প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯
ডিসেম্বর, ১৯৭৯

প্রকাশ করেছেন
এ, দাস
শ্রীগুরু পাবলিকেশন
২৩এ, নুর আলি লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১৪

ছেপেছেন
শ্রীশিশিরকুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭
শ্রীমতী শিখা চৌধুরী
রূপা প্রেস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

বেঁধেছেন
নির্মল দত্ত
দত্ত বাইণ্ডার্স
১১ডি, আরপুলি লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১২

॥ ওঁ নমো ভগবতে শ্রীগুরবে নমঃ ॥

এইখণ্ডে চারটি উপন্যাস আছে

বেগম রিজিয়া

সিরাজের ফৌজী

ক্রীতদাসী

বাঈ বেগম বাঁদী

দুটি গল্প

নর্তকী রাণাদিল

কহে চণ্ডীদাস

সম্পাদিকার বক্তব্য

পরিব্রাজকাচার্যবর শ্রীশ্রীমদ্দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেবের স্মরণে এই বিপুল গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। এই অসম্ভব সম্ভব করলেন সেই সচ্চিদানন্দ মহাপুরুষ। যাঁর শ্রীপাদপদ্মে মানুষের কাতর প্রার্থনা নিবেদিত হয়, যিনি জীবের কল্যাণের জন্যে অহরহ নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সেই ইচ্ছা কাজে পরিণত হলে মানুষ অবাক হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশেও অনেকে অবাক হয়েছেন কিন্তু যিনি অন্তর্যামী সচ্চিদানন্দ তাঁর অমল পরশ যে পেয়েছে সে কখনও অবাক হবে না। তাই আমিও অবাক হই নি এই গ্রন্থ প্রকাশে। আজ এই সম্পাদিকার বক্তব্য লিখতে গিয়ে অনেক কথাই মনে আসছে। জীবিত লেখকের রচনাবলী খুব একটা প্রকাশ হয় না। লেখক জীবিত থাকতেই তাঁর রচনাবলী বেরিয়ে যাচ্ছে। অনেকে হেসে বললেন, তাহলে কি লেখকের লেখার সমাপ্তি ঘটল? তিনি কি আর কোন লেখা লিখবেন না?

এদেশে চালু একটা নিয়ম আছে, লেখকের মৃত্যু ঘটলে তাঁব রচনা নিয়ে কিছু আলোচনা হয়, তাঁর অপ্রকাশিত কি আছে তার খোঁজ করা হয়। প্রকাশকরা সেই লেখকের বাড়ী গিয়ে তাঁর গ্রন্থ ছাপার জন্য তাঁর উত্তরাধিকারকে অনুরোধ করেন। দেখা যায় যে লেখক ও তাঁর লেখা নিয়ে তাঁর জীবিতকালে খুব একটা আলোচনা করেন নি বা যাঁরা করেছেন অল্পস্বল্প 'বেশ লিখছে এমনি ভাব' তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর রচনা নিয়ে যেন হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এ সর্বক্ষেত্রে সব লেখকের বেলাতেই দেখা যায়। তবে যে ব্যতিক্রম হয় না তাও বলছি না। যাঁরা জীবিত-কালে স্বীকৃতি পেয়ে যশের মুকুট পরে সূর্যের মতো জ্বলেন তাঁরা খুবই ভাগ্যবান।

আলোচ্য লেখক শ্রীঅমরেন্দ্র দাস পূর্বসূরী দলের। তিনি নিঃশব্দে যেমন সাহিত্যে প্রবেশ করেছেন, নিঃশব্দে তিনি পাঠকমনে জায়গা করে নিয়েছেন। বরেণ্য লেখক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র একসময়ে তাঁকে বলেছিলেন, অমরেন্দ্র তুমি যে মাঠ ভেঙে সাহিত্যে ঢুকে পড়লে! দেখো যেন মাঠ থেকে বেরিয়ে যেও না। অর্থাৎ তাঁর বলার উদ্দেশ্য, কোন বড় পত্রিকার তরফ থেকে স্বীকৃতি পেয়ে তোমার সাহিত্যে আগমন নয়। নিজের রচনার গুণে তুমি পাঠকমন জয় করেছ। এই যে পাঠকমন জয় করার ক্ষমতা, শুধু একটি বিশেষ বই লিখে নয়, অনেক অনেকগুলি লিখে। এই ক্ষমতা ক'জন সাহিত্যিকের মধ্যে দেখা যায়? আর শুধু হালকা লেখা নয়, গুরু গম্ভীর অর্থবহ ক্লাসিক জাতীয় রচনা।

এই যে লেখকের ক্ষমতা, সে ক্ষমতা কি অস্বীকার করা যায়? আমরা সেই লেখকের প্রকাশিত সমস্ত রচনা থেকে মাত্র তাঁর বিশেষ ঐতিহাসিক রচনাগুলি নিয়ে 'ঐতিহাসিক রচনা সমগ্র' বের করতে চলেছি। আর এ সমগ্র তাঁর

জীবৎকালেই বেরুচ্ছে। লেখককে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, বেঁচে থাকতেই শ্রাদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, এ মন্দ ব্যবস্থা নয়।

এ সম্বন্ধে লেখকেরও কিঞ্চিৎ অভিমান আছে লক্ষ্য করেছি। যাঁরা তাঁর রচনা পাঠ করেন, তাঁরা কখনই তাঁর কম বয়সটা স্বীকার করেন না। পরিণত লেখার বয়স পরিণত ও বয়স্ক হওয়া উচিত। অর্থাৎ জ্ঞানগর্ভ রচনা লিখবে প্রাজ্ঞ ও পরিণত বয়স্ক মানুষ, অর্থাৎ প্রবীণ ব্যক্তি। সে জায়গায় অমরেন্দ্র দাসের বয়স পাকা লেখার দৌলতে খুবই অল্প। একটি লোক বেঁচে থাকতে প্রবীণ, সেই প্রবীণের শেষপর্যন্ত রচনা সমগ্র বেরিয়ে তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হল, সেইজন্যে হেসে বললেন, আমার শ্রাদ্ধেরও ব্যবস্থা হয়ে গেল? লেখা যাঁর এখনও সমাপ্তির মুখে পৌঁছোয় নি, তাঁর রচনা সমগ্র বেরিয়ে যাচ্ছে।

এ কথায় আমার বক্তব্য, তাঁর এই বিশেষ ঐতিহাসিক রচনাগুলি কয়েকটি সংস্করণের পর একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাচ্ছিল। অথচ যাঁরাই এই বইগুলি পড়েছেন তাঁরা এর পুনর্মুদ্রণের জন্যে বার বার তাগিদ দিয়েছেন। কিন্তু এই বিপুলগ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশকরা হাতে নিতে চান নি, তার কারণ ব্যবসায়িক ভীতি। আজ কাগজ, মুদ্রণ, বাঁধাই, বিজ্ঞাপনের যে বিপুল ব্যয়ভার, যদি না চলে?

সেই ব্যয়ভার কাঁধে নিলেন শ্রীগুরু পাবলিকেশনের কর্তৃপক্ষ। তাঁকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারছি না। আমার ধারণা ১৯৬১ সালে যে পাঠক ছিল, তাঁর চতুর্গুণ বেড়েছে এবং যেমন অমরেন্দ্র দাসের যাত্রা শুরু হয়েছিল ঐ ১৯৬১ থেকে তখন যেমন বইগুলি মর্যাদা পেয়েছে আজ পাবে তাঁর চতুর্গুণ। সুতরাং এই ব্যয়ভার বিফলে যাবে না।

এই খণ্ডের রচনার আলোচনায় আসার আগে আর একটি কথা জানাই, বহুগুণী মানুষের আশীর্বাদে ধন্য হয়ে এই স্বীকৃতিবান লেখকের জীবন ধন্য। ক্ষমতা যাঁর আছে তাঁর খ্যাতি চাপা থাকে না। জনে জনে এসে বিতরণ করে যায় তাঁর মনের খুশির বরমাল্য। এমনি দুজন মানুষের কথা কিছুতে বিস্মৃত হবার নয়। একজন ঐতিহাসিক ডক্টর প্রতুল গুপ্ত, যিনি উপযাচক হয়ে লেখককে বলেছিলেন, আপনার লেখার হাত বড় সুন্দর, আমার কাছে এলে আমি আরও ম্যাটার দিতে পারি। আর একজন বরেণ্য প্রয়াত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্বীকারই করেছেন, আমিও তো শিয়া, সুন্নীদের নিয়ে কত পড়াশুনা করলাম, কই তোমার মত তো লিখতে পারলাম না। এক একজন জন্মায় এক একটি ক্ষমতা নিয়ে। তারাশঙ্কর তারাশঙ্কর। অমরেন্দ্র অমরেন্দ্র। এই লেখকের কাছে একসময়ে শুনেছি তিনি যখন সহজ গল্প লেখেন অনেকে মুখ ফিরিয়েছিল। তারাই উপদেশ দিলেন, এমন কিছু লিখুন যাতে নাড়া খেয়ে যায়। তাই হেসে বলেন, তাঁরা যে গাল দিয়ে আমার কি উপকার করেছিল?

সত্যি সেই সব বন্ধুস্থানীয় মানুষদের নমস্কার জানাই, শিল্পীকে এমনি আঘাত না করলে তাঁর ভেতরের সৃজন প্রতিভাকে জাগানো যায় না। এই খণ্ডে আছে,

বেগম রিজিয়া, সিরাজের কৈফী, ক্রীতদাসী, বাঈ বেগম বাঁদীর খণ্ডাংশ। এইরকম একটি করে বড় বইয়ের খণ্ডাংশ প্রত্যেক খণ্ডেই দেওয়া হবে কারণ তা না'হলে বড় বইগুলি একসঙ্গে একখণ্ডে দেওয়া সম্ভব নয়। তাতে কলেবর বৃদ্ধি পাবে ও খণ্ডগুলির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যাবে না। এ ছাড়া খণ্ডগুলিতে মাঝে মাঝে কিছু গল্পও থাকবে। এ খণ্ডে আছে, নর্তকী রাণাদিল ও কহে চণ্ডীদাস।

অমরেন্দ্র দাসের ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশেষত্ব ইতিহাসকে বিকৃত না করে উপন্যাস রচনা করা। প্রচুর ইতিহাস পড়ে তার মধ্যে থেকে কোন প্রধান চরিত্র নিয়ে তার জীবনের মধ্যে ঢুকে পড়ে সেই রাজরাজড়ার জীবনের মধ্যে যে কান্না সেটাই সাহিত্যে রূপ দেওয়া। আমরা যেমন সামাজিক জীবনের মধ্যে ব্যথা বেদনা, আনন্দ সুখ বঞ্চনা অবিচারের মধ্যে জীবন খুঁজি। ইতিহাসের চরিত্রও যে মৃত নয়, সে ঘটমান অতীত। তাকে সজীব করে তুলে ধরাই অমরেন্দ্র দাসের রচনার প্রধান গুণ। যেমন সেই ঘটমান অতীতটাও পাঠককে জ্ঞাত করল, তার সঙ্গে উপন্যাসের রসও তার প্রাপ্য হল। অথচ ভাষার অদ্ভুত মোহিনী শক্তিতে কলেবরও কলেবর মনে হল না। মুহূর্তে একটা জগতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে লেখক পাঠককে দৌড় করিয়ে মারল। এটাই লেখকের রচনার প্রধান প্রসাদ গুণ। যেমন রিজিয়া, যে সুলতানা হয়েও তার নারীমন লুকোতে পারে নি, এ যেন বেগম রিজিয়া না পড়লে বিশ্বাস হত না।···অতবড় একজন নবাব সিরাজ তার পরাজয় সামান্ত একজন তওফায়ালীর কাছে। অথচ এ ইতিহাস সত্য। সিরাজের অন্তরের বেদনার স্পর্শ কি পাঠকও পান নি?···তারপর ক্রীতদাসী হীরার বেদনা। পর্তুগীজদের স্বদেশ প্রেম, খৃষ্টান পাদরীদের উদারতা, তার ওপর সে যুগে হুগলীর দাসবাজার। এ যেন রূপকথা বলে মনে হয়। অথচ এ নিছক কল্পনা নয় সত্য ঘটনা, বিশ্বাস করতে কেমন যেন ইচ্ছে করে না। অথচ এ সত্য।···বাঈ বেগম বাঁদীতে আকবরের জীবন। যিনি ইতিহাসে মহামতি আকবর বলে নাম পেয়েছিলেন তাঁর প্রথম জীবনটা কি মর্মন্তুদ!

পরিশেষে সম্পাদিকা হিসাবে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, যাঁরা এই গ্রন্থপ্রকাশে অক্লান্ত সহায়তা করেছেন তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। দ্রুত মুদ্রণের জন্যে কিছু ভুল ভ্রান্তিও থেকে গেল। পরবর্তী খণ্ডে যাতে এ ত্রুটি না থাকে তার চেষ্টা অবশ্যই থাকবে।

সম্পাদিকা
শিউলি দাস

লেখকের শুভেচ্ছা

আমাকে পাঠকপাঠিকার জন্য শুভেচ্ছা জানানোর অনুরোধ করেছেন সম্পাদিকা। শুভেচ্ছা তো অনেকদিন আমার প্রিয় পাঠকপাঠিকাকে জানিয়েছি। আজ আর নতুন করে কি জানাবো। তাঁরা আমার লেখনী পরম সমাদরে গ্রহণ করেছেন, লেখকের লেখাকে বুকে তুলে নিয়েছেন, তাঁদের কাছে যে আমি চিরঋণী। আজও তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম তাঁদেরই শুভেচ্ছায় এই ঐতিহাসিক রচনা সমগ্র প্রকাশ হল দেখে। বহুদিন ধরে যে বইগুলি অন্তরালে চলে গিয়েছিল সেগুলি একসূত্রে গাঁথা হচ্ছে দেখে আমার চেয়ে আনন্দিত আর কে হবে? সন্তানের উন্নতিই তো জন্মদাতার পরম কাম্য। সেই আনন্দ মনে ধারণ করেই এখানে এই খণ্ডের ইতি টানলাম।

পরম দুঃখের সঙ্গে জানানো হচ্ছে যে ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখবেন বলে আগ্রহান্বিতা হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর বিস্তারিত ভূমিকা আমাদের কাছে যথাসময়ে এসে পৌছালো না দেখে তাঁর ভূমিকার জন্যে আর অহেতুক প্রকাশের বিলম্ব করা গেল না। একেই দুর্লভ কাগজ ও বৈদ্যুতিক গোলযোগের জন্য মুদ্রণ বিভ্রাট ইত্যাদিতে অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। যদিও এ ত্রুটি আমাদের নয়, তবু তো ত্রুটি, তাই ত্রুটি স্বীকারে বাধ্য হলাম।

সম্পাদিকা

বেগম রিজিয়া

উপন্যাস প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি

সবাই জানতো রিজিয়া সুলতানা। ভারতে প্রথম নারী সুলতানা, অবশ্য পৃথিবীর ইতিহাসে নয়। কিন্তু সে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতো, পুরুষের বেশে সিংহাসনে বসতো, রাজ্যে বিয়ে শাদী হলে তার হুকুম নিতে হতো কিন্তু কেন? তবে কি সে বিয়ে শাদীর ওপর ক্ষুব্ধ ছিল? এই প্রশ্নগুলি মনে হতে ভারতের প্রথম নারী সুলতানার ওপর পড়াশুনায় মন দিই। আর তারপরই বেরিয়ে আসে সুলতানা রিজিয়ার জীবনের নানান কাহিনী। রিজিয়া শুধু সুলতানাই হয় নি, বেগমও হয়েছিল। আর মনটি ছিল একটি কোমল নারী মন, যা নারীর আসল ধর্ম হওয়া উচিত। কিন্তু বাইরের চেহারায় কখনও তা প্রকাশ করতো না। একি শুধু সেই ইতিহাসের নারী, না আবহমানকাল ধরে সেই নারীরই একরূপ। যে প্রেমিকের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে কখনও দ্বিধা করেনি। রিজিয়াও তাই করেছিল। তাই সেই রিজিয়াকে নিয়ে এই উপন্যাসের প্রস্তাবনা। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা যায়, একসময়ে বাংলায় নাটক লেখা হয়েছিল 'সুলতানা রাজিয়া' নামে কিন্তু সে সুলতানার কাহিনী, বেগমের নয়। মনে হয় এই প্রথম বেগম রিজিয়াকে নিয়েই উপন্যাস লেখা হল।

'Those who scrutinize her actions will find no fault but that she was a woman.'

(Birggs' Ferishta, i,217-8)

'দিল গুমান দারদ কি হুশীদে অস্ত্
রাই-ই ইশ্‌কুয়া
শমরা ফানুস পনদারদ্ কি পিনহাস্
করদে অস্ত্।'

আসমানে নীল নীল ছায়া। নীলের সমারোহের মাঝে সাদা সাদা মেঘের আলপনা। সলমা-চুমকির মতো রূপোলী জরির বুটি জলছে আসমানে নীলের সমারোহে। রূপোলী আলোর মায়ামোহ বিস্তার দিগন্তের অসীম কূল ছাপিয়ে। এক একটি তারা খুব উজ্জ্বল হয়ে তার রূপের ছটায় নিস্তব্ধ প্রহরীকে চমকে দিয়ে টুপ করে মিলিয়ে যাচ্ছে শূন্যের মাঝে। মাঝে মাঝে বাতাসের স্নিগ্ধ পরশ ছুটে আসছে প্রাসাদ অলিন্দে। কিন্তু সে পরশ অনুভবের সাড়া জাগাবার আগেই কোথায় কোন অতলান্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।

রিজিয়া তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে নিশ্চুপ রাতের দিকে। এমনি করে রাত্রিকে উপভোগ করার সময় তার জীবনে কখনও হয়নি। জীবনে কখনও আসেনি এমনি একটি অশুভ মুহূর্ত। হ্যাঁ অশুভ মুহূর্ত। অশুভ ছাড়া আর কি বলবে? এই রাত্রি তার কাছে আজকে সুষুপ্তির কোলে মখ্‌মলের কোমল শয্যায় বিশ্রাম নিতে দেয় নি, জাগিয়ে রেখেছে। দেহের মধ্যে পুরে দিয়েছে দস্যুর ছুরিকা। যে কথাটা সবসময় সে একান্ত গোপনে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে জল্লাদ যেন হুঙ্কার দিয়ে সেই কথাটাই বার বার উচ্চারণ করেছে, 'তুমি নারী তুমি রমণী। পুরুষকে ভালবেসে দিওয়ানা হয়ে যাওয়ার জন্যেই তোমার জন্ম।'

প্রাসাদের নহবত চূড়ায় কিছুক্ষণ আগে রাত্রি দ্বিপ্রহরের বার্তা ঘোষিত হয়েছে। নিস্তব্ধ প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে তারই প্রতিধ্বনি সহস্র হয়ে ঢেউ সৃষ্টি করে দূর-দূরান্তে মিলিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে খোজা-প্রহরীর পায়ের শব্দ ভেসে আসছে এই নিস্তব্ধ রাত্রে। আর কি কোন শব্দ নেই? রিজিয়া বিস্ময়ে ভাবলো। কান পাতলো বাতাসের বুকে। নরনারীর কোন গোপন অভিসার সুলতানার অগোচরে এই রাতের রঙ্গমঞ্চে কথা কয়ে ওঠে না, অন্যায় করে না, সুলতানার নিষেধ বাক্য অমান্য করে হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করে না! এসব কথা ভেবেই রিজিয়া কেমন যেন বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে গেল। তবে কি রিজিয়াকে বুঝতে হবে—এখানে হৃদয় বড় না। মানুষের ধর্ম বড় না। আইন বড়। জল্লাদের খড়্গ বড়। সে সমস্ত নগরীতে ঘোষণা করে দিয়েছে কেউ বিয়ে-শাদী করতে পারবে না। করলে সুলতানার হুকুম চাই। না হলে নিশ্চিত কারাগার বাস। কিন্তু কেউ কি জানে না সুলতানা রিজিয়া এ হুকুম দিয়েছে কেন? জানে, জানে সবাই জানে। কেউ প্রকাশ করে না রিজিয়ার ভয়ে।

কেউ প্রকাশ করে না রিজিয়ার ভয়ে তাদের প্রণয়কাহিনী। কিন্তু এই রাতের নিভৃতলোকে সুলতানা রিজিয়া জেগে আছে কেউ তো জানে না। তবে কেন তাদের গোপন প্রেমালাপ নিস্তব্ধ প্রহরে ফিসফিসিয়ে অনুচ্চারিত হয়ে ওঠে না! যার শব্দ শুনে রিজিয়ার হৃদয়ের স্তরে একটি প্রশ্নেরই মীমাংসা হয়ে যায়। পৃথিবীতে আইন বড় না, হুকুম বড় না। হৃদয় বড়। একটি হৃদয়ের জন্যে আর একটি হৃদয়ের ব্যাকুলতা সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে চূর্ণ করে দেয়।

সকলে জানে রিজিয়া ন্যায়পরায়ণা, বিদ্যোৎসাহিনী, দয়াশীলা রমণী। কঠোর এবং নির্মম সুশাসক। রাজদরবারে বসে কঠোরভাবে অপরাধীর বিচার করে। সেখানে নারীর কোমলতা নেই। নারীর মনের কোমল বৃত্তিগুলিকে চূর্ণ করে দিয়ে পুরুষের দৃঢ়তাই রিজিয়া অভ্যাস করেছে। পুরুষের বেশে যখন রিজিয়া রাজদরবারে বসে কাজীর মত বিচার করে, সম্মুখে বসে থাকা আমীর-ওমরাহরা দেখে চমকে ওঠেন। তাঁরা ফিসফিস করে পরস্পরে রিজিয়ার সম্বন্ধে আলোচনা করেন; রিজিয়া বুঝতে পারে তাঁদের মনোভাব। মনে মনে হাসে সে। কি তাঁরা আলোচনা করেন তাও জানে রিজিয়া। এঁরাই একদিন নারীর বশ্যতা স্বীকার করতে চাননি। দিল্লীর সিংহাসনে একটি নারীর আসন হবে অলঙ্কৃত! এ কথা চিন্তা করে তাঁরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন! আর তার জন্যেই তৈরী হয়েছিল—'চল্লিশের চক্র'।

কিন্তু আজ? যে নারীর হাতে দিল্লীর সিংহাসন, সে নারী যে কোমলস্বভাবা নারী নয়—তা প্রমাণ হয়ে গেছে। বরং পুরুষের দৃঢ়তা, কঠোর মনোভাব—তার চেয়েও রিজিয়া প্রমাণ করেছে যে সে পুরুষকে ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠতে পারে। সে পুরুষ না, নারী না—দিল্লীর সিংহাসনের একজন সত্যিকারের সুলতানা। পিতা আলতামাসের সম্মান সে রেখেছে। পিতার ভবিষ্যৎবাণী সে সফল করেছে। একটি কথা আজও মনে আছে রিজিয়ার। সে তখন ছোট। পিতা আলতামাস গোয়ালিয়র যুদ্ধ জয় করে প্রফুল্লচিত্তে দিল্লীতে প্রবেশ করলেন। প্রধানা মহিষীর প্রাসাদে এসে দেখেন পিতার জয়লাভে স্নেহময়ী রিজিয়ার মুখে এক অপূর্ব রাজভাবের সমাবেশ হয়েছে। আলতামাস কন্যার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করে খুশী হয়ে রাজসচিব তাজুলমালিক মাহমুদকে ডেকে আদেশ দিলেন—রাজদপ্তরে লিখে রাখো, এই কন্যাই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী এবং আমার মৃত্যুর পর সিংহাসন অলঙ্কৃত করবে।

সিংহাসন রিজিয়া পেয়েছে বটে। পিতার ভবিষ্যৎবাণী সফলও হয়েছে। কিন্তু সিংহাসন পাওয়ার জন্যে যে কষ্ট তাকে করতে হয়েছে সে কথা কোনদিনও সে ভুলবে না। এবং আজ পর্যন্ত তাকে গভীরভাবে চিন্তা করে সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। বিদ্রোহীদের শিরে পদযুগল স্থাপন করে তবে তাকে সিংহাসন টিকিয়ে রাখতে হয়েছে। মুহূর্তে এতটুকু শিথিল মনোভাব দেখালেই পশ্চাতে সম্মুখে শত্রু নিশান তুলে অপেক্ষায় আছে।

কি নিদারুণ তার এই পরীক্ষা? সে ভুলে যেতে চেয়েছে সে নারী নয়। রমণী নয়। সে পুরুষ। পুরুষের চেয়েও কঠিন। বজ্রের চেয়েও ভয়ঙ্কর। কিন্তু তার এই অসামান্য যৌবন তাকে তা ভুলতে দেয়নি। প্রকৃতির নিয়মে, মানুষের ধর্মে, রমণীর দেহে যে প্রকাশগুলো একটি অপূর্ব সময়ে জেগে ওঠে, তাকে সৌন্দর্যময়ী করে দেয়, রিজিয়ার দেহেও আল্লা সে উপহার না দিয়ে পারে নি। কিন্তু কেন এই উপহার? কে চেয়েছিল এই উপহার? রিজিয়া রমণী—এ কথা যে বার বার সে বিস্মৃত হতে চেয়েছে।

বার বার সে আল্লার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে—রমণীর সৌন্দর্য তাকে দিও না। সে দিল্লীর সুলতানা। সিন্ধুনদ থেকে জাহ্নবী পর্যন্ত সুবিশাল আর্যাবর্তের একচ্ছত্র

অধিশ্বরী সে। তাকে কঠোর হস্তে রাজ্য পরিচালনা করতে হয়। তার জন্ম দিল্লীর সিংহাসনের জন্য। তার জন্ম কোন পুরুষের পূজার নৈবেদ্য গ্রহণের জন্য নয়। পুরুষের সুদৃঢ় আলিঙ্গনে পরশে পরশে হৃদয় রাঙা হয়ে উঠবে সে রকম মন নিয়ে তার জন্ম হয়নি। সে অশ্বারূঢ় হয়ে শত্রু নিধনে সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ বিজয়ে ছুটবে। রণক্ষেত্রে অসির ঝন ঝনানিতে পৃথিবী কাঁপিয়ে শত্রুকে দ্বিখণ্ডিত করবে—এইজন্য তার জন্ম। সেইজন্যে সে কোন সময়ে নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে চমকিত হয় নি। দীর্ঘ মুকুরে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে খুশীর জোয়ারে হৃদয় সমুদ্রে তুফান তোলেনি। পাছে তার মন শিথিল হয়ে যায় এইজন্যে সে কখনও সহজে পুরুষের বেশ দেহ থেকে খোলেনি। পাছে তার মনে কোন কথার আলোড়ন জাগে সেইজন্যে সে সারাদিন ধরে পরিশ্রম করেছে। তারপর ক্লান্ত-শ্রান্ত পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে শয্যার ওপর অঘোর সুষুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে। পাছে নিস্তব্ধ রাত্রে নারীর হৃদয়ের আকুতি চীৎকার করে কেঁদে ওঠে, বিদ্রোহী হয়ে রিজিয়াকে প্রতিজ্ঞা থেকে টলিয়ে দেয় সেইজন্য কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে চিন্তাকে এড়ানোর জন্যে সে শয্যার কোলে মুহূর্তের মধ্যে নিদ্রার বশীভূত হয়েছে।

কিন্তু আজ সবকিছু সাবধানতা, কঠোরতা, যুদ্ধ, শাসন, বিচার, দরবার, বিদ্রোহ সব লয় করে দিয়ে প্রকাশ্য দরবারে সবার সমক্ষে একজন দৃঢ়মনে তাকে জানিয়ে গেছে সে নারী। সে যতো চেষ্টা করুক পুরুষের মতো কঠিন মনে রাজ্য-পরিচালনা করার। তবু সে নারী। একটি কেন, সহস্র পুরুষের হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতে পারে। তাকে কেউ জোর করে অধিকার করে বুকে চেপে ধরলে হৃদয়ের শোণিত তপ্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু লোকটা সাহস পেল কেমন করে? প্রকাশ্য রাজসভায় আমীর-ওমরাহ, মন্ত্রী, সেনাপতি, উচ্চকর্মচারী, মোল্লাকাজী, স্ব-স্ব আসনে বসে আছেন। প্রহরীরা স্ব-স্ব স্থানে পাহারা দিচ্ছে তাদের কোষবদ্ধে অসি। ঘাতক একপাশে অপেক্ষা করছে হুকুমের অপেক্ষায়। তার হাতের খড্গে সূর্যের রশ্মি। মাঝে মাঝে সুলতানাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

উন্মুক্ত রাজসভা। রিজিয়া পুরুষের বেশে উচ্চ সিংহাসনে বসে সমস্ত রাজদরবারের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার মুখে দৃঢ়তার ছাপ। দৃষ্টিতে মেয়েলি-ছাপ এতটুকু নেই। দৃষ্টির মধ্যে একটি ক্ষুব্ধভাব জাগানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ঠোঁটের কোণে মৃদু- হাসির হীরার ঔজ্জ্বল্য। সেই হাসিটুকু লক্ষ্য করার জন্যে আমীর-ওমরাহদের সতৃষ্ণ দৃষ্টি রিজিয়ার ওপর। রিজিয়া বুঝতে পারে হাসা তার অন্যায়। কিন্তু না হেসেও সে পারে না। রাজদরবারে বসে প্রফুল্লভাব জাগিয়ে না রাখলে রাজ-প্রতিনিধিদের অসম্মান করা হয়। পিতা আলতামাস যখন রাজদরবারে বসতেন, রিজিয়া দেখেছে। তিনি হাসিমুখেই এক একটি কঠিন বিচার সমাধা করতেন। রাজ-প্রতিনিধিরা অবাক হয়ে তাঁর বিচার লক্ষ্য করতেন আর শিউরে উঠতেন। তাঁরা ঐ হাসিকে ছুরি বলতেন। রিজিয়া হাসিটিকে ছুরি করবার জন্যে, শাণিত

করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে কিন্তু তা হয়নি। মেয়েলি হাসিতে যে বিজলীর চমক, সরাবের মাতোয়ারা থাকে, তা তার হাসিতে ফুটে উঠেছে। সতৃষ্ণনয়নে লুব্ধ দৃষ্টিতে যে আমীর-ওমরাহরা লক্ষ্য করে তা দেখে সে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়—কিন্তু হাসি লুকিয়ে সে গম্ভীর হতে পারে না। হাসি লুকোলে পিতার সম্মান সে রক্ষা করতে পারবে না। সিংহাসনের ইজ্জত গরিবী-আশ্রয়ের মতো পথের ধুলোয় লুটিয়ে যাবে। দিল্লীর মহামূল্য সিংহাসনের রোশনাই ম্লান হলে তাদের দাসবংশের পূর্বপুরুষরা কবর থেকে উঠে এসে তাকে শাসন করবে।

কিন্তু এই হাসিই তার রাজ্যে অগণিত মানুষের হৃদয়শোণিতে তুফান তুলেছে। সে খবর সে জানতো। জানতো আমীর-ওমরাহ, মন্ত্রী, সেনাপতি, তার হৃদয় অধিকার করবার জন্যে তার পাশে পাশে ছায়ার মত ফিরছে। এক একসময় ভাবে রিজিয়া, সে অপরাধীকে এত কঠোর দণ্ডাজ্ঞা দেয়; মন্ত্রী,সেনাপতিদের সঙ্গে কখনও কোমল ব্যবহার করে না; প্রাসাদের কোন কর্মচারী তার কাছ থেকে এতটুকু দয়া পায় না; ভালবাসার চোখে, প্রেমের চোখে, মহব্বতের রোশনাই জেলে গোলাবী নেশাসক্ত চোখে কখনও কারও দিকে এতটুকু দৃষ্টি হেলায় নি—তবু কি আছে তার দেহের মধ্যে যার জন্যে সমস্ত দিল্লীর মানুষ তার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত সমর্পণ করতে চায়? জল্লাদের খড়্গের তলায় মাথা দিতেও ভয় পায় না?

রিজিয়া নিজের ভাইদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কথা ভাবে। পিতা বেঁচে থাকতেই তারা সেরাজি সরাবের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে ফুলের মতন টুকরো টুকরো নরম কোমল মেয়েলী দেহগুলো নিয়ে দিনরাত তাদের নিঙড়ে রস বের করবার চেষ্টা করেছে। নগ্ন, অর্ধনগ্ন নিটোল দেহগুলোর বিচিত্রখাঁজে যে রহস্যের আনাগোনা থাকে সেই রহস্যকে আরও প্রকট করে তোলবার জন্যে তাদের নাচিয়ে—সেরাজি সরাবের নেশায় মাতোয়ারা করে বাঁদীগুলোর, নর্তকীগুলোর দেহের রহস্য জিহ্বার আস্বাদে লেহন করেছে। রিজিয়া তখন ছোট। সে মাঝে মাঝে লুকিয়ে ভাইদের এই প্রমোদ ক্ষেত্রে চোখ লাগিয়ে দেখেছে। দেখেই চোখ বন্ধ করে পালিয়ে এসেছে। শিউরে উঠেছে তার দেহ। যৌবন তখন তার সবে দ্বারে এসে কুর্নিশ জানিয়েছে। তার দেহের মেয়েলি খাঁজগুলি আস্তে আস্তে অলঙ্কারের জলুস নিয়ে অসামান্য হয়ে উঠেছে। ভরন্ত হয়ে উঠেছে বুক। দুধশুভ্র সমুদ্রের ফেনার মতো বুকের পেলবতায় জেগে উঠেছে রক্তিমতার ছোঁয়াচ। লজ্জারুণ হয়ে উঠেছে শরীরের কোন কোন অংশ। চটুল ভঙ্গি। সাবলীল গতিবেগে চোখের চাউনিতে জেগে উঠেছে মদিরচ্ছটা। সেইজন্যেই দেখতে গিয়েছিল রিজিয়া। শুধু কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে। তার ভায়েরা দিনের পর দিন বাজনার তালে তালে নর্তকীর পায়ের ঘুঙুরের শব্দ শুনে আর সরাবের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে কি আনন্দ পায় দেখবার জন্যে সে লুকিয়ে চোখ দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে তাকে এই দেখতে হবে সে ভাবেনি। পিতা কেন নিষেধ করেন এবার সে বুঝতে পেরেছে। রমণীর নগ্নদেহ যে এমনি প্রকাশ্য প্রমোদঘরের আলোর নীচে এমনি প্রকটভাবে ধরা দিতে পারে—রিজিয়া

কখনও ভেবে পায়নি। তাড়াতাড়ি সে তার বুকের ওড়নার ওপর হাত দিয়ে চাপা দিয়েছে। কেউ বুঝি তার আসমানি সাটিনের সালোয়ার কামিজ টেনে খুলে দিচ্ছে, এমনিধারা ভয়ে ভয়ে সে চেপে ধরেছে তার সালোয়ার, কামিজ, ওড়না।

পিতা আলতামাস ভাইদের বার বার কেন নিষেধ করেন—এইবার সে বুঝতে পেরেছে। নারীর যৌবনের তপ্ত নিঃশ্বাসে পুরুষের দেহের সমস্ত পৌরুষটুকু নিঃশেষ হয়ে যায়। পুরুষের রক্তে থাকবে বীরের সাহস, হস্তীর দাপট, অশ্বের দৃঢ়তা—সেইসব শক্তি দুর্বল হয়ে যায় একমাত্র বিলাসের পঙ্কে অবগাহন করে নারীর যৌবন দেহের ছোঁয়াচ নিলে। পিতা আলতামাস মুসলমান সুলতান হয়েও উচ্ছৃঙ্খলতাকে ঘৃণা করতেন।

না'হলে পূর্বপুরুষদের গল্প মায়ের কাছে শুনেছে রিজিয়া। প্রায় অধিকাংশ সুলতানই বিলাসের পঙ্কে অবগাহন করে নারীর লালসার মধ্যে বন্দী হয়ে রাজ্য হারিয়েছে। মুসলমান সমাজের ওপর কলঙ্কের কালিমা লেপে দিয়ে আলবারী তুর্ক-জাতিকে ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে। মুসলমান সুলতানদের এই ঘৃণ্য জীবনের কথা চিন্তা করলে এক একসময় শিউরে উঠতে হয়।

সম্মান তাদের কাছে কিছু না। কর্তব্য তাদের জলাঞ্জলি যায়। হিংসা, দ্বেষকে বুকে বেঁধে অতর্কিতে বুকে ছুরি বসিয়ে একবার ছিনিয়ে নিতে পারলেই হল রাজ্য। তারপর নাচঘর, সেরাজি সরাব, নর্তকীর ললিত ছন্দে ঘুঙুর নিক্কণ। খুবসুরত লেড়কীর যৌবনকে বসোরাই গোলাপের মতো মুঠিতে নিয়ে নিষ্পেষিত করতে পারলেই হল। রাজকোষের আসরফি দুহাতে বিলিয়ে দিয়ে—মুক্তার কণ্ঠহার গলা থেকে খুলে জগতের সেরা সুন্দরীদের পরিয়ে দিয়ে বিলাসের পঙ্কে অবগাহন করতে পারলেই মুসলমান সুলতানরা শ্রেষ্ঠ। মায়ের কাছে বসে সে সব গল্প সেদিন শুনে মনে মনে সে মুসলমান সুলতানদের ঘৃণার চোখেই দেখেছে। পরিণত বয়সে আজকে দিল্লীর সুলতানা হয়ে সে তাই বিলাসী পুরুষদের এড়িয়েই চলে। যাদের মধ্যে সে এতটুকু এমনি ধরণের বিলাস দেখে তাদের সে কখনও রাজ্যের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করে না। তবে সামনে কেউ কিছু না করলেও গোপনে শুনতে পায়, আমীর ওমরাহ, মন্ত্রী, সেনাপতি, সামন্তদের মধ্যে এমনি ধরণের বিলাস মাঝে মাঝে মাত্রাধিক্য হয়ে ওঠে।

সংযম রক্ষা করে রিজিয়া। সে রমণী। গান, বাজনা, নাচ, সরাব তার কাছে আনন্দের সামগ্রী নয়। কিন্তু পুরুষেরা একটু আধটু এসব না করলে বাঁচবে কেমন করে? বিশেষ করে রমণীর চটুলভঙ্গি, যৌবনের অপরূপ লীলায়িত ছন্দ, তাদের দেহের শোণিতে আগুন জ্বালে। যুদ্ধজয়ী যোদ্ধাদের ক্লান্তি নিবারণ করতে এইসব উপকরণই যথেষ্ট। সেইজন্যে তার আদেশ আছে, যুদ্ধজয়ে ফিরে এলে তার রাজ্যের সবাই আনন্দ করবে কিন্তু মাত্রাধিক্য নয়।

কিন্তু এ আদেশ থাকা সত্ত্বেও আমীর ওমরাহরা সুলতানাকে উপেক্ষা করেই আলাদাভাবে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে। রিজিয়া বাঁধা দেয় না এইজন্যে যে বিদ্রোহী হবার আকাঙ্খা আছে তাঁদের। তবে রিজিয়ার ভায়েরাও এদের সঙ্গে যোগ

করে তাঁদের আরও উত্তপ্ত করে তোলে। রিজিয়ার রাজ্যে শৃঙ্খলা থাকুক, শান্তি বিরাজ করুক, তার ভায়েরা কখনও তা চায় না।

রিজিয়ার দৃঢ়মনের রাজ্য পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করার লোক সমস্ত রাজ্যের কোথাও ছিল না। রিজিয়া অপূর্ব কৌশলে বিদ্রোহ দমন করে রাজ্যে সুশৃঙ্খলা আনয়ন করেছিল। তবু তার ভয় ছিল প্রতিমুহূর্তে কেউ কোথাও বুঝি বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। এইজন্যে সর্বদা প্রতিটি লোকের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তাকে দিনযাপন করতে হয়েছে। কিন্তু একা একটি মেয়ের পক্ষে সমস্ত রাজ্যের পুরুষের ওপর চোখ রাখা যে কি দুষ্কর সে একমাত্র রিজিয়া নিজেই জানে। সর্বদা সে ভয় কণ্টকিত হয়ে থাকতো কিন্তু বাইরে দুর্বলতা প্রকাশ করতো না।

উন্মুক্ত রাজদরবারে যখন লোকটি নির্ভয়ে জলদগম্ভীর অথচ স্পষ্ট স্বরে সমস্ত সভাসদকে চমকিয়ে উচ্চারণ করলে—'আমি চাই সুলতানা রিজিয়ার পাণীগ্রহণ করতে।' তখন সেই সময় হঠাৎ মনে পড়লো ইস্কান্দারকে। রাজ্যের প্রধান সচিব ও শাসনদণ্ড বিধাতা উলুখ খাঁর কিরকম সম্পর্কে আত্মীয়। আত্মীয় বললেও ভুল হয়। উলুখ খাঁ লাহোরের একটি বাজার থেকে কয়েকটি আসরফির বিনিময়ে ইস্কান্দারকে কিনেছিল। ইস্কান্দার একরকম ক্রীতদাসই ছিল উলুখ খাঁর। ঘৃণ্য কে? ক্রীতদাস সবাই ছিল। উলুখ খাঁ, কৎলুখ খাঁ, সঙ্কেজ খাঁ, আইবক খিতাই তার রাজ্যের বড় বড় কর্মচারীরা সবাই ক্রীতদাস। কোথাকার লোক, কোথা থেকে এসেছে। কে তাদের পিতামাতা কিছুই জানার উপায় নেই। এমনিভাবে রিজিয়ার পিতা আলতামাসও এসে ছিলেন ক্রীতদাস হয়ে সুলতান কুতুবউদ্দীনের কাছে। সেদিন কুতুব তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন বলেই আজ আলতামাসের সৌভাগ্য পরিবর্তিত হয়েছে; তা না হলে আলতামাস সেই ঘৃণ্য জীবনের মধ্যেই জীবনের বাকী দিনগুলি কাটাতো।

ইস্কান্দার ক্রীতদাস বলে রিজিয়া ঘৃণা করতো না। ইস্কান্দার তাকে প্রথম প্রেম জানাতে এসেছিল। তখন আলতামাস বেঁচে ছিলেন। ইস্কান্দার গোপনে রিজিয়ার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে একদিন প্রকাশ্যে তাকে প্রেম নিবেদন করতে আসে।

আজও সে কথা রিজিয়ার মনে আছে। তখন সবে তার দেহে রূপের মাধুর্য বিকশিত হতে শুরু করেছে। দেহের কোষে কোষে শোণিতে উষ্ণতার ছোঁয়াচ লেগেছে। মনের মধ্যে অপরূপ এক সঙ্গীতের মূর্ছনা। বক্ষের সুধায় সমুদ্রের জোয়ার। কিন্তু এসব থাকলে কি হবে? রিজিয়া মনেপ্রাণে জানে, আগামী দিনে সে দিল্লীর একচ্ছত্র অধিষ্ঠাত্রী। সে সুলতানা হবে। সে যোদ্ধা হবে। সে যুদ্ধে গিয়ে বর্ম পরিধান করে অসি হাতে শত্রুর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করবে। এসব ছেলেমানুষের হৃদয় হৃদয় খেলা তার নয়। তাকে কঠিন হতে হবে। দৃঢ় হতে হবে। সংযত হতে হবে। উন্মত্ত হওয়ার জীবন তার নয়।

সেদিন সঙ্কল্প কঠিন ছিল বলে হৃদয়ের সেই চাওয়াকে কবর দিতে হয়েছিল। না হলে সেদিন ইস্কান্দারের কোমল মুখটি দেখে কি তাকে ভালবাসতে ইচ্ছে হয় নি?

ইচ্ছে হয় নি পরশে পরশে রাঙিয়ে তুলতে নিজের বিকশিত অসামান্য তনু-দেহটি? ভুল। সেদিন প্রথম চাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটি হাহাকার করে কেঁদে উঠেছিল।

তবু যে সঙ্কল্প। অবিচলিত সে প্রতিজ্ঞা। ইস্কান্দারের সাধ্য কি ছিল তাকে টলাবে? কিন্তু পিতা আলতামাস যখন ইস্কান্দারকে যুদ্ধে সৈনিকের বেশে পাঠালেন তখন সে না কেঁদে পারে নি। ইস্কান্দারের মৃত্যু সে চায়নি। ইস্কান্দার তার সামনে সামনে থাক্ কিংবা সে যেখানেই থাক্, বেঁচে থাক্। তার প্রথম মহব্বতের বসোরাই গোলাপটির মতো সুন্দর সতেজ জীবনটি নিয়ে বেঁচে থাক—এই চেয়েছিল রিজিয়া। কিন্তু কি কুক্ষণে যে সে বাবাকে বলেছিল। পিতা আলতামাস কন্যার মনের রূপটি ধরে ইস্কান্দারকে প্রকাশ্যে শাস্তি না দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন যুদ্ধে।

অগণিত সৈনিকের মধ্যে ইস্কান্দারের মৃতদেহ কোন্ অশ্বের পদতলে বা হস্তীর পদতলে পিষ্ট হয়েছিল রিজিয়া তা জানে না। তবে সেদিন সে খুঁজেছিল ইস্কান্দারকে—যখন যুদ্ধ থেকে অবশিষ্ট সৈনিকেরা ফিরে এসেছিল।

নিভৃতকক্ষে সুগন্ধি বর্তিকার সামনে বসে সে কেঁদেছিল অনেকক্ষণ, খোদাকে জানিয়েছিল সেই একটুক্ একটি মেয়ে—'ইয়ে মেরে আল্লা! মেহেরবান্-খোদা। আমার গোস্তাফি মাপ করো। আমি চাই নি তাকে মেরে ফেলতে। সে আমার প্রথম প্রেমের বসোরাই গোলাপ ছিল।'

তারপর অনেক বছর চলে গেছে। অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। আলতামাস মারা গেছেন। সিংহাসন নিয়ে অনেক বিদ্রোহ হয়েছে। রিজিয়ার জীবনের প্রতিটি দিন যেন এক সঙ্কল্পে অটল হয়ে উঠেছে। ষড়যন্ত্র ভেঙেছে। বিদ্রোহীদের নির্মমহস্তে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। ভায়েদের চক্রান্তকে ছিন্ন করেছে। লাহোর, লক্ষণাবলী, দেবল প্রভৃতি সুদূর রাজ্যের রাজন্যবর্গকে বশীভূত করেছে।

এক একসময় সে ভাবে, সেদিন ইস্কান্দারকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে বুঝি ভালই হয়েছিল। সে বেঁচে থাকলে বোধ হয় রিজিয়া দুর্বল হয়ে পড়তো। সঙ্কল্পে টলে যেতো। হৃদয়ের পুষ্পকোরককে ইস্কান্দারের সবল পুরুষ হাতের ছোঁয়াচ অন্য এক পৃথিবীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটাতো। সে কাব্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, সুন্দরের উপাসক হয়ে উঠতো। ইস্কান্দারের সঙ্গে মহব্বতের গুঞ্জরণে রমণীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভরিয়ে তুলতো। প্রাসাদের কোন এক নিভৃতকক্ষে আতরদান সামনে রেখে মখমলের রেশমী শয্যায় শুয়ে হীরার কণ্ঠহার গলায় দিয়ে ইস্কান্দারের ওষ্ঠে ওষ্ঠ মিলিয়ে বেহেস্তের স্বপ্ন দেখতো।

সুলতানা হওয়ার স্বপ্ন তার চিরজীবনের মতো মন থেকে মুছতে হতো। পিতা আলতামাস যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মরবার সময় সে ভবিষ্যদ্বাণী নাকচ করে দিয়ে যেতেন। উচ্ছৃঙ্খল ভাইদের হাতেই সিংহাসন দিয়ে যেতেন, নতুবা অন্য ব্যবস্থা করতেন।

না-না এই ভাল হয়েছে। ইস্কান্দার হারিয়ে গেছে পৃথিবীর জনারণ্যে। প্রয়োজন হলে তো কত ইস্কান্দার এখনই তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। আজ তার

ইস্কান্দারের অভাব ! আজ তো অঙুলি হেলনেই কত আমীর ওমরাহ, সামন্ত, শাসকরা ছুটে আসতে পারে। কেন সেনাপতি আইবক বহতু ? তার চোখের দৃষ্টিই কি বড় পরিচয় নয় ?

সেদিন যুদ্ধজয়ের পুরস্কার দিতে গেলে আইবক হঠাৎ অসাবধানে বলেই ফেলেছিল।

রিজিয়া যখন তার বিজয়ে খুশী হয়ে নিজের মহলে ডেকে পাঠিয়েছিল। রিজিয়ার পাশে ছিল তার প্রধানা বাঁদী ফিরোজা। বীর আইবক সুলতানার সামনে এসে দাঁড়ালে সুলতানার মাথা নত হয়ে গিয়েছিল। সেই দৃষ্টি। সেই চাহনি। কেঁপে উঠেছিল ভয়ে রিজিয়া। তবু তাকে জিজ্ঞেস করতে হয়েছিল, আইবক কি পুরস্কার চাও ?

আইবক রিজিয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। তাকানোর ভঙ্গিটি ছিল অদ্ভুত। কামনার শেষ স্তরে দাঁড়িয়ে রিজিয়ার কথার উত্তর দিয়েছিলো জড়িতস্বরে : সুলতানা গোস্তাফি মাফ করো। আমি একটিমাত্র পুরস্কার চাই।

বিস্মিত না হবার ভাণ করে তবু রিজিয়াকে জিজ্ঞেস করতে হয়েছিল : কি সে পুরস্কার ? যদি দেবার মত হয় নিশ্চয় সেনাপতি আইবক তা পাবে।

এই কথায় আইবক মৃদু হেসে বলেছিল—অসম্ভব কিছু না। সুলতানা ইচ্ছে করলে আমার এই ক্ষুদ্র আরজি মঞ্জুর করতে পারেন।

রিজিয়া আর সহ্য করতে পারেনি। ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ফিরোজা মৃদু মৃদু হাসছিল। তার দিকে তাকিয়ে রিজিয়া আরও ক্ষেপে ওঠে। কিন্তু সংযম রক্ষা করাই তার ধর্ম। সংযম রক্ষা করে যুদ্ধজয়ী বীরকে অপমান না করে আস্তে আস্তে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

আইবকের পুরস্কার যে সুলতানার কৃপাপ্রার্থী, সেটুকু বুঝে রিজিয়া আইবককে কিছুতে ক্ষমা করতে পারেনি। ইতিহাস জানবে আইবক বহতু যুদ্ধে গিয়ে নিহত হয়েছিল কিন্তু আইবক বহতু যুদ্ধে নিহত হয়েছিল সত্যিকথা কিন্তু নিহত হয়েছিল রিজিয়ারই চক্রান্তে এ কথা কেউ জানবে না। নিজের পুরস্কৃত সৈন্যের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে আইবক বহতুকে নিহত করেছিল রিজিয়া। সেনাপতির পদে বসিয়েছিল মালিক কুতুবউদ্দীন হসনঘোরিকে। যে হসনঘোরি পরবর্তীকালে রণথম্বর দুর্গ ধ্বংস করে মুসলমান সেনাপতিকে উদ্ধার করেছিল।

আইবক বহতুকেও আজ ভুলে গেছে রিজিয়া। ভুলতে হয়েছে রিজিয়াকে। রিজিয়া এখন দিল্লীর সুলতানা। রাজকার্য ও রাজ্য পরিচালনা ছাড়া তার এখন আর কোন কর্তব্য নেই।

শুধু যুদ্ধ, সন্ধি, বশ্যতাস্বীকার। সমস্ত উত্তর ভারতকে তার রাজ্যের সীমাবদ্ধ করে রাজ্যবিস্তার করাই তার এখন প্রধান কাজ। পিতা আলতামাস গোয়ালিয়র বিজয় করেছিলেন। কিন্তু রিজিয়া সিংহাসনে বসবার পর আবার গোয়ালিয়রপতি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। রিজিয়া শোনা মাত্রই গোয়ালিয়র আক্রমণের জন্য সেনাদল প্রেরণ

করে। কিন্তু দিল্লীশ্বরীর সঙ্গে পেরে ওঠা গোয়ালিয়র পতির কর্ম নয়। রিজিয়ার রণকৌশল পিতা আলতামাসের শিক্ষায়। পিতার কৌশলে রিজিয়া প্রতিটি যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। গোয়ালিয়রপতি সন্ধি করে মিন্‌হাজ সিরাজ ও মজদুল উমরা জিয়াউদ্দীন্ কুনাইদিকে সুলতানার কাছে পাঠান। রিজিয়া তাদের ব্যবহারে খুশী হয়ে নাসিরিয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও গোয়ালিয়রের কাজিপদে নিযুক্ত করেন।

আজ এই গভীর নিশীথে রজনীর তিন প্রহর প্রায় অতিক্রান্ত। বাতায়নের একপাশে একাকী নিঝুম অবস্থায় দাঁড়িয়ে অতীতের কত কথাই মনের মধ্যে জেগে উঠছে। বিস্ময়ও জাগছে। সুলতান আলতামাস যে অসমসাহসে নিজের বাহুবলে অপূর্ব কৌশলে শত্রুকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছেন, রিজিয়া এক দুর্বলা নারী হয়ে কি করে পিতার রাজ্যপরিচালনার নীতি অনুসরণ করে মহা মহা শত্রুকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করতে সম্ভব হলো? রিজিয়া নিজেই এই মুহূর্তে ভেবে অবাক হয়ে গেল।

এতদিন তবে কি সে কোন মন্ত্রপূত সেরাজী সরাবের নেশায় মত্ত ছিল? না হলে এই মুহূর্তে সে চিন্তা করতে পাচ্ছে না—এতদিন ধরে কি করে সে এই রাজ্যের সমস্ত বিদ্রোহীদের আপন ক্ষমতায় নিহত করে ও বশ করে করায়ত্ত করলো? এক একজন বিদ্রোহী তাকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্যে একটি সংগঠন করে তার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। বিদ্রোহের কথা মনে এলে অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক নাশিরউদ্দীন তাবাসী মুইজ্জীকে মনে পড়ে। সে বেচারী রিজিয়াকে সাহায্য করতে গিয়েই বেঘোরে প্রাণটা দিলো। তবে মুইজ্জী যে একেবারে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল তা নয়। মনে মনে রিজিয়াকে সে ভালবাসতো। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে দিল্লীশ্বরীর পাশে দাঁড়াবার স্বপ্নও তার ছিল। সেকথা থাক্। অনেকেই রিজিয়ার রূপলাবণ্যতে মোহিত হয়ে তাকে কামনা করতো কিন্তু মুইজ্জীর মতো কেউ এগিয়ে এসে প্রাণটা দিতে সাহস করেনি। সেইজন্য রিজিয়া আজীবন মুইজ্জীর কাছে কৃতজ্ঞ।

সেদিন রিজিয়ার জীবনের দারুণ সঙ্কটময় অবস্থা। ভাই রুকনউদ্দীনকে অপূর্ব কৌশলে নিহত করে তার মা শাহতুর্কানকে বন্দী করে সবে সে সিংহাসন অধিকার করেছে। রুককে মসজিদ প্রাঙ্গণে চালাকির ছলে নিহত করে তার মনে একটা অনুশোচনা এসেছিল। আহা হাজার হোক সে তো তার বৈমাত্রেয় ভাই! না হয় সিংহাসনের জন্য দুজনে দুজনের শত্রু। কিন্তু একই পিতৃশোণিত তাদের দুজনের শরীরে প্রবাহিত। একই মায়ের গর্ভে তাদের দুজনের জন্ম নয় বটে তবু তো তাদের পিতা এক।

কিন্তু তবু রুককে রিজিয়া ক্ষমা করতে পারেনি। ক্ষমা করতে পারেনি এইজন্যে যে রুক তার মায়ের প্ররোচনায় একটি ভীষণ অপরাধ করেছিল। যে অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। বৈমাত্রেয় ভাই মুইজুকে হত্যা করেছিল। বেচারী পনেরো বছরের একটি সরল কিশোর। ঠাণ্ডা, মিষ্টি ফুলের মত প্রাণচঞ্চল। এক ঝলক আলোর মতো সে প্রাসাদের চারিদিক আলো করে ঘুরে বেড়াতো। এই বৈমাত্র

ভাইটিকে রিজিয়া বড় স্নেহ করতো। মুইজুর কমনীয় মুখখানি তার সবচেয়ে আদরের ছিল। এই মুইজুকে রুক হত্যা করলো। হত্যা করলো কিসের জন্য ?

মুইজু দুদিন বাদে বড় হয়ে উঠে রাজ্য অধিকার করতে পারে। সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে যত তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। সেইজন্যে রুক সরিয়ে দিলো। কিন্তু খবর শুনে রিজিয়া দারুণ মর্মাহত হলো। মুইজুকে যে রুক পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারে—রিজিয়া স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। অমন কমনীয় সুন্দর মুখখানি চিরতরে ম্লান হয়ে গেল ভাবতে গিয়ে রিজিয়া মনে মনে দারুণ শোকার্ত হয়ে উঠলো। রুকের নিষ্ঠুরতা সে কিছুতে ক্ষমা করতে পারলো না।

রুক নিজেও পরে তার ভুলটা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু মুসলমান সুলতানরা সিংহাসনের জন্য নিজের পিতাকেও হত্যা করতে দ্বিধা করে না জানে বলেই সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল যে রিজিয়া অন্যায় যাই বলুক আসলে সে কোন অন্যায় করেনি। কিন্তু রিজিয়া প্রতিবাদ করতে তার ওপর অত্যাচার শুরু করলো রুক ও তার মা শাহতুর্কান।

রিজিয়া কিন্তু নীরবে রুকের অত্যাচার সহ্য করলো না। সুযোগের অপেক্ষায় থাকলো রুককে জব্দ করার। কিন্তু রুক চেয়েছিল রিজিয়াকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। কারণ পিতা আলতামাস সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করে গেছেন রিজিয়াকে। আলতামাসের মৃত্যুর পর কিছু আমীর-ওমরাহ, রাজন্যবর্গরা নারীর বশ্যতা স্বীকার করতে চাইলো না, সেইজন্য রুকনউদ্দীনকে তারা সিংহাসনে বসালো। কিন্তু রুকনউদ্দীন মনে মনে রিজিয়াকে এড়িয়ে চলতো। রিজিয়া পুরুষের মতো অসি খেলায়, ধনুঃশর ক্ষেপণে, বর্শা নিক্ষেপে ওস্তাদ ছিল রুক তা জানতো। পিতা নিজের হাতে রিজিয়াকে এসব বিদ্যা শিখিয়ে গেছেন।

কিন্তু রুক কিছু ষড়যন্ত্র করার আগেই রিজিয়া একদিন হঠাৎ কৌশল অবলম্বন করলো। প্রাসাদের অলিন্দ থেকে করুণ মর্মভেদী কণ্ঠে আত্মবেদনা নিবেদন করতে লাগলো। প্রাসাদের পাশেই রাজপুঙ্গবদের নামাজ পড়ার মসজিদ। সেদিন শুক্রবার। রুক নামাজ পড়বার জন্যে আল্লাকে আরাধনা করবার জন্যে প্রবেশ করছে মসজিদে। এই সময় রিজিয়ার আত্মবেদনাও তার কর্ণগোচর হলো। সে রিজিয়ার ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু সর্বকালে সর্বদেশে নারীর আরজিই সর্বপ্রথমে বিবেচিত হয়। রিজিয়া রুকের সম্বন্ধে অকথ্যভাবে রাজপুঙ্গবদের শুনিয়ে শুনিয়ে তার লাঞ্ছনার ব্যাখ্যা কর্ণগোচর করতে লাগলো। একজন অবলা নারীর ওপর এমনি অত্যাচার, রাজপুঙ্গবরা দারুণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ক্ষিপ্ত হয়ে তারা রুকনউদ্দীনকে আক্রমণ করলো। সে সময়ে রিজিয়ার অভিনয়টি হয়েছিল সুন্দর। এমনভাবে মর্মবেদনা জানিয়ে সবার মনে আগুন জ্বালিয়ে দিল যে রুককে কেউ কিছু বলতে দেয় নি। রাজপুঙ্গবরা নামাজের কথা ভুলে গিয়ে অত্যাচারী রুকনউদ্দীনকে কেটে খণ্ড খণ্ড করে রিজিয়ার অত্যাচারের প্রতিশোধ নিল। সেদিন মসজিদ প্রাঙ্গণ দিল্লীর সম্রাট রুকনউদ্দীনের রক্তে স্নান শেষ করেছিল।

ভায়ের জন্য মনে তীব্র অনুশোচনা জাগে। একই শোণিতে প্রবাহিত ভাইকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়ে রিজিয়া বেশ কিছুকাল সহজভাবে চলাফেরা করতে ভুলেছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে মুইজুর কথা মনে এলে সে আত্মচেতনা ফিরে পেয়েছে। শাস্তি পেয়েছে।

তা ছাড়া রুককে হত্যা না করলে যে সিংহাসন লাভের আশা দুরাশা ছিল সে কথা ভেবেই রিজিয়া রুককে নিহত করতে বাধ্য হয়েছিল। নাশিরউদ্দীন তখন নাবালক। রাজন্যবর্গেরা আর উপায় না দেখে উপযুক্ত সুলতানা হিসাবে দিল্লীর সিংহাসনে রিজিয়াকেই বসাতে বাধ্য হলো। রিজিয়া মনে মনে শুধু হাসলো। আর অন্য ভাইরা তারা উচ্ছৃঙ্খল ছিল বলে তাদের সিংহাসন দেওয়ার কথা চিন্তাও হলো না।

কিন্তু রিজিয়া সিংহাসনে আরোহণ করবার পর একদল রিজিয়ার স্বপক্ষে থাকলো, আর বেশীর ভাগ রিজিয়ার বিপক্ষে দাঁড়ালো। তার মধ্যে উজীরপ্রধান নিজাম উলমুলক জুনাইদি একজন। তিনি মালিক জানি, মালিক কোটি, মালিক কবীর খাঁ ও মালিক ইজ্জুদ্দীন মহম্মদ সালারীর সহযোগে সুলতানা রিজিয়ার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়ে দিল্লীনগরের প্রাচীরদ্বার আক্রমণ করলেন।

রিজিয়ার রণকৌশল আগেই শেখা ছিল। একদল সুদক্ষ যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে সাহসে নিজেই প্রাচীরদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হল। ঘোরতর যুদ্ধ বাধলো। এই সময়ে অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক মাশির উদ্দীন্ তাবাসী মুইজ্জী স্বীয় বাহিনী নিয়ে দিল্লীশ্বরীর সাহায্যার্থে নগরাভিমুখে প্রবেশ করলো।

রিজিয়া যুদ্ধ করতে করতে লাহোর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। লাহোরের শাসনকর্তাও বিদ্রোহী হয়ে শাসনযন্ত্র বিকল করে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল। রিজিয়া তাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করে লাহোরে আবার সুশাসন ফিরিয়ে নিয়ে এলো। সেই সময় তার কর্ণগোচর হলো যে মুইজ্জী নিজের জীবন বিপন্ন করে তাকে সাহায্য করার জন্যে দিল্লীনগরাভিমুখে এগিয়ে গেছে। শোনা মাত্রই রিজিয়া তার দ্রুত অশ্বারোহী বাহিনী সঙ্গে নিয়ে দিল্লী-নগরাভিমুখে এগিয়ে চললো। মুইজ্জীর জন্য তার মনে কাতরতার সৃষ্টি হলো। রিজিয়াকে যারাই যখন সাহায্য করতে এসেছে তাদের জন্য দিল্লীশ্বরীর রমণী মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। নিজের জন্য কখনও সে কোনদিন চিন্তা করেনি কিন্তু সাহায্যকারীর জন্য তার প্রাণ পর্যন্ত অনেক সময় সমর্পণ করেছে।

সেইজন্যে মুইজ্জীর দুর্ভাগ্য উপস্থিত হওয়ার আগেই যাতে তার সঙ্গে মিলিত হতে পারে সেই ভেবে সে দ্রুত যমুনা নদীর পার দিয়ে এগিয়ে চললো। তার ও তার বাহিনীর দ্রুত অশ্বের পায়ের শব্দ সেদিন যমুনা নদীর জলেও ঢেউ সৃষ্টি করেছিল। যমুনা নদীর পারে ধূলোর আকাশ সৃষ্টি করে রিজিয়া তার বাহিনী নিয়ে দিল্লীর নগরের দিকে এগিয়ে চললো।

কিন্তু বিদ্রোহীরা রিজিয়ার রণকৌশল লাহোরেই প্রত্যক্ষ করেছিল। সামান্য নারী বলে যাকে তারা উপেক্ষা করেছিল, সে যে সামান্য নয় তার প্রমাণ প্রতি পদে

পদে তারা পাচ্ছিল। তাই যখন তারা শুনলো রিজিয়া তার বাহিনী নিয়ে অযোধ্যাপতির সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে ছুটে আসছে, তখন আর বিলম্ব না করে উজীরের পক্ষীয় বিরোধী সেনাপতিগণ মুইজ্জীকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করলো।

রিজিয়া যখন দিল্লীনগরের কাছাকাছি এসে পৌছলো, পৌছে মুইজ্জীর নিহত হবার সংবাদ শুনে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ক্ষিপ্ত হয়ে নগর পরিত্যাগপূর্বক বাইরে এসে যমুনার তীরে শিবির সন্নিবেশিত করলো। এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো—মুইজ্জীকে যারা নিহত করেছে তাদের সে কখনও ক্ষমা করবে না। মুইজ্জী-হত্যার প্রতিশোধ নেবে সবার আগেই।

যমুনাতীরে বিদ্রোহীদের সঙ্গে তার দারুণ যুদ্ধ শুরু হলো। সৈনিকের রক্তে যমুনা নদীর জল লোহিতবর্ণ ধারণ করলো। সৈনিকের মৃত্যুযন্ত্রণার কাতর চীৎকারে যমুনা তীর মুহূর্তে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো। চীৎকার, কোলাহল, অসি ঝনঝনানিতে রণক্ষেত্র যেন একটা দারুণ ধ্বংসের মুহূর্ত নিয়ে চীৎকার করতে লাগলো। এদিকে রিজিয়া মৃতপ্রায় সৈনিকের যত আর্তনাদ শোনে তত তার দেহে যুদ্ধের মাতন সৃষ্টি হয়। সে যে রমণী, রমণীর ধর্ম কোমলতা, রমণীর কর্ম সুস্থ, রিজিয়াকে দেখে যেন সেই মুহূর্তে মনেই হয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে বড় বড় যোদ্ধারা অবাক হয়ে রিজিয়ার রণকৌশল দেখে মনে মনে ভীত হয়ে উঠলো। যারা আলতামাসের রণকৌশল জানতো তারা মনে মনে আলতামাসকে সেলাম জানালো। বিদ্রোহীরা আস্তে আস্তে রিজিয়ার ক্ষমতায় চমকিত হয়ে রণে ভঙ্গ দেবার চেষ্টা করতে লাগলো।

অবশেষে বিদ্রোহী দলপতি মালিক মহম্মদ সালারী ও মালিক কবীর খাঁ আবার সুলতানার পক্ষে এসে যোগদান করলো। রিজিয়া মনে মনে তার জয় হয়ে গেল জেনে খুশী হয়ে উঠলো। সালারী ও কবীর খাঁ দলে এসে যোগদান করতে সে কিছু বললো না—কারণ সে রাজ্য চালাবে। সিংহাসনের পাশে উপযুক্ত ব্যক্তি না থাকলে তার পক্ষে রাজ্য চালনা করা সম্ভব নয়। তাই কবীর খাঁ ও সালারীর বীরত্বকে স্বীকার করে তাদের দলে যোগ করে নিলো। কিন্তু সে মুইজ্জীর হত্যাকারীদের ক্ষমা করতে পারলো না। সুলতানার নির্দেশে একদল অশ্বারোহী—সেনানায়ক মালিক কোটী ও তার ভাই ফখরউদ্দীনের পিছনে ছুটলো। রিজিয়ার নির্দেশ ছিল এদের নিহত করার। তাই একসঙ্গে মালিক জানি, কোটি ও ফখরউদ্দীনকে পেয়ে সৈনিকরা তাদের নিহত করলো। দলের গুরু উজীর নিজাম-উলমূলক জুনাইদিকে আর ধরতে পারা গেল না। সিরমূর প্রদেশে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালো।

রাজ্য থেকে শত্রু বিতাড়নের পর রিজিয়া নিশ্চিত হয়ে সিংহাসনে বসে উজীরপ্রবরের সহকারী খাজা মহজুবকে নিজাম-উলমূলক উপাধি দিয়ে মন্ত্রীপদ দান করলো। মালিক সৈকউদ্দীন আইবক্ বহতুকে কংলুখ খাঁ উপাধি দান করে তাকে সেনাপতি পদে বসালো। এই আইবক বহতুর কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। বহতুর অন্য ইচ্ছার শাস্তি রিজিয়া বেশ ভালভাবেই তাকে দিয়েছে। কবীর খাঁকে লাহোর প্রদেশের শাসনকর্তা করে রিজিয়া রাজ্যে সুশৃঙ্খলা আনয়ন করলো।

এ সব অতীত কাহিনী আজ যেন তার চোখের সামনে সব ছবির মত ফুটে উঠছে। আজ যেন মনে হচ্ছে সে সিংহাসন পাওয়ার পরে যে সব ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে, যাদের সে নিজের শক্তির কৌশলে পরাজিত করেছে সে সব কৌশল অবলম্বন করা তার দ্বারা সম্ভব হয়নি। অন্য কোন রিজিয়া নামে শক্তিময়ী দিল্লীর সিংহাসন শত্রুমুক্ত করেছে। এই মুহূর্তে সে ভাবতে পারে সে এক অবলা রমণী। রমণীহৃদয় নিয়ে সে দয়িতের জন্য নিশিদিন প্রহর রচনা করে চলেছে।

সেদিনের প্রভাতের ঘটনাটিই সর্বদা তার চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সুসজ্জিত দরবারগৃহ। দিল্লীর অসামান্য দরবার। সুসজ্জিত ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ। দরবার গৃহের সম্মুখ দিয়ে একটি মর্মরময় সোপান বরাবর বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সোপানশ্রেণী শেষ হলে একটি রাজোচিত সজ্জাপূর্ণ মর্মরময় দালান। দালানটির খিলানের নীচে—রঞ্জিতস্ফটিকপাত্রে সদ্যচয়িত সুবাসপূর্ণ, সরস পুষ্পসমূহ সুরক্ষিত। গন্ধরাজ, বেলা, মল্লিকা, চম্পা, চামেলি প্রভৃতি সুগন্ধভরা কুসুমাবাসে দালানের বারান্দাটি মনোমদ সুগন্ধে আকুলিত। বারান্দার মধ্যস্থলেই একটি রৌপ্যময় বেষ্টনীর মধ্যে, শ্বেত মর্মরময় আধারের ওপর রজতনির্মিত গোলাপের ক্ষুদ্রপ্রস্রবণ। তা থেকে অনবরত গোলাপজল উৎসারিত হয়ে সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুমাবাসের সঙ্গে মিশে সে স্থানকে বেহস্তের সুগন্ধে পূর্ণ করেছে।

প্রতিটি দ্বারে রক্ত রাগবর্ণের ঝালর পরদা কোণাকুণি ভাবে ঝুলিয়ে দ্বারের শোভা বাড়ানো হয়েছে। দ্বারের দু'দিকে বিশালাকায় সশস্ত্র প্রহরী। দরবার গৃহের মধ্যে ঐশ্বর্যপূর্ণ উচ্চ সিংহাসনে বসে রিজিয়া। তার পরণে আজ পুরুষের বেশ নয়। রূপসী রমণী সাজেই সে দরবার গৃহের সিংহাসনে বসেছে। স্বর্ণখচিত মণিদ্যুতি পূর্ণ সিংহাসন। স্বর্ণখচিত মণিদ্যুতি পূর্ণ সিংহাসনে বসে তাকে আরও অপরূপ দেখাচ্ছে। রত্নখচিত ফিরোজা-রঙের ওড়না ভেদ করে রূপসী রিজিয়ার সৌন্দর্যপূর্ণ মুখমণ্ডল যেন স্বর্গের অপ্সরার মতো হয়ে উঠেছে। পাশে দণ্ডায়মান প্রিয় সহচরী ফিরোজা। তাকে যুদ্ধে যাওয়া ছাড়া প্রায় সব সময়ই রিজিয়া কাছে রাখে। ফিরোজা ছাড়া অন্য আরও দুজন খোজা প্রহরী তার সঙ্গে সর্বদা ছায়ার মত ঘোরে।

সিংহাসনোপবিষ্টা সুন্দরী সুলতানা রিজিয়া একের পর এক বিচার মন্ত্রীর সহযোগে সম্পন্ন করে চলেছে। এক একটি বিচারের অদ্ভুত চরম শাস্তি এক এক সময়ে আমীর-ওমরাহদের মধ্যে গুঞ্জনের সৃষ্টি করেছে। রিজিয়ার মুখে কিন্তু সেই মৃদু হাসি।

সে যে এতো কঠোর ভাবে বিচারকের ভূমিকা নিয়ে অভিনয় করে চলেছে তা তার মুখের কোথাও এতটুকু রেখাঙ্কিত হয়ে উঠছে না। সে মুখ সহজ, সুন্দর হাস্যময়। অবগুণ্ঠনের আড়ালে তার এই রাজ্য পরিচালনা সমস্ত আমীর-ওমরাহ, রাজন্যবর্গের শ্রদ্ধার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এই সময় হঠাৎ দরবার গৃহের মধ্যে প্রহরীর দ্বারা বেষ্টিত হয়ে এক সুবিশাল দীর্ঘ সৈনিক পুরুষ এসে প্রবেশ করল। সমস্ত দরবার গৃহ তার আগমনে স্তব্ধ হয়ে গেল। সেই দীর্ঘ সৈনিক পুরুষ মুসাফেরকে রিজিয়ার সামনে এনে দাঁড় করালে মন্ত্রী নিজাম-উলমুলক ক্ষুব্ধ ও বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি? কি চাও? তোমাকে ধরে আনা হয়েছে কেন?

মুসাফেরের উত্তর দেবার পূর্বেই প্রহরীদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বলল—এই বিদেশী গোপনে প্রাসাদে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল বলেই তাকে আমরা ধরে নিয়ে এসেছি।

কিন্তু মুসাফের তাচ্ছিল্য ভাবে হেসে বলল, আমাকে ধরে নিয়ে আসবার সাহস এই দুর্বল প্রহরীদের কর্ম নয়। আমি নিজেই ধরা দিয়েছি। ধরা দিয়েছি এই জন্যে যে—সহজে সুলতানার কাছে পৌছতে পারবো বলে।

মন্ত্রী আবার জিজ্ঞাসা করল—কি তোমার প্রয়োজন এখানে বলতে পারো। যদি অশোভনজনক কিছু না হয় তাহলে তোমার এই অনধিকার প্রবেশের শাস্তি লঘু হবে।

মুসাফের আবার তাচ্ছিল্যভাবে হেসে বলল—হাবসী প্রাণের মায়া করে না। যদি সুলতানা আমার কথা শোনেন ও তার উত্তর দেন তাহলে এ বান্দা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

দরবার গৃহের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিদেশী মুসাফেরের এই বেয়াদপী সহ্য করতে পারলেন না। তাঁরা গুঞ্জন করে কেউ কেউ প্রতিবাদ করে বিদেশীর এই বেয়াদপীর শাস্তি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু রিজিয়া রাজন্যবর্গের প্রতিবাদে কোন কর্ণপাত করলো না। তার স্বভাবটি সব সময়ে সংযত। কিন্তু সে বিস্মিত হল, বিদেশী মুসাফেরের সাহস দেখে। লোকটির দিকে বারকয়েক তাকিয়ে সে মনে মনে বিদেশীর স্বাস্থ্যের প্রশংসা করলো। কি সুন্দর বিরাট পুরুষ। কি সুন্দর দীর্ঘ দেহ, চওড়া বক্ষ। তার অগণিত সৈনিক ও রাজন্যবর্গের মধ্যে একটিও নেই। তার ওপর এই দেহের সঙ্গে মিলেছে দুর্জ্জয় সাহস। যেন রাজযোটক।

সাহস না থাকলে এমনি উন্মুক্ত রাজ দরবারে অগণিত বীরপুরুষদের মাঝখানে এমনি সাহসে সে সুলতানার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়? মনে মনে রিজিয়া এই বিদেশী মুসাফেরকে সাধুবাদ জানালো। তারপর মন্ত্রীকে কাছে ডেকে বলল—ওকে বলো, আমি তার কথা শুনছি, সে যা বলতে চায় আমাকে বলুক। কিন্তু মন্ত্রী সে কথা বলতে বিদেশী মুসাফের ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, সুলতানা যদি নিজে কথা বলেন ও শোনেন তাহলে আমার আরজি পেশ করতে পারি।

রিজিয়ার মুখমণ্ডল আরক্তিম হয়ে উঠলো। নিজেকে সামলাতেও তার কয়েক মিনিট সময় লাগলো। তারপর একটু প্রকৃতস্থ হলে সহজ ও স্পষ্টাক্ষরে জিজ্ঞেস করলো—মুসাফের কি চাও তুমি ?

মুসাফের মৃদু হেসে কুর্নিশ করে বলল—সেলাম আলেকুম্ সুলতানা।

রিজিয়া মৃদু হেসে মাথাটা একটু হেলিয়ে সায় দিয়ে বলল—তোমার নাম কি নওজোয়ান, তুমি কি চাও ? বিনা হুকুমে এখানে প্রবেশ করেছ কেন ?

মুসাফের এতটুকু ভীত না হয়ে স্পষ্টস্বরে বলল—আমার নাম জালাউদ্দীন ইয়াকুত। আমি চাই সুলতানার পাণিগ্রহণ করতে। যদি আমার আরজি মঞ্জুর হয় তাহলে আমি সুলতানার কাছে খোদার নামে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

কিন্তু তার কথা সম্পূর্ণ হোলো না। সভাসদ গর্জে উঠলো। আমীর, ওমরাহ, মন্ত্রী, সেনাপতি বিশিষ্ট রাজন্যবর্গরা উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধস্বরে বলল—এই মুহূর্তে এই বেতমিজের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হোক। লোকটা নিশ্চয় উন্মাদ। না'হলে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে এই দরবার গৃহে এসে প্রকাশ্যে এতগুলি বিশিষ্ট রাজন্যবর্গের সামনে দিল্লীর সুলতানাকে এমনি অসম্মান করতে সাহস পায় ?

তারপর সকলেই আস্ফালন করে একসময় চুপ হয়ে গেলো। প্রত্যেকেই বিস্ময়ে তাকালো সুলতানা রিজিয়ার দিকে। কিন্তু সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেলো রিজিয়ার মুখচ্ছবি দেখে। সে মুখে তখনও মৃদু হাসি। এতটুকু রাগের চিহ্ন কোথাও ফুটে ওঠেনি। শুধু চোখের কালো মণি দুটোয় একটু লজ্জার ভাব। মনে হলো যেন রিজিয়ার গণ্ডেও রক্তিমার চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

রিজিয়া তখনও আশ্চর্য মুগ্ধ হয়ে ভাবছিল লোকটির সাহসের কথা। যে কথা স্পষ্ট করে কখনও কোন রাজন্যবর্গ উচ্চারণ করতে পারেনি সেকথা এই অপরিচিত মুসাফের কি করে উচ্চারণ করলো ? শুধু বীর নয় লোকটি, অদ্ভুত ক্ষমতা সমস্ত দিল্লী সাম্রাজ্যের একটি নিদর্শনস্বরূপ। রিজিয়া নিজে বীরাঙ্গনা। বীর পূজারী। বীরকে সহজে শাস্তি দিতে সে সব সময় একটু ভাবে।

তাই যখন এই ঔদ্ধত্যের জন্য সমস্ত রাজন্যবর্গ তার বিচারের অপেক্ষা করছে তখন রিজিয়া কোন চিন্তা না করে মন্ত্রীকে আদেশ দিলো—আজ এই মুসাফেরকে কয়েদঘরে বন্দী করে রাখা হোক। আগামীকল্য এর বিচার হবে।

রাজন্যবর্গরা ভাবলো হয়ত উপযুক্ত শাস্তির বিষয় চিন্তা করার জন্য সুলতানা রিজিয়া একদিনের সময় নিলো। কিন্তু তারা যদি জানতো, রিজিয়া এই মুসাফের বিদেশীর প্রেমে পড়েছে ! দিওয়ানা হয়ে গেছে !

হ্যাঁ, রিজিয়া এই বিদেশী মুসাফেরের প্রেমেই পড়েছে। তা না'হলে এই গভীর রাত্রি পর্যন্ত সে একা এই প্রাসাদে নিজের আরাম ঘরে না শুয়ে অলিন্দের কাছে দাঁড়িয়ে ভাববে কেন ? তার চোখে ঘুম নেই কেন ? তার বুকের মধ্যে কিসের আলোড়ন শুরু হয়েছে ? কি যেন হারাবার ভয়ে সে ভীত হয়ে উঠেছে এই নিশীথ রাতে।

কাল তার পরীক্ষা শুরু হবে? আগামীকল্য সুলতানা রিজিয়ার আসল পরিচয় সমস্ত রাজ্যের লোক জানতে পারবে? সুলতান আলতামাসের উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের মতো তাঁর কন্যাও রাজকর্তব্য বিস্মৃত হয়ে তার ভাইদের পথানুসরণ করেছে। যারা এখনও গোপনে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে তারা এই সুযোগে রিজিয়ার দুর্বলতা দেখে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। এতো কষ্টের রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয়েছিল, সে শান্তি আগামীকল্য থেকে আর থাকবে না। রাজ্যে ঘোষণা ছিল, বিয়ে-শাদী কেউ করতে গেলে রাজাজ্ঞা নিতে হবে, নতুবা কারাবাস। আগামীকল্য থেকে সে রাজাজ্ঞার ভিত দুর্বল হয়ে যাবে। শিথিল হয়ে যাবে সমস্ত রাজ্যের নিয়মকানুন। যে যা খুশী ইচ্ছে করবে তাই সে করবে।

আগামী প্রভাতের পর থেকে সমস্ত রাজ্যের চারিদিকে শান্তির পরিবর্তে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হবে। আমীর-ওমরাহ, রাজন্যবর্গ যারা তার বশ্যতা স্বীকার করে রাজ্যশাসনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তারা আবার বিদ্রোহী হবার চেষ্টা করবে। নারীসম্ভ্রমকে বাঁচানোর জন্য রাজাজ্ঞা দিয়ে রাজ্যে কিছুটা উচ্ছৃঙ্খলতা কমাবার চেষ্টা করেছিল আবার তা জেগে উঠবে। সেরাজী সরাবের নেশায় মাতাল হয়ে আবার রমণী ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হবে।

এসব কথা চিন্তা করে দিল্লীশ্বরীর মানসিক অবস্থা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো। কিন্তু ঐ জালাউদ্দীন ইয়াকুতই যে তার সমস্ত কর্তব্য চূর্ণ করতে আজ রাজদরবারে এসে তাকে সব ভুলিয়ে দিলো। ভুলিয়ে দিলো তার সমস্ত রাজকার্য। বিচার ক্ষমতা। বীরাঙ্গনা শক্তি। তার যে এখনও হৃদয় আছে। এখনও মন বলে একটি পদার্থ সযতনে আড়াল করে রাখা আছে। রমণী-হৃদয়ে কুসুম ফুটে আছে। জালাউদ্দীনকে দেখবার আগে একবারও তার মনে হয়নি সে কখনও কোন পুরুষকে আকাঙ্ক্ষা করতে পারে! বীরকে শুধু পূজা নয়, আপন করার জন্যে সমস্ত রাত্রি জেগে ভাবতে পারে!

তবে কি সেই মৃত ইস্কান্দারের আত্মা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যেই জালাউদ্দীন ইয়াকুত নামের ছদ্মবেশে তাকে এসে মুগ্ধ করলো? সেই ইস্কান্দার! রিজিয়ার যৌবনের প্রথম পুরুষ। প্রথম পুরুষের ভালবাসার পরশ। রিজিয়াকে একদিন ইস্কান্দার প্রাসাদের নিরালা সোপানে আপন করে নেওয়ার জন্যে জড়িয়ে ধরেছিল। জড়িয়ে ধরে রিজিয়ার গোলাপী কম্পমান কোমল ওষ্ঠে এঁকে দিয়েছিল মহব্বতের চিহ্ন। রিজিয়া আবেশ মুহূর্তে হারিয়ে ফেলেছিল নিজের চেতনা। মুহূর্তে তারও হৃদয়ের শোণিতে আগুন জলে উঠেছিল। ঝিম্‌ লেগে গিয়েছিল সমস্ত শরীরের উর্ধাঙ্গে। বুকের কুসুমাস্তীর্ণ সমুদ্রের উত্তালতায় দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। চোখে নেমে এসেছিল লজ্জার রং।

কিন্তু হঠাৎ চমক ভেঙ্গে গেল রিজিয়ার। ইস্কান্দারের মুখে সেরাজী সরাবের গন্ধ। নেশা কেটে গিয়ে তার ক্রুদ্ধভাব জেগে উঠলো। সে নিজের হাতে ইস্কান্দারের গালে ঠাস্‌ করে চড় কষিয়ে দিলো। বললো জাহান্নমে যাও। সেরাজী পান করে কখনও আমার সঙ্গে কথা বলতে এসো না বেতমিজ।

সেদিন ইস্কান্দার গালে হাত বুলোতে বুলোতে চলে গিয়েছিল। আর রিজিয়া ইস্কান্দারের ওষ্ঠের ছোঁয়াচ নিজের ওষ্ঠে অনুভব করেছিল। সেরাজী সরাবের দুর্গন্ধ সেখানে নেই। কি যেন এক সুগন্ধ মাদকতা। সম্ভবত বসোরাই গোলাপের সুগন্ধের চেয়েও মনোরম। সেই গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে বিভোর হয়েছিল অনেকক্ষণ। অনেক স্বপ্ন, অনেক কল্পনা। প্রথম প্রেমের সেই অনাস্বাদিত আনন্দ। কি মনোরম লাগছিল সেই সময়।

আজও যেন ইয়াকুতকে দেখবার পর সেইরকম কোন এক মনোরম পরিবেশের স্বপ্ন মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল। ইয়াকুত যদি সেই মুহূর্তে সিংহাসনের ওপর উঠে তাকে আবেগে জড়িয়ে ধরে ওষ্ঠে ওষ্ঠ মিলিয়ে দিত, তাহলে কি সে বাধা দিতে পারতো? মন্ত্রী, সেনাপতি, আমীর-ওমরাহ, রাজন্যবর্গরা আশা করে আছে, আগামীকল্য এই মুসাফেরের প্রাণদণ্ডের আদেশ হবে। সুলতানা রিজিয়ার সম্ভ্রম নষ্ট করার অপরাধে—প্রাণদণ্ড!

কিন্তু যখন আগামীকল্য দরবারে বসে রিজিয়া সে ধরণের কোন শাস্তির হুকুম দেবে না, তখন সমস্ত রাজ দরবারের বিশিষ্ট অতিথিরা কি মনে করবে? লোকটিকে কি করা যায়? মহাসংস্থার মধ্যে দিয়ে সুলতানার নির্ঘুম রজনী অতিবাহিত হতে লাগলো।

খুসক্ ফিরোজী প্রাসাদের চারিদিকে রাতের নিস্তব্ধতা। প্রাসাদের তোরণদ্বারের দ্বাররক্ষীর পায়ের শব্দ মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করছে। এত বড় প্রাসাদের আর কোথাও কেউ জেগে নেই। রিজিয়ার পাশের ঘরে বাঁদী ফিরোজা ঘুমিয়ে আছে। তার পাশের ঘরে অন্যান্য বাঁদীরা। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ফিরোজা তার কাছে ছিল। সুলতানার চোখে ঘুম আসছে না কেন তার জন্য তার চিন্তার শেষ ছিল না। সুগন্ধি গোলাপ জল স্বর্ণপাত্রে এনে অনেকবার রিজিয়াকে পান করিয়ে ঘুমের জন্য অনেক মেহনত করেছে। শরীরের মধ্যে কি যাতনা হচ্ছে—ফিরোজা অনেকবার জিজ্ঞেস করেছে—কিসি লিয়ে এত্‌না তকলিফ সুলতানা! মৃদু হেসে ফিরোজাকে উদ্বেগ প্রকাশ করতে নিষেধ করেছে রিজিয়া। রিজিয়া জানে, ফিরোজা বুঝতে পাচ্ছে সুলতানার তকলিফ কি? সেও রমণী। তারও হৃদয় আছে। দরবার ঘরে সেও সকালে উপস্থিত ছিল। সেও দেখেছে বিদেশী মুসাফেরকে। মুসাফেরের নির্লজ্জ কথাগুলি সেও শুনেছে। তখনকার মুখের অবস্থা-রিজিয়ার কিরকম হয়েছিল ফিরোজা তাও দেখেছে। কিন্তু কোন উত্তর দেয়নি। সুলতানার কাজের কোন কৈফিয়ৎ বা

জিজ্ঞাসা বাঁদীর শোভা পায় না। যদিও সুলতানা ফিরোজার সঙ্গে সেরকম ব্যবহার করে না। সুলতানা সব কথাই ফিরোজাকে বলতো। কিন্তু সুলতানা বলতো। ফিরোজা কখনও জিজ্ঞাসা করে নি। হয়ত তার ভয় করতো। হয়ত ভাবে, যদি অপরাধ হয়ে যায়? যদি বেওকুফের মত কোন অতিরিক্ত দাবী পেশ হয়ে যায়? সুলতানার মেজাজের হদিশ সব সময় পাওয়া বড় মুস্কিল।

মনে মনে হাসে রিজিয়া। সবাই তাকে ভয় করে। শুধু মানুষ নয় বনের পশু, পক্ষী পর্যন্ত। সে দিল্লীর প্রথম নারী সুলতানা। নারীর কোমল হাতের পরিচালনায় রাজ্যের বড বড় যোদ্ধা আজ ভীত। রিজিয়া ইতিহাস তৈরী করছে। পৃথিবীতে প্রথম নারী সুলতানা হিসাবে তার নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে।

কিন্তু আজ একি তার হলো? কিছুতে যে মানসিক চাঞ্চল্য স্তিমিত হচ্ছে না? আর কতক্ষণ যে এমনি বাতায়নের অলিন্দে দাঁড়িয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে চাঁদের আলোর রূপ দর্শন করবে? একটু বিশ্রাম কি খোদা তাকে দেবে না? সারাদিন ধরে রমণী হয়ে যে পরিশ্রম তাকে করতে হয় তারপর যদি এই রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি দেহে নেমে আসে তাহলে পরদিন প্রভাত থেকে আবার সে কেমন করে রাজকার্য পরিচালনা করবে?

নিজের শয়ন ঘরে ফিরে এল রিজিয়া। উজ্জ্বল বর্ত্তিকার আলোয় সুলতানার শয়ন-ঘরটি ঝলমল করে উঠলো। স্বর্ণ পালঙ্কের ওপর মখমলের শুভ্র শয্যা। ঘরের মধ্যে সুগন্ধির বাস। ঘরের দেয়ালে দেয়ালে বহু মূল্যের সুদৃশ্য দর্পণ। দর্পণে রিজিয়ার অপরূপ গোলাপী দেহের ছায়া পড়লো। দর্পণের দিকে তাকিয়ে রিজিয়া নিজের সুন্দর দন্তপংক্তি দিয়ে গোলাপী অধর চেপে ধরলো।

চীৎকার করে তার বলতে ইচ্ছে করল—কেন কেন কি জন্যে এই রূপ এই দেহে দিলে খোদা! আমি যে সুলতানা। আমি যে দেওয়ানা। আমার হৃদয়কে গোপন করে আমাকে কর্তব্য করতে হবে। দেওয়ানার মতো সব নিঃস্ব হয়ে আমাকে আমার রাজ্যকে সুশৃঙ্খলার মধ্যে রাখতে হবে। আমার ভালবাসার অধিকার নেই। মহব্বতের মিঠে আতরের সুগন্ধি মেখে চোখে সুরমা দিয়ে প্রিয়তমের কণ্ঠালগ্ন হবার জন্যে আমার জন্ম নয়।

রিজিয়া ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লো শয্যার ওপর। সুন্দর দুটি আয়ত চোখের কোলে রাত্রি জাগরণের কালিমা। মণি-খচিত সাচ্চা কাজ করা নীলাভ ওড়নাটা অবহেলাভরে বুকের কুসমাস্তীর্ণ থেকে মেঝেতে পড়ে লুটচ্ছে। চোখের কোণ দুটোয় দু'টুকরো মুক্তার বিন্দু হীরের মত জলজল্ করে উঠলো। বড় তৃষ্ণার উদয় হতে রিজিয়া তাকালো ঘরের চারিদিকে। স্বর্ণপাত্রে জল ঢাকা আছে একপাশে দেখতে পেল। কিন্তু অন্য জায়গায় স্বর্ণভৃঙ্গারে সেরাজী সরাব। বিস্মিত হল না রিজিয়া। এই নিয়ম তার প্রাসাদের। প্রয়োজন ছাড়াও অনেক জিনিষ ঘরে সাজিয়ে রাখা হয়। সোনার কারুকার্য করা রেকাবীতে থোলো থোলো রক্তের মত রাঙা টসটসে আঙুর। তাজা রক্তের মতো আরও লালবর্ণের বড় বড় আপেল। কমলা, বেদানা, কলা, কাশ্মীরী মেওয়া।

সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সেরাজী সরাবের পাত্রটি তুলে নিল রিজিয়া। তারপর কি ভেবে যথাস্থানে নামিয়ে রাখলো।

কোনদিন সে সরাব পান করবে বলে চিন্তাই করেনি। আর আজ এমন অবস্থা হয়েছে তার, যার জন্যে তাকে সরাবের নেশায় বুঁদ হয়ে আগামী সমস্যার হাত থেকে সাময়িক অব্যাহতি নিতে হবে? কিন্তু সরাবের নেশায় বুঁদ হয়ে মুসলমান সমাজের উচ্ছৃঙ্খল সুলতানদের মতো বিলাসিতার পঙ্কে ডুবে যাবে? কিন্তু উপায় কি? বিদেশী মুসাফেরকে ভালবেসে নিজেকে মনে মনে সমর্পণ করে দিল্লীর সুলতানার মৃত্যু তো সেই সময়েই হয়েছে। আর সাবধানতা অবলম্বন করে নিজেকে বাঁচানোর প্রয়াস কোথায়?

সরাব, নাচগান, খুশীর পেয়ালায় হৃদয়ের মধুময় সুগন্ধ কুসুমবাস পুরে নেশাসক্ত হবার সময় এটা। এই ভেবে হঠাৎ মনস্থির করে নিয়ে স্বর্ণপাত্রে দুবার সেরাজী সরাব ঢেলে রিজিয়া পান করে নিলো। তারপর আনন্দে চঞ্চল হয়ে ঘণ্টাধ্বনি করে ফিরোজাকে ডাকলো। ফিরোজা মুহূর্তে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিস্মিত ভঙ্গিতে রিজিয়ার সামনে এসে দাঁড়াল।

রিজিয়া আরো একবার সেরাজী সরাবের পাত্র মুখে তুলে ফিরোজার দিকে তাকিয়ে বলল—আমার সঙ্গে একবার কারাগারে চলো।

ফিরোজা আরো একবার বিস্ময়ে তার দুটি আয়ত চোখে সুলতানার দিকে তাকিয়ে থাকলো। এতরাত্রে কারাগারে! সুলতানা সরাব পান করছে! সেকি স্বপ্ন দেখছে না, জেগে আছে?

কিন্তু ফিরোজা কোনদিনই সুলতানার কাজের কোন কৈফিয়ৎ নেয় না, আজও নিল না। শুধু নিঃশব্দে রিজিয়ার কথায় সায় দিয়ে তার হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলো।

হঠাৎ রিজিয়া ফিরোজার দিকে তাকিয়ে খুশীর আনন্দে তাকে নিজের সুকোমল হাতের বেষ্টনে জড়িয়ে ধরলো—জড়িয়ে ধরে ফিরোজার কানে কানে বলল—আমি দিওয়ানা হয়ে গেছি ফিরো। আমি হারিয়ে গেছি। বলতে বলতে তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেলো।

ফিরোজা কোন কথা বলছে না দেখে সে ফিরোজাকে ঝাঁকি দিয়ে বলল—আজ কিছু বল্ তুই। আজ কিছু না বললে যে আমার দিল্ ঠিক থাকছে না। কেমন যেন দিল্‌টা ধড়ফড় করছে।

ফিরোজা মৃদু হেসে শুধু বলল—তুমি মরেছ সুলতানা।

সেই গভীর নিশীথে দুটি রমণী দুটি কালো বোরখায় নিজেদের আচ্ছাদিত করে হাতে একটি প্রজ্জলিত দীপ নিয়ে কারাগারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তাদের দেখে কারাগারের প্রহরী চমকে উঠলো। ঘুমের জড়তা চোখে নিয়ে সে রাতের শেষপ্রহরকে অতিক্রম করছিল। আচমকা এদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সজাগ হয়ে উঠলো। বলল—হুঁশিয়ার।

মৃদু হেসে রিজিয়া বোরখা থেকে মুখটি বাইরে বের করে প্রজ্জলিত দীপের সামনে ধরে প্রহরীকে মৃদুস্বরে বলল—দ্বার খুলে দাও বেন্‌কাশিম।

বেন্‌কাশিম সুলতানাকে সামনে দেখে আর কালবিলম্ব না করে কারাগারের দ্বার উন্মোচন করে দিল।

দূর থেকে দেখতে পেল রিজিয়া সেই অসমসাহসী মুসাফের বিদেশীকে। বসে আছে কারাগারের এক কোণে নিঃঝুম হয়ে। যেন একটি পাহাড় হাত-পা গুটিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে কারাগারের এক কোণে। যখন উঠে দাঁড়াবে তখন এই ক্ষুদ্র কারাগৃহ তার সে বিশাল দেহ ধরে রাখতে পারবে না, ভেঙে চুরমার করে বেরিয়ে যাবে এই ক্ষুদ্র কারাগার ভেদ করে। রিজিয়া ফিরোজাকে বাইরে অপেক্ষায় রেখে নিজে একা ঘরে ঢুকেছিল। কয়েক পা এগিয়ে এল জালাউদ্দীন ইয়াকুতের দিকে। তারপর তার উপস্থিতি জানাবার জন্যে কথা কয়ে উঠলো—বন্দী তুমি কেমন আছো?

ছোট্ট একটি ঘরের মধ্যে স্বল্প আলোর একটি বর্তিকা দেয়ালের এক কোণে রাখা আছে। তা থেকেই যে একটু আলো ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তা খুব পর্যাপ্ত নয়। দিল্লীর কারাগারের বর্ণনা দেবার মতো কিছুই নেই। পরিচ্ছন্ন শুধু ঘরটি। মেঝের ওপর একটি তৈলসিক্ত মলিন বালিশ ও কম্বলের মতো একটুকরো মলিন শয্যা পাতা আছে। ঘরের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার ভেদ করে একটু আলোর শিখা যেন ও কিছু নয়। যেন অন্ধকারকে উপহাস করবার জন্যে আলোটি এনে রাখা হয়েছে। তবে আলো কয়েদীর ঘরে দেওয়া হয় না সম্ভবত বিদেশীকে একটু উঁচুদরের আসামী ভেবে ঐটুকু দয়া করা হয়েছে। মনে মনে হাসলো রিজিয়া। যে রিজিয়ার পাণিপ্রার্থনা করার সাহস করে সে যে সামান্য আসামী নয় এই অনুমানে তাকে একটু খাতির করা হয়েছে।

রিজিয়া আরও দেখল ঘরের আর একটি কোণে বিদেশী মুসাফেরের জন্য খাবার রাখা আছে; সামান্য অল্প একটু খাদ্য। যা কয়েদীর জন্য বরাদ্দ। কিন্তু সেই খাদ্যের দিকে তাকিয়ে রিজিয়ার গা ঘিন ঘিন করে উঠলো। এমন খাদ্যও মানুষের জন্য দেওয়া হয়? কয়েদী যে মানুষ, তারা অপরাধী বলে জন্তু নয় এটুকু বোধ কারারক্ষীর থাকা উচিত। মনে মনে রিজিয়া ঠিক করলো—কালই এই খাদ্যের জন্য মন্ত্রীকে ঢালাও আদেশ দিতে হবে। বিদেশী মুসাফের যে এ খাদ্য খায়নি তার জন্যে রিজিয়া খুশী হলো।

এত কথা রিজিয়ার মুহূর্তে ভাবা হয়ে গেল। কিন্তু বিদেশী মুসাফেরের কাছ থেকে কোন উত্তর এল না। সে কারাকক্ষের এককোণে যেমনি নিঝুম হয়ে বসেছিল তেমনি বসে রইলো। শুধু রিজিয়ার কথায় একটু নড়েচড়ে বসলো কিন্তু তার দিকে ফিরে তাকালো না।

রিজিয়া মনে মনে একটু অপমানিত বোধ করলো। এমন অপমান অন্য সময়ে অন্য কেউ করলে তার শাস্তি রিজিয়া বেশ ভালভাবেই দিত। কিন্তু ইয়াকুতের এই অবহেলায় সে শুধু মৃদু হাসলো, হেসে কালো বোরখাটা মাথা থেকে খুলে হাতে নিয়ে

বলল—বিদেশী আমি সুলতানা। তোমার সঙ্গে আমার কিছু বাতচিজ করার আছে। তার আগে জিজ্ঞেস করি তুমি খানা খাওনি কেন ?

এ কথায় মুসাফের ফিরে ঘৃণিত দৃষ্টিতে খানার পাত্রের দিকে তাকালো তারপর কোন কথা না বলে মুখটা অন্যপাশে ফিরিয়ে নিলো।

রিজিয়া মুসাফেরের মনের অবস্থা বুঝে কাতর হয়ে উঠলো। কাতর ভাব গোপন না করে মুসাফেরের আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো—খানা খাবে ? আমি পাঠিয়ে দেবো কিছু।

হঠাৎ মুসাফের তার দুটি আয়তচোখ তুলে ক্ষুব্ধস্বরে বললো—বহুৎ মেহেরবাণী সুলতানা। আমার কিছু প্রয়োজন নেই।

রিজিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো—তোমাকে কাল মুক্তি দেবো ভাবছি— মুসাফের তুমি কি মুক্তি পেলে খুশী হবে ?

জালাউদ্দীন ইয়াকুত তাচ্ছিল্যভাবে হেসে বললো—কেন সুলতানা কি অপরাধীর বিচার করতে ভুলে গেলেন ?

রিজিয়া যেন কেমন অস্থির হয়ে উঠলো—না—না বিদেশী তুমি বুঝতে পাচ্ছো না। আমি তোমাকে শাস্তি দেওয়ার কথা কখনও ভাবিনি। শুধু আমি তোমাকে মিনতি করছি তুমি সুলতানার পাণিগ্রহণের ইচ্ছা মন থেকে মুছে ফেলো। দিল্লীর সুলতানীর অনেক কাজ। তার জীবন শাদীর জন্য নয়। রাজ্য পরিচালনার জন্য তার জন্ম। সে সারাজীবন ধরে রাজ্য-পরিচালনার মেহনত করে এসেছে, শাদীর জন্য না। তুমি যদি অন্য কিছু চাও আমি দেবার চেষ্টা করবো তবু ও আশা মন থেকে মুছে ফেলো। আমি তোমাকে অশ্বশালার পরিরক্ষক করে দেবো।

হঠাৎ ইয়াকুত পঞ্চাশ ইঞ্চি বুকের ছাতি নিয়ে পাহাড় দেহ দাঁড় করিয়ে সেই ক্ষুদ্রঘরের পরিসরকে সঙ্কুচিত করে দারুণ রবে হেসে উঠলো। তার হাসিতে তার সমস্ত শরীর এমনভাবে আন্দোলিত হতে লাগলো যা দেখে রিজিয়ার ছোট্ট বুকটি কুঁকড়ে উঠলো। হাসি প্রশমিত হলে ইয়াকুত বলল—বহুৎ সেলাম সুলতানাজী, হাবসী সর্দার কারও অনুগ্রহের আশা করে না।

তাহলে তুমি কি পেলে খুশী হবে বলো আমি তোমায় তাই দেবো।

আমি চাই দিল্লীশ্বরীর হৃদয় !

সে পেলে তোমার কিছু লাভ হবে না মুসাফের। দিল্লীশ্বরী শাদি করলে এ সিংহাসন আর তার থাকবে না। তাকে উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী সুলতানা বলে ষড়যন্ত্র করে সিংহাসনচ্যুত করবে। তুমি শুধু রিজিয়াকে চাও, না তার সঙ্গে সিংহাসনও চাও ?

আমি শুধু সুলতানাকে চাই।

কিন্তু সিংহাসন ছাড়া সুলতানার মূল্য কোথায় ? আজ যার জন্যে তোমার এই চাওয়া, সিংহাসনচ্যুত হলে সে সুলতানার মূল্য তো সাধারণ জেনানার মতো হয়ে যাবে। তার চেয়ে আমার মহলে অনেক সুন্দর বাঁদী আছে, তুমি যদি তাদের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে চাও আমি তার জন্যে সাহায্য করতে পারি।

সুলতানা সাহেবাকে তার জন্যে ধন্যবাদ। আমি সুলতানাকে ছাড়া আর কারও কথা ভাবি না।

রিজিয়া আরও অধৈর্য হয়ে বললো, তুমি বুঝতে পাচ্ছো না বিদেশী। আমি যদি কাল দরবারে তোমার ঔদ্ধত্যকে সমর্থন করি তাহলে আমার ভায়েরা ওৎ পেতে বসে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা আমার দুর্নাম রটিয়ে রাজ্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনবার চেষ্টা করবে। তা ছাড়া আমি রাজ্যের মধ্যে বিয়েশাদী বন্ধ করে দিয়েছি। বিনা হুকুমে কেউ ঐ ধরণের উৎসব করলে কারাবাস। এখন যদি আমি তোমাকে সমর্থন করি তাহলে রাজ্যের লোকেরা আমাকে কি মনে করবে ?

কাল থেকে উৎসবের ঢালাও আদেশ দাও।

তুমি যদি সুলতান হতে তাহলে মিনিটে মিনিটে তোমার আদেশ পরিবর্তন করতে পারতে ?

ইয়াকুত আর কিছু বলবার আগেই রিজিয়া কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ইয়াকুতের হাত ধরলো। কাতর স্বরে বললো, তুমি কি বুঝতে পারো না, আমি দিল্লীর সুলতানা, আমি ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারি নে।

ইয়াকুত রিজিয়ার মানসিক অবস্থা বুঝলো। তা ছাড়া সুলতানার কোমল হাতের বন্ধনিতে তার বলিষ্ঠ হাতটি যেন কেমন মোহের সঞ্চার করছিল। ইয়াকুত আর একটু সাহস করে রিজিয়াকে আপন বক্ষের ওপর স্থাপনের জন্য হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে গেল। রিজিয়া তাড়াতাড়ি একটু সরে গিয়ে মৃদু হাসলো, হেসে বললো—এত সাহস ভাল নয় বিদেশী।

ইয়াকুত হাসতে হাসতে বললো, আমি জানতুম আমার আরজি মঞ্জুর হবে।

রিজিয়া তাড়াতাড়ি ঘাড় নেড়ে বললো, উঁহু একথা যেন কেউ না জানে। এখন গোপন থাকবে এ সম্বন্ধ। সময় হলে সুলতানা নিজেই জানাবে তার রাজন্যবর্গকে। এখন জালাউদ্দীন ইয়াকুত অশ্বশালার পরিরক্ষক ও সুলতানার পার্শ্বচর।

ইয়াকুত কুর্নিশ করে বললো—যো হুকুম জাঁহাপনা। সুলতানার বহুৎ মেহেরবাণী।

রাত্রির শেষের প্রহর আগতপ্রায়। নিস্তব্ধ কারাকক্ষের প্রস্তর প্রাচীর ভেদ করে কার যেন দরদ ভরা কণ্ঠের গান রিজিয়ার কানে গিয়ে পৌঁছলো। কান পেতে সে মধুমাখা কণ্ঠের গান শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে গেল। মসজিদের প্রাঙ্গণে বসে ফকির সাহেব প্রিয়মিলনের আকুতিভরা সুরে গান গেয়ে চলেছেন।

আজ তার এ গান শুনে রিজিয়ার চোখের দুই কোণায় জল টলমল করতে লাগলো। মনে প্রশ্ন জাগলো, ফকির সাহেব কি কোনদিন ভালবেসে দিওয়ানা হয়ে গিয়েছিল ? প্রিয়াকে না পেয়ে প্রিয়ার জন্যে নিশিদিন ধরে তার এই আকুলতা !

ছোটবেলা থেকেই শুনছে রিজিয়া ফকির সাহেবের এই গান। পিতা আলতামাস তখন দিল্লীর সিংহাসনের একচ্ছত্র সম্রাট। মায়ের মহলে রাত্রিবেলা মায়ের কাছে শুয়ে কতদিন মাকে বলেছে রিজিয়া, ফকিরসাহেব কাঁদে কেন মা? সঠিক জবাব পায়নি সেই ছোট্ট মেয়েটি। আজ বুঝছে কেন সে জবাব সেদিন তার বোধগম্য হয়নি। সুলতানা হয়েও রিজিয়া বোঝেনি ফকির সাহেবের কান্নার অর্থ। আজ সে ভালভাবেই বুঝছে।

রিজিয়া আবার কান পাতলো। ফকীর সাহেব গান গাইছে না। ফকীর সাহেব সত্যিই কাঁদছে। তার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে কান্নার ঢেউ মোচড় দিয়ে দিয়ে বুক ঠেলে গলার ওপর উঠে আসছে। সে কাঁদছে না তাকে কাঁদাচ্ছে কেউ। কে কাঁদাচ্ছে তাকে? সুলতানার ইচ্ছে করলো—ফকীর সাহেবকে ডেকে জিজ্ঞেস করে কে তোমায় কাঁদায় বলো আমি আমার সুলতানার শক্তি দিয়ে তাকে উদ্ধার করে এনে তোমার কাছে পেশ করবো। ফকীর সাহেবের কণ্ঠ থেকে তবু নিঃসৃত হল।

'বেশেকনদ্ দস্তে কে খম্ দর গর্দন-ই ইয়ারে নাশুদ্।
কুর বা-চশমে কে লজ্জৎগীর-ই দীদারে নাশুদ্॥'

আলতামাসের বেগম ছিল অনেকগুলি। তিনি উচ্ছৃঙ্খল জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে রমণীর রূপসুধা আকণ্ঠ পান করবার জন্যে রমণীর যৌবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা খেলেন নি। তবে রাঙা টুসটসে খুবসুরৎ লেড়কীর অপরূপ দেহভরা যৌবন দেখলে তাকে বেগম করে এনে মীনামহলে ঢুকিয়ে দিতেন। মীনা মহলে বাছা বাছা সুন্দরীদের অনেক দেখেছে রিজিয়া ছোটবেলায়। সত্যি, সে সৌন্দর্যের হাট দেখে সেদিন রিজিয়া অবাক হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভিন্ন ভিন্ন যৌবন। কোনটি গোলাপী, কোনটি সাদা দুধ-আলতা, কোনটি কৃষ্ণবর্ণ, কোনটি তামাটে বর্ণ। কিন্তু প্রত্যেকটির শরীরের বাঁধুনি অপরূপ। যেমন বক্ষসুধা। তনুর লাবণ্য। নিতম্বের অপরূপ ভঙ্গিমা। চোখের দৃষ্টিতে মদির স্বপ্নাভা। রসাক্ত অধরের মধুর আকর্ষণ।

আলতামাস যে রুচিশীল ব্যক্তি ছিলেন তা তার এই মহলের সৌন্দর্য বিচারে প্রতীয়মান হয়।

কিন্তু রিজিয়ার মা এখানে থাকতেন না। এই মহলের এই সুন্দরীদের থেকে তিনি নিজেকে আলাদা করে নিয়ে অন্যত্র থাকতেন। তিনি এই মীনা মহলের বেগমদের মনে মনে ঘৃণা করতেন। স্বামীর চরিত্রের এই দিকটায় তার কোন কিছু করার ছিল না বলে তিনি মনে মনে আহত হতেন।

অবশ্য মনে মনে এই বলে তিনি নিজেকে আশ্বাস দিতেন যে সুলতানের হাজারটা বিবি না থাকলে সে সুলতানের সম্মান রক্ষা হয় না। সুলতান একটি নারীর প্রেমের মোহিনী বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। আর লক্ষ লক্ষ নারীর যৌবন তারই কর্মচারীরা লুটেপুটে খাবে, তিনি তাই চোখ মেলে দেখবেন কিন্তু হাত বাড়িয়ে কখনও গ্রহণ করবেন না অন্ততঃ এরকম কোন আদর্শবানের কথা মুসলমান সুলতানের ইতিহাসে লেখা নেই। তাই আলতামাসের এই বেগম প্রীতি ক্ষমার চোখেই দেখতে হয়।

কিন্তু তবু প্রধানা মহিষী রিজিয়ার মা ক্ষমা করতে পারেননি। তিনি নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখবার জন্যে স্বতন্ত্র বাসের ব্যবস্থা করেছেন। আর তার জন্যেই তৈরী হয়েছে রাজপ্রাসাদের পাশে প্রধানা বেগমের জন্য খুসকৃফিরোজী নামে প্রাসাদ। রিজিয়ার মায়ের নামে নাম দিয়ে এই প্রাসাদ তৈরা হয়। আলতামাস প্রধানা বেগমকে সবচেয়ে ভালবাসতেন। এবং তার মনের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে ভিন্ন প্রাসাদ তৈরী করে তাকে ভিন্ন বাসের সুযোগ দিয়েছিলেন।

সেই প্রাসাদেই রিজিয়া জন্মেছে। বড় হয়েছে। ছোটবেলার শিশুমনের দিনগুলি এই প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে কেটেছে। এই প্রাসাদের স্মৃতি তার সর্ব অঙ্গের সবটুকু জায়গায় মিশে আছে। তার ছোটবেলাকার খেলার সাথীর মতো এই প্রাসাদের সর্বপ্রস্তরময় অলিন্দ। তাই যখন সে সুলতানা হল তখন সে এই প্রাসাদের মায়া কাটাতে পারলো না। এই প্রাসাদেই সুলতানার বাসস্থান নির্দিষ্ট হলো। এখানে কয়েকজন বাঁদী সমবিহারে রিজিয়া স্বতন্ত্র এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে রাখলো। এখানে পুরুষের কোন অধিকার নেই। তবে রাজপ্রাসাদ থেকে কারও হঠাৎ প্রয়োজন হলে সে এসে সুলতানাকে সংবাদ দিতে পারবে এমনি একটি যোগাযোগ পথ খুসকৃফিরোজী প্রাসাদের সঙ্গে ছিল। আসলে যে পথটি দিয়ে আলতামাস নিজে এক সময় গমনাগমন করতেন। এখন সেই পথ দিয়েই রিজিয়া রাজদরবারে যাওয়া আসা করে।

সেদিনের প্রভাতটি রিজিয়ার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সমস্ত রাত্রি জাগরণের পরও প্রভাতের সেই মনোরম সময়টিতে প্রকৃতির অপরূপ রূপলাবণ্য দেখে তার চোখ দুটি জুড়িয়ে গেল। সাধারণত খুব ভোরেই ওঠা অভ্যাস তার। প্রত্যহ ভোরে উঠে সূর্য ওঠার আগের মুহূর্তটি না দেখলে তার প্রতিদিনের কাজ শুরু হয় না। ভোরের সেই স্নিগ্ধ-স্নাত রূপটি, নীলমেঘের আকাশে সূর্য ওঠার মুহূর্তে বড় মনোরম। রিজিয়ার সারাদিন ধরে রাজকার্যের মধ্যে এই রূপটি প্রত্যহ দেখা থাকলে কাজের সময় তার মস্তিষ্কটি সুস্থ থাকে। যেন সে ভোরের রূপটি মনে ধরে প্রভাতের স্নিগ্ধ-শান্ত রূপসী হয়ে ওঠে।

কিন্তু এদিনের ভোর তাকে অন্য এক আস্বাদ দান করলো। নির্ঘুম দুটি চোখে তার কত ক্লান্তি। কিন্তু কারাগার থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে ফেরার পর বড় তৃপ্তিতে সে শয্যার ওপর ঢলে পড়েছিল। নরম মখ্‌মলের শয্যায় তার সুরভীমাখা সৌন্দর্যেভরা দেহটি বড় আরামেই শয্যা নিয়েছিল। কিন্তু কতটুকুই বা সে ঘুম! শয্যায় উঠে বসে সে অনুভব করে কোন ক্লান্তি নেই। বিস্ময়ে চিন্তা করে রিজিয়া—আশ্চর্য তো!

মনে অদ্ভুত পুলকের সঞ্চার হয়ে মনের যেন কাণা ভরে উঠেছে। যেন অথৈ জলে সারা দীঘি টলোমলো।

হঠাৎ একটি বাঁদী পাশে এসে কুর্নিশ করে রিজিয়ার কৃপা প্রার্থনা করলো। রিজিয়া আকাশের দিক থেকে চোখ দুটি তুলে বাঁদীর দিকে তাকালো। বাঁদী ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এমনি ভয়ই করে প্রাসাদের প্রতিটি প্রাণী। রিজিয়ার মেজাজ ও মর্জি যে সবসময় বোঝা যায় না। তাছাড়া সবসময় যে সে বিরক্তি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় সেইজন্যে সর্বদাই কর্মচারীরা গর্দান যাওয়ার আশঙ্কায় এতটুকু হয়ে থাকে। সেই কথা চিন্তা করে মনে মনে রিজিয়া একটু হাসলো। মুখে একটু কোমলভাব নিয়ে এসে বাঁদীকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলো, কিছু খবর আছে সাকী ?

হ্যাঁ, বেগমসাহেবা, রাণীবিবি শিকল কেটে ঘর থেকে ছুট্‌কে বারমহলে চলে এসেছেন। তাঁকে কেউ আটকাতে পাচ্ছে না। তিনি অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিচ্ছেন। বেশবাস তার শিথিল হয়ে গেছে। আপনি যদি একবার যান তাহলে বড় ভাল হয়।

রসাপ্লুত অধরটি দাঁত দিয়ে রিজিয়া চেপে ধরলো। দাঁতের তীব্র পেশনে নরম অধরের মাংস কেটে রক্তের বন্যা ছুটতে চাইলো। তীব্র একটি যন্ত্রণা। যন্ত্রণাটি শরীরের রন্ধ্রে পাক খেয়ে খেয়ে কণ্ঠ দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে এলো। মুখটি বিস্বাদ হয়ে গেলো। মস্তিষ্কের কোষে কোষে আগুন জলে উঠলো। ইচ্ছে করলো এখুনি চাবুকের আঘাতে এই দুশ্চরিত্রা কলঙ্কিনী রমণীকে রক্তাক্ত করে দিল্লী সাম্রাজ্যের বাইরে করে দেয়। কিন্তু তা যে সে পারে না সে তা ভাল করেই জানে। এই রমণীর ওপর দুর্ব্যবহার করলে মৃত পিতার আত্মার অকল্যাণ হবে। তিনি এই রমণীকে যথেষ্টই ভালবাসতেন।

হঠাৎ চিন্তা থেকে সরে এসে বাঁদীর দিকে তাকিয়ে রিজিয়া মাথা নেড়ে জানালো, তুমি যাও। আমি যাচ্ছি।

বাঁদী চলে গেলে রিজিয়া আবার চিন্তার মধ্যে ঢুকে গেল। পিতা আলতামাসকে আজ প্রতি মুহূর্তে তার স্মরণ করতে হচ্ছে। রাজ্যের চারিদিকে, এই রাজপ্রাসাদের চারিদিকে পিতার প্রতিটি স্মৃতি। প্রতিটি স্মৃতি অবিস্মরণীয়। ভুলতে চাইলেও তবু ভোলা যায় না। ইতিহাসে আলতামাস একজন প্রতিপত্তিশালী শ্রেষ্ঠ সুলতান। অন্তত দাসবংশের সুলতানদের মধ্যে আলতামাসের নাম চিরস্মরণীয়। তিনিই প্রথম শিশু মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করতে পেরেছিলেন। ভারতের মুসলমান রাজত্বের সূচনা তার দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বঙ্গদেশে প্রাধান্য স্থাপন করে ভারতের একাংশের একচ্ছত্র অধিপতি হয়েছিলেন।

বাগদাদের খলিফা আল মুস্তানসি আলতামাসের এই প্রতিপত্তি স্বীকার করে নিয়ে ভারতীয় রাজ্যকে মুসলিম সাম্রাজ্য বলে অভিহিত করেছিলেন। বাগদাদের খলিফা সুলতানের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন। আলতামাসকে সুলতান-ই-আজম (মহা

সুলতান) উপাধি দান করেন। খেলাত (মূল্যবান রাজ পরিচ্ছদ) দানে ভূষিত করেন এবং একখানি তরবারি উপহার দিয়ে আলতামাসের তুর্কীনামের সঙ্গে শামনউদ্দীম বা ধর্মসূর্য উপাধি যোগ করেন।

আজ রিজিয়া ভাবে, সেদিন খলিফা সম্মান দিয়ে পিতাকে শ্রেষ্ঠ করেছিলেন বলে তিনি ধন্যবাদের পাত্র কিন্তু সবকিছু উপহারের সঙ্গে আর একটি সম্পদ যে দান করেছিলেন তার জন্য তিনি আজও চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। সেদিনের সব কথা রিজিয়া জানে না, সে তখন ছোট। মা মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অসাবধানে যে সব কথা বলতেন তার মধ্যে থেকেই উদ্ধার করে আজ একটি কাহিনী সৃষ্টি করে নিয়েছে।

বাগদাদের খলিফার বিলাস সর্বজনবিদিত। সৌন্দর্য ও সেরা সুন্দরীর হাট ঐ বাগদাদেই। খলিফা আল মুস্তানসি সুন্দরীদের মেলায় বসে রাজ্য পরিচালনা করতেন। তিনি সুখী লোক। বেহেস্তের নয়ন মনোরম কোন স্বপ্নস্বর্গ আছে কি না জানা নেই, তবে বাগদাদ যে বেহেস্তের চেয়েও মনোরম একথা হলফ করে বলা যায়। সেখানে রং বেরঙের ফুল যেমন চারিদিকে ছড়িয়ে থাকতো তেমনি রমণীর সৌন্দর্য।

সেই খলিফাই রোশনীকে উপহার দিয়েছিলেন। খলিফা বোধ হয় জানতেন, মুসলমান সুলতান রমণী সৌন্দর্যকে সবচেয়ে বেশী পছন্দ করে। অন্য উপহারের চেয়ে এই উপহার যে আলতামাসকে খুশী করবে তা তিনি জানতেন।

আলতামাস সেদিন প্রৌঢ়ত্বের সিঁড়িতে গিয়ে পৌছেচেন। বাগদাদের মহামূল্য উপহার কুর্নিশ জানিয়ে গ্রহণ করে হকচকিত হয়ে গেলেন। রক্তে তার আগুনের স্পর্শ লাগলো। কামমদির চোখে প্রৌঢ় আলতামাস যেন কেঁদে ফেললেন অপরূপ যৌবনকে সামনে দেখে। এতদিন যে হীরা বলে কাঁচকে নিয়ে খেলা করেছেন। কাঁচের সঙ্গে জীবনের উত্তপ্ত দিনগুলি বিদায় নিয়েছে। জীবনের এই উত্তপ্ত দিনগুলি বাজে কাজে ব্যয় করতে হয়েছে বলে তীব্র অনুশোচনায় ক্ষত বিক্ষত হলেন।

রোশনী সামনে দাঁড়িয়ে। আলতামাস হীরার দিকে তাকাতে গিয়ে চোখ দুটি তাঁর ঝলসে গেল। চোখের ওপর মণিমাণিক্যের জ্যোতি পড়ে প্রৌঢ় আলতামাসের চোখ দুটির দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিল। তবু দেখলেন। দেখলেন দিল্লীর অধিপতি মহাবীর আলবারী তুর্ক শ্রেষ্ঠ আলতামাস।

এত রূপ যার। যে রূপের তুলনা নেই। যে রূপ অন্ধকারে আলো জ্বালে। হৃদয়ের ঘুমন্ত শোণিতে জোয়ার তোলে। সেই রূপবতী বেহেস্তের হুরীকে বাগদাদের খলিফা কেমন করে পাঠালেন? কোন্ পুরুষ এই রমণীর সৌন্দর্য উপভোগ না করে তাকে ছেড়ে দেয়—অন্ততঃ আলতামাসের চিন্তার বাইরে। তাই তাঁর সন্দেহ হলো, তবে কি খলিফা তার সঙ্গে দিল্লাকী করবার জন্যে উচ্ছিষ্ট যৌবনের উপহার দিয়ে তাকে উপহাস করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু খলিফার ওপর শ্রদ্ধা ছিল তাঁর। বাগদাদের খলিফা যে তার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করতে পারেন না তার অন্যান্য ব্যবহারেই তা প্রমাণ হয়েছে। তিনি যদি আলতামাসের সঙ্গে ছল ও চাতুরীর আশ্রয় নিতে

চাইতেন তবে আলতামাসকে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে 'ধর্মস্বর্ধ' ও 'সুলতান-ই-আজম' উপাধি দিয়ে সম্মান জানাতেন না। খলিফা যে তাকে উচ্ছিষ্ট যৌবন উপহার পাঠিয়ে উপহাস করেননি সে কথা ভেবে আলতামাস খুশী হয়ে উঠলেন। মনে মনে খলিফাকে তারিফ করলেন এই বলে যে, যৌবনটুকু আদর্শ পুরুষ সুলতানকে খলিফা উপহার পাঠিয়েছেন, তামাম দিল্লী সাম্রাজ্যের কোথায় কোন রমণীর সৌন্দর্যের সঙ্গে এর বুঝি তুলনা মেলে না। এমন কি মনে মনে আলতামাস তাঁর বেগমমহলের প্রতিটি বেগম ও বাঁদীর সৌন্দর্য পরীক্ষা করে দেখলেন।

এবার স্পষ্ট ও সোজাসুজি রোশনীর দিকে তাকাবার চেষ্টা করলেন। ফুলের মতো সতেজ তনু দেহটি অল্প নুয়ে একটি ভঙ্গিমায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। সুদৃশ্য ভেলভেটে মোড়া মেঝের উপর যে সুন্দর পা দুটি রাখা ছিল আলতামাস সেইদিকে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। দুধে আলতা রঙের সুকোমল পা দুটি চাঁপা ফুলের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে ভেলভেটে মোড়া ফরাসের ওপর রাখা। আলতামাস চোখ দুটি আস্তে আস্তে তুলে দিলেন পায়ের পাতা থেকে ঊর্ধাঙ্গে। একটি পাতলা মসলিনের বহুমূল্য ঘাঘরা মেয়েটির নিম্নাঙ্গকে জড়িয়ে আছে। আলতামাস নির্লজ্জের মত হাঁটু থেকে চোখ দুটি আরও গভীরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। কোমর থেকে নিম্নাঙ্গের দিকে আবার দৃষ্টি ঝুলিয়ে দিলেন। বহুদর্শী জহুরীর মতো আবার কোমর থেকে ঊর্ধাঙ্গে চলে গেলেন।

বারকয়েক নিম্নাঙ্গের ওপর নীচে চোখ দুটো দিয়ে লেহন করে ঊর্ধাঙ্গে উঠে গেলেন। বক্ষের রূপধারাকে সামান্য ঢাকা রাখবার জন্যে একটি ছোট্ট বহুমূল্য জামা মেয়েটির গায়ে। বুকের ওপর আকাশীরঙের একটি ওড়না। অবহেলা ভরে বক্ষ থেকে খসে পড়ে মাটিতে লুটচ্ছে। আলতামাস বারকয়েক মেয়েটির যৌবন প্রস্ফুটিত বক্ষসুধার দিকে তাকিয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। মেয়েটির দৃষ্টি আনত। কপাল, চিবুক, অধর, ভুরু, সুরমা আঁকা সুন্দর চোখদুটি দেখলেন। আলতামাস ভাবলেন, রমণীতো তাব বেগমমহলে অসংখ্য আছে। কিন্তু এমনটি কোথায়? একে না দেখলে রমণীর এই রূপের সম্বন্ধে তার একটা ভুল ধারণা তৈরী হয়ে থাকতো। খলিফা বোধ হয় জানতেন, আলতামাস অভাবী। রমণী তাঁর হারেমে অনেক আছে কিন্তু এমনটি নেই। তাই বুঝি তিনি সেরা একটি সুন্দরীকে বাগদাদ থেকে পাঠিয়ে তাকে খুশী করলেন।

কিন্তু এই প্রৌঢ় বয়সে এই সুন্দরীকে নিয়ে তিনি কি করবেন? এর বুকে যে আগুন আছে, এর শোণিতে যে সমুদ্রের মাতন আছে তিনি এই শক্তিহীন দেহে তা উপভোগ করবেন কেমন করে? আলতামাস শুধু শঙ্কিত হয়ে সেই কথা ভাবলেন। ভীত হয়ে রোশনীর অবনত মস্তকের দিকে তাকালেন। আবার বারকয়েক পা থেকে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন।

জীবনে অনেক রমণী তিনি পেয়েছেন। যাদের ভাল লেগেছে তাদের বেগম করে বেগমমহলে স্থান দিয়েছেন। সেই বেগমদের গর্ভে তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ

হয়ে গেছে। বেগমরা আজ অনেকেই সন্তানবতী। অনেকেই তার সন্তানাদি নিয়ে লালনপালনে ব্যস্ত। আজ তাঁর অনেক সন্তান, অনেক তাঁর বেগম। কিন্তু কি হলো এসবের জন্য শক্তি ক্ষয় করে? জীবনের এই যে অপব্যয় এর জন্যে আবার নতুন করে আলতামাস শোকার্ত হয়ে উঠলেন। তারপর রোশনীকে নিয়ে বেগমমহলের স্বতন্ত্র একটি কক্ষে স্থান দিলেন। রোশনীর রূপসুধা পান করতে তার নিঃশেষিত শক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল।

তারপর একদিন হঠাৎ শুনলেন রোশনী বেগম নেই। পাখী উড়ে গেছে। বিহঙ্গী তার সোনার ডানা মেলে কোন স্বপ্নের দেশে চলে গেছে। কিন্তু আলতামাস সন্ধান নিয়ে জানলেন, রোশনী একটি সামান্য সিপাহীর মহব্বতের রোশনাইতে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে পালিয়েছে। আলতামাস মনে মনে রোশনীকে ক্ষমা করলেন। কারণ জানতেন যে, তিনি রোশনীকে খুশী করতে পারেননি, তাঁর অক্ষমতাই রোশনীর পালানোর জন্যে দায়ী।

কিন্তু প্রকাশ্যে বেগমকে খোঁজার জন্য ঘোড়সওয়ার দেশবিদেশে পাঠালেন। নিজে রোশনীর জন্যে ব্যথিত হয়ে উঠলেন। ব্যথিত অবশ্য আলতামাস সত্যিই হয়েছিলেন। সৌন্দর্য উপভোগ করার শক্তি তাঁর না থাকলেও সৌন্দর্যকে আপন এক্তিয়ারে রাখবার ক্ষমতা তার থেকেও থাকলো না দেখে ব্যথিত হলেন। ঘোড়সওয়ার ছুটলো দিল্লীর যমুনা নদীর পার দিয়ে অনেকদূর। যে পলাতক সিপাই রোশনীকে নিয়ে পালিয়েছিল সেই ইকবাল খাঁ আলতামাসেরই সৈন্যবাহিনীর একজন। ইকবালের সাহস দেখে কিন্তু আলতামাস চমকালেন না। কারণ তিনি জানতেন এর জন্য দায়ী একমাত্র তিনি। তাঁরই অক্ষমতা রোশনীর যৌবনকে খুশী করতে পারেনি। সেইজন্যে রোশনী মরিয়া হয়ে উঠেছে। এক নওজোয়ানকে আপন যৌবনের উপচার নিবেদন করে রোশনী বাঁচতে চেয়েছে। মনে মনে এও ভেবেছিলেন আলতামাস, ওদের দু'জনকে খুঁজে পেলে তিনি ক্ষমা করবেন। এবং যাতে সুলতানের সম্মান ক্ষুণ্ণ না হয় প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে অনেক দূর দেশে পাঠিয়ে দেবেন। দিল্লীর প্রতিভাশালী একচ্ছত্র সুলতান দাসবংশের সম্মানকে কিছুতে ম্লান করতে দেবেন না। তার অক্ষমতার কথা তার পঙ্গুত্বের বার্তা পৃথিবীময় রাষ্ট্র হলে ইতিহাসে তিনি অক্ষম সুলতান নাম নিয়ে থাকবেন। তাই মনে মনে ঠিক করেছিলেন ওদের পেলে ক্ষমা করে অনেকদূরে পাঠিয়ে দেবেন। তার স্বভাবের সুন্দর দিকটাই মানুষের চোখে সুন্দর আসন পেয়ে যাবে।

কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ওদের দুজনকে পাওয়া গেল না। আলতামাসের মনের ইচ্ছা মনের মধ্যেই গুমরে থাকলো। তিনি রোশনীকে না পেয়ে বিরহানলে দগ্ধ হলেন। ত্যাগের বাসনা যে মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল সেই ত্যাগ না করতে পেরে রোশনীর জন্যে যেন দিনের পর দিন পাগল হয়ে উঠলেন।

আলতামাসের সেই দিনগুলির কিছু কিছু ইতিহাস রিজিয়া তার মার মুখে শুনেছে। মা যখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিজের জীবনকে ধিক্কার দিয়ে অনেক বাজে

কথা বলতেন, তার মধ্যে আলতামাসের সেদিনের কিছু কিছু ঘটনা মার মুখ থেকেই শুনেছে রিজিয়া। পিতা আলতামাস যেন সেদিন বৃদ্ধবয়সে রোশনীর মহব্বতের রোশনাতেই পড়ে মরেছিলেন। পিতার মুখে সেদিন রোশনীর নাম ছাড়া কিছু ছিল না। এত বড় যোদ্ধা, এত বড় সুলতান, যাঁর ভয়ে সমস্ত উত্তর ভারতের রাজন্যবর্গেরা কাঁপেন ; তিনি সামান্যা এক নারীর প্রেমে এমনি করে নিজেকে হারাবেন একথা যে কল্পনাতে আসে না। কিন্তু সেদিন তিনি তাই করেছিলেন। দাসবংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান এক নষ্টা নারীর জন্যে রাজকার্য ভুলে গিয়ে হা-হুতাশ করেছিলেন।

তারপর তিনবছর চলে গেছে। হয়ত আলতামাস আস্তে আস্তে ভুলেও গিয়েছিলেন। হঠাৎ একদিন তাঁর সৈন্যরা শত্রুপক্ষীয় একটি ছাউনি অধিকার করে কয়েকটি শত্রু সৈন্য ও কয়েকটি রমণীকে বন্দী করে নিয়ে আসে। হঠাৎ তাদের মধ্যে থেকে উদ্ধার করেন তিনি রোশনীকে। আলতামাস দেখেই চিনতে পেরেছিলেন রোশনীকে। কিন্তু রোশনীর আগের সে সৌন্দর্য ছিল না। প্রথম যারা রোশনীকে দেখেছিল তারা এই বর্তমানের রোশনীকে দেখলে হলফ করে বলতে পারবে—এ কখনই সে রোশনী নয়। সেই রোশনীর এই অবস্থা কখনই হতে পারে না। কিন্তু আলতামাস দিনরাত রোশনীর মুখটি মনে করবার চেষ্টা করতেন বলে প্রথম সাক্ষাতেই তাকে চিনে ফেলেছিলেন। শত্রু সৈন্যেরা যে ছাউনিতে রাত্রিবেলা এই রমণীগুলিকে নিয়ে স্ফূর্তি করছিল তাও তিনি শুনেছিলেন। আর রোশনীর চেহারা দেখেও বুঝেছিলেন, বহুপুরুষের স্পর্শে ও বহুরাতের অত্যাচারে সেই দেহের এই রূপ বর্তমানে হয়েছে। একটি নষ্টা মেয়ের ঘৃণ্য রূপ নিয়ে সেদিনের সেই চমক লাগানো সৌন্দর্যকে একেবারে পালটে দিয়েছে।

আলতামাস এই ঘৃণ্য রমণীকে ঘৃণা করে তাড়িয়ে দিলেই ভাল করতেন। মনের সেই হারানো সুখস্বপ্নকে—মহব্বতকে মুছে দিয়ে জীবন থেকে রোশনীর স্মৃতি মুছে ফেললেই আলতামাসকে চেনা যেত। কিন্তু তা তিনি করলেন না। তিনি আবার তাকে ধুয়ে মুছে ঘরে নিয়ে এলেন। বেগমমহলে আবার তাকে স্থান দিলেন। আবার তাকে নিয়ে হারানো দিনগুলি নতুন করে ঝালানোর চেষ্টা করলেন। নতুন করে মালকোষ সুরে তানের ছন্দে হৃদয় মাতানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু সুর আর সৃষ্টি হল না।

রোশনীকে পিছনের ঘৃণিত জীবনের মাশুল দিতে হলো। রোগ তার শরীরে আগেই বাসা বেঁধেছিল। দুশ্চরিত্র সৈনিকদের সাথে মেলামেশায় শরীরের মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক আগেই হয়েছিল। হয়ত প্রাসাদের বিলাসীজীবনে ফিরে এসে সুলতানের ক্ষমা পেয়ে তা প্রকট হয়ে ধরা পড়লো। দিনের পর দিন রোশনীর সারা শরীরের চারিদিকে রোগের প্রকাশগুলো বীভৎস হয়ে উঠলো। সে পাগল হয়ে গেল।

রাজ্যবৈদ্য এল মহলে। দিনের পর দিন ওষুধের হের-ফের চলতে লাগলো। সুলতান ছটফট করতে লাগলেন। কিন্তু রোশনী ভাল হল না। রোশনী সম্পূর্ণ

পাগল হয়ে গেল। রোশনী পাগল হল হয়ত তার ঘৃণ্য জীবনটি সুলতানের সহানুভূতি পেয়ে। সুলতান যদি এমনি করে তাকে ক্ষমা না করতেন, তাকে আবার ভালবাসা না দেখাতেন—হয়ত নিজে পাগল না হয়ে মরমে মরে যেতো। কিন্তু পাগল হয়ে গেল রোগের জন্য নয় সুলতানের ভালবাসা পেয়ে। এই সুলতান ও এই বিলাসী জীবনকে ছেড়ে সে যৌবনকে উপভোগ করতে গিয়ে যে অন্যায় করেছে তার ক্ষমা নেই বলে সে পাগল হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত এই পাগলীকে শৃঙ্খলিত করে ঘরে বন্ধ রেখে আলতামাসকে রোশনী বেগমের মহব্বতের শেষ পরিণতি তৈরী করতে হল। তবু তাঁর শান্তি, যে রোশনী কাছেই আছে। রোশনী এখন রোগাক্রান্তা, অক্ষমা। তবু সে চোখের সামনে আছে। রোশনীর রূপহীনা বিকৃত আকৃতি দেখে মনে মনে সুলতান খুশী। যৌবন থাকলে যে রোশনীকে ধরে রাখা যেত না, সেই যৌবন এখন বিকৃত হয়ে রোশনীকে সুলতানের হারেমে বন্ধ করেছে। এখন রোশনী তাঁর। অন্য কারুর নয়। এই আনন্দে সুলতান আলতামাসের শেষের দিনগুলি স্মরণীয় হয়েছিল। বীরের বীরত্বকে কেউ চূর্ণ করতে চাইলে যে বীর কখনও ক্ষমা করে না ; একদিন তার প্রতিশোধ নেয়। আলতামাস ছিলেন বীর, রোশনীর যৌবন চূর্ণ হতে তিনি নিজের জয়ই মেনে নিলেন। সেই আনন্দে তিনি একটি ভারী পাথরকে বেগম মহলে রেখে তিনি হাঁফ ছাড়তে চাইলেন।

সুলতান আলতামাস চলে গেলেন। বেগম মহলের অনেক বেগম আজ গত। রাজ্যের অনেক ওলোট পালট হয়ে গেছে কিন্তু সেই পাগলী রোশনী এখনও শৃঙ্খলিত হয়ে বন্ধঘরের মধ্যে বসে আছে। রিজিয়া বেগমমহলে কখনও গেলে রোশনীকে দেখলে কিছুতে পিতা আলতামাসকে ক্ষমা করতে পারে না। আজও তাই পারলো না পিতাকে ক্ষমা করতে। মনে মনে পিতার এত গুণের মধ্যে দোষটুকুর কথা ভেবে নিজেই বেদনাহত হলো।

সুন্দর ভোরটি তার কাছে যে স্নিগ্ধরূপের মায়া বিস্তার করেছিল। সেটুকু মন থেকে মুছে গেল। মনের ওপর ভেসে উঠলো রোশনীর বীভৎস ঘৃণ্য মুখের প্রতিচ্ছবি। তামাম রাজ্যের চারিদিকে যেখানে পাপ, উচ্ছৃঙ্খলতা দিনের পর দিন নদীর স্রোতের মতো ঢেউ সৃষ্টি করে ছড়িয়ে পড়েছিল, রিজিয়া সিংহাসনে বসে রাজদণ্ডের ভয় দেখিয়ে তা কমানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার প্রাসাদের উজ্জ্বল দীপালোকে যে পাপের ছড়াছড়ি আলতামাসের সাক্ষ্য হয়ে আছে তাদের কমাতে পারেনি। বাইরের লোক সে কথা জানে, সুলতানার রাজদণ্ডের ভয়ে বলতে সাহস করে না। কিন্তু সুলতানা নিজে জানে যে তার প্রজাবর্গরা আড়ালে তার নামে কি বলে? কিন্তু উপায় নেই। পিতা তার নমস্য ব্যক্তি। পিতার শিক্ষায় আজ সে সিংহাসনকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তিনি যদি নিজের হাতে রণকৌশল না শেখাতেন তাহলে রিজিয়া আজকে এক একটি যুদ্ধ জয় করতে পারতো না। পিতার রাজ্য পরিচালনার পদ্ধতি অনুসরণ না করলে কবে সে সিংহাসনচ্যুত হয়ে যেতো। পিতার অনেকগুণ। কিন্তু গুণ ছাড়া যে দোষগুলি আজ রিজিয়াকে পীড়ন করে তার জন্যে রিজিয়া সর্বদা আহত

হয়ে ওঠে। পিতা যেন রিজিয়াকে সংজীবন যাপন করতে দেবেন না বলেই তাঁর পাপের দৃশ্যগুলি চোখের ওপর ধরে রেখে গেছেন। রিজিয়ার বৈমাত্রেয় ভায়েরা যে উচ্ছৃঙ্খলতায় নেমে গেছে তাও যেন পিতাকে অনুসরণ করে। অথচ আলতামাস কখনও সেরাজী সরাবের নেশায় নিজেকে রাঙিয়ে নর্তকীর নৃত্যের মধ্যে দিয়ে তাদের যৌবন-লুব্ধ দেহের দোলানি উপভোগ করেননি।

মন থেকে চিন্তা দূর করে রিজিয়া তাড়াতাড়ি 'খুসক্ ফিরোজী' প্রাসাদ ছেড়ে রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে চললো। রাজপ্রাসাদের পিছনের অংশে বেগমমহল। বেগমমহলের একটি ভিন্ন অংশে রোশনীর ঘর। যে ঘরে সে বদ্ধ অবস্থায় জীবনের বাকী দিনগুলি কাটিয়ে চলেছে।

বেগমমহল দিয়ে যেতে যেতে আর একজনের কথা মনে পড়লো রিজিয়ার। শাহতুর্কান। সুলতান আলতামাসের এক তুর্কী ক্রীতদাসী। এই ক্রীতদাসী পরে আলতামাসের বেগম হয়ে বেগমমহলে স্থান পেয়েছিল। রুকনউদ্দীনকে জন্ম দিয়ে এই ক্রীতদাসীবেগম মাতৃত্বের গৌরবে সুলতান আলতামাসকে যথেষ্ট পীড়ন করেছে। সুলতান জীবিত অবস্থায় শেষের দিনগুলি এই শাহতুর্কানের অত্যাচারে সর্বদা শঙ্কিত হয়ে থাকতেন। তার আরজি: সুলতানের মৃত্যুর পর তার পুত্রই যেন সিংহাসন পায়।

কিন্তু শাহতুর্কানের হাজার অত্যাচারেও মৃত্যুর সময় সুলতান শাহতুর্কানের পুত্রকে সিংহাসন দিয়ে যাননি। মরবার সময় তাঁর শেষ ইচ্ছা জানিয়ে গিয়েছিলেন, যেন রিজিয়াই তাঁর অবর্তমানে সিংহাসনে বসে।

কিন্তু আমীর ওমরাহেরা একজন অবলা কুসুমকোমলা নারীর অধীন হতে চাইলেন না। তখনকার দিনে রমণীরা পর্দার বাইরে এসে রাজ্য পরিচালনা করবে—এ কথা স্বপ্নেও চিন্তা করা যেত না। তাই যখন আলতামাস মরবার সময় তার শেষ ইচ্ছা জানিয়ে গেলেন তখন আমীর ওমরাহেরা সুলতানের মতিভ্রম হয়েছে বলে ধরে নিলেন। তা ছাড়া সুলতান কন্যার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহের জন্যেই এরূপ অসঙ্গত ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে সবাই সাব্যস্ত করলেন।

এর মধ্যে অবশ্য রুকনউদ্দীনের মা শাহতুর্কানের যথেষ্ট হাত ছিল। শাহতুর্কান ছেলেকে সিংহাসনে বসানোর জন্যে রিজিয়ার বিরুদ্ধে দল তৈরী করলেন। মনে মনে সুলতানের নির্বুদ্ধিতার যথেষ্ট সমালোচনা করে মৃত সুলতানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমীর ওমরাহদের খেপিয়ে তুললেন।

তাঁর মনস্কামনা একদিন পূর্ণ হল। রুকনউদ্দীনকে আমীর ওমরাহরা সসম্মানে সিংহাসনে বসালেন। নামে অবশ্য রুকনউদ্দীন সিংহাসনে বসলো, আসলে তার গর্ভধারিণী মা শাহতুর্কানই রাজ্য পরিচালনার ভার নিলেন।

সেদিন খুসক্‌ফিরোজী প্রাসাদের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসে রিজিয়া শুধু আল্লাকে ডেকেছে। মৃত পিতার কথা সর্বদা স্মরণ করেছে আর ভয়ে সর্বদা কেঁপেছে—এই বুঝি শাহতুর্কান শাণিত কৃপাণ নিয়ে তার দিকে ছুটে আসে।

খুসরুফিরোজী প্রাসাদে বসেই রিজিয়া বিমাতা শাহতুর্কানের নিষ্ঠুর ও কড়া মেজাজের পরিচয় পেয়েছে। রমণীর হৃদয় যে এত রূঢ় ও কঠিন হতে পারে—রিজিয়ার জানা ছিল না। শাহতুর্কানের ভয়ঙ্কর মূর্তি আজ রিজিয়ার দৃশ্যপটে চিত্রিত হলে সে শিউরে ওঠে।

শাহতুর্কান বেগমমহল থেকে তাঁর সতীনদের বের করে এনে নৃশংসভাবে হত্যা করলেন। তাঁর সেই নারীহত্যার নৃশংসতা দেখে আমীর ওমরাহরা শিউরে উঠলেন। সুলতান আলতামাসের অতি আদরের সুন্দরী বেগমরা এমনি নৃশংসভাবে শাহতুর্কানের হাতে জীবন দিতে বাধ্য হলো। তাদের কেউ রক্ষা করতে পারলো না। সুলতান আলতামাস হয়ত বেহস্ত থেকে তাঁর আদরের বেগমদের এমনি দুর্দশা দেখে রোদন করলেন কিন্তু তাদের বাঁচাতে পারলেন না। খুসরুফিরোজী প্রাসাদে নিজেকে গোপন রেখে রিজিয়া শুনেছে বেগমমহলের বেগমদের আর্ত চীৎকার। কিন্তু তার করবার সেদিন কিছুই ছিল না। তখন তার অবস্থা ঐ বেগমদের মতোই নিরুপায়।

কিন্তু আলতামাসের অন্যতম পুত্র কুমার কুতুবউদ্দীনের চক্ষু উৎপাটিত করে নিতে ও মুইজুকে হত্যা করতে জনসাধারণ আর চুপ করে থাকতে পারলো না। তারা ক্ষুব্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে মাতা ও পুত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। শেষে মাতা ও পুত্র যখন রিজিয়াকে হত্যা করবার জন্যে ষড়যন্ত্র করলো, সেই সময় রিজিয়া কৌশলে মসজিদ প্রাঙ্গণে রুকনউদ্দীনকে জনসাধারণের দ্বারা হত্যা করালো ও পিথোরা দুর্গে শাহতুর্কানকে বন্দী করলো।

এই সেই বেগমমহল। এরই নিম্নপ্রকোষ্ঠের কারাগারে শাহতুর্কান পাষাণ প্রাচীরের আড়ালে নিষ্ফল আক্রোশে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মৃত্যুকে বরণ করেছে।

রিজিয়া তখন সবে সিংহাসনে বসেছে। সে জানে, এই বেগমমহলের নিম্নপ্রকোষ্ঠে পাষাণ প্রাচীরের আড়ালে শাহতুর্কানের ক্ষুব্ধ চীৎকার ও আস্ফালন পাষাণ প্রাচীরকে চৌচির করে ভেঙে দিতে চেয়েছিল। শাহতুর্কান যেন ক্ষুব্ধ সিংহী। তখন যদি সে একবার মুক্তি পেত তাহলে যে রিজিয়ার দেহের মাংস কুরে কুরে খেত এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কিংবা শাণিত কৃপাণ দিয়ে সে রিজিয়ার দেহ খণ্ড খণ্ড করে পৈশাচিক আনন্দে নৃত্য করতো।

সেই শাহতুর্কান বেগমের প্রাণ ফাটানো চীৎকার আজও বেগম-মহলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিধ্বনি তুলে সুলতানা রিজিয়াকে সচকিত করে দেয়। শাহতুর্কান এই বেগমমহলের নীচেই অন্ধকার কারাগারে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে অনাহারে, পিপাসায় তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করেছে। রিজিয়া যখনই আসে এই বেগমমহলে তখনই যেন সে শুনতে পায় শাহতুর্কান বেগমের নিষ্ফল চীৎকার। মর্মন্তুদ হাহাকার।

আজ বেগম-মহলে আলতামাসের একটিও বেগম জীবিত নেই। সমস্ত বেগম-মহলের সুন্দর কারুকার্য করা ঘরগুলি সম্পূর্ণ মুক্ত। সেখানে এখন বাস করে বাঁদী ও ও নর্তকী। আর আছে শৃঙ্খলিত অবস্থায় বন্ধঘরের মধ্যে রোশনী। ঐ একটি বেগমই এখনও বেঁচে আলতামাসের অস্তিত্ব প্রমাণ করছে।

রিজিয়া দ্রুত এগিয়ে গেল রোশনীর উদ্দেশ্যে বেগমমহলের অন্য প্রকোষ্ঠে।

মালিক ইকৃতিয়ারউদ্দীন ইতিগীন। এই সুন্দর যুবকটির ব্যবহারে রিজিয়া তার ওপর যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিল। তাকে ঠিক আপন সহোদর ভায়ের মত স্নেহ করতো। যুবকটি ছিল ভীষণ চালাক। লোকের মনের ইচ্ছা টপ্ করে সে বুঝতে পারতো। আর সেইজন্যে রিজিয়া তাকে যথেষ্ট কৃপার দৃষ্টিতে দেখতো। কিন্তু যুবকটির একটি মারাত্মক দোষ ছিল, সুন্দরী বাঁদীদের দেখলে লোলুপ হয়ে চেয়ে থাকত তাদের দিকে। ইতিগীনের এই দোষ রিজিয়ার দৃষ্টি এড়ায়নি। মৃদু হেসে রিজিয়া ইতিগীনকে ঘাতকের শাণিত কৃপাণ দেখিয়ে বলেছে: 'ওদিকে দৃষ্টি দিও না, উচ্ছৃঙ্খলতার শাস্তি আমি কেমন দিই আশা করি তুমি তার প্রমাণ পেয়েছো।'

তবু ইতিগীনকে রাজিয়ার ভাল লাগে। যুবকটি সুন্দর। বয়স কম। ছেলেমানুষের একটি চঞ্চলতা তাকে ঘিরে সর্বদা খেলা করে। ছেলেটি বিলাসী। আতরের সুরভি মেখে সর্বদা মূল্যবান পাতলুন, পাঞ্জাবী পরে মাথায় জরির টুপি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বাঁদীদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে। সুন্দর সুন্দর কথার তুবড়ীবাজী করে তাদের হাসায়। রিজিয়াও তার কথা শুনে হাসে। ইতিগীন সুলতানার রাজসিংহাসনের মর্যাদাকে এতটুকু ভয় করে না। সম্ভ্রম অবশ্য করে, তবে সিংহাসনকে নয় রিজিয়ার অপরূপ সৌন্দর্যকে। রিজিয়া সেইজন্যে এই ছেলেটির বেয়াদপি নীরবে সহ্য করে। এমনটি তো কেউ সাহস করে বলে না?

এই দুঃসাহসের জন্যেই রিজিয়া ইতিগীনকে ভিন্নভাবে স্নেহ করে। যখন রাজ্যের ছোট বড় সবাই হুজুর হুজুর করে তাকে সম্ভ্রম করছে, সেইসময় ইতিগীনের দুঃসাহসিক আত্মীয়তা তাকে যেন নতুন এক আস্বাদ দান করে।

ইতিগীনকে এনেছিল তারই এক তুর্কী-সৈনিক। সৈনিকের কিরকম সম্পর্কে আত্মীয় হয় যেন। ইতিগীনকে এনেছিল একটি কাজের জন্য। সুলতানা যদি ইতিগীনের ব্যবহারে খুশী হয় তাহলে নিশ্চয় তাকে তিনি চাকরী দেবেন। সুলতানা প্রথম-দর্শনে খুশী হয়েছিলেন তা তার মুখের চেহারাতেই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু এযাবৎ ইতিগীনকে রিজিয়া কোন কাজ দেয়নি। ইতিগীন কাজ চাইলেই রিজিয়া হেসে বলেছে: 'কাজ করে তুমি কি করবে? কবিতা লেখো। যদি পাঁচটি ভাল কবিতা লিখতে পার তাহলে তুমি একশো আসরফি পুরস্কার পাবে।' ইতিগীন পাঁচটি কবিতা লিখে রিজিয়াকে শুনিয়েছে। রিজিয়া ইতিগীনের কবিতার ভাষা শুনে হেসে লুটোপুটি।

ইতিগীন কবিতা লিখেছে বেগম-মহলের পাঁচটি সুন্দরী বাঁদীর প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে। বর্ণনাগুলি এমনিই উৎকট ও নির্লজ্জ যে রিজিয়ার রমণীয় মুখমণ্ডলে লজ্জার ছায়া পড়েছে। ইতিগীন ছেলেমানুষ। তার মনে যে ঘোরানো কোন ধারণা নেই, অকপটে যা দেখেছে, যা বুঝেছে তাই বর্ণনা করেছে। যদি বোধশক্তি থাকতো তাহলে কখনই এই নির্লজ্জ বর্ণনাগুলি উদাত্তস্বরে চীৎকার করে সুলতানাকে শোনাতো না। সুলতানা যে বেয়াদপি সহ্য করবে না শাস্তির জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করবে এ ইতিগীন ভাল করেই জানে।

তাই রিজিয়া ইতিগীনের কবিতা পাঁচটি শুনে হাসতে হাসতে মনে মনে ইতিগীনকে ক্ষমা করলো কিন্তু মুখে বললো : কবিতা লিখে আর বাঁদীদের দেহ-সৌন্দর্য দেখে দিন চালালে তো চলবে না, রণকৌশল আয়ত্ত করতে হবে। তরবারী চালোনোর কৌশল শিখতে হবে। কাল থেকে মহম্মদের কাছে তালিম নেবার চেষ্টা করো।

ইতিগীন ভাবলো, বোধহয় সুলতানার কবিতা ভাল লাগে নি বলে এই হুকুম। তাই একান্ত করুণ হয়ে রিজিয়ার গম্ভীর-মুখের দিকে চেয়ে কাঁদ কাঁদ স্বরে বললো : শাস্তি।

না শাস্তি নয়। একশো আসরফি তোমার পাওনা হয়েছে।

তবে ?

তুমি নওজোয়ান। তোমার শক্তি আছে। সেই শক্তি বাজে কাজে নষ্ট না করে রণকৌশল আয়ত্ব করো।

কবিতা লেখা বাজে কাজ ?

একটু থমকে দাঁড়ালো রিজিয়া। কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস শিল্পত্বের শ্রেষ্ঠ অবদান। পিতা আলতামাসও এই শিল্পকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। সেইজন্যে তার রাজপ্রাসাদ অলঙ্কিত করেছিল কয়েকজন কাব্যানুরাগী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি। তিনি অনেকের মাসোহারা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করে গেছেন। এখনও অনেকের মাসোহারা নিয়মিত রাজকোষ থেকে বিতরিত হয়। তাদের অনেককে চেনে না রিজিয়া। আবার কাউকে কাউকে চেনে। তাদের অনেকে মাঝে মাঝে আসে। রিজিয়া তাদের শ্রদ্ধা করে। পিতা আলতামাস বলতেন : খেটে-খুটে, পরিশ্রম করে, রণকৌশল আয়ত্ত করে সাম্রাজ্য বানানো যায় কিন্তু সাহিত্যকে খেটে-খুটে তৈরী করা যায় না। ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা না থাকলে কাব্যানুরাগ বা সাহিত্যানুরাগ জন্মায় না। সেইজন্যে যারা এসব করেন তাঁরা নমস্য ব্যক্তি। তাঁদের কখনও অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়। আলতামাস জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কখনও এঁদের অশ্রদ্ধা করেননি।

রিজিয়াও তাই অশ্রদ্ধা করতো না। সাহিত্যানুরাগী, কাব্যানুরাগী ব্যক্তিদের সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতো। তাঁদের মাসোহারা দিয়ে তাঁদের সম্মান অক্ষুন্ন রাখতো। তাই ইতিগীনের কথাতে সে একটু চমকালো। তারপর হেসে বললো—না। তবে এ ছাড়াও কিছু রণকৌশল শেখো। কোন কোন সময় তো দরকার হতে পারে।

বেশ কিছুদিন ধরে তাই রিজিয়ার কথায় বাধ্য হয়ে অসি-চালনা, তীর-ধনুক ছোঁড়া, নানান রণকৌশল ইতিগীন শিক্ষা করে। শিক্ষার মাঝখানে একদিন শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে ইতিগীনের অসি-চালনা দেখে রিজিয়া খুশী হয়ে তাকে বাহবা দিয়ে বলে : কবিতা লেখাতেও তুমি যেমন পটু, অসি-চালনাতেও।

সেই ইতিগীন এতদিনে একজন ভাল যোদ্ধা হয়ে উঠেছে। এখন সে যে হাতে কবিতা লেখে সেই হাতে অসি-চালনাতেও সিদ্ধহস্ত। এবার এই ইতিগীনকে কাজে লাগাতে হবে।

রিজিয়া চিন্তাই করে রেখেছিল। ইতিগীনকে রাজপ্রাসাদের পরিদর্শক করে দিতে হবে। এই কাজই তার উপযুক্ত। রাজপ্রাসাদকে শত্রুর হাত থেকে সাবধানে রাখবার একমাত্র লোক এই ইতিগীন। এখন সে একজন বড় যোদ্ধা। অসির আঘাতে কিছু লোককে আহত করবার শক্তি তার হয়েছে। তা'ছাড়া এর মধ্যে সে প্রাসাদের বিভিন্ন মহলে অবারিত প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়েছিল। এমন কি রিজিয়ার খাসমহলে যখন তখন প্রবেশ করলেও রিজিয়া কিছু বলে না। রিজিয়া ইতিগীনকে দারুণ বিশ্বাস করতো। একজন পুরুষের এমনি অন্দরমহলে যাতায়াত নিয়ে আমীর-ওমরাহরা রিজিয়ার নিন্দা করতো। কিন্তু রিজিয়া সে সব কথায় কর্ণপাত করতো না। রিজিয়ার একটি গুণ ছিল, সে যে-টা উচিত মনে করতো, সেটার ওপর যত বাধা বিপত্তি আসুক সে তা অগ্রাহ্য করে যেত। তেমনি ইতিগীনের ব্যাপার। ইতিগীন যে দুশ্চরিত্র নয় বা তার যে অন্য কোন দোষ নেই—তা জানতো রিজিয়া। তাই জানতো বলেই রিজিয়া ইতিগীনের অবাধ স্বাধীনতায় এতটুকু বাঁধা দেয় নি। তা ছাড়া ছেলেটিকে তার ভীষণ ভাল লাগতো। এমন সহজ সরল একটি ছেলেকে পাওয়া বড় দুষ্কর।

রিজিয়ার আপন বলতে পৃথিবীতে কেউ ছিল না। বাবা, মা অনেকদিন আগেই গত হয়েছেন। এক আছে, বৈমাত্রেয় ভাই ও বোন। কিন্তু তাদের সঙ্গে রিজিয়ার কোন সম্পর্ক নেই। রিজিয়ার সিংহাসন প্রাপ্তিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে তারা সমস্ত সদ্ভাব ছিন্ন করে দিয়েছে। সেই নিরানন্দ মনে ইতিগীনের এই উচ্ছল প্রাণের সঙ্গ যেন রিজিয়ার গুরুগম্ভীর রাজকার্যকে অনেক সহজ করে দেয়। সেইজন্য রিজিয়া ইতিগীনের বেয়াদপি সহ্য করেও তার আগমন প্রতীক্ষা করে। সে এলে তার প্রাণে কিছুক্ষণের জন্যে হাসির উৎস আসে।

সেই ইতিগীনকে এবার গুরুদায়িত্বের ভার দিতে হবে। রাজপ্রাসাদের পরিদর্শক।

মনে মনে হাসে রিজিয়া। ইতিগীনের এবার বাঁদীমহলে যাতায়াত আরও বেড়ে যাবে। তা যাক্। তবু যুবকটিকে প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। অন্ততঃ রিজিয়ার নিমকের বেইমানি করবে না।

জালাউদ্দীন ইয়াকুতকে অশ্বশালা ও হাতিশালার অধ্যক্ষ ও রিজিয়ার পার্শ্বচর নিযুক্ত করার দিন ইতিগীনকেও রিজিয়া রাজপ্রাসাদের পরিরক্ষক নিযুক্ত করে দিলো। দুটি সম্মানীয় ও দায়িত্বপূর্ণ পদগৌরব দুটি অপরিচিত লোকের ওপর ন্যস্ত হতে আমীর-ওমরাহরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু রিজিয়া অটল। সে যা হুকুম দেয় তার যে নড়চড় হয় না—সকলেই তা জানে। তা ছাড়া রিজিয়ার কঠোর রাজ্যশাসন পরিচালনা কারও মতের অপেক্ষা রাখে না। আর এ ছাড়া মনে মনে সে জানে—ইয়াকুত বিদেশী। তাকে এত বড় গুরুদায়িত্ব দিলে রাজন্যবর্গরা কত ক্ষিপ্ত হবে। তা ছাড়া এই বিদেশী মুসাফেরের বেয়াদপি উন্মুক্ত রাজদরবারে প্রমাণিত হয়ে গেছে। সে চায় সুলতানার পাণিগ্রহণ করতে। সেই বিদেশী মুসাফেরকে প্রাণদণ্ডের আদেশ

না দিয়ে তাকে সম্মানীয় পদমর্যাদা দিয়ে ভূষিত করা হলো। তাই রাজন্যবর্গরা অন্তরালের আসল অর্থটি উপলব্ধি করে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।

একদিকে ইত্তিগীন। যাকে রিজিয়া ছাড়া কেউ পছন্দ করে না। সে হল রাজপ্রাসাদ পরিরক্ষক। আর একদিকে ইয়াকুত—বিদেশী মুসাফের। ইত্তিগীনকে জড়িয়ে আমীর-ওমরাহরা রিজিয়ার নামে আগেই অনেক দুর্ণাম ছড়াতো। এখন ইয়াকুত এসে উপস্থিত হলো। রিজিয়ার কুমারী জীবনে যে দুটি পুরুষ কুমারী নামের অবমাননা করে তাকে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—রিজিয়া যে আর ভাল নেই, সে তার বৈমাত্রেয় ভায়েদের পথ অনুসরণ করেছে—ইত্যাদি, ইত্যাদি অনেক দুর্ণাম চারিদিকে রটনা হয়ে রিজিয়ার সম্মানকে ধূলায় মিশিয়ে দিলো।

আর রিজিয়া। রিজিয়া রাতের রহস্যলোকে অন্ধকারময় বাতায়নে দাঁড়িয়ে নির্ঘুম দুটি চোখে আকাশের খণ্ড খণ্ড মেঘের দিকে তাকিয়ে ভাবে সে তাহলে সত্যিই নারী। নারীত্বের কামনা বাসনা নিয়েই তার জন্ম। রমণী হৃদয়শোণিতে যে পুরুষের স্পর্শ লোলুপ হয়ে তাকে সমস্ত কর্তব্যের উপরে তোলে, রিজিয়া আজ তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। আজ তার মন ইয়াকুতের জন্যে ব্যাকুল।

ইয়াকুতের ঐ বলিষ্ঠ দুই বাহুর মাঝে নিজেকে সমর্পণ করতে পারলে যেন হৃদয়ের বিক্ষুব্ধভাব চিরতরে শান্ত হতো। হৃদয় যেন আজ উন্মুক্ত হয়ে ইয়াকুতের সোহাগ পেতে চায়। ইয়াকুত! ইয়াকুত! বিদেশী মুসাফের। সে আজ ভাগ্যগুণে তুর্কী-সুলতানা রিজিয়ার প্রণয়ী। ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে—রিজিয়া একজন নারী হয়ে রাজ্যপরিচালনার যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তা জগতে অবিস্মরণীয়। কিন্তু রিজিয়া যে রমণী। রমণীর আসল ধর্ম পুরুষের ভালবাসা। রিজিয়া রমণীর ধর্মকে এড়িয়ে নিজেকে পরিবর্তিত করতে পারেনি। সে হেরে গেছে। সে পরাজিতা।

আজ দীর্ঘ পঁচিশ বছরের জীবনে যে একাগ্রতা, যে সহিষ্ণুতা তাকে একটিমাত্র লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সে সুলতানা হবে। সে সিংহাসনে বসবে। সে অশ্বের পিঠে চড়ে অসি হাতে যুদ্ধ করবে। বড় বড় যোদ্ধারা তার শক্তি দেখে মাথা নত করে বশ্যতা স্বীকার করবে। অবাক হয়ে তারা ভাববে, খোদা এই নারীকে কি ধাতুতে তৈরী করে পাঠিয়েছেন! সে পুরুষ নয়। সামান্য একজন কোমলা নারী। যাকে একটা ধমক দিলে সে কেঁদে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে; সেই কোমলা নারী পুরুষের চেয়েও ভয়ঙ্কর কঠিন হয়ে রাজ্যপরিচালনা করছে। পরাজিত রাজ্যকে নিজের মুঠোর মধ্যে রেখে বশীভূত করে রাখছে।

রিজিয়া এতদিন ধরে যে সঙ্কল্প করেছিল, সে সঙ্কল্প তার আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। আজ সে সমগ্র উত্তর ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি। বড় বড় রাজন্যবর্গরা আজ তার বশীভূত। তারা বিস্মিত—রিজিয়ার রাজ্যপরিচালনা দেখে। রিজিয়া রমণী-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে। রমণী যে ভীরু, রমণী যে কোমলা, রমণী যে ক্ষীণাঙ্গী, দুর্ণাম ঘুচিয়ে অসিহাতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রমাণ করে দিয়েছে সে রমণী হলেও, রমণীর দুর্ণামের বাইরে তার বিচরণ।

কিন্তু বিদেশী মুসাফের ইয়াকুত এসেই তার সব প্রতিজ্ঞা লয় করে দিল।

ইয়াকুতের ঐ বলিষ্ঠ বাহু দেখে তার রমণী-হৃদয়ের কামনা বাসনা জেগে উঠলো। সে পুরুষের বেশে রাজ্য পরিচালনা করে। কিন্তু পুরুষের বেশ শরীরে থাকলেও সে যে নারী—তার দেহের শোণিতে যে উষ্ণ রমণীরক্ত। তার দেহে যে যৌবনের সবকিছু উপাচার থরে থরে সাজানো—তাকে অস্বীকার করবে কেমন করে?

কিন্তু আজ এত পরে এল কেন? জীবনের প্রথমারম্ভে যখন যৌবনের উপকরণ থরে থরে দেহের উপর মহামূল্য রত্নরাজির মত জ্যোতিপ্রবাহ নিয়ে সজ্জিত হয়েছিল তখন এসেছিল ইস্কান্দার। কিন্তু ইস্কান্দার ভীরু। দুঃসাহসিক ছিল না। যদি দুঃসাহসিক হতো তাহলে রিজিয়ার যৌবনকে সে অপহরণ না করে এমনি ছেড়ে দিতো না। ইস্কান্দার জানতো সে মরবে। কিন্তু মরবার আগে যদি সে রিজিয়াকে নিঃশেষ করে দিয়ে যেতে পারতো তবে তার মরা সার্থক হতো।

আজ রিজিয়া তাই ভাবে: সেদিন ইস্কান্দার মেয়েমানুষের মত ভালবাসার গান শুনিয়েছিল। বলিষ্ঠ হাতে ছিনিয়ে নিতে পারেনি। বলিষ্ঠ হাতে যদি সেদিন ছিনিয়ে নিত তাহলে কি আজকে রিজিয়ার জীবনে বর্তমানের ইতিহাস তৈরী হতো। হয়ত ইস্কান্দারের বলিষ্ঠতায় তার সর্বস্ব ইস্কান্দারের বাহুর মধ্যে বদ্ধ হয়ে যেত। তারপর তারা পালিয়ে যেত দিল্লী থেকে বহুদূরে। রিজিয়ার সিংহাসনের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হতো।

কিন্তু জীবনের সেই প্রারম্ভে ইস্কান্দার তাকে তেমন করে ভোগ করলো না। সে পিছলে যেতে কর্তব্য বলিষ্ঠতার রূপ নিলো। সে সিংহাসনের জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করলো। যৌবনকে দেহের রূপেই পরিবর্তিত করলো। মনের প্রতিক্রিয়া হলো না। যৌবন দেহে এসে একসময় বিদায় নিয়ে গেল। রাজকার্যের ফাঁকে ফাঁকে রিজিয়া বুঝতে পেরেছে, যৌবনের চলে যাওয়ার সময় এসেছে। বুকের যন্ত্রণাটা বড় প্রকট। কিন্তু উপায় নেই।

সহসা চমক। কর্তব্যে গম্ভীর, শাসনে কঠোর রিজিয়ার মনে হঠাৎ যেন কে এসে সেই যৌবনের বিদায়ের মুহূর্তে জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। সে চমকে উঠলো হঠাৎ অন্ধকারে প্রজ্জ্বলিত উল্কার মত আলোর ধূমকেতু দেখে। পরমুহূর্তে তার মনে পড়লো সে নারী।

কিন্তু সে নারী হলেও সে সুলতানা। সমস্ত রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী সে। তার একটি অঙ্গুলি হেলানে শ' শ' লোকের প্রাণ সমর্পণ করতে হয়। সে যেমন নিজে অন্যায় করতে পারে না তেমনি কেউ অন্যায় করলে তার শাস্তি—মৃত্যু।

সেইজন্যে তাকেও অনেক কর্তব্য মেনে চলতে হয়। রাজ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা কমাবার জন্যে বিয়ে-শাদী উৎসব বন্ধ করে দিয়েছে। অবশ্য তার মধ্যে আরও একটি অর্থ ছিল। বিয়ে-শাদী বন্ধ করার অর্থ—রিজিয়ার ঈর্ষা। রমণীর রমণীয় মনের পরিচয় এখানে প্রকাশ হয়েছে। রিজিয়া নিজে কখনও শাদী করতে পারবে না বলে রাজ্যে বিয়ে-শাদী বন্ধ থাকবে এমনি একটি হুকুম যেন মনে মনে সে প্রচার করেছিল। এমন

কি রিজিয়ার এই উৎসব বন্ধ করার পিছনের যে গোপন অর্থ—সে অর্থ সবার চোখে ধরা পড়ে গেছে।

তবে কি রিজিয়া দিনের পর দিন বিকৃতমনা হয়ে উঠছিল? সে ভাবতে লাগলো শুধু বিয়ে-শাদী সে বন্ধ করে নি। নাচ, গান, হৈ-হল্লা। খুশীর যে কটা ইন্ধন আছে সব কটি রিজিয়া বন্ধ করে রাজ্যে ত্রাস আনতে চেয়েছিল। আজ দরবারে ইয়াকুত ও ইতিগীনকে পদগৌরবে ভূষিত করে সে সব হুকুম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। রাজ্যে নাচ, গান, হাসি, উৎসব অনাবিলভাবে আবার ফোয়ারা ছুটিয়েছে।

বাতায়নের সামনে দাঁড়িয়েই সে শুনতে পাচ্ছে। প্রাসাদের বাইরে দিল্লীর বিভিন্ন সম্ভ্রান্তের বাড়ীতে গানের মহড়া বসেছে। হয়ত যৌবন-চঞ্চল কোন নর্তকী পায়ে ঘুঙুর বেঁধে চটুল চাউনি নিয়ে অনেকদিন পরে আসরে নেমে সুধীজনের বাহবা কুড়োচ্ছে। রাজ্যের চারিদিকে যেন আবার অনাবিল আনন্দের বন্যা ছুটেছে। সেরাজীসরাবের উচ্ছল স্রোত রিজিয়ার শাসিত-রাজ্যের চারিদিকে আবার মায়া-মোহ দেহ বিস্তার করে অভিসার রচনা করেছে।

তবু রিজিয়া আজ খুশী হয়েছিল। খুশী হয়েছে এইজন্যে যে সে তার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এতদিন ধরে যে মারাত্মক নিষেধাজ্ঞা দিয়ে সমস্ত উৎসব, গান, বাজনা, মানুষের যে সব খুশীর ইন্ধন ছিল, সব বন্ধ করে দিয়েছিল। যে জন্যে দিয়েছিল আজ তার মুক্তি হয়েছে। রিজিয়া আজ নিজেও উৎসব চায়। রিজিয়া নিজেও খুশীর বন্যায় নিজে ভেসে যেতে চায়। আজ তার রমণীর রমণীয় মন সম্পূর্ণ। সে আর এখন সুলতানা নয়। সে এখন রমণী। একটি বলিষ্ঠ পুরুষের বাহুর সুনিবিড় আলিঙ্গন কামনা করে। তার হৃদয়ে এসেছে গান। তার হৃদয়ের তারের যন্ত্রে সুর বাজতে শুরু করেছে। সে সঙ্গীত-পিপাসু হয়ে উঠেছে। তার অন্তরে যেন ছন্দের একটি নিটোল ঘূর্ণী পাক খেয়ে খেয়ে তাকে নর্তকী করে তুলেছে।

●
● ●

কিন্তু হঠাৎ তার চমক ভাঙলো নগর প্রদক্ষিণের সময় কয়েকজন নগরবাসীর উচ্চৈঃস্বরের আলাপন শুনে। তখনই তার মনে হয়েছিল ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঐ নগরবাসীর গাত্রবর্ণ চাবুকের আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করে দেয়। এতদূর স্পর্ধা এই কুক্কুটদলের। তারা সমালোচনা করে উত্তর ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি সুলতানা রিজিয়ার? যে রমণী হয়েও সহস্র পুরুষের মত শক্তি ধরে রাজ্য পরিচালনা করে, তার কাজের সমালোচনা করে এই বেতমিজ বেওকুফের দল।

নবনিযুক্ত অশ্বপাল জালাউদ্দীন ইয়াকুত পাশেই ছিল। ইয়াকুত তাকে তার বলিষ্ঠ দুই-বাহু দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরে অশ্বের পৃষ্ঠে তুলে দিয়েছিল। ইয়াকুতের

হাতের স্পর্শে রিজিয়ার শরীরে শিহরণ জেগেছিল। স্বাভাবিক লজ্জায় তার মুখমণ্ডল আরক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে বেশীক্ষণ নয়। আবার সহজ হতেও তার বেশী সময় লাগে নি।

রিজিয়া সুলতান-বাদশাহ্‌দের নিয়মটি মেনে নিয়েছিল। আগে অবশ্য অশ্বের পিঠে উঠতো একটি উঁচু প্লাটফর্মের ওপর উঠে। আর সাহায্য নিতো প্রধানা-বাঁদী ফিরোজার কিংবা অন্যান্য কোন বাঁদীর। পুরুষ কেউ তাকে স্পর্শ করতো না। অবশ্য এ কাজটি অশ্বপালের। অশ্বপালের কর্তব্য সুলতানকে অশ্বের পিঠে উঠিয়ে দিতে সাহায্য করা। কিন্তু রিজিয়া অশ্বপালের কোন সাহায্য নিতো না।

ইয়াকুতকে যখন সে অশ্বপাল নিযুক্ত করে তখন তার মনে পড়ে যায় অশ্বপালের কর্তব্যটি। মনে মনে সেই থেকেই রিজিয়া রোমাঞ্চিত হয়েছিল। তারপর যখন রিজিয়া অশ্বপালকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করে দেয় তখন ইয়াকুত চমকে বারকয়েক ইতস্তত করে। কিন্তু সুলতানার হুকুম। তার অধীনস্থর পালন করা অবশ্য কর্তব্য। রিজিয়া মনে মনে হাসে তার গোপন অভিসন্ধির কথা ভেবে। ইয়াকুতকে যখনই তার ভাল লেগেছিল তখনই সে যে তাকে অশ্বপাল নিযুক্ত করেছিল এবং অশ্বপাল নিযুক্ত করার পরের ভূমিকা যে এইটি—এসব চিন্তা রিজিয়া অনেক আগেই করে রেখেছিল। ইয়াকুত তার বলিষ্ঠ হাতের বেষ্টনে তাকে জড়িয়ে ধরে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে দেবে। আর তার শরীরের স্পর্শে দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে। অতৃপ্ত হৃদয়ে পুলক এসে কানায় কানায় ভরে দেবে। এসব চিন্তা সে অনেক আগেই করে রেখেছিল। তাই যখন সে আমীর-ওমরাহের সামনে ইয়াকুতের বেষ্টনে অশ্বের পিঠের ওপর উঠে বসলো তখন কোনদিকে একবারও সে তাকিয়ে দেখলো না। যেটুকু লজ্জা তাকে ঘিরে খেলা করলো, তারা খুব বেশী অনুগ্রহ না পেয়ে সরে গেল আস্তে আস্তে। রিজিয়া হৃদয়কে যথেষ্টভাবে সংযত করে অশ্বের বল্গা ধরে তাকে সামনের দিকে ছুটিয়ে দিলো। পাশে অশ্বপাল ইয়াকুত। পিছনে আরও কয়েকজন দেহরক্ষী।

রিজিয়া বুঝতে পারলো—আমীর-ওমরাহ, মন্ত্রী-সেনাপতি, রাজন্যবর্গরা সুলতানার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেছে। হাঁ করে তারা রিজিয়ার নবতম আচরণটি তলিয়ে ভাববার চেষ্টা করছে। তারপর রিজিয়া একটু এগিয়ে গেলে হঠাৎ তার কানে গেল —আমীর-ওমরাহদের মধ্যে থেকে কে একজন বলছে—আরও কত দেখবে দ্যাখো। এই তো সবে শুরু।

অন্য একজন তার কথার জের টেনে বলল—শেষকালে একটা হাবসী এমনি সুন্দরীর কৃপা পেলো!

সবই খোদার ইচ্ছা। একেই বলে আল্লা যাকে দেন তাকে ছপ্পড় ভরে দেন।

কথাগুলো হয়ত খুব খারাপ নয়। কিন্তু রিজিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ইচ্ছে করলো অশ্বের মুখ ঘুরিয়ে ছুটে যায় ঐ নিন্দুকদের কাছে। যারা তার সমালোচনায় সময় অপব্যয় করছে। তারা ভেবেছে কি? রিজিয়া রমণী বলে তার কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকবে না? সুলতান হলে তার হারেমে অজস্র বেগম এসে জুটতো।

আর সে রমণী বলে, সুলতানা বলে, সে নীরস জীবন যাপন করবে। তার ভাল লাগলে সে ভাল-লাগা নিয়ে মরমে মরে থাকবে।

এতদিন সে রাজ্যের জন্যে, রাজকার্যের জন্যে, সিংহাসনকে বিদ্রোহীর হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে কঠিন মনে কর্তব্য পালন করেছে। এতদিন পর তার রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয়েছে। এখন যদি সে অন্যদিকে একটু মন দেয়। একটু যদি নিজে বিলাসী হয়ে ওঠে তার জন্য এরা সমালোচনা করবে কেন? সুলতান হলে বিলাসী হতো না! সুলতানা বলে বুঝি সে বিলাসিনী হতে পারে না! সুলতানা রমণী বলে বুঝি তার ইচ্ছার কোন মূল্য নেই!

অশ্বের পিঠে চড়ে যেতে যেতে মনের মধ্যে এইসব কথা রোমন্থন করে রিজিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। কঠিন হয়ে উঠলো তার মুখ। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো এইসব মুখোসধারী রাজপ্রতিনিধিদের সুযোগ পেলেই শায়েস্তা করতে হবে। কোনরকম ক্ষমা নেই।

তখনকার দিনে দিল্লীর নগরপথে রমণী সুলতানা রিজিয়া নগর প্রদক্ষিণ করতে বেরোলে নগরবাসীদের মধ্যে একটা কৌতূহলের সাড়া পড়ে যেত। কাতারে কাতারে নগরবাসী পথের ওপর দাঁড়িয়ে সুলতানা রিজিয়াকে দুচোখ ভরে দেখতো। তারা অবাক হয়ে ভাবতো—সামান্য একটি রমণী। রমণী অলঙ্কারের মত ঘরের সৌন্দর্যই বাড়ায়। তাদের আব্রু নষ্ট হলে রমণীর ইজ্জত থাকে না। তারা দেওয়ানা হয়ে যায়। সেই রমণী ঘরের বার হয়ে সহস্র পুরুষের চোখের সামনে নিজেকে মেলে দিয়ে সিংহাসনে বসে রাজকার্য করছে। একটু কেন—বেশ অবাক লাগে বৈকী! সেইজন্যে তারা দেখতো দুচোখ ভরে।

কিন্তু এদিন দেখে রিজিয়ার অবাক লাগলো—আজ পথে অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী লোক। নগরের ঘরবাড়ীর জানলা-দরজার কপাটের ফাঁক দিয়ে রমণীরা উৎসুক নয়নে রিজিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। রিজিয়া বুঝতে পারলো—ওদের কৌতূহলের কারণ কি? এর মধ্যে যে সংবাদটা রাজদরবার থেকে নগরে নগরে রঙীন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে—এই লোক সমাগমই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

পাশে ইয়াকুত। বিরাট চেহারা। ছ'ফুট লম্বা, পঞ্চান্ন ইঞ্চি ছাতি। অশ্বপালের বিরাট চেহারা ও তার সঙ্গে পোষাকের জাঁকজমক—মানিয়েছে বড় চমৎকার। আর রিজিয়ার পরণে পুরুষের বেশ। মাথায় টুপী, গায়ে কোর্তা, কটিতে তরবারি। এই বেশে রিজিয়া প্রত্যহ নগরে ঘুরে বেড়ায়। এদিনও এসেছিল এই বেশে। ইচ্ছে ছিল রমণীর পরিচ্ছদেই ইয়াকুতের পাশে পাশে চলে। কিন্তু রমণীর পরিচ্ছদে ঘোড়ায় চড়া অসুবিধে বলেই ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। অশ্বের পিঠে চড়ে দিল্লীর প্রথম সুলতানা রিজিয়া সগর্বে বক্ষ দৃঢ় করে সমান গতিতে এগিয়ে চলেছে সম্মুখদিকে। অগণিত নগরবাসী রিজিয়ার দিকে কুর্নিশ করে মাথা নত করে।

রিজিয়ার মুখে মৃদু হাসি। সে প্রশান্ত মুখে নগরবাসীর কুর্নিশ গ্রহণ করতে করতে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। মাঝে মাঝে রিজিয়া মৃদুস্বরে পাশে চলমান

ইয়াকুতকে বুঝিয়ে দিচ্ছে নগরের বিভিন্ন স্থান। ইয়াকুত পদমর্যাদার গাম্ভীর্য নিয়ে মাথা নেড়ে সুলতানার সম্মান রক্ষা করছে।

হঠাৎ এক জায়গায় একটি জটলা। কয়েকটি নগরবাসী আলাপনে ব্যস্ত। তারা এত জোরে তর্ক বিতর্ক করছিল যে তাদের সোচ্চার কণ্ঠস্বর শুনে রিজিয়াকে একস্থানে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানা আছে। সুলতানা রিজিয়া রাত কাটায় একা তার মহলে! বাপ, দাদারা বেগম-মহল, বাঁদীমহল নিঃশেষ করে গেল—আর সাধু মেয়ে এসেছে সুলতানা রিজিয়া।

এই যে ঐ হাবশী লোকটা। যার গুণ্ডার মত চেহারা তাই দেখে রিজিয়ার ভাল লাগলো। আসল কথাটা বুঝতে পারলে না হে—সুলতানা একটু শক্তিমান লোকের সঙ্গে মহব্বত করতে পছন্দ করে। শক্তিমান লোক এসে তাকে পিষে ধরলে শক্তিময়ী সুলতানার উষ্ণরক্তের কামনা নির্বাপিত হয়।

তারপর লোকগুলো হো হো করে পাগলের মত হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে বললো—সুলতানা আমাদের চেয়ে ধড়িবাজ চালাক। দেখলে না সেই হাবশী-গুণ্ডাটাকে তার ভাল লাগলো অমনি রাজ্য থেকে উৎসবের পরোয়ানা তুলে নিয়ে নিজে উৎসবে লেগে পড়লো। এবার দেখবে 'খুসকৃফিরোজী' প্রাসাদের রাতের চোখে ঘুম আসবে না। আবার তারা হো হো করে হেসে উঠলো।

রিজিয়া মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এল প্রাসাদে। তারপর উজীরপ্রবর খাজা মুহজুব্‌কে ডেকে আদেশ দিলো—খুসকৃফিরোজী প্রাসাদের চারিদিক আলোর মালায় ভরিয়ে দিন। জায়গায় জায়গায় গোলাপ জলের ফোয়ারা বসিয়ে সুগন্ধে চারিদিক আমোদ করিয়ে দিন। আতরদানে আতর দিন। রক্তরাগ ভেলভেটে চারিদিক মুড়ে দিন। নর্তকীমহল থেকে শ্রেষ্ঠ নর্তকী নিয়ে এসে প্রাসাদের প্রাঙ্গণে নাচের আয়োজন করে দিন। প্রচুর সুগন্ধী সেরাজীসরাব পাঠিয়ে দিয়ে আমার সুলতানা মর্যাদাকে সেলাম জানান।

উজীরপ্রবর খাজা মুহজুব সেলাম জানিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটলো সেই সব আয়োজন করতে। কিছুক্ষণের মধ্যে আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গেল। ইতিগীন রিজিয়ার প্রাসাদে এসে এই সব আয়োজন দেখে খুশী হয়ে উঠলো। রিজিয়াকে সেলাম জানিয়ে বললো—বহুৎ মেহেরবাণী সুলতানা বিবি। আজ বুঝতে পাচ্ছি সুলতানার ভি দিল মজুত আছে।

রিজিয়া মৃদুহেসে ইতিগীনকে সমর্থন করে মাথা নাড়লো। তার মনে তখনও জ্বলছিল নগরবাসীর সেই বিশ্রী-ইঙ্গিতপূর্ণ কথাগুলি। একজন সুলতানা। হোক সে রমণী। তবু সে একচ্ছত্র অধিপতি এই সমগ্র রাজ্যের। তার হাতে রাজদণ্ড থাকা সত্ত্বেও কেউ তাকে ভয় করে না? নগরবাসীরা যা খুশী তাই তার নামে চিন্তা করে রাজ্যে রটনা করে। আর তাই তারা বিশ্বাস করে। সে বেশ্যার মত সবার কাছে হেয়। তার কোন সম্মান নেই।

সেদিন খুসক্‌ফিরোজী প্রাসাদে তাই রাতের অন্ধকারকে গলা টিপে হাজারো বাতির রোশনাই জ্বলে উঠলো। রাজ্যের প্রধানা নর্তকী আসরে এসে মিঠে কণ্ঠে গানের সাথে পায়ের মৃদুল-ছন্দে নাচের ঢেউ বইয়ে দিলো। রিজিয়া আসরে বসে সেরাজী সরাবের গেলাস মুখে তুলে আসরফির থলিয়া ছুঁড়ে দিল নর্তকীর দিকে। সেরাজী নেশায় বুঁদ হয়ে চীৎকার করে 'বাহবা' দিল। ইতিগীন আরও উত্তাল নাচের জন্য সেরা সেরা নর্তকী আসরে নিয়ে এসে হাজির করলো।

খুসক্‌ফিরোজী প্রাসাদের বৈধব্য ঘুচে গিয়ে পাথরে পাথরে যৌবনের উল্লাস জেগে উঠলো। হাজারো বাতির আলোর রোশনাই কেঁপে কেঁপে সুলতানাকে নেশা মদির চোখে নর্তকীর ঘাঘরার ভেতর দিয়ে তার সুন্দর পায়ের কেরামতি দেখতে থাকলো। কাঁচুলি ভেদ করে তার নবপ্রস্ফুটিত সমুদ্র উত্তাল বক্ষের নির্লজ্জ দোলানি দেখতে দেখতে হঠাৎ রিজিয়ার স্বাভাবিক চেতনা চীৎকার করে উঠলো—থামো।

ঘৃণায় রিজিয়ার নিজের রমণী হৃদয়ের অভ্যন্তরে যেন লজ্জার মেদুর স্পর্শ লাগলো। ছিঃ ছিঃ সে কি ভুলে গেল নাকি? সে কি তার ভাইয়ের মত বিকৃত মস্তিষ্ক, উচ্ছৃঙ্খল, বিলাসী হয়ে উঠলো? মনুষ্য সমাজের কলঙ্ক যে ভাইরা। যাদের মানুষেরা ঘৃণার চোখে দেখে। যাদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য পিতা আলতামাস রিজিয়াকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী করতে চেয়েছেন। শেষপর্যন্ত কতকগুলি সামান্য নগরবাসীর ওপর অভিমান করে সে নিজের স্বাভাবিক চেতনাকে বধ করতে বসেছে?

রিজিয়া নাচের আসর তুলে দিয়ে খুসক্‌ফিরোজী প্রাসাদ থেকে সমস্ত বিলাসী আয়োজন সরিয়ে দিয়ে এসে দাঁড়ালো তার সেই নির্দিষ্ট বাতায়নের সামনে।

হঠাৎ তার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরতে লাগলো। ছুটে গেল ঘরে। টেবিলের ওপর রাখা বর্তিকার সামনে বসে সে কোরাণ খুলে চীৎকার করে পড়তে লাগলো—"ইয়ে খোদা আমার হৃদয়ের এ অশান্তি তোমার স্পর্শ দিয়ে শান্ত করে দাও।"

অনেকক্ষণ ধরে চীৎকার করে কোরাণের ধর্মকথা মনের মধ্যে ধরে হৃদয় পবিত্র ও শুদ্ধ করে তুললো। তারপর আবার বাতায়নের কাছে এসে উন্মুক্ত নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে ব্যাকুল দুটি চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইলো।

ফিরোজা কয়েকবার পাশে এসে দাঁড়িয়ে সুলতানার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলো। রিজিয়া বুঝলো, ফিরোজা কি বলতে চায়? কিন্তু ফিরে দাঁড়িয়ে ফিরোজার সঙ্গে কথা বলতে তার ইচ্ছা করলো না। কথা বললে যে মনের অনেক

চেহারা ধরা পড়ে যায়। ধরা পড়ে গেলে ফিরোজা কিছু ভাববে বলে সে চুপ করে থাকলো। ফিরোজা যে রাতের আহারের জন্য বলতে এসেছিল সে কথা বুঝলো রিজিয়া। কিন্তু আহার তার আজকে আর করতে ইচ্ছা নেই। ফিরোজা শুনলে বলতো—কেন নেই? আবার কৈফিয়ৎ দেওয়া। আবার অনেক কথা। কিন্তু কিছুই যে আজ তার বলার নেই।

তখন বোধ হয় অনেক রাত। রজনী তখন কোন্ প্রহরে রিজিয়া জানে না। হঠাৎ তার কানে পৌছলো, প্রাসাদের নহবত চূড়ায় রাত্রি প্রহরের বার্তা ঘোষণা করছে। কিন্তু কত যে সে প্রহর জানবার আগেই ঘণ্টাধ্বনি মিলিয়ে গেল রাতের নিস্তব্ধতায়।

আবার একসময় তন্ময়তার ঘোর কাটলো রিজিয়ার। সেই ফকির করুণাক্ত স্বরে বিনিয়ে বিনিয়ে গান গাইছে। তার গানের কথাগুলি কান্নায় ভেজা। ভোরের শিশিরসিক্ত তৃণখণ্ডের মতো তার কান্নায় ভেজা গানের পরশে হৃদয় কেঁপে কেঁপে ওঠে।

বিরহী বিরহের জ্বালায় নিশিদিন ধরে হৃদয়ের কান্নাকে রাতের নিবিড় অন্ধকারে দূর থেকে সুদূরে যেখানে প্রিয়াকে হারিয়েছে সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছে। যেন রাতের আকাশের বৃন্তে ফুলটি সবে ফুটে উঠেছে। বিরহীর গানে বৃন্তচ্যুত হয়ে ফুলটি মাটিতে ঝরে পড়ে অবহেলায় নিজের দেহকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করছে।

রিজিয়া 'পিথোরা' প্রাসাদের পাশে বিরাট সৌধ কুতুবমীনারের দিকে তাকিয়ে রইলো। অন্ধকারে কুতুবমীনারের সৌধকে যেন দীর্ঘদেহ পূর্বপুরুষ সুলতান কুতুবউদ্দীনের মত দেখাচ্ছে। তবে কি পূর্বপুরুষ সুলতান বুঝতে পারছে তার এই হৃদয়ের জ্বালা? সে যে এই রাতের নিস্তব্ধ প্রহরে নির্ঘুম দুটি চোখ নিয়ে বাতায়নে একা দাঁড়িয়ে আছে কিসের জন্যে?

মার কাছে গল্প শুনেছে রিজিয়া—চৌহানবংশীয় তৃতীয় পৃথ্বীরাজ দিল্লী ও আজমীঢ়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। এই পৃথ্বীরাজ কনৌজ ও বারাণসীর সিংহাসনে গহরবাড়বংশীয় রাজা জয়চন্দ্রের কন্যা অপরূপ সুন্দরী সংযুক্তাকে অপহরণ করে নিয়ে এসে বিবাহ করেন। তখনকার দিনে সমগ্র হিন্দুস্তানে পৃথ্বীরাজের মত এত বড় বীর কেউ ছিল না।

সেই পৃথ্বীরাজই দিল্লীর দক্ষিণে যমুনাতীরে 'রায় পিথোরা' (পৃথ্বীরাজ) নামে এই প্রাসাদ তৈরী করেন ও সংযুক্তার প্রেমকে চিরঅক্ষয় করে রাখবার জন্যে কুতুব-মীনার বলে যে সৌধ আজও বর্তমান আছে সেই সৌধের খানিক অংশ তৈরী করেন। তখনকার শ্রেষ্ঠ বীর শিহাবুদ্দীন মহম্মদ গজনীও কাবুলের অধিকার স্থাপন করে 'তরাইন'-এর যুদ্ধে দিল্লী ও আজমীঢ়ের সিংহাসন পৃথ্বীরাজকে নিহত করে অধিকার করেন।

তারপরই কুতুবউদ্দীন শিহাবুদ্দীনকে পরাজিত করে দিল্লীসাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই কুতুবই পৃথ্বীরাজের সংযুক্তা-স্মৃতিসৌধ বিলুপ্ত করে 'কুতুব-মীনার' বা 'জাম-ই

মসজিদ' তৈরী করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সমাপ্ত হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। শেষে আলতামাস সিংহাসনে বসে অর্ধসমাপ্ত সৌধ সমাপ্ত করে 'কুতুব-মীনার' নাম অক্ষয় করে দেন।

পৃথ্বীরাজের প্রেয়সী সংযুক্তার প্রেমের স্মৃতি আর জগতে চির অক্ষয় হয়ে থাকলো না। কিন্তু রিজিয়া মায়ের কাছে যে গল্প শুনেছিল সে গল্প আজও ভোলেনি।

সংযুক্তা জগতে চির অমর। ইতিহাসে সত্য। অজেয় বীর হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ বীর পৃথ্বীরাজকে ভালবেসে সংযুক্তা পিতৃগৃহ ত্যাগ করতেও বাধ্য হয়েছিল। সে প্রেমকেই প্রাধান্য দিয়েছিল বেশী। বীরকে পূজা করে পিতাকে ভুলতেও সে পিছিয়ে যায়নি। পিতা কনৌজ ও বারাণসীর সিংহাসনে গহরবাড়বংশীয় রাজা জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজকে ধ্বংস করতেও এতটুকু দ্বিধা করেনি। কন্যার জীবনে বৈধব্য আনবার জন্যে তিনি মুসলমান সুলতানের সাহায্য নিয়েছিলেন!

সংযুক্তা তবু ভীত হয়ে পড়েনি। অনুরোধ করেনি পিতাকে। যুদ্ধসাজ নিজে হাতে পরিয়ে দিয়ে স্বামীকে পাঠিয়েছে যুদ্ধে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'তরাইনের' শ্রেষ্ঠ যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হয়ে মহম্মদ ঘোরীর বন্দী হয়।

সংযুক্তা সেদিন একাকী মুসলমান সুলতানের অধীনা না হয়ে যুদ্ধ করেছিল। সেই হিন্দু রমণীর যুদ্ধকৌশল দেখে মুসলমান সুলতান মহম্মদ ঘোরী বিস্মিত হয়েছিলেন। সংযুক্তা ও পৃথ্বীরাজ মুসলমানের হাতেই প্রাণ দিয়েছিল বটে; কিন্তু বীরের মত। দুই বীর পুরুষ ও রমণী শৌর্যের বীর্যের পরিচয় দিয়ে জগতে তাদের প্রেমের নিদর্শন রেখে গেছে। 'সংযুক্তা-পৃথ্বীরাজ উপাখ্যান' সবার মুখে শোনা যায়। তাদের সে প্রেম এই দিল্লীর আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলে প্রতি মানুষের মধ্যেই প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত করে। কিন্তু মুসলমান সুলতানরা প্রেম কাকে বলে—মহব্বত কাকে বলে জানে না। তারা রমণীর দেহ ভোগ করে ভাবে এই বুঝি প্রেমের আসল স্বরূপ। সে নিশ্চয় দারুণ প্রেমিক। কিন্তু তারা জানে না—দিলের মধ্যে যে গুঞ্জরণ ওঠে, কলিজার মধ্যে যে ধুক্‌পুক্ সৃষ্টি হয়, চোখে যে আঁধি লাগে—তার অর্থ কি?

কুতুব-মীনারের দিকে তাকিয়ে সংযুক্তা ও পৃথ্বীরাজের উদ্দেশ্যে রিজিয়া কুর্নিশ করলো। মনে মনে বললো—'আমার হৃদয়ে তোমরা একটু শান্তি এনে দাও।'

ফকির সাহেব গান গাইছে। মীনা মসজিদের প্রাঙ্গণে বসে আল্লাকে ব্যাকুল হয়ে ডাকছে। দরবারী রাগে ফকির আল্লাকে ইনিয়ে বিনিয়ে গানের সুরে আকুল হয়ে ডাকছে। কোরাণ-শরিফের অমৃতময় বাণী ফকিরের কণ্ঠ দিয়ে নিঃসৃত হয়ে

রাতের নিস্তব্ধ ধরিত্রীকে ব্যাকুল করে তুলছে। রিজিয়া কাঁদছে। তার সুন্দর চোখ দুটির কোল বেয়ে অশ্রুধারা ডালিম-রাঙা মসৃণ গালের ওপর দিয়ে গণ্ডে নেমে যাচ্ছে। কি অসহনীয় জ্বালা। আগুনের দীপ্তি চোখের তারায়। মনের মধ্যে একবার জাগছে বীরের শক্তি। সিংহাসন অরক্ষিত রাখবার জন্যে শত্রু নিধনের বল। আবার পরক্ষণে মনে হচ্ছে—যাক্, যাক্, সব যাক্। সে চায় না কিছু। সে হারিয়ে যেতে চায়। সে ভালবাসতে চায়। সে মহব্বতের রঙে রাঙা হয়ে উঠতে চায়। এতদিন ধরে যে জীবনকে সে বধ করে ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যায় করেছিল ; তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়।

সে প্রায়শ্চিত্ত করবে। দিল্লী থেকে অনেকদূর চলে গিয়ে পৃথিবীর কোন এক গোপন কোণে সে লুকিয়ে থাকবে। অন্ততঃ লোকে জানবে তুর্কী রমণী রিজিয়া হৃদয়কে ঠকাতে না পেরে দূরে পালিয়ে গেছে।

পঁচিশটি বসন্ত তার জীবনে এসেছে। পঁচিশটি বসন্তকে সে বিদায় দিয়েছে অন্যায় ভাবে। সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করবে বাকী জীবনের খেসারৎ দিয়ে। সেও ঐ ফকিরের মত কোন মসজিদের প্রাঙ্গণে বসে রাতের পর রাত প্রিয়জনের জন্য আকুল হয়ে কাঁদবে। পৃথিবীর কাছে তার অনেক অভিযোগ। সে পৃথিবীকে অপরাধী করবে। রমণী করে যখন পৃথিবীতে তাকে পাঠিয়েছেন আল্লা। তবে রমণীর আসল ধর্ম তাকে পালন করতে কেন দেবেন না ?

রিজিয়া যেন ভাবতে ভাবতে অপরূপ রূপে মহিয়সী হয়ে উঠলো। চোখের জল শুকোলো। প্রাণের জ্বালা কমলো। মাটিতে পড়ে যাওয়া ওড়নাটা বুকের ওপর তুলে নিয়ে মুখের প্রসন্নতা ফিরিয়ে নিয়ে এলো।

নহবত চূড়ায় নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে আবার ঘণ্টাধ্বনি হলো। খোজা প্রহরীর পায়ের শব্দ ভেসে এল। ফকির সাহেব এখন আর দরবারী স্বরে প্রাণ মন ব্যাকুল করে তুলছে না। এখন তার কণ্ঠে বেহাগের রাগ। ফকির সাহেব গাইছে বেহাগরাগে গজল।

'সদ্ বহার্ আখির্ শুদ্ ও হর্ গুল বফর্কে জা গেরেফৎ।
ঘুঞ্চা-এ-বাঘ্-ই-দিল্-ই-মা জেব্-ই দস্তারে নাশুদ্॥'

সঙ্গীতের অপূর্ব মূর্ছনায় ভাবাবেগে রিজিয়ার চোখে ঘুম এসে গেল।

আরও একটি কথা ইতিহাসে লেখা হয়ে গেল। ইয়াকুত নিজের শয়ন-কক্ষে মখমলের বিছানার ওপর আদুল গায়ে শুয়ে শুয়ে চিন্তার গভীর সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিল। কক্ষের মধ্যে আলো-অন্ধকারের খেলা চলছিল। এক কোণে একটি অল্প আলোর বর্তিকা রাখা আছে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে নতুন পদপ্রাপ্তির গর্বে গর্বিত ইয়াকুতের পেশীবহুল দেহ। যে দেহকে দেখে রিজিয়া প্রথম দর্শনে চমকে উঠেছিল।

কক্ষটি অদ্ভুত সুন্দর করে সাজানো। মনে হয় রিজিয়ার ভিন্ন আদেশে এ কক্ষের শোভা অধিকতর বর্ধিত হয়েছে। দিল্লীর প্রাসাদের অপরূপ ঝলমল ঐশ্বর্যের এক কণা বুঝি রিজিয়া তার প্রিয়তমের ঘর সাজাবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছে। ঘরে গোলাপের সুবাস।

চাঁদের আলো এসে পড়েছে পালঙ্কের ওপর। ইয়াকুতের মুখের ওপর। মৃদুমন্দ সুগন্ধি বাতাস ভেসে আসছে উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়ে। কারুকার্যখচিত বহুমূল্য মেহগনি কাঠের টেবিলের ওপর রক্তবর্ণের ভেলভেটের ঝালর ঢাকা দেওয়া। তার ওপর রাখা আছে স্বর্ণভৃঙ্গারপূর্ণ সেরাজী সরাব। ইয়াকুত হাবশী হলেও সে সরাব পান করে না পরিচারিকারা জানে, তবু রেখে গেছে যদি দরকার হয়।

ইয়াকুত ভাবছে। অখণ্ড ভাবনার সাগরে সে হাবুডুবু খাচ্ছে। অপমানের তীব্র জ্বালায় মহীরুহের মত দেহ ছটফট করছে। শোণিতে প্রতিশোধের জ্বালা। রক্ত চাই। এ অপমানের উপযুক্ত শাস্তি অপমানকারীকে দিলে তবে প্রাণের শান্তি। সে যোদ্ধা, সে বীর। সে একা এক সহস্র তুর্কী সেনানীকে এক নিমেষে অসির ঘায়ে ধরাশায়ী করতে পারে।

অথচ নীরবে অগুণতি আমীর-ওমরাহের সামনে তাকে নীরবে সব লাঞ্ছনা, সব অত্যাচার সহ্য করতে হলো। ছোট ছোট রাজকর্মচারী পর্যন্ত তাকে কটূক্তি করলো। সে বুঝলো, রিজিয়ার যারা সুহৃদ, উপকারী বলে প্রকাশ করে—তারা তলে তলে কত বড় শয়তান। বিদ্রোহ করবার জন্যে, বিদ্রোহী হবার জন্যে তারা সবসময় তৈরী। সবসময় তারা একটি রমণীর বিরুদ্ধে গোপনে দল তৈরী করছে।

আজ রিজিয়া কত যে অসহায় তা একমাত্র ইয়াকুতই জানে। অথচ প্রথম রাজদরবারে আমীর-ওমরাহের সামনে সিংহাসনে উপবিষ্ট রিজিয়াকে দেখে তার মনে হয়েছিল—পৃথিবীতে এর মত বুঝি সৌভাগ্যশালিনী কেউ নেই। রিজিয়ার সৌভাগ্য দেখে তার ঈর্ষা হয়েছিল। কিন্তু সে যে কত বড় ভুল। ভ্রান্ত। আজকের অবস্থা দেখলে বোঝা যায়। অসহায়া রিজিয়া। নিতান্তই অবলা এক নারী। তার পিছনে সমস্ত রাজ্য বিদ্রোহী। সিংহাসনের পাশে যারা বন্ধুর মত রাজকার্যের সাহায্যের জন্য আছে, তারা ওৎ পেতে আছে সংগ্রামের জন্য। রিজিয়া অন্যায় করলেই তাকে পদতলে দলিত করতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। রমণীর রক্তে তুর্কীবীররা নিজেদের হাত রঞ্জিত করবে।

ইতিগীন। যাকে স্নেহ করে রিজিয়া রাজপ্রাসাদের পরিরক্ষক করেছে। সেই ইতিগীন। বেইমান। সে গোপনে গোপনে রিজিয়ার বিরুদ্ধে দল তৈরী করছে। রিজিয়ার বৈমাত্রেয় ভাই মুইজুদ্দিন বহরামের দলে গিয়ে ভিড়েছে। অবশ্য তার দলে যাওয়ারও অনেক উদ্দেশ্য আছে। বহরাম সর্বদা বহু রমণীকে নিয়ে উচ্ছল আনন্দস্রোতে অবগাহন করে। ইতিগীনের সেইজন্যে রমণী সাহচর্য খুব সুলভ হয়ে ওঠে। তার কবিতার রঙে রাঙা হয়ে যে সব প্রেয়সী তার বক্ষে এসে ধরা দেয় তাদের সাথে সেরাজী সরাব মেশালে ইতিগীনের পদমর্যাদার সম্মানমূল্য আরও ভারী হয়ে ওঠে।

ইতিগীন শুধু এই সামান্য শস্তা রমণী সাহচর্যে মন খুশী রাখতো না। বহরামের ভগ্নী আসমানের সাথে গোপনে মহব্বতের খেলা খেলতে শুরু করেছে। একথা খুবই গোপনে আছে। একমাত্র ইয়াকুত ছাড়া বোধহয় কেউ জানে না।

ইয়াকুত নিজের কানে শুনেছে। নিজের চোখে দেখেছে বলে সে বিশ্বাস করে। সেদিন সাঁঝের অন্ধকারে ইয়াকুত অশ্বশালা থেকে রাজপ্রাসাদের ভেতর পথ দিয়ে বাইরে আসছিল। হঠাৎ পাশের গলিপথ থেকে কার যেন চাপা কণ্ঠস্বর ইয়াকুতের কানে এসে পৌছলো। সে সেখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

রমণীকণ্ঠটি ইয়াকুত চিনতে পারলো। বহরামের দুলালী ভগ্নী আসমান। এই আসমান রিজিয়ার ওপর ঈর্ষান্বিত হয়ে সর্বদা রিজিয়ার চরিত্র নিয়ে নানান মন্তব্য করে। এবং এক এক সময় ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, একবার সিংহাসনের অধিকার পেলেই হয় তারপর ঐ কলঙ্কিনী মন্দা মেয়েলোকটাকে কি করে শাস্তি দিতে হয় তা সে দেখে নেবে। ঘাতকের কৃপাণ দিয়ে অঙ্গের এক একটি অংশ কেটে এক একদিন ফেলে রাখবে, তারপর যন্ত্রণার মধ্যে তাকে তীব্র কষাঘাতে জর্জরিত করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। তবে সহজে মরতে দেবে না। মরতে দিলে মুক্তি পাবে। তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিলে যন্ত্রণায় পাগল হয়ে উঠবে। সেই শাস্তি।

সেই আসমানের কণ্ঠস্বর শুনে ইয়াকুত নিজেকে একটু গোপন স্থানে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাখলো। পুরুষ কণ্ঠস্বরটিও ইয়াকুত শুনতে পেল। কিন্তু শুনে সে অবাক হয়ে গেল—ইতিগীন। সেই প্রথম ইয়াকুত জানতে পারলো ইতিগীন আসলে ভাঁড় নয়, অত্যধিক ধূর্ত্ত চতুর একজন ভবিষ্যৎদর্শী যুবক। আসমানের সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে সে যে রিজিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে চায়—ইতিগীনের কার্যাবলী অনুসরণ করলেই তা বোঝা যায়।

এই ইতিগীনের মনে মনে আশা ছিল সে রিজিয়ার কৃপাদৃষ্টি পাবে। সবাই যখন ইতিগীনের সঙ্গে রিজিয়ার একটি কাল্পনিক সম্পর্ক গড়ে নিয়েছিল তখন ইতিগীন মনে মনে খুশী হয়েছিল। কিন্তু ইতিগীন জানতো না, রিজিয়া অত নরম হৃদয়ের মেয়ে নয়। রিজিয়া ইতিগীনকে স্নেহ করতো বটে, কিন্তু সে স্নেহ যে প্রেমের রূপ নেবে, এ ধারণা মূর্খ ইতিগীনের মনে আনাই নিতান্ত বোকামী।

ইতিগীন অবশ্য সেদিনও রিজিয়ার শয়নকক্ষে অবারিতভাবে যাওয়া-আসা করতো। কিন্তু রিজিয়া কোনদিনও ইতিগীনকে দেখে কোন মন্দ ধারণা মনে পোষণ করেনি। তাই যখন অনেকে তার সঙ্গে ইতিগীনকে জড়িয়ে নানা কথা বলতো—রিজিয়া তখন বেদনাবোধ করতো।

ইয়াকুত আসার পরও দেখেছে ইতিগীনকে নিয়ে রিজিয়ার নামে রাজ্যের বহুলোক নানান খোসগল্প করে। এমন কি ইয়াকুতকে বলেছে—'মিয়া, শেষকালে উচ্ছিষ্ট যৌবনের নামাজী হয়ে উঠলে?' ইয়াকুত সেদিন বোঝেনি কিন্তু আজ বুঝছে—ইতিগীন রিজিয়ার কতবড় সর্বনাশ করেছে। একটি সহজ, সরল মেয়ের কোমল মনে রেখাপাত করে সে বাইরে তার নামে নানান অশ্লীল কাহিনী প্রচার করেছে। ইতিগীন

যে কতবড় শয়তান, কতবড় বেইমান, রিজিয়া যদি জানতো। হয়তো সে জানে। এত বড় রাজ্য যে চালাচ্ছে সে কি এই সামান্য ষড়যন্ত্র ধরতে পারে না? ধরতে পারে। কিন্তু কোন গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু ইয়াকুত রিজিয়ার এই খামখেয়ালীকে কিছুতে ক্ষমা করতে পারে না। একটি রমণীর বিরুদ্ধে তার ইজ্জত নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেলা খেলবে—আর সেই রমণী তাই শুনে প্রতিবাদ করবে না, শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে শক্তি ব্যয় করে না ইয়াকুত তাকে ক্ষমা করতে পারে না। সেই ইতিগীন রাজরোষ থেকে নিজেকে কৌশলে বাঁচিয়ে অদ্ভুতভাবে নিজের কার্য সমাধা করে যাচ্ছে।

ইয়াকুত আসতেই ইতিগীনের অসুবিধা হয়েছে। আগে ইতিগীন প্রচার করতো সে রাত্রে রিজিয়ার খাসমহলে ছিল এবং রিজিয়া তার কুমারী মনের নিবিড় ছোঁয়াচ দিয়ে তার জীবন সার্থক করে দিয়েছে। কিন্তু ইয়াকুত আসতে, ও ইয়াকুতের সঙ্গে রিজিয়ার আসল সম্বন্ধ ধরা পড়তে ইতিগীনের চালাকি আর খাটলো না। রিজিয়াও ইতিগীনকে খুব আমল দিল না। খাসমহলে প্রবেশের পথ রিজিয়া বন্ধ করে দিল।

ইতিগীন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু করতে কিছু পারলো না। শুধু ইয়াকুতকে মৃদু হেসে বললো—দাদা, খুব সৌভাগ্যবান।

ইয়াকুত গলিপথের আর একটু কাছে সরে গেলো। ইতিগীন আসমানকে হয়ত বুকে জড়িয়ে ধরেছে, বোঝা গেল না। হয়ত বুকে জড়িয়ে ধরে অধরে অধর দিয়ে ইতিগীন রাজপরিবারের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চায়। আসমানের প্রস্ফুটিত যৌবনের হরিণী দেহটি মনে মনে স্মরণ করলো ইয়াকুত। হাঁ, আসমানের রূপ আছে। রূপে আগুনের প্রদাহ আছে। ইতিগীন আসমানের সেই আগুনের দাহ সহ্য করতে পারবে। ইতিগীন চালাক পুরুষ। বয়স কম হলে কি হবে? রমণী সংসর্গে সে একজন যোদ্ধা। রমণী হৃদয় বশ করবার সব ক্ষমতা তার আছে।

বসরাই গোলাপের মত সৌন্দর্যকে আপন হৃদয়ে স্থাপন করে মোহাচ্ছন্ন না হয়ে আসল উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার ক্ষমতা তার আছে। ইতিগীনের গোপন উদ্দেশ্য যেন সেই মুহূর্তে ইয়াকুতের কাছে ধরা পড়ে গেল। ইতিগীন যে আসমানকে হাত করে রাজপরিবারকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ধ্বংস করে দিতে চায়। এমনি কি হয়ত মনে মনে নিজেকে দিল্লীর সিংহাসনের সুলতান করার স্বপ্ন দেখে। ইয়াকুতের ইচ্ছে করলো, এইমুহূর্তে তরবারী উন্মুক্ত করে দুটি দেহ থেকে মুণ্ডু নামিয়ে দেয়। দুটি নরনারীর রক্তস্রোতে এই গতিপথ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অন্ততঃ লোকে জানবে রাজপরিবারের কন্যার গোপন অভিসারের শেষপরিণতি এইরকম ভাবে হয়েছে। কিন্তু তাতে রিজিয়ার বিপদ। বিদ্রোহের আগুন জ্বালতে শুধু এখন একটু সূচনার দরকার। সেই সূচনা যদি এত তাড়াতাড়ি হয়, তাহলে রিজিয়া দিশেহারা হয়ে যাবে। তার চেয়ে অপেক্ষা করে শত্রুগুলিকে চিনে নেওয়া ভাল। এই কথা ভেবে ইয়াকুত সেই গলিপথের গোপনস্থান থেকে বেরিয়ে চলে এল নিজের ঘরে।

কিন্তু প্রাণে তার শান্তি থাকলো না। রাজপরিবারের অভ্যন্তরের দৃশ্য সে যত দেখতে লাগলো আর তত সে চিন্তিত হয়ে পড়তে লাগলো রিজিয়ার কথা ভেবে। বেচারী।

তারপর হঠাৎ আজ সে অতর্কিতে বহরামের রঙমহলে প্রবেশ করে বসেছিল। এই প্রথম সে বহরামের রঙমহল দেখল।

দিল্লী-রাজপ্রাসাদের মধ্যে এমন একটি সৌন্দর্য পরিপূর্ণ কক্ষ আছে, এ কথা জালালউদ্দীন ইয়াকুত স্বপ্নেও ভাবে নি। সে শুধু অবাক হয়ে দীর্ঘ চোখ-দুটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমস্ত রঙমহলের কারুকার্য দেখতে লাগলো। তার মনে হল, পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য বুঝি এখানেই রাখা আছে। এত আলো যে—ভাল করে কিছুক্ষণ চোখ রাখা যায় না। ঘরের স্বর্ণালঙ্কারের ওপর, দর্পণের ওপর আলো পড়ে জ্যোতি বিকিরণ করছে। তারপর লাল, নীল, সবুজ, ফিরোজা, আসমানী কত রঙের যে বাহার তাহার ইয়ত্তা নাই। রঙমহলের রঙের বেসাতি যেন সর্বত্র। কক্ষের বাতাসে অদ্ভুত গন্ধের মিশ্রণ। হরেক রকমের পুষ্পস্তবক স্তম্ভে স্তম্ভে দোলায়মান। সেখানে মল্লিকা, মালতী, চামেলী, নাগকেশর, গন্ধরাজ ও গোলাপের ছড়াছড়ি। হীরকমণ্ডিত গুলাব-পাশ আতরদানের অভাব নেই। ইস্তাম্বুলের চিত্তোন্মাদকর সুগন্ধ। লোবানের তীব্র মধুর গন্ধ। তার ওপর অগুণতি বেহেস্তের হুরী। বক্ষের শোভাকে প্রায় উন্মুক্ত রেখে মৃত আলতামাসের তৃতীয় পুত্র বহরামকে ঘিরে বসে আছে। অপরূপ সুন্দরী একটি রমণীদেহ আসরে উত্তাল-নৃত্য করছে। যন্ত্রসঙ্গীতের তালে তালে সেই রমণীটি প্রাণপণে নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে।

আসরে বহু সম্ভ্রান্ত রাজপরিষদ। আমীর-ওমরাহরা সেরাজী সরাবের পাত্র মুখে তুলে উল্লাসে আনন্দ প্রকাশ করছে। তার মধ্যে ইতিগীনকেও দেখতে পেলো ইয়াকুত। ইতিগীন বহরামের পাশে বসে তাকে তোয়াজ করছে। মনে মনে ইয়াকুত ইতিগীনের প্রশংসা করলো। যুবকটি ঠিক জায়গায় নিজেকে ভেড়াতে পেরেছে—এবং বহরামের মোসাহেবী করলে যে তার অনেক কিছু সুবিধা হবে—সে তা জানে। আসমানকে আপন করে রাজপরিবারের একজন হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার সুবিধা হবে।

ইয়াকুত আরও দেখলো, রিজিয়ার সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা বহরামের এই রঙমহলে এসে চিত্তবিনোদনের আনন্দে যোগদান করেছে। তারা এখন সব সেরাজী সরাবের নেশায় রঙীন হয়ে ঢুলু ঢুলু চোখে নাচ দেখছে। পাশে বসে বসে সুন্দরীরা সেরাজী সরাবের পাত্র বিতরণ করছে আর আমীর-ওমরাহদের তোয়াজ করছে।

ইয়াকুত অবাক হয়ে গেল। রঙমহলে মেয়েগুলির ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা দেখে। রিজিয়ার রাজ্য পরিচালনায় রমণী দেহের এমনি অবমাননা হাবশীর প্রাণের মধ্যে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিল। তার ইচ্ছে করলো, এই সরাবপ্যায়ী উন্মত্ত কুকুরগুলোর গলাগুলো তরবারী দিয়ে ছেদন করে মেয়েগুলোর ইজ্জত বাঁচায়। রিজিয়া কি জানে না তার ভায়ের এই উচ্ছৃঙ্খলতা? নিশ্চয়ই জানে। কিন্তু উপায় নেই। আইনের রজ্জু দিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারী করলে রাজ্যে বিদ্রোহ জাগবে।

আমীর-ওমরাহরা বিলাসী হতে চায়। রমণীদেহ ও সেরাজী-সরাব। এ দুটি সুলতানা নিজে রমণী হয়ে ব্যবহার করতে পারে না বলে তারা বহরামের সাথে মিশেছে। বহরামই যে একদিন সিংহাসনের আশা রাখে—এই চক্রান্ত দেখলে বোঝা যায়।

ইয়াকুত থামের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল বলে কক্ষের ব্যক্তিরা তাকে দেখতে পায় নি। থামের আডালে থেকে আলোর বন্যায় আসতে ইতিগীন উল্লাসে ছুটে এল।

ইয়া, আল্লা, কেয়া তাজ্জব ব্যাপার। দিল্লীসুলতানা বেগমসাহেবা রিজিয়ার পার্শ্বচর প্রিয়জন জালাউদ্দীন ইয়াকুত আজ মুইজুদ্দিন বহরামের রঙমহলে হাজির। বলেই সে উল্লাসে হা-হা করে হেসে উঠলো। তার কথা বলার ঢঙ্ ও হাসির কায়দা দেখে ইয়াকুতের গা জ্বালা করে উঠলো। কিন্তু কিছু সে বললো না। শুধু ইতিগীনকে সমর্থন করে একটু হাসলো।

ইতিগীন আবার তাকে আমন্ত্রণ জানালো: আরে চলিয়ে না। সেরাজী, খুবসুরৎ জেনানা সব তৈয়ের আছে।

নাচ থেমে গেছে। সকলে এইদিকে তাকিয়ে আছে। আমীরওমরাহরা বিরক্ত হয়ে ইয়াকুতকে দেখছে। সমস্ত আনন্দোৎসব স্তব্ধ। বহরাম ভ্রুকুটি করলেন। রমণীরা এতক্ষণ মোহগ্রস্ত হয়ে কেমন যেন পিচ্ছিল স্রোতে হারিয়ে গিয়েছিল। ইয়াকুত এই আসরে উপস্থিত হতে যেন বাঁধা সুরে ছেদ পরে বেসুরো হয়ে গেল। রমণীরা তাড়াতাড়ি নিজেদের ওড়নাটা বুকে তুলে দিয়ে সম্ভ্রম বজায় রাখলো।

বহরাম ক্ষিপ্ত হয়ে জড়িতস্বরে ইতিগীনকে আদেশ দিল—দোজাখের মেয়ের পেয়ারীকে ইধার লে আও।

ইতিগীন হাসছে। দারুণভাবে হাসছে। তার হাসিতে শব্দ নেই। কিন্তু তার চোখ দুটো হাসির ঢেউয়ে কেমন যেন আশ্চর্য লাগছে। ইতিগীনকে যেন কেমন লাগছে। কেমন যেন মনে হচ্ছে ও সব পারে। ইয়াকুত শক্তিহীন হয়ে পড়লো। খাপে পোরা তরবারী। কিন্তু সে তরবারীর অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেল।

ইতিগীন কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বললো—ভয় কি? বেগমসাহেবা কিছু জানতে পারবে না। তারপর হেসে বললো—লাহোর, গোয়ালিয়র, মালব প্রভৃতি রাজ্যের সবচেয়ে সেরা সুন্দরী। সেরা বাইজী। সেরা বাঁদী। উষ্ণরক্তের মোহিনী স্পর্শে মাতাল হয়ে গেলে সেরাজী সরাবকেও হার মানায়। এই বলে ইতিগীন এবার রঙমহলের সমস্ত দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে হা হা করে হেসে উঠলো।

হাসি প্রশমিত হলে হঠাৎ ইতিগীন দুঃসাহসিকভাবে ইয়াকুতের বলিষ্ঠ একটি হাত খপ্ করে ধরে ফেললো। ধরে টানতে টানতে একেবারে আসরের মাঝখানে নিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আসরের সম্ভ্রান্ত আমীর-ওমরাহরা সেরাজীর নেশায় ঢুলতে ঢুলতে খি-খি করে পাগলের মত হেসে উঠলো। নানারঙের ফুলগুলো হাসির ঢেউয়ে মৌ মৌ হয়ে হাত-পা মেলে চারিদিকে জড়াজড়ি করে জড়িয়ে গেল। স্বর্ণ-রজতময় দীপাবলীর উজ্জ্বল আলোকমালাগুলি ঝলমল শব্দ করে জলতরঙ্গের

শব্দ তুলে চারিদিকে যন্ত্রসঙ্গীতের তান সৃষ্টি করলো। ইয়াকুত আকস্মিক এই ধরণের অশোভনীয় ঘটনার মধ্যে পড়ে কেমন যেন অভিভূত হয়ে গেল। ইতিগীন, নিম্নপদস্থ কর্মচারী হয়ে যে এমনি বেলাল্লাপনা করবে—সে স্বপ্নেও ভাবেনি। বুঝতে পারলো, এতখানি সাহস সে সঞ্চয় করেছে—কার কাছ থেকে? মুইজ্জুদ্দীন বহরাম যে ভিতরে ভিতরে ইতিগীনকে উত্তেজিত করছে বোঝা যায়। ইতিগীনের এত সাহস যে বহরামের প্ররোচনায় তাও বেশ অনুমান করা যায়।

হঠাৎ ইতিগীন আবার করলো কি? একটি সুন্দরী রমণীকে আসর থেকে হাত ধরে তুলে আলোতে মুখখানা মেলে দিয়ে ইয়াকুতকে দেখিয়ে বললো—দোস্ত, সুলতানা বেগমসাহেবার চেয়েও কি এ সুন্দর নয়? তুমি কি দেখে ভুললে বাপু? দেখো, ভাল করে চোখ মেলে চেয়ে দেখো। দিল্ ধড়ফড় করে কিনা—দেখোতো!

ইয়াকুতের একেবারে বুকের কাছে রমণীটি। রমণীটির উষ্ণ নিঃশ্বাস ইয়াকুতের চোখ-মুখের ওপর লাগছে। আগুনের তাপ লেগে পুড়ে যাচ্ছে। জ্বলে যাচ্ছে। মিষ্টি একটি গন্ধ। গন্ধটি রমণীটির গাত্রবর্ণ থেকে। সেরাজী সরাবের উৎকট গন্ধও একে হার মানায়। ইয়াকুত মেয়েটির চোখের দিকে তাকাতে গেল। কিন্তু উজ্জ্বল আলোতে শত চক্ষু তার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে গিলছে যে তাকে না তাকিয়ে মাথা নত করতে হলো।

হঠাৎ আমীর-ওমরাহরা খি-খি করে হেসে উঠে চীৎকার করে বললো—সুলতানার দিল্ বিগার যাবে। মজে যেও না ভাই!

ইতিগীন হঠাৎ আরও একটি কাণ্ড করলো। যে মেয়েটি ইয়াকুতের সামনে অপ্সরীর রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার ঘাঘরা কাঁচুলির বন্ধন ধরে টানতে লাগলো। মেয়েটি লজ্জায় রঙীন হয়ে খিলখিল করে হেসে নিজেকে আগলাতে লাগলো। হাসির ঢেউ উঠলো গমগমে আসরে। ইয়াকুতের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। মরীয়া হয়ে আসরের মাঝপথে পশ্চাদ্ধাবন করে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হা-হা করে হাসির প্রতিধ্বনি ইয়াকুতের পিছন পিছন তাকে ধাওয়া করলো। তার সাথে সুন্দরী রমণীদের খিলখিল করে হাসি ওদের হাসির সাথে মিশে ইয়াকুতকে পাগল করে দিল। তার পরণে ছিল পদমর্যাদার পোষাক। পোষাকের গুরুভারে তার সমস্ত দেহটি ভারী। সেই ভারী দেহ নিয়ে প্রাসাদের অলিন্দ দিয়ে চলতে চলতে সে বার বার ঠোক্কর খেতে লাগলো। অপমানের তীব্র কষাঘাতে যন্ত্রণায় পাক খেতে খেতে ইয়াকুত ফিরে এল তার কক্ষে।

স্বল্পালোকিত ঘরের মধ্যে ডিভানে বসে তার চোখে জল এল। জল এল নিজের জন্য নয়। রিজিয়ার ব্যর্থ জীবনের জন্য অনেক চিন্তা করলো। দিল্লীর সুলতানার নিরুপায় অবস্থা দেখে তার ইচ্ছে করলো—রিজিয়াকে কণ্টকশূন্য করতে পারলে তার সবচেয়ে শান্তি আসতো। কিন্তু সে একা। একা ঐ সমগ্র দিল্লী সাম্রাজ্যের তুর্কী যোদ্ধাদের পরাজিত করা বড় কঠিন। এখানে ষড়যন্ত্র বাতাসের আগে আগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। লাহোর ও গোয়ালিয়রের শাসনকর্তা ভেতরে ভেতরে দিল্লীর রাজন্যবর্গদের মধ্যে সংবাদ আদানপ্রদান করছে।

রণথম্বোর দুর্গের হিন্দুরা আবার বিদ্রোহী হয়ে দিল্লীর অধীনতাপাশ ছিন্ন করতে চায়। আগামী যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে। রণথম্বোর দুর্গ তারা চায়। বহু মুসলমান তুর্কী সেনানীকে হিন্দুরা রণথম্বোর দুর্গের মধ্যে অবরোধ করে রেখেছে। রিজিয়া প্রধান সেনাপতি মালিক কুতুবউদ্দীন হসনঘোরিকে সৈন্য-সমাবেশে পাঠাতে মনস্থ করেছে।

ইয়াকুত চেয়েছিল সেও হসনঘোরির সঙ্গে রণথম্বোর দুর্গ আক্রমণ করতে যায়। রিজিয়ার শত্রুকে বধ করতে পারলে তার শান্তি। রিজিয়াকে তার অভিপ্রায়ের কথা জানাতে রিজিয়া মৃদুহেসে বললো—না। রণথম্বোর দুর্গ হসনঘোরি একাই জয় করে আসতে পারবে। তুমি এখানেই থাকো। এখানেই তোমাকে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

রিজিয়া আসল কথা খুলে বলে নি, কিন্তু এখন বুঝতে পাচ্ছে, রিজিয়া বেশ ভালভাবেই জানে যে বাইরের বিদ্রোহের চেয়ে ভেতরের বিদ্রোহ সবচেয়ে বেশী। ষড়যন্ত্রের ধোঁয়া কুণ্ডলি হয়ে পাক খেয়ে খেয়ে রাজপ্রাসাদের উজ্জ্বল অলিন্দের মধ্যে ঘোরালো হয়ে উঠছে। এরই জন্যে তার ইয়াকুতকে প্রয়োজন। ইয়াকুত কাছে থাকলে যে রিজিয়া একটু সাহস পায় তা বোঝা যায়। অসহায়া একটি স্ত্রীলোক সমস্ত দিল্লী সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিশ্বরী হয়ে সর্বদা ভয়ে শঙ্কিতচিত্তে বিদ্রোহের আগমনে কাঁপছে। রিজিয়ার প্রয়োজন আজ ইয়াকুতকে শুধু হৃদয়ের জন্য নয়। প্রয়োজন সমগ্র তুর্কীদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে তাকে বাঁচানো। নিজে তুর্কী রমণী হয়ে একজন হাবশীর কৃপাপ্রার্থী হতে চায়। এক হাবশীর কাছে তার হৃদয়ের সমস্ত বেদনা উজাড় করে দিয়ে সে তার মুক্তি চায়।

যখন সে একমনে রিজিয়ার কথা ভাবছে। রিজিয়ার অসহায়া অবস্থা চিন্তা করে তার চোখে জল আসছে। সমগ্র দিল্লী সাম্রাজ্যের তুর্কী রাজন্যবর্গদের ষড়যন্ত্রের কথা চিন্তা করে সে ভীত হয়ে পড়ছে। তুর্কীরা ঈর্ষায় রিজিয়ার সঙ্গে তার সহবাসের নানান অশ্লীল কাহিনী তৈরী করে প্রচার করে নগরবাসীকে ক্ষিপ্ত করে তুলছে। রিজিয়ার সরল মনকে পাপের ক্লেদাক্ত কালিমালিপ্ত করে তারা ষড়যন্ত্রকে আরও পাকিয়ে তুলছে। এইসব কথা সে নিস্তব্ধ রাত্রে একা নিজের ঘরে পালঙ্কে শুয়ে ভাবছিল।

এরই মধ্যে বাঁদী এসে ঘরের টেবিলে রৌপ্যপাত্রে তার রাতের আহার্য বস্তু রেখে গেছে। ইয়াকুতের আজ আহার করার কোন ইচ্ছে নেই। সব যেন তার তিক্ত ও বিস্বাদময় মনে হচ্ছে। গলা দিয়ে আহার্যবস্তু যে আজ যাবে না—সে বুঝতে পারে। তাই সে আহার্যবস্তু স্পর্শ না করে রক্ষিত স্বর্ণপাত্রে ভর্তি জল সে পান করে নেয়। পিপাসার্ত কণ্ঠের মধ্যে যেন পানীয় প্রবেশ করতে বুকের ভেতরটা কতকটা শান্তি পায়।

সে এগিয়ে এসে তার নিজস্ব তরবারীটি খাপ থেকে খুলে নেয়। স্বল্পালোকিত আলোর সামনে তরবারীটি ঝল্‌সে ওঠে। তরবারীটি হাওয়ায় দুচারবার শত্রুর

উদ্দেশ্যে ঘোরায়। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলে : ইতিগীন! বেইমানের শাস্তি তাকে অবশ্যই পেতে হবে।

কিন্তু তার আস্ফালনই সার। একা সে কতটুকুই বা করতে পারে? এখন যদি সে একটি ভিন্ন সৈন্যদল তৈরী করতে পারতো! কয়েকজন বলশালী হাবশীকে নিয়ে সে নিজের দেশে দল তৈরী করেছিল। তাদের যদি আজ আনিয়ে নিতে পারতো—তাহলে তুর্কী সেনানীদের বিদ্রোহী হওয়ার শিক্ষা বেশ ভালভাবেই দিতে পারতো। কিন্তু তার কোন উপায় নেই। এখন সে রিজিয়াকে ছেড়ে গেলেই এসে দেখবে রিজিয়া আর ইহজগতে নেই। কিংবা দিল্লী কারাগারে বসে অপেক্ষা করছে প্রাণদণ্ডের জন্য। মনে মনে শিউরে উঠলো ইয়াকুত।

হঠাৎ সে তার ঘরে কালো একটি মূর্তি দেখে ভয়ে চীৎকার করে উঠলো—কে? কে তুমি? ইয়াকুতের হাতে তরবারী ছিল, সে সেই তরবারী নিয়ে কালো মূর্তিটির দিকে এগিয়ে গেল।

খিল খিল করে কে হেসে গড়িয়ে পড়লো। কালো বোরখাটা শরীর থেকে মুক্ত করে রিজিয়া হাসতে হাসতে বললো—দ্যুৎ, আমি এই ভীতু কাপুরুষটাকে সাহসী ভেবে নিজের পার্শ্বচর করেছিলাম!

ইয়াকুত হতবাক। স্বল্পালোকিত আলো যেন সহস্র পাখনা মেলে দিল। রিজিয়া সেজেছে। রমণীর অঙ্গে রত্নালঙ্কার। হীরা, চুণি পান্নার উজ্জ্বলতা স্বল্প আলোময় কক্ষে সহস্র আলোর রূপ নিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। দিল্লীর সমস্ত রত্নভাণ্ডার বোধ হয় রিজিয়ার অঙ্গে। কি যে সুন্দর লাগছে দেখতে! রিজিয়া একে সুন্দরী। তার সৌন্দর্যের খ্যাতি সমগ্র উত্তর ভারতে। রিজিয়ার মত সৌন্দর্য তুর্কীরমণীদের মধ্যে বিরল। তার উপর রিজিয়া সেজেছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত স্বর্ণালঙ্কারে মোড়া। সেই অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্য রিজিয়ার রূপকে আরও বাড়িয়েছে। ইয়াকুত চোখ ফেরাতে পারলো না। কেমন যেন হতবাক হয়ে বিস্ময়ে দুটি চোখ বড় বড় করে রিজিয়াকে দেখতে লাগলো। রিজিয়া হাসছিল। চোখে মোহিনীরূপ সৃষ্টি করে রাতের রহস্য মেখে সে ইয়াকুতের দিকে তাকিয়েছিল। ইয়াকুত সভয়ে পিছিয়ে গেল।

রিজিয়া আরও দু'পা ইয়াকুতের দিকে এগিয়ে গেল। রিজিয়া হাসছে। তার গোলাপী নরম অধরে হাসির মোহিনী মায়া।

ইয়াকুত অস্ফুটস্বরে চীৎকার করে উঠলো—না, না তুমি যাও। তুমি সুলতানা। তোমার অনেক কাজ। তোমার এভাবে নষ্ট হওয়া উচিত নয়।

রিজিয়া হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো, ভ্রূকুটি করে বললো—আমার বুঝি জীবন নেই।

ইয়াকুত কাঁপছে। উত্তেজনায় তার পেশীবহুল দীর্ঘ দেহ থর থর করে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে সে ডিভানের ওপর বসে পড়লো। বোবা নিরর্থক চাউনি নিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। ভাবতে লাগলো, এ কে? একি সেই দিল্লীর একচ্ছত্র অধিকারী সুলতানা রিজিয়া বেগম—না অন্য কেউ! মনে হচ্ছে এই রাতের চোখে বাঁদী মহল থেকে কোন এক নষ্টা বাঁদী বেরিয়ে এসে ইয়াকুতকে পুড়িয়ে মারতে চাইছে!

তবে এই বাঁদীর দেহ ভর্তি এত রত্নালঙ্কার কোথা থেকে এল? দিল্লীর যে সুলতানা সেই রিজিয়া পরিধান করে—পুরুষের পোষাক। গায়ে 'কাবা' (কোর্তা), শিরে 'কুল্যা' (উঁচু টুপী), কোমরে কটিবন্ধ পরে অশ্ব বা গজপৃষ্ঠে চড়ে নগর ভ্রমণ করে—রাজদরবারে অপরাধীর শাস্তিবিধান করে। সে নিজেকে কোন সময় রমণীর মত ভাবতেও লজ্জা বোধ করে। সেই রিজিয়া যদি এই হয়, তাহলে এর একি পরিবর্তন!

এই নিস্তব্ধ প্রাসাদের একাংশে ইয়াকুতের ঘরে প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে প্রবেশ করা। তারপর দিল্লীর কোষাগারের প্রভূত ধনরত্নের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে দিল্লীশ্বরী আজ প্রাণভরে সেজে এসে তাকে প্রলুব্ধ করতে চায়। কেন? কেন? কেন? তবে কি রিজিয়া যে রমণী সে কথা ভাল করে জানতে চায় বলেই —এই গভীররাত্রে এই বেশে সে এসেছে?

কিন্তু রিজিয়া তো জানে সে তাকে ভালবাসে? রিজিয়ার পাণি প্রার্থনা করেই সে এই প্রাসাদে প্রবেশাধিকার নিয়েছে। রিজিয়াকে সে আগেও চেয়েছে এখনও চায়। আগে চেয়েছিল, সামান্য শক্তি পরীক্ষার বশবর্তী হয়ে। সে যে বীর, সে যে শক্তিবলে সবকিছু অধিকার করতে পারে এইটে প্রমাণ করবার জন্যেই উন্মুক্ত রাজসভায় ঐ রকম নির্ভয়ে সুলতানার পাণি প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু আজ এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে বাস করে রিজিয়ার পাশে পাশে থেকে সে দেখেছে—রিজিয়া কত অসহায়া। তার সামনে, পিছনে শাণিত কৃপাণ নিয়ে তারই পারিষদবর্গরা ওৎ পেতে রয়েছে। একটু সুযোগ পেলেই ধড় থেকে নামিয়ে দেবে সুলতানার মুণ্ড। রিজিয়ার প্রকৃত অবস্থা দেখে ইয়াকুতের মনে ভালবাসার সঞ্চার হয়েছে। মমতার রং দিয়ে ভালবাসার ভিত্। সুতরাং সে ভালবাসা শুধু দৈহিক সুখের জন্য নয়। রিজিয়ার দেহ পেলে ইন্দ্রিয়ের সুখ হবে। না পেলে ব্যর্থ। এই সামান্যকে মনে পোষণ করে ইয়াকুতের ভালবাসার জন্ম হয়নি। রিজিয়ার চারিদিকে যে শত্রুরা জাল বিস্তার করে তাকে জালে আটকে ফেলবার আয়োজন করছে তা থেকে একমাত্র সুহৃদ হয়ে তাকে বাঁচাবার জন্যেই এখন ইয়াকুতের চিন্তা। যদি বাঁচাতে পারে তাহলে একদিন বুঝবে সে সত্যিই রিজিয়ার পাণি প্রার্থনার যোগ্য, নতুবা ঐ উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী আমীর-ওমরাহরা যেমনি রমণীদেহ নিয়ে খেলা করে সেও রিজিয়ার রমণীদেহ সাময়িক ভোগ করতে চায় বলেই তার শক্তিকে অপচয় করেছে।

সুগন্ধ সুবাসে ঘর আমোদিত। স্বল্পালোয় রত্নালঙ্কারের উজ্জ্বলতা সহস্র আলোর জ্যোতি বিকিরণ করে বেহেস্তের হুরীর মত অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে সুলতানা রিজিয়া দাঁড়িয়ে আছে—রিজিয়া নামে একটি খুবসুরত জেনানা রাতের নিশীথলোকে পুরুষকে ভোলাবার জন্যে অপরূপ বসনভূষণে নিজেকে মায়াবিনী করে অভিসারিকা হবার জন্যে প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে ইয়াকুতের ঘরে এসে ঢুকেছে। ইয়াকুত একটু আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো—রিজিয়ার সুরমা আঁকা চোখ দুটি মাটিতে ন্যস্ত করে রক্তাক্ত অধরকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে কি যেন ভাবছে? মাথায় ওড়না দিয়ে অল্প অবগুণ্ঠন টানা হয়েছে। যে চুল টেনে ওপর দিকে তুলে মাথায় 'কুল্যা' (উঁচু টুপী) দেয় সেই

চুল পরিপাটি করে বেঁধে নানা কারুকার্য করা হয়েছে। মুখখানি প্রসাধনে রাঙানো হয়েছে। রিজিয়ার প্রসাধনহীন মুখই ইয়াকুত এযাবৎ দেখেছে। কিন্তু প্রসাধনে রাঙানো মুখ দেখে তার দেহের রক্তে চাঞ্চল্য জাগলো। পরণে গাঢ় রক্তরঙের বহু মূল্যবান ভেলভেটের সালোয়ারের পাঞ্জাবী। রক্তের সঙ্গে যেন মনের বর্তমান রূপের মিল আছে। গলায়, হাতে, কানে, মাথায় বহুমূল্য অলঙ্কার। অলঙ্কারের ভিন্ন ভিন্ন রঙের উজ্জ্বল পাথরগুলি থেকে আলো ঠিক্‌রোচ্ছে। পান্না, চুণি, হীরার উজ্জ্বলতায় রিজিয়ার সুকুমারী তনুদেহটি মোহিনীরূপ নিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

ইয়াকুত মনের মধ্যে কষ্ট অনুভব করে। সভয়ে বাইরের দিকে তাকাবার চেষ্টা করে। তারপর বলে—কেন এলে বেগমসাহেবা? দিলের তাড়নাকে প্রশ্রয় দিয়ে দিল্লীর সুলতানার ইজ্জত ধূলোয় লুটিয়ে দিতে এলে কেন?

কেন এলাম? মুসাফের, তুমি জিজ্ঞেস করছো কেন এলাম? তুমি যে আমায় ভালবাসো।

কিন্তু সে মহব্বতকে সম্মান দিতে গিয়ে তুমি যে নিজের সম্মান লুটিয়ে দিলে।

ক্ষতি কি? সুলতানা হয়ে যা পাইনি, মহব্বতে তা পেয়েছি। নিজেকে জেনেছি। হৃদয়কে জেনেছি। তোমাকে জেনেছি। সমস্ত রাজ্যকে জেনেছি। আজ তাইতো আমার এই রূপ!

কিন্তু তুমি হয়ত জানো না, তোমার পিছনে পিছনে ছায়ার মত গুপ্তচর ফিরছে। তোমার গতিবিধির ওপর লক্ষ্য দিল্লী সাম্রাজ্যের সকলের।

রিজিয়া মৃদু হেসে বললো—জানি। জানি বলেই আমি সমস্ত দিল্লী সাম্রাজ্যের প্রতিটি লোককে জানাতে চাই—রিজিয়া সুলতানা হলেও সে মানুষ। তার দেহের শোণিতে মানুষের রক্ত আছে। সে যোদ্ধার বেশে যুদ্ধ করবে। অসি হাতে বিদ্রোহ দমন করবে। কাজীর মত রাজদরবারে বসে অপরাধীর বিচার করবে। অপরাধীকে কঠোর দণ্ড দেবে। সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনা করবে। ব্যস্ এই ছাড়া আর কোন প্রয়োজনে সুলতানার কোন অধিকার নেই। কারণ সুলতানা রমণী। রমণী হয়ে তুর্কী মুসলমানের চিরাচরিত প্রথা পর্দার আড়াল ঘুচিয়ে পুরুষের বেশে রাজদণ্ড হাতে করে সিংহাসনে বসেছে। রজিয়তের পারিষদগণ রমণীর এই অন্যায় স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় কিছুতে ক্ষমা করতে পারেনি।

হঠাৎ রিজিয়া উত্তেজিত হয়ে উঠলো—তুমি কি ইয়া জানো না, আজ আমাকে এরা 'মর্দা জানানা', 'দোস্তাখের নষ্টা নারী' বলে অভিহিত করে? আমি নষ্টা! আমি যদি নষ্টা হই তাহলে দিল্লী নগরের গৃহস্থবঁধুরা কি? তুমি কি শোননি? এই সিংহাসনে বসে যে সব সুলতানরা রাজত্ব করে গেছে তাঁদের হারেমে কত বেগম ছিল, তবু তাঁরা পুরুষ। তাই তাঁদের চরিত্রের নিশান তুলে সারা রাজ্যের কেউ বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি। আর আমি রমণী হয়ে যত দোষ করেছি। তবু আমি কোরা-আন্ শরিফ পড়ি। মনটাকে পবিত্র করে রাখবার জন্যে সর্বদা ব্যস্ত করে রাখি। গান, বাজনা, নাচ, মাদক দ্রব্যের কোনদিন আমি বশীভূত হয়নি—পাছে আমার মধ্যে

শৈথিল্য আসে। কিন্তু তার পরিণাম কি হয়েছে? আমার নামে যত কুৎসিৎ কাহিনী রচনা করে রাজন্যবর্গরা তাদের বিলাসের সময় খোসগল্পের আনন্দ পরিবেশন করে।

ইয়াকুত বললো—কিন্তু তুমি আমার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করেছ?

হ্যাঁ করেছি। আমি তুর্কী রমণী। আমি বীরকে পূজা করি। বীরের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে তাকে আমি ক্ষমা করেছি। তার জন্য যদি হৃদয়ের কোন দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে থাকে—তাকে আমি দোষ মনে করি না।

আমাকে তোমার শাস্তি দেওয়াই উচিত ছিল?

সমগ্র তুর্কী সাম্রাজ্যের লোককে যদি ক্ষমা করে থাকি তাহলে তুমিও ক্ষমার যোগ্য। সমগ্র তুর্কী-সমাজের প্রতিটি পুরুষ আমার দেহ কামনা করে সেরাজী পান করে—আমি জানি। যদি শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে তাদেরই আগে দেওয়া উচিত। তুমি তো নির্ভয়ে আমাকে কামনা করতে পেরেছিলে? তাই যখন তুমি উন্মুক্ত রাজদরবারে নির্ভয়ে সেই অমূল্যবাক্য উচ্চারণ করলে—সেই মুহূর্তে আমার চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা সব বুদ্‌বুদের মত মিলিয়ে গেল শূন্যে। আজ তুর্কীরমণী হয়ে তুর্কীদের ঘৃণা করে এক বিদেশী মুসাফেরকে বিশ্বাস করেছি। এতেই কি তুমি বোঝ না আজ আমার পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। আমি আজ ভাগ্যবিধাতা হয়ে দিল্লীর সিংহাসনে রাজদণ্ড হাতে বসে আছি। মৃত কবরের মৃত্তিকার উপর বেহেস্তের কল্পনা করে সেখানে সুরম্য গোলাপ বাগিচা তৈরী করেছি। এই সিংহাসনের জন্যই আমার সারাজীবন ধরে স্বপ্ন ছিল। হঠাৎ উত্তেজনাকে সংযত করবার জন্যে রিজিয়া চুপ করলো।

ইয়াকুত কি বলবে? বলবার তার কিছুই ছিল না। সে সব জানে। এই কিছুক্ষণ আগেই এইসব কথা ভাবছিল। কিন্তু এসব কথাগুলি সুলতানা রিজিয়ার মুখ থেকে শুনে সে আশ্চর্য হল। সুলতানা যে এত গভীর চিন্তা করে তার জন্য তার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। সে রিজিয়াকে এই গভীর রাত্রে তার ঘরে দেখে যেমনি আশ্চর্য হয়েছিল, রিজিয়ার কথাগুলি শুনে তেমনি আশ্চর্য হলো। রিজিয়া তাকে এমনি আন্তরিকভাবে কখনও এতকথা বলেনি। তার হৃদয়ের একাংশ সেদিন কারাগারে উদ্‌ঘাটিত করেছিল কিন্তু তখন মনে হয়েছিল—সামান্য এক নারী। হয়ত ভালবাসার রং নিয়েই সে ঘোরে। যোগ্য ব্যক্তির অভাবে এতদিন হৃদয় দিতে পারেনি, তাকে যোগ্য ভেবে হৃদয়কে উন্মুক্ত করেছে। কিন্তু আজ বুঝলো—সেদিনের সেই চিন্তাধারায় কত ভুল ছিল। এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত সে ভেবেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। রিজিয়ার এইমুহূর্তে তার মনের যে রূপ উদ্‌ঘাটিত করলো, অন্তরের যে ভাবনা সে আন্তরিকভাবে বলে গেল, তার মধ্যে একটি রমণীর দৃঢ় মনের পরিচয়ই পরিস্ফুট হলো। সুলতানার দৃঢ়তাই তার আসল রূপ। রমণী ও সুলতানার দুটি ভিন্ন সত্ত্বা থাকলেও দুটি সত্ত্বাই সম্পূর্ণ সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে। রিজিয়া সুলতানা হয়েও শ্রেষ্ঠা। রমণী হয়েও শ্রেষ্ঠা। সেখানে তার মত এক নগণ্যকে সঁপে দেবার বাসনা সম্পূর্ণ আসমানে চাঁদ ধরার মত। অন্ততঃ তার বিবেক-বুদ্ধি যা বলে তাতে এই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হঠাৎ রিজিয়া তার অতীত রোমন্থন থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে ঘরের মেহগিনি টেবিলে রক্ষিত রৌপ্যপাত্রে আহার্য বস্তু দেখে ইয়াকুতের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে শুধালো—একি তুমি রাতের আহার্য গ্রহণ করনি ?

ইয়াকুত মাথা নাড়লো।

কেন ?

ভাল লাগে নি বলে।

ভাল না লাগার কারণ !

বীর শ্রেষ্ঠ অশ্বপাল জালাউদ্দীন ইয়াকুত ম্লান হেসে মাথা নামালো, তারপর মাথা তুলে ম্লান স্বরে বললো—আমার গোস্তাখি মাপ করো বেগম-সুলতানা।

তা নয় করলাম, কিন্তু কারণ কি।

আমি বলতে ভয় পাই।

রিজিয়া অসন্তুষ্ট হলো। হয়ে ইয়াকুতের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললো—ভয় পাওয়ার কোন হেতু আছে ? তুমি আমার পার্শ্বচর। আমার চোখে যা পড়ে না, তুমি আমাকে সাহায্য করবে বলেই তোমাকে ঐ পদ দিয়েছি।

ইয়াকুত আর দ্বিধা না করে বহরামের রঙমহলের আদোপান্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে রিজিয়ার কাছে বলে গেল।

রিজিয়া শুনে কিছুক্ষণ বেদনাহত হয়ে চুপ করে রইলো। তারপর নিজেকে সহজ করে বললো—কিন্তু আমি তো ইতিগীনকে কিছু বলতে পারি না ইয়া। তোমাকে অপমান করার শাস্তি আমাকেই পেতে হবে। আমিই একদিন ইতিগীনকে প্রশয় দিয়ে তাকে এই প্রাসাদে প্রবেশাধিকার দিয়েছি। আজ সে আমার আত্মীয় হতে চলেছে। এখন আমার বহিন আসমানের সঙ্গে তার শাদী হবে। এখন সে আসমানের সম্পত্তি। এ রাজ্যের একজন বিশেষ ব্যক্তি।

রিজিয়া তারপর আবার বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো—কিন্তু তুমি কি তাই জন্যে আহার্যবস্তু গ্রহণ করনি ?

ইয়াকুত মাথা নাড়লো। তারপর বললো—ওরা সত্যি আমাকে অপমান করে নি, করেছে তোমাকে। তোমাকে অপমান করার জন্য আমার কলিজায় আগুন জ্বলেছে। তোমার অনিষ্ট হবে বলেই আমি কোনরূপ বিপর্যয় ঘটায় নি। না'হলে ঐ ইতিগীনের শোণিতে রঙমহলের রোশনাইয়ের শোভা বাড়িয়ে দিতাম। তার ছিন্নমুণ্ড তোমার বহিনকে উপহার দিয়ে বলতাম—ধন্য তুমি তুর্কীরমণী !

ইয়াকুতের বীরত্বপূর্ণ কথায় রিজিয়া মৃদু হাসলো, হেসে বললো—কিন্তু এসব করলে যে সুলতানাকেই বিপদে ফেলতে দোস্ত। তখন যে বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে হতো।

ইয়াকুত হঠাৎ সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললো—তার জন্যে বিদেশী কখনও ভয় পায় না সুলতানা। তবু অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় সুখ আছে একি সুলতানাকে নতুন করে শেখাতে হবে ?

রিজিয়া আহত হয়ে চুপ করে গেল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিম্নস্বরে বললো—তুমি আমার কৌতুক বুঝতে পার নি তার জন্যে আমাকে ক্ষমা করো ইয়া। আমি তোমার বীরত্বকে ক্ষুণ্ণ করতে চাই নি। ইতিগীনকে আমি নিশ্চয় শাস্তি দিতাম কিন্তু আজ নিরুপায়। সে এখন বহিন আসমানের বাগদত্ত। তুমি জানো, এই সিংহাসন নিয়ে আমার ভাইদের সঙ্গে আমার কি রকম বিবাদ? রিজিয়া হঠাৎ রমণীসুলভ খিল খিল করে হেসে বললো—এখন এসব কথা থাক্। আর ভাল লাগছে না। যদি কোন শাস্তি দেবার বাসনা জেগে থাকে আমাকে দিও, আমি মাথা পেতে নেবো। তবু আমার কসম—তুমি আহার্য গ্রহণ করো।

ইয়াকুত বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলো। রিজিয়ার দিকে। এই সেই সুলতানা। যে সুলতানার চারিদিকে শত্রু। সুলতানা নিজে জানে সে শত্রুর গণ্ডীর মধ্যে সর্বদা প্রাণ নিয়ে বাস করে। যে কোন মুহূর্তে তাকে কেটে টুক্‌রো টুকরো করে দিতে পারে। সে রমণী জানে, তার কেউ নেই এই পৃথিবীতে। সে সম্পূর্ণ একা। সে এই গভীর নিশীথে সম্পূর্ণ নির্ভয় হয়ে একজন বিদেশী কর্মচারীর ঘরে ঢুকে রমণীসুলভ সামান্য বাঁদীর মত খিল খিল করে হাসছে। ইচ্ছে করলো ইয়াকুতের—সুলতানাকে তিরস্কার করে তার চেতনা ফিরিয়ে দেয়। তার গুরুদায়িত্বগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু পরক্ষণে সে ভাবলো এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে গেলে সুলতানা নিজেই হয়ত পরিবর্তে তিরস্কার করে বিপরীত কথা বলবে। তবে ইয়াকুত বেশ ভালভাবেই জানে—রিজিয়া একজন সামান্যা শিথিলমনা সুলতানা নয়। তার মন যথেষ্ট দৃঢ় আছে। সে একটি বৃহৎ রাজ্য পরিচালনা করছে। বাঘা আমীর-ওমরাহ-মালিকদের বশে রেখেছে। তাকে কোন কিছু স্মরণ করিয়ে দেওয়া নিজেরই বাতুলতা।

রিজিয়া আবার বললো—কি ভাবছো? আহার্য গ্রহণ করবে না? এখনও কি রাগ কমলো না? বলেছি তো যদি কোন শাস্তি দেবার হয় আমাকে দিও! আমার নসীবের দোষ। তার জন্যেই যত গণ্ডগোল।

ইয়াকুত মাথা নেড়ে বললো—এসব কথা বলে আমার আর যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিও না সুলতানা! আমি আজ আহার্য গ্রহণ করতে পারবো না। আমার রুচি নেই।

রিজিয়া ইয়াকুতের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো, হেসে বললো—আমি কি তোমার ঘরের কেউ? মান-অভিমান ভাঙ্গাবো! তবে বলতে পারো—। এই বলে রিজিয়া আবার রমণীসুলভ খিল খিল করে হেসে উঠলো।

ইয়াকুত তাড়াতাড়ি সচকিত হয়ে ঘরের বাইরের দিকে তাকিয়ে সভয়ে বললো—একটু আস্তে সুলতানা। কেউ শুনতে পেলে একটা কেলেঙ্কারী হবে।

রিজিয়া এবার একটু আস্তে শব্দ করে হেসে বললো—কি আর হবে? আগামীকল্য মন্ত্রী গিয়ে আমার পার্শ্বচরের ঘরে বাঁদীর আবির্ভাব ঘটেছিল এই খবরটি শুধু দিয়ে আসবে।

আর তুমি কি করবে?

আমি মন্ত্রীকে আদেশ দেবো যে আমার পার্শ্বচরের বাসস্থান আমার প্রাসাদের

মধ্যেই ব্যবস্থা করে দাও। এই বলে রিজিয়া আবার খিল খিল করে হেসে উঠলো। হাসি থামলে বললো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল কথা ইয়া। তুমি এবার থেকে আমার প্রাসাদেই বাস করবে। প্রয়োজন হলে এতখানি আসার বিলম্ব আমার সহ্য হবে না। সেইকথা বিশেষ করে বলার জন্যেই আমার আসার কথা ছিল।

ইয়াকুত মাথা নেড়ে বললো—অসম্ভব। এসব দুষ্টুবুদ্ধি সুলতানার মাথায় থাকলে এই বান্দাকে অবিলম্বে ফেরার হতে হবে।

দুষ্টুবুদ্ধি বলছো কি? রিজিয়া বিস্মিত হবার ভাণ করলো। আমার সর্বদাই পার্শ্বচরের প্রয়োজন।

সে পার্শ্বচর পুরুষ। তুমি রমণী।

রমণী বলেই তো পুরুষ পার্শ্বচর দরকার। যার ক্ষমতাকে ভর করে রমণী নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে।

কিন্তু রমণীর পাশে পুরুষ থাকলে তার আসল অর্থ কি দাঁড়ায় নিশ্চয় তোমার জানা আছে!

রিজিয়া খিল খিল করে হেসে বললো—না জানি না। তুমি জানিয়ে দাও। রিজিয়া আবার হেসে উঠল। হাসির দমকে তার দেহের অলঙ্কারে একটা মৃদু সঙ্গীতের তান উঠতে লাগল।

রিজিয়া বলল—আচ্ছা ইয়া, তুমি আমার নাম ধরে ডাকো না কেন? আমি কত সহজে তোমার নাম উচ্চারণ করতে পারলাম আর তুমি পারো না? তুমি বোধ হয় আমাকে ভালবাসো না।

ইয়াকুত উত্তর দিল না। মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখল।

কি, উত্তর দিচ্ছ না কেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

কেন নেই? তুমি আমাকে আদর করে 'রাজি' বলে ডাকতে পারো না? আমার আম্মা ডাকতেন আমাকে রাজি বলে। ডাকটা সুন্দর না?

আমাকে মাফ কর সুলতানা। ওসব আমি বলতে পারবো না।

তবে কি আমার সাথে মহব্বত করবে দূর থেকে? কাছে আসবে না। স্পর্শ দেবে না। হৃদয়ের শোণিতে তোমার হৃদয়ের শোনিত মেশাবে না। আদর করে ডাকবে না। আমার সুগন্ধ ঘ্রাণ নেবে না। তুমি কি আল্লার কোরা-আন্ শরিফের পবিত্র মহব্বতের রোশনাই জ্বালাতে চাও? কিন্তু আমরা যে মানুষ ইয়া! মানুষ হয়ে কি করে আল্লার সেই পবিত্র মহব্বতের মসজিদে গিয়ে প্রবেশ করবো? আমি মহব্বত চাই, স্পর্শ চাই, সুখ চাই। আমার অতৃপ্ত হৃদয়ের সান্ত্বনা চাই। তোমার কাছ থেকে এই ব্যর্থজীবনে একটু শান্তি চাই। তুমি কি আমাকে শান্তি দেবে না?

রিজিয়া যেন কেমন মোহাবিষ্ট হয়ে গেলো। নিশীথরাতের গভীরে রমণী যে আকর্ষণে অভিসারিণী হয়, রিজিয়া যেন সেই আকর্ষণে ছুটে গেল ইয়াকুতের কাছে। ইয়াকুতের একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে রিজিয়া কাতর হয়ে বলল—তুমি

কি এই অসহায়া রমণীকে এইটুকু ভিক্ষা দেবে না? আজ দিল্লীর সুলতানা নিজের হৃদয়কে বধ করে সম্রাজ্ঞী হতে চেয়েছে কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল সিংহাসন কখনও বড় হয় না হৃদয়ের চেয়ে। তাকে সে ভুল সংশোধনের একটু সুযোগ দাও! রিজিয়ার চোখে জল এসে পড়লো।

হঠাৎ ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে হাঃ-হাঃ করে কে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। ইয়াকুত ও রিজিয়া উভয়েই চমকে ঘরের দরজার দিকে তাকাল। কিন্তু মূর্তিটি মুহূর্তে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পাষাণ অলিন্দের অন্ধকার প্রকোষ্ঠের দিকে চলে গেল। কালো আলখাল্লা ঢাকা লোকটির অট্টহাসি হাসতে হাসতে বলে গেল—আর বেশী দিন নয় সুলতানা। তোমার সিংহাসনের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। হাঃ হাঃ হাঃ।

ইয়াকুত ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গেলে রিজিয়া তাকে বাধা দিল। ইয়াকুত ঘণ্টাধ্বনি করে প্রহরীকে ডাকতে গেলে তাতেও রিজিয়া বাধা দিল। বলল—রাত্রির স্তব্ধ প্রহরকে বিশ্রামের শয্যা থেকে তুলে তাকে জবাই কর না ইয়া। মিছে গোলমাল করে কি হবে? ওরা প্রমাণ চায়—প্রমাণ পেয়েছে। আমি নির্দোষী তা তো বলিনি। যা সত্য তা রাতের রহস্যে চাপা থাকলেও দিনের আলোয় সম্পূর্ণ মুক্ত। ওরা তবু জানুক—রিজিয়া মন্দা মেয়েলোক হলেও তার মাঝে মাঝে রমণী মন জেগে ওঠে। একথা ইতিহাসও জানুক—রিজিয়া শুধু সুলতানা ছিল না সে রমণী। রমণীর কুসুম নরম হৃদয় নিয়ে জন্মেও স্বপ্নকে বড় করতে হৃদয়কে জবাই করেছে। ঘাতকের শাণিত কৃপাণের তলায় হৃদয়কে দিয়ে সে সুলতানা হয়েছিল। কিন্তু সে কর্তব্য থেকে কখনও সরে যায়নি।

ইয়াকুত বললো, কিন্তু লোকটাকে না ধরে তাকে ছেড়ে দিলে কেন?

কারণ লোকটাকে ধরা যেত না। তাছাড়া শুধু শুধু সেই নির্দোষীকে শাস্তি দিতে আমায় বিচারের আসনে বসতে হত। তার প্রাণদণ্ড হতো। কিন্তু আসল লোক অন্তরালে থেকে যেতো। এর পিছনে যে কারা আছে, কারা যে আমাকে কলঙ্কিনী প্রতিপন্ন করতে চায় সব আমি জানি। সেইজন্যে লোকটাকে ধরবার জন্যে অহেতুক ব্যস্ত হয়ে উঠলাম না। হয়ত ঘণ্টাধ্বনি করলে প্রহরীরা ছুটে আসত কিন্তু এসে আমাকে এখানে দেখে তারা মনে মনে কৌতুক বোধ করতো—সেই লজ্জা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আমি এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করলাম।

ইয়াকুত বলল—কিন্তু এই দেখেই বুঝতে পারছো, ওরা সর্বদা তোমার গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

সেইজন্যেই তো বলছি, আমরা ভীরু নয়, আমাদের যে সাহস আছে, আমাদের যে ক্ষমতা আছে সেটা প্রমাণ করবার জন্যেই আমরা আরও মুক্ত হব।

কিন্তু এত বড় রাজ্যে আমরা দুজন কি করব?

রিজিয়া ম্লান হেসে বলল—তুমি শুধু আমার পাশে থাকো, আর মাঝে মাঝে বুদ্ধিভ্রষ্ট হলে বুদ্ধিতে শান দিয়ে দিও। তাহলে তোমার এই 'রাজি' সমস্ত ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে কাটিয়ে তুলতে পারবে।

ইয়াকুতের জানালার গবাক্ষ দিয়ে চাঁদের রূপোলী রোশনাই রমণীরূপের জ্যোতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছিল। হঠাৎ রিজিয়ার চোখ দুটি সেইদিকে তাকিয়ে আটকে গেল। মৃদু হেসে ইয়াকুতের দিকে তাকিয়ে বললো—ইয়া, একটা অনুরোধ আমার রাখবে? এই রাত্রে আমার সঙ্গে একটু অশ্বারূঢ় হয়ে যমুনার তীর পর্যন্ত যাবে?

যমুনাতীর? ইয়াকুত অস্ফুটস্বরে কথাগুলি উচ্চারণ করলো।

হ্যাঁগো হ্যাঁ। ছাখো না, তোমার ঘরে চাঁদনী রোশনাই তার যৌবন নিয়ে কেমন খেলা করছে? এর আসল রূপ দেখতে হলে এই রাত্রে যমুনার পাণিতে গিয়ে চোখ রাখতে হবে। যমুনার পাণিতে চাঁদনী রোশনাই রমণীর যৌবন-চাপল্য ক্রীড়া করে ফিরছে। চল না ইয়া! দেখলে তুমি সার্থক হয়ে যাবে। আমি কতদিন আম্মার সঙ্গে এই রাত্রে গিয়ে যমুনার এই রূপ দেখে এসেছি।

ইয়াকুত বিস্ময়ে বলল—কিন্তু সে তো অনেক পথ? তা ছাড়া এই গভীর রাত। কাজটা কি ভাল হবে?

'ডরো মৎ ইয়া।'

তুমি পাশে থাকলে আমি একাই যুদ্ধে সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করতে পারি। তুমি কি জানো না, একটি পুরুষের শক্তি একটি রমণীকে আরও শক্তিময়ী করে!

দিল্লী সাজানো নগর। তুর্কী-সুলতানের পরিচ্ছন্ন মনের পরিচায়ক। সমগ্র উত্তর ভারতের রাজত্বকে সুশৃঙ্খলার মধ্যে রাখবার জন্যে তুর্কী-সুলতানরা রাজ্যের ভূমিকে সুরম্য ও সুসজ্জিত করে রেখেছে। তুর্কী-সুলতানদের সুশিক্ষিত মনের পরিচয় তাঁদের শাসিত রাজ্যের চারিদিক দেখলে প্রতীয়মান হয়। পথের দু'পাশে বৃক্ষাদি রোপণ করে ছায়ার সৃষ্টি করা হয়েছে। ঘোড়সওয়ার যাওয়ার জন্যে প্রশস্ত পথ। জঙ্গলাকীর্ণ বাধা বিপত্তিগুলি অপসারণ করে পুষ্পবৃক্ষের শোভা সর্বত্র। বেলা, মল্লিকা, চামেলী, গন্ধরাজ প্রভৃতি নানারঙের ফুলে পথের দু'পাশ সুসজ্জিত।

রিজিয়ার পিতা আলতামাস অনেক বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের কাল ছিল ছাব্বিশ বছর। তিনি এই ছাব্বিশ বছর একাদিক্রমে উত্তর ভারতে রাজত্ব করে—সমগ্র হিন্দুস্থান পর্যন্ত তাঁর রাজ্যবিস্তার লাভ করেছিল। তিনি তুরস্কের 'ইলবারি' শাখায় উৎপন্ন হয়েছিলেন বলে তাঁর শিল্পানুরাগ সর্বজনবিদিত ছিল। তাঁরই চেষ্টায় তাঁর শাসিত সমস্ত রাজ্য সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত হয়ে উঠেছিল।

রিজিয়া সেই আলতামাসের কন্যা। পিতার শিল্পানুরাগ তার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। রিজিয়া তাই তার নিজের মনের মত করে নগরীর শোভাবর্ধন করেছিল।

চাঁদের রূপোলী রোশনাই সেই শোভার ওপর পড়ে রাতের রূপকে আরও সৌন্দর্যপূর্ণ করেছিল। আসমানের উজ্জ্বল নক্ষত্রের উপস্থিতিও সেই সৌন্দর্যের অংশীভূত। নিস্তব্ধ রাত্রে অপরূপ স্তব্ধ রূপের মধ্যে সুষুপ্তিময় নগরীর ভেতর দিয়ে শুধু দুটি অশ্বারোহীর পায়ের শব্দ মুখরিত হয়ে উঠছে।

দুটি শ্বেত অশ্বের গায়ে চাঁদনী রোশনাই। পাশাপাশি দুটি অশ্বের পিঠে সুলতানা রিজিয়া ও ইয়াকুত। দ্রুত চলেছে অশ্ব। সঙ্গে কোনো সান্ত্রী ঘোড়সওয়ার

নেই। এখনই যদি কোন শত্রু তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—তাহলে প্রাণ যাবার আশঙ্কা বিদ্যমান। তবে দুজনেই অত্যধিক সাহসী। রণকৌশলে সিদ্ধহস্ত। রিজিয়ার কাছেও একটি ছোরা একটি তরবারি ছিল।

যমুনার পাণিতে চাঁদের রূপদর্শনে প্রাণ মনে আনন্দের পরশ বুলোতে বুলোতে চলেছে। কিন্তু সঙ্গে অস্ত্র নিতে ভোলেনি। এই কিছুক্ষণ আগে তার গতিবিধির অনুসন্ধানে লোক নিয়োজিত হয়েছে—তার প্রমাণ হয়ে গেছে। এখনও যে কেউ না কেউ তাদের এই নৈশ ভ্রমণ প্রত্যক্ষ করছে না—বিশ্বাস হয় না। এমন কি হয়ত অতর্কিতে একদল অশ্বারোহী সৈন্য তাদের আক্রমণ করে এই নিস্তব্ধরাত্রে যমুনার জলে রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে পারে।

দ্রুত অশ্বের গতি যমুনার তীরভূমি লক্ষ্য করে। রিজিয়া ইয়াকুতের পাশাপাশি চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, একটু আস্তে ইয়া। আমরা কি শত্রুনিধনে এগিয়ে চলেছি ?

কিন্তু পথে কোন শত্রুর মুখোমুখি পড়তে পারি তো!

রিজিয়া হেসে বলল—যার ঘরে শত্রু তার শত্রুকে ভয় করে লাভ কি ? তার চেয়ে আস্তে চল। অন্ততঃ আজকের রাত্রের এই মোহিনী দৃশ্য মনের মধ্যে স্মৃতি করে জীবনকে অক্ষয় করে রাখি। হয়ত এদিন আর নাও আসতে পারে। তুমি পাশে আছ। তোমার সাথে এই নিভৃত রাতের সুষুপ্তিময় নগরীর উন্মুক্ত পথ দিয়ে যমুনা-বিহার করতে যাচ্ছি—ভাবতেও মনের মধ্যে রোমাঞ্চ লাগছে। অন্ততঃ এই সুন্দর ভাবনাকে জবাই করে শত্রুর ভয় দেখিও না।

আবার পথ। আবার নিস্তব্ধতা। আবার চাঁদের রূপোলী রোশনাই দিগন্তকে পরিব্যাপ্ত করেছে। সুষুপ্তিময় নগরীর জায়গায় জায়গায় নগরবাসীর ঘর। দিনের বেলায় এ পথ দিয়ে প্রায় রোজই রিজিয়া নগর-ভ্রমণ করে। কিন্তু রাত্রিবেলা এই পথে অনেকদিন পর এই প্রথম। তাই সুষুপ্তিময় নগরীকে দেখে রিজিয়ার অনেকদিন পর একটা চিন্তা মনকে ছেয়ে দিল।

আজ এই সমস্ত ভূমির একমাত্র অধিকারিণী সে নিজে। আগামী কল্য সে যদি এই সমস্ত নগরবাসীকে উচ্ছেদ করতে চায় তাহলে নগরবাসীর কেউই তাকে বাধা দিতে পারবে না। সমস্ত নগরকে আগুণে দগ্ধ করে দিতে পারে। কয়েক সহস্র অশ্বারোহী পাঠিয়ে তরবারী দিয়ে ছেদন করে নগরবাসীদের এই রকম পদ্ধতিতে শাস্তি দিলে তবে রাগ যায়। এরা তার সম্বন্ধে নানা নোংরা আলোচনা আর্যাবর্তের চারিদিকে ছড়িয়েছে। আসলে সে বোঝে—ঈর্ষা। রমণী রমণীকেই বেশী ঈর্ষা করে। লাহোর, পাঞ্জাব, সিন্ধু, মুলতান প্রভৃতি প্রদেশের লোকেরাও তার বিরুদ্ধে নানা মন্তব্য করতে শুরু করেছে। এর আসল গোড়াপত্তন এই দিল্লীর অভ্যন্তরে। এখানকার রমণীরা গৃহস্থ হয়ে এক তুর্কী রমণীকে সিংহাসনে বসতে দেখে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। যেমন তার বহিন আসমান। আসমান তাকে 'মর্দ্দা' বলে। কেন বলে সে তা জানে। আসমানকে ক্ষমা করেছে উপায় নেই বলে। কিন্তু এই

নগরবাসী তার অনুগ্রহে তারই রাজ্যের ভূমিতে বাস করছে। বেইমানদের শাস্তি কি বেশ ভালভাবেই জানে রিজিয়া। কিন্তু এখন চুপ করে থাকতে হবে। একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলি জট পাকিয়ে পাকিয়ে আস্তে আস্তে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বার চেষ্টা চলছে। রাত্রি নিস্তব্ধ হলে প্রাসাদের পাষাণ প্রকোষ্ঠের অন্ধকার অলিন্দে কে বা কারা ফিসফিস করে গোপন পরামর্শ করে। রিজিয়া যেন শুনতে পায় তাদের কথা। বাতাসে যেন তাদের কথার আসল অর্থ উড়ে উড়ে এসে রিজিয়াকে সংবাদ জানিয়ে যায়। সাবধান করে বলে যায়—হুঁশিয়ার!

হুঁশিয়ার রিজিয়া সর্বদাই আছে। কে বা কারা—কোত্থেকে বিদ্রোহের ধোঁয়ার প্রথম দাবাগ্নি জ্বালাবে—সে তা জানে। জানে বলেই তার চিন্তা। সমস্ত দিকে সম্পূর্ণ সচেতন দৃষ্টি রেখে কাজ না করলে সিংহাসন তো যাবেই—তার সাথে প্রাণের মায়াও ছাড়তে হবে। কিন্তু ইয়াকুত বিশ্বাসী? সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে হঠাৎ একটা চমক লাগল। রিজিয়ার একটি অভ্যাস ছিল, মনের মধ্যে যে কথা উদয় হত সেটা যথার্থ কি না—সঙ্গে সঙ্গে জেনে নিত। তাই যখন ইয়াকুতের সম্বন্ধে ঐ ধরণের কথা মনে এল সে পথের মাঝে চলমান অশ্বের গতিরোধ করে ইয়াকুতের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—আচ্ছা, তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি, ইয়া!

ইয়াকুত আচমকা এই ধরণের কথা শুনে রিজিয়ার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল, তারপর বলল—হঠাৎ এই ধরণের প্রশ্ন সুলতানার মনে উদয় হল কেন?

রিজিয়া হেসে বলল—আমার অপরাধ নিও না ইয়া। আমি বুঝতে পাচ্ছি, আগামী দিনে আমাকে আবার আর একটি ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের মুখোমুখি হতে হবে। এবং সেই বিদ্রোহের সুচনা এই রাজ্যের সর্বত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে জেনে নিতে হবে আমাদের কে শত্রু আর কে মিত্র। কারণ কাকে আমি বিশ্বাস করব—আর কাকে করব না। তবে বিশ্বাস করার মত আর কেউ নেই। দু'একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছাড়া সবাই বিদ্রোহীদের দলে। এক তুমি বাকী। তোমার কাছে জিজ্ঞেস করলাম এইজন্যে যে তোমার স্পষ্ট উক্তিটা আমার আগামী কার্যসূচনায় সাহায্য করবে বলে।

ইয়াকুত হঠাৎ অশ্বের পিঠ থেকে মাটিতে নেমে নিজের কোমরের খাপ থেকে তরবারিটা আসমানের দিকে উঁচু করে তুলে বলল—জালাউদ্দীনের কলিজায় একফোঁটা খুন থাকা পর্যন্ত সে দিল্লীর সুলতানার সাহায্যে লাগবে।

ধন্যবাদ ইয়া। স্মিতহাস্যে রিজিয়া ইয়াকুতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল—আমি জানি ইয়া, একথায় তোমার মনে গোসা হবে। কিন্তু আল্লার দোহাই, আমি কোন মন্দ অভিপ্রায় মনে গ্রহণ করে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নি। আমি বুঝতে পাচ্ছি না কে যে আমার মিত্র—আর কে যে আমার শত্রু। মন্ত্রী, সেনাপতি, মালিক, সামন্ত, আমীর-ওমরাহরা সবাই আমায় শ্রদ্ধা করে। কিন্তু পিছনে গেলে এরা সবাই আমার বিরুদ্ধে নানা পরামর্শ করে। আমি শুনতে পাই এদের সেই পরামর্শ। কিন্তু একসময় কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ি।

আবার দুটি অশ্বারোহী যমুনাতীর লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল। একটা বাঁকের মুখে এসে দুজনেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। অনেকদূর থেকে যেন মনে হল দ্রুত একটি অশ্বারোহী প্রাসাদের পথ দিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে।

ইয়াকুত তড়িৎবেগে পথের একপাশে বৃক্ষাদির আড়ালে সরে এসে খাপ থেকে তরবারী বের করে নিল। রিজিয়াও ইয়াকুতের মত তদ্রূপ করল।

কিছুক্ষণের মধ্যে অশ্বারোহী ইয়াকুত ও রিজিয়া যেখানে লুকিয়ে ছিল সেই ঘন বৃক্ষাদির কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। তারপর চতুর্দিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে না পেয়ে পশ্চাদ্ধাবন করল। অশ্বরোহী দ্রুত পথের বাঁকে মিলিয়ে গেলে ইয়াকুত ও ও রিজিয়া গোপনস্থান থেকে বেরিয়ে এসে আবার এগিয়ে চলল।

আরও কয়েক গজ এগিয়েই পাওয়া গেল যমুনাতীর। যমুনার কালো জলে চাঁদের রূপোলী আলো পড়ে অপূর্ব রূপের সৃষ্টি হয়েছে। হাজারো রোশনাইয়ের বৈদ্যুতিক চমক যমুনার জলে। যেন হাজারো মাসুম লেড়কীর স্পর্শহীন যৌবনের কামনা লালসার আগুনের ফুল্‌কি। নিস্তরঙ্গ যমুনার স্রোত। দূরে ওপারের শেষ দেখা যায়। দিনের মত স্বচ্ছ আলোতে সব যেন আরও স্পষ্ট ও আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

সুলতানা রিজিয়া যমুনার দিকে তাকিয়ে ছেলেমানুষ হয়ে উঠল। খিল খিল করে হেসে সে উন্মুক্ত যমুনার তীরকে উচ্ছল করে তুলল। অশ্বের পিঠ থেকে নেমে সে চীৎকার করে আসমানের দিকে তাকিয়ে বলল—'ইয়া খোদা মেহেরবান, তুমি এই পৃথিবীর পিতা হয়ে কি অপূর্ব রাজত্ব বিস্তার করেছ। আর আমি এই এক মাসুম লেড়কী, আমি এক সামান্য রাজ্যকে সুশৃঙ্খলভাবে চালাতে পারি না।'

রিজিয়া কাঁদল। রিজিয়া হাসল। রিজিয়া যমুনার তীরে ছোট্ট মেয়েটির মত উচ্ছল হয়ে নাচল। ইয়াকুত চেয়ে চেয়ে শুধু দেখল। শুধু শুনলো। শুধু উপভোগ করল। সে রাতের স্মৃতি চির অক্ষয় হয়ে থাকল। ইতিহাসে হয়ত সে রাতের কাহিনী লেখা থাকবে না। কিন্তু ইয়াকুত যতদিন বাঁচবে—ততদিন জেনে থাকবে, রিজিয়া একটি রাতের জন্য তার মনকে উদ্ঘাটিত করেছিল।

সে রমণী। সে পুরুষের বেশে রাজ্য পরিচালনা করলেও তার রমণী মন—রমণীয় মন। তার হৃদয় ছিল। সে হৃদয়ে ছিল মমতা। যে মমতা তুর্কী রমণীর হৃদয়ে বিরল। তার মন হিন্দু রমণীর ছাঁচে গড়া। সে বঁধু। সে প্রেমিকা। কিন্তু সুলতানা। সুলতানা হবার তপস্যা নিয়ে জন্মেছিল বলে আজীবন সে দৃঢ় হস্তে রাজদণ্ড ধরে রাজ্য শাসন করে গেছে। অপরাধীর বিচার করেছে। এই হাতে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছে। কিন্তু মানুষকে হত্যা করার ইচ্ছা তার ছিল না। মানুষের মমতা দিয়ে গড়া মন মানুষকে কখনও বধ করতে পারে না।

এর কদিন পরে।

রিজিয়া সর্বদা আশা করছিল আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ কোথা থেকে শুরু হয় দেখবে। কারণ তার রাজ্যে কখন কোথায় কি হচ্ছে সবই তার নখদর্পণে। জানা না থাকলে

রমণী হয়ে এই উচ্ছৃঙ্খল প্রজাদের বশে রাখতে পারত না। পিতা আলতামাস যেমন এই দুষ্ট পারিষদবর্গকে শাসনের দণ্ড দিয়ে বশে রেখেছিলেন, রিজিয়াও পিতার শাসন-পদ্ধতির অনুকরণ করেছে। কিন্তু পিতা আলতামাসের কঠোর শাসনে রাজ্যের লোকেরা যেমন বশে ছিল, তার বৈমাত্রেয় ভাই রুকনউদ্দীনের রাজ্য পরিচালনায় তাদের ঘুমন্ত দুষ্টবুদ্ধি আবার জেগে উঠেছিল। রুকনউদ্দীনের যত ভোগবিলাসের স্রোত ভীষণ উদ্দাম হয়ে উঠল—কোষাগারের ধনরত্ন অঢেলভাবে ব্যয় হতে কার্পণ্য হল না। তঁত রাজ্যের আমীর মালিকেরা শিথিল হয়ে পড়তে লাগল। যখন রিজিয়া সিংহাসনে বসল তখন এদের বশে আনতে তাকে বেশ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হল। সেই থেকে সে জানে রাজ্যের আমীর ওমরাহদের মনোগত অভিপ্রায় কি।

সেদিন রাতের ঘটনার পর সে সর্বদাই প্রত্যাশা করছিল—তার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একদল লোক গোপনে পরামর্শ করছে—এবং তারা কোন দিক দিয়ে তাকে আক্রমণ করবে তাই এখন চিন্তার বিষয়। আবার এদের সঙ্গে আছে ইতিগীন ও তার কুলাঙ্গার বৈমাত্রেয় ভাই বহরাম। বহরাম তার রঙমহলে এদের জৈবিক ক্ষুধার খোরাক পরিবেশন করে। ইন্দ্রিয়ের সুখের ইন্ধন যুগিয়ে সে এদের বশ করেছে। আর ইতিগীন। তার আক্রোশ! সে ইয়াকুতের ওপর ঈর্ষান্বিত হয়ে রিজিয়াকে অপদস্থ করবার চেষ্টা করছে। অথচ একেই সে খুশী হয়ে রাজপ্রাসাদের পরিরক্ষক করেছিল। এখন তার সে পদ কেড়ে নিতে গেলে আমীরওমরাহদের বিরাগভাজন হতে হবে। ষড়যন্ত্রের ওপর অগ্নিসংযোগ করা হবে।

কি ভুলই যে-সে করেছে! হৃদয়ের মমতা যেখানেই স্পর্শ করেছে, রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা সেখানেই জেগে উঠেছে। অথচ হৃদয়কে বধ করে রাজ্য পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। অপরাধীকে শাস্তিও যেমন দিয়েছে রিজিয়া—লঘু অপরাধকে ক্ষমাও করেছে অনেক সময়। ক্ষমা করার সময় তার রমণীর রমণীয় মন উন্মুক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে খুব গোপনে। তার দুর্বল মনের খবর পেলে সিংহাসনের পাশে দণ্ডায়মান বন্ধুরাই শয়তানের রূপ ধরে তাকে সিংহাসনচ্যুত করবে।

কিন্তু ইতিগীনের প্রতি যে মমতা দেখিয়ে ভুল করেছে, ইয়াকুতের প্রতি সে ভুল করেনি। ইয়াকুত বিশ্বাসী। বিদেশী বন্ধু। তার প্রতি দুর্বল হয়ে সে ভাল কাজই করেছে। ইতিগীনকে স্নেহ দেখিয়ে সে অন্যায় করেছে—ইয়াকুতকে ভালবেসে সে ভুল করেনি।

রিজিয়ার খাসবাঁদী দুজন। ফিরোজা ও মরিয়ম। মরিয়মকে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কথাটা প্রথমে শুনে রিজিয়া খুব আমল দেয় নি। কারণ তার মহলের বাঁদীরা তার কড়া পাহারার মধ্যে বাস করে। সেখান থেকে তারা বাইরে গিয়ে কারুর সঙ্গে মজে রাত কাবার করবে—সে চিন্তা করতে পারে না। সেইজন্য মরিয়ম বাঁদী মহলে নেই, একথা প্রচারিত হলেও বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। কিন্তু পরে জানা গেল সত্যিই সে রিজিয়ার খাসমহল থেকে অদৃশ্য হয়েছে।

রিজিয়া যখন সত্যিই বিশ্বাস করল, মরিয়ম অদৃশ্য হয়েছে তখন সে চমকে উঠল। আবার নিশ্চিন্ত হল এই ভেবে যে, মরিয়ম বহুকাল ধরে এক সৈনিকপুরুষকে ভালবাসে। সে কথা রিজিয়া গোপনে সংগ্রহ করেছিল। সৈনিকপুরুষটির নাম নসরুদ্দীন। কিন্তু রিজিয়া রাজ্যে নরনারীর মেলামেশা আইন করে বন্ধ করে দিয়েছিল। এমন কি বিয়ে-শাদী পর্যন্ত সুলতানার হুকুম ছাড়া হবে না। তাই যখন শুনল, শাস্তি দেবার ব্যবস্থা মনে মনে করেছিল। কিন্তু মরিয়মকে সে স্নেহ করে। যে ঘটনা সবার অগোচরে আছে সে ঘটনাকে লোকচক্ষে তুলে ধরে বে-আইনি সাব্যস্ত করতে রিজিয়ার ইচ্ছা করল না। তা ছাড়া মরিয়মের ফুলের মত সুন্দর মুখটি কল্পনা করে সে তার অপরাধের কথা বিস্মৃত হতে চাইল।

এসব ক্ষেত্রে অবশ্য ফিরোজা একেবারে অভিন্ন। সে সুলতানার পন্থাই অবলম্বন করেছে। সুলতানার মত রমণী মনের প্রবৃত্তিগুলিকে চাপা রেখে সে সুলতানাকে অনুসরণ করে। এক একসময় অবশ্য মন ভাল থাকলে রিজিয়া ফিরোজাকে জিজ্ঞেস করেছে—হ্যাঁরে, তুই কি সুলতানার ব্রতই গ্রহণ করলি? শাদী করবি না? তোর জন্যে যে রাজ্যের বড় বড় আমীররা পথ চেয়ে দিন গুণছে। রিজিয়া হাসল।

ফিরোজার উত্তর কিন্তু খুব গম্ভীর প্রতিশব্দ—"গোস্তাখি মাফ কর সুলতানা বেগম। আমি যেন আমার সুলতানার পথানুসরণ করতে পারি।

চমকে উঠেছে সুলতানা রিজিয়া। 'সুলতানার পথানুসরণ করতে পারি'—এ প্রতিশব্দে সুলতানা তার হৃদয়ের অন্ধ গলিগুলিতে হাতড়িয়েছে। ফিস্ ফিস্ করে নিজেকে নিজেই শুনিয়েছে—"সে কি সত্যি পুরুষ ছাড়া জীবন যাপন করতে পারে?" তারপর সে তাড়াতাড়ি চারিদিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখেছে—কেউ শুনেছে কি-না তার কথা।

ফিরোজা কিন্তু আজও নিষ্পাপ। সে কোন রাজপুরুষকে মনে মনে কল্পনা করে না—এ সন্ধান রিজিয়া বেশ ভালভাবেই নিয়েছে।

কিন্তু মরিয়ম সম্পূর্ণ ফিরোজার ভিন্ন। তার চলনে, কথাবার্তায়, চোখের চাহনিতে রিজিয়া দেখেছে তার মনে নানা আশা। শুধু ভয়ে তার হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ। সে খাসমহলের বাঁদী। তার পদমর্যাদার গুরুত্ব অনেক বেশী। সে সুলতানার পাশে পাশে থাকে। তার বাচালতা যে সুলতানা ক্ষমা করবে না সে জানে। তাই তার দেহের ঐশ্বর্য্যের বর্ণাঢ্য সে ম্লান করে রাখবার চেষ্টা করে। কিন্তু অগ্নিকে সিন্দুকের মধ্যে গোপন করে রাখলে তা থাকবে কেন। তার প্রকাশ আশেপাশের মানুষের চোখ ধাঁধাবে। তাই মরিয়মের যৌবনের গোলাম আসতে দেরী হয় নি। নসরুদ্দীনকে রিজিয়া দেখেছে। সৈনিক যুবকটি খুব শীঘ্র নিজের ক্ষমতায় উচ্চপদে উন্নীত হবে। মরিয়ম একে আপন করে খুব ভুল করেছে।

কিন্তু মরিয়ম অদৃশ্য হয়েছে শুনে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। নসরুদ্দীন সেনা-প্রাসাদে থাকলে হয়ত চিন্তা করা যেত মরিয়ম নসরুদ্দীনের অভিসারিকা হবার জন্যে আত্মগোপন করেছে। কিন্তু সে আজ অনেক মাইল দূরে যুদ্ধক্ষেত্রে। রণথম্ভোর দুর্গে সেনাপতি

হুসনঘোরির সঙ্গে যুদ্ধ করে রণথম্বোর দুর্গ দখল করতে গেছে। যদি সে রণথম্বোর দুর্গ জয়লাভ করে আসে সুলতানা তাকে উচ্চ পদমর্যাদায় ভূষিত করবে, খেতাব দান করবে।

তাহলে মরিয়ম কোথায় গেল? চিন্তায় পড়লো রিজিয়া। প্রাসাদের খোজা-প্রহরীদের ডেকে আদেশ দিল, চব্বিশঘণ্টার মধ্যে মৃত-অথবা জীবিত মরিয়মকে তার চাই।

খুসক্ফিরোজী প্রাসাদ থেকে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত। সুলতানার কঠোর আদেশ চারিদিকে প্রচারিত হল—জীবিত অথবা মৃত মরিয়মকে চাই।

হ্যাঁ চাই। রিজিয়া মরিয়মের লাশই দেখতে চায়। দেখতে চায় মরিয়ম বেগুণা, না অপরাধী। তাকে কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে তার ইজ্জতকে পিষে দিয়েছে, না-সে নিজে স্ব-ইচ্ছায় তার সম্ভ্রমকে একজন শয়তানের হাতে তুলে দিয়েছে। তাই মৃত অথবা জীবিত মরিয়মকে চাই। জীবিত থাকলে রিজিয়ার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তার পাপের শাস্তি লঘু করবে অথবা মৃত হলে রিজিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে তার দেহের প্রতিটি রেখা পরীক্ষা করে তারপর নিশ্চিন্ত হবে।

চব্বিশ ঘণ্টার আগেই মরিয়মের দেহ পাওয়া গেল। বহরামের রঙমহলে নর্তকীদের ঘর থেকে উদ্ধার করা হল। রিজিয়া যখন মৃতপ্রায় মরিয়মকে দেখল তখন সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। ফুলের মত নরম সুন্দর প্রাণচঞ্চল একটি রমণী দেহ। যাকে দেখে রিজিয়া কতদিন হতবাক হয়ে থেকেছে। মরিয়মের সৌন্দর্য যেন খুসক্ফিরোজী প্রাসাদ-মহলের ঐশ্বর্য। রিজিয়ারও রূপ জগদ্বিখ্যাত কিন্তু সে সুলতানা। তার দেহে আছে সুলতানার ধনরত্নের ঐশ্বর্য। রাজকোষের সেরা মণিমুক্তা তার অঙ্গের শোভাবর্দ্ধন করে। কিন্তু মরিয়ম বাঁদী হয়েও যেন সুলতানার মণি-মুক্তা, হীরা-জহরতের ঔজ্জ্বল্যকে ম্লান করেছে। ঈর্ষা হয় নি রিজিয়ার—ভয় করতো মরিয়মের সৌন্দর্য দেখে। সেই মরিয়মের এই অবস্থা দেখে তার শোণিতে দাহ সৃষ্টি হলো। ক্ষুব্ধ চোখে শাণিত দৃষ্টি নিয়ে রক্তশূন্য নিস্তেজ লতানো দেহটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কারা যেন ক'টি রাতে একটি রমণীদেহের সৌন্দর্যটুকু চুষে নিয়েছে। কারা আবার? কে যে এ কাজ করেছে রিজিয়া জানে? কার এত সাহস হবে তাও জানে রিজিয়া। রুকনউদ্দীনের মত যদি বহরামকে সে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দিতে পারতো? কিন্তু রুকনউদ্দীনকে সে যত সহজে শেষ করে দিতে পেরেছে। বহরামকে সেভাবে পারবে না। কারণ বহরাম উচ্ছৃঙ্খল হলেও কৌশলী। সে জানে, আমীর-ওমরাহদের কি করে বসে রাখা যায়। তার কথায় অনেক আমীর-ওমরাহ মালিকরা প্রাণ পর্যন্ত সমর্পণ করতে পারে। বহরামকে উচ্ছেদ করতে গেলে বিদ্রোহের দাবানল আর চাপা দেওয়া যাবে না। তার চেয়ে এদের বশে এনে রাজ্যের বিদ্রোহ কমিয়ে তারপর বহরামকে চরমতম শাস্তি দিতে হবে।

কিন্তু মরিয়ম? মরিয়ম দিল তারই জন্য ইজ্জত-বলি?

রিজিয়া তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাসিরুদ্দীনকে কোরাণ শরিফের মর্মার্থ বুঝিয়ে দিচ্ছিল। নাসির অত্যন্ত একনিষ্ঠ শ্রোতা ও প্রিয় ছাত্র। সম্পূর্ণ আগ্রহ নিয়ে সে ভগ্নীর কাছে কোরাণ শরিফের ধর্ম কথা শুনছিল। সামনে মেহগিনি কেদারার ওপর রাখা বৃহৎ কোরাণ শরিফটি। 'হারানো ইউসুফের' জন্য তার মন কাতর হয়ে উঠেছিল। এই সময় মরিয়মের দেহ নিয়ে খোজা প্রহরীরা প্রবেশ করল।

তাই আর কিছু ভাবতে না পেরে তার মহলে মরিয়মের অচৈতন্য দেহটি পাঠিয়ে দিল সেবা শুশ্রূষার জন্যে এবং জ্ঞান ফিরে এলে যেন সুলতানাকে খবর দেওয়া হয় একথা জানিয়ে দিল। মরিয়মের দেহ নিয়ে বাহকেরা চলে গেলে রিজিয়া আবার কোরাণ-শরিফে মন দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু মন বসল না। 'হারানো ইউসুফের' জন্য যত না মন তার কাতর হল, মরিয়মের জন্য তত বেশী কাতর হল। বেচারী মরিয়ম। বেগুণা মরিয়ম। নিষ্পাপ মরিয়ম।

সুলতানার ইজ্জতের মূল্য দিয়ে সে নিজের ইজ্জত বিলিয়ে দিল।

সুলতানার সম্মানকে রক্ষা করে সে নিজের সম্মানকে বলি দিল। রিজিয়া পবিত্র কোরাণ-শরিফকে আদাব জানিয়ে, নাসিরকে বিদায় দিয়ে, সে উঠে এল নিজের খাসকামরায়।

না-না-না। এ সহ্যের অতীত! সে সুলতানা। এরা এই কুকুরের দল তুর্কীজাতির সম্মানকে পৃথিবীর চোখে হেয় করে কোরাণ-শরিফকে ছুরিকাহত করবে এ কখনই সহ্য করা যায় না। হ্যাঁ কোরাণ-শরিফ। পবিত্র কোরাণের মত রমণীহৃদয় পবিত্র। সেই পবিত্র রমণীহৃদয়কে একজন শয়তান রক্তাক্ত করেছে। তাকে শাস্তি না দিলে সে নিজে দোষী সাব্যস্ত হবে। খোদা তাকে মেহেরবাণী করবে না। সে সুলতানা নয়, সে আল্লার প্রেরিত দূত। সে যদি তার ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন না হয় তাহলে সে নিজে দোষী। ক্ষমতার অপব্যবহার না করে ব্যবহার করাই খোদার অভিপ্রেত।

কিন্তু রিজিয়া ভেবে পেল না সে কি করবে? বহরামকে শাস্তি দেওয়া তার সাধ্যাতীত। বহরামের রঙমহলকে উচ্ছেদ করাও তার দ্বারা হবে না। অথচ সে জানে যে রিজিয়ার প্রিয় বাঁদী মরিয়মকে নষ্ট করলে রিজিয়া শাস্তি পাবে। রিজিয়াকে সব সময় অপদস্থ করারই ইচ্ছা তার। কিন্তু মরিয়মের ফুলের মত নিষ্পাপ হৃদয়কে নষ্ট করে বহরাম রিজিয়াকে যতটুকু শাস্তি দিয়েছিল ভেবেছে—তার চেয়ে অনেক বেশী শাস্তি রিজিয়া পেয়েছে।

রিজিয়া ভাবে, তার নিজের ইজ্জত খোয়া গেছে। তার নিজের রক্ত বৈমাত্রেয় শয়তানভাই বহরাম চুষে নিয়েছে। একই পিতার রক্ত দেহে থাকা সত্ত্বেও সে থামেনি। এমনি কুলাঙ্গার ভাই তার। মনুষ্য সমাজের কলঙ্ক। ঘৃণ্য।

বেচারী নসরুদ্দীন। হয়ত মনের কত উদ্যম নিয়ে সে রণথম্বোর দুর্গ শত্রুর হাত থেকে উদ্ধারের কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। হয়ত জয় হবে শুধু তারই জন্যে। তারই রণকৌশলে শত্রুরা পরাজয় স্বীকার করবে। ফিরে এলে সেনাপতি হসনঘোরির মুখে জানা যাবে নসরুদ্দীনের কৃতিত্ব। রিজিয়া স্মিতহাস্যে বীরকে কুর্নিশ করে তাকে সম্মানীয় পুরস্কার

দানে ভূষিত করবে। নস্রুদ্দীন হয়ত সমস্ত লজ্জা ভয় ত্যাগ করে মরিয়মের পাণি-প্রার্থনা করবে।

রিজিয়া নস্রুদ্দীনের বীরত্বে খুশী। তার আরজি মঞ্জুর করতে দ্বিধা করবে না।

কিন্তু নস্রুদ্দীনের সমস্ত আশা-ভরসা, সুখ-আহ্লাদ, প্রেম-প্রীতি, দিল্লী-নগরে প্রবেশ করলেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তার বিজয়োল্লাস অপরে উপভোগ করবে আর সে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে পুনরায় ব্যক্তিগত যুদ্ধের আয়োজন করবে। কে তার হৃদয়ের কুসুমটি ছিঁড়ে নিয়েছে তার জন্য তরবারী শানাবে।

এ সবই ষড়যন্ত্র। রিজিয়া বুঝতে পারে ওরা ষডযন্ত্র করেই এক ঢিলে 'দুই পাখী' বধ করেছে। বেগুণা মরিয়ম ইজ্জত দিয়েছে। কিন্তু অপরাধী দুজন—নস্রুদ্দীনের মহব্বতের কথা ওদের অজানা নয়। নস্রুদ্দীন মরিয়মের মত খুবসুরত জোয়ানি লেড়কিকে উপভোগ করবে—ওরা তার জন্যে ঈর্ষান্বিত। হয়ত ওরা মরিয়মকে তার কাছ থেকে চেয়েছিল। দেয়নি বলে—নস্রুদ্দীনের অবর্ত্তমানে মরিয়ম বলি হয়ে গেল। এছাড়া রিজিয়ার প্রিয়বাঁদীর ইজ্জত তার মহল থেকে নিয়ে গিয়ে পিষে দিয়েছে। কতদূর স্পর্দ্ধা থাকলে সুলতানার ইজ্জত নিয়ে শয়তানরা খেলা করে। সুলতানার ইজ্জত ছাড়া কি ? তার মহলের ইজ্জত গেলেই তার ইজ্জতে হাত পড়ে। মরিয়ম শুধু যায়নি, সুলতানার ইজ্জতের সম্ভ্রম নষ্ট হয়েছে। দিল্লীর তুর্কী সিংহাসনের পবিত্রতা কলঙ্কিত হয়েছে।

একজন বীর যখন সজল চোখে এসে তার কাছে ভিক্ষা চাইবে তখন সে কি বলবে ? বলবে সে সুলতানা হয়েও অক্ষম। তার শক্তি আলতামাসের শক্তি নয়। তারই খাসমহল থেকে বাঁদীকে চুরি করে শয়তানরা তাদের ভোগ-লালসা চরিতার্থ করেছে।

রণথম্বোর দুর্গের বিজয়ী বীরকে সে পুরস্কার দেবে মরিয়মের উচ্ছিষ্ট যৌবন। হাঃ হাঃ হাঃ। কে যেন রিজিয়ার অন্তরের ভেতরে অট্টহাসি হেসে উঠলো।

বাঁদী এসে জানালো মরিয়মের জ্ঞান ফিরে এসেছে। রিজিয়া স্খলিতপদে গিয়ে মরিয়মের সামনে দাঁড়ালো অপরাধিনীর বেশে। রিজিয়ার কোন কথাই মরিয়মকে জিজ্ঞাসা করতে হল না। সে চোখের জলের সাথে বলে গেল গত ক'রাত্রে বিশ্রী ভয়ঙ্কর কলঙ্কিত জীবনের কাহিনী।

ওরা জানত নস্রুদ্দীন দিল্লীতে নেই। ওরা সেই সুযোগ গ্রহণ করেছে। খুসক্-ফিরোজী প্রাসাদের বাঁদীমহল থেকে অতর্কিতে রাত্রিবেলা প্রবেশ করে কালো কাপড়ের ঢাকনা দিয়ে তাকে জড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে। যখন তার কালো কাপড়ের ঢাকনা সরানো হয়েছে সে দেখেছে সে দাঁড়িয়ে আছে বহরামের রঙমহলের অত্যুজ্জ্বল আলোর সামনে। তারপর আর তার কিছু বলার নেই। উন্মত্ত সরাবপায়ীরা তার কোন অজুহাতই শুনতে চায় নি। একযোগে কয়েকজন মাতাল তাকে আক্রমণ করেছে। তার ইজ্জত ছিনিয়ে নিয়েছে। তাকে সবার সামনে লজ্জাহীন করে তার রমণী-ঐশ্বর্য কেড়ে নিয়েছে। রক্তের বন্যা রঙমহলের রঙীন ঔজ্জ্বল্যে আরও রঙের

ছোপ পরিয়েছে। সে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছে। তারপর ক'রাত সেখানে কেটেছে সে জানে না। যখনই জ্ঞান হয়েছে সে সুলতানাকে খুঁজেছে।

সুলতানা আস্তে আস্তে মাথা নীচু করে মরিয়মের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। মরিয়ম কাঁদছে। মরিয়মের ব্যর্থ জীবনের কান্নায় বাঁদী মহলের পাষাণ অলিন্দ কেঁপে কেঁপে উঠছে। সুলতানাকে অপরাধিনী বলার স্পর্ধা তার নেই। কিন্তু রিজিয়া জানে, নীরব প্রাসাদের পাষাণ প্রাচীর আজ চীৎকার করে বলছে—'তুমি দোষী। একটি বেগুনা মাসুম লেড়কীর স্বপ্নকে ছিঁড়ে নেওয়ার জন্যে রাজ্যের অধিশ্বরীই দায়ী। তার পরিচালনায় গলদ থাকার জন্যে একটি রমণীর জীবন নষ্ট হয়ে গেল।'

মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে রিজিয়া নিজের মহলে ছটফট করে ঘুরতে লাগল। রাজদণ্ডের ক্ষমতার ব্যর্থতা তাকে যেন সিংহাসনচ্যুত করল। সে যেন অসহায়া হয়ে পড়ল। তার হৃদয়ের শোণিতে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল তার দাহ যেন বড় দুর্বল মনে হল। দাহশক্তি থাকা সত্ত্বেও সে কাউকে দগ্ধ করতে পারে না। সে যোদ্ধা। সে অশ্বারূঢ় হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বামহাতে অসি নিয়ে বীরশ্রেষ্ঠ শত্রুকে ধরাশায়ী করতে পারে। এসব যেন তার জীবনের গল্প। সে তুর্কী রমণী নয়। সে কোমল স্বভাবা হিন্দুরমণী। রাজ্য পরিচালনা না করে কারুর ঘরের শয্যাসঙ্গিনী হলেই তাকে মানাতো ভাল।

রাজপ্রাসাদ, খুসক্‌ফিরোজী প্রাসাদ, মহলের পর মহল চারিদিকে যখন রিজিয়ার মন ঘুরে বেড়াচ্ছে, গুপ্ত-ঘাতকের সঙ্গে পরামর্শ করে কয়েকটিকে নিষ্ঠুরভাবে বধ করবে কিনা চিন্তা করছে, সেইসময় রণথম্বোর দুর্গের বিজয়ীদের দিল্লী ফেরার সংবাদ দূত-মুখে রাষ্ট্র হয়ে গেল।

রণথম্বোর দুর্গ। আলতামাস এই দুর্গ পুনরুদ্ধার করেছিলেন। আইবকের মৃত্যুর পর হিন্দুরা পুনরায় এই দুর্গ অধিকার করলে আলতামাস নিজের বাহুবলে হিন্দুদের পরাজিত করে রণথম্বোর দুর্গ নিজের অধিকারে আনেন। এবং নিজের শাসনাধীনে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লী রাজ্যের অধিকারভুক্ত করেন।

সেই রণথম্বোর দুর্গ রিজিয়ার রাজত্বে তার শাসনকর্তার মৃত্যুতে আবার হিন্দুদের অধিকৃত হয়। এই দুর্গ বার বার হিন্দুদের দ্বারা পুনরুদ্ধার ও মুসলমান সুলতানদের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ার কাহিনী ইতিহাসে সাক্ষ্য দিচ্ছে। হিন্দুরা রণথম্বোর দুর্গের অধিকার হারিয়েও কোনসময় ক্ষান্ত হয়ে চুপ করে বসে থাকে নি। তুর্কী সুলতান কর্তৃক বার বার অধিকারভুক্ত হলেও সুযোগ বুঝে বার বার হিন্দুরা দুর্গ দখলের জন্য অভিযান করেছে। সেইজন্যে ইতিহাসে তুর্কী সুলতানদের সঙ্গে একাধিকবার হিন্দুদের এই রণথম্বোর দুর্গ নিয়েই সংঘর্ষ।

রিজিয়া ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে, পিতা আলতামাস এই রণথম্বোর দুর্গের জন্যই একাধিকবার হিন্দুদের আক্রমণ করেছিলেন। হিন্দুদের ওপর তার কোন জাতিগত আক্রোশ ছিল না। হিন্দুদের তিনি শিল্পনৈপুণ্যের জন্য যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। হিন্দু-মুসলমানদের মিলিত প্রচেষ্টায় শিল্পচাতুর্যের অপূর্ব সৃষ্টি—কুতুবমীনার। তিনি

মুসলমানের শিল্পনৈপুণ্যকে যেমন সম্মান দিতেন হিন্দুদেরও তেমনি। তার প্রমাণ, আলতামাসের গম্বুজহীন কবরে জিওমেট্রিক ডিজাইনের ছড়াছড়ি। যা এখনও দিল্লীর ভূমিতে চিরঅক্ষয় হয়ে আছে। তার সৃষ্টি শুধু মুসলমানের কৃতিত্ব নয়। আলতামাস গুণী ছিলেন বলে গুণের কদর জানতেন। সেইজন্যে হিন্দুদের এই সব ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। বাংলাদেশের শাসনকর্তার দায়িত্বপদ সেইজন্যে তিনি তাঁর প্রথমপুত্র মাহমুদকে দিয়েছিলেন। মাহমুদ এই বাংলাদেশেই একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। রাজা-কামরূপের নিকট পরাজিত হয়ে তাকে জীবন হারাতে হয়। আলতামাসের একপুত্রের প্রাণ এই বাংলাদেশের মাটিতেই চিরঘুমের কোলে শেষদীপ জেলেছে।

রিজিয়া এ সবই জানত। পিতা আলতামাসের মত সেও হিন্দুদের সর্বদা প্রীতির চোখে দেখত। হিন্দুজাতির বুদ্ধিমত্তার ওপর তার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। হিন্দুরমণী সংযুক্তার প্রেমে সে মুগ্ধ হয়ে আজও সময় পেলে ভাবে তার কথা। হিন্দুরমণীর প্রেমের নিদর্শন নিজের জীবন দিয়ে অনুভব করার জন্যে তার প্রয়াস কম ছিল না।

শম্‌স-উদ্দীনের মৃত্যুর পর আবার হৈ হৈ করে হিন্দুরা মুসলমান সৈন্যদের বন্দী করে, বধ করে দুর্গ দখল করে নেয়। এবং তারা বন্দী মুসলমানের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে নিজেদের নৃশংসতা প্রমাণ করে। রিজিয়া শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মুসলমানদের ওপর অমানুষিক অত্যাচারের সংবাদ শুনে তার মানবিক মন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কোরা-আন শরিফের স্রষ্টা মহম্মদের কথা স্মরণ করে তার সুলতানা প্রাণ নির্যাতিত মানুষের জন্য কেঁদে ওঠে।

রিজিয়া নতুন সেনাপতি মালিক কুতুবউদ্দীন হসনঘোরিকে আদেশ দিল। তার ওপর সুলতানার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। তাকে ডেকে আদেশ দিল, রণথম্বোর দুর্গ অবরোধ করে মুসলমানদের যেন মুক্ত করা হয় এবং প্রয়োজন হলে এই দুর্গ ধ্বংস করে হিন্দুদের শাস্তি দেওয়া হয়। সঙ্গে কয়েক সহস্র অশ্বারোহী সশস্ত্র সৈন্য ও সুযোগ্য সেনাধ্যক্ষ নস্‌রুদ্দীন গেল।

খবর অনেক আগেই দিল্লীতে পৌচেছিল। হসনঘোরি রণথম্বোর দুর্গ ধ্বংস করে ফিরছে। সঙ্গে বন্দী মুসলমানরা ও বহু হতাহত সৈন্যের মিছিল। রিজিয়া নতুন সেনাপতির বিজয়োল্লাসকে উৎসাহিত করবার জন্যে, দিল্লী সুলতানার ক্ষমতাকে প্রচারিত করবার জন্যে উৎসবের আয়োজনে রাজপ্রাসাদের চারিদিক ভরিয়ে তোলার আদেশ দিল। কুতুবউদ্দীন তার দাদুর নাম ছিল। দাসবংশের প্রথম ক্রীতদাস ছিল এই দাদু। সেই দাদুর নামে নতুন সেনাপতির নাম। কুতুবউদ্দীন হসনঘোরি একজন শক্তিমান পুরুষ, সেনাপতি হবার যোগ্য। আইবক বহতু মারা যাবার পর এই হসনঘোরিকে দেখে একবাক্যে সে সেনাপতি নির্বাচন করেছিল।

সে আজ বিজয় অভিযানে দিল্লীতে ফিরছে। রিজিয়া তাকে বরণ করবার জন্য সবরকম রাজসিক আদেশ প্রদান করল। কিন্তু নস্‌রুদ্দীনের জন্য তার মনের তলায় দারুণ লজ্জাবোধ লুকিয়ে রইল। সে যখন সামনে এসে দাঁড়াবে! তার কৃতিত্বের পুরস্কার যখন সে সুলতানার কাছে চাইবে তখন সে কি দেবে?

মরিয়ম সুস্থ হয়েছে কিন্তু কেমন যেন পাগলের মত দিনরাত কান্না-হাসির মাঝে অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া আতঙ্ক নিয়ে থর থর করে কাঁপছে। তার অবস্থা দেখে রিজিয়ার মন আরও নীচুগামী হয়ে পড়েছে। আরও সে ভাবছে নসরুদ্দীন যখন মরিয়মের অবস্থার কথা জানবে তখন সে সুলতানাকে কি মনে করবে? নসরুদ্দীনের জন্যে মনে একটা বিরাট আতঙ্ক নিয়ে রিজিয়া আশা করতে লাগল বিজয়ী সৈন্যদের দিল্লীতে ফেরার।

বিজয়ী সেনাপতি ও তার সৈন্যরা দিল্লী প্রাসাদে ফিরল। উৎসবের রোশনাই জ্বললো প্রাসাদের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে। প্রাসাদের তোরণদ্বারে নহবত চূড়ায় নহবতের বাদ্য বেজে উঠল। সুলতানা রিজিয়ার জয় ঘোষিত হল দিল্লী নগরের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে। সুলতানা রিজিয়া সিংহাসনে বসে হাসিমুখে বিজয়ী সেনাদের অভিবাদন জানালেন। সেনাপতি হসনঘোরিকে জানালেন অন্তরের শুভেচ্ছা। সামনে নসরুদ্দীন। মরিয়মের আত্মা। রিজিয়া তাকে দেখে মুহূর্তে কেঁপে উঠল। কিন্তু সংযম রক্ষা করল। পরে নসরুদ্দীনকে তার কৃতিত্বের জন্য উচ্চপদে উন্নীত করবার প্রতিশ্রুতি দিল। এসব যা কিছু করলো রিজিয়া স্বপ্নের ঘোরে।

তারপর থেকে রিজিয়া নসরুদ্দীনের আড়ালে আড়ালে নিজেকে সরিয়ে রাখল। নসরুদ্দীন জানতে যখন পারল মরিয়মের কথা তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ক্ষিপ্ত হয়ে সে সেনা-প্রাসাদের অলিন্দে ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে ছটফট করে ঘুরতে লাগল। বিস্ময়ে ভাবতে লাগল, সুলতানা রিজিয়ার প্রহরাধীনে খাস প্রাসাদের বাঁদীমহল থেকে কি করে মরিয়ম অদৃশ্য হয়! কিন্তু নসরুদ্দীন শুধু হা-হুতাশ, দীর্ঘশ্বাসই ফেলল, বীর তার বীরত্বের আবেগে মরিয়মের লাঞ্ছিত জীবনের কথা সুলতানাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারল না। কারণ তার অধিকার কি? সে কোন অধিকারে মরিয়ম-পতনের কৈফিয়ৎ তলব করতে যাবে! তার যদি শাদী করা বেগম হত তাহলে সে তার স্ত্রীলোকের জন্য সুলতানার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চাইতে পারত।

কিন্তু নসরুদ্দীন কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করল না। আপন হৃদয়ের মাধুরীতে দুর্ভাগ্যের ছোঁয়াচ পরিয়ে সে বীর মনের পৌরুষকে ছুরি দিয়ে বধ করে দিল। ছেড়ে দিল রাজপোষাক। ছেড়ে দিল উচ্চপদ। ছেড়ে দিল সেনাপ্রাসাদ। নসরুদ্দীন দিল্লী নগরের পথে পথে সেই কুসুম মেয়েটিকে খুঁজতে লাগল যাকে সে রণথম্বোর দুর্গ দখল করতে যাবার সময় সুলতানার কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল। দরবেশের মত পোষাক পরে, পাগলের মত রূপ নিয়ে মসজিদের প্রাঙ্গনে তার বসবাস শুরু হলো।

রিজিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে সবই দেখল। লোকমুখে নসরুদ্দীনের পরিবর্তনের কথা সবই জানল। জানল, শুনল আর কাঁদল। নিজেকে ধিক্কৃত করল। বাঁদী মহলে মরিয়মকে বদ্ধ ঘরের মধ্যে ধরে রাখতে হয়েছে। কড়া প্রহরাধীনে তাকে মৃত্যুর কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে হয়েছে। সে পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু মরবার জন্যে সর্বদা মারণাস্ত্র খুঁজছে। বিষ খেয়ে জীবনাহুতি দেবে বলে বিষ খুঁজছে।

এক একসময় রিজিয়া ভাবে : মরিয়মের মৃত্যু হওয়াই এখন উচিত। মরে গেলে সে শান্তি পাবে। তরবারীর এককোপে শেষ করে দেবার আদেশ দিলে রাজ্যের লোক তার নৃশংসতা নিয়ে আলোচনা করবে। কঠোর মনের বিচার করবে। হয়ত অনেক দুর্ণাম দেবে। তা দিক। তবু মরিয়ম শান্তি পাবে। সে শান্তি পাবে। দিল্লীর আকাশ-বাতাস থেকে একটি রমণীর ইজ্জতহারার দীর্ঘশ্বাস চিরতরে লুপ্ত হবে। একটি মহব্বতের রক্তগোলাপ ফুটতে না ফুটতে ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে দিল্লীর ফকির-ধূলায় ছড়িয়ে গেল। তার স্মৃতি লুপ্ত হবে।

কিন্তু না। মরিয়ম বেঁচেই থাক্। সে শৃঙ্খলিত হয়ে বদ্ধঘরের মধ্যে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বেঁচে থেকে সমস্ত রমণীকে জানিয়ে যাক—রমণীর ইজ্জত একবার লুণ্ঠিত হলে তাকে আর খোদার কাজে লাগে না। সে নষ্টা হয়ে পৃথিবীর ঘৃণ্য হয়ে যায়। মরিয়মের সব ছিল। রূপ, যৌবন, সব। কিন্তু অতর্কিতে এক দস্যু এসে তাকে অপহরণ করে নিয়ে কেড়ে নিল তার রমণী-সম্পদ।

রিজিয়া তারপর থেকে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। যন্ত্রচালিতের মত কর্তব্য ছাড়া, রাজকার্য ছাড়া তার আর কোন চেতনা নেই। সে নিরলস। আড়ম্বরহীন। ইয়াকুত পাশে আছে। ইয়াকুতের জন্যে যে প্রাণের মধ্যে উন্মাদনা ছিল, আবেগ ছিল, আনন্দ ছিল, রমণী-মনের আকাঙ্ক্ষা ছিল সব যেন স্তিমিত হয়ে গেল। কেউ অবশ্য কিছু জিজ্ঞাসা করল না কিন্তু অনেকেই সুলতানার ভাবান্তর দেখে শঙ্কিত হল।

যেন আত্মীয় বিয়োগ হয়েছে সুলতানার। রিজিয়ার অতি আপনজন কেউ মরে গেছে তার জন্যে সে শোকে মুহ্যমান। আড়ম্বরহীন সাধারণ বেশভূষায় সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতি। রাজদরবারে বসে কোন কঠোর বিচার না। অথচ সুসংযত। কোন সময় ভয়ঙ্কর, আবার মৃদু।

রিজিয়া তাকায় না তার সভাসদ্‌দের দিকে। আমীর-ওমরাহ মালিকরা ষড়যন্ত্র করছে সে জানে। রাজ্যের মধ্যে অনেক গোপন পরামর্শ চলছে তার বিশ্বস্ত গুপ্তচর জানিয়ে গেছে। এমন কি রিজিয়া জানে তারা কারা? গুপ্তচর প্রতিটি নাম তাকে বলে দিয়ে গেছে। ইচ্ছে করলে সে প্রতিটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে রাজ্যে একটা ভয়ঙ্কর ত্রাসের সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু না, এখন কিছু না। রাজ্য পরিচালনায় হঠাৎ কোন অসংযত ব্যবহার করা সুলতানার উচিত নয়। অপেক্ষা করতে হবে এবং একটি একটি করে আগাছাকে নির্মূল করতে হবে।

কিন্তু এরপর আভ্যন্তরীণ বিষয়ে চিন্তা করার আর কোন ফুরসৎ রিজিয়ার থাকল না। দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূত এসে সুলতানাকে দুঃসংবাদ জানিয়ে গেল—লাহোরের শাসনকর্তা মালিক ইজ্‌-উদ্দীন কবীর খান্-ই আয়াজ বিদ্রোহী হয়েছে। বিদ্রোহের কারণ ইয়াকুত। আয়াজ ইয়াকুতের প্রতি ঈর্ষান্বিত। এক বিদেশী মুসাফের দিল্লী সুলতানার প্রিয়পাত্র হয়েছে বলে আয়াজ নিজেকে ভীষণ অপমানিত বোধ করেছে।

কথাটা রিজিয়ার কানে গেলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সিংহীর মত কেশর ফুলিয়ে সে উত্তেজনায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গেল। এতদিন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য মনের মধ্যে যে বাষ্প জমে উঠছিল, সেই বাষ্প যেন সর্বক্ষমতা নিয়ে বাইরে উদ্গীরণ করল। সেনাপতি হসনঘোরিকে আদেশ দিল—সৈন্য সাজাও। অশ্বপাল ইয়াকুতকে আদেশ দিল—খুব তেজিয়ান অশ্বের সম্মিলিত মিছিল সৈন্য-সমাবেশে লাহোরের শাসনকর্তা আয়াজকে শায়েস্তা করবার অভিযানের আয়োজন কর। উজীরপ্রবর মন্ত্রী খাজা মুহজ্জবকে জানাল—কিছুকালের জন্য দিল্লী-রাজ্যের ভার তার ওপর দিয়ে সে যাবে বিদ্রোহীদের দমন করতে। মন্ত্রী যদি বেইমানী করবার চেষ্টা করে তাহলে তার শাস্তি সুলতানা রিজিয়ার কোমল প্রাণের ক্ষমা নয়, রাজ্য পরিচালনার কঠোর বিচার মন্ত্রীর ওপর আরোপিত হবে।

রিজিয়া যখন চারিদিকে এই সবে ব্যস্ত—তখন আবার সংবাদ ছুটে এল যে, গোয়ালিয়র শাসনকর্তা বসিদউদ্দীনকে নিহত করে জিয়াউদ্দীন জুনাইদি গোয়ালিয়র অধিকার করে স্বাধীন সুলতান বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু বরণের শাসনকর্তা ঐতিহাসিক মিনহাজ-উদ্দীন-সিরাজ ও জুনাইদিকে গোয়ালিয়র ত্যাগ করে যেতে অনুরোধ করেছে। মিনহাজ রিজিয়াকে ভাল করেই জানত, একবার রিজিয়ার কাছে অপদস্থ হয়ে তার শিক্ষা হয়ে গেছে বলে সে বরণের শাসনকর্তার আদেশ শুনে গোয়ালিয়র ত্যাগ করল কিন্তু জুনাইদি গোয়ালিয়র ত্যাগ না করে বরং আয়াজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে দিল্লী আক্রমণ করবার তোড়জোড় করতে লাগল।

রিজিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে জুনাইদিকে কুকুর দিয়ে খাওয়ানোর জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। বিস্ময়ে সে শুধু এই কথাটাই ভাবতে লাগল—ওরা ভাবে কি? সুলতানা রিজিয়া কি মরে গেছে? সুলতানা রিজিয়ার কি ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে! তার হাতে কি তরবারী ধরবার শক্তি নেই!

যখন বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে যাবার সব আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, এইসময় কর্তব্যবোধে ইয়াকুত, রিজিয়ার পার্শ্বচর এসে রিজিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করে জানাল: সুলতানা আমার একটি আর্জি আছে। যদি গোস্তাখি মাফ করেন তাহলে উচ্চারণ করতে পারি।

রিজিয়া মৃদু হাসল ইয়াকুতের নতমুখের দিকে তাকিয়ে, তারপর সুমিষ্টস্বরে কৌতুক করে বলল—তুমি কি অভিযানে সঙ্গী হতে পারবে না বলে মাফ চাইতে এসেছ?

ইয়াকুত সেইরকম মাথা নত করেই উত্তর দিল—না, সুলতানা। সে ধরনের কোন অভিপ্রায় জানানোর মতলব আমার নেই। আমার ভয় সুলতানার সিংহাসনের জন্যে। সিংহাসন অরক্ষিত রেখে এসময় দিল্লী ত্যাগ করা সুলতানার পক্ষে সমীচীন হবে কি না—আমি শুধু সেই কথাই ভাবছি। কারণ রাজ্যের চতুর্দিকে প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে গোপনে যে শলা-পরামর্শ কানে এসে বিঁধছে তাতে ডর লাগে হয়ত সুলতানা দিল্লী ত্যাগ করলেই সেই ষড়যন্ত্রকারীরা এসে সিংহাসন অধিকার করবে।

মুহূর্তে ইয়াকুতের জন্য রিজিয়ার মনের কোণে একটি আসন তৈরী হয়ে গেল। ইয়াকুতকে নিয়ে তার ভাল লাগার রং যেন আরও গাঢ় আকার ধারণ করল। এমন করে রিজিয়ার জন্যে কে ভাবে? রিজিয়ার কে আছে? পিতামাতা বহুকাল গত। আত্মীয়স্বজন সিংহাসনের জন্য শত্রু। এখন সে সম্পূর্ণ একা। কেউ নেই। সান্ত্বনা তার নিজের অর্জিত সম্পদ। সেখানে ইয়াকুতের এই চিন্তা তার চোখে জল এনে দিল। কিন্তু সে তা সামলে নিয়ে মৃদু হেসে বলল—ইয়াকুত, তোমার এই চিন্তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। সুলতানা রিজিয়া রাজ্যপরিচালনার কৌশলগুলি পিতা জীবিত থাকতেই পিতার কাছ থেকে আয়ত্ব করেছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, আমি না থাকলে মন্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। যদি করে তার পিছনে আরও একটি ক্ষমতা প্রহরাধীনে রেখে যাচ্ছি।

রিজিয়া বিদ্রোহী দমনের জন্য প্রথমেই তার বাহিনী নিয়ে লাহোর অভিমুখে যাত্রা করল। বর্ম পরিধান করে, মাথায় শিরস্ত্রাণ দিয়ে, ঢাল, তলোয়ার সঙ্গে করে অশ্বারোহী সেই রিজিয়াকে বাহিনীর আগে আগে ছুটতে দেখে কিছুতেই মনে হয় না এই রমণীটি একদিন গভীর রাত্রে চাঁদের রোশনাই দেখতে যমুনাতীরে ছুটে গিয়ে ছোট্ট মেয়েটির মত উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। বরং পুরুষের চেয়ে কঠিন ও ভয়ঙ্কর তেজী বলে মনে হয়। তার হাতে তরবারী। সে তরবারী মানুষের শোণিত দেখবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। লাখো মাসুম লেড়কী অপরূপ যৌবনের উদ্দামতা নিয়ে যে রমণী রাজ্য পরিচালনা করে তার বর্তমানের রূপ দেখে ইয়াকুত বিস্ময়ে ভাবতে লাগল—এমন রমণীর দর্শন বুঝি তামাম পৃথিবীর কোথাও নেই। আরও একটা কথা মনে পড়ে ইয়াকুতের—রিজিয়া বলেছিল, তুমি ইয়া পাশে থাকলে আমি আরও শক্তি পাই। তাই কি রিজিয়া আরও শক্তি পেয়েছে?

রিজিয়া এগিয়ে চলেছে দিনের পর দিন লাহোরের দিকে। অশ্বের ধাবমান গতি তার বাতাসের মত দ্রুত। অশ্বের পায়ের শব্দে মাটির বক্ষ থর থর করে কাঁপছে, ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। ধুলো উড়ছে। ধুলোয় ধুলোয় দিনের স্বচ্ছ আলো ধোয়ার কুণ্ডলী নিয়ে আকাশ অন্ধকার করে তুলছে। অশ্ব ক্লান্ত, সৈন্যরা ক্লান্ত, সেনাপতি ক্লান্ত, ইয়াকুত ক্লান্ত কিন্তু দিল্লীর সুলতানা রিজিরা ক্লান্ত না। তার রক্তে এগিয়ে যাবার নেশা। উন্মাদনা। উন্মাদ হয়ে উঠেছে রিজিয়া। সে যে রমণী, সে তা ভুলে গেছে। তার যে দেহে আজ বিজলী। তাকে যে লোকে শয্যাসঙ্গিনী করবার জন্যে কামনা করে। সে যে লাখো নওজোয়ানের হৃদয়ের পিয়াস—সেকথা সে একেবারে বিস্মৃত হয়েছে। সে যোদ্ধা, সে বীর, সে তরবারী হাতে রণক্ষেত্রে শত্রুনিধন করে সিংহাসনের সম্মান রাখতে পারে—এইটুকু ছাড়া মনে হয় সে সবই ভুলেছে।

হসনঘোরি চমকিত হয়, ইয়াকুত বিস্মিত হয়—রিজিয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে। তারা মনে মনে স্বীকার করে—সত্যিকারের কেউ যদি দিল্লীর তখ্‌তে বসে থাকে সে সে হল সুলতানা রিজিয়া। জগতে এর কীর্তি চির জাগরূক হয়ে থাকবে। মনে মনে তারা দুজন বীরই শ্রদ্ধা জানায় সেই লাহোর পথাভিমুখী এক তুর্কী রমণীর বীরত্বকে।

একদিন অনেক রাত্রে।

কোন একটি উন্মুক্ত মাঠের ওপর তাঁবু পড়েছে। সংখ্যাতীত তাঁবুর মধ্যে রাতের নিশুতি নেমে এসেছে। সৈন্যরা পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে গভীর ঘুমে তাঁবুর মধ্যে আচ্ছন্ন। চাঁদের আলো এসে রূপোলী চাদর বিছিয়েছে তাঁবুর মাথার ওপর। সাদা সাদা সাগরের ফেনার মত তাঁবুর মাথায় চাঁদের আলো। যেন দর্পণে আলো পড়ে আলো বিকীরণ করেছে চতুর্দিকে।

রিজিয়া ঘুমতে পারেনি তাঁবুতে। পাশের তাঁবু থেকে ইয়াকুতকে ডেকে এনে উন্মুক্ত মাঠের একধারে ঘাসের ওপর ঘাস শিশু হয়ে বসে পড়েছে। আজ বড় বেশী এইরাতে ইস্কান্দারকে মনে পডছে। ইস্কান্দার যেন সেই প্রথম যৌবনের দিনগুলিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে যন্ত্রণার মধ্যে ক্লান্তি এনে দিচ্ছে। প্রথম যৌবনের সেই অবুঝ দিনগুলি উন্মাদনা নিয়ে এলেও সেদিন রিজিয়া সিংহাসনের স্বপ্নেই বিভোর ছিল। হৃদয়ে সেদিন অন্য কোন অনুভূতির স্পর্শ ছিল না। পিতা আলতামাসের পাশে পাশে থেকে রণকৌশল শেখা, সিংহাসনে বসে রাজ্য পরিচালনা করা, অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া, মনকে নৃশংস করে তোলা—এ ছাড়া কিছুই সেদিন মনে করবার সময় ছিল না। যদিও রমণী দেহের ঐশ্বর্যের বর্ণাঢ্য বাইরের কৌতূহলীকে অবাক করে দিয়েছিল, রিজিয়া তার দেহের অগ্নিতে অনেককে দগ্ধ করেছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। রিজিয়া নিজে তার কিছু জানত না। এমন কি ইস্কান্দার সেদিন দুঃসাহস নিয়ে এগিয়ে এলেও রিজিয়ার প্রবৃত্তি তাকে কুর্নিশ জানায় নি।

আজ সে ইস্কান্দার কোথায় কে জানে? আজ মনে হয় সে সুলতানা রিজিয়ার সিংহাসনের পাশে পাশে থেকে তাকে বিদায়ী যৌবনের দিনগুলিকে রক্তাক্ত করে চলেছে। অশরীরি আত্মা নিয়ে সে রিজিয়ার অন্তরালে থেকে প্রতিশোধ নেবার জন্য রিজিয়ার প্রাণের মধ্যে পুরে দিয়েছে দুশমনের শয়তানী। রিজিয়া জানে, আজ যা সে করেছে, তাতে সিংহাসনের আশে পাশে শত্রুর সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। তারা রিজিয়ার উচ্ছৃঙ্খলতা কিছুতে ক্ষমা করবে না। রমণী হয়ে বাইরের সমাজে নিজেকে মেলে ধরে রমণীর আব্রু সে নষ্ট করেছে। বহুপুরুষের সামনে নিজেকে মেলে ধরে সে

রমণী-লজ্জাকে দূর করে দিয়েছে। তুর্কী-সমাজের লোকেরা তার এই ঔদ্ধত্যকে কিছুতে ক্ষমা করে নি। তার ওপর আজকে সে রমণী হৃদয়ের চাওয়া পাওয়ার মাঝে নিজের প্রবৃত্তিকে জয়ী করবার জন্যে স্পষ্টই ইয়াকুতকে অনুগ্রহ দেখিয়েছে।

সে জানে এ অন্যায়। সিংহাসনে বসে সুলতানা অন্যায় করলে রাজ্যের লোক সিংহাসনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সুলতানার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। সেই ষড়যন্ত্রের মাঝে পড়ে রিজিয়া আজ বুঝছে, সেদিন সে ভুলই করেছিল। রমণী যতই পুরুষের মত শক্তিধর হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অসি হাতে শত্রু নিধন করুক, তবু সে রমণী। ইস্কান্দারকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলেও রমণীর প্রবৃত্তি থেকে রিজিয়া অধিকারচ্যুত হয়নি। রিজিয়া বুঝতে পাচ্ছে ইস্কান্দার বাতাসের সাথে অন্তরালে থেকে অদৃশ্য ছায়ার মত প্রতিশোধের জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছে।

নক্ষত্র-মালিনী যামিনী, জ্যোতির্ময় নিশানাথকে বুকে নিয়ে অতীব শোভাময়ী। দূরে দূরে চতুর্দিকে আসমানের রোশনীতে দিগন্ত মোহিনীরূপে প্রতিভাসিত। সমস্ত প্রকৃতি সেই প্রোজ্জল চন্দ্রালোকে সুখ-স্বপ্নে নিমজ্জিত। এ রাত্রে শুধু সুখ, কান্না না। কান্নার রাত্রি যেদিন প্রকৃতিকে কবরিত করে, সে রাত অন্ধকারের গহ্বরে নিমজ্জিত। আনন্দের ও সুখের রাত্রি প্রকৃতির হাস্যোজ্জ্বল রোশনী। এ রাত্রে প্রিয়া-মিলনের জন্যে হৃদয়ের আকর্ষণে সাড়া জাগে। ঘুম ভাঙে প্রকৃতির। মায়ার মোহে মোহিনীরূপে হৃদয়কে আকুল করে তোলে।

পাশে ইয়াকুত। বসে বসে ভাবছে রিজিয়া। মনের মধ্যে জাগছে কেমন যেন হারিয়ে যাবার নেশা। এইমুহূর্তে মনে হচ্ছে সে সুলতানা না, তার কোন কর্তব্য নেই, সে রাজ্য পরিচালনা করে না, সে সামান্য এক তুর্কীরমণী। রমণী যে মন দিয়ে দয়িতকে আপন করে, হৃদয়কে উন্মুক্ত করে তাকে মহব্বতের রোশনীতে রাঙায়—অভিসারিকা হয়—রিজিয়ার মন আজ সেই পর্যায়ে। রিজিয়া সামান্য রমণী। পাশে যে আছে সে তার অধীনস্থ কর্মচারী না। সে হৃদয়ের পূজারী, সে তার দেবতা। আল্লার প্রেরিত দূত।

সে এইমুহূর্তে ভুলে যেতে চায়—সে লাহোর আক্রমণ করে বিদ্রোহী আয়াজকে উচ্ছেদ করতে যাচ্ছে। তার অভিযানে হাজার হাজার সৈন্য তার পিছনে চলেছে তারই জন্যে প্রাণবলি দিতে। সব ভুলে সে এখন এই রাত্রে সামান্য রমণী।

চোখে সুরমা কাজল। দেহে মহব্বতের আকুলতা। শোণিতে চাঞ্চল্য।

ইয়াকুত অনেকক্ষণ পাশে নিঃশব্দ হয়ে বসেছিল। সে ভয়ে ভয়ে তাঁবু ছেড়ে সুলতানার সঙ্গে এসেছে। সে বিস্ময়ে ভাবছে, সুলতানার দুঃসাহসিক হবার কথা। দিল্লী থেকে এত মাইল দূরে এই লোকালয়হীন উন্মুক্ত প্রান্তরে অসংখ্য সৈন্যদের মাঝে সুলতানার এই নির্লজ্জ রাত্রি অভিসার ক্ষমার অযোগ্য। একদিন সেই সুলতানার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে সুলতানাকে জয় করার জন্য উন্মুক্ত রাজসভায় পাণিপ্রার্থনা করেছিল, সেদিন সে জানত না সুলতানা কত অসহায়া। আজ তার সে পাণিপ্রার্থনার ইচ্ছা অন্তর্হিত হয়েছে, আজ সে ভাবছে সুলতানার কাছ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার

উপায় কি। সুলতানাকে লোকনিন্দার হাত থেকে বাঁচাতে গেলে তাকে ছেড়ে যাওয়াই উচিত। কিন্তু এই বিপদসঙ্কুল রাজ্যে সম্পূর্ণ একাকী তাকে ছেড়ে গেলে সকলে তাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে পথে ছড়িয়ে দেবে। সে বুঝতে পারছে, আগামী কিছুদিনের মধ্যে সুলতানার বিরুদ্ধে বিরাট এক অভিযান বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। তার প্রথম সাক্ষী লাহোরের আয়াজ। যার জন্যে তাদের এই অভিযান। সুলতানা ক্ষিপ্ত হয়ে সেই আয়াজকে শায়েস্তা করতে চলেছে। কিন্তু আয়াজের দোষ কি? আয়াজ কেন, রাজ্যের সব লোকই সুলতানা রিজিয়ার হৃদয় অধিকার করতে চায়? রূপসী রিজিয়ার পাণিপ্রার্থনা সকলের। কারণ রিজিয়ার অনুগ্রহ পেলে শুধু রিজিয়া না সিংহাসনের একাধিপত্য সে পাবে। সেখানে এক বিদেশী মুসাফের এসে অনধিকার প্রবেশ করেছে। বিদ্রোহী হবে না কেউ?

ইয়াকুত হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলল, সুলতানা, একটা কথা আমার মনে হচ্ছে, আমি বিদায় নিলেই মনে হয় এই বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটবে। আমাকে বিদায় করে দাও।

রিজিয়া অন্য কোন একরাজ্যে তখন বিচরণ করছিল, হঠাৎ চমকে ইয়াকুতের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে বলল—কি বললে!

আমি বিদায় চাইছি সুলতানা। আমার জন্যে তোমার বিরুদ্ধে সকলের ষড়যন্ত্র ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। তাই বিদায় নিয়ে তোমাকে মুক্ত করে যেতে চাই।

বি-দা-য়! চাঁদের রূপো আলোর মাঝে একমাথা এলো চুলে মাথা ঝাঁকিয়ে হি-হি করে পাগলের মত হেসে উঠল রিজিয়া। তারপর হঠাৎ মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গিয়ে ভাবতে লাগল—তবে কি ইস্কান্দারের আত্মা ইয়াকুতের ওপর ভর করে তাকে শাস্তি দিতে চায়? রিজিয়া যেন কেমন ভীত হয়ে পড়ল, ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। মনে হল, প্রাণের মধ্যে বুঝি ইয়াকুতের 'বিদায়' কথাটি প্রতিধ্বনি তুলে তাকে ভেঙ্গে দিতে চায়। হঠাৎ রিজিয়া অস্ফুটস্বরে উত্তেজিত হয়ে মাথা নেড়ে বলল—না, না, না—কখনই না। তোমার জন্য যদি সিংহাসন আমাকে ছাড়তে হয়, ছাড়বো; তবু আর সে ভুল করবো না। হৃদয় ছাড়া যে সিংহাসন বড় না—তার প্রমাণ আজকে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে আমি পাচ্ছি। তোমার জন্যে আজ আমি সব ছাড়তে পারি, কিন্তু তোমাকে না।

রিজিয়ার আয়ত চোখদুটি দিয়ে জল ঝরতে লাগল। ইয়াকুত তাকিয়ে রইল সুলতানার কান্নারত ব্যথাতুর মুখখানির দিকে চেয়ে। একমাথা সোনালী চুলের বর্ণাঢ্য পিঠ পর্যন্ত শোভাবর্ধন করেছে। রিজিয়ার পরণে শালোয়ার, পাঞ্জাবী, বুকে পাতলা ওড়নার আস্তরণ। সিফনের মত পাতলা পোষাকের ভিতর থেকে রিজিয়ার দুধে-আলতা দেহের বর্ণাঢ্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বুকের ওপর যৌবন-সমুদ্রের উত্তালতাকে চাপা দিয়েছে একখণ্ড মসলিনের কাঁচুলি। তা এই চাঁদের স্বচ্ছ রোশনীতে প্রকট হয়ে পড়েছে। বুকের স্পন্দন দ্রুত। সেইজন্যে রিজিয়ার অসমতল বুকের কাঁচুলির অভ্যন্তর চঞ্চল।

ইয়াকুত রিজিয়ার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবল, তবে কি সুলতানা আজ এই রাত্রির গভীরে দিল্লী থেকে অনেক দূরে এই উন্মুক্ত প্রান্তরে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবে বলেই এতদিন ধরে মনে মনে কোন গোপন-অভিসন্ধি পুষে রেখেছিল? কিন্তু তা কি করে হয়? রিজিয়া অসাবধানে অন্যায় করতে চাইলে সে কেন অন্যায় করতে দেবে? সে এক সামান্য পুরুষ, আজ সুলতানার অনুগ্রহে দিল্লীরাজ্যের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কিন্তু সুলতানার সেই অনুগ্রহ পেয়ে সে তার ওপর বেইমানী করবে? না-না-না অসম্ভব। সুলতানাকে বাঁচাতেই হবে। অন্ততঃ আজকের এই রাত্রে তার বিরাগভাজন হয়েও তাকে রক্ষা করতে হবে। এ কালরাত্রি অন্তরালে চলে গেলে আগামীকল্য সূর্যোদয়ে সে বুঝতে পারবে—কাল সে দোস্তাকের পথে দুশমনের হাত ধরে এগিয়ে চলেছিল। যদি তার স্খলন হত তাহলে কাল সূর্যোদয়ে কি সে মুখ দেখাতে পারত?

ইয়াকুত রিজিয়ার কান্নারত ব্যথাতুর মুখখানির দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল—সুলতানা, তুমি তাঁবুতে ফিরে যাও।

সর্পিনী যেন দংশন করে নিজেই যন্ত্রণায় ছটফট করে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। চীৎকার করে বলল—তুমি ভীরু, তুমি পুরুষত্বহীন, তুমি কাপুরুষ ইয়াকুত। তুমি জানো, এইমুহূর্তে আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে ঘাতকের কাছে প্রেরণ করতে পারি?

ইয়াকুত মাথা নেড়ে বলল—জানি। জানি সুলতানা। আমি কখনও বিস্মৃত হই নি, আমি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি! আমি সুলতানার গোলাম। এই বলে ইয়াকুত দাঁড়িয়ে উঠে রিজিয়াকে কুর্নিশ করল।

থর থর করে কেঁপে উঠল রিজিয়ার দেহ। ইয়াকুতের মুখের দিকে হঠাৎ কাতর হয়ে তাকিয়ে তার চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। অস্ফুটস্বরে বলল—সুলতানা, সুলতানা! সবাই আমাকে উচ্চসিংহাসনে বসিয়ে কুর্নিশ জানাতে চায়! সবাই আমাকে আসমানের তারা ভেবে দূর থেকে অবাক চোখে দেখতে চায়! আমি যেন পাথরের মীনারের মত সবার দৃশ্যমান হয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসে আছি। বলতে পার ইয়া, আমি রক্তমাংসের মানুষ, না আমি পাথর!

রিজিয়া কাঁদছে। তার গোলাপী অধর থর থর করে কাঁপছে। তার মসৃণ রক্তাভ গাল বেয়ে অশ্রু প্লাবন জাগিয়েছে। রিজিয়ার বুকের ভিতর কি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, সেখানে ঝড় উঠেছে। রিজিয়া নিজেকে সরাবপায়ী উন্মত্ত সৈন্যদের মধ্যে এক মুহূর্তে বিলিয়ে দিতে পারে। তার এতদিনের সংযম মোম গলার মত গলে গলে পড়েছে এই রাতের গভীরে। তাকে বাধা দিতে গেলে কোন সান্ত্বনাই বাধা মানবে না। কিন্তু তবু ইয়াকুত আজকে মরীয়া হয়ে চেষ্টা করবে সুলতানাকে বাঁচাতে। সুলতানার স্খলন যে লাখো লাখো মানুষ আওরতের স্খলন একথা কখনও বিস্মৃত হলে চলবে না। কিন্তু রিজিয়া কাঁদছে। সে কেঁদে অপরের মনের অনুগ্রহ কুড়োচ্ছে। সেখানে এইমুহূর্তে মনকে লঘু করা যে রিজিয়াকে প্রশ্রয়

দেওয়া—এই কথা ভেবে ইয়াকুত কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—সুলতানা, রাতের শেষপ্রহর আগত। তাঁবুতে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নাও। আগামীকল্য প্রত্যুষে লাহোরে আয়াজের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। সামনে সমূহ বিপদ। আয়াজ বিদ্রোহী হয়ে তোমাকে বন্দী করবার চেষ্টা করছে। তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য তোমার অনেক শক্তি অপচয় করতে হবে। তোমার রাজ্যে শান্তি ফিরে আসুক, আমি তো সর্বদা তোমার পাশেই আছি, যদি মৃত্যু না হয় তাহলে নিশ্চয় আমি তোমাকে খুশী করবার চেষ্টা করব। অন্ততঃ আজ রাতের জন্য আমার গোস্তাফি মার্জনা করে তুমি তাঁবুতে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নাও।

রিজিয়া হঠাৎ দাঁত দিয়ে গোলাপী অধর কামড়ে ধরে উঠে দাঁড়াল। তারপর ইয়াকুতের দিকে অবাক বিস্ময়ে নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে টলতে টলতে তাঁবুর দিকে অগ্রসর হলো।

আয়াজ খবর পেয়েছিল রিজিয়া দিল্লী ত্যাগ করে লাহোর অভিমুখে রওনা হয়েছে। রিজিয়ার পিছনে অনেক শত্রু কিন্তু সামনে কেউ না। সামনে বড় বড় যোদ্ধারা মাথা নত করে তাকে সেলাম জানায়, শ্রদ্ধা করে, অধীন কর্মচারীর মত ব্যবহার করে। এ কথা রিজিয়াও জানে, তামাম রিজিয়া-শাসিত রাজ্যগুলির শাসনকর্তারাও ভালভাবে জানে।

রিজিয়া যখন লাহোরে পৌছলো, সঙ্গে ইয়াকুত ও হসনঘোরিকে নিয়ে—তখন আয়াজ নিজের আস্ফালনের কথা ভুলে গিয়ে সুলতানার ক্ষমাপ্রার্থী হলো। ক্ষমাপ্রার্থিজনকে ক্ষমা করাই বিধি। বিশেষ করে রিজিয়ার কোমল প্রাণ, ক্ষমাপ্রার্থীর জন্যে তার মন সর্বদাই আকুলিত ছিল, সে যত দোষই করুক। আয়াজ যে অন্যায় করেছিল তার ক্ষমা বড় একটা সুলতানরা করতেন না কিন্তু রিজিয়ার বিশেষত্ব এইখানে। সে সর্বদা অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করত যদি অপরাধী নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করত। তাছাড়া, আয়াজ বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করতে—অহেতুক রক্তক্ষয় হল না বলে, মানুষের মৃত্যু দেখতে হল না বলে সে খুশী হয়ে উঠল। আয়াজকে ক্ষমা করল বটে রিজিয়া, কিন্তু তাকে আর লাহোরে রাখল না। মুলতানে বদলি করে দিল। মুলতানের শাসনকর্তা করাকুশ খাঁকে অবিলম্বে সংবাদ পাঠিয়ে জানিয়ে দিল যে, লাহোরের সামন্তের পদ তাকে দেওয়া হয়েছে, যেন তিনি অবিলম্বে মুলতান ত্যাগ করে লাহোরে চলে আসেন।

ইজ্‌উদ্দীন কবীর খানই আয়াজ সুলতানার কথামত মুলতানে প্রেরিত হল। রিজিয়ার রাজ্য-পরিচালনার নীতি সম্পূর্ণ পিতা আলতামাসের নীতি। আলতামাস

যেমন অপরাধীকে ক্ষমা করে তাকে শাস্তি না দিয়ে ভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন, রিজিয়াও সেইরূপ ভিন্ন ব্যবস্থা করে অপরাধীকে ক্ষমা করত।

তারপর রিজিয়া অবিলম্বে লাহোর ত্যাগ করে গোয়ালিয়রের পথে এগিয়ে গেল। তার বিজয়ী মনে যেন নব উদ্দীপনা। এত সহজে সে আয়াজকে বশে আনতে পারবে, তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তাই যখন গোয়ালিয়র-এর পথে সে এগিয়ে চলল, ভাবতে লাগল, হয়ত সেখানেও গিয়ে দেখবে জুনাইদি তার আগে গোয়ালিয়র ত্যাগ করেছে। রিজিয়া গোয়ালিয়র গিয়ে সেই কথাই শুনল। জুনাইদি রিজিয়ার আসবার আগেই সম্পূর্ণ ভীত হয়ে গোয়ালিয়র ত্যাগ করে চলে গেছে। তবে এর মধ্যে বরণের শাসনকর্তার কিছু কৃতিত্ব ছিল। রিজিয়া বরণের শাসনকর্তার কাছে দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূত পাঠিয়ে দিয়ে জানাল যে, তার এই সাহায্যের জন্য সুলতানা তাকে যথাসময়েই পুরস্কৃত করবে।

রিজিয়া প্রায় বহুদিন তার শাসিত রাজ্যের চারিদিকে ঘুরে বিদ্রোহীদের দমন করে অবশেষে দিল্লীতে ফিরল। লোকক্ষয় তার কিছু হয়নি, রক্তও যায়নি একফোঁটা, শুধু রিজিয়ার উপস্থিতি বিদ্রোহীদের ভীতি উৎপাদন করেছে। রিজিয়ার যোদ্ধা-বেশ দেখে বড় বড় বীরেরা অসি ফেলে মাথা নত করে সুলতানার বশ্যতা স্বীকার করেছে। সুলতানা রিজিয়া তাই ভাবে, তার আজও ক্ষমতা আছে, বিলীন হয়নি।

আবার সেই দিল্লী। আবার সেই রাজপ্রাসাদ। এবারে মনে হল যেন দিল্লীর প্রাসাদের চারিদিকে ভয়ের একটা হিমেল স্পর্শ লেগেছে। আগের মত আর সে উচ্ছৃঙ্খলতা নেই। আমীর-ওমরাহ-মালিকরা সুলতানার অধীন হয়ে তাকে বার বার কুর্নিশ জানাল। রিজিয়া খুশী হল এদের আচরণে। বিজয়িনী রিজিয়া সিংহাসনে বসে সুলতানার গর্বে গর্বিতা হয়ে উঠল। এতগুলি রাজপুরুষ যখন তার বশ্যতা স্বীকার করেছে তখন তার সিংহাসনের আশেপাশে চিরশান্তিই বিরাজ করবে।

বাইরের বিদ্রোহের ইন্ধন যে এই দিল্লী থেকে যোগান হয়েছিল, তা রিজিয়া জানত। বাইরের বিদ্রোহ দমন হতে ভিতরের শত্রুরা যে বুঝেছে খুব সুবিধে হবে না, এই ভেবেই মনে হয় তারা জাল গুটিয়ে নিয়েছে। তা ছাড়া ইজ্জ্‌উদ্দীন কবীর খানই আয়াজ হঠাৎ ভয় পেয়ে বশ্যতা স্বীকার করে ফেলল দেখে দিল্লীর বিদ্রোহীরা আর মাথা তুলতে সাহস করল না। না'হলে এই আয়াজ খুব সহজ লোক ছিল না। তার মত শয়তান ব্যক্তি রিজিয়ার রাজ্যে বিরল। অথচ তাকে ক্ষমা করল কেন রিজিয়া? এটা রাজ্য-পরিচালনার একটি কৌশল। আয়াজকে নিহত করলে আভ্যন্তরিক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠত। তার চেয়ে আয়াজ ক্ষমা পেয়ে সুলতানির অনুগ্রহে বেঁচে থাকল। তাতে সকলের লজ্জা। আয়াজ যখন অধীন, তখন অন্য কারও বিদ্রোহী হওয়া লজ্জাকর।

রিজিয়ার রাজ্য পরিচালনায় পূর্ণ শান্তি ফিরে আসতে সে আগের মত আবার শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তৎপর হল। কিন্তু তবু শান্তি কোথায়? মরিয়ম বাঁদীমহলে উন্মাদিনী। হাতে-পায়ে তাকে শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করে ঘরে বন্দী করে রাখতে হয়েছে।

তার অসামান্য যৌবনের এক কণাও আর অবশিষ্ট নেই। গোলাপীবর্ণ দেহ নীলাকার ধারণ করেছে। বুকের সেই কৌস্তুভরত্নে আর সে উত্তালতা নেই। নেই কোন উন্মাদনা। সম্পূর্ণ নিস্তেজ ও স্তিমিত। সমুদ্র সফেন যৌবনের উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে সম্পূর্ণ শান্ত প্রবাহিত। মরিয়মকে দেখে রিজিয়া যেন চাবুকের আঘাত খেল। তার মনে কত স্বপ্নের প্রেমাস্পদের আলিঙ্গনের আশা ছিল। সে আশা অন্তর্হিত। কিন্তু দুটি জীবন চিরতরে নষ্ট হয়ে গেল। নসরুদ্দীন আজ কোথায়—কে জানে? দিল্লীতে যে নেই তার খবর রিজিয়া দিল্লীতে ফিরেই নিয়েছিল।

মরিয়ম-নসরুদ্দীনের কথা মনে হলে সুলতানা নিজেকে অপমানিত মনে করে। মরিয়মের ইজ্জত খোয়া যায়নি, তার গেছে বলে মনে হয়। কিন্তু যদি তার যেত, তাহলে বোধহয় এত যাতনা হৃদয়ে সহ্য করতে হত না। রিজিয়া বর্তমানে শুধু এই জায়গায় পরাজয় স্বীকার করেছে। বহু বাঁদী দিনের পর দিন প্রাসাদের অন্ধকারের অন্তরালে নিজের ইজ্জত বিলিয়ে দিয়ে পুরুষের কৃপা-প্রার্থিনী হচ্ছে তার জন্যে ক্ষতি না, কারণ রাজপরিবারের এইসব রাজসিক দুরারোগ না থাকলে, রাজপরিবারের ঠাট্ বজায় থাকে না। কিন্তু মরিয়মের মত মেয়েরা যারা বাঁদী হয়েও উচ্চাশা নিয়ে জন্মায় তাদের ইজ্জত কেউ হরণ করে নিলে সমস্ত রমণীকুলের অসম্মান।

এক সময় মনে হয় রিজিয়ার—এর চেয়ে বুঝি সামান্য ফকিরের ঘরে জন্ম নিলে ভাল হত। অন্ততঃ হাজারো হাজারো সমস্যা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারত। একটি ছোট্ট ঘরের ক্ষুদ্র-বৃত্তে জীবনের স্বপ্নকে ছোট্ট করে দেখলেও মনে আনন্দ ছিল। তার মধ্যে একাকীত্ব ছিল। একাত্ম ভাব জেগে থাকত। আন্তরিকতায় পূর্ণ হত। রাজা-উজীরের ঠাট্ নিয়ে অহেতুক সম্মানকে বজায় রাখতে গিয়ে আকুল হতে হতো না।

রিজিয়া আবার ছটফট করতে লাগল। আবার তার মনের শক্তি নষ্ট হয়ে গেল। সারাদিন ধরে রাজকার্য করে রাত্রিবেলা সে বিশ্রাম নিতে পারে না। আসমানের অন্ধকার রোশনী তাকে যেন আরও অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে দেবার চেষ্টা করে। নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়। মনে হয় যেন কবরের আত্মারা প্রেতাত্মার রূপ নিয়ে সিংহাসনের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। নেই, নেই, পরিত্রাণ নেই। অন্ধকারে দিল্লী-প্রাসাদের চারিদিকে যেন কারা এসে দাঁড়িয়ে তাকে শাসিয়ে যাচ্ছে।

সেই ফকির আজও গান গাইছে।

'বর্ দর্-ই সুলতান্-ই আসর্ হএক্ নাদারম্ কসে।

তা কে রসানদ্ বআর্জ-ই মকসম্-আর্কানে-উ।'

ফকির গাইছে সুলতানের দুঃখের গীত। কি দুঃখ! এই যুগের সম্রাটের দরবারে আমার কেহ (বন্ধু) নেই। যে (আমার) প্রার্থনা তাঁর শ্রুতিগোচর করবে। আল্লা নিজেই তামাম পৃথিবীর সম্রাট। সেখানে সেই সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করা বড়ই কষ্টকর।

আজ মনে হচ্ছে ফকির সাহেবই বুঝি সবচেয়ে সুখী। সে গান গাইতে পারে।

সে গান গেয়ে মনের দুঃখ লাঘব করতে পারে। তার গানে অপরের দুঃখ লাঘব হয়ে যায়। তার চোখের জল শুকোয়। বেদনা স্তিমিত হয়।

'কাবাত উল্-ইসলাম' মসজিদের পবিত্র প্রাঙ্গনের ফকিরকে স্মরণ করল রিজিয়া। লোকটিকে অনেকদিন ধরে দেখবার সাধ আছে। কিন্তু সময়াভাবে দেখা হয়ে উঠছে না। সময়াভাবে সুলতানা খোদাকে ডাকতে পারে না। মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে পারে না। দেশের জন্য, দশের জন্য সুলতানার সারাদিনের সময় সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। যে আল্লাকে ডাকলে মুক্তি, সেই আল্লাকে না ডেকে সুলতানা মানুষের সুখের জন্য প্রাণপাত করে।—আর সেই মানুষ তার ওপর অবিচার করে। মানুষও সুলতানাকে ভালবাসে না, আল্লাও রুষ্ট হল। তার চেয়ে যে সবাইকে ক্ষমা করে তাকে ডাকাই উচিত। মানুষ বেইমানী করে, সে তো করে না। সেই খোদাকে প্রাণভরে ডাকার জন্য রিজিয়ার মন আকুল হয়ে উঠল। রিজিয়ার ইচ্ছে করল, এই মুহূর্তে গিয়ে সে কাবাত-উল্-ইসলামের প্রাঙ্গণে ছুটে গিয়ে খোদাকে প্রাণভরে ডাকে। ফকিরের মত হৃদয় বেদনাসিক্ত করে রাতের স্তব্ধতার মাঝে করুণ সুরে গান গেয়ে ওঠে। তাকে চোখের জলের সাথে প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে জানায়—'হে খোদা, তুমি তো সবই জান। আমি যা চাইনি আমি তাই পেয়েছি। আমার চাওয়া পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে দিয়ে আমাকে তোমার ভক্ত করে নাও। আমাকে পবিত্র করে দাও। আমি শান্তি চাই। কোরা-আন্ শরিফের পবিত্র বাণী আমার মরমে আর সে আকুলতা কেন জাগায় না—আমি জানি না। অন্তর্যামী, তুমি সবই তো জান। আমি কিছু চাই না যদি তোমার মেহেরবাণী পাই।'

কে জানবে দাসবংশের তুর্কীসুলতানা বেগম রিজিয়া একদিন গভীর রাত্রে এমনি করে খোদাকে ডেকেছিল। অশ্রুজলে সিক্ত করে মন নিবেদন করেছিল। তার মনের নিঃস্ব ভাব খোদাকে জানিয়ে চেয়েছিল খোদার মেহেরবাণী। দিল্লীর সুলতানা অসি হাতে অজেয় বীর। শত্রুনিধনে সেদিন তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। কিন্তু সুলতানা যে মনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব—কে জানে? সকলে জানে, যে সম্পদের ওপর বসে সম্পদশালিনী, তার আর দুঃখ কি?

কিন্তু তার দুঃখ সম্পূর্ণ একটি ফকিরের দুঃখের চেয়েও দুঃখ-ভারাক্রান্ত—কে জানে? ফকিরের তবু দুঃখের শান্তি আছে, মুক্তি আছে, সে খোদার মেহেরবাণী পেয়েছে—কিন্তু সে?

মরিয়মের রমণী ইজ্জত নষ্ট হতে—সে উন্মাদিনী হয়ে যেতে রিজিয়া যেন সিংহাসন-হারা হয়ে, বা শত্রুর দ্বারা অধিকৃতা হয়ে বন্দী-জীবনের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

সে বন্দী। তার মুক্তি নেই। তার মুক্তি দিল্লীর সমস্ত লোকেরা হরণ করেছে। শান্তি নেই। কোথাও শান্তি নেই। তামাম দুনিয়ার সমস্ত শান্তি কে বা কারা হরণ করেছে।

পরদিন সন্ধ্যার মিঠে অন্ধকার দুনিয়াকে ছেয়ে ফেললে রিজিয়া এক কালো বোরখায় নিজেকে আচ্ছাদিত করে ইয়াকুতকে সঙ্গে করে 'কাবাত-উল্-ইসলামের' মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হল। 'কাবাত-উল্-ইসলাম'-এর মসজিদ ও মীনা মসজিদ পাশাপাশি। এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন কুতুবউদ্দীন ও অপরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন আলতামাস। দুটিই দিল্লীর রাজপরিবারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মসজিদ। মসজিদের গম্বুজে বিচিত্র কারুকার্য, শিল্পনৈপুণ্যে জগদ্বিখ্যাত।

রিজিয়া গিয়ে নামাজের হলঘরে প্রবেশ করল। পাশে ইয়াকুত। ইয়াকুতকে নিম্নস্বরে বলল রিজিয়া—খোদাকে প্রাণভরে ডাক, আমাদের মিলন যেন তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।

ইয়াকুত ম্লান হেসে মাথা নামাল।

রিজিয়া অনেকক্ষণ ধরে নামাজের ঘরে থেকে হাঁটু গেড়ে নামাজের ভঙ্গিতে চোখ বন্ধ করে বসে থাকল। চোখ দিয়ে তার অশ্রুর নদী বইল। খোদাকে সে কেঁদে কেঁদে তার মনের সমস্ত লুকোনো ব্যথা নিবেদন করল। উচ্চাশা থেকে তাকে সরিয়ে নেবার জন্যে প্রার্থনা জানাল। সে সুলতানা। তাই তার হৃদয়ে কোন দুঃখ থাকতে পারে না—এ কথা যারা ভাবে, তাদের ক্ষমা করতে বলল। খোদার কাছ থেকে চাইল প্রেম, প্রীতি, মায়া, মোহ। ইয়াকুতকে যেন সে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে নিজের হৃদয়ের তৃষ্ণাকে নিবৃত্তি করতে পারে—তার প্রার্থনা জানাল।

ইতিগীন-আসমানের শাদী হয়ে গেছে, তারা আলাদা মহল পেয়েছে। তাদের জীবনে মধুমাস। তারা দুটি হৃদয়ের চাওয়া-পাওয়াকে সম্পূর্ণরূপে মেলাতে দুনিয়ার সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করেছে। তাদের দুটি স্পন্দন, এক হয়ে স্পন্দনহীন সাম্রাজ্যে বিলীন হয়ে গেছে। মহলের দরজা বন্ধ করে দুনিয়ার সব দরজায় তালা দিয়ে তারা দুটি প্রাণ মধুমাসের স্বপ্নমন্দিরে আবেশের রঙে রাঙা হয়ে সরাব পান করে মাতাল হয়ে আছে। মাঝে মাঝে সেইজন্যে শোনা যায়, মহল থেকে ভেসে আসে ঘুঙুরের তান। গানের মিঠে খুসবু। প্রাণের পেয়ালা ভরে নারীপুরুষের মিলনে অমৃত যেন সরাবের মাতোয়ারাকেও ম্লান করে দেয়। বসোরাই গোলাপের গোলাপী রঙে চারিদিক সমাহিত। রজনীগন্ধার মিঠে সুগন্ধ ইতিগীন-আসমানের মহলের স্বর্গে রাজ্য বিস্তার করেছে।

ইত্যবসরে ইয়াকুত একদিন বহরমের রঙমহলের পাশ দিয়ে তার প্রাঙ্গণে ফিরছে, হঠাৎ বহরামের রঙমহলের পিছনের দিকে অন্ধকার অলিন্দের পাশে তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

বহরামের রঙমহলে আগের সে অত্যুজ্জ্বল আলোর রোশনাই নেই। নেই আর রমণীদের চপল হাসির কলকলানি। ঘুঙুরেরও ঐক্যতান শোনা যাচ্ছে না। কোন

রমণী তার লজ্জার ভূষণ ত্যাগ করে আমীর-ওমরাহদের খুশী করবার জন্যে অর্ধোলঙ্গ হয়ে নেই। নেই আর শরাবের পেয়ালার ঠুন্ ঠুন আওয়াজ। মাতালদের অহেতুক উল্লাসও নেই। রঙমহলের হলঘরের মধ্যে ক'টি সুদৃশ্য বর্তিকায় আলো জলছে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে ইতিগীন, বহরাম ও আমীর-ওমরাহ মালিক। তারা যেন চুপি চুপি কি নিয়ে আলোচনা করছে।

ইয়াকুত নিজের কানটাকে আরও তীক্ষ্ণ করে জাফরীর ভেতর দিয়ে দৃষ্টি পাঠিয়ে ওদের কথা শোনার চেষ্টা করল। চারিদিকে একবার সভয়ে তাকিয়ে নিল ইয়াকুত—কেউ দেখছে কি না দেখবার চেষ্টা করল। যদি তাকে লুকিয়ে অনুসরণ করে তাহলে যে সমূহ বিপদ—ওরা যে ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করতে পারে—এই ভেবে ইয়াকুত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। কারণ মরতে তার ভয় নেই, কিন্তু এখন মরলে সুলতানাকে কিছুতে বাঁচানো যাবে না। সুলতানার বিপদে তাকে বেঁচে থাকতেই হবে। সুলতানা তাকে ভালবাসে। সুলতানা নিঃসহায়া। এই ভেবে ইয়াকুত যতটা পারল নিজেকে অলিন্দের গোপনস্থানে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করল।

রঙমহল থেকে হঠাৎ ইতিগীনের উত্তেজিত কণ্ঠ ইয়াকুতের কানে গেল। ভাতিণ্ডার সামন্তরাজ ইখতিয়ারউদ্দীন আলতুনিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেছে। সে একাই আসছে দ্রুতগামী অশ্বে সওয়ার হয়ে আমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে। পিছনে আছে লক্ষবাহিনী সৈন্য। প্রয়োজন হলে তারা দিল্লী আক্রমণ করবে। আলতুনিয়ার লক্ষ্য দিল্লীর সিংহাসন নয়, রিজিয়া। অপরূপ সুন্দরী রিজিয়ার পাণিগ্রহণ। সিংহাসন সে অধিকার করে মালিক শ্রেষ্ঠ বহরাম শাহর হাতে অর্পণ করবে।

বহরাম তার আতর লাগানো গোঁফে হাত বুলতে বুলতে ইতিগীনের কথার প্রতিবাদ করল—কিন্তু যদি সে তার প্রতিশ্রুতি না রাখে? যদি সে সিংহাসন পেয়ে লোভাতুর হয়ে সিংহাসনে বসতে চায়! একদিকে 'রাজি' আর একদিকে সিংহাসন নিয়ে যদি দিল্লীর সমস্ত ক্ষমতা নিজে করায়ত্ত করে!

অসম্ভব! হতেই পারে না। ইতিগীন ফরাসের ওপর চপেটাঘাত করে কবুল করল—হাজিব, আলতুনিয়া কখনও এরূপ বেইমানী করতে পারে না। সে আমার দোস্ত। তার উদ্দেশ্য শুধু সিংহাসন প্রাপ্তি নয় রিজিয়া। অপরূপ সুন্দরী রিজিয়ার জন্যে তার বহুদিন ধরে মনে বাসনা আছে। ইতিগীন এই বলে খ্যা খ্যা করে উল্লাসে হেসে উঠল।

বহরামও দৈত্যো হাসি হাসতে হাসতে বলল—দেখো যেন কূলে তরী ভিড়িয়ে সে তরী ডুবিয়ে দিও না। তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে বলেই তোমার সঙ্গে আমার বহীনের শাদী দিয়েছি। দিল্লী-সিংহাসনের মায়া বড় সাংঘাতিক কি না, ও হাজারো খুবসুরত বেহেস্তর হুরীও এর কাছে কিছু লাগে না।

ইতিগীন কবুল করে কি একটা কথা বলতে গেল। কিন্তু ইয়াকুত আর দাঁড়ালো না। তার তখন দেহে উত্তেজনা। রক্তে চাঞ্চল্য জেগে উঠেছে। ভাতিণ্ডার সামন্তরাজ আলতুনিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেছে। সে দিল্লী অধিকার করতে

চায়। রিজিয়াকে ছিনিয়ে নিতে চায়। ষড়যন্ত্র সব ইতিগীনের দ্বারা আয়োজিত হয়েছে। ভাবা গিয়েছিল যে দিল্লীতে বুঝি আর কোন বিদ্রোহের সম্ভাবনা নেই। আমারাজ বশ্যতা স্বীকার করতে সবাই জাল গুটিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, এইমাত্র তার প্রমাণ হল।

এখন উপায়!

রিজিয়ার কর্ণগোচর করতে গেলে অযথা বিলম্ব হয়ে যাবে। অথচ আলতুনিয়া হয়ত এতক্ষণে যমুনার ধার দিয়ে এগিয়ে আসছে। সে এসে এদের সঙ্গে মিলিত হলে সমূহ বিপদ। তখন একা রিজিয়াকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করা মুস্কিল হয়ে পড়বে। তার চেয়ে পথিমধ্যে আলতুনিয়াকে বাধাদান করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আলতুনিয়াকে দিল্লী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আসতে পারলে অন্ততঃ এদিকে সময় পাওয়া যাবে, তখন স্থলতানার সঙ্গে একটা পরামর্শ করে ব্যবস্থা করলেই সবদিকের স্থবিধে।

এই ভেবে ইয়াকুত আর কালবিলম্ব না করে অশ্বশালা থেকে দ্রুতগামী অশ্বে সওয়ার হয়ে রাতের অন্ধকারে দিল্লীর প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে গেল। তবে যাবার সময় একজন মাত্র লোককে সচেতন করে যেতে ভুললো না, সে হলো—ওসমান খাঁ। ইয়াকুত রাজ সৈন্যবাহিনী থেকে বাছা বাছা ক'জন যোদ্ধাসেনা দিয়ে গোপনে একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করে রেখেছিল, যে সৈন্যবাহিনীর প্রতিজ্ঞা ছিল নিজের জীবনপণ করেও স্থলতানাকে সবরকম বিপদ থেকে রক্ষা করবে। যদি কোনদিন রাজসেনাবাহিনী দিল্লীশ্বরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় তাহলে অন্তত বাধা দান করবে ইয়াকুতের এই সৈন্যবাহিনী। সেই সৈন্যবাহিনীর কর্তৃত্ব ছিল এই ওসমান খাঁর ওপর। যদিও ইয়াকুতই তার সব। তবু গোপনীয় বলে ইয়াকুত সবসময় এই বাহিনীকে পরিচালনা করতে পারত না। সেইজন্য ওসমান খাঁ-ই ছিল এর প্রধান। ইয়াকুত যাবার সময় ওসমান খাঁকে সংবাদ দিয়ে গেল এই বলে যে, সে আগামী কল্য প্রত্যুষে দিল্লীপ্রাসাদে না ফেরে তাহলে যেন তাকে অনুসন্ধানের জন্য একদল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হয়। ইয়াকুত বুঝতে পারছিল, ঝড় উঠেছে, ঝটিকা-প্রবাহ চারিদিকে তার পাখা মেলে দিয়েছে, ধ্বংসের রূপ অবশ্যম্ভাবী।

যমুনার পাশ দিয়ে নক্ষত্রবেগে এক অশ্বারোহী ছুটে চলেছে। বাতাসের চেয়েও দ্রুত তার গতিবেগ। চাঁদনী রাত নয় শুধু মেঘের আড়াল থেকে চাঁদের নিষ্প্রভ দ্যুতি ধরিত্রীর বুকে আলো-ছায়ার খেলা শুরু করেছে। সেই আলোয় যমুনার জল শুধু টলমল করছে দেখা যাচ্ছে, কোন সৌন্দর্যের সৃষ্টি সেখানে নেই।

ইয়াকুত চলেছে দ্রুত কিন্তু তার মনের মধ্যে হাজারো চিন্তা। হাজারো প্রশ্নের ভীড়ে তার মন আচ্ছন্ন। আশঙ্কা। সুলতানা রিজিয়ার জন্ত উদ্বিগ্ন। বিদ্রোহীরা ভিতরে ভিতরে আবার নতুন কৌশল অবলম্বন করছে। এবার আলতুনিয়া তার প্রধান। আয়াজের মত এই আলতুনিয়াও একজন বীর। এর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে রিজিয়া তাকে অনুগ্রহ দেখিয়েছিল। রিজিয়া নিজে বীর। বীরকে সম্মান দেখানো বীরের কর্তব্য, ধর্ম। সেইজন্তে এই বীরকে রিজিয়া জায়গীরদার করেছে, উপাধি দিয়েছে, সম্মান দিয়েছে। ভাতিণ্ডার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছে। রিজিয়ার কাছে আলতুনিয়া সবরকমে ঋণী। তার ভাগ্য ফেরার জন্তে সবসময় সে রিজিয়ার কাছে কৃতজ্ঞ।

রিজিয়ার মুখে ইয়াকুত অনেকবার শুনেছে আলতুনিয়ার নাম। এবং রিজিয়ার এও বিশ্বাস ছিল যে, আলতুনিয়া কখনও বেইমানী করবে না। যখনই সুলতানার প্রয়োজন হবে তার ডাকে অন্ততঃ ভাতিণ্ডার সামন্তরাজ সাড়া দেবে।

রিজিয়া আরও বলেছিল এই আলতুনিয়ার সম্বন্ধে। ভাগ্যপীড়িত একজন যুবক ভাগ্যান্বেষণে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একদিন নগর প্রদক্ষিণ করতে করতে এই যুবকের সঙ্গে আকস্মিক তার পরিচয় হয়ে যায়। নগরবাসীর একটি গৃহে হঠাৎ কেমনভাবে আগুন লেগেছিল। সেই আগুন থেকে একটি মানব শিশুকে নিজের জীবনপণ করে এই নির্ভীক যুবক অক্ষত অবস্থায় বের করে নিয়ে আসে। রিজিয়া সেখানে উপস্থিত হয়ে, সবিশেষ অবগত হয়ে নির্ভীক যুবককে পুরস্কৃত করিতে চাইল। তখন যুবক জানাল তার দুঃখের কাহিনী। সে যাচ্ছিল রাজদরবারে যদি সুলতানার কৃপাপ্রার্থী হতে পারে এই মানসে। রিজিয়া মুহূর্তে কালবিলম্ব না করে এই নির্ভীক যুবক নওজোয়ানকে দিল্লীর পূর্বাঞ্চল বুলন্দশহরে সুপ্রতিষ্ঠিত করল। এবং ভাতিণ্ডার দুর্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত করল।

তাই ইয়াকুত ভাবছিল, যখন রিজিয়া শুনবে তারই অনুগ্রাহী ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন আলতুনিয়া বিদ্রোহী এবং বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তখন সুলতানার মুখের অবস্থা কি দাঁড়াবে? এই সেদিন রিজিয়া দুঃখ করে বলছিল, 'যাকেই অনুগ্রহ দেখিয়েছি সেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাই ভয় করে, শেষপর্যন্ত তুমিও যদি বিশ্বাস হারাও তাহলে আমার বেঁচে থাকা দুষ্কর হয়ে পড়বে।' ইয়াকুতের ইচ্ছা ছিল সুলতানাকে কয়েকটি কথা বলে। কিন্তু সে সুলতানাকে সম্মান করে। সুলতানা তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে বলে সে সেই সুযোগ নিয়ে সুলতানাকে অসম্মান করবে এরকম সাহস তার না হওয়াই উচিত। কিন্তু সুলতানার সেদিনের কথায় স্পষ্ট হয় সুলতানার মনের বেদনা। সুলতানা সবাইকেই বিশ্বাস করে কিন্তু যখনই আঘাত পায় তখনই ভেঙে পড়ে এইসব আবোল-তাবোল কথা বলে যায়।

ইয়াকুত তাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল—অন্ততঃ দুনিয়ায় একজন ব্যক্তি বেঁচে থাকবে যে কোনদিনও লোভের বশবর্তী হয়ে সুলতানার বিশ্বাস হারাবে না।

যমুনার ধার দিয়ে বহুপথ অশ্বারোহী ইয়াকুত চলে আসবার পর হঠাৎ সে অশ্বের

বল্গা টেনে ধরে পথিমধ্যে এক বৃক্ষের তলায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক দীর্ঘ বটবৃক্ষের দেহ হাত-পা মেলে চারিদিক ভরিয়ে রেখেছে। স্থানটি সেইজন্যে ছায়া-ছায়া অন্ধকার। একটি মানুষ সেই বটবৃক্ষের আড়ালে ঘোড়া নিয়ে লুকিয়ে থাকলে বাইরের কেউ তাকে দেখতে পাবে না। ইয়াকুত ভাবল, অযথা পরিশ্রম করে এত পথ শত্রুর পিছনে ধাবিত না হয়ে একস্থানে অপেক্ষা করে থাকা সমীচীন। কারণ দিল্লীতে প্রবেশ করতে গেলে এই পথ দিয়েই তাকে যেতে হবে। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সমাধানও হয়ে গেল।

ইয়াকুত অশ্বের ওপর সওয়ার হয়ে বটবৃক্ষের পিছনে নিজেকে লুক্কায়িত রেখে শত্রুর প্রতীক্ষা করতে লাগল। অনন্তকাল সে প্রতীক্ষা।

সম্মুখে যমুনার প্রবহমান শান্তমূর্তি। কালো মেয়ে যেন তার যৌবনের দেহ মেলে ইয়াকুতের দিকে ব্যাকুল দুটি আঁখি মেলে তাকিয়ে আছে। অন্ধকারে জোনাক জ্বলছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঐক্যতান। বাতাসের হিস্ হিস্ শব্দ। নির্ঘুম ইয়াকুত দুটি চোখ মেলে কান সজাগ রেখে অশ্বের পায়ের শব্দ শোনার চেষ্টা করতে লাগল। সামনে চলমান পথ, বহুদূর বিস্তৃত। সেই পথের সীমানায় ইয়াকুতের দুটি চোখ। রাতের প্রহর এগিয়ে চলেছে। দিল্লীর লোকালয় থেকে এইস্থান বহুদূরে। এখান থেকে দিল্লী প্রাসাদের কোন শব্দই শোনবার উপায় নেই।

ইয়াকুতের শরীরে উত্তেজনা। রক্তে তার শত্রু নিধনের চাঞ্চল্য। কিন্তু মনে তার আনন্দ। কারণ সে এতদিন পরে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে। যদি আলতুনিয়াকে সে হটাতে পারে তাহলে রিজিয়ার কাছে সে শ্রদ্ধা পাবে। রিজিয়া যে তাকে কৃপাদৃষ্টি দেখিয়ে ভুল করেনি তার প্রমাণ হয়ে যাবে। এ দিল্লীসাম্রাজ্য যে অরক্ষিত নয়, বিদ্রোহীরা বিদ্রোহের আগুন গোপনে জ্বালিয়ে চলেছে তাও ভালভাবে রিজিয়ার কর্ণগোচর হবে।

সম্পূর্ণ একটি ভবিষ্যৎ কল্পনা নিয়ে মনের অসমসাহসিক শক্তি জাগিয়ে ইয়াকুত বটবৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে থাকলো। দেখতে দেখতে সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। আকাশ অন্ধকারের কালোবর্ণ থেকে মুক্তি পেয়ে আলোর মুখ দেখল। যমুনার জলে ভোরের আলো তার স্বর্ণরঙের ঠোঁট দিয়ে চুম্বন দিল। আসমানের নক্ষত্ররা অদৃশ্য হয়ে মেঘের বুকে নীলের ছোঁয়া জাগাল।

ইয়াকুত আসমানের দিকে তাকিয়ে ধরিত্রীর বুকে চোখ মেলে সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর বিস্মিত হলো দূরে পথের দিকে তাকিয়ে আলতুনিয়া কোথায়? তবে কি যে সংবাদ গতরাত্রে শুনেছিল তা ভুল! কিন্তু তাই বা কি করে হয়! বিশেষ করে ইতিগীনের পরামর্শ। ইতিগীন কৌশলে যে জাল পেতে চলেছে, ভবিষ্যতে মনে হয় তার ইচ্ছা সে দিল্লীর সিংহাসনে বসবে। সেই ইতিগীনের আলোচনা সে স্বকর্ণে শুনেছে। ইতিগীনের কথা যদি মিথ্যে হয় তাহলে আলতুনিয়া কখনই দিল্লীতে আসতে সাহস করবে না। কারণ আলতুনিয়া ইতিগীনের ভরসাতেই আসছে।

ইয়াকুত আবার অন্যরকম করে ভাবলো—অবশ্য আলতুনিয়া মতলব পরিবর্তন করতে পারে। হয়ত নিজে একা না এসে সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিল্লীপথে রওনা হয়েছে।

হয়ত সেও কৌশল প্রয়োগের চেষ্টা করছে। পাছে দিল্লীতে একা গেলে কেউ তাকে বন্দী করে সেইজন্তেই ভীত হয়ে মতলব পরিবর্তন করেছে। কিংবা কাউকে বিশ্বাস না করে সরাসরি সে সৈন্যবাহিনী নিয়ে অতর্কিতে দিল্লী আক্রমণ করে, রিজিয়াকে বন্দী করে সিংহাসন করায়ত্ত করতে চায়। শুধু রিজিয়াই যে তার কাম্য তা নয় সিংহাসনও যে সে মনে মনে চায়—সে কথা মুখে প্রকাশ না করলেও বোঝা যায়। আলতুনিয়া বোধ হয় সেই পন্থা অবলম্বন করেছে। যদি সে সৈন্যবাহিনী নিয়ে অতর্কিতে দিল্লী আক্রমণ করে—তার আগে এই সংবাদ রিজিয়ার কর্ণগোচর করাই সর্বপ্রথম কাজ। এই ভেবে ইয়াকুত দ্রুত দিল্লীতে ফেরার মনস্থ করল। কিন্তু হঠাৎ অশ্বের পায়ের শব্দ দূর থেকে ভেসে এল। ইয়াকুত সচকিত হয়ে উঠল।

অশ্ব খুব দ্রুত আসছে। মাটিতে তার কম্পন। বাতাসে তার শব্দ। ইয়াকুত বটবৃক্ষের পাশে লুকিয়ে থেকেই দূর পথের দিকে তাকাল। দেখা যাচ্ছে একটি ছোট চলমান বিন্দু আস্তে আস্তে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। ইয়াকুতের মনে আনন্দ জেগে উঠল। কটিবন্ধে খাপে পোরা তরবারীখানা হাতের মুষ্টিবন্ধনে জোরে চেপে ধরল। বুকে অদম্য সাহস নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল শত্রুর।

অশ্বের পায়ের শব্দ আরও স্পষ্টতর হলো। প্রত্যুষের আলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। যমুনার জলে পড়ল সোনার রং। পূর্বাভাসে সূর্যের রশ্মি দিগন্তে রং ছড়াল। অশ্বারোহী আরও কাছে এসে পড়ল।

আরও আরও কাছে। একেবারে ইয়াকুতের বটবৃক্ষের ধারে। মুহূর্তে ইয়াকুত লুকায়িত স্থান থেকে বেরিয়ে এসে ধাবমান অশ্বের গতি রোধ করল। সরোষে গর্জন করে অশ্বারোহীকে বলল—কে তুমি? কোথায় যাও?

অশ্বারোহী হঠাৎ পথিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হতে দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে খাপ থেকে তরবারী বের করে প্রত্যুত্তর দিল—তুমি কে? হঠাৎ পথিমধ্যে অযথা আমার পথ রোধ করে তুমি তোমার বিপদকেই ডেকে নিয়ে এসেছ।

ইয়াকুত মৃদু হেসে বলল, জালাউদ্দীন ইয়াকুত বিপদকে কখনও ভয় করে না। আমি কি তাহলে ভাতিণ্ডার সামন্তরাজ, রিজিয়ার অনুগ্রাহী, ইখতিয়ারউদ্দীন আলতুনিয়ার সঙ্গে কথা বলছি!

আলতুনিয়া হঠাৎ অতর্কিতে তরবারী দিয়ে ইয়াকুতকে আঘাত করে বসল। মুখে বলল—হ্যাঁ, আমিই সেই আলতুনিয়া। দিল্লী সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। তোমাকে বধ করবার জন্তেই আমার দিল্লী আগমন।

ইয়াকুত অতর্কিতে তরবারীর আঘাত পেয়ে—তার দেহের একাংশের কামিজ ভিজে রক্তে লাল হয়ে উঠল। সেও মুহূর্তে খাপ থেকে তরবারী বের করে উপর্যুপরি কয়েকবার আলতুনিয়াকে দারুণ বেগে আক্রমণ করল। কিন্তু আলতুনিয়া শক্তিমান, কৌশলী, তরবারী চালনায় সিদ্ধহস্ত। দুই বীরের মরণপণ যুদ্ধ যমুনাতটে দারুণভাবে সরগোল তুলল। শুধু দুটি তরবারীর সংঘর্ষের শব্দ। সূর্যের আলো দুটি তরবারীর ওপর পড়ে ঝক্‌মক্‌ করতে লাগল।

পাখীরা হঠাৎ বনান্তরাল থেকে ভয়ে ঊর্ধ্বাকাশে ছুটে পালাল। তারা অস্বাভাবিকভাবে চীৎকার করে যমুনার তটের শান্তিকে কবলিত করল।

আলতুনিয়া তরবারী চালাতে চালাতে বলল—মৃত্যুর জন্তে তৈরী হও বিদেশী মুসাফের। সুলতানা রিজিয়ার স্নেহধন্য হয়ে দুনিয়ায় কেউ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে, আমি তা সহ্য করব না।

ইয়াকুতও দাঁতে দাঁত চেপে উত্তর দিল—বেইমান, নিজের স্পর্ধিত ভঙ্গিকে সংযত করে নিজের প্রাণ বাঁচা। সুলতানার মন জয় করার শক্তি তোর নেই।

যমুনার জল লাল হয়ে উঠল। দুজনের দেহ ক্ষত বিক্ষত। দেহের কামিজ রক্তে ভিজে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। মৃত্যুপণ যুদ্ধ। দুজনেই দুজনকে নিহত করবার কৌশল অবলম্বন করতে লাগল। যমুনার নির্জনতটে শুধু তরবারীর ঝনঝনানি।

শিশিরসিক্ত শান্ত প্রত্যূষে সূর্যের আলোর স্নিগ্ধরূপ। সেই স্নিগ্ধরূপকে বধ করে যমুনাতটে হানাহানির খেলা শুরু হয়ে গেল। একজন বধ করতে চাইছে বৃহত্তর স্বার্থের জন্ত—অপরজন বধ করতে চাইছে নিজের স্বার্থের জন্য।

হঠাৎ আলতুনিয়া অতর্কিতে ইয়াকুতের বক্ষ ভেদ করে তার তরবারী চালিয়ে দিল। ইয়াকুত নিহত হয়ে অশ্ব পিঠ থেকে পিছলে পড়ে মাটিতে গড়িয়ে গেল। রক্তের নদী বয়ে গেল ইয়াকুতের দেহ থেকে। হঠাৎ দিল্লীর পথ থেকে বহু অশ্বের দ্রুত চলমান পায়ের শব্দ আলতুনিয়ার কর্ণগোচর হল। সে তখন দারুণভাবে হাঁফাচ্ছিল। অত্যধিক শক্তি ক্ষয়ে তার দেহের অবস্থা সঙ্গীন। এখন বিশ্রাম না নিয়ে পুনঃশক্তি ফিরে আসবে না। এ ছাড়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করা সমীচীন নয়। ইয়াকুত নিহত হলে সুলতানা রিজিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। হত্যাকারী আলতুনিয়াকে সে ক্ষমা করবে না এ বোঝাই যায়।

এবার একাধিক অশ্বের পায়ের শব্দ খুব কাছে অনুচ্চারিত হয়ে উঠলো। আলতুনিয়া অশ্বের মুখ ফিরিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটনাস্থলে ওসমান খাঁ তার বাহিনী নিয়ে এসে উপস্থিত হল। নিহত রক্তাক্ত ইয়াকুতকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তারপর অশ্বের পিঠে নিহত ইয়াকুতকে তুলে দিল্লী অভিমুখে রওনা হল।

বাতাসে সংবাদ চারিদিকে ছুটে গেল। আমীর-ওমরাহ-মালিকরা প্রাসাদের প্রাঙ্গণে ছুটে এল ইয়াকুতের মৃতদেহ দেখবার জন্তে। ইয়াকুত-এর মৃতদেহ দেখাই তাদের উদ্দেশ্য নয়, রিজিয়ার ভাবান্তর লক্ষ্য করা আসল কাজ। সুলতানা তার প্রেমাস্পদের মৃতদেহ দেখে কি করে দেখবার জন্তে অগণিত জনসমুদ্র প্রাসাদের প্রাঙ্গণ ভরিয়ে তুলল। ওসমান খাঁ গতরাত্রের সমস্ত কাহিনী সুলতানাকে আড়ালে নিয়ে

গিয়ে জানাল। ভাতিণ্ডার শাসনকর্তা আলতুনিয়াই যে এ কাজ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রিজিয়া চমকে উঠল আলতুনিয়ার কথা শুনে। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না আলতুনিয়া এই কাজ করতে পারে। কিন্তু অবিশ্বাসেরও কোন কারণ নেই। গতরাত্রে ইয়াকুতের অভিযানই প্রমাণ করেছে আলতুনিয়ার বিদ্রোহ। ইয়াকুত নিজের জীবন তুচ্ছ করে সুলতানা রিজিয়াকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। তার মৃত্যু বৃহত্তর স্বার্থের জন্য। আজ দিল্লীর কেউ বুঝুক আর না বুঝুক, রিজিয়া জানে, ইয়াকুত সুলতানা রিজিয়াকে বিপদমুক্ত করবার জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে।

রিজিয়া একদৃষ্টিতে ইয়াকুতের রক্তাক্ত মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রইলো। প্রাণের ভেতরে দারুণ এক ঝড়ের লক্ষণ। বুক ফেটে যাবে বুঝি। চোখ দুটি জ্বালা করে কান্না বেরিয়ে আসবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করতে লাগল। আমীর-ওমরাহ, রাজন্যবর্গরা রিজিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ রিজিয়া কঠিন হয়ে উঠল। কর্তব্যের পথে অটল হয়ে উঠল। সে সুলতানা। তার কর্তব্য, তারই পার্শ্বচরের আততায়ীকে উপযুক্ত সাজা দেওয়া। সেখানে তার কোন দুর্ণাম নেই। সেখানে সে সুলতানা। তার কর্মচারীকে গুপ্তহত্যার দায়ে সে হত্যাকারীকে উপযুক্ত সাজা দিতে পারে।

কিন্তু রিজিয়া যে জানতো, আলতুনিয়া খুন করেছে সেকথা প্রকাশ করল না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল—আলতুনিয়াকে উপযুক্ত শাস্তিরই ব্যবস্থা করতে হবে। সে বেইমান এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করবে এ যেন স্বপ্নের অগোচর ছিল। প্রকাশ্যে মন্ত্রী উজীরকে আদেশ দিল—পার্শ্বচরের হত্যাকারীর অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠিয়ে দিন। হত্যাকারীকে পেলে রাজদরবারে হাজির করবেন, তার উপযুক্ত শাস্তিরই ব্যবস্থা করবে দিল্লীর সুলতানা।

ইয়াকুতের মৃতদেহ কবরের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়ে রিজিয়া চলে গেল তার খাসমহলে। মহলে নিজের খাসকামরায় এসে ডিভানের ওপর ভেঙে পড়ল। রুদ্ধকান্নার অবাধ স্বাধীনতায় সে সেই ঘরের মধ্যেই নিজেকে মেলে দিল।

কে জানে? ইতিহাস কি জানে—সেদিন দিল্লীর সুলতানা একজন বিদেশী মুসাফের জালাউদ্দীন ইয়াকুতের জন্য কতখানি দুঃখ পেয়েছিল? রিজিয়া শুধু ইয়াকুতকে হারায়নি, বন্ধু হারিয়েছে, আত্মীয় হারিয়েছে, সমস্ত দুনিয়ার একটিমাত্র মানুষ যে সুলতানাকে আন্তরিকভাবে রক্ষার জন্য সচেষ্ট ছিল, তাকে হারিয়েছে। নতুন করে যেন আবার রিজিয়ার মনে তার পিতামাতার শোক উদ্বেল হয়ে উঠলো।

পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে যখন ভায়েরা যুদ্ধ করছে, সেইসময়ে রিজিয়া পিতার দুঃখে মহল থেকে বাইরে বহুকাল বের হয়নি। শুধু কেঁদেছে। সান্ত্বনা পাওয়ার জন্যে কোরা-আন শরিফের পৃষ্ঠাগুলি উদাত্তস্বরে আবৃত্তি করেছে। বাইরের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়ে একেলা ঘরে বহুকাল সে নিজেকে নিয়েছিল।

মা মারা যেতে পিতার সান্ত্বনায় মায়ের দুঃখ সে ভুলেছিল। তা ছাড়া পিতা—যাকেও অত্যধিক ভালবাসতেন। পিতার দুঃখের সাথে তার দুঃখ মিলে আপনা থেকে সান্ত্বনা এসে গিয়েছিল। কিন্তু পিতা মারা যেতে সে যেমন একলা হয়ে গিয়েছিল, আজ আবার ইয়াকুত নিহত হতে সে সম্পূর্ণ একলা হয়ে গেল।

পঁচিশ বছরের জীবনে যৌবনের স্তিমিত প্রবাহ। কিন্তু অনাস্বাদিত যৌবনের সেই আকাঙ্ক্ষা তাকে উদ্বেল করে দিয়েছিল ইয়াকুতের সাহায্যে। একদিন জীবনের প্রথম যৌবনে সিংহাসনের জন্য সে দিকভ্রান্ত হয়ে অস্ত্রকে আপন করেছে, হৃদয়কে না। সেদিন ইস্কান্দার যদি একটু সুযোগ পেত তাহলে তার শূন্য জীবন পূর্ণ করে তাকে আজকের স্মৃতিতে কিছু সঞ্চয় দিয়ে যেত। সেদিন ভুল করে হৃদয়ের চাহিদাকে বধ করে সিংহাসন চেয়েছিল। সিংহাসন সে পেল বটে কিন্তু হৃদয়ের আকাঙ্খা হাহাকার করে মাথা কুটে মরল। বুঝি ইস্কান্দারের অভিশাপই ইয়াকুতের হত্যার জন্যে দায়ী।

ফুলের মত নিষ্পাপ ইস্কান্দারের প্রেম সে তুচ্ছ করেছিল। তার ঐশ্বরিক মহব্বতের রোশনীকে ম্লান করে দিয়ে সে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সেদিন তার প্রতি সে এতটুকু অনুকম্পা দেখায় নি। আজ মহব্বতের আগুনে জ্বলে শেষ হয়ে গেলেও সেদিনের প্রতিশোধের জ্বালা কোথায় যাবে?

রিজিয়া, সুলতানা রিজিয়া সম্পূর্ণ দিওয়ানা হয়ে হৃদয়ের নিঃস্বতাকে ভরাট করবার জন্যে নিজের দৃষ্টির মাঝে কিছু খুঁজে ফিরতে লাগল। সান্ত্বনা নেই। শুধু আছে হাজারো রত্নসম্ভারে মোড়া একটি নিষ্প্রাণ সিংহাসন। যে সিংহাসনে বসবার জন্যে প্রতিটি মানুষ লালায়িত। রিজিয়া নিজেও একদিন লালায়িতা ছিল। কিন্তু আজ নেই। আজ সে মনে করে—তার এই বহু আকাঙ্খিতা সিংহাসনের জন্য সে সব হারিয়েছে। এই সিংহাসনে পিতা তাকে উত্তরাধিকারিণী করে গিয়েছেন। তিনি জানেন, তার কন্যার সমস্ত মহব্বত এই সিংহাসনকে কেন্দ্র করে। সেখানে অন্য কোন প্রবৃত্তির যোগ নেই। তিনি কন্যাকে অনূঢ়া থেকেই রাজ্য পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশ্য মুখে কিছু বলেন নি তবে মনে হয় তার অভিপ্রেত তাই ছিল। বিলাসিনীর জন্য যে এই নিষ্পাপ সিংহাসন নয় সে কথা তার নির্দেশের অক্ষরে অক্ষরে। পুত্ররা উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী বলে তিনি কন্যাকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী করেছিলেন। তার দূরদর্শিতা প্রশংসাযোগ্য।

কিন্তু তখন যদি একবার বুঝত রিজিয়া। এই সিংহাসনের জন্যে তাকে যা ত্যাগ করতে হবে মনুষ্য জীবনে তার মূল্য অনেক। তাহলে সে কখনই সিংহাসনের জন্য ব্যগ্র হতো না। আজ এই সিংহাসনের জন্যে তার হৃদয় হারিয়ে গেল। আল্লার কাছে সে ছোট হয়ে গেল। আল্লার অভিপ্রেত রমণীর রমণীকর্ম করা উচিত। রমণী যদি পুরুষের মত রাজ্য পরিচালনা করে তাহলে রমণীর যে সহজাত কোমল প্রবৃত্তিগুলি ঈশ্বর দিয়েছেন সেগুলি দিয়ে কি হবে? খোদার শাসন পরিচালনার ওপর টেক্কা দিয়ে সে ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তার মুক্তি নেই।

তবু এ শোক তার গোপন। এ শোকের জন্ম বাহ্যিক কিছু সে প্রকাশ করতে পারবে না। মনের বেদনা মনের রঙেই ম্লান হয়ে মনের ভেতরে মৃত্যুর আরাধনা করবে। বাইরে তার প্রকাশ হলেই সারা রাজ্য তাকে নিয়ে একটি কাহিনীর জাল বুনবে। সারা রাজ্য আজ মনে হয় খুশী। সুলতানা রিজিয়ার একটু আনন্দ—তাও আল্লা কেড়ে নিয়ে তাকে শাস্তি দিয়েছে তার জন্যে সমস্ত আর্যাবর্তের লোক খুশী। রিজিয়া রমণীধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে সে পুরুষের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। সেইজন্যে সমগ্র দাস-সাম্রাজ্যের প্রজারা সুলতানার এই ধর্মচ্যুত কার্য সমর্থন না করে মনে মনে সুলতানার উপর ক্ষুব্ধ ছিল। সুলতানার প্রতিটি পরাজয়, আর্যাবর্তের সমস্ত রমণীকুলের জয়। তারা পর্দানসীন হয়ে পর্দার বাইরে অগণিত পুরুষের সামনে নির্লজ্জ এক রমণীকে ধর্মচ্যুতা হতে দেখে বার বার অভিসম্পাত দিয়েছে। সেই রমণী সিংহাসনে অধিষ্ঠাতা হয়েও আবার রমণীধর্মকে পালন করতে চায়। রিজিয়া যেন নিজের বদ্ধঘরের মধ্যে বসেই অনুভব করতে লাগল, তার প্রিয়তমের নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে সমস্ত উত্তরভারত উৎসবে মুখরিত হয়ে উঠেছে।

কে আর রিজিয়াকে সান্ত্বনা দেবে? বাঁদীরা পরিচারিকা ছাড়া কিছু নয়। তারা আদেশ তামিল করে। রিজিয়াকে তারা কর্ত্রী হিসাবে শ্রদ্ধা করে। সেখানে তাদের আন্তরিকতা ধৃষ্টতার সামিল। তারা প্রাণের ভয়ে জড়োসড়ো। কিসে সুলতানার ক্রোধ প্রকাশ পায় তার দিকেই তাদের লক্ষ্য বেশী। সুলতানাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে দিনান্তে তারা হাজারো সেলাম জানিয়ে নিজেদের দুর্বলতার মার্জনা চায়। এক ফিরোজা একটু তাদের চেয়ে স্বতন্ত্র। কিন্তু সে দুর্বল। এসময় সে ভয়ে ভয়ে কাছে আসে না। জানে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে যদি অন্যায় কিছু বলে ফেলে তাহলে সুলতানার ক্ষমা পাওয়া মুস্কিল হয়ে পড়বে।

তাই রিজিয়া নিজের শাস্তি নিজেই অর্জন করে নিল। নিজের রক্ত নিজেই মুছে নিয়ে নিজেই তাতে ওষুধ লেপন করল। কিন্তু মনে মনে সে ইয়াকুতের হত্যাকারীকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে শক্তি যোগাড় করতে লাগল। ওসমান খাঁকে গোপনে নিজের মহলে ডেকে নিয়ে এল। তার সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করল—ইতিগীনকে পৃথিবী থেকে কি করে সরান যায়? কারণ সে জানে, আলতুনিয়াকে শাস্তি দেওয়ার আগে ইতিগীনকে শাস্তি দেওয়া উচিত। ইতিগীন অনেকখানি এগিয়ে গেছে। তাকে আর বাড়তে দিলে শেষে সিংহাসন রক্ষা করা মুস্কিল হয়ে পড়বে। ইতিগীন নিহত হলে বহরাম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। হয়ত সাক্ষাতে বিদ্রোহের আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে দেবে। তা দিক্। তার জন্য সুলতানা তৈরী। সে ভয় করে না।

ওসমান খাঁ কুর্নিশ জানিয়ে বলল, আমি সব বুঝতে পেরেছি সুলতানা। ইতিগীনকে এমনভাবে গুপ্তহত্যা করতে হবে যে রাজ্যের লোক কেউ জানবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি সব ব্যবস্থা তিনদিনের মধ্যে শেষ করব। অশ্বপাল জালাউদ্দীনের সজ্জিত সেনাবাহিনী আপনার সেবায় লাগাবার জন্যে সর্বদা তৈরী। অশ্বপালের ইচ্ছাতেই আমরা কাজে রূপ দিয়ে তার আত্মার কল্যাণ কামনা করব।

ওসমান চলে গেলে রিজিয়া আসমানের কথা ভাবল। আসমানের জন্ত সে কাতর হয়ে উঠল। ইতিগীনের মৃত্যুতে আসমানের হৃদয় ছিন্ন হবে এই ভেবে তার মনে দুঃখ হলো। কিন্তু পরক্ষণে মরিয়মের জন্যে—নিজের জন্তে দুঃখিত হলো। মরিয়মেরও হৃদয় ছিল, তারও ছিল। কিন্তু ঐ শয়তান ইতিগীনের জন্ত সব গেছে। তাদের দুজনের হৃদয়ের বিনিময়ে যদি আসমানের হৃদয় নেওয়া যায়—অন্তত আল্লা অপরাধ নেবে না। তিন আওরৎ দিওয়ানা হয়ে ফকীরসাহেবের মত দরবারী সুরে গান গাইবে। মন্দ কি? ইতিগীন তারই অনুগ্রহে এই রাজবংশতে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। এখন সে রাজবংশের আত্মীয়। এবার তারই চক্রান্তে এই দুনিয়া থেকে সে সরে যাবে।

রিজিয়া ইতিগীনকে উন্মুক্ত রাজসভায় অপরাধী সাব্যস্ত করে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে পারত কিন্তু তাতে রাজন্যবর্গরা বাধা দান করত। যদিও ঘাতক রিজিয়ার কথাই রাখত কিন্তু আমীর-ওমরাহরা প্রতিবাদ করে ইতিগীনের পক্ষাবলম্বন করত।

রিজিয়া গুপ্তহত্যার আয়োজন করল শুধু সাময়িক চাঞ্চল্য থেকে রাজ্যকে বাঁচানোর জন্যে। প্রথমে ইতিগীন, তারপর আলতুনিয়া ও বহরাম। পর পর এদের গুপ্তহত্যা করলে সামনের বিপদগুলো থেকে উদ্ধার পাওয়া সুবিধে হবে। ইয়াকুতের হত্যাকারী এই তিনজন। তিনজনকে হত্যা করতে পারলে ইয়াকুত হত্যার প্রতিশোধ সম্পূর্ণ হবে। অর্থাৎ রাজ্য পরিচালনায় কোন ব্যাঘাত হবে না।

ওসমান খাঁ ফিরতে লাগল সন্ধানে। ইতিগীনকে কৌশল অবলম্বন করে রাজপ্রাসাদের বাইরে নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু তাকে রাজপ্রাসাদের বাইরে নিয়ে যাওয়াই মুস্কিল। সে দিনরাত আসমানের মহলে সুখের মহাসাগরে নেশাড়ীর মত সেরাজী পান করে ফুলের শয্যাগহ্বরে শয়ন করে আছে। সেখানে বাঁদীদের প্রবেশ ছাড়া কোন মরদের প্রবেশ নিষেধ। মাঝে মাঝে অবশ্য বহরামের রঙমহলে রাতের মায়াবিনী মুহূর্তে এক একবার দেখে যায়, কিন্তু সেখান থেকে তাকে বের করে আনা বড় মুস্কিল। আসমানের মহলের খাসবাঁদীকে প্রচুর উৎকোচ দানে বশীভূত করেছে ওসমান, তার দ্বারা কিছু কাজ হওয়া সম্ভব। বহরামের রঙমহলেও যে নর্তকী ইতিগীনকে নিজের যৌবন দিয়ে খুশী করে—তাকেও বশ করেছে ওসমান। সে বলেছে, প্রয়োজন হলে সেরাজী সরাবের সাথে বিষ মিশিয়ে দিয়ে ইতিগীনের প্রাণনাশ করবে। কিন্তু ওসমান ভাবছে তা করবে কিনা! প্রাসাদের মধ্যে ইতিগীনকে বধ করবে না প্রাসাদের বাইরে নিয়ে গিয়ে একেবারে গুম করে দেবে। ইতিগীনকে সম্পূর্ণ লোপাট করে দিতে পারলে রাজন্যবর্গের বিস্ময় উৎপাদন হবে। তারা হয়ত অন্তরকম একটা চিন্তা মনের মধ্যে গ্রহণ করে ইতিগীনের অদৃষ্টকে গুরুত্ব দেবে না।

ওসমান ভাবতে লাগল—কি করবে? কিন্তু সময় বড় অল্প। বেশীদিন অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না। হয়ত সুলতানার মত পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। একটা অত্যধিক উত্তেজনায় সুলতানা ইতিগীনকে গুপ্তহত্যার চক্রান্তে মত দিয়েছেন। কোমলপ্রাণা সুলতানা হঠাৎ হয়ত মত পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু ওসমানের ইচ্ছা নয় ইতিগীন এখনও পৃথিবীতে বেঁচে থাকুক। অশ্বপালের অভিপ্রেত ছিল, ছুনিয়া থেকে ইতিগীনকে সরিয়ে দেওয়া। কারণ এই শয়তানের চক্রান্ত শেষপর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করতে পারে।

বহরামের রঙমহলের নর্তকী রোশনীর সঙ্গে পরামর্শ করল ওসমান। যেমন করে হোক ইতিগীনকে কোন কিছুর লোভ জাগিয়ে প্রাসাদের বাইরে আনতে হবে। তারপর দিল্লী থেকে বহুদূর নিয়ে গিয়ে জীবন্ত-কবর।

নর্তকী রোশনী কথা দিল আগামী রাত্রে সে তাই করবে, শুধু যমুনার তটে কেউ যেন তাদের জন্য অপেক্ষা করে। সেখানে পৌছে দিয়ে তার ছুটি।

নর্তকী রোশনী অপূর্ব সুন্দরী। তার দেহের খাঁজে খাঁজে বিজলীর চমক। তার বুকের কস্তুরীবাঁকে সমুদ্র-সফেন উত্তালতা। তার নিতম্বের অপূর্ব গঠনে বহু মরদের হৃদয় চাঞ্চল্য। ইতিগীন বেছে বেছে তার কাব্যমনের প্রেয়সী হিসাবে এই রোশনী যৌবনে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছিল। রোশনী যখন রঙমহলের হাজারো বিজলীর সামনে নিজের দেহকে লীলায়িত ছন্দে ঘুরিয়ে নাচত তার দেহের চমকে ইতিগীনের কাম-প্রপীড়িত রক্তের মধ্যে হিন্দোল জাগত। ইতিগীন মুগ্ধ রোশনী-যৌবনে।

সেদিন এমনি নাচতে নাচতে ইতিগীনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে রোশনী কি বলল—বলতে ইতিগীন মাথা নেড়ে বলল, 'প্রয়োজন নেই। তোমার চেয়ে কোন রূপসী তামাম ছুনিয়ায় আছে কিনা আমার জানা নেই।' কিন্তু রোশনী ছাড়বার পাত্রী নয়, সেও হেসে ইতিগীনকে বলল—একবার আমার সাথে চল, দেখে চোখ ফেরাতে পারবে না। আমার কথা যদি ঠিক না হয় তাহলে আমাকে যে শাস্তি দেবে তাই আমি গ্রহণ করব। এত রূপ কখনও আমি দেখিনি। কিন্তু সামান্য এক ফকির সাহেবের হেপাজতে সেই রূপ দলিত হচ্ছে। একে যদি তুমি রঙমহলে আনতে পার তাহলে সুলতান বহরাম শাহ তোমার ওপর আরও খুশী হবে। আমি আওরৎ হয়ে আর এক আওরতের সন্ধান দিচ্ছি কেন—আমি তোমাকে বহুৎ পেয়ার করি বলে তোমার সুখই আমি চাই।

মূর্খ ইতিগীন রোশনীর কথাকে বিশ্বাস করে একটি খুবসুরত আওরতের হৃদয় জয় করবার জন্যে বহরামের রঙমহল ছেড়ে সেদিন রাতের অন্ধকারে প্রাসাদের বাইরে রোশনীর সাথে বেরিয়ে পড়ল। ছুটি অশ্বে ছুজনে আরোহণ করে এগিয়ে চলল তারা যমুনার দিকে। তখনকার রাজ্যে রমণীদের ছিল অদম্য সাহস। রোশনীর ভেতরে উত্তেজনা। সে ভাবছে, যদি ইতিগীন এখনই বুঝতে পারে তার চক্রান্ত, তাহলে তার খাপে পোরা ধারাল ছোরা আমূল বিদ্ধ করে দেবে রোশনীর ছোট্ট বুকে। কোন মায়া বা অনুকম্পা দেখাবে না।

ওসমান তার দলবল নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় অন্ধকারে অপেক্ষা করছে। ঠিক গিয়ে পৌছলে তারা ইতিগীনকে বন্দী করে বহুদূর পালায় চলে যাবে। তারপর ছোরার আঘাতে ইতিগীনের প্রাণবায়ু এই রাতের অন্ধকারে অন্ধকারের সাথে মিশিয়ে দেবে।

দুটি অশ্বের গতি দ্রুত। ইতিগীন সরাবে অভ্যস্ত। নেশা হলেও মাতাল নয় সে, জ্ঞান তার টনটনে। রোশনীর পাশে পাশে চলতে চলতে কত ভাল ভাল কথা বলল। বলল রোশনীকে অনেক সুখের কথা। অনেক গোপন ইচ্ছাও ব্যক্ত করল। সে সুলতান হলে, সিংহাসনের তখতে বসলে রোশনীকে বেগম করবে। আসমান রোশনীর কাছে কি? শুধু রাজপরিবারের মেয়ে বলে তাকে একটু খাতির করে—না হলে তাকিয়েও দেখত না কখনও। আওরতের শরীর দেখলে দিল ধড়ফড় না করলে সে আওরতকে কোরবানী দেওয়া উচিত। আরও বলল, সুলতানা অবশ্য একজন আস্‌লি আওরৎ। কিন্তু বড় মেজাজ। আওরতের দেহ মরদের ভোগের জন্য। সে দেহে বোরখা পরিয়ে রাখলে তার মূল্য কি?

হঠাৎ যমুনার ধারে একটি চাপ অন্ধকার স্থান থেকে একটি দারুণ চীৎকার উত্থিত হল। ইতিগীন কিছু বোঝবার আগেই একটি কাল কাপড়ের ঢাকনা এসে তাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরল। তারপর কে যেন তাকে জোর করে অশ্বপৃষ্ঠে থেকে নামিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধে ফেলল, মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজে দিল, দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। ইতিগীন আর কিছু বলতে পারল না, জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

ওসমান যখন রোশনীকে ঘোড়ায় তুলে দিয়ে দিল্লী প্রাসাদে ফিরে যাবার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছে, এইসময় আর একটি দ্রুত অশ্বারোহী অন্ধকারের ভেতর থেকে দ্রুত এসে সামনে দিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করল। সামনে আসতে ওসমানের দলের লোকেরা দেখল অশ্বারোহীর সামনে কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা একটি মানুষ। অবশ্য মানুষ বলে অনুমান হয়।

ওসমান অশ্বারোহীকে চিনতে পারল না, গর্জন করে শুধু জিজ্ঞেস করল—তুমি কে? তোমার সঙ্গের ওটি কি বস্তু?

অশ্বারোহী অন্ধকারে হা হা করে হেসে উঠল, বলল—দিল্লীর সুলতানা আমার বার্তা শুনে খুশী হয়ে আমাকে ইনাম দিয়েছেন তারই মহলের একটি খুবসুরৎ বাঁদী। আমি দ্রুত ফিরে চলেছি তাকে উপভোগ করব বলে।

কিন্তু বেঁধে নিয়ে যাচ্ছ কেন?

আওরৎ চিড়িয়ার মত। যদি উড়ে যায় সেইজন্যে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি। এই বলে আবার সেই অশ্বারোহী নিজের রসিকতায় হেসে উঠল।

ওসমানের দলের লোকেরাও হাসল।

অশ্বারোহী আর অপেক্ষা করল না, সেলাম জানিয়ে দ্রুত অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

ওসমানের সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু অশ্বারোহীকে থামাতে তার ইচ্ছা হল না।

কারণ সঙ্গে বন্দী ইতিগীন, তাকে কোঁতল করতে হবে। এই ইতিগীনকে সরিয়ে দিতে পারলে হয়ত সুলতানা খুশী হয়ে অশ্বপালের পরিত্যক্ত পদটি তাকে দিতে পারে।

তারপর রোশনীকে বিদায় দিয়ে ওসমান ও তার দলের লোকেরা ইতিগীনকে নিয়ে বহুদূর চলে গেল। তারপর গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করে তাকে কোতল করে মাটির নীচে কোরবাণী দিয়ে ফিরে এল। যখন তারা দিল্লীর প্রাসাদের কাছে পৌছল প্রভাতের আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে। পাখীর কলরবে চারিদিক ভরে গেছে। সূর্যের প্রথম আলোর স্নিগ্ধপরশ দিল্লীর প্রাসাদের তোরণদ্বারে। কিন্তু ওসমানের বাহিনী নহবতখানার কাছে আসতেই কয়েকজন উত্তেজিত সেনার আলাপ-আলোচনায় তারা থমকে দাঁড়াল। শুনল, গতরাত্রে রিজিয়া ও ইতিগীন প্রাসাদ থেকে অদৃশ্য হয়েছে। ইতিগীনের বিবি বহরাম-ভগ্নী আসমান সুলতানাকে অভিসম্পাত দিয়েছে। সুলতানা ইয়াকুতের মৃত্যুর পর নিজের কামপ্রবৃত্তিকে দমন করতে না পেরে ইতিগীনকে নিয়ে পলায়ন করেছে, আসমানের এই বিশ্বাস।

এদিকে বহরাম শাহ খুশী। সে আমীর-ওমরাহদের সমর্থন নিয়ে রিজিয়ার পরিত্যক্ত সিংহাসনে আজ মাথায় মুকুট পরে বসেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে রাজ্যের। রাজন্যবর্গরা বহরামকে বসিয়ে কোষাগারের সমস্ত ধনরত্নে অধিকার বসিয়েছে।

ওসমান শুধু দলবল নিয়ে হতবুদ্ধির মত নহব্বতখানার সিংহদরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। ভাবতে লাগল, গতরাত্রে যে অশ্বারোহী তাদের সামনে দিয়ে চলে গিয়েছিল সেই যে অশ্বপৃষ্ঠে সুলতানাকে কালোকাপড়ের ঢাকনা পরিয়ে নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে—এ নিশ্চিত। কিন্তু সেই অশ্বারোহী কে? পরক্ষণে ওসমানের মনে একটি কথার উদয় হতে সে দলবল নিয়ে অশ্বের মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে দ্রুত অশ্বচালনা করল। আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে কয়েকটি অশ্ব ছুটে চলল যমুনার ধার দিয়ে। তুর্কী-সেনাদের বর্মের ওপর সূর্যের রশ্মি পড়ে রোশনী ছড়ালো।

ভাতিণ্ডার কারাকক্ষ। তবে এ কারাকক্ষ সাধারণ কক্ষ নয়। কোন রাজন্যকে বন্দী করে রাখবার জন্যে ভিন্নভাবে তৈরী হয়েছে। ঘরের মধ্যে আসবাবের ছড়ছড়ি। ঐশ্বর্যপূর্ণ। বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন মেজাজের মসলিনের ঘেরাটোপ পরানো। কাশ্মিরী ফরাস পাতা ঘরের মেঝেতে। সুদৃশ্য মেহগিনি পালঙ্ক। পালঙ্কে শুয়ে আছে দিল্লীর সুলতানা রিজিয়া। রিজিয়ার পরণে মখমলের শ্বেতপোষাক। রজনীগন্ধার মত শ্বেতশুভ্র বসন পরে রিজিয়া ক্লান্ত অবসন্ন দেহে কাগজ সাদা মুখ নিয়ে শুয়ে আছে পালঙ্কে। সামনেই মেহগিনি টেবিলের ওপর রাখা স্বর্ণপাত্রে আহার্য বস্তু। সে আহার্য বস্তু স্পর্শ করেনি রিজিয়া।

রিজিয়া ভাবছে। অখণ্ড ভাবনার সাগরে নিমজ্জিত হয়ে সে কূল খুঁজে চলেছে। পরিত্রাণের উপায় ভাবছে না, মুক্তির চেষ্টা না, সে ভাবছে এর শেষ কোথায়? সিংহাসন থেকে তুলে আলতুনিয়া তাকে নিয়ে এসে কারারুদ্ধ করে রাখল। সে দিল্লীর সুলতানাকে নিয়ে কি করতে চায়? তাঁর বাসনা যখন চরিতার্থ হওয়ার কোন পথ নেই তখন সুলতানকে বন্দী করে রেখে তার কি সুবিধে হবে?

ইয়াকুত নেই। ইয়াকুত নিহত হতেই সে বুঝেছে যে তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কদিন ধরে মৃত্যুর ছায়া মহলের চারিদিকে ঘুরে ফিরছিল। তার চোখে ঘুম এলেই সে চোখের সামনে দেখেছে পিতার ছায়া। পিতা যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ইয়াকুতের রক্তাক্ত দেহটা যেন কাতর হয়ে তাকে বলছে, সুলতানা মেহেরবাণী করে আমাকে মুক্তি দাও।

ইয়াকুত মুক্তি চাইল কেন? তবে কি ইয়াকুত সুলতানার অত্যাচারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। রিজিয়া ভাবে, হ্যাঁ অত্যাচারই সে ইয়াকুতের ওপর করত। সে নিজেকে ইয়াকুতের কাছে বিলিয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু ইয়াকুত নেয় নি। ইয়াকুত সুলতানাকে সম্মান করে রক্ষা করেছে। লোভাতুর হয়ে নিজেকে প্রশ্রয় দিয়ে সুলতানাকে ভোগ করে নি। সুলতানার হৃদয়ে এক অসহ মুহূর্তে পাপ ঢুকিয়ে দিয়ে সে আনন্দ আহরণ করেনি। সে মহৎ। তার তুলনা সারা আর্যাবতের কোথাও নেই। কোথাও এমন একটি মানুষ পাওয়া যাবে না যে সুলতানার লোভাতুরা দেহের কৌমার্যকে ভোগ না করে ছেড়ে দেবে—সেখানে সুলতানা গররাজী নয়।

আজ ইয়াকুত নেই। আজ ভাবতে পারছে রিজিয়া। সমস্ত তুর্কী সাম্রাজ্যে এমন একটি তুর্কীর দেখা যদি পেত! অথচ সুলতানাকে ভালবাসাও ইয়াকুতের কম ছিল না। নিজে ভিন্নভাবে দল গঠন করে সুলতানাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছে। নিজে যতদিন বেঁচে ছিল সর্বদা সুলতানার পাশে থেকে সুলতানাকে বাঁচিয়েছে, সুলতানার সিংহাসন রক্ষা করেছে। তার মৃত্যু এই সুলতানার জন্যেই। আলতুনিয়াকে অতর্কিতে বাধা দিতে গিয়েই তার মৃত্যু হয়েছে। সে মরেনি। সুলতানাকে মেরে গেছে। তার অভাব সমস্ত আর্যাবর্তের চারিদিকে। সুলতানা রিজিয়া ইয়াকুতকে আকাশে বাতাসে খুঁজে বেড়ায়।

ওসমান খাঁ অঙ্গীকার করেছিল ইতিগীনকে হত্যা করবে। কিন্তু তার কোন সংবাদ পাওয়ার আগেই আলতুনিয়া তাকে ধরে নিয়ে এল। আলতুনিয়া তাকে তার খাসমহল থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় চুরি করে নিয়ে এল। খোজা প্রহরীরা তাকে সাহায্য করল। দিল্লীর চারিদিকে বিদ্রোহ, এমনকি প্রহরীরা পর্যন্ত সুলতানার বিরুদ্ধে। বিরুদ্ধে না হলে এমনটি হওয়া সম্ভব ছিল না। সুলতানাকে চুরি করে নিয়ে আসা আলতুনিয়ার ক্ষমতায় হতো না।

যাক সিংহাসন গেছে তার জন্যে ক্ষতি নেই। এই সিংহাসনের জন্য তার চার বছর ধরে ঘুম হয়নি। সে ভাল করে ঘুমতে পারেনি। এই চার বছর ধরে তাকে সরীসৃপের দংশনে অস্থির হয়ে ছুটে বেড়াতে হয়েছে। সিংহাসনকে অরক্ষিত রেখে সে কোথাও

গিয়ে শান্তি পায় নি। সর্বদা বিদ্রোহ আর যুদ্ধ। শত্রুদমনে তার এই চারবছরে অনেক ইতিহাস তৈরী হয়ে গেছে। সে রমণী বলে বার বার যোদ্ধারা তাকে আঘাত করতে চেষ্টা করেছে। এখন সে ক্লান্ত। সিংহাসন আর সে চায় না। সিংহাসনের প্রতি মমতা তার আজ লুপ্ত। যে হৃদয়ের বিনিময়ে সে সিংহাসন অধিকার করেছিল সেই সিংহাসন আজ স্বইচ্ছায় ত্যাগ করবে বলে মনস্থ করেছিল। আলতুনিয়া বন্দী করে নিয়ে আসতে স্বইচ্ছায় আর ত্যাগ করতে হল না। পিতা বেহেস্ত থেকে তাকে অভিসম্পাত দেবে, কিন্তু সে আজ বলতে বাধ্য, পিতার দূরদর্শিতা কিছু কম ছিল, কোন রমণী সিংহাসনে বসে রাজকার্য চালাতে পারে না। রমণীকে কেউ শক্তিশালিনী বলে স্বীকার করে না। আল্লার সৃষ্টি তাদের কোমল স্বভাব। পুরুষ তাদের তাই তুচ্ছ জ্ঞান করে। রিজিয়া বহু যোদ্ধাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করেছে। অসি-চালনায় সবাইকে চমকে দিয়ে পিতা আলতামাসের সম্মান রক্ষা করেছে। তবু সে তুচ্ছ, তবু তার সম্মান কোন পুরুষ তাকে দেয় নি। একথা যদি আগে সে জানতো, কেউ যদি তাকে রমণী জীবনের মূল আদর্শকে স্মরণ করিয়ে দিতো তাহলে সে কখনই সিংহাসনের জন্য বাসনা মনে পোষণ করতো না।

কিন্তু হায়, কে বলবে সে কথা? আপনার বলতে কে ছিল রিজিয়ার। রিজিয়ার মাইনে-করা কর্মচারী অনেক, অনেক লোক তার তাঁবে হুকুমতামিল করবার জন্যে অপেক্ষামান। কিন্তু আপন কে ছিল? সবাই আড়ালে ছুরি শানিয়ে সুলতানার হৃদপিণ্ড ছিঁড়বার জন্যে তৈরী।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রিজিয়া। এসব কথা কদিন ধরেই ভাবছে। ভাবনার তার শেষ নেই। ভাবনার সময়ও তার অফুরন্ত। সিংহাসন নেই, রাজকার্য নেই, অপরাধীর বিচার নেই—কিছু নেই। শুধু ভাবনা। বহুকাল পরে সুলতানা সমস্ত কর্তব্যের পর অবসর পেয়েছে।

সে আজ হাত-পা ছড়িয়ে জীবনের বাকী দিনগুলির জন্যে মসজিদের দরজায় গিয়ে নমাজ পড়তে পারে। আর অশান্তিময় জীবনে শান্তির জন্য খোদার কাছে প্রার্থনা জানাতে পারে। সে আজ মুক্ত। সে যা খুশী তাই করতে পারে। সে সিংহাসনের কর্তব্য, রাজ্যের কর্তব্য থেকে অব্যাহতি পেয়েছে।

সে বিহঙ্গের মত আসমানের সমস্ত দিকে উড়ে যেতে পারে। তাকে সঙ্গীন তুলে কেউ প্রাণের ভয় দেখিয়ে নিষেধ করবে না। সে দেশ-দেশান্তর ঘুরে তীর্থ করতে পারে। আজমীরের দরগা শরীফের মসজিদে নমাজ পড়তে যেতে পারে; দূরদুর্গম মক্কাশরীফ, পুণ্যভূমি কাবায় গিয়ে জমজমের পানি সারাদেহে ছিটিয়ে, ঊষর মরুপ্রান্তরে উটের কারোয়ায় বসে দেখতে পারে—পশ্চিম আকাশ ছেয়ে রঙের তুফান, শত দৃশ্য—শত সহস্র স্মৃতির রঙে রঙীন কত অজস্র দিন।

কিন্তু বেহুঁশ মনে কিছুই আর ভালো লাগে না। এই কারাকক্ষের পাষাণ প্রাচীরের অন্ধকার গুহাকোণে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে ভাল লাগে। আলতুনিয়া তাকে কৃপা করে সাধারণ কারাকক্ষের নোংরা আবহাওয়ায় রাজবংশের দুলালী

কন্যাকে স্থান দেয়নি, দিয়েছে রাজকন্যাকে সম্মান, রাজন্যের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা। কিন্তু কি দরকার ছিল এসব রাজসিক ব্যবস্থার। যে বন্দী সে বন্দী। বন্দীকে সম্মান প্রদর্শন করার প্রয়োজনীতা কি? অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড সাধারণ ও অসাধারণের তফাত রাখে না। ঘাতকের খড়্গ প্রত্যেকের গণ্ডে গিয়ে একইভাবে পরশ বুলায়। একই শোণিত বেরিয়ে আসে প্রত্যেকের শরীর থেকে। তাই সে অন্ধ প্রকোষ্ঠের কল্পনা নিয়ে বন্দী জীবনের যন্ত্রণা অনুভব করতে করতে রিজিয়া নিঃশেষ হয়ে যেতে চায়। রিজিয়া আহার্য গ্রহণ করে না, নিরম্বু উপবাসের মধ্যে যন্ত্রণার সপ্তমার্গে উঠে পালঙ্কের শয্যায় শুয়ে মৃত্যুর আরাধনা করে।

দিন আসে। সূর্য উদয় হয়ে পশ্চিম আকাশে রঙের তুলি বুলিয়ে দিয়ে তামাম দুনিয়ার মানুষের আশীর্বাদ গ্রহণ করে। আবার রাত্রি আসে। অন্ধকারের কুহেলী ধরিত্রীকে শয়তানের হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নেয়। অন্ধকারে ঘটে যত অলৌকিক ঘটনা। অন্ধকারের শয়তান তীক্ষ্ণ ছুরিকা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় রক্তপিপাসু হয়ে। সর্প দংশন করবার জন্যে ফণা তুলে অপেক্ষা করে। তারপর চাঁদের মোহিনী মায়া দুনিয়াকে ছেয়ে ফেললে রাতের অপ্সরীরা রোশনীবাগে বসোরাই গোলাপের মধ্যে নৃত্যছন্দে আনন্দ বিতরণ করে।

রিজিয়া কারাকক্ষে বসে এ সবই অনুভব করতে পারে। কিন্তু এ তার সহ্য হয় না। তার মনে হয়, আলতুনিয়া তাকে শত্রু ভেবে বন্দী করে নি, তাকে আদর করে আয়াসের সুযোগ দিয়েছে।

> 'জেনে রাখ বন্দী তুই, শেষদিন না আসিলে আর,
> নাই নাই—আশা নাই খুলিবে যে লৌহ-কারাগার।'

লৌহপাষাণ প্রাচীরের এপারে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটলে যে রিজিয়া পরম শান্তি পেতো। কিন্তু আলতুনিয়া তাকে এই রাজসিক কারাগারে বন্দী করে তার শান্তি কেড়ে নিয়েছে। বন্দীর বন্দীত্বকে ঘৃণা না করে তাকে সম্মান দিয়ে সে রিজিয়ার অশ্রদ্ধা গ্রহণ করেছে।

রিজিয়া কাঁদে না। কান্না তার দু'চোখে নেই। অশ্রুর উৎস কোথায় মুখ লুকিয়েছে কে জানে? পাষাণ হয়ে গেছে সব। পৃথিবীতে যার কেউ নেই তার কান্না অলীক সম্পদ। সহানুভূতি যার নেই তার শোক মূল্যহীন।

আলতুনিয়া তাকে বন্দী করেছে। সম্ভবত বহরাম শাহ ও ইতিগীনের প্ররোচনায় এ কাজ করতে এগিয়ে এসেছে কিন্তু তার স্বার্থ, সুলতানার হৃদয়। সুলতানাকে সে শাদী করে আর এক সাম্রাজ্য গঠন করতে চায়।

আলতুনিয়া ছিল তারই অনুগ্রাহী। সেই এই ভাতিণ্ডার সামন্তরাজ করে আলতুনিয়াকে সম্মান দিয়েছিল। জীবন দিয়েছিল। আজ আলতুনিয়া নিজের বাহুবলে ভাতিণ্ডায় আপনাকে প্রতিষ্ঠা করেছে। কয়েকটি হিন্দুরাজা তার বশ্যতাধীনে। খোকুর ও জাঠসেনা তার অধীনে। অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে উঠেছে আলতুনিয়া। অর্থসম্পদ ও সৈন্যসামন্ত প্রচুর সঞ্চয় করেছে। এ সবই এখানে এসে সংবাদ পেয়েছে

রিজিয়া। লোকটির ক্ষমতা দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেছে। আলতুনিয়ার ক্ষমতা দেখেই আমীর-মালিকরা তাকে ক্ষেপিয়ে সুলতানার বিরুদ্ধে নিয়ে গেছে। আলতুনিয়ার স্বার্থ সুলতানার হৃদয়। কিন্তু আলতুনিয়া সুলতানাকে বন্দী করে এনে বুঝতে পেরেছে। সে বার বার আক্ষেপ করেছে।

আলতুনিয়া প্রত্যহ আসে এই কক্ষে। সে যখন আসে সে অপরূপ সাজে সেজে আসে। আতরের খুসবু মেখে সে রিজিয়াকে মোহিত করবার চেষ্টা করে। রিজিয়া তার দিকে ফিরেও চায় না। সে বলে: ও মুখ দেখলে পাপ হয়। তুমি চলে গেলেই আমি বাধিত হবো। আমাকে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হতে দাও। তুমি ভুলে যেও না আমি সেদিন পর্যন্ত দিল্লীর সুলতানা ছিলাম।

রিজিয়া বুঝতে পারে, আলতুনিয়া কষ্ট পায়। কিন্তু উপায় নেই। যে ইয়াকুত-হন্তা তার ক্ষমা সেই। তার এতবড় দুঃসাহস কেমন করে হয় যে দিল্লীর সুলতানাকে শাদী করতে চায়!

আলতুনিয়া প্রত্যহ অনুরোধ করে তাকে আহার্যবস্তু গ্রহণ করবার জন্যে কিন্তু রিজিয়া তার কথা কানেই নেয় না। একদিন আলতুনিয়াকে সে অনুগ্রহ দেখিয়েছে, হয়ত তাকে ভালও লেগেছিল তবে ভাল লাগা মানে শাদীর ইন্তেজার নয়। বীরকে শ্রদ্ধা করে সে তাকে অনুগ্রহ করেছে। কিন্তু তার ফল যে এই দাঁড়াবে, সে যদি জানতো তাহলে কখনও তাকে শয়তান হতে সাহায্য করত না। ইতিগীন, আলতুনিয়া দুজনেই একজাতের মানুষ। দুজনেই সুলতানার অনুগ্রহ পেয়ে শয়তান হয়েছে।

আরও কতদিন যে কারাকক্ষে বসে কেটে গেল কে জানে? আলতুনিয়া শেষ পর্যন্ত রিজিয়াকে নিয়ে কি করবে ভেবে পেল না। রিজিয়া অনেক দিনপর অসুস্থ হয়ে পড়তে হাকিমের নির্দেশে আহার্য গ্রহণ করেছে। এখনও সে বেঁচে আছে তবে মৃত্যুর দিন গুণছে। সে এখন মৃত্যু ছাড়া কিছু ভাবে না। ইয়াকুতের কাছে পৌছোনোর জন্য সে ব্যাকুল।

হঠাৎ অনেকদিন পর আলতুনিয়া আবার কারাকক্ষে প্রবেশ করল। সেদিন রিজিয়া যেন মরিয়া হয়ে উঠল। সে মৃত্যু চায়। কিন্তু মৃত্যু এই বন্ধ ঘরের মধ্যে আসবে না। তাই তার মুক্তি একান্ত কাম্য। সে আলতুনিয়ার দিকে ফিরে কাতর হয়ে বলল—আজ বাহাত্তর দিন আমি তোমার বন্দিনী, তুমি কি আমাকে মুক্তি দেবে না?

আলতুনিয়াও কাতর হয়ে উত্তর দিল—বলেছি তো তুমি রাজী হও।

আমি রাজী হতে পারবো না।

এই কি তোমার শেষ কথা?

হাঁ।

আমি তোমাকে ভালবাসি।

রিজিয়া ঘৃণামিশ্রিত স্বরে বলল: আমি তোমাকে ভালবাসি না।

আলতুনিয়ার মুখে ম্লানছায়া নেমে এল, বলল—আমার অপরাধ কি বেগমসাহেবা?

আমি জালাউদ্দীন ইয়াকুতকে হত্যা করেছি, সেইজন্যেই কি তুমি আমার সাথে মহব্বত করবে না?

কতবার তো বলেছি একই কথা। আমি তোমাকে ঘৃণা করি। আমি ইয়াকুতের হত্যাকারীকে শাস্তি দেবো বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যে আমার কলিজা ছিঁড়ে নিয়েছে, আমিও তার কলিজা সময়ান্তরে ছিঁড়ে নেবার আয়োজন করব।

আলতুনিয়া মাথা নাড়ল, বলল—জানি তুমি সাহসিনী। কিন্তু আমার নিরুপায় অবস্থার জন্যেও কি তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পার না? তুমি কি বুঝতে পার না—এ সবেরই মূলে আমার বহুদিনের অর্জিত মহব্বত! যখন শুনতাম, ইয়াকুত নামধারী এক হাবসী ক্রীতদাস তোমার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে; আর তুমিও তাকে যথেষ্ট ভালবাসো, তখন আর কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। নফরকে আমার পথ থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। আমার সিংহাসনের প্রতি কোন লোভ ছিল না, স্রেফ তোমার জন্যে আবার এই শ্রম।

রিজিয়ার মুখের ওপর বিরক্তির ছায়া নেমে এল, বলল—এসব কথা অনেকবারই শুনেছি। আর শোনার স্পৃহা নেই। তবে এটুকু তুমি জেনে রাখ, কোন রমণী কাপুরুষকে শাদী করে না। আমি দিল্লীর সুলতানা হলেও রমণী। রমণী-মনের ইচ্ছাও আমার মধ্যে আছে। ইয়াকুত উন্মুক্ত রাজসভায় সবার সামনে যেমন করে দিল্লীর সুলতানাকে চেয়েছিল, আমি তার অদ্ভুত সাহস দেখেই চমকে উঠেছিলাম। ভালবাসা অনুনয় বিনয় করে আসে না, সে আপন থেকেই আসে। ইয়াকুতের সাহস দেখে আমার মন আপন থেকে তার কাছে ছুটে গিয়েছিল। মনটা এমন করে সে জয় করেছিল যে, সেই রাত্রে বন্দীশালায় সে যদি জোর করে আমার কুমারীত্বটুকু কেড়ে নিত, তাহলেও আমি তাকে বাধা দিতুম না। কিন্তু সে তা করেনি। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সে সুলতানাকে সম্মান দেখিয়ে তার রমণী হৃদয়কে অশ্রদ্ধা না করে সে মহব্বতকে উচ্চ সিংহাসনে স্থাপন করে গেছে। বলতে বলতে রিজিয়া চুপ করে গিয়ে উদাস হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। হয়ত ইয়াকুতের মুখটাই তার মনে পড়ে যাচ্ছিল।

খানিকক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ। তারপর স্তব্ধতা ভঙ্গ করে আলতুনিয়া শেষ একবার বলল—তাহলে তুমি কিছুতেই রাজী হবে না?

রিজিয়া ম্লান হাসল, হেসে বলল—দিল্লীর সুলতানা কখনও এক কথা দুবার বলেছে শুনেছ কি?

আলতুনিয়া মাথা নত করে রইল। ভাবতে লাগল—সিংহীকে পিঁজরায় পুরে তাকে পোষ মানানো যাবে না। জোর করে তাকে অধিকারও সম্ভব নয়। শাদী করা তো একেবারেই চলবে না। শ্লীলতা হানি করা যেতে পারে। কিন্তু তার সার্থকতা নেই। অথচ ওদিকে তারই সাহায্যে বহরাম শাহ সিংহাসনে জাঁকিয়ে বসেছে। ভুল করেছে। দারুণ সে ভুল। পরকে সাহায্য করে তার সুবিধে কি হল? বরং রিজিয়া তাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখিয়েছে। ভাতিণ্ডায় সামন্তরাজের পদ

তারই জন্যে পেয়েছে। সেই রিজিয়ার ওপর সে অত্যাচার করল। ইয়াকুতকে হত্যা করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। রিজিয়াকে বহুদিন ধরে সে কামনা করেছে। তখন সে ফকির। আজ সে উজীরের পদমর্যাদা জয় করে রিজিয়াকে পাওয়ার জন্যে এইসব অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছে। দিল্লীর সিংহাসন উচ্ছৃঙ্খল বহরামশাহের হাতে তুলে দিয়ে দারুণ অন্যায় করেছে। ইতিগীন ওসমান খাঁর হাতে নিহত। ইতিগীন আজ নেই। সেই তাকে বিদ্রোহী হবার জন্যে গোপনে প্ররোচনা দিয়েছিল।

ওসমান খাঁ ও তার দলবল আলতুনিয়ার কাছে বন্দী। সেকথা এতদিন ধরে গোপনে রেখেছিল শুধু রিজিয়াকে সিংহাসনের পুনঃপ্রাপ্তির আশা ছাড়ানোর জন্যে। কিন্তু রিজিয়া আর সিংহাসন চায় না। চায় না আর শাসন করতে রাজত্ব। সে নিজেই বলে—সে ক্লান্ত। আলতুনিয়া বুঝে উঠতে পারে না, এ কি করে সম্ভব? যে সিংহাসনের এক সামান্যা রমণী কত সাহসের পরিচয় দিয়ে বার বার সিংহাসনকে উদ্ধার করেছে সে হঠাৎ সিংহাসনের মায়া ত্যাগ করে মুক্তি চায়?

কিন্তু কেন? আলতুনিয়ার কিছুতে বোধগম্য হল না রিজিয়ার আগামীদিনের মতলব। সে যেন ভাবনার অতলান্তে হারিয়ে গেল। রিজিয়ার উদ্ধত ফণা সে বন্দী হতে নামিয়ে রেখেছে কিন্তু উঠতে কতক্ষণ। আলতুনিয়া বেশ ভালভাবেই এই সর্পিণীকে চেনে! এই সর্পিণীকে চেনে উত্তরভারতের যোদ্ধারা। রিজিয়ার অসাধ্য কিছু নেই তাও জানে সবাই। জানে আলতুনিয়া নিজেও।

তাই সে সর্বদা ভয়ে ভয়ে দিন অতিক্রম করে। ওসমান খাঁকে বন্দী করেছে সম্পূর্ণ অতর্কিতে। সে দলবল নিয়ে তাকে আক্রমণ করবার জন্তে দুর্গের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল; তার যোগ্য সেনারা ধরে ফেলেছে। এখন তারা কারাগারে বন্দীজীবন যাপন করছে। তার কাছ থেকেই শুনেছে ইতিগীনের হত্যার কাহিনী। ইতিগীন নিঃশেষ হয়ে গেছে ওসমানের ছোরার আঘাতে। আরও শুনেছে—রিজিয়া নিযুক্ত করেছিল ওই ওসমানকে ইতিগীনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে। ওসমান অবশ্য এসব গোপন কথা প্রকাশ করতে চায়নি, আলতুনিয়া জোর করে আদায় করেছে।

ইতিগীন মারা গেছে তার জন্যে আজ খুশী হয়েছে আলতুনিয়া। ঐ শয়তানই তাকে উত্তেজিত করে করে রিজিয়ার বিরুদ্ধে লাগিয়েছে। না' হলে এত তাড়াতাড়ি হয়ত ইয়াকুত নিহত হত না। ইয়াকুতকে হত্যা করে সুলতানার কাছে সে ছোট হয়ে গেল। সুলতানার কাছে বেইমান নাম নিয়ে সে বীরত্বের সুনামকে ম্লান করে ফেলল। সুলতানা আজ ক্রুদ্ধ, শুধু ইয়াকুতের হত্যাকারী ভেবে।

বহরাম শাহ আজ দিল্লীর সিংহাসনে বসে তোষাখানা খুলে দিয়েছে আমীর-মালিকদের জন্য। তারা দুহাতে লুঠে নিয়ে যাচ্ছে দিল্লীর ধনরত্ন। আলতামাসের ও রিজিয়ার ক্ষমতায় যে ধনরত্ন দিল্লীর তোষাখানায় সঞ্চিত হয়েছিল, উচ্ছৃঙ্খল বহরাম শাহ তা লুটিয়ে দিচ্ছে রাজন্যদের কাছে। তারা সকলে লাভবান হয়ে মজা লুটছে, আর সে বেইমান নাম নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার ছাপ দেহে নিয়ে রিজিয়ার কাছে অপমানিত হচ্ছে।

উত্তেজনার বশে ইতিগীনের প্ররোচনায় একটা বিরাট অন্যায় করে এখন সে অনুতপ্ত। কিন্তু অনুতপ্ত হলে এর প্রতিকার কি? রিজিয়া তাকে শাদী করবে না। শাদী করলে না হয় বিবির হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধারের আয়োজন করা যেত। নতুন সুলতান মুইজুদ্দিন বহরাম শাহর অধীনতা পাশ ছিন্ন করে মালিক ইজ্জ-উদ্দীন্ মুহম্মদ সালারী ও মালিক করাকুশ ভাতিণ্ডায় এসে উপস্থিত হয়েছে। তাদের মুখ থেকেই শোনা বহরাম শাহর অত্যাচারের নমুনা। সে সিংহাসনে বসে রিজিয়ার খাসমহলের সবকটি বাঁদীকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিয়েছে। কারণ রিজিয়ার কোন চিহ্নই সে রাজ-পরিবারে রাখবে না। মন্ত্রী ও সেনাপতিকে বরখাস্ত করে নবনিযুক্ত মন্ত্রী ও সেনাপতি বহাল করেছে। প্রথমে তারা জানতো, রিজিয়া ইতিগীনকে নিয়ে ফেরার হয়েছে। তারপর জানতে পারল তারা ভাতিণ্ডায় আলতুনিয়ার কাছে গিয়ে উঠেছে। তারপর জানতে পারল—আলতুনিয়া ইতিগীনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে। বহরাম শাহ এখন আলতুনিয়ার ওপর দারুণ ক্ষিপ্ত। সে সৈন্য তৈরী করেছে ভাতিণ্ডার আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যে। তার স্থির বিশ্বাস—রিজিয়া সিংহাসন উদ্ধারের জন্য আলতুনিয়ার সাহায্যে আক্রমণ চালাবে।

এসব কথা রিজিয়া এতটুকু জানে না। আলতুনিয়ার ইচ্ছা ছিল, যদি রিজিয়া শাদীর মত দেয় তাহলে সে সব অকপটে বলবে কিন্তু রিজিয়ার মেজাজের হদিশ না পেয়ে সে সংবাদ গোপন করে আছে। তার দুশ্চিন্তা—যদি রিজিয়া এসব কথা শুনে এই কারাকক্ষে বসেই চক্রান্ত করতে শুরু করে! তখন নিজেকে বিপদ মুক্ত করা আলতুনিয়ার সাধ্যের বাইরে হয়ে পড়বে। কিন্তু আজ মনে হলো এসব সংবাদ রিজিয়াকে দিলে মনে হয় শীঘ্র কোন ফল হবে। হয়ত রিজিয়া সিংহাসনের জন্য তাকে শাদী করে দিল্লীর আক্রমণে মত দিতে পারে।

তাই আলতুনিয়া খোদার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রেখে রিজিয়াকে গত ক'দিনের আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা পরিবেশন করল, এতটুকু সে গোপন করল না। সে এখন মরীয়া। একদিন দিল্লীশ্বরী তাকে কৃপা করেছিল, তার অনুগ্রহে আলতুনিয়ার ভাগ্য ফিরেছে। আর তাকেই বিশ্বাস করে তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়।

রিজিয়া যেন সমস্ত ঘটনা শুনতে শুনতে ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠতে লাগল। তার সাজানো রাজ্য আজ তার বৈমাত্রেয় ভাই ছারখার করে দিচ্ছে। এ যে তার সহ্যের অতীত। সে এখনও কেমন করে স্ব-কর্ণে শুনছে? শুনে কেমন করে সহ্য করছে? খোদা এখনও তাকে কেন জীবিত রেখেছে। তার রক্ত দিয়ে গড়া রাজ্য আজ অপরে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

আলতুনিয়া ক্ষমা চেয়ে বলল—সুলতানা, বহুৎ অন্যায় আমি করেছি। আমার অন্যায়ের ক্ষমা নেই, তবু এই শেষবারের মত আমাকে ক্ষমা কর। আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে দিল্লী পুনরুদ্ধারের আয়োজন করব।

রিজিয়া মনে মনে কি যেন ভাবল, তারপর বলল—কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, ইয়াকুতের হত্যাকারীকে আমি উপযুক্ত শাস্তি দেব।

দিও। আমি শাস্তি মাথা পেতে নেব, আর তার আগে আমাকে তোমার সিংহাসন উদ্ধার করতে দাও, যে সিংহাসন থেকে আমি তোমাকে নামিয়ে এনেছি।

রিজিয়া চুপ করে থেকে আরও যেন কি ভাবতে লাগল—তারপর বলল—আমাকে একটু ভাবতে সময় দাও। সিংহাসন আমি আর চাই না বলেই মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম কিন্তু যে সিংহাসনকে সুরক্ষিত করবার জন্যে পিতা তাঁর পুত্রদের না বসিয়ে আমাকে বসিয়েছিলেন, সেই সিংহাসন আজ এক কক্কুটের হাতে পড়ে নষ্ট হচ্ছে দেখে আমি অস্থির হয়ে উঠছি।

কিন্তু ভাববার সময়ও আর নেই। মনে মনে রিজিয়া অস্থির হয়ে উঠল সিংহাসনের জন্য। গতকাল সে মনে করেছিল সিংহাসনের আশা সে ত্যাগই করবে। যে সিংহাসনের জন্য সে হৃদয়কে বন্ধ করেছে সে সিংহাসন তার কাছে অভিশপ্ত। পিতা তাকে এক অভিশপ্ত সিংহাসনের রক্ষিণী করে তার জীবন বিষময় করে দিয়ে গেছে।

কিন্তু ইয়াকুতও তাকে এই সিংহাসন রক্ষার জন্যে সর্বদা বলেছে। বলেছে, তুমি যদি সিংহাসন রক্ষা করে সুলতানার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ না রাখ, তাহলে তোমার বিশেষত্ব কি? তুমি কি উত্তর ভারতের সাধারণ এক রমণী হয়ে ঘরের কোণে পর্দানশীনা হয়ে বাস করতে চাও? তুমি যে লাখো লাখো আওরতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা—এ কথা ভুলে যাও কেন?

আজ নিহত ইয়াকুতের মহব্বতের সম্মান জানাতে গেলে আবার সিংহাসন জয় করতে হবে। একদিন পিতার অনুরোধ রক্ষার্থে সিংহাসনে আরূঢ়া হয়েছিল, আজ প্রেমাস্পদের প্রেমকে শ্রেষ্ঠত্ব জানাতে গেলে সিংহাসন পুনরুদ্ধার করা উচিত। ইয়াকুত হয়ত আসমান থেকে তাকে আশীর্বাদ জানাবে।

কিন্তু প্রশ্ন—আলতুনিয়াকে শাদী করা। ইয়াকুতকে ভুলে আলতুনিয়াকে শাদী করতে যে দিলের ইচ্ছা জাগে না। ইয়াকুত হৃদয় না চেয়ে মহব্বত জানিয়েছিল। তার মহব্বত ছিল কোরা-আন-শরীফের মত পবিত্র। বেহেস্তের স্বর্গীয় অনুভবের মত সুগন্ধময়। তার স্পৃহা ছিল না। আকাঙ্খা ছিল না। দেহের কোন চাহিদাই ছিল না। এমন একটি মানুষকে ভুলে সে কেমন করে আলতুনিয়াকে শাদী করবে? কিন্তু তবু করতে হবে। সিংহাসনের জন্য। আজ যখন ইয়াকুত এ জগতে নেই তখন সাহায্যের জন্যও নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। ইয়াকুত থাকলে অবশ্য সে আর কারুরই অবলম্বন চাইতো না।

তারপর সানাই বেজে উঠল ভাতিণ্ডার দুর্গে। শাদী হলো কোন রাজসিক উৎসবের আড়ম্বরে নয়। মামুলী এক মেহমানের শাদীর মত অল্প আয়োজন করে দিল্লীশ্বরীর সাথে আলতুনিয়ার পরিণয় হয়ে গেল। অবশ্য উৎসবের যেটুকু প্রয়োজন সবই হল। সরাবের পেয়ালা ভরলো সবচেয়ে সেরা সুন্দরী বাইজী। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ গায়ক গান ধরলো। দামী ফরাসের ওপর নরম পায়ের ছন্দবদ্ধ তালে ঘুঙুরের রুনুঝুনু ধ্বনি উঠল। হাজারো বাতি নয় লাখো লাখো বাতির রোশনাইতে দিল্লীর সুলতানার মুখ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এ সংবাদ দিল্লীর

প্রাসাদে গিয়েও পৌঁছল। রিজিয়ার বৈমাত্রেয় ভাই বহরাম শাহ ভগ্নীর বিবাহে মূল্যবান খানদানী যৌতুক পাঠিয়ে দিল।

উৎসব শেষ হয়ে গেল। শাদীর পরদিনই মধুযামিনী উপভোগ করবার আর ফুরসৎ গ্রহণ করল না নবদম্পতি। ওসমান খাঁ, মালিক ইজ্জউদ্দীন, মুহম্মদ সালারী, মালিক করাকুশ খাঁর সহায়তায় নিকটবর্তী জাগীরের কয়েকজন আমীরের সাহায্যে তারা দিল্লীপথে রওনা হল।

তাড়াতাড়ি করবার কারণ ছিল। বহরাম শাহ প্রস্তুত হবার আগে দিল্লী আক্রমণ করলে সহজেই সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ করে সিংহাসন অধিকার করতে পারবে। কিন্তু গুপ্তচরের মুখে বহরাম শাহ সংবাদ পেয়ে দিল্লীর অনেক আগেই সুলতান-সেনা পাঠিয়ে এদের বাধা দান করল। দিল্লী থেকে একশো মাইল দূরে কর্ণালের কাছাকাছি সুলতান-সেনার সঙ্গে এদের সংঘর্ষ হল। সুলতান-সেনা লাখ লাখ আর আলতুনিয়ার সেনাবাহিনী তার চেয়ে অল্প। তার মধ্যে বিশেষ করে খোকর ও জাঠরা বেশী ছিল। দিল্লীর সুলতান সেনার হাতে পরাজিত হয়ে নবদম্পতি পলায়ন করল। কইথাল পর্যন্ত সৈন্যরা দম্পতির সঙ্গে অনুগামী হয়েছিল হঠাৎ তাদের পথের উপর ত্যাগ করে সৈন্যরা অদৃশ্য হয়ে গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে সালারী, করাকুশ ও ওসমান নিহত হয়েছিল।

নিরাশ্রয় নবদম্পতি পথে দাঁড়িয়ে রইল হতবুদ্ধি হয়ে। সামনে দিগন্তবিস্তৃত সুদীর্ঘ পথ। মরুকান্তারলীন, সুদুর্গম। আসমানের প্রখর সূর্যতাপে পায়ের নীচের বালুকারাশি উত্তপ্ত। কোথায় যাবে? ক্ষুৎপিপাসায় কাতর পথশ্রমে অবসন্ন, দেহ নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ। পরাজয়ের কালিমা মুখে মেখে আলতুনিয়া রিজিয়ার হাত ধরে এগিয়ে চলল। তাদের বাঁচতে হবে। আবার তাদের সৈন্য যোগাড় করতে হবে। আবার দিল্লী আক্রমণ করতে হবে। বহরাম শাহর হাত থেকে সিংহাসন কেড়ে নিতে হবে।

রিজিয়া শক্তিহীনা হয়ে আর পথ চলতে পারল না। আলতুনিয়া তাকে সাহস দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল। রিজিয়ার ভেতরে উত্তেজনা জাগিয়ে তুলল। ভবিষ্যতের স্বপ্নে তাকে আবার রাঙিয়ে তুলল। আশাবাদিনী রিজিয়ার মনে আবার সিংহাসন প্রাপ্তির আশা জাগিয়ে তুলল।

কিন্তু আলতুনিয়া নিজেও জানে না, পথ কোথায়? কি করে আবার তারা সৈন্যসমাবেশ করবে, দিল্লী আক্রমণ করবে? সামান্য আশ্রয়টুকু দিয়ে কেউ যদি তাদের সাময়িক বাঁচবার স্বাধীনতা দিত।

জঠরের জ্বালা, পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। একটু ছায়াতলে বসে অবসন্ন মনকে যদি কেউ শ্রান্ত করবার আয়োজন করে দিত। একজন দিল্লীশ্বরী, যার আশ্রয়ে লাখো লাখো লোকের আশ্রয়, অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা ছিল। সেই দিল্লীশ্বরী আজ একটু আশ্রয়ের জন্যে স্বামীর হাত ধরে মরুপ্রান্তর দিয়ে অবসন্ন দেহে হেঁটে চলেছে। আর একজন ভাতিণ্ডার সামন্তরাজ, যে নিজের বাহুবলে অফুরন্ত ধনসম্পদ নিজের দুর্গে সঞ্চিত রেখেছে। সে দিল্লীশ্বরীর আজ সঙ্গী।

তবু চলেছে তারা পথ। চলেছে আশার ছলনায় ভুলে। যদি কেউ অন্ধকারে আলো দেখিয়ে তাদের পথ বলে দেয়। তাদের আশ্রয় দিয়ে, শান্তি দিয়ে তাদের মনস্কামনা সিদ্ধির জন্যে সাহায্য করে।

রিজিয়া কোরা-আন-শরীফের মর্মকথাগুলি মনে মনে উচ্চারণ করল। খোদার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলল—হে মেরে খোদা, তোমার যা মনের ইচ্ছা তাই করো, তবু আমাদের এই দুর্গম পথের শেষ করে দিয়ে আশ্রয় পাইয়ে দাও। জীবনের সমস্ত কালই রিজিয়া কোর-আন শরীফের কথা, আল্লার কথা স্মরণ করেছে। স্বপ্নেও কখনও সে অন্যায় করেনি। রাজপরিবারের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে সে নিজের জীবনকে ফুলের মত পবিত্র করে রেখেছিল, কখনও স্পর্শ করতে দেয় নি মালিন্য। ইয়াকুতকে দেখে যদি বা তার ঘুমন্ত যৌবনের আকাঙ্খা জেগে উঠেছিল, ইয়াকুত তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে বেহেস্তের অপরূপ সৌন্দর্য দর্শন করিয়েছে। সেইজন্যে ইয়াকুত আজও তার কাছে শ্রদ্ধেয়।

রিজিয়ার প্রার্থনায় বোধহয় আল্লা খুশী হয়েছিলেন সেইজন্যে তাদের মিলিয়ে দিলেন একটি আশ্রয়। একটি হিন্দু-জমিদারের এক্তিয়ারে তারা আশ্রয় পেল দুজনে। সন্ধ্যার অন্ধকারে তারা জমিদারের বাড়ীতে সম্মানীয় সমাদর পেয়ে প্রবেশ করল কিন্তু পরদিনের সূর্যোদয়ের আগেই দুটি অমরজীবনের মৃত্যু সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হয়ে গেল। অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সেই জমিদার মহাশয় রাতের অন্ধকারে এদের হত্যা করলেন।

দাসবংশের শ্রেষ্ঠা সুলতানা 'রজিয়ৎ-উৎ-দুনিয়া-ওয়া-উদ্দীন' এমনি নিষ্ঠুরভাবে এক অচেনা অজানা জায়গায় অপরের ছুরিকাঘাতে নিহত হল। কি শোচনীয় এর শেষ পরিণাম। সিংহাসনে বসে যে রমণী পৃথিবীর সব কিছুকে একদিন তুচ্ছ করেছিল, যার ভয়ে সমস্ত ভারতের সামন্তরা হৃদকম্প, তার মৃত্যু এক নাটকীয় ঘটনার ভেতর দিয়ে সমাপ্ত হয়ে গেল।

খোদা, মেহেরবান সকলে জানে। খোদাকে ডেকে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানেরা মুক্তি চায়। রিজিয়া জীবনের শেষদিন পর্যন্ত খোদার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে নিজে রাজকার্য চালিয়েছে কিন্তু তার শেষ পরিণতি কি এই?

দিন আবার আসে, সূর্য পূর্ব গগনে তার অপূর্ব জ্যোতিঃপ্রবাহ নিয়ে উদয় হয়। তারপর দিনান্তের শেষে আসে অন্ধকার। অন্ধকারের কালো রূপ গগন থেকে অপসারিত হয়ে চাঁদের রোশনী আসমানের বুক আলো করে আসে। তেমনি দিন ও রাত্রি আবার ঘুরে ঘুরে তারা বছরের পর বছর এগিয়ে চলে।

কিন্তু ঐ কুতুবমীনার। যা আজও দাসবংশের অস্তিত্বকে জাগিয়ে রেখে শ' শ' বছর ধরে বেঁচে আছে। যাকে দেখে দেখে আজিকার মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সেই কুতুবমীনারের অস্তিত্বকে স্মরণ করতে গেলে তারই সমসাময়িক কালে সুলতানা রিজিয়াকেও স্মরণ করতে হয়। একটি রমণী সমস্ত পুরুষের বীর্যকে অপমান করে নিজের বাহুবলে বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী হয়েছিল। রিজিয়াকে মনে এলে মনে পড়ে কবির একটি বাণী :

'অশ্বারোহী, অবহেলে বাম করে বল্গা
ধরি, দক্ষিণেতে শরাসন, নগরের
বিজয়লক্ষ্মীর মত, আর্ত প্রজাগণে
করিয়াছেন বরাভয় দান * *
মুক্তলজ্জা, ভয়হীনা, প্রসন্নহাসিনী।'

আল্লার কাছে শুধু প্রার্থনা জানাতে ইচ্ছা করে—হে খোদা, মেহেরবান, দুনিয়ার মালিক, তুমি সেই ভাগ্যহীনা তুর্কীরমণী রিজিয়ার জীবনে-শান্তি দিও। সে কোন অপরাধিনী নয়। পৃথিবীর কত হারানো রমণী কলঙ্কিতা হয়ে তোমার দয়ায় পথ খুঁজে পেয়েছে। আর যে সত্য, প্রেম, ধর্মকে আজীবন গ্রহণ করে এসেছে তার শেষ জীবনে তাকে এমনি শান্তি দিলে কেন? তবে কি বুঝবো, সে তোমার অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হয়েছিল?

কিন্তু ঐ যে আকাশে লাখো লাখো নক্ষত্রের মাঝে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ফুটে আছে, ঐ কি সেই পবিত্র রমণী আলতামাস-কন্যা রিজিয়ার পবিত্র মনের উজ্জ্বলতা নয়? জানি না, রিজিয়ার অশান্তিময় আত্মা আজ কবরের মাটির তলায় শুয়ে ছটফট করে কি না?

সিরাজের ফৌজী

সেই কিম্বদন্তী বিস্ময়কর নারী

ফৈজী, যার কথা শুধু মনের মধ্যে চমকায়। যে ছিল ইতিহাসে বিস্ময়। সিরাজের জীবনের বহু উত্থান পতনের ইতিহাস ঐতিহাসিক আখ্যানে লিপিবদ্ধ কিন্তু ফৈজী যেন সে দামাল সিরাজের সব দাপটকে প্রতিহত করে ইতিহাসের বুকে চির অক্ষয় হয়ে আছে। অথচ আশ্চর্য ফৈজী কথা ঐতিহাসিক গ্রন্থে কোথাও উল্লেখ নেই। শুধু স্টুয়ার্ট সাহেব ও মুতাক্ষরীণ তাদের গ্রন্থে ফৈজীকে নিয়ে কিছু লিখেছেন কিন্তু সেও এতো অবাস্তব কাহিনী যে হেসে উড়িয়ে দিতে হয়। ফৈজীর ওজন ছিল বাইশ সের। একজন উদ্ভিন্নযৌবনা যুবতীর বাইশ সের ওজন কি সম্ভব? ঔপন্যাসিকরা নারীচরিত্র অঙ্কনে একটু বেশীই রঙ ফলান তাদের সে দোষ আছে, তা বলে ইতিহাসকার? যাই হোক একমাত্র স্টুয়ার্টের ইতিহাস থেকেই ফৈজীর বিষয়ের কিছু জানা যায়। আর সবই যোগাড় করে নিতে হয়। সেই নিয়েই এই উপন্যাস। সার্থক কিনা পাঠকের বিচার্য।

'She was a small delicate woman with a cool retreat, being the summum bonum of an Indian.'

(Mutaqherin Vol I. P. 614)

ঝিলের কালো জলের ওপর পড়েছে রূপোলী আলোর জোরালো রোশনাই। ভাগীরথীর চঞ্চল স্রোতেও চুমু দিয়েছে লাখো যৌবন-পুষ্ট জোয়ানি মেয়ের ডাগর চোখের বিদ্যুৎ। রাতের কোলে আজ সেজেছে হীরাঝিল প্রাসাদ আলোর সাজে, খুশীর আবেগ ছড়িয়ে দিয়ে। নাচ হবে আজ হীরাঝিল প্রাসাদে। এসেছে ভারতের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী দিল্লীর বাদশাহের বাহু-আলিঙ্গন ছেড়ে মুর্শিদাবাদের বাতাসে সৌরভ ছড়াতে; আগুন জ্বালাতে মুর্শিদাবাদের নবাবী মসনদের ঐশ্বর্যকে ম্লান করে দিয়ে। মুর্শিদাবাদের মাটিতে হয়েছে দিল্লীর হারেমের সমস্ত ঐশ্বর্যের আবির্ভাব। ময়ূর-সিংহাসনের রোশনাইও সুদূর বাংলাতে। সবুজ শ্যামলিমার স্নিগ্ধ রূপের মধ্যে যেন হঠাৎ উল্কার মত বিদ্যুৎ নিয়ে আবির্ভূতা হয়েছে। তারই আগমন উপলক্ষ্যে তাই এত আয়োজন। লক্ষ্ণৌর মাটিতে যার জন্ম, লক্ষ্ণৌর বাতাসে যার যৌবন পাওয়া, সেই-পুষ্প-উদ্যান থেকে একটি সেরা সজীব পুষ্পরত্ন বাতাসে ঘুঙুরের ধ্বনি ছড়াতে ছড়াতে একদিন দিল্লীর বাদশাহের হারেম পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল; সে এসে উপস্থিত হল শেষপর্যন্ত বাংলা তথা এই মুর্শিদাবাদের ভাবী নবাব সিরাজউদ্দৌলার অদ্ভুত আকর্ষণে। কোথায় দিল্লী, আর কোথায় এই মুর্শিদাবাদ। সব এক হয়ে গেল দুটি নরনারীর হৃদয়ের সহজাত আকাঙ্ক্ষায়। অবশ্য সিরাজ কিনে নিয়ে এসেছিল একলক্ষ টাকার বিনিময়ে। টাকাটা উপঢৌকন-স্বরূপ দেওয়া, মূল্যস্বরূপ নয়। কারণ এ রত্ন মূল্য দিয়ে কেনা যায় না।

ফৈজীকে বাদশাহের কাছ থেকে নিয়ে আসার জন্য বহু মেহনৎ করতে হয়েছে সিরাজকে। সহজে মেলেনি এ দুর্লভ রত্ন। সেই ইতিহাসও কম দীর্ঘ নয়। সেই ফৈজী যখন সুদূর দিল্লী থেকে মুর্শিদাবাদে এসে পৌঁছল, বিস্মিত হ'লো সিরাজ। সত্যিই যে সেই দুর্লভ রত্ন শেষপর্যন্ত এই মুর্শিদাবাদে পৌঁছবে এ কথা কখনও সিরাজের ধারণায় ছিল না; তাই আসার পরই সে চমকে উঠেছিল। তারপরই তার ঘোষণা হল, ফৈজীর অপরূপ সৌন্দর্য কেউ সহজে দেখতে পাবে না। তার জন্য আয়োজন হবে, আর সে আয়োজন হবে বিরাট। আর তারই জন্যে সারাদিন ধরে বহু লোকের অদ্ভুত চেষ্টায় ও মেহনতে নবাব আলীবর্দীর কোষাগারের অর্থে সাজানো হল হীরাঝিল প্রাসাদ। সাজানো হল প্রাসাদের রংমহল। সিরাজের রুচির বাহবা দিতে হয় সাজানোর ফরমাইজিতে। এবং বাহবা দিতে হয় তার সৌন্দর্য জ্ঞানের। এমন কি তামাম ভারতের শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাট শাহজাহানও জগতে সৌন্দর্যরসিক বলে যে সুখ্যাতি পেয়েছিলেন তাঁকেও সিরাজ আজ তার রংমহল সাজানোর কৃতিত্বে ম্লান করে দিল।

ফৈজীকে রাখা হল গোপন করে। বোরখা পরিয়ে একটি বদ্ধ ঘরের মধ্যে।

তার বোরখা উন্মোচিত হবে একটি নির্দিষ্ট ক্ষণে। রংমহলে যখন সমস্ত মোসাহেব পরিবৃত হয়ে সিরাজ সরাবের নেশায় মাতোয়ারা হবে, চোখে যখন রঙীন নেশা এসে

তার দৃষ্টিকে রঙীন করে দেবে, মনে আসবে খুশীর মৌতাত। মোসাহেবরা যখন খুব বিভোর হয়ে যাবে নেশায়—তখন রংমহলের সমস্ত আলো নিভিয়ে দেওয়া হবে। শুধু অন্ধকারে শোনা যাবে ঘুঙুরের মৃদুল মন্থর মধুর ধ্বনি। দূর থেকে কাছে এসে রংমহলের কক্ষের মাঝে সেই শব্দ থামবে, সেই সময় রংমহলের সমস্ত জোরালো আলো একসঙ্গে জ্বেলে দেওয়া হবে। কক্ষের সকলে দেখবে ফরাসের মাঝখানে তাকিয়ে, তারপর চমকে উঠবে, চমকে উঠে চোখ রগড়াবে, আবার দেখবে কিন্তু ততক্ষণে তবলা, এসরাজ, সারেঙ্গী বেজে উঠবে, আর ভারতের সেরা সুন্দরী নর্ত্তকী দিল্লী থেকে তুলে আনা ফৈজী, লক্ষ্ণৌর মান রেখে বাইজীর ইজ্জতকে বাঁচাতে তার নয়া খেল্ শুরু করবে—অর্থাৎ এমন নাচ সে তার টুকটুকে দুধে আলতা-গোলা নরম তুলতুলে কৃশাঙ্গী দেহে জাগিয়ে তুলবে, যে ধনিক-বনিক-রাজা-বাদশাহ্-যুবক-প্রৌঢ় সব পাগল হয়ে যাবে। সারা মুর্শিদাবাদ পরদিন এই ফৈজীর জন্য উন্মাদ হবে। আর সিরাজ একা লুটবে সেই আওরতের ঐশ্বর্য-ভরা মাখন-দেহটি। মেয়েলী দেহের কুসুমকোমল ইজ্জতটি। উন্মোচন করবে সে সালোয়ারের আবরণ। ওড়নার সরম। আওরত জীবনে সিরাজ অনেক পেয়েছে কিন্তু এমনটি কোথায়? সেইজন্যে তার খুশীর অন্ত নেই। তার খুশীর আনন্দঘন আলোর স্পর্শ হীরাঝিল প্রাসাদের চতুর্দিকে।

বাইরে কানাঘুষো, ফিসফাস। সকলেই শুনেছে ভারতের শ্রেষ্ঠা একটি সুন্দরী নর্ত্তকী পালকীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে এসে হীরাঝিলের মধ্যে লুকিয়ে আছে। তার রূপ নাকি হীরের জ্যোতিকেও ম্লান করে। তার দেহের কাঠামো নাকি সমস্ত আকর্ষণীয় বস্তুকে তুচ্ছ করে। সে যখন নাচে, তার দেহের সুঠাম দোলন পুরুষের রক্তে ঝড় তোলে। তার চলার ভঙ্গিটি এমনি অদ্ভুত যে, সেই চলার ভঙ্গিই যেন মনে হয় নাচের ছন্দ। অথচ মেয়েটির ওজন মাত্র বাইশ সের। এমন অল্প ওজনের লঘুদেহের সৌন্দর্য কেমন করে ভারতের সেরা সৌন্দর্যের মান রাখল, কেউ চিন্তা করতে পারে না। তাই সবাই উৎসুক হয় এই দুর্লভ রত্নটি দেখবার জন্যে। কিন্তু কেউই তাকে দেখতে পায় না। ফৈজী আছে হীরাঝিলের প্রাসাদের একটি কক্ষের মধ্যে আবদ্ধ। আর তার চাবী আছে, সিরাজের হাতের মুঠোয়। একটি মাত্র বাঁদী মরিয়মই ফৈজীর তদারকে আছে, এ ছাড়া আর কেউ নেই তার কাছে। সেই মরিয়ম ছাড়া আর কেউ দেখেনি ফৈজীকে। এমন কি সিরাজও না। সিরাজ ইচ্ছে করলে দেখতে পারত কিন্তু

আওরতের শরীরের রোশনাই দেখার সাধ তার নেই, সে জীবনে বহু আওরত পেয়েছে। তাদের শরীরের সমস্ত রহস্য হাজারো বার সে আলোর সামনে মেলে ধরে দেখেছে। কৌতূহলী হয়েছে। বিস্ময় প্রকাশ করেছে। রমণীর সৌন্দর্য এত আকর্ষণ জাগায় কেন? ইন্দ্রিয় দুর্বল করে দেয় কেন? প্রবৃত্তি অসংযমী করে দেয় কেন? এ সব কথা বহু রমণীর সহবাসে সে চিন্তা করেছে কিন্তু উত্তর পায় নি। ফৈজী সেই আওরত। তবে এ আওরত দিল্লীর হারেম থেকে লুটে আনা। লক্ষ্ণৌর নর্ত্তকী। অদ্ভুত তার উদ্ভিন্ন যৌবন। সংযম রক্ষা করা যায় না। সেই ফৈজীকে সে বিশেষভাবে উপভোগ করতে চায় বলেই এমনি কৌশলের অবতারণা করেছে, তার আগে দর্শন করে ম্লান করতে চায় না বলেই সে দেখেনি। এবং মরিয়মকে সাবধান করে দিয়েছে, যেন বাইরের কেউ না ফৈজীর দর্শন পায়। ফৈজীর রূপের রোশনাই কারও চোখের আলো জ্বাললে তার গর্দান যাবে।

কিন্তু প্রিয় দাদু আলিবর্দী সংবাদ পেয়ে নিজামত কেল্লার নবাব প্রাসাদ থেকে সিরাজকে এত্তেলা পাঠিয়েছেন, এই মুহূর্তে যেন সে দেখা করে।

পৃথিবীর এই একটি ব্যক্তিকে সিরাজ কখনও অবহেলা করতে চায় না। দাদু আলিবর্দীর ওপর তার বাহ্যিক শ্রদ্ধা না, অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশের হৃদয় মথিত শ্রদ্ধা উচ্ছ্বাস। সেই দাদু আলিবর্দী সংবাদ পাঠিয়েছেন তাকে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করবার জন্যে। সিরাজ মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হল। কিন্তু পরক্ষণে মুখে তার হাসি এল, হয়ত বৃদ্ধনবাব জোয়ানী আওরতের প্রতি লুব্ধ হয়ে অস্তমিত যৌবনের নিস্প্রভ উন্মাদনার ওপর স্পর্শ মাখিয়ে নতুন রঙে জীবনকে রাঙাতে চান। আজকের ডাক হয়ত সেই উদ্দেশ্যেই প্রেরিত। তিনিও কি তাঁর অনুচরবৃন্দের কাছে শোনেন নি ফৈজীর কথা! ফৈজীর আগমন তামাম মুর্শিদাবাদের চারিদিকে এক অদ্ভুত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। মনসুরগঞ্জ থেকে ছুটে গেছে ফৈজীর দেহের রোশনাই। আর সেই রোশনী ভাগীরথীর প্রবহমান স্রোতের মুখে ভাসতে ভাসতে বাংলাদেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

সিরাজ ঠিক করল আজ সে দেখা করবে না তার দাদুর সঙ্গে। ফৈজীর চিন্তা যখন তার দেহের পরতে পরতে—তখন সে চিন্তা থেকে মন সরিয়ে দাদুর সঙ্গে দেখা করার সার্থকতা নেই। হয়ত সে তার স্নেহে উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করতে পেরে দাদুর বিরাগের কারণ হবে। অথচ আজকের এই ক্ষণটি কিছুতে বরবাদ হতে দিতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু তবু যেতে হবে। দাদু আলিবর্দীর ডাক। আওরত তার জীবনে অনেক আসবে, কিন্তু দাদুর এই স্নেহ চিরকাল থাকবে না। নবাব দিন দিন প্রৌঢ়ত্বের শেষ ধাপে উন্নীত হয়ে রুগ্ন, কৃশ, রোগ-পাণ্ডুর হয়ে যাচ্ছেন। হয়ত খুব অল্পদিনের মধ্যেই চোখ বুজবেন, তখন কোথায় থাকবে এ ডাক?

দুপুরের ক্লান্ত নিঝুম মনসুরগঞ্জ। এ সময় সমস্ত মুর্শিদাবাদই আফিমের নেশায় ঝিম্ মেরে থাকে। প্রখর সূর্যের তীব্র আলো। ভাগীরথীর উত্তাল স্রোতে তার মিতালী। স্রোতের অদ্ভুত উচ্ছ্বাসের কলরব নিস্তব্ধতা ভেঙে টুকরো টুকরো করে

দিচ্ছে। বাতাসে আতরের খুসবাই। বিচিত্র ফুলের বিচিত্র সৌরভ জোরালো আতরের গন্ধকেও যেন ম্লান করে দিতে চাইছে। সিরাজ আতরের খুসবাই মেখে সর্বদা নিজেকে গন্ধময় করে রাখে। তার সাথে সরাবের সৌরভ। আরও মন মজিয়ে রাখে তার। সর্বদা রঙের মধ্যেই সে ডুবে থাকতে চায়, একটু ফিকে হলেই যেন ভাবী সিংহাসনের স্বপ্ন তার মন থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

দাদু আলিবর্দীর ডাক—সে ডাক উপেক্ষা করা যায় না। হয়ত বুকের আলিঙ্গনে তাঁর স্নেহ উচ্ছ্বাসে কিছু ফাঁক পড়েছে বলে তিনি সিরাজকে বক্ষে ধারণ করে একবার তাঁর স্নেহসিক্ত হৃদয়টি ভরিয়ে নিতে চান। সিরাজও অনুভব করল তার হৃদয়ের কান্না। সে যেন হঠাৎ শিশু হয়ে গেল। এখানে তার পরিণত মন পরাজয় স্বীকার করল। দাদু আলিবর্দীর স্নেহক্রোড়ে একবার নিজেকে সঁপে দেবার জন্যে মনটা আকুলি বিকুলি করতে লাগল।

সিরাজ অশ্বের পিঠে উঠে বসল।

ভাগীরথীর তীর দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল সিরাজের অশ্ব। তার ওপর সওয়ার হয়ে সিরাজ। কঠিন হাতে চেপে ধরেছে অশ্বের বল্গা। তীরবেগে তাই ছুটছে অশ্ব। ধুলো উড়ছে বাতাসে। আকাশের উন্মুক্ত প্রান্তরে, সূর্যের প্রখর দীপ্ত শোভায়, ভাগীরথীর অসীম নীলজলের তীর দিয়ে যেন একটি ছোট্ট চলমান বিচিত্র বর্ণের অশ্ব পায়ের শব্দ তুলে এগিয়ে চলেছে ; দেখাচ্ছে অদ্ভুত একটি মন মাতানো রঙের বাহার। সিরাজের দেহে মূল্যবান সব রঙীন মখমল ও সাটিনের পোষাক। সে সর্বদা এমনি অদ্ভুত সাজেই সেজে থাকে। সাজতে সে ভালবাসে বলেই সর্বদা সে পোষাক পরিবর্তন করে নিজেকে বিভিন্ন রঙের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে। তার অশ্বের রঙও বিভিন্ন বর্ণের। সিরাজের কোষবদ্ধে দীর্ঘ তরোয়ালের ওপর পড়েছে সূর্য-রশ্মি। যেন আগুন জ্বলছে ধক্ ধক্ করে।

এখন আর সে কোন কথা ভাবছে না। না ফৈজী, না অন্য কোন হিন্দুমেয়ের সরম জড়োসড়ো লাজরক্তিম আঁখির মেদুর চাউনি! এখন সে ভাবছে দাদুকে। তার প্রিয়তম দাদুকে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবকে। যে নবাব তাঁকে আজীবন স্নেহের অঞ্চলের তলায় ঢেকে রেখেছেন ; এখানে তার শাদী করা আওরত মির্জা ইরাজ খাঁর কন্যা ওমদাৎ উন্নিসা না, লুৎফা না এমন কী আতাউল্লা খাঁর যে অপরূপ কন্যাটিকে একসময় শাদী করার তার ইচ্ছা জেগেছিল, সে যদি হঠাৎ কবরে শায়িতা না হত, তাহলে হয়ত শাদীও সম্পন্ন হয়ে যেত—সেই অপরূপ কন্যাটিরও রূপ আজ ম্লান—দাদু আলিবর্দীর স্নেহের কাছে সব তুচ্ছ। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবী সিংহাসনের জৌলুষ, দরবারের সম্মান—লাখো আওরত সমভিব্যাহারে রংমহলের মধ্যে দিনের পর দিন সুখস্বপ্নে মগ্ন হয়ে থাকলেও—সব, সব তুচ্ছ।

সবুজ অরন্যানী। বিচিত্র সব বৃক্ষের সবুজ রং। ফলের ও ফুলের সারি। আকাশের বক্ষ ছেয়ে দীর্ঘ ঝাউ গাছের শোভা। আম গাছের কচি সবুজ রং ধরা পাতার বাহার। বসন্তের বাতাসে তারা দেহ মেলে পণ্যা হয়ে লোকের প্রশংসা

কুড়োচ্ছে। সিরাজের অশ্ব খুব দ্রুত তালে চলছিল। দুলছিল তার নবযৌবন প্রাপ্ত পুরুষালী প্রেমিক দেহটি। কণ্ঠে একটি বহুমূল্য মুক্তার মালা। মালাটি দুলছে। দুলছে যুবরাজ সিরাজের স্নেহময় প্রেমিক বক্ষটি।

একটি বাঁক। বাঁকের মুখে হঠাৎ সিরাজ জোরে লাগাম টেনে ধরল। খুব দ্রুত আসছিল বলে অশ্বটি আকাশ সমান লাফিয়ে চিঁ হি-হি রবে শব্দ তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিপরীতে আর একটি অশ্বও অমনি ভঙ্গিমায় মুখোমুখি। সেই অশ্বের পিঠে বুলক খাঁ। নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর কর্মচারী বুলক খাঁ সিরাজকে দেখে তাড়াতাড়ি সম্ভ্রমে অশ্বের পিঠ থেকে নেমে কুর্ণিশ জানাল।

সিরাজ অশ্বের পিঠের ওপর বসেই ভ্রূকুটি করল। অসহিষ্ণুকণ্ঠে বলল—কী সংবাদ বুলক খাঁ? নওয়াজেস মহম্মদ খাঁর প্রতি প্রসন্ন নয় বলেই সিরাজ এমনি অসন্তুষ্ট হল। কারণ এই লোকটি তার সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দী। তাছাড়া নওয়াজেস্ মোতিঝিল বানিয়ে সিরাজের ঈর্ষা বাড়িয়েছে। ঢাকার শাসনকর্তার শাসন ভার সহকারী হোসেন কুলী খাঁর ওপর ন্যস্ত রেখে নওয়াজেস মোতিঝিলে বসে সিংহাসনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন। এদিকে তিনি মোতিঝিলের সুরম্য প্রাসাদের রংমহলে দিনরাত সরাবের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থেকে কোকিলকণ্ঠী কামিনীদের সঙ্গীতসুধা ও নর্তকী বাইজীর নৃত্য দেখে সময় অতিবাহিত করছেন; এমন কি সামান্য এক আওরত ভগবাইয়ের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি নেই; আর ওদিকে নিজের বেগম আলীবর্দী কন্যা ঘসেটি তাঁরই কর্মচারী হোসেন কুলী খাঁর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত—এইসব ভেবেই সিরাজ নওয়াজেস মহম্মদ খাঁর ওপর সন্তুষ্ট নয়। দাদু আলিবর্দীর মুখের ওপরও দেখেছে সিরাজ, পরিবারের এই বিশৃঙ্খলায় তিনি কত মর্মাহত, ব্যথিত। দাদুর মুখের ওপর তাই সর্বদা পাণ্ডুর ছায়া, ব্যথার মালিন্য। এক এক সময় ইচ্ছে করে সিরাজের—দাদুর অশান্তির যত কারণ, সব এই তার কোষে ভরা তরবারী উন্মুক্ত করে কেটে টুকরো টুকরো করে দেয়।

বুলক খাঁ কুর্ণিশ জানিয়ে ততক্ষণে বলেছে—তার প্রভু জনাব নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ যুবরাজকে সেলাম জানিয়েছেন।

সিরাজ হঠাৎ চিন্তা থেকে সরে এসে এই কথা কানে যেতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, দাঁতে দাঁত পিষে বলল—উদ্দেশ্য!

আমি জানি না যুবরাজ! বুলক একটু ভীত হয়ে আবার কুর্ণিশ জানাল।

তবে কি বিলাসী নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ তার ফৈজীর সংবাদ শুনেছে? না শোনবারই বা কারণ কি? ফৈজীর আগমন তো কারুর কাছে গোপন নেই। ফৈজী আজ ঈর্ষা। সমস্ত পুরুষের ঈর্ষা। সমস্ত মরদের ঈর্ষা। নওয়াজেস মহম্মদ খাঁও বহু সুন্দরী রমণী যোগাড় করে মোতিঝিলে নিয়ে গিয়ে তাঁদের সদ্ব্যবহার করেন। একসময় এমনি একটি রমণীকে নিয়ে নওয়াজেস মহম্মদ খাঁর সঙ্গে তার গণ্ডগোল লেগেছিল। সে কথা স্পষ্টই এখনও মনের মধ্যে রেখাঙ্কিত হয়ে আছে। নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে সিরাজের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলেন।

তার মোসাহেবদের অপমান করেছিলেন। আলিবর্দীর কাছে গিয়ে আর্জি পেশ করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই সিরাজকে দমিত করতে পারেন নি। সিরাজ সেই সুন্দরী রমণীটিকে নিজের হেফাজতে এনে নওয়াজেস মহম্মদ খাঁকে কদলি দেখিয়েছিল।

আজ সে কথা মনে এলে নিজের মনেই বার বার হাসে সিরাজ। গর্ব! হ্যাঁ গর্ব বৈকী? নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ মনে মনে জানেন, প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত হয়ে এক নবীন যুবকের সঙ্গে পারা মুস্কিল। উষ্ণরক্তের কারবারীর সঙ্গে মিছে কারবার শীতল রক্তের। মিছে চেষ্টা নওয়াজেস মহম্মদ খাঁরও! সে কথা জানেন আলিবর্দীর জামাতা।

ঘসেটি বেগমের স্বামী নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ। মুর্শিদাবাদের ভাগ্যের চাকা আবার ঘুরতে শুরু করেছে। মুর্শিদকুলীর মুখসুদাবাদ সুজাউদ্দিন ও সরফরাজ খাঁর পর আলিবর্দীর হাতে এসে গিয়েছিল। আলিবর্দী মুর্শিদাবাদের নবাবী কায়েম করেছিলেন, উত্তরাধিকারী সূত্রে পান নি। কিন্তু আলিবর্দী তাঁর সেই নবাবী অন্য আর কাউকে দেবেন না, সিরাজই যে সেই সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকার সে কথা একদিন নবাবী দরবারে বসে আলিবর্দী পারিষদবর্গের কাছে ঘোষণা করে দিয়েছেন। ঈর্ষার আগুন সবার মনেই দাউ দাউ করে তার শিখা প্রজ্জলিত করেছে কিন্তু কেউ সামনে কিছু বলতে সাহস করে নি। শুধু নওয়াজেস্ খাঁ নিঃশব্দে মুর্শিদাবাদের নবাবী প্রাসাদেরই কিঞ্চিৎ দূরে মোতিঝিল বানিয়ে সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আর আলিবর্দীর কন্যা ঘসেটিবেগম ঈর্ষার আগুনে জ্বলে ছটফট করে পিতার পশ্চাতে খেদোক্তি করতে লাগলেন। পিতা আলিবর্দী যে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে এক অপরিণত বুদ্ধিহীন যুবককে বাংলার শ্রেষ্ঠ সিংহাসন দিয়ে যাচ্ছেন সে কথা জোর গলায় ঘোষণা করলেন।

কিন্তু সিরাজ জানে, যে কেউই তার কিছু করতে পারবে না। তার নবাবী পাওয়ার বিরুদ্ধে দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীই আছে, এক ঘসেটি ও দুই দাদুর আর এক কন্যা মৈমানার পুত্র সৌকত জঙ্গ। ওরা যত আস্ফালনই করুক কিন্তু সিরাজের তরবারী চালানোর কৌশল যোদ্ধা দাদুর কাছ থেকে শেখা সুতরাং ওরা নিজেদের জান কোরবাণী দিয়ে আল্লার নাম নিতে নিতে কবরের তলায় চলে যাবে।

তাই আজ সবাই সিরাজের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই সিরাজ এনেছে দিল্লীর হারেম থেকে হীরের টুক্‌রো। সোহাগের প্রবাল। ঈর্ষা হবে বৈকী! ঈর্ষার সামগ্রী নিয়ে বাংলার ভাবী নবাব খেলা করে। বাঘের সঙ্গে মিতালী করে তার মুখগহবরে হাত দেয়। সে ঈর্ষার নিদর্শন হবে নাতো অন্য আর কে হবে?

নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ সেদিন অপমানিত হয়েও দেখছি ভুলেছেন। আওরত তার জীবনের দিনরাত্রি। তাই সেই আওরতের রূপের রোশনাই দেখেই বেহুঁশ হয়ে যান। মোহান্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ফৈজীর কথা যখন শুনেছেন, ফৈজীর রূপের চমকও মনে মনে উপলব্ধি করেছেন। হয়ত প্রৌঢ় নওয়াজেস্ মনে মনে

ফৈজীকে বক্ষে ধারণ করবার কল্পনাও করেছেন, যে রকমটি আজ রাত্রে সিরাজ করবে ফৈজীকে। ঠিক সেই রকমটি নওয়াজেস্ কল্পনা করেই আত্মহারা।

হঠাৎ হাঃ হাঃ করে অট্টহাস্য হেসে উঠল সিরাজ। সম্মুখে দাঁড়িয়ে বুলক খাঁ, সে চমকে উঠল। সে ভয়ে ভয়ে যুবরাজ সিরাজের দিকে তাকাল।

দুটি অশ্বের মুখের রশি ধরে দুজনে দাঁড়িয়েছিল। অশ্ব দুটি মাঝে মাঝে মুখ বিকৃতি করছিল। বুলক খাঁ ভয়ে ভয়ে আবার কুর্ণিশ করে বলল—জনাব, হুকুম যদি করেন তা'হলে আমি যেতে পারি।

সিরাজ হঠাৎ তার কোষ থেকে তরবারী উন্মোচিত করে বুলকের বুক লক্ষ্য করে বলল—খামোশ, আমি তোমায় বধ করব নফর।

বুলকের কোমরেও বাঁধা ছিল কোষবদ্ধ তরবারী। কিন্তু সে তা উন্মোচন করল না, শুধু ভীতস্বরে বলল—আমার গোস্তাখি কী জনাব?

তুমি নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর নফর এই অপরাধ।

তবে কোতল করুন। বুলক খাঁ হঠাৎ নির্ভয়ে বলল।

সিরাজ মাথা নেড়ে বলল—না, তুমি যোদ্ধা, তোমার খাপে আছে তরবারী। তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে মৃত্যুকে বরণ কর।

বুলক মাথা নেড়ে বলল—না জনাব, মেহেরবানি করে ঐ আদেশ করবেন না। ভাবী নবাবকে এই জান দিতে পারলে জীবন সার্থক হয়ে যাবে হুজুর।

সিরাজ খুশী হয়ে উঠল। মৃদু হেসে তরবারী আবার কোষে বদ্ধ করে বুলকের পিঠ চাপড়ে বলল—মনে থাকবে বুলক তোমার কথা। তোমার হুজুর নওয়াজেস্ সাহেবকে বলো, আজ আমি ব্যস্ত, আগামী কাল দেখা করব।

বুলক কুর্ণিশ করে অশ্বের পিঠে উঠে দ্রুত শব্দের ঝড় তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল। সিরাজ সেইদিকে তাকিয়ে মনে মনে হেসে বলল, উত্তর শুনে কিন্তু নওয়াজেস খাঁ ক্ষিপ্ত হয়ে বুলককে জুতি মারবে। পাঁচ জুতি। বেচারী বুলক। আবার সিরাজ হাঃ হাঃ করে অট্টহাস্য হেসে উঠল।

•
• •

সিরাজ আবার অশ্বের পিঠে সওয়ার হয়ে দ্রুত অশ্ব ছোটাল। হ্যাঁ, ঘৃণা লাগে এই নওয়াজেস্ খাঁকে। লোকটি অদ্ভুত লোভী। অদ্ভুত তার নারী রক্তের প্রতি আকাঙ্খা। রমণী রক্তের উষ্ণতার প্রতি অবশ্য তারও লোভ আছে কিন্তু এমনি উন্মুক্ত লোভ নয়। দাদুর কন্যা ঘসেটি বেগমের উপযুক্ত স্বামীই বটে! এ সব কথা ভাবতেও মনে ঘৃণার উদয় হয় সিরাজের। দাদুর ঘনিষ্ঠ যারা তারা যত অপরাধীই হোক সে দাদুর মতই তাদের ভালবাসতে চায়। কিন্তু নবাবপ্রাসাদে যেতেই তার ঘৃণা লাগে। সেখানে চলেছে এক দারুণ নারকীয় দৃশ্যের অভিনয়। মুখে আনতেও ঘৃণা লাগে।

তার গর্ভধারিণী মা আলিবর্দীর আর এক কন্যা আমিনা।...তবু দাদু ডেকেছে যেতে হবে। সেখানে তার দাদুর স্নেহ আছে সেখানে তার যে কলিজা বাঁধা। দাদু যদি সহ্য করতে পারে তাহলে সে কেন পারবে না? সিরাজ আবার ভাবল—কিন্তু তিনি যে তার মা, আম্মাজান।

সিরাজ অশ্বের গতি একটু মন্থর করল, তারপর একটি মসজিদের সামনে থামল। অসংখ্য দীর্ঘবৃক্ষ পরিবেষ্টিত হয়ে অল্প ছায়া ছায়া অংশে উচ্চমিনার ও গম্বুজ নিয়ে একটি মসজিদ। ধর্মের পীঠস্থান। মুসলমানের বিবেক ও চেতনাকে সংশোধন করতে এর প্রতিষ্ঠা। দাদু আলিবর্দীই মুখসুদাবাদের চারদিকে মসজিদ নির্মাণ করে নিজের ধর্মের মহাপ্রাণতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সিরাজ তাকাল সেই মসজিদটির দিকে। দুপুরের আজানের উচ্চরব দিক্‌বিদিক্ বিদীর্ণ করে আসমানের চারদিকে আছড়ে পড়ছে। এক মোল্লা গণ্ডের পাশে একটি হাতের তালু স্থাপন করে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করছে।...আল্লা মেরে...। আল্লার কানে বোধ হয় সে ডাক পৌছেচে। আল্লা বোধ হয় মুসলমান কেন সমস্ত ধর্মীয় মানুষকে বাঁচাবার জন্যে নিজেকে মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আলিবর্দীর মধ্যেও আল্লার আশীর্বাদ কাজ করেছে, না হলে তাঁর জীবন কেন আল্লার প্রার্থনায় নিয়োজিত হয়? সেই আলিবর্দীর প্রিয়তম হয়েও সিরাজ কখনও প্রাণভরে আল্লাকে ডাকতে পারল না—কেবলই তার মনে হয়, আল্লা বুঝি তার না। আল্লা বুঝি তাকে বলছে, 'তোমাকে শক্তি দিয়েছি, সামর্থ্য তোমার কম নয়, শুধু বুদ্ধি প্রয়োগ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নাও!'

তবু এক এক সময় বড় মনটা আকুল হয়ে ওঠে সিরাজের। তার বিবেকের মধ্যে দংশন শুরু হয়। সে কেন তার দাদুর মতো আল্লার ওপর নির্ভর করতে পারে না, দাদুর মতো প্রতিদিনের রুটিন বাঁধা ছকে ফেলা জীবন যাপন করতে পারে না! তার রক্তের মধ্যে কেন এত তাণ্ডব? কই তার পিতা তো এত চঞ্চল ছিলেন না? দাদু আলিবর্দী যেমন একটি রমণীর বাহুপাশ ছাড়া কখনও এতটুকু শৈথিল্য প্রকাশ করলেন না; আর সে বহুরমণীর উষ্ণস্পর্শ নিয়েও এখনও বুভুক্ষু! কেন, কেন, কেন? এই প্রশ্নের উত্তর অনেকদিন ধরে সিরাজ চিন্তা করেছে কিন্তু কোনদিনও পায়নি। আজও চিন্তা করল কিন্তু মিলল না! মিলল না জীবনের রহস্যময় প্রশ্নের উত্তর। লোকে জানে, সে-কি? কিন্তু লোকে যদি জানত যে, সে যা, সে তা নয়। তার মনে আছে অনুশোচনা। তার মনে আছে কাতরতা। তাহলে হয়ত ক্ষমা করত। অবশ্য লোককে জানাবার জন্যে তার কোন ব্যগ্রতা নেই, কিন্তু অনেক দুর্নামের চেয়ে একটু সুনামও যে মনের অনেক স্বতন্ত্রভাব ফিরিয়ে আনে।

আবার তাকাল সিরাজ মসজিদের দিকে। মসজিদের অভ্যন্তরে দীর্ঘ দালালের ওপর বহু মুসলমান মাথায় টুপি পরে হাঁটু গেড়ে আল্লাকে ডাকতে শুরু করেছে। অন্ধকার দালানের ভেতর সূর্যের সোনালী আলো ছোট্ট মেয়েটির মত লুটোপুটি খাচ্ছে। সেখানে নিস্তব্ধতার পরিবেশ। নিস্তব্ধতার পরিবেশে ঈশ্বরকে পাওয়ার

পথ সুগম। হয়ত যারা ঐ মসজিদের মধ্যে নামাজে বসেছে তারা ঈশ্বরকে পাবে, আল্লাকে পাবে। খোদার মেহেরবাণী পেয়ে জগতে সফলতা অর্জন করবে। আর সে নবাব বংশের সন্তান হয়ে খোদার মেহেরবাণী পাবে না? নবাব খোদার সুসন্তান। তা না'হলে সৌভাগ্য লাভ করতেন না। সেও নবাব বংশের সন্তান হয়ে সৌভাগ্য লাভ করেছে। খোদাকে না ডাকলেও খোদার মেহেরবাণী এমনি পাবে। হয়ত পেয়েছে। সে জানে না বলে খোদাকে দোষারোপ করছে।

দাদুকে এই প্রশ্ন অনেক সময়ই জিজ্ঞেস করেছে সিরাজ। কিন্তু দাদু হেসেছেন। উত্তর দেন নি। বেশি পীড়াপীড়ি করলে বলেছেন—'খোদা সকলকেই মেহেরবাণী করেন, সে আমীর হোক্ আর ফকির হোক।' কিন্তু দাদু আলিবর্দীর কাছ থেকে এর বেশি উত্তর আদায় করতে পারেনি সিরাজ। সেইজন্যে জিজ্ঞেস করেছে নবাব বেগমকে। যিনি সিরাজকে মাতৃস্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন। দিয়েছিলেন ভবিষ্যতের চিন্তাধারা, রণসাজের সরঞ্জাম, বক্ষে সাহসের তূর্যনাদ। যেমনি করে দিয়েছিলেন এই রমণী তাঁর স্বামীকে, তেমনি করে তিনি এই আমিনার পুত্রটিকে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি মৃদু হেসে বলেছেন, এর উত্তর আজ না। যদি কখনও সময় আসে নিশ্চয় আমি দেব।

নবাববেগমও বলেন না, তিনিও এড়িয়ে যান। তাই সিরাজও হারিয়ে যায়। হারিয়ে যায় অন্ধকারে। সিরাজের মনের চিন্তাধারা একমুখী থাকে না। ছিন্নভিন্ন হয়ে বহুমুখী হয়ে ওঠে। ভাবে বুঝি ভোগের মধ্যেই তার পথ। বিলাসের মধ্যেই সমস্ত সুখ। সৌরভের মধ্যেই সমস্ত প্রশস্তি।

নিষেধ কেউ করে না। দুটি মানুষ তার সবচেয়ে প্রিয়। আলিবর্দী ও নবাব বেগম। তাঁরা সিরাজের আবদারগুলি নিঃশব্দে পালন করেন। রক্তচক্ষু না, প্রদীপের ঠাণ্ডা-মিষ্টি আলোর মতো স্নেহের স্পর্শ দিয়ে সবকিছু সুন্দর করে দেন। সিরাজ যা ভাবে, অন্যায়। নবাব ও নবাববেগমের কাছে তা হয়ে ওঠে মাল্যভূষণ। ক্ষমা দিয়ে তাঁরা সবকিছু সহজ ও সুন্দর করে নেন।

সিরাজ বোঝে, নবাব ও নবাববেগম তাকে একটু অতিরিক্ত স্নেহ করেন। তাই তার সব আবদার তাঁদের কাছে অমূল্য সমান। সেইজন্যে সিরাজের প্রবৃত্তির অশ্বের লাগাম আর বাঁধ মানে না, সে দ্রুতবেগে ধাবিত হয়।

হঠাৎ সিরাজ অশ্বের চিঁহি শব্দ শুনে চমকে নিজের অশ্বের দিকে তাকাল। তারপর মৃদু হেসে অশ্বের গায়ে হাতের তালু দুবার চাপড়ে তাকে আদর করে বল্গা আলগা করে দিল।

আবার ছুটল অশ্ব। শব্দ হতে লাগল টগ্‌বগ্।

নবাব প্রাসাদের কাছে অশ্ব এসে পৌছতে সিরাজ অশ্বেরগতি মন্থর করে দিল। সে ভাবতে লাগল, দাদু এখন কি করছেন? ঘুমুচ্ছেন না উদাত্তস্বরে কোরাণ আবৃত্তি করছেন। সূর্যের দিকে তাকিয়ে মনে হল এখন ঘড়িতে সময় প্রায় দুটোর কাছাকাছি।

আলিবর্দীর প্রত্যহের ছকেবাঁধা জীবনের কার্যতালিকা সিরাজের মুখস্ত। কখনও নবাব এ তালিকা থেকে বিচ্যুত হন না। রাজ্যের মধ্যে কোন গোলযোগ উপস্থিত হলেও এর কোন ব্যতিক্রম নেই। উত্তেজনা আলিবর্দীর জীবনে যেন খুব কম। শান্ত শিষ্ট সদাশিব মানুষটি। অথচ এই লোকটি কতবড় একজন যোদ্ধা, সিরাজ নিজেই তার বার বার প্রমাণ পেয়েছে মহারাষ্ট্র ও আফগান সফরের সময়। দাদুর রণকৌশল দেখে সেই কিশোর বালক বার বার চমকে উঠেছে। তাছাড়া গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধের কথা বিস্মৃত হবার নয়। এখনও মুর্শিদাবাদের অনেক লোক সে গল্প করে। নবাব আলিবর্দীর সে সময়ের যুদ্ধ কৌশলে সরফরাজ খাঁয়ের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রেই লুটিয়ে পড়েছিল। সিরাজ সে যুদ্ধ দেখেনি কিন্তু মহারাষ্ট্র ও আফগান সমরের রণকৌশল দেখে বুঝেছিল, দাদু আলিবর্দীকে যত ভালমানুষ বলে সে ঠাওরায় তত ভালমানুষ তিনি নন।

সেই মানুষ নিয়মমাফিক ভাবে প্রত্যহের জীবন নির্বাহ করেন। প্রত্যহ সকালে সকলে ওঠবার আগে, দিনের আলো ফোটবার দুঘণ্টা আগে আঁধার আসমানের নীচে শয্যা ত্যাগ করে এসে দাঁড়ান। নবাবের নবাবী আলস্য তাঁর দেহে নেই, এ তাঁর প্রত্যহের কাজ। প্রাত্যাহিক কাজ সম্পন্ন করে তিনি আল্লার প্রার্থনায় বসেন। তারপর দিনের আলো ফুটলে রাজ্যের বড় বড় খেতাবধারী দোস্তের সাথে একসঙ্গে বসে কফি পান করেন, গল্পগুজব করেন, কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন। প্রাসাদের সবার সংবাদ গ্রহণ করে নিজের অন্তঃপুরের সংবাদ নেন, তাদের কারুর কারুর সঙ্গে আলাপ করেন। তারপর সাত ঘটিকায় দরবারে গিয়ে নবাবী সিংহাসনে বসেন। তখন তিনি নবাব। তাঁর ষোল বছরের অভিজ্ঞতার আভিজাত্যপূর্ণ গম্ভীর মুখখানির ওপর খেলা করে রাজ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। তিনি রাজকার্য্যের যাবতীয় করণীয় কিছু সবার সামনে এক এক করে সমাধা করেন।

তারপর তিনি দর্শন দেন তাঁর বিশেষ বিশেষ রাজপ্রতিনিধি, সেনাপতি, মন্ত্রী ও উজীরদের। তাদের সঙ্গে মিষ্টভাষ্যে আলাপ পরিচয় করে তাদের বিদায় দিয়ে কাছে ডাকেন নিজের প্রিয় দুটি ভাগিনেয় সাহামাৎ জঙ্গ, সৌলৎজঙ্গ ও নাতি সিরাজকে। এই সব করতে দু'ঘণ্টার বেশি সময় অতিবাহিত হয় না। তিনি ঘড়ির মতো, নিয়ম মাফিক কাজ ছাড়া কখনও অতিরিক্ত সময় ব্যয় করেছেন বলে কখনও কেউ বলতে পারে না। কোনো কিছুর জন্য অল্প সময় দিয়ে ত্রুটি করার হেতু কখনও কেউ দেখে নি।

এরপর এক ঘণ্টাকাল তাঁর ব্যয়িত হয় নানা গ্রন্থ থেকে গল্প ও কবিতা শোনার জন্য। এর জন্যে নবাব দরবারে কবি ও গল্পকারের ব্যবস্থা আছে, তারা নিয়মিত শুনিয়ে যায় নবাবকে অদ্ভুত সব গল্প। সুন্দর ও সুললিতছন্দে কবিতার অনুভূতি। নবাব এক ঘণ্টাকাল সেই সব একমনে উপভোগ করেন। তারপর তাঁর খানসামা আসে নবাবের কাছ থেকে রান্নার ফরমাইজি জেনে নিতে। নবাব নিজে যেমন ভাল রান্না পছন্দ করেন, প্রাসাদের লোকদের ভাল রান্নার আস্বাদ গ্রহণ করিয়ে সর্বদা উত্তরের

জন্য ব্যগ্র হন। তাই প্রত্যহ তৈরী হয় নতুন নতুন উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী। তিনি শুধু প্রাসাদের সবাইকে খাইয়েই আনন্দ পান না; নতুন রান্নার সৃষ্টি হলেই নতুন অতিথি বা নিমন্ত্রিত কোন দোস্তদের এনে আহারে বসেন। এবং এক সঙ্গে সকলে মিলে আহার করার মধ্যেই তাঁর তৃপ্তি। এরপর পুনরায় শুরু হয় উপভোগের আনন্দ। গল্পকার এসে তার সুরেলা কণ্ঠে অদ্ভুত বাঁধুনী দিয়ে গল্প বানিয়ে তাঁকে শোনায়। শুনতে শুনতেই তাঁর অল্প করে তন্দ্রা আসে। তারপর একসময় তিনি শয্যা গ্রহণ করেন।

উঠবেন ঠিক একটার সময়। উঠে দুপুরের নামাজ পড়বেন। পড়ার পর সন্ধ্যা পর্যন্ত উদাত্তস্বরে তিনি কোরাণ আবৃত্তি করবেন। তাঁর গম্ভীরস্বর প্রাসাদের পাথরের দেয়ালে লেগে প্রতিধ্বনি উঠে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। সবাই জানে নবাব আলিবর্দীর সেই উদাত্তস্বরের কোরাণ পাঠ। অনেকে মুখস্ত বলে সেই কোরাণের স্তবক। সিরাজও ছোটবেলায় দাদুর কাছে বসে এই কোরাণ আবৃত্তি করত। আজ আর করে না। সে এখন পরিণত যুবক। রক্তে তার দারুণ চাঞ্চল্য। সে কোরাণের মধ্যে এখন আর পায় না কোন মিঠেলস্পর্শ।

এর জন্যে নবাব আলিবর্দীর কোন অনুযোগ নেই। তিনি নিজেই তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক একই নিয়ম মেনে চলেন। তারপর কোরাণ পাঠের পর বৎসরের কাল অনুযায়ী গ্রীষ্মকাল ও শীতকালে গরমজল ও বরফজল পান করেন, সরকারী কাজগুলি শেষ করেন এবং রাত্রিকালের প্রার্থনা শেষ করে অন্তঃপুরের বেগম ও বাঁদীদের সঙ্গে তাঁর নানান আলাপ-আলোচনা হয়। সে আলোচনার ভাষা হয় সহজ ও সুন্দর, তার মধ্যে কোন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকে না।

এই সময় নবাববেগম এসে তাঁর আর্জি পেশ করেন এবং মতামত যাচ্ঞা করেন। সিরাজের দুই বেগম ওমদাৎ ও লুৎফা আসে। তারা নবাবের পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে নবাবের আদর গ্রহণ করে। নবাব তাদের সঙ্গে হেসে কথা বলেন, মার্জিত ভাষায় রঙ্গ করেন। এর মধ্যেই হারেমের কোন কোন রমণী তার অভিযোগ পেশ করে, নবাব তার সমাধানে কপাল কুঞ্চিত করে চিন্তা করেন। সবার জন্যেই তিনি অল্পবিস্তর ভাবেন।

তারপর সকলের সঙ্গে আহারে বসে কিছু ফল ও মিষ্টি গ্রহণ করে সেদিনকে বিদায় দিয়ে শয্যাগ্রহণ করতে যান।

●

● ●

নবাবপ্রাসাদের মধ্যে ঢুকে খোজা প্রহরীর হাতে অশ্বের ভার দিয়ে সিরাজ দ্রুত অন্তঃপুরের দিকে এগিয়ে চলল। দিল্লীর হারেমের কায়দায়ই নবাবের হারেমের অবরোধ। সে হারেমের কর্ত্রী নবাববেগম, আলিবর্দীর চরিত্রবতী বেগম। এই

বেগমের হেফাজতে সমস্ত আওরতরা। এখানে আছে আমিনা ও ঘসেটি। আমিনা স্বামী হারা হয়ে পিতার প্রাসাদেই এসে বাস নিয়েছিল। আর ঘসেটি মাঝে মাঝে মোতিঝিলে গিয়ে বাস করে কিন্তু নওয়াজেস্ খাঁর উচ্ছৃঙ্খলতা, বিলাসের পঙ্কে অবগাহন—তার রমণী মনে ঈর্ষা প্রণোদিত করে বলে সেইজন্যে সে পিতার প্রাসাদেই অধিকাংশ দিন কাটায়; আসলে যে স্বামীর মোতিঝিলে থাকলে তার অবৈধ প্রণয় সংসর্গে যোগ দেওয়ার অসুবিধে সেইটাই অধিকভাবে পরিস্ফুট হয়।

নবাবপ্রাসাদের মধ্যে নবাববেগমের চোখের আড়ালে কন্যার এই অবৈধ প্রণয়লীলা—খুব বিস্ময় জাগায় মনে। কারণ নবাববেগম সেই রমণী, যে রমণীরা চিরকাল স্বামীর সুখের জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। নিজের আত্মসুখের মোহত্যাগ করে বৃহত্তর স্বার্থকে গ্রহণ করে তার সেবায় জীবনকে ব্যয়িত করেছেন। আলিবর্দী খাঁর রাজনৈতিক জীবন তাঁর প্রিয়তমা মহিষীর সহায়তায় পূর্ণতা লাভ করেছিল। দুর্দান্ত মহারাষ্ট্রীয় ও আফগান বীরদের শায়েস্তা করে আলিবর্দী বাঙলারাজ্যে যে শান্তির হিল্লোল বইয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর পরামর্শ—এই শক্তিরূপিণী নবাববেগমের। নবাববেগমের উচ্ছৃঙ্খল সংসার যেমন এই মহীয়সী রমণীর তর্জনী তাড়নের অধীন ছিল. সেরূপ বিপ্লবসাগরে নিমগ্ন সমগ্র বঙ্গরাজ্যের শাসনও তাঁরই পরামর্শানুসারে চালিত হত। আলিবর্দী খাঁ মহিষীর পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজই করেন না। নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক বিষয় রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক প্রধান ও গুরুতর বিষয় নবাব তাঁর মহিষীর পরামর্শ মতো করেন। এই রমণীর সম্বন্ধে বলতে গেলে লেখনী স্তব্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু তবু সে রমণী শেষপর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করেছেন। আজীবন সৎপথে থেকে তিনি পেয়েছেন খোদার অভিশাপ। তাঁর ঘরে দুশমনের আবির্ভাব। তাঁর শান্তির প্রাসাদে অশান্তির ধূমরাশি। তাই তাঁর মানসিক অবস্থা ইদানীং একেবারে ছিন্নভিন্ন। তিনি আহত। তিনি এখন আর মাথা তুলে বিশেষ কথা বলেন না। সর্বদা যেন কি ভাবেন? সিরাজ দেখেছে বেগমদিদার মুখের ওপর পাণ্ডুর ছায়া।

জিজ্ঞেস কিছু করেনি, বুঝতে পেরেছে হেতু। কিন্তু করার তাঁর কিছু নেই। একদিন এই রমণী কত শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সেদিনের দম্ভের সিংহাসনের সম্রাজ্ঞীকে সিরাজ দেখেছে, একদিকে তিনি যেমন ছিলেন স্নেহশীলা, আর একদিকে তেমন ছিলেন দৃঢ়স্বভাবের রমণী। তাঁর আজকের এই পরিবর্তন বড় কষ্টের সৃষ্টি করে। বড় কষ্ট অনুভব করে সিরাজ।

তাই সে যখন এই প্রাসাদে থেকেই পরিণত মন পেল, পুরুষের বাহুতে রমণীর স্পর্শের আকাঙ্ক্ষা জন্মাল, তার প্রয়োজন হল বহু রমণীর সাহচর্য। সুরার গোলাপী রঙে মাতোয়ারা হতে, নর্তকীর পায়ের মৃদুল ছন্দে বাদ্যযন্ত্রের সাথে নাচ, তাদের সুউন্নত বক্ষের কাঁচুলির অভ্যন্তরের মাতন, চটুল মিঠে চাউনির অর্থ বোঝা—সিরাজ ছেড়ে দিল নবাবপ্রাসাদ। তৈরী করল হীরাঝিল। প্রমোদ হীরাঝিল। যেখানে সে তার পুরুষের পৌরুষ স্বভাবকে ফেলে ছড়িয়ে মেলে দিতে পারবে, যেখানে

নেইকো কোন শুচিশুভ্রতা। পবিত্রতার স্থায়িত্বকে বজায় রাখতে যেখানে তার বিবেক আঘাত হানবে না। সেইজন্যে সে তৈরি করল হীরাঝিল। একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা করে তৈরি করল এই প্রাসাদ।

মোতিঝিলও তৈরি হয়েছিল সেই কারণের জন্যে। নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁও নবাব ও নবাববেগমের এই প্রাসাদের পবিত্রতা নষ্ট করতে চান নি।

অবশ্য হীরাঝিল তৈরির সমর্থন সিরাজ নবাব ও নবাববেগম দুজনেরই পেয়েছিল। তাঁরা সিরাজের কোন কিছুতে কখনও বাধা দেন নি, হীরাঝিল নির্মাণও তাই সমর্থন করেছিলেন।

অন্তঃপুরের মধ্যে ঢুকতেই প্রথমে দেখা হল সিরাজের সঙ্গে নবাব বেগমের। হাসি হাসি মুখ কিন্তু পাণ্ডুর। মুখের ওপর যেন কষ্টকল্পিত হাসির আহ্বান। সিরাজ তাঁকে দেখে কুর্নিশ জানিয়ে বলল,—ভবিষ্যৎ আচ্ছা আছে তো বেগমদিদা?

নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে নবাববেগম জিজ্ঞেস করলেন—তোমার ভবিষ্যৎ।

সিরাজও মাথা নাড়ল। তারপর বলল—দাদুভাই আমাকে এত্তেলা পাঠিয়েছে কেন জানো?

নবাববেগম মৃদু হেসে বললেন—ঠিক জানি না। হয়ত আজ তোমার দর্শন না পাওয়াতে প্রাণ আকুল হয়েছে। তাছাড়া কয়েকটি নতুন রান্না তিনি ফরমাইশ করেছিলেন সেগুলির আস্বাদ তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রহণ করারও বাসনা থাকতে পারে।

সিরাজ শেষের বক্তব্যে মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হল। সামান্য আহারের জন্যে এমনি করে তাকে ব্যতিব্যস্ত করা সত্যিই নবাবদাদুর শোভা পায় না। তিনি কি জানেন না—এখন তাঁর প্রিয় নাতি সিরাজের সময়ের অভাব। আর দর্শনের ব্যাপারে দাদুকে সে সাফ বলে দিয়েছে এখন তার আবাস অন্যত্র। সুতরাং প্রত্যহ দর্শন দেওয়া তার পক্ষে অসুবিধে।

এ কথায় অবশ্য নবাবদাদুর মুখের প্রফুল্লভাব অন্তর্হিত হয়েছে। তিনি অনুযোগ করেছেন কিন্তু সিরাজ উত্তর দেয় নি। বৃদ্ধ দাদু অবুঝ, সেইজন্যে তাঁর স্নেহময় বক্ষের মাতনই অনুভব করেন, আর কিছু জানতে চান না। সিরাজ একদিন ছোট ছিল, তাকে যা আদেশ করতেন সে তাই করত। তবু তার মধ্যে ছিল কৈশোরের সহজ আবেদন। এখন সে যুবক। তরুণ যুবক। নবাবের আওতায় সেই যুবকের মনের অনেক অংশে নবাবী কায়দাগুলি ঢুকে পড়েছে। যদিও আলিবর্দী নবাবী কায়দা কিছুই রপ্ত করেন নি। কিন্তু তাঁর রাজ্যে নবাবী ঠাটগুলি সবই ছিল। তিনি সরাব খেতেন না কিন্তু বহু বিলিতী সরাব মুর্শিদাবাদের ঘরে ঘরে রঙের তুফান ছোটাত। তিনি নর্তকীর নাচ দেখতেন না, তাই বলে নর্তকীর পায়ের ঘুঙুরের শব্দ মুর্শিদাবাদের বাতাসে ছিল না এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, বরং একটু বেশি

পরিমাণে নবাবের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে প্রচারিত ছিল। তবে তাঁর কোন কিছুতে নিষেধ ছিল না। নিষেধ যদি থাকত তাহলে তিনি বিধান দিয়ে সব সঙ্কুচিত করে দিতেন। তিনি পছন্দ করতেন না বলে এসব ব্যবহার করেন নি।

তাই নবাব প্রাসাদের বাইরেই চলত যত নবাবী কায়দা। হুরী পরীর আনাগোনা। বাগিচায় নানা ফুলের সমারোহ। হীরা জহরতের রোশনাই। দিনের আলোয় হাজারো রোশনীর চমক! সরাবী নেশায় বুঁদ হয়ে রাহী পথ চলে জান-মান সামলে। হিন্দুস্তানের সেরা যে মুর্শিদাবাদ শহর, একথা যেন বার বার প্রকাশ হয়ে পড়ে। আজব শহর এই মুর্শিদাবাদ। রঙ্গ রঙ্গিলা দিলচশপী মুর্শিদাবাদ। ভারতবর্ষের সাতমুলুকের দৌলত লুটে শাহী শহর দিল্লী গড়ে উঠেছিল। বাংলায় মুর্শিদাবাদ গড়ে উঠেছে দিল্লীর রোশনাইকে ম্লান করবার জন্যেই। দিল্লীর তোষাখানার সমস্ত ধনদৌলত যেন আস্তে আস্তে মুর্শিদাবাদের তোষাখানায় এসে ঢুকছে। যেন দিল্লীর বুকে মরুভূমির শুকনো বালুকারাশি এসে জমা হচ্ছে, আর মুর্শিদাবাদে যত আলোর রোশনাই। যত হীরা, জহরৎ, চুনি. পান্না। দিল্লীর রংমহলের ভোগবিলাসের প্রাচুর্য স্তিমিত হয়ে এসেছে। এখন হাজারো আলোর রোশনাই মুর্শিদাবাদে।......বাংলার শ্যাম সজীবতার মাঝে মুর্শিদাবাদ যেন ঘাসের শিষের ওপর একটি আলো ঝলমল শিশির বিন্দু।

নবাব প্রাসাদের বাইরে সব কিছু। একদিকে আলোর চমক, অন্যদিকে নিবিড় কালোর গাঢ় তন্ময়তা। আলিবর্দীর রাজত্বেই মুর্শিদাবাদ শহর আস্তে আস্তে মণিমুক্তার গহনা পরে, কিংখাব ও রেশমী পোষাক পরে ষোড়শী আওরতের মতো সেরা শ হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে নানা বিদেশী পণ্যদ্রব্যে ঝলমল চকবাজার। চকবাজারের দুপাশে থরে থরে সাজানো দোকান—বোখরার কার্পেট—সামোভার, হাতীর দাঁতের তৈরী মুর্শিদাবাদের নানারকম খেলনা, ইতালীর, বেলজিয়ামের তৈরি কাট গ্লাসের নানানতর জিনিস, পলতোলা আলোর ঝাড়—নানারকম বিদেশী দেশী মূল্যবান সম্ভারে সাজানো আর্মানীর দোকান। দূর সাগর পার থেকে এসে ফলাও কারবার ফেঁদেছে। ওপাশে কিংখাব-সার্টিনের পর্দার আড়ালে দেখা যায় রকমারী সরাব, সুন্দরী স্বল্পবাসা বিদেশিনীরা সেখানে বিক্রি বাণিজ্য করছে; মেওয়াপট্টিতে কাবুল-কান্দাহার-খিলাত থেকে আনা নানা ফল, কিসমিস, আঙুর, খোবানি, আখরোট, আপেল, বেদানা। দিশী ফলের মধ্যে রকমারী আম, আনারস আছে। মেহেদি রং করা দাড়ির আড়ালে পাগড়া ঢাকা পেশোয়ারী শেখজী বহাল তবিয়তে খুশমেজাজে বেগমমহলের বাঁদীদের সঙ্গে রসিকতা করে সওদা তুলে দিচ্ছে আরবী টাট্টু টানা গাড়িতে। এসব দেখে-শুনে কী সিরাজের দিল্ ঠিক থাকে? তাই সে ছুটিয়ে দিয়েছে তার মনের রঙের ঘোড়া।

নবাববেগমের কাছ থেকে সরে এসে সিরাজ নবাবের কক্ষের দরজার সামনে দাঁড়াল। বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ভীষণাকৃতি হাবশী খোজা। ভেতর থেকে ভেসে আসছে উদাত্তস্বরে নবাবের কোরাণ আবৃত্তি। দরজার সামনে

রক্তবর্ণের একটি সার্টিনের বৃহৎ পর্দা। সিরাজ পর্দা সরিয়ে কক্ষের মধ্যে উঁকি দিল। দেখল, নবাব হর্ম্যতলে একখণ্ড কাশ্মীরী কার্পেটের ওপর বসে চোখ দুটি বুজে গম্ভীরস্বরে কোরাণ মুখস্থ আবৃত্তি করছেন। তাঁর গম্ভীরস্বরের প্রতিধ্বনি সমস্ত কক্ষের মধ্যে অনুরণিত হয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে। এ সময় দাদুকে ডাকতে সিরাজের ইচ্ছে হল না। কিন্তু ওদিকে হীরাঝিল প্রাসাদে আজ সমারোহ। ফৈজীর আগমনকে ইস্তেজার করতে সমস্ত প্রাসাদ ও রংমহল নিখুঁত করে সাজাতে হবে, তার জন্যে চাই অনেক সময়। এখন সময় ব্যয় করার মতো মানসিক অবস্থা নয়। সে নবাবদাদু হোক বা অন্য কেউ পেয়ারী হোক। তাই তড়িৎ কার্য সমাধার জন্যে এক পা কক্ষের মধ্যে দিয়েই ডাকল—দাদুভাই!

মুহূর্তে থেমে গেল গম্ভীর স্বর। প্রতিধ্বনিও স্তব্ধ হল। শুধু কক্ষের মধ্যে নবাব আলিবর্দীর কণ্ঠস্বরের আমেজ সুরের মতো চতুর্দিকে ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল। সিরাজ আবার ডাকল—নবাবদাদু আমি সিরাজ।

নবাব আলিবর্দী পিছনদিকে ঘাড় ফেরালেন, তারপর অভিমানীকণ্ঠে বললেন, কার কণ্ঠস্বর শুনি কানে। আমি কি আমার দাদুভাইয়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই?

সিরাজ আরো এক পা কক্ষের মধ্যে দিয়ে বলল—হ্যাঁ দাদুভাই, আমি সিরাজ।

এত দেরি করলে কেন দাদু? আমি তোমার জন্যে আজকের নয়া নয়া খানা ফরমাইজ দিয়ে বানিয়েছিলাম, এত্তেলা পাঠিয়েছিলাম অনেক আগে কিন্তু আমার আহারের সময় হয়ে গেল আমি আর অপেক্ষা করতে পারলাম না।

তুমি শুধু এইজন্যে ডেকেছিলে দাদু? সিরাজের কণ্ঠে অসন্তোষ।

নবাব আলিবর্দী বিব্রত হয়ে বললেন—না, না, তার জন্যে নয় সিরাজ। সারা মুর্শিদাবাদ শহরে আজকে কিসের জন্যে যেন পাগল হয়ে উঠেছে, কেউ কেউ তাদের মধ্যে এসে দরবারে বলে গেল, তুমি নাকি একটি খুবসুরত নর্তকীকে দিল্লীর হারেম থেকে আনিয়ে হীরাঝিল প্রাসাদে পুরেছ। এ কথা সত্যি কি না জানবার জন্যে তোমাকে ডেকেছি দাদুভাই।

এ কথা এমন কিছু নতুন নয় নবাবদাদু। আমি বহু রমণীকেই বিভিন্ন দেশ-বিদেশ থেকে এনে হীরাঝিল প্রাসাদে রেখে সম্মান দিই, তা তুমি জান। অবশ্য ফৈজী তাদের মধ্যে আজ একটু উপলক্ষ্য। তার জন্যে জিজ্ঞেস করার কি আছে?

নবাব আলিবর্দী একটু দমে গেলেন, তারপর বললেন—না, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। ওরা আরও অনেক কথা বলে গেল কি না। সহ্য করতে পারলুম না। তাই তোমাকে ডেকেছি। তুমি তো জানো, তোমাকে কেউ কিছু বললে আমার মনের অবস্থা কি হয়? শেষের স্বরে আলিবর্দীর কণ্ঠে কান্নার সুর।

সিরাজের মনেও ব্যথার ছোঁয়াচ লাগল। কণ্ঠ একটু মোলায়েম করে বলল—কে কি বলেছে দাদু আমাকে স্পষ্ট করে বল? তুমি তো জানো, আমি খুব অন্যায় কিছু একটা করি না। হীরাঝিলে দুই একটি আওরৎ বা সরাবের পানপাত্রের সাথে

নর্তকীর নৃত্য দেখা—এতো রংমহলের ধর্মকে পালন করতেই আমি করি। আর এসব গোপনও নয়। তামাম মুর্শিদাবাদের সব লোকই জানে।

আলিবর্দী মাথা নেড়ে বললেন—না, অন্যায় কিছু অবশ্য কেউ বলে নি। শুনলুম তুমি দিল্লার বাদশাহের রংমহল থেকে একটি সেরা সুন্দরীকে লোক দিয়ে চুরি করিয়ে আনিয়েছ?

হঠাৎ সিরাজের রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠল। কোষ থেকে তরবারি বের করে শূন্যে তুলে বলল—দাদু গোস্তাখি মাপ কর। কিন্তু একবার আদেশ কর, কে সেই মিথ্যাবাদী যে আমার নামে তোমার কাছে এমনি মিথ্যে কথা জানিয়েছে, তার শির মাটিতে নামিয়ে দেব। আমি দিল্লীর বাদশাহকে একলক্ষ টাকা নজরানা দিয়ে ফৈজীকে হীরাঝিলে আনিয়েছি। এ কথা তোমার রাজ্যের কারুর জানার দরকার নেই দাদু, অন্তত তুমি জেনে রাখ। তবে তোমার মুর্শিদাবাদের লোকেরা ক্রুদ্ধ হতে পারে এইজন্যে যে আমি কাউকেই এখনও সুন্দরী ফৈজীর দর্শন দিই নি, এমন কি তোমার দাদুভাই সিরাজ পর্যন্ত সেই অপরূপ সুন্দরী নর্তকীকে দেখে নি, তার সৌন্দর্যের বিচার করে নি।

আলিবর্দীর ইচ্ছা করল সিরাজকে জিজ্ঞেস করেন, এ রহস্যের অর্থ কি? সেই সুন্দরীকে যখন ভোগই করা হবে না, তবে আনা হল কেন? কিন্তু লজ্জায় সে কথা জিজ্ঞেস করতে নবাবের জিহ্বার তালু শুকিয়ে গেল। তিনি মাথা নত করলেন। এবং অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার জন্যে বললেন—লুৎফা তোমাকে একবার বোধ হয় আকাঙ্ক্ষা করেছে দাদুভাই, তার সঙ্গে একবার দেখা করে যেও।

সিরাজ মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল—আজ আমি যাই তাহলে নবাব দাদু। আগামীকাল এসে তোমার সঙ্গে আহার করে যাব। আজ আমার সময় বড় সংক্ষেপ। সিরাজ চলে যাচ্ছে দেখে নবাব একটু ইতস্তত করে হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো আবদারের কণ্ঠে বলে উঠলেন—দাদুভাই, একবার আমার পাশটিতে বসবি না। তুই যেন আজকাল বড় বেশী দূরে দূরে চলে যাচ্ছিস্।

সিরাজ মৃদুহেসে দাদুর কথারই সুর ধরে বলল—তুমি কি জানো না এখন আমি বড় হয়ে গেছি।

জানিরে জানি। কিন্তু মন যে চায় না জানতে। একবার পাশে এসে বস্। বসে আমাকে একটু স্পর্শ দে তারপর চলে যা।

সিরাজ লজ্জারুণ হয়ে নবাব আলিবর্দীর পাশে গালিচার ওপর বসল। নবাব পরম আরামে সিরাজের গায়ে নিজের হাতের তালু দিয়ে হাত বুলিয়ে দু চারবার আদর করলেন, সিরাজ মাথা নত করে বসে থাকল। এ জায়গায় সিরাজকে একেবারে শিশুর মতো মনে হল। সে যে পরিণত যুবক, আজকে সন্ধ্যার পর ফৈজীর মতো সেরা সুন্দরীর অপরূপ যৌবন দেহভার উন্মুক্ত আলোর মাঝে উন্মোচন করবে; একটি আওরতের ঐশ্বর্যের সমস্ত কিছু আজ রাত্রে একাই লুটবে, সেখানে দোসর কেউ নেই। অপরূপ গোলাপী সৌন্দর্যের মাখনতনুটি একা সারা রাত ভোগ করে সে

রমণীর দেহের রহস্যের সন্ধান করবে। সেই পুরুষ শিশুর মতো স্নেহের ক্রোড়ে এখন সমাহিত।

একটুক্ষণ পরে নবাব আলিবর্দী মৃদুহেসে বললেন—এস দাদুভাই। আর বিলম্ব করব না, তোমার হয়ত ওদিকে অসুবিধে হবে।

সিরাজ আর অপেক্ষা না করে একদৌড়ে নবাবের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। এসে সে লুৎফাউন্নিসার কক্ষের দিকে চলল। লুৎফাউন্নিসার কক্ষের সামনে যেতেই সে থমকে দাঁড়াল। সারেঙ্গীতে তান তুলে লুৎফা গাইছে—

'মওলা প্রেম কি অওতারা।
সারে ছুনিয়া মে, প্রেম কি লীলন রে,
হাম্ তুম্ প্রেম্ কি ফুয়ারা॥
প্রেম কে লিয়ে সব কোই জীয়ে
কোই কোই রোয়ে, হোই বাউরা॥'

সিরাজ মনে মনে গানের শেষ কলিটি উচ্চারণ করল—'কোই কোই রোয়ে, হোই বাউরা। হায় শেষপর্যন্ত আমার ফকিরের বেশ!

সিরাজ ভাবল, লুৎফা-উন্নিসা যে এত দুঃখ পায় এ কথা কখনও বলে নি তো? তাহলে তাকে সে হীরাঝিলেই নিয়ে যেতে পারত! বললেই বলে—না জনাব, তোমার অসুবিধে করে আমি সুখ চাই না। অথচ মনে মনে তার এই দুঃখ, এও তো সহ্যাতীত!

এই কথা যখন সিরাজ লুৎফার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছে, একটি বাঁদী এসে কুর্নিশ করে সিরাজের সামনে দাঁড়াল।

সিরাজ তাকে দেখে বলল—কি আর্জি বাঁদী?

ওমদাৎবিবি আপনাকে একবার সেলাম দিয়েছেন জনাব।

সিরাজ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল বাঁদীর কথা শুনে। ইচ্ছে করল, এক ধমক দিয়ে বাঁদীকে চমকে দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। এখন সময় নেই, তাড়াতাড়ি করছে, এখুনি ফিরতে হবে হীরাঝিলে। এল ওমদাৎ উন্নিসার অনুরোধ। তাছাড়া ও বিবিকে যে সে অবহেলা করে একথা সেই আওরৎ বুঝতে চায় না? শাদীর অধিকার? না, সে অধিকার স্বীকার সে করে না। ওমদাৎ একদিন ছিল লোভনীয়া, এখন সে পরিত্যক্তা। এখন নয়া নয়া বহু খুবসুরৎ আওরৎ তার হীরাঝিলে আসছে। বাছাই করার সময় এখন। একটাকে জড়িয়ে নিয়ে যে পড়ে থাকে সে আহাম্মক। সিরাজ আহম্মক হতে চায় না। এই যে লুৎফাউন্নিসা! তার রূপ বহু আওরতের রূপকে ম্লান করে দেয়। তা ছাড়া লুৎফার স্বভাব বড় অদ্ভুত। সে কখনও চায় না, দাবি জানায় না। নিজে পোড়ে, কিন্তু কাউকে পোড়ায় না। শাদী করা আওরৎ না, তবু তার বেগমের মতো স্বভাব দেখে সিরাজ কখনও তাকে অশ্রদ্ধা করে না। ঠিক নবাববেগমের মতো।

তবু বাঁদীকে বলল সিরাজ—তোমার বিবিকে বলো, আজ আমি দেখা করতে

পারব না, তবে কাল নিশ্চয় দেখা করব। কাল সারাদিন এ প্রাসাদে থাকব তখন নিশ্চয় দেখা হবে।

বাঁদী চলে গেলে সিরাজ লুৎফার কক্ষে প্রবেশ করল।

লুৎফাউন্নিসা তার কক্ষের গবাক্ষ দিয়ে বাইরের শ্যামল ধরিত্রীর দিকে উদাস হয়ে তাকিয়েছিল। পিছন ফিরেছিল বলে সে সিরাজকে দেখতে পেল না। শুধু সিরাজ কক্ষে প্রবেশ করতে যে বাঁদী সারেঙ্গী হাতে নিয়ে অবস্থান করছিল সে নিঃশব্দে কক্ষত্যাগ করল।

সিরাজ তাকাল লুৎফার দিকে। অপরূপ বেশ তার। এখন সে জারিয়া ক্রীতদাসী নয়, এখন সে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ভাবী নবাবের পেয়ারী লুৎফা। এখন সম্মানের উচ্চাসনে বসেছে বলে নবাববেগম তাকে সমস্ত নবাববংশের ইজ্জত দান করেছেন। দিয়েছেন রেশমী, মসলিনের দামী দামী পোষাক। ধনাগার খুলে দিয়েছেন হীরা, চুনি, পান্নার অপর্যাপ্ত গহনার অলঙ্কারাদি। সাজিয়েছেন নিজের হাতে লুৎফাকে। মণিমুক্তার কণ্ঠহার লুৎফার কণ্ঠে দুলে তাকে আরও রূপ দান করেছে। কিন্তু এখনও শাদী করেনি তাকে সিরাজ। শাদী করার কোন গলদ অবশ্য নেই, করেনি এমনি। সিরাজ, লুৎফা এর জন্যে কোন অসুবিধে বোধ করে না। অসুবিধে বোধ করেন নবাববেগম। যিনি এই নবাব বংশের মঙ্গলের কর্ণধার। তিনি বার বার লুৎফাকেই অনুযোগ করে বলেন—বোকা আওরৎ, নিজের সম্মানটাকেও বাঁচিয়ে রাখতে পারিস্ না। মহব্বতের রোশনাই কতদিন মরদের চোখে থাকে রে ?

কিন্তু লুৎফা কখনও নিজের স্বার্থের জন্যে সিরাজকে উৎপীড়িত করে নি। তার চাহিদা নেই, তার আগ্রহও নেই। সে বলে 'নাই বা হল শাদী। এই যা পেয়েছি তাই কি আমার নসীবে ছিল ? একটি আওরৎ একটি সৌভাগ্যবান পুরুষের হৃদয়ে স্থান পেয়েছে, এই তো অনেক বেশি। এর বেশি চাইতে গেলে সব হারিয়ে যাবে।'

সিরাজ এ কথাগুলির সবই জানত, জানত বলেই সে এত লুৎফাকে ভালবাসে। লুৎফার মতো রমণী তার জীবনে একটিও আসেনি। লুৎফার মতো অপরূপ সুন্দরী আওরৎ বহু তার জীবনে এসেছে কিন্তু এমনি গুণের রমণী কোথায় ? তাই লুৎফার জন্যে তার হৃদয়ের একটি কোণে একটু কান্নার বরফ চাপা আছে অনুগ্রহ নয় আগ্রহ, বেদনা নয় মহব্বতের রক্তগোলাপ। সিরাজ স্পর্ধাভরে বলতে পারে—আমার জীবনে সহস্র সহস্র রমণী আসুক, লুৎফা সেখানে অম্লান।

তাই লুৎফাকে কখনও সে উপেক্ষা করতে পারে না। দুনিয়ার হাজার প্রয়োজন সিরাজের জীবনের সমস্ত সময় কবরিত করুক, তবু সিরাজ লুৎফার জন্যে একটু সময় ব্যয় করবেই।

সিরাজ লুৎফার পিছনের অবয়বটি একমনে দেখতে লাগল। একমাথা ধূসরবর্ণের চুলের রাশি মাথা থেকে নিতম্ব পর্যন্ত দোলায়মান। তাতে রেশমী জরির ফিতার বন্ধন। পরনে ফিকে সবুজবর্ণের দামী সার্টিনের সালোয়ার, কামিজ, ফিকে গোলাপী

বর্ণের মসলিনের ওড়না দিয়ে লুৎফার বক্ষের রমণী ঐশ্বর্য ঢেকে রাখবার চেষ্টা হয়েছে। মাথায় সেই ওড়না দিয়েই অবগুণ্ঠন টানা।

সিরাজের হাতদুটি হঠাৎ নিস্‌পিস্‌ করে উঠল। ইচ্ছে করল, লুৎফার মাখন নরম মুখের অবয়বটি তার গালের প্রান্তভাগ ধরে ফেরায়। ফিরিয়ে দেখে। দেখে প্রাণভরে। যেমনটি প্রথম একদিন দেখেছিল। হ্যাঁ সেই প্রথমদিন। আচমকা। কে জানত নবাব প্রাসাদেই একটি রত্ন অবহেলায় বিকশিত না হতে পেরে অপ্রকাশিতই আছে? হঠাৎ আচমকা একদিন সিরাজের চোখের দৃষ্টিতে নবাব হারেমের মধ্যে দুনিয়ার সেরা সুন্দরী, পৃথিবীর সেরা ঐশ্বর্যকে প্রত্যক্ষ করল। লুৎফা তখন ছিল জারিয়া ক্রীতদাসী। নবাব হারেমের নবাববেগমের নিজস্ব বাঁদী সে। কিন্তু নবাব-বেগম বাঁদী বলে লুৎফাকে তাচ্ছিল্য করতেন না। একটু অন্য রকম করে দেখতেন। একটু স্বতন্ত্র।

হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করল সিরাজ। সিরাজ তখন সবে পরিণত হতে শুরু করেছে। বাইরের দিকে মেলে দিয়েছে তার দৃষ্টি। সুন্দরী রমণী দেখলেই তার মরদের শিরায় রক্তের মধ্যে চঞ্চলতা অনুভব করত; ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত বিশেষ এক আওরৎ দেখলে। তাদের সঙ্গে রঙ্গরস করে তাদের সিক্ত করবার জন্যে তার আগ্রহ তাকে ব্যগ্র করত। তারপর পেলও অনেক রমণীর ঐশ্বর্য। প্রাণভরে তাদের ভোগও করল। প্রথম রোমান্সের আমেজটি মন্দীভূত হতে তার চিন্তাধারা অন্যত্র ঘুরতে লাগল। যা দুর্লভ তা সুলভ করতে হবে। যা পাওয়া যায় না, তা পেতে হবে। জগতে অসাধ্য কিছু থাকবে না। তাই যা পাওয়া অসাধ্য তার দিকেই তার মন ঝুঁকলো। এরপর এক এক একটি ঘটনা নবাবের এই রাজপ্রাসাদ ও তার আশেপাশে এমন ঘটতে লাগল যে সিরাজকে নিয়ে নবাব ও নবাববেগমের দুশ্চিন্তা হয়ে উঠল। সিরাজ রাজ্যের সেরা মেহমান আদমী, তাঁর জানানা মহলের চিকের ঘেরা অবরোধ ডিঙিয়ে তার মধ্যে চলে যায়। দেখে আসে মেহমান আদমীর কক্ষের ঐশ্বর্য। প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে। তারপর একটি বিশ্রী সংবাদ বহন করে আনে বাতাস। নবাব ও নবাববেগম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন কিন্তু সিরাজকে বলতে তাঁদের ডর লাগে। কেন যে ডর লাগে তা বোঝা যায় না। হয়ত সিরাজকে তিরস্কার করলে পাছে সে আরও অবাধ্য হয়, এইজন্যে তাঁরা নিষেধ পর্যন্ত করতে পারলেন না। এস্থলে অবশ্য নবাব ও নবাববেগমের অন্ধ স্নেহ প্রাবল্যই সিরাজকে এতখানি অবাধ্য হতে সাহসী করেছে। তবে সে কথাও নবাব আলিবর্দীর রাজত্বে বাস করে কারুর বলবার উপায় নেই। নবাব আলিবর্দী একদিকে যেমন খুব ভালমানুষ, অন্যদিকে রাজনীতিতে তাঁর মতো ভয়ঙ্কর লোক অন্তত বাংলার নবাবী তখতে কেউ বসেননি।

সেই সিরাজ একদিন লুৎফাকে দেখল। হয়ত লুৎফা ধরা দেবার জন্যেই ফাঁদ পেতেছিল। সিরাজকে লুৎফা অনেকদিন ভালবেসেছিল। বাঁদীর মহব্বত পাছে গোস্তাখি হয় বলে অপ্রকাশিত ছিল। কিন্তু সিরাজের অত্যধিক উচ্ছৃঙ্খলতায় নীরবে একটি রমণী নিজেকে সঁপে দিয়ে বহু রমণীকে বাঁচাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে

উঠল। অন্তত বহু রমণী এক চঞ্চল যুবকের হাত থেকে রেহাই পেয়ে একজনের জীবনের বৃত্তে আটকে থাক। অবশ্য সেও কল্পনা। লুৎফা এই চঞ্চল যুবককে নিজের দেহ দিয়ে, মন দিয়ে, মহব্বতের রঙীন পুষ্পের সৌরভে আমোদিত করতে পারবে কিনা জানে না, তবু তার কল্পনা ছিল হয়ত সে পারবে। সেই অনুমানে একদিন সে তার চটুল চাউনির মোহ বিস্তার করল। সিরাজ ধরা দিল। কাছে ছুটে এল। তারপর আর কি? দুনিয়াতে যা হয়। একটি আওরৎ ও একটি মরদ। আসমানের চাঁদ মুখ লুকিয়ে চুরি করে দেখল এদের মিলন।

সিরাজ গ্রহণ করল জারিয়া বাঁদীর মহব্বত। কিন্তু মুগ্ধ হল। বিস্মিত হল। তারপর তার দুর্বল ও ছন্নছাড়া প্রাণমন এই রমণীর বৃত্তে জড়িয়ে গেল।

সিরাজ দেখল লুৎফার শুধু রূপ নেই, রমণী ঐশ্বর্যই শুধু সুন্দর নয়—রমণীর কাছ থেকে যে পাওয়া সে কখনও পায় নি তাই পেল। পেল নিবিড় মহব্বতের শান্ত স্রোতধারা। নীরবে দিয়ে যাওয়া, কিছু না চাওয়া। এমন একটি সেবার ধর্ম নিয়ে লুৎফা তার কাছে আবির্ভূতা হল যে সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এক অজানা জগতের সন্ধান পেল। সে জগৎ কখনও সে কল্পনা করে নি। নবাববেগমের মধ্যে লুৎফার স্বভাবের অংশ ছিল কিন্তু তাঁকে বুঝতে গেলে সিরাজকে অনেকখানি অন্তর্মুখী হয়ে অন্বেষণ করতে হয়। কিন্তু অন্তর্মুখী অন্বেষণের ক্ষমতা কোথায় সিরাজের। সিরাজ চঞ্চল। চিন্তাহীন। ছন্নছাড়া। কোন কিছু ভাবনা-চিন্তার আগেই তার অশ্ব বাতাসে ছোটে।

সেই চঞ্চল, অশ্রান্ত মনে হঠাৎ লুৎফার স্পর্শ তাকে চমকে দিল। সে হারিয়ে যাচ্ছিল। বিলাসিতার স্রোতে আকণ্ঠ ডুবে সুরার মাদকতায় সে মোহান্ধ হয়ে থাকছিল; হয়ত সেই নেশার রাজ্যে বিচরণ করেই কতকগুলি নষ্টা যৌবনের মেকী রোশনাই উপভোগ করেই জীবন শেষ হয়ে যেত কিন্তু আল্লার আশীর্বাদ সিরাজের ওপর বর্ষিত হতে লুৎফার মতো রমণীর সাহচর্যে তার চেতনা ফিরল। সে লুৎফার আড়ালেই কিছুকাল নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে চুপ করে রইল।

কিন্তু অশ্রান্ত, চঞ্চল জীবন সিরাজের। যতদিন লুৎফার রূপ যৌবন তার ভাল লাগল ততদিনই সে চুপ করে রইল। তারপর আবার সে বাইরের দিকে দৃষ্টি ন্যস্ত করল। লুৎফা হাজার হলেও বাঁদী, তার নিষেধ শুনছে কে? লুৎফা কখনও সিরাজকে কিছু নিষেধ করত না। করলে হয়ত শুনত। কিন্তু লুৎফার স্বভাবের মধ্যে কোন প্রতিবাদ ছিল না।

এরপর তৈরি হল হীরাঝিল প্রাসাদ। সিরাজ লুৎফাকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইল, লুৎফা গেলেও কিন্তু বেশিদিন সেখানে থাকল না। হীরাঝিল প্রাসাদে আওরতের থাকা চলে না, যে আওরৎ অনেক বড় আদর্শ গ্রহণ করে বাঁচতে চায়। সিরাজকে সেখানে চেনা যায় না বলে লুৎফাউন্নিসা নবাব প্রাসাদে এসেই বাস করতে লাগল। তবু সিরাজ কখনও লুৎফার ওপর বীতরাগ নয় বরং সিরাজের সমস্ত দুর্বলতা লুৎফাকে ঘিরে।

হঠাৎ পিছন থেকে সিরাজ লুৎফার দুটি চোখ টিপে ধরল। সবল পুরুষের হাতের ছোঁয়াচে লুৎফার কর্ণমূল দুটি রক্তিম হয়ে উঠল, শিহরিত হল দেহ। কিন্তু পরক্ষণে বুঝতে পেরে সে খিলখিল করে হেসে উঠল, বলল—উফ্ লাগে, ছাড়ো,—ছাড়ো।

সিরাজ তবু ছাড়ল না দেখে লুৎফা মিনতিকণ্ঠে বলল—মেহেরবানী করে ছাড়ো যুবরাজ, কেউ দেখে ফেলবে না?

সিরাজ ছেড়ে দিল, দিয়ে লুৎফার সামনে গিয়ে হেসে বলল—দেখে ফেলবে তো কি হবে? তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধর কথা কি তামাম হিন্দুস্তানের কারুর জানতে বাকী আছে? তোমার কাছে আমি জানতে এসেছি, এই কিছুক্ষণ আগে যে গীত গাইছিলে সে গীতের অর্থ কি? 'কোই কোই রোয়ে হোই বাউরা'—কাকে বলে!

সিরাজের স্পষ্ট জিজ্ঞাসার ভঙ্গি দেখে লুৎফা লজ্জায় মাথা নত করল। তার সুন্দর শুভ্র মুখের ওপর রক্ত আবীর ছড়িয়ে গেল। নিম্নস্বরে বলল—লুকিয়ে যারা অপরের গীত শোনে আল্লা তার কসুর মাফ করে না, জানো!

মানে? সিরাজ যেন ক্ষিপ্ত হতে চাইল। আমার বেগমের দিলের আঁধির খোঁজ আমি নেব না তো অন্য লোকে নেবে?

লুৎফা তেমনি নিম্নস্বরে বলল—কে কার বেগম।

কেন, তুমি আমার বেগম নও? সিরাজ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল।

লুৎফা তখনও মাথা নীচু করে মিটিমিটি হাসছিল, এবার সে তার অবগুণ্ঠন মুখের ওপর টেনে দিয়ে শব্দ করে খিলখিল করে হেসে উঠল।

সিরাজ কিন্তু লুৎফার হাসিতে যোগ দিল না, সে আরও গম্ভীর হয়ে বলল—তোমার সঙ্গে আমার শাদী হয় নি বলে তুমি আমার বেগম নও?

লুৎফা উত্তর দিল—তাই তো লোকে বলে। আজও নবাববেগম সেই কথা আমাকে বলে গেলেন। বললেন—ভাবী নবাব যে রকম দিন দিন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে তাতে ভবিষ্যৎ তোর অন্ধকার।

তোমারও কি সেই এক মত!

লুৎফা মাথা নাড়ল, বলল—না, আমি বিশ্বাস করি। শাদীর ইন্তেজার দিয়ে সেই দিলের বিশ্বাসকে বেইমানী করতে চাই না বলে শাদীর জন্যে আমার ফরমাইজ নেই।

সিরাজ এবার খুশী হয়ে লুৎফার মুখের অবগুণ্ঠন সরিয়ে দিয়ে থুতনি ধরে মুখটি নিজের চোখের সামনে তুলে ধরল। অপরূপ দুটি ডাগর স্বপ্নাভা চোখের দিকে তাকিয়ে নরম-সরম গোলাপী অধরের দিকে তাকিয়ে সিরাজের মনে প্রশ্ন এল, ফৈজী কী এর মতো এতো সুন্দর হবে? এমনি হবে দিল্! দরদ ভরা মন!

লুৎফা তার উষ্ণরক্তের সঙ্গিনী নয়, সে তার নিরুৎসাহ জীবনের অঙ্গার। উৎসাহ বর্ধনের জন্যে তার সৃষ্টি। ফৈজীকে যদি তার ভাল লাগে তাহলে সে তার সঙ্গে মহব্বত করবে, হৃদয় মেশাবে, ফৈজীর আগুনের মতো দেহের উষ্ণ তাপে তার চঞ্চল রক্তস্রোতে মিশ্রণ সৃষ্টি করবে। সে ফৈজীকে লুটবে তার কামনাঘন যৌবনের

উন্মাদনার জন্যে। লুৎফাকে গ্রহণ করবে তার সারাজীবনের রসদ হিসাবে। লুৎফা তার সঙ্গিনী, ফৈজী হবে তার মহব্বতের রোশনাই। দিলের হীরের টুক্‌রো। হৃদয়ের নির্যাস।

লুৎফাকে কাছে টেনে নিল সিরাজ। নিল একেবারে বক্ষের সীমিতে, লুৎফা আবেশঘন হয়ে একেবারে মিশে গেল সিরাজের বক্ষে। দুজনের বুকের স্পন্দন এক হয়ে দুজনকে জানাল তাদের নীরব ভাষা। পরস্পরের আকুতিই একবৃন্তে সংযোজিত হয়ে তাদের মোহাচ্ছন্ন করল। তারা বার বার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, যেন এ জোড় কখনও ছিন্নভিন্ন না হয়। এ মিলন স্বর্গীয়। আল্লার আশীর্বাদের পবিত্ররূপ।

সুখের উত্তেজনায় লুৎফার দুটি কোমল অধরে কম্পন সৃষ্টি হয়েছিল, হঠাৎ সেইদিকে তাকিয়ে সিরাজ বলল—লুৎফা, পিয়ারী, তোমার অধরে কম্পন কেন?

লুৎফা নিঃশব্দে ফিসফিসিয়ে বলল—বড় সুখ, বড় আনন্দ।

তুমি আমাকে কখনও ভুল বুঝবে না!

লুৎফা তেমনি আবেশে মৃদুস্বরে বলল—বাংলার ভাবী নবাবকে ভুল বোঝার ক্ষমতা বেসরম এক জারিয়া কন্যার আছে?

না, না এ কথা বলো না লুৎফা। হঠাৎ সিরাজ লুৎফার মুখে হাত চাপা দিল। তুমি আমি এক। সেখানে নবাব না, নবাবী না, কোন কিছু না। তুমি লুৎফাউন্নিসা। লুৎফার অর্থ ভালবাসা, মহব্বত; ও নিসার অর্থ বেগম। তুমি আমার মহব্বতের বেগম।

লুৎফা কোন কথা বলল না, শুধু ম্লান হাসল।

সিরাজ আবার বলল, জানো লুৎফা, আজকে আমার হীরাঝিলে একটি অপরূপ সুন্দরী নর্তকী এসেছে তার নাম ফৈজী। ফৈজী লক্ষ্ণৌর আওরৎ। দিল্লীর হারেম থেকে বাদশাহকে নজরানা দিয়ে আনিয়েছি। শুনেছি তার রূপ নাকি বর্তমানে সারা হিন্দুস্তানে দুর্লভ। হঠাৎ সিরাজ লুৎফার মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। সিরাজ দেখল, লুৎফার মুখের ওপর পাণ্ডুর ছায়া। কেমন যেন যন্ত্রণার আকুতি।

সিরাজ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল—তোমার কি তবিয়ৎ আচ্ছা নেই পিয়ারী?

লুৎফা মাথা নেড়ে বলল—তবিয়ৎ আচ্ছা আছে যুবরাজ। কিন্তু একটি কথা বলব গোস্তাখি মাপ করবে। তুমি নিত্যনতুন এই আওরতের সঙ্গ গ্রহণ করে কি পাও?

পাই! সিরাজ হাসল—পাই যে কি তা আমি জানি না। তবে সরাব পান করলে যেমনি দিল্‌টা খুশীর আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে, তেমনি আওরতের উষ্ণস্পর্শ দেহের শোণিতে খুশীর তাণ্ডব সৃষ্টি করে। নিত্যনতুন আওরতের স্পর্শ নিত্যনতুন মেজাজের সৌরভে আমাকে মাতোয়ারা করে।

তবে আমার মধ্যে কি পাও?

তোমার কাছে এলে আমি আশ্রয় পাই। তোমার কাছে আমি জানতে পারি আমি কে? তোমার কাছ থেকে আমি উন্মাদনা চাই না, চাই স্থিতি, স্বস্তি। তোমার বুকে আছে মধুর এক সান্ত্বনার আশ্রয়। চোখে আছে ক্ষমার প্রলেপ।

সিরাজ লুৎফাকে হৃদয়ের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে বলল—আজ তাহলে যাই লুৎফা। আবার কাল আসব। তুমি দুঃখ কর না। তোমার যদি কোন গোপন দুঃখ থাকে তাহলে আমাকে নিবেদন কর, আমি সাধ্যমত তোমার আশা পূরণ করব। দুনিয়ায় তোমার মতো আপনার আমার আর কেউ নেই এ কথা তুমি অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস কর। এই বলে সিরাজ লুৎফার কম্পিত অধরে নিজের বহুচুম্বিত অধরের স্পর্শ দিয়ে আস্তে আস্তে কক্ষত্যাগ করে চলে গেল।

লুৎফার মহল থেকে বেরিয়ে একটি দীর্ঘ অলিন্দ। অলিন্দের পাশে পাশে সরু গলিপথ। প্রত্যেক সরুগলি পথে এক একজন খোজা প্রহরী, হাতে তাদের খাপখোলা ধারাল তরবারীর ফলা, আলোর মতো চিকচিক করছে। সিরাজকে দেখে তারা মাথা নত করে সেলাম জানাল। দীর্ঘ অলিন্দ পার হতেই নবাবী দরবারের পিছনের পথ। একটি দীর্ঘ ফুলের বাগান, সেখানে নানা ফুলের সমন্বয়। সেখানে পৌছতেই নানাধরনের বিচিত্র সৌরভের সুগন্ধ সিরাজের নাকে প্রবেশ করল। সিরাজ একবার সেইদিকে তাকিয়ে লুব্ধদৃষ্টিতে বাগানের একটি অংশের দিকে তাকিয়ে থাকল। সেখানে তারই নিজ হাতে রচনা করা কটি ফুলের গাছ। সে গাছেও ফুল ফুটেছে। বাতাসে তারা দুলছে সদ্যযৌবন পাওয়া সজীব আওরতের মতো।

একটু এগিয়ে যেতেই হঠাৎ সে পথের মাঝে বাধাপ্রাপ্ত হল। সিরাজ চমকে উঠল। সামনে দাঁড়িয়ে তার আম্মাজান আমিনা বেগম, আলিবর্দীর কনিষ্ঠ কন্যা। অপরূপ সাজে তিনি সেজেছেন। বাংলার নবাবের কনিষ্ঠা কন্যা বলে যেন তাঁর সাজের বহর একটু ভিন্নরকমের।

চোখে সুরমা, গালে গোলাপের রংবাহার। মেহেদি রঙে রাঙিয়েছেন হাতের তালু। পরনে তাঁর দামী রেশমী পোষাক। সালোয়ার কামিজের ধরণ দেখলে মনে হয় সদ্যপ্রাপ্তা যৌবনের অধিকারী এই আমিনা বেগম। মস্তকে ওড়নার আস্তরণ ছিল না, শুধু ওড়নাখানি অবহেলা ভরে মাটিতে লুটোচ্ছিল, আমিনাবিবি সিরাজকে দেখে তা মস্তকে তুললেন। সিরাজ তাকিয়ে থাকল তার গর্ভধারিণী আম্মাজানের দিকে। রমণী সে এই বয়সে অনেক দেখেছে। দেখল নবাববেগমকে। দেখল তার আম্মাজান ও মাসি ঘসেটিকে। লুৎফাকেও তার ভাল করে চেনা হয়ে গেছে। কিন্তু আজ যিনি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে যেন সে কোনদিনও দেখেনি। রমণী চিরকাল ভূষণে সৌন্দর্যশালিনী হয় কিন্তু রমণীর সৌন্দর্য দেখে জ্বালা সৃষ্টি হয়, কখনও সে অনুভব করে নি। সম্মুখে যে রমণী দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর সৌন্দর্য অবলোকন করে ঘৃণা জাগছে। কেন সে তা জানে না। অথচ তার আম্মাজান একজন শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলে সবার কাছে সম্মানিতা ছিলেন।

আমিনাবিবি সিরাজকে কাছে ডাকলেন, বেটা সিরাজ, তোমার সঙ্গে আমার থোড়া বাতচিত্ আছে।

সিরাজ ঘৃণায় মুখখানা সরিয়ে নিল। তারপর সংযতস্বরে বলল—আজ আমার সময় নেই, কাল আসব বলো তোমার বাত্।

সিরাজ আর দাঁড়াল না, হন হন করে দ্রুত সেস্থান থেকে পালাল। যেন একদলা ঘৃণা নাকের কাছে কেউ ধরেছে দুর্গন্ধে তার বমনোদ্বেগ হচ্ছে। সে মুখখানা বিকৃত করেই সেস্থান থেকে পালাল। কিন্তু তার বড় কষ্ট হল। চোখে জল এল। এই তার মা, তার আম্মাজান। এঁরই গর্ভে তাঁর জন্ম। রমণী কি ভুলে গেল এ কথা! এঁরই তো ক্রোড়ে একদিন সে ভূমিষ্ঠ হয়ে স্থান পেয়েছিল।

আজ সে রমণী তাঁর মাতৃত্বের রূপ নষ্ট করে এ কোনরূপে নিজেকে পরিবর্তিত করেছে? এই রূপ কি তাঁর যথার্থ রূপ হওয়া উচিত ছিল? অনেক রমণীরই স্বামী থাকে না, সোহাগ থাকে না, তাই বলে তাঁর মাতৃত্বও কি বিস্মৃতির কোলে হারিয়ে যায়?

পিতা জৈনুদ্দীন বিহারের শাসনকর্তা থাকাকালীন অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বেইমান আফগান সৈন্যের দ্বারা তাঁর দরবার গৃহে নিহত হন। এবং সৈন্যরা আমিনা বেগম ও অন্যান্য রমণীদের উন্মুক্ত শকটে আরোহণ করিয়ে প্রকাশ্য রাজপথে তাঁদের যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করে সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করায়। তারপর নবাব আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজী আহমদকে অশেষ কষ্ট প্রদান করে নিহত করে।

সেইসময় কি আমিনাবেগমের চিত্ত বিকৃতরূপ ধারণ করেছিল? তিনি আফগান সৈন্যের দ্বারা লাঞ্ছিতা হয়ে ইজ্জত জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হন? সিরাজ জানে না সে কথা। তখন সে ছোট। সে থাকতো আলিবর্দীর কাছে এই নবাবপ্রাসাদে। পরিণত হয়ে বুঝতে শিখেও কখনও সে তার আম্মাজানকে একথা জিজ্ঞেস করতে পারে নি। পারে নি জিজ্ঞেস করতে—আম্মা, তুমি কি সেদিন তকলিফ পেয়ে হারিয়ে গিয়েছিলে? কিন্তু জিজ্ঞাসা না করলেও আজ সে বোঝে, সেদিন আম্মাজান আমিনাবেগম যথেষ্ট তকলিফ পেয়েছিলেন, যার জন্যে আজ তাঁর এই পরিবর্তন।

নবাব আলিবর্দী তাঁর স্নেহপুত্তলী কন্যা, দৌহিত্র ও দোহিত্রীদের উদ্ধার করেছিলেন অনেক পরে। সেদিন নবাববেগম আলিবর্দীকে শত্রু দমনের জন্যে প্রোৎসাহিত করেছিলেন বলে পরবর্তী যুদ্ধের আয়োজন করতে আলিবর্দী সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর যুদ্ধ-কৌশলে অচিরাৎ আফগানগণ বিধ্বস্ত হয়েছিল। নবাব আপনার কন্যা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রীদের উদ্ধার-সাধন করে, আফগান পরিবারদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে, যুগপৎ আপনার শৌর্য ও মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করেছিলেন।

নবাব দেখালেন আপনার অনুগ্রহ; কিন্তু নবাবের প্রাসাদের হারেমে যে এক দারুণ পরিবর্তন সাধিত হল সে কথা কে জানল? জানল পরে এই সিরাজ ও নবাব প্রাসাদের জন্যে যিনি মঙ্গলের চেষ্টায় সর্বদা চিন্তা করে চলেছেন সেই স্নেহময়ী, করুণাময়ী নবাববেগম। সিরাজ বহুদিন গোপনে অবলোকন করেছে নবাববেগমের চোখে জল। তিনি চোখের অশ্রুর সাগর নিয়ে নিঃশব্দে একলা সমস্ত যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে পার হয়ে চলেছেন।

প্রাসাদের বারমহলে অশ্বের ওপর উঠতে যেতেই একটি পালকি এসে মহলের সামনে দাঁড়াল। আর তার থেকে বেরিয়ে এলেন ঘসেটিবিবি। এক ঝলক জৌলুসের মতো আসমানের নীচে দাঁড়িয়ে সিরাজের দিকে দৃষ্টি তুলে তাকালেন। সিরাজের সঙ্গে তাঁর চোখোচোখি হল। ঘসেটিবিবি হাসলেন এক ঝলক এবং হাত নেড়ে সিরাজকে কাছে ডাকলেন।

সিরাজ কিন্তু এক ঝট্‌কায় চোখ সরিয়ে নিয়ে অশ্বের পিঠে লাফিয়ে সওয়ার হয়ে বল্গা ছুটিয়ে দিল। অশ্বের পেটে দারুণভাবে পায়ের গোড়ালি দিয়ে সজোরে এক লাথি মারল, অশ্ব দারুণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে তীরবেগে ছুটে চলল। মাটিতে শব্দ উঠল টগ্‌বগ্‌। বাতাসে ধ্বনিত হল, সোঁ সোঁ।

অশ্বারোহী সিরাজ মাঝে মাঝে মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিতে লাগল, না আর সে কোন কথা ভাববে না। এখন ফৈজী। ফৈজীর রূপ, ফৈজীর যৌবন। সুরার পানপাত্র। বাদ্যযন্ত্রের অপরূপ ধ্বনি, রমণীর সুরমা আঁকা চোখের চাউনির আকর্ষণ।... নবাবপ্রাসাদে সে ঐ জন্যে আসতে চায় না। এখানে যেন চারদিকে প্রেতাত্মা ঘুরে ফেরে। এখানে এলে তার ওপর সেই প্রেতাত্মা ভর করে। সে তাকে ভাবায়। তাকে হারিয়ে দেয়। সে যেন কেমন পাল্‌টে যায়। অথচ না গেলেও উপায় নেই। বৃদ্ধ নবাব দিন দিন কেমন যেন ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছেন। সিরাজকে না দেখতে পেলে তাঁর সংযত মন হঠাৎ নবাবী ভুলে ছটফট করে ওঠে। তিনি যেন স্বাভাবিক সৌজন্য প্রকাশেও আত্মনিয়োগ করতে পারেন না। এই নবাবের জন্যেই তার বিশেষ চিন্তা। এই বৃদ্ধের দুঃখের জন্যেই তার যত কষ্টভোগ।

একটি সরুপথ দিয়ে অশ্ব তীরবেগে ছুটে চলছিল হঠাৎ একটি অশ্বারোহী বিপরীত দিক থেকে এসে সিরাজের পাশ দিয়ে তীরবেগে ছুটে চলে গেল। সিরাজ দেখল, হোসেন কুলী খাঁ অশ্বের ওপর সওয়ার হয়ে আছে। এই লোকটিই আজ নবাবপ্রাসাদের দুশমন, শত্রু। অথচ তাকে কিছু বলার উপায় নেই। হোসেন কুলী খাঁ ঢাকার শাসনকর্তার পদে এখন সমাসীন। নওয়াজেস মহম্মদ খাঁর সহকারী হয়ে সে ঢাকায় শাসন পরিচালনা করছে।

লোকটির গুণের মধ্যে তাকে দেখতে অদ্ভুত। মুসলমানদের মধ্যে সচরাচর এমনি রূপবান দেখা যায় না। ঠিক যোদ্ধার মতো চেহারা। দীর্ঘ, লম্বা, টানটান, ফর্সা শরীর। উন্নত নাসিকা, দীর্ঘ কপাল, দুটি গোলাকার চোখের মধ্যে অদ্ভুত এক দৃষ্টির আমেজ। সেই দৃষ্টির মাঝে যে কোন রমণী এক মুহূর্তে বাঁধা পড়তে পারে। পড়েছেও দুজন। আলিবর্দীর ইজ্জত নষ্ট করছে তাঁর দুইকন্যা ঘসেটি ও আমিনা। ঘসেটি বহুদিন ধরে লীলা করে আসছিলেন। বৃদ্ধ নওয়াজেস খাঁর সোহাগে তাঁর চিত্তের তাণ্ডব স্তিমিত হয় নি, তাই তিনি নওজোয়ান খুবসুরত মরদ হোসেন সাহেবের বাহুডোরে বাঁধা পড়েছেন।

আর আমিনা তার ভগিনীর প্রণয়ীকে অধিকার করেন বিহার থেকে চলে আসবার পর। সিরাজের পিতা জৈনুদ্দীন নিহত হবার পর।

সে এসব কথা আর ভাববে না বলে প্রতিজ্ঞা করে অশ্বের ওপর সওয়ার হয়েছিল কিন্তু আবার তাকে সেই চিন্তার গহ্বরে ঢুকে যেতে হল। সিরাজ আবার মাথা ঝাঁকাল। তারপর মনটা অন্য দিকে ফেরাবার জন্যে অশ্বের পায়ের দ্রুত ধ্বনিতে কান পেতে থাকল। তারপর এক সময় হীরাঝিলে গিয়ে পৌঁছল।

সারাদিনের কথাগুলি ঝিলের নীলজলের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিরাজ ভাবছিল। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। ঝিলের জলে চাপ অন্ধকার জমাট বেঁধে শুয়ে আছে। প্রাসাদের চারদিকে আলোর রোশনাই। ঝিলের জলে তার প্রতিবিম্ব।

আজ হীরাঝিলের জলস্রোত যেন সিরাজের দিলের তাণ্ডবের মতো উন্মত্ত হয়েছে। জলস্রোতের ঢেউ প্রাসাদ চত্বরে আছাড় খেয়ে খেয়ে আকুলিত হয়ে পড়ছে। উপরের অলিন্দের এক কোণ থেকে সেই দিকে বিস্ময়ে সিরাজ তাকিয়েছিল। সে দেখছিল ঝিলের জলের অস্বাভাবিক কলগুঞ্জন। যেন কোন মধুর সুরের গীত কোন বেহেস্তের হুরীর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়ে জলের বুকে হারিয়ে যাচ্ছে। মিলিয়ে যাচ্ছে কোন অতলান্তে। সিরাজ সেই জলের গীত শোনবার চেষ্টা করল। কিন্তু একটি সঙ্গীতের তান ছাড়া সমস্ত ধ্বনি যেন কোন অদৃশ্যের ছোঁয়া পেয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। সে ধ্বনি শোনার শক্তি তার নেই।

সিরাজ আজ সারাদিন ধরেই সরাব পান করছিল। সরাব সে যত পান করছিল তত তার উত্তেজনা দারুণ বেড়ে যাচ্ছিল। উত্তেজনা তার আজ প্রয়োজন। আজ সে ফৈজীকে লুটবে। ফৈজীর কথা যত সে চিন্তা করছিল সরাবের পাত্র তার তত বাড়ছিল। অথচ ফৈজীকে সে কখনও দেখে নি। শুধু লোকমুখে শুনে সে ফৈজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তবে মরিয়মের কাছে সে যতটুকু শুনেছিল তাতে তার মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্‌ শুরু হয়েছিল। নেশার মাত্রা হয়েছিল আরও গাঢ়, আরও গভীর। সরাবের নেশা যেন তার ফিকে হয়ে গেছে। ফৈজীর নেশা তাকে পাগল করে তুলেছে। ফৈজী কি আওরত—না সরাবের গোলাপী খুসবু পানি? সিরাজ ভেবে পায় না। সরাব যাকে মাতাল করে না, একটি আওরতের কথা অন্য মুখে শুনে মাতাল করে দিল! না জানে সে আওরতের আরও কি ক্ষমতা? মরিয়ম এসেছিল জিজ্ঞেস করতে—ফৈজী কি পোষাক পরে আসরে নাচতে নামবে?

তখন সিরাজ জিজ্ঞেস করেছিল—আগে ফৈজীর রূপের বর্ণনা দাও, তখন তার পোষাকের ফরমাইজ দেব।

মরিয়ম বলেছিল—জনাব, তার রূপের বর্ণনা দেওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে।

আমি বাঁদী জনাব। এ মুখে তার বর্ণনা শুনলে আপনি আমাকে কোতল করবেন। তার চেয়ে নিজের চোখে দেখে তার বিচার করবেন।

সিরাজ তবু জিজ্ঞেস করেছিল—একটুখানি বল। এখানে তো বহু আওরত রয়েছে। সমস্ত হিন্দুস্তানের সেরা সেরা হুরীর দল হীরাঝিলের কক্ষগুলি আলো করে আছে। হিন্দুঘরের বহু অপ্সরী এসে এই প্রাসাদের কক্ষে আছে, তাদের কার মতো দিল্লীর হারেমের নর্তকী ফৈজী?

কারও মতো নয় জনাব!

তুই ঠিক দেখেছিস্? সিরাজ বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে গেল।

হ্যাঁ, জনাব, আমি তো তাকে সারাদিন ধরে দেখেছি সে যেখানে বসেছিল, সেই জায়গায় আলোর রোশনাই। সে যখন স্থির হয়ে বসেছিল আমি তার রূপের একটি তসবীর এই প্রাসাদের একটি কক্ষেও দেখিনি। ঠিক যেন কেউ মোমের পুতুল বানিয়ে পালঙ্কের ওপর বসিয়ে রেখেছে।

সিরাজ মরিয়মের মুখে ফৈজীর বর্ণনা শুনতে শুনতে কেমন যেন মোহাবিষ্ট হয়ে পড়তে লাগল। কেমন যেন লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠতে লাগল। মাথার মধ্যে রক্তের চাঞ্চল্য। হঠাৎ সে মরিয়মকে বাধা দিয়ে বলল—ফৈজী তোর সঙ্গে বাতচিত্ করল?

জাদা নহী হুজুর। শুধু দুবার কথা বলেছিল। একবার বলেছিল, একগ্লাস পানি। আর এই কিছুক্ষণ আগে বলল—তোমার নবাবকে জিজ্ঞেস করে এস নাচের জন্যে কি পোষাক পরবো?

ফৈজী কী খুব দাম্ভিকা?

বলতে পারি না হুজুর। তবে খুব ছেলেমানুষ। জোয়ানী বাচ্চা লড়কীর মতো কিছুক্ষণ ধরে কক্ষের মধ্যে ঘুরে ঘুরে নাচ কসরৎ করল।

আর কিছু জিজ্ঞাসা করেনি?

মরিয়ম আবার একটু চিন্তা করে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করছিল; তোমার নবাব আমাকে দিল্লী থেকে ধরে এনে এখানে খাঁচায় বন্ধ করে রাখছে কেন? আমাকে কি বন্ধ করে মেরে ফেলবার মতলব করছে নাকি? এই বলে সে খিলখিল করে হাসতে লাগল। তারপর বলল—দোহাই, তোমার নবাবকে মেহেরবানী করে বলো—ফৈজী জোয়ানী আওরত। তার বাঁচবার সাধ এখনও ফুরোয়নি। যদি তাঁর প্রয়োজনে না লাগে তিনি যেন এই বেগুণা লড়কীকে তার জন্মভূমি লক্ষ্মৌতে পাঠিয়ে দেন।

সিরাজ জিজ্ঞেস করল—তুমি কি বললে তার উত্তরে?

আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম—ডর কিঁউ! যুবরাজ সন্ধ্যায় আসর বসিয়ে তোমায় তলব করবেন। তোমাকে সেই আসরে নাচতে হবে, আর তার জন্যেই আজ বিশেষ কায়দায় প্রাসাদ সাজানো হচ্ছে।

সিরাজ হঠাৎ মরিয়মকে থামিয়ে দিয়ে বলল—ফৈজীর পোষাক হবে, কোমরে

খাটো গাঢ় রক্তবর্ণের ঘাগরা, বুকে নীলাভ মসলিনের কাঁচুলি। সারাদেহকে আবৃত করে একটি গোলাপী সার্টিনের আবরণ তাকে ঢেকে রাখবে। নাচবার সময় সে আবরণ মুক্ত হয়ে যাবে।

মরিয়ম চলে গেলে সিরাজ ভাবল—ফৈজীকে বিবস্ত্র করে নাচালেই বুঝি তার সৌন্দর্য পরীক্ষা করা হত। কিন্তু আসরে বহু মোসাহেব থাকবে, তাদের চোখের কামাতুর দৃষ্টির মাঝে ফৈজীর রমণী ইজ্জতকে ছোট করলে ক্ষতি তার। কারণ রমণীর গোপন লজ্জাকে সবার মাঝে উন্মুক্ত করলে সেই রমণীর সৌন্দর্য বিকশিত হয় না বরং তাকে অপমান করে তার ইজ্জতকে অবমাননা করা হয়। তাছাড়া ফৈজী তার। তার ফৈজীকে অন্য কেউ বেওয়ারিশ ভোগের কসরৎ করবে এও সহ্য করা যায় না। তাই সিরাজ আপাতত একটি ইচ্ছা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করল।

সে ইচ্ছাটি তোলা থাকল নাচের শেষে। অন্য একটি মহলের অন্য একটি কক্ষের জন্যে। সেখানে তৈরী আছে একেবারে ভিন্ন একটি ব্যবস্থা। সে কক্ষে আর কারও প্রবেশের অধিকার নেই। কোন ভিন্ন আওরতের পর্যন্ত না। সিরাজ যে আওরতকে নিয়ে রাত্রির সুষুপ্তির কোলে পালঙ্কের শয্যাগহনে উষ্ণ তাপের স্বর্গে নিমজ্জিত হতে চায় সে ছাড়া আর কারুর এই রহস্যময় কক্ষে প্রবেশাধিকার নেই। আজ নাচের শেষে ফৈজীকে নিয়ে সে সেই কক্ষে প্রবেশ করবে। ভেতর থেকে দরজার আগল আটকে দেবে। কক্ষের আলোর জৌলুস কমিয়ে দিয়ে ফৈজীর রূপের আলো ছড়িয়ে দেবে। সমস্ত কক্ষ আতরের সুবাসে আমোদিত করে ফৈজীর নিজের হাতের দেওয়া সরাব পান করবে! তারপর তাকে কাছে টেনে নেবে। যে রকমটি আগে সে অন্য রমণীর বেলায় করেছে।—আচ্ছা ফৈজী কী তাকে বাধা দেবে? বলবে—'আমাকে স্পর্শ কর না। আমি পণ্য নয়! আমি ফুলের মতো সজীব জীবন নিয়ে বাঁচতে চাই। আমি মরদের নিষ্পেষণে যৌবন হারিয়ে আবর্জনা হতে চাই না!'

একথা সিরাজের মনে হল তার কারণ, সে একটি রাইজীর কাছ থেকে এমনি সম্মান পেয়েছিল। সেই বাইজী ঠিক এই কল্পিত কথাগুলি বলে বাংলার ভাবী নবাবকে অপমান করেছিল।

তার উত্তরে অবশ্য সিরাজ অনুনয় বিনয় করেছিল এবং পরবর্তী কার্যতালিকা ঠিক করে সেই রাত্রে কক্ষের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে ওসমানের হাতে সঁপে দিয়েছিল। ওসমান হল সিরাজের বিশ্বস্ত অনুচর। পালোয়ানের মতো চেহারা তার। তার বিরাট হাতের থাবার পেষণে সেই বাইজীর যৌবনপুষ্ট দেহ কদিনেই নিঃশেষ। যেন কেউ চুমুক দিয়ে তার রক্তটুকু পান করে নিল।

ফৈজীকেও কি তেমনি কোন অনুচরের হাতে সঁপে দিতে হবে? কিন্তু ফৈজীর জন্যে যে আকাঙ্ক্ষা তার হৃদয়ের স্তরে স্তরে কামনার সঞ্চার করেছে, তা স্তিমিত হবে কেমন করে? ফৈজী অনিচ্ছা প্রকাশ করলে সে যে উন্মত্ত হয়ে উঠবে। উত্তেজনায়

কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে যাবে ! তবে কি তাকে আওরতের রক্তে হস্ত কলুষিত করতে হবে ? —না-না এ অসম্ভব। তার চেয়ে ফৈজীকে দেখবার আগেই তাকে বিদায় করে দেওয়া ভাল। দেখার পর যদি কামনা আরও তীব্র হয়, তখন যে ত্যাগ করবার মোহ নষ্ট হয়ে যাবে। তখন বলপ্রয়োগ করতে হবে। রমণী নিজের ইচ্ছায় এগিয়ে না এলে সে রমণীকে বলপূর্বক গ্রহণ করে সুখ কোথায় ? উভয়ের ইচ্ছায় যে মিলন সাধিত হয় তার রূপ চন্দ্রিমার নির্মল স্বর্ণ-ভার দ্যুতি। ফৈজী কী তাকে ভালবাসবে না ? মহব্বত না পেলে মরদের দিলের শোণিতে যে আগুনের প্রলেপ লাগে না। তাহলে ফৈজীকে জয় করার আনন্দ তার চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আজ সমস্ত মুর্শিদাবাদ যার রূপের ঈর্ষায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। যখন তারা জানবে, সিরাজ সেই ফৈজীকে অধিকার করতে পারে নি, ফৈজী ভাবী নবাবকে অবহেলা করেছে, তখন তারা কি মনে করবে ? হয়ত আনন্দে আহ্লাদিত হয়ে আসমানের জমীনে অট্টহাসি ছড়াবে। একটি সৌভাগ্যবান পুরুষ একটি হুরীর মতো আওরতের কাছ থেকে অপমানিত হয়েছে। আর সেই সৌভাগ্যবান পুরুষ বাংলার ভাবী নবাব সিরাজউদ্দৌলা। তাকে অপমান করেছে একটি খুবসুরত নর্তকী বাইজী।

কেমন যেন চিন্তাটা সিরাজকে আক্রমণ করে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। হঠাৎ পাশ থেকে কে ডাকতেই চমকে উঠল।

হুজুর রংমহলে বহু মেহমান আদমী আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সিরাজ বাঁদীর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল সময় হয়ে গেছে। আসর সরগরম। তাই কোন উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি আসরের দিকে এগিয়ে চলল।

●
● ●

অদ্ভুত সিরাজের রংমহল। সিরাজ দ্বিতীয় সৌন্দর্যপ্রিয়। এক মোগল বাদশাহ শাহজাহান ছিলেন সৌন্দর্যপ্রিয়, আর বাংলার ভাবী নবাব সিরাজ। দুজনের মিল যেন অদ্ভুত। মুর্শিদাবাদের দ্বিতীয় নবাব সুজাউদ্দীনেরও সৌন্দর্যপ্রিয়তা ছিল কিন্তু সিরাজ তাঁর সেই প্রীতিকে অনেক পরিমাণে অতিক্রম করেছে। সৌন্দর্যপ্রীতি অনেক সময়ে বিলাসিতার সঙ্গে মিশ্রিত থাকলেও, বিমল সৌন্দর্যপ্রীতি স্বর্গীয় দান। সিরাজের হৃদয় বিলাসাবরণে আচ্ছাদিত থাকলেও স্বাভাবিক সৌন্দর্যপ্রীতি তার সমস্ত কিছু আবরণোন্মুক্ত। তার প্রমাণ এই হীরাঝিলের সৃষ্টি। হীরকস্বচ্ছ সলিলরাশির দর্পণে অপরূপ কারুকার্য শোভিত প্রাসাদচত্বর।

আর এই রংমহলেরও তুলনা হয় না। আজ আবার সেই রংমহলকে বিশেষ কায়দায় সজ্জিত করা হয়েছে। রংমহলের অভ্যন্তরে বড় বড় থামের দেহ, রেশমী জরির কাজ করা সার্টিনের জামা পরানো। ছাদের খিলান থেকে ফুলের ঝুড়ি নেমেছে। স্থানে স্থানে ফুলদানীতে নানান ফুলের স্তবক। সমস্ত রংমহলটি ঘিরে

বেলজিয়ামের দর্পণের প্রতিচ্ছবি। তার ওপর ঝাড়ের আলোর রশ্মি পড়ে হাজারো রোশনাই। এ আলোও এখানে পর্যাপ্ত নয় আরও আলোর ব্যবস্থা আছে, সে আলো জ্বালার জন্যে কয়েকজন বাঁদী মোতায়েন হয়ে আছে।

সিরাজের পূর্ব ব্যবস্থা মতো কাজ এগিয়ে চলেছে।

রংমহলের প্রাঙ্গণে সাদা মর্মরের মেঝের ওপর দামী কাশ্মীরী ফরাস পাতা, তার ওপর রক্তবর্ণের মখমলের ঘেরাটোপ। আসর বসেছে তার ওপর। এক পাশে বাদ্যযন্ত্রের সম্ভার। মালবকৌশিক রাগে আলাপ চলেছে। বীণে ঝাঁপ-তালের বোল উঠেছে তবলায়, নিখুঁত একটি বনিয়াদী উচ্চাঙ্গের আসর। সিরাজ যে গানের সমঝদার, এই আসরই তার প্রমাণ।

এক পাশে বসেছে সরাবের আসর। সঙ্গে আছে বহু খুবসুরত অগ্নিসম্ভবা, আগুনের মতো রূপ নিয়ে তারা সরাবের পানপাত্র ভরছে। আজ সেজেছে নর্তকীরা নতুন এক অপরূপ সাজে। এ সাজের বহর হীরাঝিলে কখনও দেখা যায়নি। নর্তকীদের আজ পেশোয়াজ ওড়না—সলমার কাজকরা কুর্তি পরা, মুর্শিদাবাদী রেশমের কাজ করা সার্টিনের ঘাগরা। বক্ষের কাঁচুলি ভেদ করে গোলাপ সৌন্দর্য লোলুপ হয়ে মরদের সরাবের নেশাকে আরও গাঢ় করেছে। নাচ শুরু হয়ে গেছে। নাচছে ফৈজী না, অন্য একটি নয়া খুবসুরত মাসুম লেড়কী। তবলায় চৌদুনের জলদ। নর্তকীর পায়ের ঝংএর সূক্ষ্ম একটা নিক্কণের তান সৌরভের মতো বাতাসে খেলা করছে। উড়ছে মেয়েটির ওড়নার দোপাট্টা। কোমরের ঘাগরা নৃত্যের তালে লাট্টুর মতো ঘুরছে। দেখা যাচ্ছে পায়ের পাতা থেকে উরুর খাঁজ পর্যন্ত। দুধে আলতা গাত্রবর্ণের ওপর প্রকট রক্তের ছাপ। অপরূপ লাগছে নিম্নাঙ্গটি। দুলছে, দুলছে, কেমন যেন সারা দেহটি ছন্দময় হয়ে মোহাবিষ্ট হয়ে গেছে। মোসাহেবেরা সরাবের খুসবাই আতরের নেশায় ঢুলু ঢুলু!

সিরাজ এসে আসরে বসল। তার আর অন্য নর্তকীর নাচে মন ভরছিল না। তাই ইচ্ছে করেই একটু দেরি করে আসরে প্রবেশ করল। সিরাজ বসতেই একটি মৃণাল বাহুর পদ্মকলির মতো আঙুলের বন্ধনে একটি স্বর্ণভৃঙ্গার পূর্ণ গুলাবী সরাবের পাত্র এগিয়ে এল। সিরাজ তা গ্রহণ করল না, হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সুন্দরীকে বলল—সুকৃরিয়া! বলে সে তার স্বাভাবিক হাসি ছড়িয়ে দিল।

পাশ থেকে একজন মোসাহেব একটু কৌতুক করে বলল—কি বাবা, ভাবী নবাব কি এবার সরাব রাণীকে বিদায় জানালেন?···আমরা তাহলে যাই কোথায়? লোকটির কণ্ঠে হেঁচকি উঠে আর তাকে কথা বলতে দিল না।

কিন্তু গোলমাল কেউ চায় না, একজন বক্তা মোসাহেবটির মুখে হাত চাপা দিয়ে তাকে রোধ করে দিল। নাচ তখন সমাপ্তির দিকে। নর্তকী বেসামাল হয়ে পড়েছে। তার আর পা চলে না। কিন্তু সমঝদারের কেয়াবাতের ঠেলায় তার দেহের মধ্যে রক্ত চাঞ্চল্য। সে বাহবা পেয়ে আরও উৎসাহী হয়ে উঠেছে।

সাবাস!

নাচ জমে গেছে। নর্তকীর দেহের নিটোল ভাঁজের ওপর হাজারো চঞ্চলতা। উড়ন্ত ঘাগরার নীচে লোলুপ দৃষ্টির শতচক্ষু নগ্নসৌন্দর্য উপভোগ করতে চায়।

হঠাৎ জমাটি আসরের বুক কাঁপিয়ে প্রতিধ্বনি হল—খামোশ !

সমস্ত আসর মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ বিরাট হট্টগোল বেলুনের মতো নিশ্চুপ হয়ে যেতে সকলে ভয়ে ভয়ে সিরাজের মুখের ওপর তাকাল। সিরাজ গম্ভীরভাবে বাজনাদারদের নির্দেশ দিল অন্য বাজনা বাজাতে। তারপর দণ্ডায়মান বাঁদীকে হুকুম দিল—ফৈজী !

নেশা সবাই করেছে। সবারই চোখে গুলাবী সরাবের নেশার মৌজ; শুধু ভাবী নবাবের চোখে নেশার আমেজ নেই। সে এতক্ষণ যা নেশা করেছিল ফৈজীকে দেখবার জন্যে সে নেশা তার ছুটে গেছে। তাই সে আর সরাবের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেনি। দেখতে চায় সরাব পান করে নেশা না হলেও ফৈজীর দর্শনে নেশা হয় কি না ? এমন আওরত পৃথিবীতে আছে কিনা, যে সরাবের মাদকতার চেয়েও আরও জোরালো, আরও মৌজের মতো। সেই পরীক্ষার জন্যেই মনে মনে সিরাজ সঙ্কল্প করেছে সে আর সরাব পান করবে না। ফৈজীকে দেখবার পর যদি দেখে সরাবের চেয়েও ফৈজী আরও নেশার উপাচার, তাহলে ফৈজী থাকবে বুকে, সরাব চিরতরে বিদায় নিয়ে হীরাঝিল প্রাসাদ থেকে চলে যাবে।

হঠাৎ রংমহলের সমস্ত আলো নিভে গেল। বাদ্যযন্ত্রের জোরালো শব্দ নিস্তব্ধ কক্ষের মধ্যে যেন মায়ামোহ বিস্তার করল। সবাই প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে। সিরাজ নিঃশ্বাসরুদ্ধ। তার বুকের মধ্যে যেন যুদ্ধের দামামা। এমনি উত্তেজনা সে রমণী দর্শনের জন্যে কখনও অনুভব করেনি। অথচ এ আয়োজন তারই আদেশের ফলাফল। ইচ্ছে করলে ফৈজীকে সে অনেক আগেই অধিকার করতে পারত। কিন্তু এই রংমহলে এই পরিবেশে তাকে দেখার সাধ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে যেত। রক্তস্রোতে সমুদ্র তুফান আর জাগত না।

দূর থেকে ভেসে উঠছে ঘুঙুরের রুণুঝুণু ধ্বনি। মৃদুল ছন্দে কে এগিয়ে আসছে রংমহলের মধ্যখানে। কে ? কে ? কে সে ? সে কি আজকে এই রংমহলে সমস্ত মরদের বুকের হৃৎপিণ্ডে দোলা জাগাতে পারবে ? দুমড়ে, মুচড়ে দিলগুলি গুঁড়ো করে দিতে পারবে ? অন্য আওরতের ঈর্ষার বস্তু হয়ে তাদের বিস্ময় কেড়ে নিতে পারবে ?

রংমহলের সহস্র জোড়া চোখের বিস্ময়ের তিমিরে সিরাজ যেন আরও হতচকিত। ফৈজী আসরের মাঝখানে এসে থেমেছে। বাদ্যযন্ত্র হঠাৎ খুব জোরে বেজে উঠল। সারেঙ্গীতে বসন্তরাগের মূর্ছনা। তবলায় খটাখট্ শব্দ। সোম, তাল, ফাঁক স্পষ্ট হয়ে উঠল। কে যেন হঠাৎ অন্ধকারে সেই বাজনার তালে তালে লাট্টুর মতো নেচে উঠল ঘুরপাক্ খেয়ে।

আলো জ্বলে উঠল। রংমহলের ঝাড়গুলোর পলতোলা কাটগ্লাস যেন উত্তেজনায় নড়েচড়ে উঠল। শব্দের অনুরণন উঠল। দিনের মতো আলোর

রোশনাই। রাতের তিমিরে সে আলো যেন স্বপ্ন। সেই আলোর চেকনাইতে—সামনে ওকি? যেন আর একটি জোরালো আলোর স্তম্ভ সমস্ত আলোর দ্যুতিকে ম্লান করে দিয়েছে।···মুক্তাভস্ম মেশানো তাম্বুলের গাঢ় লালিমা ভেদ করে গোলাপী আভা। পায়ের ছন্দে ছন্দে ফুটে উঠছে রক্ত কমল, চোখের চাউনিতে বিকশিত হচ্ছে কত হৃদয় শতদল। তন্বী, সুন্দরী ফৈজী! ওজন মাত্র বাইশ সের। শরীরে তার ক্ষুব্ধ তওফাওয়ালীর আদিম রক্ত। বন্য কুরঙ্গীর মতো তার চটুল চাউনির দিকে তাকিয়ে সিরাজের শ্বেতকপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল।

ফৈজী নাচছে। অর্ধনগ্ন দেহের কাঁচুলি ভেদ করা যৌবনরাজ্যে সহস্র মাতন। কোন ওড়নার বাঁধন দিয়ে সে লজ্জা কবরিত হয়নি। লোলুপ হয়ে তাই উঁকি মারছে বুকের দুই সুউন্নত গোলাকার প্রবাল। দুলছে নাচের তালে মৃদুল ছন্দে। সমস্ত ঘরের মদিরাচ্ছন্ন কামুকের দল দেখছে ক্ষুধিত চোখে। জিহ্বায় তাদের লালার আভরণ।

সিরাজও দেখছে ফৈজীকে। বিশ্বাস করেছে রূপের চমকদারি। ফৈজীর মতো হীরকের রোশনাই যে কোন আওরতের আছে, সিরাজ আর বিশ্বাস করে না। বাংলার নবাব, দিল্লীর বাদশাহ, তামাম হিন্দুস্তানের কোন রাজার ঐশ্বর্যও ফৈজীর জৌলুসের কাছে লাগে না। সাত রাজার ঐশ্বর্য একত্র করে ফৈজীকে তার বিপরীতে রাখলে যেন ফৈজীই জিতবে। কৃশকায় দেহের সবচেয়ে সৌন্দর্য, তনুর অদ্ভুত ছন্দময় নিটোল বাঁধুনি। বীণা-যন্ত্রের নিম্নাংশ নিন্দিত ভারী নিতম্বের দুপাশ দিয়ে নিটোল মাখন পায়ের জোড়া, যেন হাঁসের পায়ের মতো। ক্ষীণ কটি মেখলার মতো সরু কোমর। একটুখানি বুক, কিন্তু বুকের যৌবনস্তম্ভে সমুদ্র তুফান বিদ্রোহী উত্তালতা। যেন কেউ দুই থাবা সমুদ্রের ফেনা বক্ষের দুইপাশে জমা করে দিয়েছে। মসলিনের কাঁচুলির বন্ধন সেখানে কিছু নয়। ক্ষুব্ধ যৌবন প্রবাহ যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে বাঁধন মানবে না, ছিঁড়ে খুঁড়ে সমস্ত লয় করে দিয়ে চলে যাবে। টিকালো নাক, টানা টানা দুটি ডাগর সুরমালাঞ্ছিত কাজল কালো চোখ, চোখের মধ্যে বালকুণ্ডার মরুপ্রান্তরে পথহারা হরিণীর নীরব আকুতি; কামনার দ্যুতি। দুটি ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ন নরম সরম গোলাপী পাতলা অধর, মুক্তার মতো দাঁতের সারি। হাতীর দাঁতের মতো শুভ্রতার রোশনাই নিয়ে ফৈজী হাসছে। হাসছে খিলখিল করে। নাচতে নাচতে সে সিরাজের সামনে এসে দেহটা দুলিয়ে দিচ্ছে সিরাজের কোলের ওপর। সিরাজের কোলে শুয়ে পড়বার মতো ভঙ্গি করে বার বার নিজেকে এলিয়ে দিচ্ছে।

সুরাবের পানপাত্র বাঁদীরা পরিবেশন করে চলেছে। কিন্তু সে সরাবে কারুর স্পৃহা নেই। তাই সবাই ঠেলে দিচ্ছে সরারের গুলাবী খুসবু। কক্ষের মধ্যে আতরের সৌরভ নাকের মধ্যে ঢুকে ঝিম্ হয়ে গেছে। ফৈজী যেন আতরদান, তার দেহ সুবাসে সমস্ত রংমহল মাতোয়ারা। বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি আরও প্রকট হয়ে উঠেছে।

আসমানের জমিনে চাঁদের রুপোলী আলো। হীরাঝিল রংমহলের গবাক্ষ দিয়ে

ঝিলের জল, তার ওপাশে ভাগীরথীর উন্মত্ত স্রোতের কানাকানি সবই দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। কিন্তু রংমহলের সবার দৃষ্টি একই দিকে নিবদ্ধ। এখনই যদি কেউ কাউকে হত্যা করে, রক্তের নদী রংমহলের ফরাসের বুক রক্তাক্ত করলেও—কেউ ফিরে তাকাবে না। প্রত্যেকেরই বুকের মধ্যে উত্তেজনা।

কিন্তু সবার উত্তেজনা বেওয়ারিস কামনা নিয়ে বাতাসে ফুৎকার দেবে, শুধু সিরাজ এই অমূল্য ঐশ্বর্যের একমাত্র অধিকারী। তাই সে ভাবছে অনেক কিছু। কিন্তু তার ভাবনাতে স্থিতি নেই, কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন নেশায় চোখ বুঁদে যাচ্ছে। চোখ জুড়ে আসছে আবেশে। রক্ত যেন সমস্ত মাথার ওপর উঠে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। কি দারুণ উষ্ণতা সেই রক্তে ?

সিরাজ বার বার ফৈজীর সমস্ত ঘূর্ণায়মান দেহটি স্পষ্ট করে দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু বার বার দৃষ্টি স্থির করে রাখতে গিয়েও হারিয়ে গেল, পারল না ধরে রাখতে। দুটি চোখের মেদুর চাউনি। পদ্মের মতো শতদল বিকশিত ছোট্ট পা দুখানি ফরাসের ওপর চরকির মতো ঘুরছে। এক ঝলক রক্তপিণ্ড যেন ফরাসের ওপর চলন্ত হয়ে উঠেছে। সিরাজ দৃষ্টি উর্ধ্বগামী করে না রাখতে পেরে পায়ের পাতা দেখতে লাগল। তারপর দৃষ্টিটা অল্প অল্প করে হাঁটুর ওপর তুলে দিল। সিরাজের চোখে যেন কেমন সরম জড়োসড়ো চাউনি। বহুভোগ্য মরদ আজ হার স্বীকার করছে। যেন নয়া যৌবনপ্রাপ্ত নওজোয়ান জোয়ানী মাসুম লেড়কীর উন্মুক্ত হাঁটুর দৃশ্যশোভা দেখে পুলকে শিউরে উঠছে। ঘাগরা ঘুরছে ফৈজীর। দেখা যাচ্ছে ঘাগরার অভ্যন্তরের অনেক দূর, দুটি পায়ের উর্ধ্বসীমান্তে মিলনের জায়গা পর্যন্ত যেন উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। উন্মুক্ত হয়ে যাবে যেন আওরতের মাসুমী ইজ্জতের ঐশ্বর্য। সিরাজের চোখ শেষপর্যন্ত গিয়ে কেমন যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আর ওঠবার শক্তি নেই তার। মাথাটা আর তুলতে পাচ্ছে না সে। রক্ত যেন চঞ্চলতার উর্ধ্বে উঠে শেষ মার্গে গিয়ে পৌচেছে। এবং রক্তস্রোতে গলগল করে ধারা বয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়বে কিংবা জমাট বেঁধে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে।

সিরাজ বারকয়েক চেষ্টা করল চোখ দুটি উর্ধ্বগামী করবার জন্যে। কিন্তু ফৈজীর চোখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে যেতেই চোখ সরিয়ে নিল। সে চটুল চাউনির মদিরচ্ছটা ছড়িয়ে সুন্দর দন্তপঙ্‌ক্তি মেলে হাসছে। হঠাৎ ফৈজীর পায়ের কাছে সিরাজের সামনে শব্দ করে কে যেন একগাদা মোহর আশরফি-জহরৎ ছড়িয়ে দিল। আসরের সকলে নড়েচড়ে উঠল—আর কেউ কেউ কণ্ঠের মুক্তার মালা ছড়িয়ে দিল। ফৈজী প্রথম যে মোহর ছুঁড়েছিল তার দিকে কটাক্ষে তাকাল। সিরাজও একবার ঈর্ষার দৃষ্টি নিয়ে সেই দিকে লক্ষ্য করল। মীরজাফর আলি খাঁকে দেখে হঠাৎ তার চোখ দুটি রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ফৈজী জাফর আলি সাহেবকে কুর্নিশ করছে দেখে সিরাজ প্রচণ্ড শব্দে চীৎকার করে উঠল—খামোশ !

সমস্ত আসর মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। বাদ্যযন্ত্রকাররা বাজনা থামিয়ে ফেলল। ফৈজী নাচ থামিয়ে ভ্রূকুটি করে সিরাজের দিকে তাকিয়ে রইল।

আবার সিরাজ আমীর, ওমরাহ, মোসাহেব, অনুচরদের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠল—নিকালো সব হিঁয়াসে! আভি নিকালো।

কারুর মুখে কোন কথা নেই। আস্তে আস্তে আসর ফাঁকা হতে লাগল। পেশোয়ারী নাগরা পায়ে দিয়ে প্রায় অভ্যাগতরা প্রমোদকক্ষ ত্যাগ করল। মীরজাফর আলি খাঁ, পরণে তার জরির ওয়াশকিট, কুর্তির হাতে সাচ্চা জরির কাজ করা কল্‌কা, কিস্তী টুপিতে মসলিনের কাজ। গিলেদার কুর্তি আলিগড়ি সালোয়ারে মানিয়েছে ঠিক নবাব, বাদশার মতো। ফৈজীর কাছে এসে ঠোঁটে মৃদুহাসির রেখা টেনে জাফর আলি সাহেব মৃদুস্বরে বললেন—তোফা নাচ দেখিয়েছ বিবিজান!

আবার চীৎকার করে উঠল সিরাজ—মোহনলাল!

বাকী কথা শেষ না করে মীরজাফর ফৈজীর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল। ফৈজীও জানাল জাফর সাহেবকে কুর্নিশ।

সমস্ত রংমহল ফাঁকা হয়ে গেল।

সিরাজ বসে থাকল ফরাসের ওপর গুম হয়ে। ফৈজী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রংমহলের দৃশ্যশোভা দেখতে লাগল। ঝাড়ের আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে যেন মিটিমিটি হাসতে লাগল। মাঝে মাঝে অবশ্য সে সিরাজের দিকে আড়চোখে তাকাতে লাগল।

আর সিরাজ ভাবছে কাজটা কি ভাল হল? নিমন্ত্রণ করে আমীর, ওমরাহ, মনসবদারদের ডেকে এনে এমনি করে অপমান! এতে যে তার দুর্বল দিকটাই প্রকাশ হয়ে গেল। দাদু আলিবর্দীর দরবারের বহু মেহমান আদমীকে সে ইচ্ছে করেই তার রংমহলে নিমন্ত্রণ করেছিল। তাদের দেখাতে চেয়েছিল সিরাজের দুঃসাহস। দুপুরে দাদুর কাছ থেকে তাঁর লোকেদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনে এই দুঃসাহসিক আয়োজন। ফৈজীকে তাদের দেখিয়ে আরও পাগল করতে চায় বলেই নাম ধরে ধরে আমীর ওমরাহদের সিরাজ নিমন্ত্রণ করেছিল।

কিন্তু ঐ মীরজাফর আলি সাহেবই যত বেইমানী করল! লোকটির স্পর্ধা যে দিন দিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, তাকে আর এগোতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু দাদুর জন্যেই যত গোলমাল। দাদুর সৎভগ্নী শাহ খানানের সোহাগকে কেড়ে নিলে দাদু নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করবেন না। অথচ ফৈজীর প্রতি কেউ হাত বাড়াতে সাহস করল না; কিন্তু মীরজাফর আলি খাঁ এগিয়ে এল। এত বড় স্পর্ধা! সে চায় সিরাজের আনন্দকে চোখের সামনে থেকে কেড়ে নিতে? এমনি করে কি কোন দিন নবাবী সিংহাসনটাও কেড়ে নেবে না?

না-না এ অসম্ভব! বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ভাবী নবাব কখনও এই বরদাস্ত করবে না। এর সাজা অবশ্যই দেবে সিরাজ। না'হলে সে ভীরু, কাপুরুষ, তার শোণিতে যে বীরের রক্ত নেই প্রমাণ হয়ে যাবে। তামাম মুর্শিদাবাদের সমস্ত লোক সিরাজের আড়ালে তাকে নিয়ে কানাকানি করে উপহাসের মালা গাঁথবে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সিরাজ, হাতে তালি মেরে বাঁদীকে আহ্বান করল, বাঁদী

এলে ফৈজীকে নির্দিষ্ট ঘরে পাঠিয়ে দেবার জন্যে আদেশ দিয়ে সে দ্রুত স্থান পরিত্যাগ করে চলে গেল।

সিরাজ দেখল না ফৈজীর দিকে কিন্তু ফৈজী ডাগর দৃষ্টিতে সিরাজের চলে যাওয়া পথের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়েছিল। বাঁদী এসে কুর্নিশ করে তাকে বলল—চলিয়ে বিবিসাহেবা, জনাব তোমাকে পৌছে দিতে বলেছে।

ফৈজী বাঁকা ভুরু তুলে বাঁদীর দিকে তাকিয়ে বলল—তোমাদের যুবরাজ বহু আওরৎ নিয়ে মহব্বতের রোশনাই জ্বালে, না!

বাঁদী ফৈজীর কথায় চমকে উঠল, বলল—মাপ কিজিয়ে বিবিসাহেবা, ঐসী বাত বললে কসুর হোয়ে যাবে। যুবরাজ শুনলে বিলকুল কোতল করে দেবেন।

ফৈজী বাঁদীর কথায় অল্প একটু হাসল, তারপর বলল—চল কোথায় যেতে হবে।

বাঁদী ফৈজীকে এনে সিরাজের রাত্রের শয়নকক্ষের দরজার সামনে হাজির করল। তারপর তাকে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। এসব ব্যবস্থা হীরাঝিলের বাঁদীরা জানত, তাই এসব আচরণে তাদের ভুল হবার নয়।

ফৈজী অতটা বুঝতে পারে নি কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভাবল, বোধ হয় সারাদিনের মতো আবার তাকে রাত্রেও কোন কক্ষে বন্ধ থাকতে হবে। এখানকার কিছুই সে বুঝতে পারছে না। কতই বা বয়স তার, যৌবন পেতে পেতেই কাঞ্চনবালা হবার জন্যে মোগল বাদশাহ হারেমে নীত হয়েছিল। লক্ষ্ণৌ থেকে দিল্লী। দিল্লীতে গিয়ে কখনও সে প্রাসাদের বাইরে যায় নি। শুধু হারেমের রংমহলের বাইরে থেকে একচিল্‌তে আসমানের জমিন দেখেই তাকে ক্ষান্ত থাকতে হয়েছে। আর দেখেছে প্রচুর হীরাজহরৎ মণি-মুক্তার ছড়াছড়ি। তাল তাল স্বর্ণের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে নৃত্য করেছে। সকলে বলত, তার রূপ নাকি সমস্ত মরদের কামনা, আওরতের ঈর্ষা। সে কতদিন বাদশাহী কক্ষের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অবয়ব দেখেছে এবং বিস্ময়ে ভেবেছে—সত্যিই কি তার রূপ অপরূপ?

বাদশাহের সামনে তাকে নাচতে হত। মাঝে মাঝে সরাবের পাত্র বাদশাহের হাতে ধরিয়ে দিতে হত। বাদশাহ একটু তার দিকে তাকিয়ে হাসতেন। ব্যস্, সেই পাওয়াটুকু নিয়ে তার এতদিন কেটেছে। মরদের স্পর্শসুখের কি মাদকতা, তার আস্বাদন কি? মরদের স্পর্শ পেলে মাসুম লেড়কীর হৃদয়ের শোণিতে কিসের মাতন ওঠে—এসব কিছুই জানত না ফৈজী। তবে অনুভূতিটুকু বোঝার মতো উপলব্ধি একদিন হঠাৎ হয়েছিল। একদিন বাদশাহের এক আত্মীয় হারেমের এক অন্ধ প্রকোষ্ঠের আড়ালে তাকে সবলে আকর্ষণ করেছিল, অধরে অধর দিয়ে রক্তিম করে দিয়েছিল মুখমণ্ডল। সে সময় দিলের মধ্যে কিসের যেন আলোড়ন অনুভূত হয়েছিল। কেমন যেন ভেতর থেকে পুলকের স্রোত কণ্ঠ বেয়ে উঠে আসতে চেয়েছিল। ······তারপর আরও অনেক পরে জেনেছিল, আওরতের জীবনের সোহাগ মরদের

স্পর্শসুখ। মরদের মহব্বতের স্পর্শ পেলেই আওরৎ জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়ে যায়। সেদিন সেই মরদ খোজা প্রহরীর তাড়ায় ভীত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার পরবর্তী যারা এসেছিল ফৈজীর জীবনে, ফৈজীকে তারা সুখের পেয়ালা ভরিয়ে যৌবনের তপ্ত উচ্ছ্বাস স্তিমিত করে দিয়েছিল। তারপর থেকে তার সাহস সংযোজিত হয়। সে জানতে শিখেছিল, রূপের খোয়াব কি? মরদকে পতঙ্গের মতো আলোর পাশে ঘুরিয়ে মারতে তার বুদ্ধির চাতুরী দিল্লীর হারেমেও মেলে দিয়েছিল। সেইজন্যে তার ভয় নেই সে নির্ভয়। সে পণ্যা নয় কিন্তু তার রূপের সৌরভে মাতোয়ারা হয়ে যে ডুবতে চায় তাকে ডোবাতে তার ক্ষমতা অসীম।

মুর্শিদাবাদের ভাবী নবাব সিরাজের কথা সে সুদূর দিল্লীতে বসেই শুনেছিল। এবং এও শুনেছিল—দিল্লীর বাদশাহের চেয়ে বাংলার এই নবাববংশের এই সন্তানটি হীরাঝিল নামে এক প্রাসাদ বানিয়ে সেখানে রূপের হাট বসিয়েছে। এই প্রাসাদেই যাবার জন্যে বাদশাহ তাকে আদেশ দিয়েছেন।

একটি কৌতূহল ছিল। বাংলার এই ভাবী নবাবকে দেখার জন্যে নয়, যে পুরুষ বহু আওরতের হৃদয় অধিকার করে তৃপ্ত—সে তাকে চায়? খানিকটা বিস্ময় বৈকি? কোন ঐশ্বর্যের সিংহাসনে বসিয়ে এই ভাবী নবাব তাকে পূজা করতে চায়? দেখল রংমহলের সমস্ত আলোর সামনে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত যুবা পুরুষকে। কিন্তু দেখে সে খুসী হতে পারল না। দিল্লীর বাদশাহকে সে দেখেছে, তিনি বয়েসে প্রবীণ, এবং তার গাম্ভীর্য বাদশাহের সমতুল্য। ভাবী নবাবকে দেখে মনে হল, সে যদি কোনদিন নবাবী তখ্‌ত পায় তাহলে কখনও ধরে রাখতে পারবে না। এক লহমায় যতটুকু দেখা যায় তার মধ্যেই তার বিচার তৈরি হয়ে গেছে। বয়েসে অল্প একটি তরুণ নওজোয়ান শুধু আওরতের দেহভোগের কামনা নিয়ে ঈর্ষান্বিত। আসরে যেরকমভাবে মেহমান আদমীদের হঠাৎ অপমান করে বসল তাতে ভাবী নবাবকে হিংস্নক বলেই মনে হয়।

অথচ অভ্যাগতদের কোন অপরাধ ছিল না। নর্তকীকে তারিফ করবার অধিকার সবার আছে। তারিফ ছাড়া তারা যে তার বেশি বেলেল্লাপনা কিছু করে নি, তাতেই ভাবী নবাবের নিজের সংযত হয়ে কাজ করা উচিত ছিল। কিন্তু তা তিনি না করে একটি বিশ্রী পরিস্থিতির উদ্ভব করলেন। সমস্ত আসরটিকে বিষময় করে দিলেন। এই লোকটির প্রতি ফৈজীর দারুণ বিতৃষ্ণা জাগতে লাগল। ঘৃণাও সৃষ্টি হল মনে মনে। ফৈজী এসে ঢুকল একটি কক্ষে।

কক্ষটি প্রায়ান্ধকার। অল্প মৃদু আলোর যে রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে তা খুব পর্যাপ্ত নয়। দূরে বর্তুলাকার বাতিদানে আলো জ্বলছে মিটি মিটি। অনেক আলোর বন্যা থেকে হঠাৎ এসে তাই প্রথমে অন্ধকারের মধ্যেই হারিয়ে গেল। তারপর আস্তে আস্তে চোখ দুটি সহজ হয়ে আসতে কে যেন এসে ফৈজীর হাত ধরল। ফৈজী চমকে উঠে বলল—কে, মরিয়ম?

সিরাজ হেসে বলল—না ফৈজী, আমি সিরাজ।

ফৈজী হেসে তাড়াতাড়ি হাতটি মুক্ত করে নিয়ে অসহিষ্ণুকণ্ঠে বলল—এখানে আমাকে কেন আনা হল ?

কোথায় ?

এই কক্ষে !

সিরাজ শব্দ করে হেসে উঠল, বলল—কেন ভয় করছে ?

না। কিন্তু এখানে কেন ?

তোমার আগে যে সব আওরতের প্রতি যেরকম আচরণ করা হয়েছিল তাদের মতোই সম্মান দেওয়া হবে বলে ?

মানে ? হঠাৎ সর্পিণীর মতো ফৈজী ঘুরে দাঁড়াল।

আলোটা এখন একটু স্পষ্ট হয়েছিল। ফৈজী দেখতে পেল সিরাজের চোখ। ঘৃণায় তার শরীর রি রি করে উঠল। সে চোখে ক্ষুধিত শ্বাপদের চাউনি।

ফৈজী ঘৃণামিশ্রিত স্বরে বলল—বলপ্রয়োগ করে অধিকার করতে চান নাকি ?

না, সিরাজ স্পষ্টস্বরে বলল—মহব্বতের রোশনাই দিয়ে তোমাকে জীবনভোর আপন করে রাখতে চাই।

এর আগে তো বহু আওরতকেই একথা বলেছেন, আবার আমার কাছে পুনরাবৃত্তি করছেন কেন ?

বহু আওরৎকে যে কথা বলেছি, তাদের বলতে হয় বলেই বলেছি কিন্তু তোমার কাছে ঝুটা বাত্ বলছি না।

প্রমাণ !

আল্লার কসম।

আল্লার ওপর আপনার বিশ্বাস আছে ? যদি থাকত তাহলে নিশ্চয় এতগুলি আওরতের সর্বনাশ করতেন না।

সিরাজ বিস্ময়ে বলল—এসব কথা তোমাকে কে বলল ?

নিশ্চয় আপনার বাঁদীরা নয়! তারা আপনার কোতলের ভয়ে এসব কথা কখনও প্রকাশ করবে না আপনি জানেন। আমি জেনেছি দিল্লীর বাদশাহের হারেমে বসেই বাংলার ভাবী নবাবের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পরিচয়। তামাম হিন্দুস্তানের লোক যে আপনার চরিত্রের তারিফ করে—এ কথা কি আপনি জানেন না ?

সিরাজ যেন কেমন অবশ হয়ে যেতে লাগল। কোন আওরৎ এ পর্যন্ত এমনি স্পর্ধাভরে তাকে এমনি অপমান করে নি। দেখায়নি তার চরিত্রের দুর্বলতা এমনি অকপটভাবে। এমনি অকপট স্বীকারোক্তি করতে পারে লুৎফা। সে বললে সহ্য করা যায়। কিন্তু সে কখনও প্রতিবাদ করে না। 'সে বলে, যদি কোনদিন তোমার চঞ্চলতা স্তিমিত হয় সেদিন তুমি আমারই হবে।' কি সুন্দর অর্থবোধ দিয়ে তার মহব্বতের বিচার। আর আজকে এই স্পর্ধিত রমণী, যাকে পাওয়ার কামনা সারাদিন ধরে তাকে সাপের ছোবল মেরেছে, সে এখন এসেছে তত্ত্বকথা শোনাতে। আর

দুর্বল সিরাজ একটা ক্রয় করা আওরতের কাছ থেকে শুনছে তার জীবনকাহিনী। সে কী তবে সত্যিই দুর্বল হয়ে পড়ল? না, ফৈজীর সঙ্গে মহব্বত করবার জন্যে তার স্পর্ধিত বাক্যবাণ নীরবে হজম করছে? মহব্বত! মনে মনে সিরাজ নিজেকেই উপহাস করে উঠল। বহুভোগ্য নর্তকী যে দিল্লীর বাদশাহের বাহুপাশ ছেড়ে একলক্ষ টাকার বিনিময়ে চলে এল—তার কাছ থেকে মহব্বত? এ কি লুৎফার মতো সবাইকে সিরাজ সেইরকম মনে করছে নাকি! কিন্তু হঠাৎ একে ভালবাসবারই বা ইচ্ছা জাগল কেন? রূপ আছে বলে? যৌবনের চমক মনকে ধাঁধায় বলে? কিংবা সিরাজের দেখা সমস্ত আওরতের চেয়ে ফৈজীর স্বাতন্ত্র্য সবার ওপরে মনে করে সে এমনি দুর্বলতা প্রকাশ করছে? সিরাজ বুঝতে পারল না, কেন সে পূর্বের মতো বলপ্রয়োগ করছে না?

শুধু বলল—জানো আমি ভাবী নবাব। নবাবী ইজ্জতকে বজায় রাখতে আমার বিলাসিতা করাই শোভা পায়। কেন হিন্দুস্তানের বাদশাহ কি তাঁর চরিত্রের নিশান ভুলে একটি আওরতের মধ্যেই বাঁধা আছেন?

ফৈজী কথা বলল না কিন্তু সিরাজের সামনে থেকে সরে গিয়ে সে বন্ধ দরজার দিকে এগোল। সিরাজ পথ রুখে দাঁড়াল। এবার কিন্তু সে আর সংযম ধরে রাখতে পারল না। যে স্বর কিছুক্ষণ আগে সমস্ত রংমহল কাঁপিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল সেই স্বরে সিরাজ চীৎকার করে উঠল—খাঁমোশ, বেসরম আওরৎ! একলক্ষ টাকা নজরানা দিয়ে যে আওরৎকে দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়ে এসেছি, তার মুখ থেকে জাদা জাদা বাত্ আমি শুনতে চাই না। সামনে ঐ মেহগনি পালঙ্কের নরম সুখশয্যা। আজকের রাতে ভাবী নবাবের পাশে নিজের আওরৎ জীবনকে সার্থক করতে ঐ পালঙ্কের সুখশয্যায় ভাবী নবাবের শয্যাসঙ্গিনী হও, নয়ত তুমি চেন না নবাব আলিবর্দীর প্রিয় আদরের সিরাজকে। সে যেমনি অত্যধিক স্নেহপরায়ণ, ভয়ঙ্কর হতেও তার এক মুহূর্ত দেরি হয় না। তোমার এই অসামান্য রূপকে নিঃশেষ করে দিতে রূপের পূজারী সিরাজের এতটুকু সময় লাগবে না। তাছাড়া, যেখানে তুমি আজ আছ, সে প্রাসাদটি একমাত্র আমারই অধীনে। তুমি এ কক্ষ থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজেকে কিছুতে রক্ষা করতে পারবে না। তার চেয়ে আমার আর্জিকে সমর্থন কর—আগামীকল্য দেখবে তুমি সিরাজের সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করেছ।

সিরাজ যেন মরিয়া হয়ে উঠেছিল। বন্যপশু যেমনি তার শিকারকে খেলিয়ে খেলিয়ে নিজের এক্তিয়ারে আনবার চেষ্টা করে, সে তার সেই শিকারকে খেলিয়ে নিজের এক্তিয়ারে আনবার চেষ্টা করছিল। সারাদিন ধরে সে তার মানসিক চাঞ্চল্য অনেক কষ্টে দমিত করে রেখেছে, ফৈজীকে তার হৃদয়ে ধারণ করার কতরকম কসরৎ মনের মধ্যে সঞ্চিত করে রেখেছে এবং তার পরিণতি হবে এই সে কখনও স্বপ্নেও ভাবে নি। তামাম মুর্শিদাবাদের প্রতিটি লোক জানে, ফৈজীর মতো এক অপরূপ সুন্দরী নর্তকীর হৃদয়াধিকারের সৌভাগ্য ভাবী নবাব সিরাজেরই। অথচ এই রাত্রে

সে সৌভাগ্য ফৈজী তার ইচ্ছাকে জয়া করে একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছে, এ যে একেবারে সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত।

এমনি যে একটি পরিণতি আসতে পারে, তা যেন মনে মনে সিরাজ সন্দেহই করেছিল। কিন্তু কেন সে পরিণতি এল? কার অভিশাপ তার ওপর ফললাভ করল, যার জন্যে ফৈজী অনিচ্ছার ইমারত খাড়া করল!

হঠাৎ ফৈজী সিরাজের পায়ের কাছে বসে পড়ে অঝোর ধারায় কাঁদল। তার দুটি সুন্দর চোখের প্রান্তভাগে জলধারা। তার কান্নার শব্দ সিরাজকে পাগল করল। ফৈজী কাঁদতে কাঁদতে কাতর হয়ে বলল—মেহেরবানি করে আমার দেহটা নিয়ে যদি আপনি সন্তুষ্ট হন, তাহলে গ্রহণ করতে পারেন কিন্তু দিল চাইবেন না। আপনাকে দেখে আমার আওরৎ জীবনের মহব্বতের রোশনী জ্বলে না। আমায় মাপ করুন জনাব। আমার এই অনিচ্ছা কেন যে তা আমি জানি না।

সিরাজ বুঝতে পারল না ফৈজীর কথা। কিন্তু বুঝল, ফৈজীর কাছ থেকে মহব্বত মিলবে না। দেহ বহু পেয়েছে সিরাজ। আওরৎ জীবনে কম আসে নি। কিন্তু মহব্বত কোথায়? মহব্বতের জন্যে তার আকাঙ্ক্ষা অনেক। লুৎফা ভালবাসে, কিন্তু সে ভালবাসায় তার আগুন নেই। সিরাজের চাই আগুনের মতো মহব্বত। যে তার আগুন দিয়ে তাকে পুড়িয়ে মারতে পারবে। ফৈজী পারত। ফৈজার কাছ থেকে সে অনেক বড় আশা করেছিল। কিন্তু ফৈজী তাকে পছন্দ করল না। দেহ হয়ত তার এখুনি গ্রহণ করা যায়। কিন্তু পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে একটি অসাড় দেহের বৃত্তে অসাড় স্বপ্ন রচনা করে লাভ কি? তার চেয়ে ফৈজার পরিবর্তে অন্য একটি সামান্য আওরৎকে গ্রহণ করে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার মধ্যে অনেক সার্থকতা আছে। যাদের কাছে কিছু চাওয়ার নেই তাদের কাছে পাওয়ারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু আজকের এই অপূর্ব রাত্রির অভিসার মুহূর্তে যাকে সারাদিন ধরে সে কামনা করেছে তাকে ছেড়ে দিতে বড় ব্যথায় ম্রিয়মাণ হয়ে ওঠে, তবু সে বলে, —ফৈজী তুমি যাও। আমি তোমার মহব্বতেই রাঙা হতে চেয়েছিলাম, দেহের বৃন্তে সামান্য ইচ্ছাটুকু সার্থক করতে চাই নি। এই বলে নিজেই কক্ষের দরজা উন্মুক্ত করে অন্ধকারে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ইতিহাসকার বোধ হয় জানে না, সেদিনের সেই রাত্রি, সেই অসহ মুহূর্তটি সিরাজের জীবনের কত বড় পরীক্ষার দিন ছিল। তার চরিত্র নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু তার অন্ধকারময় দিকের আলোচনা নিয়ে যেমনি সকলে মুখর হয়ে উঠেছে, তার আলোর দিকের আলোচনা যদি কেউ করত!

সে রাত্রে ফৈজীকে পাওয়ার জন্যে তার উদগ্র কামনা তাকে সাপের ছোবল দিয়েছিল। সে দংশন পেয়ে যন্ত্রণায় সারারাত্রি ছটফট করেছে কিন্তু অপরকে দংশন করে নি। লুৎফা হয়ত সিরাজকে বুঝেছিল তাই বোধ হয় সে সিরাজকে ক্ষমা করত। কিন্তু আর কেউ ক্ষমা করল না। আর কেউ তার দিলের ভেতরটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে দেখল না? তাকে উচ্ছৃঙ্খল বলল, বিলাসী বলল,

ঘৃণা করল কিন্তু হৃদয় দিয়ে বিচার করল না। বিচার করলে হয়ত সিরাজকে বুঝতে পারত। সিরাজের অশ্রান্ত যৌবন যে পরিতৃপ্তির জন্যে পাগলের মতো লক্ষ্যে পৌছবার নেশায় মরিয়া—তার সেই লক্ষ্যপথ প্রায় মানুষের জীবনেই কাম্য থাকে, তা কেউ উপলব্ধি করল না।

সেদিন রাত্রে একটু বলপ্রয়োগ করলেই সে ফৈজীকে উপভোগ করতে পারত। কারণ ফৈজী যত আস্ফালনই করুক ; তার আস্ফালন সিরাজের কাছে তুচ্ছই হত যদি সিরাজের উদগ্র কামনার আকর্ষণ তাকে দলিত ও মথিত করত।

তাছাড়া তার কেনা মেয়েমানুষ। নীলামে লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ দিয়ে লুটে আনা একখণ্ড যৌবনোপহার। মুর্শিদাবাদের শ্যামল ধরিত্রীর বুকে ভারতের উত্তর প্রদেশের রুক্ষ মরুপ্রান্তরের মেওয়া ফলের চমক, আপেলের মতো রক্তাক্ত। আঙুরের মতো রসালো। তাকে উপভোগ করে রাতের নিস্তব্ধ প্রান্তরে সুখের সপ্তমার্গে সিরাজের অবগাহন করাই উচিত ছিল কিন্তু সে তা না করে দিলের তাড়না অনুভব করে ফৈজীর পণ্যা দেহকে সেলাম জানাল। ফৈজীর কাছ থেকে চাইল মহব্বত।

একটি বহুভোগ্যা পণ্যা বাঈজী নর্তকীর দেহের তিমিরে সে মহব্বতের রোশনী জ্বালতে চাইল। আশ্চর্য সে পুরুষ। আশ্চর্য তার কল্পনা।

পরদিন প্রভাতে বাঁদী সিরাজকে ঘুম ভাঙাতে আসতেই সে আশ্চর্য হয়ে গেল যুবরাজ ঝিলের ধারে অলিন্দের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সরাব পান করছেন। এই ভোরবেলা যুবরাজকে এ অবস্থায় কখনও সে দেখেনি, কখনও যুবরাজ এত ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন না বা সরাব পান করেন না। তবে কি যুবরাজ সারারাত নিদ্ যান নি ? বাঁদী বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগল—এর কারণ কি ?

ফৈজীকে খুঁজতে গিয়ে বাঁদী পেল সিরাজেরই সেই শয়নকক্ষে পালঙ্কের ওপর গুটিসুটি হয়ে মাথা গুঁজে শুয়ে আছে। বাঁদী দেখে মুচকি হাসল কিন্তু আসল অর্থ সে অনুধাবন করতে পারল না। ভাবল বুঝি, জনাবের যে ধর্ম, সে ধর্ম তিনি পালন করে বাইরে মুক্ত বাতাসে বিশ্রাম উপভোগ করতে গিয়েছেন—তবু অবাক লাগে বাঁদীর—সিরাজের অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে ওঠা ও সবার পান করা। এ রকম তো কখনও করেন না। তারপর নিজের মনে মনেই বাঁদী আওড়ায়—বোধ হয় জনাবের সবই বানচাল হয়ে গেছে এমনি খুবসুরত জোয়ানী আওরৎকে উপভোগ করে। জনাবকে বিরক্ত না করে সে নিঃশব্দে সরে গেল অন্যত্র।

কিন্তু যদি বাঁদী সিরাজের মুখমণ্ডল দেখত, দেখত যদি তার দুটি বহু আশাভরা

চোখের চাউনি ! সে চোখ দুটি আজ ম্লান, নিষ্প্রভ, দ্যুতিহীন। তবে কি সিরাজ সারারাত ধরে কেঁদেছে ?

সিরাজ তাকিয়েছিল রঙফেরা প্রত্যুষের মুর্শিদাবাদের দিকে। বহুকাল সে এই স্নিগ্ধ শ্যামল, সবুজ পত্রাচ্ছাদিত মুর্শিদাবাদের ছবি দেখে নি। ভাল করে এখনও পরিস্ফুট আলোর প্রকাশ হয় নি, অল্প অল্প আলোছায়ার সমন্বয়। গাছের সবুজ পাতার বুকে অল্প অল্প অন্ধকারের ছায়া। সামনে ঝিলের জলে দিনের জোরালো আলোর প্রকাশ সবে শুরু হয়েছে। ঢেউয়ের ওপর হীরের চেকনাই। অপরূপ লাগছে ঢেউয়ের সাজ। আরও দূরে ভাগীরথীর উন্মত্ত উত্তালস্রোত। কানাকানি হয়ে, ছাপাছাপি হয়ে উন্মত্ত হয়ে গেছে। ঠিক মাসুম লেড়কীর মতো প্রথম যৌবনের না বোঝা আবেগ। না বোঝা যৌবনের যন্ত্রণা নিয়ে কি যেন পাওয়ার ব্যাকুলতায় হৃদয়ের মধ্যে উত্তাল উচ্ছ্বাস। দূরে দেখা যাচ্ছে একখণ্ড সাদা মেঘের মতো পালতোলা নৌকো দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে গন্তব্যস্থানে। ভাগীরথীর অপর পার দেখা যায় না। একটা আবছা দৃশ্যের মতো গাছপালার সমন্বয়ে ধূসর একটি ছায়া। সিরাজ আকাশের দিকে তাকাল। আসমানের নীল স্বচ্ছ জমিনে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের টুকরো। সূর্যের প্রথম আলো ভাগীরথীর অপর পার দিয়ে আস্তে আস্তে রক্তিমাভা প্রকাশ করতে শুরু করেছে। সোনালী আলোর আভা দুনিয়ার চারিদিকে আলোর চুম্বনস্পর্শ দিয়ে রোমাঞ্চিত করে তুলেছে।

সিরাজের রাত্রি জাগরণ ক্লান্ত দুটি চোখের জ্বালা যেন অনেকটা স্তিমিত ও শান্ত হয়ে গেল। শান্ত হল, সান্ত্বনা পেল যেন। হীরাঝিলের রোশনীবাগের পুষ্পোদ্যান থেকে বিচিত্র ফুলের সৌরভ বাতাসে সমস্ত পরিবেশকে আনন্দ মুখর করছে। পাখীরা কিচিরমিচির স্বরে ডাকতে শুরু করেছে। কোকিলের মধুর স্বরের ডাক অনেক আগেই ডাকতে ডাকতে দূরে মিলিয়ে গেছে। এখন দোয়েল, পাপিয়া, টিঁয়া প্রভৃতির বিচিত্র শব্দ। চড়ুই বেওয়ারিশ ভাবে হীরাঝিল প্রাসাদের অলিন্দে, অলিন্দে, গম্বুজে গম্বুজে, প্রাঙ্গণের চারিদিকে ঘুরে ফিরছে। পায়রার বকবকুম শুরু হয়েছে। মুখর হয়েছে ভোরের স্তব্ধতা।

বসন্তকালের প্র্রকৃতি। বাংলাদেশের শ্যামল মাটিতে বসন্ত কালের প্রকাশ খুব প্রকট। চারিদিকে বসন্তের আগমনের আভাস, তার প্রকাশ সর্বত্র। মানুষের দিলেও তার ছোঁয়াচ লাগে। সেখানে আমীর, ফকিরের ভেদাভেদ নেই, বৃদ্ধ, যুবার প্রভেদ নেই, বসন্তের আগমনে বাংলাদেশের সর্বত্র লাগে সবুজ কচিবর্ণের আন্দোলন।

মুর্শিদাবাদের মাটিতেও সেই সবুজ বর্ণের ছড়াছড়ি। নবাবী মাটিতে আম্রকুঞ্জের মধ্যে যৌবনসম্ভবা বৃক্ষরাশির পত্রের দেহে নতুন দৃশ্য শোভা। উৎসব মুখরিত মুর্শিদাবাদ। প্রাণে প্রাণে যেন কানাকানির সাড়া পড়ে গেছে। দূরে নবাবী প্রাসাদের দরবারগৃহ থেকে মধুর স্বরে পিলুরাগের সানাই বাতাসে কেঁপে কেঁপে হীরাঝিলের প্রাসাদেও ছড়িয়ে পড়েছে।

সিরাজ পরিবেশনকারীর বিনা সাহায্যেই পাত্রদান থেকে স্বর্ণময় পাত্রে সরাব

ঢেলে পান করে চলেছিল, তার মুখখানি কেমন যেন করুণ, কেমন যেন পাণ্ডুর। হঠাৎ সরাবও তার কাছে বিশ্রী লাগে। তিক্ত মনে হয়। মনে হয় সরাবে জ্বালার ভাগ বেশি, নেশার ভাগ কম, আমেজের ভাব নেই। তাই সে ক্ষিপ্ত হয়ে ছুঁড়ে দিল স্বর্ণময় পাত্রদান হীরাঝিলের হীরকস্বচ্ছ জলের বুকে। ছলাৎ করে শব্দ হল ঝিলের জলে। জলের ওপর প্রচণ্ড ঢেউয়ের অনুরণন উঠল। সিরাজ তাকিয়ে রইল তারই সৃষ্ট ঝিলের জলের দিকে। গোলাকার কতকগুলি চক্রাকার ঢেউয়ের বৃত্ত। ঘুরতে ঘুরতে একই বৃত্তে এসে আবর্তিত হচ্ছে।

বাঁদী এসে কুর্নিশ করে জানাল—মোতিঝিল থেকে বুলক খাঁ এসেছে, জনাব নওয়াজেস্ খাঁ সাহেব আপনাকে এত্তেলা জানিয়েছেন।

অন্য সময় হলে হয়ত সিরাজ নওয়াজেস্ খাঁর মোতিঝিলে যেত না, কিন্তু হঠাৎ কি ভেবে সে বলল—বুলক খাঁকে অপেক্ষা করতে বল, আমি তৈরী হয়ে যাচ্ছি।

বাঁদী চলে গেলে দাঁতে দাঁত ঘষে সিরাজ হঠাৎ মনে মনে দারুণ একটি মতলব ভেঁজে নিল। তারপর সে প্রাসাদ কাঁপিয়ে হাঃ হাঃ করে প্রচণ্ড শব্দে হেসে উঠল। একটি প্রতিশোধের নেশা অপরটির মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে সিরাজকে মুহূর্তে ভুলিয়ে দিল গতরাত্রের পরাজয়ের স্মৃতি।

নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর প্রমোদ প্রাসাদের প্রাঙ্গণ। অতীত স্মৃতি যখন নবপরিণীতা বধূর মতো ধীরে ধীরে মনোমন্দির অধিকার করে বসে, তখন তার পাদস্পর্শে চারিদিকে ভাবের পারিজাত-কুসুম ফুটে ওঠে,—জীবনের শুষ্ক মরুভূমি কোমলতার মধুরধারায় অভিসিক্ত হয়ে যায়—হৃদয়-তন্ত্রীর তারগুলি মৃদু নিক্কণে ধ্বনিত হয়। বাস্তবিকই মোতিঝিল মুর্শিদাবাদের মধ্যে একটি রমণীয় বিলাসমঞ্জিল। যখন কেউ এর নিকটে উপস্থিত হয়, তখনই তার হৃদয় স্বর্গীয়মধুরভাবে ভরে যায়। অশ্ব পদাকৃতি ঝিল সলিলভরে টলটল করছে, স্থানে স্থানে পদ্মবনে বিকশিত পদ্মগুলি সলিল থেকে মস্তক উত্তোলন করে মৃদু বায়ুবেগে ঈষৎ সঞ্চালিত হচ্ছে—নানাবিধ জলচর পক্ষী সর্বদা ঝিলে বসে কলরব করে, কখনও বা তান ছড়াতে ছড়াতে সুদূর আসমানের অনন্তপথে মিশে যায়। কোকিল, পাপিয়া প্রভৃতির মনোমোহকর সঙ্গীতে দিগ্বালারা চমকিত হয়ে ওঠে। ঝিলবেষ্টিত ভূভাগ সবুজবর্ণ ও হরিদ্বর্ণ তৃণে আচ্ছাদিত হয়ে শ্যামলিমার প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে। যখন সমীরান্দোলিত স্বচ্ছ সলিলরাশি সূর্য ও চন্দ্রকিরণে সহস্র সহস্র মণি-মাণিক্যের রূপ ফুটিয়ে তোলে, সেই সময়ে তরঙ্গায়িত হরিদ্বর্ণ ও সবুজবর্ণ তৃণসমুদ্রে দৃষ্টিপাত করলে বোধ হয়, যেন সহসা অপ্সরারাজ্য পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হয়েছে। ঝিলের পূর্বতীরে দীর্ঘকায় বৃক্ষসকল সলিল-দর্পণে আপনাদের

নিজেদের প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করছে। মোতিঝিলের স্রোতঃশালিনী ভাগীরথীর গর্ভ থেকে সৃজিত হয়েছে। এই গর্ভ থেকে প্রচুর পরিমাণে শুক্তি পাওয়া যেত বলে মোতিঝিল নামকরণ হয়েছে। এই শুক্তিগর্ভস্থিত মোতিচূর্ণে নবাব পরিবারের তাম্বুল সেবন হত।

নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ সা আমেদ জঙ্গবাহাদুর দুটি কারণের জন্যে এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। প্রথম কারণ, সিরাজের প্রভুত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে তাকে খর্ব করার জন্যে ষড়যন্ত্রের প্রয়োজন, এবং পরবর্তী নবাবী মসনদ আলিবর্দীর মৃত্যুর পর সিরাজের কবল থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে একটি সুরক্ষিত আশ্রয় প্রয়োজন, তারই জন্যে এই প্রাসাদ। তবে দ্বিতীয় কারণটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ও সকলের কাছে প্রচারিত। সেই মহারাষ্ট্রীয়গণ দু-দুবার মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন করেছিল এবং তখন নবাবী প্রাসাদ বিশেষ সুরক্ষিত ছিল না, পুনরায় যদি কোন শত্রু মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে এবং আত্মরক্ষার জন্যে এই সুরক্ষিত প্রাসাদের নির্মাণ। তবে যেটি বিশ্বাসযোগ্য সেটিও সবার কাছে প্রচারিত ছিল, সিরাজ নওয়াজেস্ খাঁ দুজনে এক প্রাসাদের নিচে বসে বিলাসী জীবন চালনায় অসুবিধা বোধ করতেন। নওয়াজেস্ খাঁ নিজের প্রবীণ বুদ্ধি প্রকাশ করে তাই আলাদা প্রাসাদ নির্মাণ করে সরে গিয়েছিলেন। তাছাড়া নবাবী প্রাসাদে ছিলেন আদর্শ রমণী নবাববেগম, তাঁর চোখের সামনে বহু রমণী পরিবৃতা হয়ে সরাবী জীবনের বিলাস উপভোগ করা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব। সিরাজ পারত এইজন্যে যে, সে অত্যধিক দিদিভাইয়ের স্নেহ পেয়ে একটু বেয়াড়া হয়ে গিয়েছিল তবে সে তখন নিতান্তই ছেলেমানুষ। পরবর্তী জীবনে সিরাজও এই কারণের জন্যে হীরাঝিল নির্মাণ করে সরে গিয়েছিল।

মোটকথা হীরাঝিল যে কারণের জন্যে তৈরি, মোতিঝিলও সেই কারণের জন্যে তৈরি হয়েছিল। তবে হীরাঝিল যেখানে তৈরি হয়েছিল মোতিঝিলের অবস্থান তার চেয়ে অনেকগুণে রমণীয় ছিল। প্রাকৃতিক কতকগুলি সৌন্দর্যের একত্র সমাবেশে মোতিঝিলের অবস্থান। মোতিঝিলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে সিরাজ ঈর্ষান্বিত হয়েছিল এবং সেই ঈর্ষার বশেই হীরাঝিলের সৃষ্টি। তবে হীরাঝিলের যে কৃত্রিমঝিল-সলিল হীরকস্বচ্ছলতা নিয়ে প্রবাহিত ছিল, মোতিঝিলের কাছে তা ম্লান।

নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ তাঁর প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে এই প্রাসাদকে সাজিয়েছিলেন। এখানে ঘসেটি বেগম কম সময়ই থাকতেন। নওয়াজেস্ তাঁর রম্য প্রাসাদে বহু রমণী পরিবৃতা হয়ে দিন যাপন করতেন। সেখানে কারও অর্ধনগ্ন দেহ দেখে পুলকিত, কখনও কোকিলকণ্ঠী কামিনীর সঙ্গীত সুধা পানে চিত্তবিমোহিত করতেন। সর্বদা দুনিয়ার একঝলক রূপের মধ্যে অবস্থান করে প্রৌঢ় নওয়াজেস্ বাইরের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ত্যাগ করেছেন।

আর একটি আওরত, যার জন্যে তিনি ঘসেটি বেগমকেও বিস্মৃত হয়েছিলেন, সেই ভগবাইয়ের হৃদয়াধিকারের জন্যে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তিনি তার

মনস্তুষ্টির জন্যে নিজের অগাধ ধন-ঐশ্বর্য দিতেও কার্পণ্য করেন নি। কিন্তু এই ভগবাই তবু নওয়াজেস্ খাঁর প্রতি প্রসন্ন নয়। সেইজন্যে প্রৌঢ়ের দিনের মধ্যে বহুত দুঃখ জমা আছে।

সিরাজ ও বুলক খাঁ সেদিন প্রত্যুষে এই প্রাসাদের উদ্যানে অশ্বের ওপর থেকে নামল। আগের দিন সিরাজ বুলককে কথা দিয়েছিল বলে মোতিঝিলে এল নয়ত নওয়াজেস্ খাঁর আদেশ পালন করবার পাত্র সে নয়। শুধু নওয়াজেস্ খাঁকে এই প্রসঙ্গে একটু অপমান করার দুঃসাহসের প্রবৃত্তি দমন করতে না পেরে বুলকের আহ্বানে এই প্রত্যুষে হীরাঝিল ছেড়ে মোতিঝিলে এল। সিরাজ জানত, নওয়াজেসের সঙ্গে দেখা হলেই বৃদ্ধ ফৈজীর প্রসঙ্গ তুলবে—এবং তার জবাব যে শাণিত তরবারীর আঘাতের যন্ত্রণার মতো প্রয়োগ করবে—এই কথা ভেবেই সিরাজ উৎফুল্ল। এখানে সিরাজের বালকসুলভ কৌতুক চাপল্য মাঝে মাঝে যে তাকে জীবনের সমস্ত গুরুত্বকে লঘু করে দেয়—তাই প্রমাণিত হল। ফৈজীর অবহেলায় যখন তাকে সমস্ত রাত্রি ধরে যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করতে হয়েছে, সরাবের নেশাও যখন তাকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি তখন এই বালকসুলভ কৌতুক চাপল্যই তাকে জীবনের গুরু সমস্যাকে লঘু করে দিল। সে তার মানসিক অবস্থাকে সংযমের রজ্জু দিয়ে বেঁধে চলে এল নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর মোতিঝিলে। শুধু বৃদ্ধ নওয়াজেস্ খাঁকে চাবুক দিয়ে শায়েস্তা করতে নয়, তাঁকে বুঝিয়ে দিতে—'তুমি নিজের অর্থের দৌলতে যতই নিজের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ কর, তবু তুমি বৃদ্ধ, তোমার শোণিতে এখন উন্মাদনা কমে এসেছে, সিরাজের উন্মাদ শোণিতের স্রোতে তুমি ভেসে যাবে।

একথা সিরাজ ফৈজীর কাছ থেকে আঘাত পাওয়ার পরেও চিন্তা করেছে। তাতেই বোঝা যাচ্ছে, ফৈজীর অবহেলা তার দুঃসাহসী মনে দারুণভাবে আলোড়ন জাগিয়েছিল। এবং সমস্ত দুনিয়ার লোকের কাছে যে নিজের আপন প্রতিষ্ঠা নিজের শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, সেই সময় ফৈজীর মতো একজন সুন্দরী নর্তকীর অবহেলা তাকে একেবারে দুর্বল করে দিল। সে যেন সেই দুর্বলতাকে ঢাকবার জন্যে বাইরে নিজেকে আরও অত্যাচারী করে প্রকাশ করতে লাগল। পরবর্তী কার্যধারাগুলি সিরাজের সেই চিন্তার ওপরই পরিচালিত হয়েছিল।

বুলক সিরাজকে বলল—যুবরাজ, মেহেরবানি করে আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি খাঁ সাহেবকে সংবাদ প্রেরণ করি।

সিরাজ মাথা নেড়ে বলল, কোন প্রয়োজন নেই বুলক খাঁ, নওয়াজেস্ সাহেবের কাছে যাব তার জন্যে এত্তেলা কি? বরং তুমি তোমার কাজে যাও, আমি তাঁর

সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিচ্ছি। এই বলে বুলককে আর কোন কথা বলতে না দিয়ে সিরাজ দ্রুত অন্দরের দিকে চলে গেল।

সিরাজ এ প্রাসাদে এর আগে অনেকবার এসেছিল। তাই সমস্ত কক্ষ ও পথগুলি তার পরিচিত ছিল। এ প্রাসাদের কোন মহলের কক্ষে তার কনিষ্ঠ ভাই এক্রামদ্দৌলা নর্তকীদের নৃত্যগীতে মুগ্ধ হয়ে জীবন যাপন করত তাও সে জানত এবং নওয়াজেস্ খাঁ তাঁর রমণী নিয়ে কোন কক্ষে বাস করতেন তাও জানত সিরাজ।

এক্রামউদ্দৌলার জন্যে তার বড় মায়া হয়, হাজার হোক তার আপন কনিষ্ঠ ভাই। সন্তানহীন নওয়াজেস্ খাঁর পুত্রের মতো জীবনযাপন করে পিতার চরিত্রের দুর্বল দিকগুলিই অভ্যাস করে ফেলল। এবং অপরিণত অবস্থায়ই শক্তিহীন হয়ে অকর্মণ্য জীবন নিয়ে মোতিঝিলে কাটাতে লাগল। সিরাজ এক্রামউদ্দৌলার মহল পেরিয়ে আরও এগিয়ে নওয়াজেস্ খাঁর মহলে ঢুকল।

নওয়াজেস্ খাঁর জীবনে যেমনি বহু মন্দের ভাগ ছিল, ভাল দিকও তাঁর অনেক ছিল। তিনি অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করে তাঁর প্রাসাদ সংলগ্ন মসজিদে গিয়ে নামাজ শেষ করতেন এবং তাঁর মসজিদ প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকে অতিথিশালায় গিয়ে তাঁর অতিথিবর্গের কুশল গ্রহণ করতেন, তাদের অভিযোগ শুনে তার ব্যবস্থা করে তিনি আর একটি অংশে গিয়ে সেখানে দরিদ্র আর্তদের আহার বাসস্থান ঠিক মতো পরিচালিত হচ্ছে কি না দেখে, বিপন্না বিধবা ও অনাথদের পরিদর্শন করে নিজের কক্ষে ফিরতেন। মুর্শিদাবাদের এক তৃতীয়াংশ লোক নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর এই অনুগ্রহের জন্যে তাঁর সমস্ত অন্যায় নীরবে হজম করত, তাদের কাছে নওয়াজেস্ মুসলমানদের মধ্যে পীর পয়গম্বর বলে পরিগণিত হয়েছিল। এই আর্তদের সেবায় তাঁর মাসিক সাঁইত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় হত।

কিন্তু সিরাজ নওয়াজেসের এই স্নেহপ্রবণতা রাজনীতির ছল বলে তাচ্ছিল্য করত। এবং বলত মানুষ দুর্বল দিকটা ঢাকা দেবার জন্যেই যত প্রতারণার আশ্রয় নেয়।

হঠাৎ সিরাজ কক্ষের মধ্যে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কক্ষের মধ্যে একটু বিসদৃশ্য পরিবেশ। চোখে পীড়াদায়ক। বাইরে দরজার কাছে খোজা প্রহরী বসেছিল। সিরাজ প্রহরীর বাধাদানের পূর্বেই কক্ষে প্রবেশ করতে চেয়েছিল কিন্তু আবার কক্ষের সম্মুখ থেকে তাকে ফিরে এসে প্রহরীকে জানাতে হল—ভিতরে গিয়ে নওয়াজেস্ সাহেবকে সংবাদ দাও, সিরাজ হাজির।

সিরাজ মনে মনে প্রচ্ছন্ন একটু কৌতুক অনুভব করল। নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর এতটা অধঃপতন হয়েছে তার জানা ছিল না।

মনুষ্যত্বের এমনি অবমাননা দেখে তার শরীর রি রি করতে লাগল। মানুষ আওরতের জন্যে এতখানি নীচে নেমে যেতে পারে, তা তার জানা ছিল না। আজকের এই সকালে তাও তার জানা হয়ে গেল। নওয়াজেস্ খাঁ প্রমাণ করে দিলেন, জগতের সমস্ত লোভনীয় ঐশ্বর্য নিয়ে এই আওরতই আবির্ভূতা হয়েছে, তাকে অধিকার করতে গেলে নিজেকে অনেক ছোট করতে হয়।

সমস্ত ঐশ্বর্যের হীরাজহরতের রোশনাই দিয়ে এই কক্ষগুলি সজ্জিত। মুর্শিদাবাদের ধনদৌলতের সন্ধান যদি কারও জানার প্রয়োজন হয় তাহলে এই মোতিঝিলের কক্ষগুলি দেখলে প্রতীয়মান হবে। সাজানো অদ্ভুত কৌশলে এই সব কক্ষ, বিশেষ করে নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর কক্ষ। বেলজিয়াম কাচের দর্পণে কক্ষের সমস্ত দেয়ালগুলি মোড়া। আসবারের মধ্যে অধিকাংশই স্বর্ণময়। মেহগনি পালঙ্ক। রেশমী মসলিনের চাদর পাতা পালঙ্কের ওপর। পাশে কুর্সির ওপর স্বর্ণভৃঙ্গার পূর্ণ সরাবের পানপাত্র। সিরাজ একলহমায় যা দেখেছিল তাতেই সে লক্ষ্য করেছিল, বিস্রস্ত এলোমেলো বেশবাস নিয়ে ভগবাই পালঙ্কের ওপর তার নগ্ন যৌবন-শোভা মেলে ধরে শুয়ে আছে। পায়ের কাছে বসে আছেন বৃদ্ধ নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ। তিনি ভগবাইয়ের কুসুম কোমল চম্পকবর্ণের সুন্দর পা দুখানি নিজের কোলের ওপর স্থাপন করে পায়ের চম্পক আঙ্গুলিগুলি নিয়ে খেলা করছেন। তাঁর চোখের ওপর কাতরতার ছাপ। তিনি বোধ হয় ভগবাইকে কিছু অনুরোধ করছিলেন, তাঁর অনুনয়ের ভঙ্গিটি মুখের ওপর ফুটে উঠেছে।

ভগবাই চোখ বুজে পালঙ্কের শয্যায় আরামে অবস্থান করছে। তার বক্ষবাস শিথিল। বক্ষের উদ্ভিন্ন যৌবন প্রবাহ প্রকট হয়ে উঠেছে, সম্ভবত ভগবাই বৃদ্ধ নওয়াজেস্‌কে দর্শন করিয়েই আরও পাগল করতে চায়, সেইজন্যে তার আওরত জীবনের স্বাভাবিক সরমও অপসারিত। এই প্রসঙ্গে ফৈজীর কথা সিরাজের আবার স্মরণে এল, ফৈজী কি এমনিভাবে তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা খেললে সে সহ্য করত? সে ফৈজীর মহব্বতের রোশনাইয়ের স্পর্শ পাবার জন্যে লালায়িত বটে, কিন্তু ফৈজীর এই দুর্ব্যবহার সে কিছুতেই বরদাস্ত করত না। তার পৌরুষ জেগে উঠত, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত আপন সত্তা, তারপর হয়ত···। যাক সে সব কথা উচ্চারণ করে লাভ নেই। ফৈজী শেষপর্যন্ত তাকে স্বীকার করে কিনা দেখতে হবে। নয়ত দুনিয়ায় ওর রূপের অহঙ্কার অন্যে কি করে গ্রহণ করে সে দেখবে? সিরাজকে যে মহব্বত জানাতে পারল না, তামাম দুনিয়ায় আর কাকে সে মহব্বত জানায় দেখতে হবে! আদৌ জীবনে আর কাউকে যাতে না জানাতে পারে তার ব্যবস্থা হয়ত সিরাজের ক্ষমতায় শেষপর্যন্ত সংঘটিত হবে।

এসব এখনও চিন্তার বাইরে। কারণ এখনও আশা আছে, হয়ত ফৈজী তাকে মহব্বত দান করবে। কিন্তু যদি নাও জানায় তাহলে সিরাজের পৌরুষত্বের যে অহমিকা জগতে ভীষণ জিঘাংসায় প্রতিষ্ঠিত হবে, তার তুলনা নেই। বশ্যতা স্বীকার না। বশ্যতা স্বীকার পুরুষের ধর্ম না। মরদের কর্ম না।

প্রহরী এসে জানাল—জনাব সেলাম দিয়েছেন।

নওয়াজেস্ খাঁ সিরাজকে দেখে সামনের একটি ডিভানের ওপর বসতে আদেশ করলেন, তারপর হেসে বললেন—সরাব পান করবে তো সিরাজ!

সিরাজ বসল না, পালঙ্কের সামনে দাঁড়িয়েই গম্ভীরস্বরে বলল—না।

ভগবাই নওয়াজেসের পাশেই বসেছিল, বসেছিল বললে ঠিক ভুল হবে, তাকিয়ার

ওপর নিজের একটি কনুই স্থাপন করে অর্ধশায়িত ভাবে শুয়েছিল, তার একটি হাতের তালু গালের ওপর রাখা। বুকের ওপর সন্তর্পণে ওড়নাটা মেলে দেওয়া হয়েছে, তবে সে খেয়ালবশে, ভগবাইয়ের বোধ হয় ইচ্ছে ছিল না তা করে। ভগবাইয়ের চোখে কৌতুক, মুখে হাসির টুকরো। দেখে সিরাজের দেহের শোণিতে কেমন যেন আলোড়ন জাগল, দেহ রোমাঞ্চিত হল কিন্তু সে সংযম রক্ষা করল। কারণ পিতৃব্যের আওরতের ওপর তার লোলুপ দৃষ্টি স্থাপন করা আল্লার কসম। তা'ছাড়া ভগবাইয়ের রূপের রোশনাই বৃদ্ধের অন্ধকার যৌবনের উজ্জ্বলতা বাড়ায়, সিরাজের উদ্ভিন্ন যৌবনের উন্মাদনা ভগবাইয়ের শোণিতে নির্বাপিত হবে না।

ফৈজীর কাছে এরা বাঁদী। এ কথা কেউ অস্বীকার করুক, সিরাজ করে না। ফৈজীর রূপের চমক খোজার আহত কাম প্রবৃত্তিকে আবার অন্ধের মতো জাগিয়ে তোলে।

নওয়াজেস্ দেখলেন, সিরাজ অবাক হয়ে ভগবাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। তাই দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ভগবাইকে বললেন—মেহেরবানি করে একটু চলে গেলেই ভাল করতে না, সিরাজের সঙ্গে আমার থোড়া বাতচিত ছিল।

ভগবাই মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—বাতচিত আছে তোমরা বলো না, আমি কি তোমাদের বাতচিত শুনছি ?

একটু গোপন বাতচিত ছিল।

এবার ক্ষিপ্ত হয়ে ভগবাই তাকিয়ার ঠেসান থেকে উঠে বসে বলল—গোপন বাতচিত ? তুমি সিরাজের সঙ্গে কি বাত রফা করবে—তা কি ভাবছ আমার জানা নেই ! আওরতের স্পর্শ সুখে যার জীবনের ধুক-ধুকুনিটুকু চলে, তাকে চিনতে তক্‌লিফ কোথায় ? তুমি তো ফৈজীর জন্যে যুবরাজ সিরাজের কাছে আর্জি জানাতে চাও, এ কথা ভণিতা না করে সিরাজকে স্পষ্টই বলতে পার, আমি তাতে বাধা দেব না। তোমার হারেমে সংখ্যাতীত আওরত দিনের পর দিন এসে জমা হচ্ছে, তাদের তুমি খোরপোশ দিয়ে পালন করে তাদের মহব্বত লুটছো, এর জন্যে আমার কোন ঈর্ষা নেই।

একগাল হেসে সিরাজের সামনেই নওয়াজেস্ বললেন—আহা গোসা করছ কেন মেরে পিয়ারী। সিরাজ আমার ভাইজান লড়কা। তার সাথে বাতচিত করব, সেইজন্যে একটু সরম ! তোমার কাছে তো আমার কিছু গোপন নেই। হেঃ হেঃ করে নওয়াজেস্ একচোট হেসে উঠলেন।

সিরাজ এর আগে কোনদিনও ভগবাইকে দেখেনি, শুধু শুনেছিল নওয়াজেস্ খাঁ এর হাতের তলায়। এমন কি ঘসেটি বেগমও এর সঙ্গে পেরে ওঠেন না বলে প্রায় সময় তাঞ্জামে করে পিত্রালয়ে গিয়ে বাস করেন। ঘসেটি পারেন না যে রমণীর সঙ্গে, সে রমণীর যে ক্ষমতা অসীম—সেই কথা ভেবেই সিরাজ ছটফট করে উঠল, তারপর বলল—চাচা, আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে, তুমি ডেকেছ কেন তাড়াতাড়ি শেষ করলে আমি চলে যেতে পারি।

নওয়াজেস্ হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন—বেটা, যায়েগা কাহাঁ, থোড়া বৈঠ্ যাও না· · · · শুনলুম তুমি নাকি এক খুবসুরত নওজোয়ানী বাইজীকে দিল্লীর বাদশাহের হারেম থেকে লুটে নিয়ে এসেছ, তার কথা কিছু জানিয়ে যাও। বেটা, আওরতের কথা জিজ্ঞেস করছি বলে লজ্জা করো না। তুমি যখন দোস্তের মতো। তোমার বাপজান জিন্দা থাকলে হয়ত এই একই বাত্ শুধোতো।······ফৈজীর বাত্ থোড়া বলো, সে নাকি তামাম হিন্দুস্তানের আওরতের রোশনাই নিয়ে এই মুর্শিদাবাদে এসেছে ?

সিরাজ তবু কোন কথা বলছে না দেখে নওয়াজেস্ আবার বললেন—সরম কিঁউ বেটা ? আমি বলছি, তার কথা কিছু বলো।

সিরাজ তবু কথা বলল না দেখে ভগবাই খিলখিল করে হেসে উঠল, হেসে বলল—ও বলবে না জনাব, তোমার কাছে ফৈজীর কথা বলবে না। ফৈজী যে ভাবী নবাব সিরাজের পেয়ারী আওরত।

সিরাজ হঠাৎ ভগবাইয়ের কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল,—চাচা, আর তোমার কোন আর্জি আছে ?

নওয়াজেস্ স্বর কোমল করে বললেন—গোসা কিঁউ বেটা। আমি তোর ফৈজীকে চাইছি না, শুধু জিজ্ঞেস করছি সে কিরকম আওরত! তার রূপ কি ভগবাইয়ের রূপের চেয়েও চমকদার ?

সিরাজের হঠাৎ মাথার মধ্যে ভগবাইকে অপমান করার নেশা জেগে উঠল, সে স্বর ব্যঙ্গমিশ্রিত করে বলল—ফৈজীর দেহের রোশনাই রাতের আসমানের চাঁদনিকেও হার মানায়, তার রূপের চমক কোন আওরতের সঙ্গে তুলনা হয় না। আর তার দেহের কাঠামো দেখলে মরদের রক্তে তুফান ওঠে ; তার বক্ষের সুরত সমুদ্রের ফেনার মতো, অধরের রক্তিমা দুনিয়ার সেরা নেশাকে কাবু করে দেয়।······আর কিছু বলবে চাচা, আমি এবার যাব।

সিরাজ এবার আড়চোখে তাকিয়ে ভগবাইয়ের মুখ দেখল, সে মুখখানি রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে রক্তিম হয়ে গেছে। মনে মনে সিরাজ হেসে তাড়াতাড়ি সেস্থান ত্যাগ করবার মতলব করল। কিন্তু নওয়াজেস্ কেমন একটু উত্তেজিত হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে নিম্নস্বরে সিরাজকে বললেন—বেটা, আমি পাঁচলক্ষ টাকা দেব, তুমি যদি ফৈজীকে ইনাম দাও তাহলে বহুত খুশ্ হব।

বহুত খুশ্ ! হঠাৎ ভগবাই ফেটে চৌচির হয়ে চীৎকার করে উঠল। সে পালঙ্ক থেকে মেঝেতে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল—তাহলে সেই ফৈজীর কোরবানীর জন্যে প্রস্তুত থাকবে খাঁ সাহেব। আমার নাম ভগবাই। মুসলমানী রক্তের সেলাম নিয়ে আমার জন্ম নয়। নবাবী মেজাজের মরদদের ভগবাই শায়েস্তা করতে পারে কিনা তার পরীক্ষা হয়ে যাবে।

নওয়াজেস্ তাড়াতাড়ি ভগবাইকে শান্ত করবার জন্যে সান্ত্বনার কণ্ঠে বললেন,

আহা, গোসা করছ কেন বিবিজান? ফৈজীর সত্যিই সেরকম রূপ আছে কিনা আগে আপনা আঁখসে পরীক্ষা কর—তারপর চিল্লাও।

সিরাজ বলল—কিন্তু চাচা, তকলিফ করে আমাকে শুধু শুধু আর্জি জানালে। ফৈজীর বিনিময়ে সারা হিন্দুস্থানের দৌলত দিলেও তাকে আমি দেব না। সে হবে আমার আগামী নবাবী মসনদের অংশীদার—নবাববেগম!

ওহো—ওহো বহুত সুক্‌রিয়া, বহুত সুক্‌রিয়া……শাদীকে ফরমাইশ হোনে কী বাত্‌ হমকো থোড়া এত্তেলা ভেজ দেনা, হম উসকে লিয়ে এক মোতিকা হার ভেজ দেউঙ্গে।

সিরাজের ঠোঁটে হাসি জেগে উঠল। সে হেসে হাত তুলে নওয়াজেস্‌কে সেলাম জানিয়ে ভগবাইয়ের দিকে তাকাল। ভগবাই তখন রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে মেঝের ওপর মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। সেই দিকে তাকিয়ে সিরাজ মৃদু হেসে বলল—চাচী, মেহেরবানি করে একদিন আমার হীরাঝিলে দর্শন দেবেন, বড় খুশী হব গেলে…। তারপর হাসিটা একটু অনুচ্চ করে বলল—হীরাঝিলে বহুত খুবসুরত আওরত আছে, সেখানে গিয়ে নিজের রূপের কদরটা যাচাই করে আসবেন।

এই কথায় ভগবাই চীৎকার করে কেঁদে উঠল, আর তাই দেখে নওয়াজেস্‌ হঠাৎ চীৎকারে খোজা প্রহরীকে ডাক দিলেন—এই কে আছিস্‌?

খোজা কক্ষে প্রবেশ করবার আগেই সিরাজ ত্বরিৎপদে কক্ষ থেকে একরকম লম্ফ প্রদান করে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর অশ্বপিঠে সওয়ার হয়ে লাগাম চেপে ধরে অশ্ব ছুটিয়ে দিল নবাব প্রাসাদের দিকে।

আওরতের স্পর্ধা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। ভগবাইয়ের অহমিকা যেমন করে চূর্ণ করে দিয়ে এল, তেমনি করে যদি ফৈজীর অহঙ্কার চূর্ণ করে দিতে পারত? পারবে না কেন? ফৈজীর প্রতি যেটুকু দুর্বলতা আছে সেই দুর্বলতাটুকু যদি কোন রকমে অপসারিত করতে পারে তাহলে অবশ্যই ফৈজীরও অহমিকা সে চূর্ণ করবে। সে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ভাবী নবাব। স্বাধীন নবাব বলে আলিবর্দীও যেমন নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন, বাদশাহকে নজরানা প্রদান করেন নি। তেমনি সেও আলিবর্দীর পরবর্তী নবাব হয়ে স্বাধীন রাজ্য ভোগ করবে, আর তার জন্যে তাকে শক্তি ধরতে হবে অসীম, কৌশল প্রয়োগ করতে হবে হিসেব করে। শত্রুকে বশ করে, নবাবী তখ্‌ত কায়েমী করে শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে আমীর ওমরাহদের শায়েস্তা করতে হবে।

এক সামান্য রমণী, থাক্ তার অসামান্য রূপ, তবু তার রূপের অহমিকা বাংলার ভাবী নবাব কখনও বরদাস্ত করবে না। কখনও না!

হঠাৎ যেন সিরাজের দেহের মধ্যে দারুণ শক্তি এল, সে খুশী হয়ে হাঃ হাঃ রবে চলমান অশ্বের পিঠের ওপর বসে হেসে উঠল। গতরাত্রে ফৈজীর অবহেলার প্রতিশোধ যেন আজ ভগবাইয়ের ওপর গ্রহণ করে তার চিত্তের বিশৃঙ্খলভাব কিছুটা দমিত হয়েছে, তাই তার হঠাৎ খুশীতে দিল্ কানায় কানায় ভরে উঠল। ছাপাছাপি হয়ে গেল যেন গঙ্গায় উত্তাল স্রোতের জল।

সারা রাত্রের পৌরুষ যন্ত্রণা ভোগ করবার পর সিরাজের শরীরের মধ্যে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, চোখে মুখে রক্তশূন্য পাণ্ডুরতা যেন যৌবনের অনেকগুলি রাতকে অবহেলার স্রোতে হারিয়ে দিয়েছিল, আবার ফিরে আসতে সে শক্তিধরের মতো নবাব প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলল।

দেখতে দেখতে যেতে লাগল, সোনালী রোদ্দুর সমস্ত দিগন্তের চারিদিকে তার আলোর বর্ণে স্নান করিয়েছে। দীঘির জলে পদ্মফুলের সবুজ পাতার কোণ থেকে ফুলের যৌবন-সুন্দর রূপগুলি বাতাসে দোল খেয়ে দীঘির নীলজলের স্রোতে ক্রীড়া করে ফিরছে। কোন একটি পুকুরের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখল, হিন্দুললনা সরম জড়োসড়ো হয়ে দেহে কাপড়ের আবরণে সাবধানে নিজেকে কবরিত করে কাঁকে কলসী নিয়ে বাড়ির পথে চলছে। রূপ আছে এদের, সে রূপে মন ভরে না। এ রূপে পালিশ নেই বলে সিরাজের চোখ ধাঁধায় না। তবু সে বহু হিন্দুললনাকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে এসে পালিশ করে রংমহলের আলোর রঙে পরীক্ষা করে দেখেছে—আছে, আছে. পালিশ করলে সব রূপেরই জ্যোতি ফোটে, তবে তার মধ্যে কারও চেকনাই বেশী বা কম। কিন্তু ফৈজীর রূপ আল্লার মেহেরবানি। তার রূপে পালিশের দরকার হয় না, সে যেখানে দাঁড়ায় সে জায়গায় আলো ঠিকরোয়।

ঘুরে ঘুরে চিন্তাধারাটা সেই ফৈজীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে কেন—সিরাজ বুঝতে পারে না। আওরতের চিন্তায়ই এখন তার সমস্ত সময় ব্যয় হয় কিন্তু মরদের জীবনে, ভাবী নবাবের জীবনে আওরতই যে সব নয় এ কথাও তার মনে বার বার আসে না কেন? আবার পরক্ষণে মনে হয়, তাই বা কেন? নবাববেগমও আওরত ছিলেন। আলিবর্দীর জীবনে যদি নবাববেগম না থাকতেন হয়ত আলিবর্দী নবাবী তখ্‌তে বেশীদিন বসে থাকতে পারতেন না। এই রমণী শুধু আলিবর্দীকে হারেমে থেকে বুদ্ধি দিয়েই সাহস যোগান নি, হস্তীর পিঠে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হয়েছেন।

একবারের কথা মনে এলে মনে এখনও রোমাঞ্চ জাগে, সেবারে মহারাষ্ট্রীয়রা বঙ্গদেশের মধ্যে এসে তার অতুল ঐশ্বর্য মন্থন করবার জন্যে অগ্রসর হয়েছে, নবাব আলিবর্দী সংবাদ পেয়ে বিপুলবাহিনী নিয়ে উড়িষ্যা থেকে বর্ধমানাভিমুখে অগ্রসর হলেন। সে যুদ্ধে নবাবের সঙ্গে নবাববেগমও উপস্থিত ছিলেন। বেগম 'লণ্ডা' নামে এক হস্তার পিঠে আরোহণ করে সেই ভয়ঙ্কর মহাসমর সাগরের উত্তাল তরঙ্গে

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়রা সেই হস্তীকে ধৃত করে নবাববেগমকে বন্দী করবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু নবাবের জনৈক সেনাপতি ওমর খাঁর পুত্র মোসাহেব খাঁ অসীম বীর্যবত্তা দেখিয়ে সেই কৃতান্তদূতের হস্ত থেকে হস্তী ও বেগমের উদ্ধার সাধন করেন। এরূপ আরও অনেক স্থলে তিনি রণক্ষেত্রের অসীম কষ্ট অকাতরে সহ্য করে স্বামীর পাশে পাশে অবস্থিতি করেছেন।

সিরাজ আজ তাই মনে মনে নবাববেগমের মতো একটি রমণীর আকাঙ্ক্ষা করে। যে রমণী তার চঞ্চল জীবনের বৃত্তে শান্ত একটি প্রতিমার মতো সমস্ত শক্তির আধার হয়ে তাকে ঘিরে রাখবে। লুৎফাই কি সেই রমণী? নবাববেগম এই লুৎফাকে আপন স্বভাবের ছাঁচে ঢেলে তৈরি করছেন নিয়ত। তাই লুৎফার মধ্যে সিরাজ পায় নবাববেগমের ছায়া। সিরাজের আগামী দিনগুলিকে সাবধানে নিয়ে যাবার জন্যে লুৎফার এই সৃষ্টি, নবাববেগমেরই দান। তাই দিদিভাইয়ের মনের মধ্যে কোন দুঃখ কোনদিন তাকে তকলিফ দিলে সিরাজের বড় কষ্ট হয়। নবাব আলিবর্দী তাকে স্নেহ করেন যেভাবে নবাববেগম তাঁর বিপরীতে সেই প্রকাশকে গোপনে ছড়িয়ে দেন। নবাববেগম কখনও সিরাজকে কাছে ডেকে তাকে পেয়ার জানান না কিন্তু নীরবে যে পেয়ার দান করেন, নবাব আলিবর্দীর সর্বসমক্ষে উচ্ছ্বসিত পেয়ার তার কাছে ম্লান মনে হয়। নবাববেগম দেখতেন সামনের ভবিষ্যৎ, এবং তাদের অবর্তমানে সিরাজের ভবিষ্যতের দিনগুলি কেমন করে কাটবে তারই জন্যে তিনি লুৎফাকে নিজের স্বভাব দিয়ে তৈরি করে সিরাজকে নিবেদন করেছিলেন।

এসব কথা সবই জানে সিরাজ। লুৎফার স্বভাবটি দেখে সেইজন্যে সে পুলকিত কিন্তু অন্য আওরতের অহমিকা দেখলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ফৈজী এখনও স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারছে কিন্তু রাবেয়া পারে নি, রোশনী পারে নি, কত হিন্দু আওরত সিরাজের রোষের বহ্নি সহ্য করতে না পেরে নিঃশেষ হয়ে গেছে। হীরাঝিল প্রাসাদে আছে একটি আলাদা কক্ষ। সে কক্ষটি বাইরে থেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। চোরকুঠরীর মতো একটি কক্ষ সিরাজ বানিয়ে রেখেছিল কোন দুরভিসন্ধির জন্যে নয় অবশ্য, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। নবাবী পাওয়ার পর হীরাঝিলের সাময়িক বন্দীর বন্দীকক্ষের জন্যে অনুমান করে সিরাজ বানিয়ে রেখেছিল। একদিন সে কক্ষটি হঠাৎ একরাতে সিরাজ চাবি লাগিয়ে খুলে ফেলল। একটি মোমবাতির আলোদানে আলোয় সমস্ত কক্ষটি অবলোকন করে একটি বেয়াড়া বেসরম আওরতকে প্রথম তার মধ্যে পুরে দিয়েছিল। তারপর তিনদিন অনাহারে তার মধ্যে তাকে রেখে যখন বের করেছিল তখন সে অর্ধমৃত।

তখনও সেই আওরতটিকে তার বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেনি। সেই থেকে সিরাজ আওরত নিয়ে যেমন ছিনিমিনি খেলা খেলেছে, তাদের এক রোখা অহমিকা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, অত্যাচার করেছে, আর নিজে নিয়েছে কলঙ্ক। তারপর এই চোরকুঠরীতে বহু আওরতকে সে প্রবেশ করিয়েছে। তাদের চীৎকারে হীরাঝিলের প্রাসাদ থরথর করে কেঁপে উঠেছে, মুর্শিদাবাদের রাতের আসমানের বাতাস

আলোড়িত করে প্রেতাত্মা অশুভ মুহূর্তে চীৎকার করেছে, পেঁচকের চিঁচিঁ শব্দে ঘুমন্ত মানুষের আত্মা থরথর করে কেঁপেছে। আর সিরাজ যন্ত্রণায় চীৎকার করে ক্ষিপ্ত হয়ে তরবারী তুলে আওরতকে হত্যা করতে গেছে। কিন্তু হত্যা সে কখনও করে নি। হত্যার রক্তে কখনও সে তার হাত কলুষিত করে নি।

শুধু নিজের অবমাননা সহ্য করতে না পেরে ক্ষিপ্ত হয়ে রোষ প্রকাশ করে, আস্ফালন করে ঐ পর্যন্ত—তার অধিক বলপ্রয়োগ তার স্বভাবের কোথায় যেন অনুকম্পা সৃষ্টি করে। হয়ত অনুগ্রহও।

নবাবপ্রাসাদে পৌছে সিরাজ হারেমে গিয়ে প্রথমেই লুৎফার কক্ষে প্রবেশ করল, তাকে দেখে লুৎফা বলল—বাঁদীর নসীব আল্লার মেহেরবানিতে বড় ভাল, আজ কি জনাব নবাবপ্রাসাদে এসে প্রথমেই আমার কক্ষে এলেন ?

সিরাজ হাসল না, শুধু মাথা নেড়ে বলল—হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমার একটু বাতচিত আছে বলেই প্রথমে তোমার কক্ষে এসেছি। বলতে পার লুৎফা, আওরত এত অহঙ্কারী হয় কেন ?

লুৎফা সিরাজের মুখের ওপর তার সুন্দর দুটি চোখের দৃষ্টি ফেলে মিষ্টি করে হাসল, হেসে বলল—জনাব, তবিয়ত আচ্ছা আছে তো !

আমার কথার উত্তর দাও লুৎফা, আমি একথা জানবার জন্যেই তোমার কাছে সর্বপ্রথমে এসেছি।

লুৎফা তবু মিষ্টি করে হেসে বলল—এতো নতুন কথা নয় জনাব, এ কথা তো বহুবার তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করেছ যুবরাজ ?

তোমার উত্তরটাই চেয়েছি, আর কোন বাত আমি বরদাস্ত করব না। মেজাজ শরীফ নেই।

লুৎফা আহত হল না, শুধু হাসিটা অধরের প্রান্তসীমা থেকে সরিয়ে দিয়ে সেই স্বরেই বলল—মানুষ মাত্রেই অহঙ্কারী হয় যুবরাজ, সে মরদ হোক্ বা আওরত হোক। আওরতও তো মানুষ, তার অহঙ্কার আছে দেখে এত ক্ষুব্ধ হও কেন ?

না, আওরতের অহঙ্কার মরদের অহঙ্কারের চেয়ে অনেক বেশী।

না জনাব, ভুল কথা। আওরতদের তোমরা বশ করে রাখতে চাও বলে তাদের অহমিকাটাই সর্বদা দেখ—মরদের অহঙ্কারও দুনিয়া কাঁপায়। তবে তাদের ব্যক্তিত্ব দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত, তারা নিজের অবলম্বনের ওপর ভর করে বেঁচে থাকে, আওরত পারে না। আল্লা আওরতকে অবলম্বনহীন করে সৃষ্টি করেছেন বলে সে অসহায়ার মতো যোগ্য ব্যক্তির সাহায্য খোঁজে। সেখানে তার নির্বাচন যদি হৃদয়ের সমর্থন না পায় তাহলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে—তবে বলতে পার, আওরত বেশি স্বার্থপর। তবে তার স্বার্থপরতাও ক্ষমাহীন, এইজন্যে যে, তার অসহায়া অবস্থা বড় মর্মান্তিক।

এর উত্তরে সিরাজ লুৎফাকে জিজ্ঞেস করল, তুমিও কি সব আওরতের মতো স্বার্থপর ?

লুৎফা সিরাজের কথা শুনে হাসল, হেসে বলল, আমি কি আওরত না ?

তবে তোমার স্বার্থপরতা কি ?

কেন, আমি যুবরাজের অনুগ্রহ পেয়েছি, মহব্বত পেয়েছি—এই আমার স্বার্থপরতা।

সে মহব্বত আমি তোমাকে দান করেছি বলে তুমি পেয়েছ, না'হলে কি তুমি পেতে ?

কেন আমায় মহব্বত দান করলে জনাব ? লুৎফা হেসে জিজ্ঞেস করল।

তোমাকে অন্যান্য আওরতের মতো স্বার্থপর দেখি না বলে সেইজন্যে। তা ছাড়া তোমার স্বভাবটিও আমাকে বড় শান্তি দান করে।

লুৎফা খিলখিল করে কক্ষ কাঁপিয়ে হেসে উঠল কিন্তু কোন কথা বলল না।

তাই দেখে সিরাজ হতবুদ্ধি হয়ে বলল—হাসছ যে বড়। আমি কি এমন কথা বললাম যার জন্যে হাসিতে ফেটে পড়লে !

লুৎফার হাসি প্রশমিত হলে লজ্জারুণ আরক্তকণ্ঠে বলল—এসব আওরতের গোপনীয় কথা। শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ কর না জনাব ?

সিরাজ জিদ ধরল, বলল—না তোমাকে বলতেই হবে এ রহস্য। আওরতের মনের কি রহস্য জানবার জন্যেই তোমার কাছে আমি ছুটে এসেছি। তুমি জান তো আমি এই বয়সে বহু আওরতের সঙ্গসুখ পেয়েছি কিন্তু তাদের মনের হদিশ খুঁজে পাই নি। আজ তোমাকে আপন বলে জেনেছি, তুমিও যদি সেই রহস্যের মধ্যে আমাকে হারিয়ে দাও তাহলে আমার আগামী জীবনের দিনগুলি কিরকম ভাবে কাটবে বুঝতে পারছ ? আমি যেন দিন দিন এই আওরতের কাছ থেকে চাবুক খেয়ে খেয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছি, আমার চঞ্চল স্বভাব আরও চঞ্চল হয়ে রহস্য সন্ধানে মরিয়া হয়ে উঠেছে—তুমি নিশ্চয় জানো, যেখানে গভীর রহস্য, সেই রহস্যের কিনারা করবার জন্যেই আমার মনপ্রাণ সর্বদা আগ্রহান্বিত। আজ যদি আওরতের মনের তল খুঁজতে আমি লাখো লাখো আওরতের জীবন শেষ করে দিই, তাদের অত্যাচার করে দুনিয়াতে কলঙ্কের নাম নিই, নিশ্চয় তুমি সুখী হবে না। তুমি আমাকে বল লুৎফা আওরতের মধ্যে কি রহস্য আছে ?

লুৎফা সিরাজের উত্তেজিত কণ্ঠ ও মনের বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারায় ব্যথিত হয়ে মনে মনে সিরাজের অসহায় অবস্থাটা উপলব্ধি করল। কিন্তু এই চঞ্চল যুবককে সে বলবে কি ? কোন্ তত্ত্বকথা দিয়ে আওরতের মনের পরিচয় ব্যক্ত করে বোঝাবে যে আওরত কোনদিনও তার অবমাননা সহ্য করে না। নবাব, বাদশাহরা লাখো লাখো আওরতকে দেশবিদেশ থেকে লুটে নিয়ে এসে নিজেদের হারেমে পুরে রেখে স্ফূর্তি করেন কিন্তু সেই আওরতরা সত্যিই কি চায়—তারা এমন করে অবমাননা পেয়ে সম্মান হারিয়ে দলিত ও মথিত হোক ! তাদের নীরব কান্না কেউই কোনদিন উপলব্ধি করে নি, তারা পণ্য হয়েই জীবন কাটিয়েছে, আর পরিবর্তে পেয়েছে পশুর মতো ব্যবহার। সেই আওরত যদি কোন সময় স্থান সঙ্কুলান হলে মাথা চাগায়, তাহলে তাদের দোষ কোথায় ? কিন্তু এসব কথা সিরাজকে বললে সিরাজ বুঝবে না,

পরিবর্তে ভুল ধারণা মনে পোষণ করে লুৎফাকেই অবিশ্বাস করবে। লুৎফা কি বলবে ঠিক বুঝতে না পেরে শুধু জিজ্ঞেস করল—মেহেরবানি করে গোস্তাখি যদি মাপ কর তাহলে একটি কথা শুধোই। তোমার সেই দিল্লীর বাদশাহের রংমহল থেকে নিয়ে আসা অপরূপ সুন্দরী ফৈজী কি তোমার ওপর বেইমানী করেছে?

হঠাৎ সিরাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বলল—বেইমানী, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ভাবী নবাবের কাছে এক ঝুটি আওরত করবে বেইমানী! কেন? সিরাজের তরবারীর ধার কি কমে গেছে মনে কর?

লুৎফা তাড়াতাড়ি কথা পাল্‌টে নিয়ে অন্যপ্রসঙ্গে যেতে গেল, এই সময় হঠাৎ অন্য মহল থেকে রমণী কণ্ঠের কর্কশ চীৎকার লুৎফার কক্ষে এসে আছড়ে পড়ল, সিরাজ সচকিত হয়ে বিস্ময়ে লুৎফার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—কিসের গোলমাল লুৎফা?

লুৎফা বেদনামিশ্রিতস্বরে মুখখানি নীচু করে বলল—আমায় জিজ্ঞেস কর না যুবরাজ, ও আমি বলতে পারব না, সরম লাগে।

সরমের কিছু নেই লুৎফা, তুমি নিঃসন্দেহে বল—আমি কিছু মনে করব না। তারপর অন্য মহলের গোলমালের দিকে কান সজাগ করে বলল—মনে হচ্ছে আম্মাজান আর ঘসেটি মাসির কণ্ঠস্বর? কি ব্যাপার লুৎফা—ওঁনারা অত উত্তেজিত হয়েছেন কেন?

লুৎফা লজ্জিত হয়ে বলল—তুমি বরং নবাবদিদার কাছে যাও, তাহলেই জানতে পারবে সব। বাঁদীর মুখে শুনে হয়ত তোমার রক্তে আগুন জ্বলে উঠবে। তাছাড়া নবাববেগম তোমাকে একবার তাঁর কক্ষে যাবার জন্যে সংবাদ দিয়ে গেছেন।

সিরাজ আর অপেক্ষা না করে উদ্বিগ্ন হয়ে দ্রুতপায়ে নবাববেগমের কক্ষের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নবাববেগম থাকতেন সম্পূর্ণ একটি ভিন্নমহলে। সেখানে বাইরের কারুরই যাবার খুব বড় একটা অধিকার ছিল না। শুধু সম্পূর্ণ অধিকার ছিল সিরাজ, লুৎফা ও দুই বাঁদীর। যে বাঁদীরা নবাববেগমের ইন্তেজারে সর্বদা লেগে থাকে। আগে এই কাজগুলি লুৎফা নিজেই করত কিন্তু সে সিরাজ কর্তৃক সম্মানিতা হতে নবাববেগম তাকে তাঁর কাজ থেকে রেহাই দিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে নবাববেগমের তুলনা হয় না। বৃদ্ধা এখনও যে শক্তি নিয়ে রাজকার্যে নবাবকে সাহায্য করেন তার তুলনা মেলা ভার।

মহলের তাঁর কক্ষটি সম্পুর্ণ অলঙ্কারহীন করে সাজানো। কক্ষের মধ্যে খুব বেশী আসবাব নেই, নেই কোন হীরা, জহরৎ, মণি, মাণিক্যের ছড়াছড়ি। শুধু নবাবের বসবার জন্যে কক্ষের মধ্যে মূল্যবান একটি ডিভান। সেটি অপরূপ অলঙ্কারাদি দিয়ে সাজানো। দামী ভেলভেটের পুরু আস্তরণ দিয়ে মোড়া। আর পালঙ্কটি বিশেষ সুরুচিপূর্ণ ও নবাবী কায়দায় সজ্জিত। দেখলে বোধ হয়, এসব আয়োজন নবাববেগম শুধু করে রেখেছেন নবাবের আয়াসের জন্যে, নিজের প্রয়োজনের জন্যে

নয়, নিজের প্রয়োজনে কিছু লাগে কিনা দেখলে বোঝা যায়, কক্ষের অন্যত্র তাকিয়ে। নবাববেগম খুব বেশি বিলাসিতা পছন্দ করতেন না বলে সেইজন্যে কক্ষের সজ্জাও তেমনি নিরাভরণ।

নবাববেগমের কক্ষের পাশেই গোলমাল। দুই কন্যা আমিনা ও ঘসেটির কলহের সপ্তকণ্ঠ সমস্ত প্রাসাদের শান্তি হরণ করেছে। নবাববেগম নিজের কক্ষের মধ্যে বসে কান দুটির মধ্যে দুই আঙুল পুরে দিয়ে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করেছেন, মুখের ওপর তার রেখা স্পষ্ট।

সিরাজ গিয়ে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করল। নবাববেগমকে ঐ অবস্থায় বসে থাকতে দেখে বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল—দিদিভাই, কি হয়েছে তোমার?

নবাববেগম কথা না বলে আঙুল দিয়ে ইসারায় বাইরের দিকে দেখিয়ে তারপর কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন—আল্লা আমার নসীবে সুখ লেখেননি, নবাববংশে শয়তানের দৃষ্টি পড়েছে।

কেন, কি হয়েছে বেগমদিদা? এত কলহই বা কিসের?

নবাববেগম হাত দিয়ে আবার ইসারা করে তারপর বললেন—শুনতে পাচ্ছ না সিরাজ আমার কন্যাদের চীৎকার? নবাববংশ আজ ঘোর পাপে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আল্লা কিছুতে আর নবাববংশকে দুনিয়াতে বাঁচতে দেবেন না। সব ধ্বংস হবে, আমি যেন শুনতে পাচ্ছি সেই ধ্বংসের সঙ্কেত। আমার চোখে আজ নিদ্ পালিয়ে গেছে, আমি নিশুতিরাতে এ প্রাসাদ নিস্তব্ধ হলে শুনতে পাই, কারা যেন বিনিয়ে বিনিয়ে সারারাত ধরে কাঁদে, নবাবকে বলেছি, তিনি আর যেন কারুর প্রাণদণ্ডের আদেশ না দেন—ঘাতকের কৃপাণ অপরাধীর মুণ্ড ছেদন করলে সেই অপরাধীর আত্মা এই প্রাসাদের চতুর্দিকে ঘুরে প্রতিশোধের মতলব আঁটে—তাদের প্রতিশোধের ফলই আজ নবাববংশের ধ্বংসের রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। নবাববেগম আবার উত্তেজিতস্বরে সিরাজকে সাবধান করে বললেন—সিরাজ এ নবাবীতখ্‌তে বসে নিজের জীবনটা হারিয়ো না, এ নবাবী তখ্‌তে রক্ত মাখানো আছে, যে বসবে তার দেহে রক্তের ছোপ লাগবে, পারতো এ নবাব সিংহাসনের মায়া ত্যাগ করে দূরে, বহুদূরে চলে যাও। কেন জান না? দিল্লীর অভিশপ্ত সিংহাসনে যাঁরাই বাদশাহ হয়ে বসেছেন, তাঁদের জীবনে শান্তি আসে নি। মানুষের জীবনে ধনদৌলত বড় নয়। শান্তিই বড়। বাদশাহ আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, ঔরঙ্গজেব কেউ বা শান্তি পেয়েছিলেন! মহামূল্যবান সিংহাসনে বসে তাঁদের ঘরে বাইরে শত্রু ঠেকিয়ে জীবন নির্বাহ করতে হত। রাজ্যের বিদ্রোহ দমনে তাঁদের জীবনের সমস্ত সময় ব্যয় হয়ে গেছে, তুমি কি মনে কর তাঁরা শান্তিতে ছিলেন? শান্তি তাঁরা পান নি! আমার এই নবাবীবংশ দিয়েই দেখতে পাচ্ছি, মুর্শিদকুলী খাঁ, সুজাউদ্দীন, সরফরাজ খাঁ তারপর তোমার দাদুভাই। কে এই নবাবী সিংহাসনে বসে শান্তি পেয়েছে বল তো? আমার তিনকন্যার শাদী দিয়েছিলাম নবাবের বড় ভাইয়ের তিন পুত্রের সঙ্গে। নিজেদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের

মধ্যে শাদী দিয়ে নিজেদের বংশে মঙ্গল আনতে চেয়েছিলাম। নবাবের বড় ভাই হাজি আহমদের চরিত্রবান তিন পুত্রের সঙ্গে তিন কন্যার শাদী দিয়ে আজ তার শেষ পরিণতি কি দেখছি? নওয়াজেস ঘসেটির ওপর বীতরাগ হয়ে তার রংমহলে অন্য আওরতের সুখে জীবন নির্বাহ করছে। জৈনুদ্দিন আফগানদের হাতে নিহত হতে আমিনা কেমন যেন পাগল হয়ে গেছে। তারপর থেকেই তার পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। আফগান সর্দার সমসের খাঁ কি তার ওপর কোন অসম্মানসূচক অত্যাচার করেছিল, জানি না কি করেছিল? তারপর থেকেই আমিনার কেমন যেন সবকিছু বেআব্রুভাব—তারপর নবাববেগম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—আর মৈমানার কথা ছেড়ে দাও। সে দুনিয়ার এমন জায়গায় গিয়ে আছে যে তার গায়ে কলঙ্কের কোন কালিমাই লাগবে না।

নবাববেগম থামলে অনেকক্ষণ বিস্ময় নিয়ে সিরাজ চুপ করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকল, শুনতে লাগল কক্ষে ভেসে আসা—ঘসেটি বেগমের উত্তেজিত ও উদ্‌ভ্রান্ত স্বর। কথা কিছু বোঝা যায় না, তবে প্রচণ্ড আক্রমণ অনুভব করা যায়। যেন ঘসেটি তাঁর ক্ষুরধার দাঁতের কামড়ে কারুর দেহ ক্ষতবিক্ষত করবার জন্যে আস্ফালন করছেন, এমনই তার চীৎকারের প্রতিধ্বনি। সিরাজ জানত, তার আম্মাজান স্বভাবত একটু ঠাণ্ডা মেজাজের। তিনি যে ঘসেটি বেগমের সঙ্গে কিছুতেই পারবেন না, এও সে জানত। তাই আমিনা বেগমের কোন স্বর শুনতে না পেয়ে সে বিস্মিত হল না। আম্মাজান যে তার কক্ষ থেকে ক্ষীণকণ্ঠে তার বাণ প্রয়োগ করেছেন, এ সিরাজ অনুমান করতে পারল—আর সেই জ্বালাময় আঘাত সহ্য করতে না পেরে ঘসেটিবেগম তাঁর কাঁসর কণ্ঠে প্রাসাদ প্রকম্পিত করছেন, এবং তাঁর স্বরই উচ্চকিত হয়ে উঠেছে প্রাসাদের গম্বুজে গম্বুজে।

কিন্তু কি নিয়ে এত কলহ? তা অনুমান করতে পারল না সিরাজ। কারণ সে বিশেষ কিছুই নবাবপ্রাসাদের খোঁজ রাখত না। শুধু জানত তার আম্মাজান ও ঘসেটি বিবি হোসেন কুলী খাঁকে নিয়ে মত্ত। তবে কি সেই হোসেনকুলীকে নিয়েই এঁদের বিবাদ? সেই রূপবান নওজোয়ান মরদকে নিয়ে দুই বেসরম আওরতের অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে? সিরাজ ঠিক বুঝতে না পেরে নবাববেগমকে জিজ্ঞেস করল—বেগমদিদা, এঁদের কলহটা কিসের জন্যে?

বেগমসাহেব ঘৃণামিশ্রিতস্বরে বললেন—ওসব কথা জিজ্ঞেস করে আমাকে তক্‌লিফ দিও না দাদুভাই, আমি জীবনে যা কল্পনা করি নি, আমার কন্যাদের দ্বারা তাই সংঘটিত হচ্ছে। আমি একটি পুরুষকেই সারাজীবন ধরে জেনেছি, ভাগ্যান্বেষণে পথে পথে তার সঙ্গে ঘুরেছি তারপর যখন দৌলতের রোশনাইতে নসীব খুলে গেছে তখনও সেই পিছনের দিনগুলি নিয়ে আলোচনা করে আল্লাকে জোড়হাত করে প্রার্থনা জানিয়েছি—'হে আল্লা, খোদাতাল্লা তোমার সৃষ্টজীবের প্রতি তোমার অপার করুণা। তুমি যাকে দাও, ছপ্পর ভরে দাও, যাকে দাও না সে পথের ফকিরী নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। তার চোখের জল পথের ধুলাতেই মিশে যায়, তার ডাক

তোমার কানে পৌঁছায় না।' তাই সেই মন্দ নসীবের কথা কোনদিনও বিস্মৃত না হয়ে নবাবকে বলি, নবাব শেষজীবনটা আর মানুষের সংহার করে হস্ত কলুষিত কর না—পার তো প্রাণপণে ক্ষমা করবে। এ জন্মের ফল যাতে পরজন্মে ভোগ করতে না হয় তার জন্যে বাকী জীবনটা আল্লার প্রার্থনায় মন নিয়োজিত কর।

সিরাজের এসব তত্ত্বকথা ভাল লাগছিল না, সে চায় কিছু করতে। তাই বৃদ্ধার কথায় তার অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল। তবে সে নবাববেগমের দুঃখের জন্যে মনের ব্যথা অনুভব করছিল কিন্তু কি করবে সে? তারও কি মনের মধ্যে আত্মাজানের জন্যে কষ্ট হচ্ছিল না? তার গর্ভধারিণী হয়ে সেই আম্মা তার পরপুরুষের প্রতি আসক্তা। একথা তাকে বেঁচে থেকেও শুনতে হচ্ছে। অথচ তার অসীম ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে কিছু করতে পারছে না—এর যে কি জ্বালা যে একমাত্র এই অবস্থায় পড়েছে সেই বুঝবে? এক এক সময় ইচ্ছে হয়, নবাব-প্রাসাদের এই কলঙ্ক-ইতিহাস ছোরার আঘাতে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়—মাতৃরক্তে হাত কলুষিত করে ইতিহাসের পাতায় রঞ্জিত হয়ে থাক—তবু তার শক্তির পরিচয় লিপিবদ্ধ হবে। অন্তত লোকে অনুকম্পামিশ্রিতস্বরে তার আম্মাজানের ব্যভিচার নিয়ে তাকে অনুগ্রহ দেখাতে আসবে না।

ভাবনা থেকে সরে এসে তিক্তকণ্ঠে সে নবাববেগমকে জিজ্ঞেস করল—তাহলে তুমি ডেকেছ কেন দিদিভাই?

এমনি ডেকেছিলাম সিরাজ। প্রয়োজন কিছু নেই। তুমি মাঝে মাঝে এই নসীবহারার সঙ্গে দেখা করে গেলে প্রাণটা শীতল হয়, সেইজন্যেই আসতে বলে এসেছিলাম লুৎফার কাছে।

তাহলে এবার যাই। নবাববেগমের সম্মতির অপেক্ষা না করেই সিরাজ আবার লম্ফপ্রদান করে নবাববেগমের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। এবার তার যাবার পালা স্নেহময় দাদু বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবের ক্রোড়ে। এ প্রাসাদে এলে যেন ঐ মানুষটির কাছে যাবার জন্যে সিরাজের মনটা আকুলি-বিকুলি করে ওঠে। পূর্বদিনের যে লজ্জা দাদুর পাশে বসে সিরাজ অনুভব করেছিল, আসলে সে লজ্জা তার বাহ্যিক রূপের সৃষ্টি, অন্তরের নিভৃততম প্রদেশের আকাঙ্ক্ষা তার দাদুর কাছ থেকে সেই ছোটবেলাকার মতো আদর পাওয়ার আশা। সেই দাদুর স্নেহস্পর্শের জন্যে এখনও এই যুবা বয়সেও তার মন আকাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে। সমস্ত দুঃখের সান্ত্বনা এই দাদুর স্নেহ ক্রোড়ের স্পর্শসুখ। সমস্ত মানসিক চাঞ্চল্য দমন হয়ে যায় ঐ জায়গায় বসলে। সেখানে বসলে সিরাজের মনেই থাকে না সে পরিণত হয়ে এখন একটি গোটা মানুষের মতো সমস্ত সুখ ভোগ করতে পারে। তার যেন মনে হয় এখনও সেই ছোট্ট সিরাজের মতো সে দাদু আলিবর্দীর পিঠে চড়ে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুনিয়ার কেউ যদি আপন হয় এই দাদু আলিবর্দী ও নবাববেগম। এই দুজনকে ছাড়া সে তার মা, বাবাকেও অত ভাল করে জানে না।

হঠাৎ পথে দেখা তার কনিষ্ঠভাই মির্জা মেহেদীর সঙ্গে। বালক হাতে একটি কবুতর নিয়ে তার মুখের ভেতর হাত প্রবেশ করাচ্ছিল, কবুতরটি সেই বালকটির হাতটি ঠোঁটের পেষণে চেপে ধরছিল, মেহেদী ক্ষেপে গিয়ে হাত বের করে নিয়ে তাকে থাপ্পড় মারছিল। সিরাজ যেতে ভাইয়ের কাণ্ড দেখে তার হাত থেকে কবুতরটি কেড়ে নিল, নিয়ে হঠাৎ বাইরে আসমানে ছুঁড়ে দিয়ে বলল—ভাইজান, কবুতরের ছোট্ট জান নিয়ে কখনও খেলা করতে হয় না। ওর জায়গা ঐ আসমানে, তাই উড়িয়ে দিলাম।

মেহেদী বড় বড় তুটি চোখ আরও বড় করে মাথা নেড়ে বলল—আমিও উড়িয়ে দেব ভাবছিলাম। তবে কবুতরটা ঘাড় নেড়ে নেড়ে আমায় বড্ড দেখছিল বলে তাই তাকে নিয়ে খেলা করছিলাম।

সিরাজ মেহেদীর কথায় হাসতে হাসতে নবাব আলিবর্দীর কক্ষে ঢুকল। কক্ষে ঢুকতেই নবাব আলিবর্দী নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সিরাজকে আলিঙ্গন করবার জন্যে এগিয়ে এলেন, বললেন—আমার দাতুভাই কখন এসেছে শুনলাম, এখনও আমার কাছে আসছে না দেখে তাই মনটা বড় ছটফট করছিল, তোমার জন্যে খানসামাকে আজ এক নয়া খানা বানাতে বলেছি, তুমি আবার এখুনি পালিয়ে যাবে না তো দাতুভাই!

সিরাজ দাতুর আলিঙ্গন থেকে একটু সরে গিয়ে বলল—যদি পালিয়েই যাই, তাহলে তোমার কি ক্ষতি দাতু?

হঁ্যা, ক্ষতি বৈকি দাতুভাই! এই বলে নবাব আলিবর্দী মাথাটা বেশ জোরে কবার আন্দোলিত করলেন, তারপর বললেন—ক্ষতি আপাতত আমার ফরমাইজি ভাল রান্নাটা। তারপরের ক্ষতি, নবাবী তখ্‌ত? তেমন কোন যোগ্যব্যক্তি কি আজ এই নবাববংশে আছে? সব তো শয়তান! শুধু মুর্শিদাবাদের দৌলতের প্রতি সবার লক্ষ্য, রাজ্যের প্রতি নয়। রাজ্য চালাতে যে মেহনতের প্রয়োজন সে মেহনত কারও নেই। সেই সিংহাসনের জন্যেও আমার দাতুকে দরকার সিরাজ।

তুমি একটু অতিরিক্ত স্নেহ কর বলে আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, না'হলে নবাববংশে বহু লোক আছে যারা বাংলার সিংহাসনে বসবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। কেন মীরজাফর? হঠাৎ সিরাজের মুখ দিয়ে মীরজাফরের নামটা বেরিয়ে এসেছিল, সে পূর্বকল্পিতভাবে মীরজাফরের নামটা উচ্চারণ করেনি। কিন্তু নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ তার গতরাত্রের মীরজাফরের সেই ব্যবহারটার কথা মনে পড়ল। ফৈজীর নাচ দেখে খুশী হয়ে মোহর ইনাম যদি না দিত তাহ'লে কি আজকে ফৈজী এতখানি বিদ্রোহী হতে পারত! নিশ্চয় এই মীরজাফরের চক্রান্তেই ফৈজীর মন বিগ্‌ড়েছে।

কিন্তু আলিবর্দী মীরজাফরের নাম শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, মীরজাফর, সেই বেইমান! যাকে আমি তু-তুবার তাড়িয়ে দিয়েছিলাম—তাকে দেব নবাবী সিংহাসন? কেন—কি জন্যে? আমার বংশের আর কি কেউ নেই যে সিংহাসনে বসতে পারে?

যদি না থাকে নিজে হাতে গঙ্গার জলে সিংহাসনখানা ফেলে দিয়ে আসবো, তবু ঐ ধরণের বেইমানদের সিংহাসনে বসিয়ে সিংহাসন কলঙ্কিত করব না।

সিরাজ দাদুকে আরও ক্ষিপ্ত করবার জন্যে বলল—তবে জেনেশুনে এইসব বিশ্বাসঘাতকদের রাজ্যের যোগ্য পদে রেখে তাদের সম্মান দিয়েছেন কেন? নিজের আত্মীয় করে নবাববংশকে কলঙ্কিত করেছেন কেন?

নবাব আলিবর্দী প্রথমে কোন কথার উত্তর দিলেন না, মনে হয় তিনি ভেতরে ভেতরে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন। তিনি অন্য দিকে মুখ সরিয়ে কেমন যেন বিবশ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন। মীরজাফর আলি খাঁর ওপর তারও অনেক অভিযোগ ছিল। তাঁর সংবহিন শাহ খানানের সোহাগের রোশনাই বলে ভগ্নিপতির ওপর ক্ষিপ্ত হয়েও তিনি কিছু করতে পারেন নি। না'হলে সেই বিদ্রোহীদের সাথে যোগদানের পর তাঁর সেই মাথা তোলবার ইচ্ছাকে চিরদিনের মতো একেবারে শেষ করে দিতে পারতেন।

সেদিন তিনি মুস্তাফার বিদ্রোহ নিয়ে বিব্রত, অন্যদিকে দৃষ্টি দিতে পারেন নি। উড়িষ্যা অঞ্চল এতদিন মীর্ হবীব ও মহারাষ্ট্রীয় দলের হাতে ছিল। এখন মীরজাফর খাঁকে তাঁর পূর্বপদ সামরিক বিভাগের দেওয়ানী ব্যতীত উড়িষ্যার নায়েবী ও মেদিনীপুর এবং হিজলী অঞ্চলের ফৌজদারী অর্পণ করে সসৈন্যে মহারাষ্ট্রীয়দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। মীরজাফর খাঁ বহুদিন উচ্চপদের বেতন ভোগ করে ক্রমশ প্রকৃত বাজ-জামাতার মতো বিলাসী ও আলস্য-পরায়ণ হয়ে পড়েছিলেন। মেদিনীপুরের কাছে সামান্য একদল মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যকে পরাভূত করে তিনি কর্মনাশা তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে শিবির সন্নিবেশ করলেন। পরে রঘুজীর পুত্র জানকীর অধীনে মহারাষ্ট্রীয়রা আগমন করছে সংবাদ পেয়ে মেদিনীপুর রক্ষার আশা ত্যাগ করে বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হলেন। সেনাপতির এরকম সাহস দেখে ক্ষিপ্রগামী মহারাষ্ট্রীয় দলের অগ্রভাগ বর্ধমানের কাছে তাঁর কিছু দ্রব্যসামগ্রী ও কয়েকটি হস্তী অপহরণ করল, এবং চতুর্দিকে অত্যন্ত লুণ্ঠনকার্য করে বেড়াতে লাগল। আলিবর্দী এই সংবাদ পেয়ে আতাউল্লা খাঁকে একদল সৈন্যসহ তাঁর সাহায্যার্থে প্রেরণ করলেন। মিলিত সৈন্য বর্ধমানের কাছে মারাঠাদের পরাভূত করল। কিন্তু আতাউল্লা এতদূর কৃতিত্ব দেখিয়েও একজন চাটুকারের ভবিষ্যদ্বাণীতে মুগ্ধ হয়ে রাজ্যভোগের সুখস্বপ্ন দেখলেন। মীরজাফর খাঁকে স্বপক্ষে আনয়ন করে লঙ্কাভাগের পরামর্শ আঁটতে বেশী সময় লাগল না। মীরজাফর বন্ধুবর্গের অনুযোগে এই কল্পনা থেকে নিবৃত্ত হয়েছেন, এমন সময়ে নবাব আলিবর্দী খাঁ সসৈন্যে কাছে এসে পৌছলেন।

মীরজাফর বর্গীদলের প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়েছেন বলে তিরস্কৃত হলে অভিমানে কয়েকদিন নবাবের কাছে এলেন না। নবাব আলিবর্দী সবই বুঝতে পারলেন। তিনি শুধু কৌশলে আতাউল্লাকে পদচ্যুত করে মুর্শিদাবাদে পাঠালেন। ভগিনীপতির মানভঞ্জনের কল্পনায় নবাব কয়েকদিন পরে মীরজাফরের কোন আত্মীয়ের মৃত্যুকে শোকপ্রকাশের জন্যে তাঁর শিবিরে যাবার অভিপ্রায়ে বেরোলেন, নির্বোধ মীরজাফর

সম্ভাষণ করতে অগ্রসর হলেন না দেখে নবাব কিয়দ্দূর থেকে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হলেন। এরপর মীরজাফরকে তাঁর দেওয়ান সুজন সিংহের দ্বারা কার্যের হিসাব-নিকাশ দেওয়াবার আদেশ পাঠানো হল, তিনি অসম্মত হলে সুজন সিংহকে বলপূর্বক নবাবের কাছে আনা হল। নবাব কিন্তু বিচার করলেন বিপরীত। তিনি সুজন সিংকেই হিজলীর ফৌজদারীপদ প্রদান করলেন, এবং অপর এক ব্যক্তিকে সামরিক বিভাগের দেওয়ান করলেন। মীরজাফরের অধীন সৈন্যদলকে অন্যান্য সেনাবিভাগে কাজ দেবার আদেশ প্রচারিত হলে অনেকেই সাগ্রহে তা গ্রহণ করল, তাঁর সৈন্যদলও এইভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অতঃপর মীরজাফরের চৈতন্য হল। গর্ব ও অভিমান দূর করে দিয়ে তিনি মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে নওয়াজেস মহম্মদ খাঁর শরণ নিলেন।

নবাব সেদিন যেভাবে মীরজাফরের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন, তাতে তিনি আর কোনদিন তাঁকে রাজকার্যে বহাল করার কথা চিন্তা করতেন না কিন্তু হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়ে গেল। তাঁর কাছে দুঃসংবাদ এল, পাটনার প্রাসাদে আফগানরা তাঁর জামাতা জৈনুদ্দিন, কনিষ্ঠকন্যা আমিনার সোহাগকে নিহত করে ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজি আহমদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে তারা তাঁকে নিহত করেছে এবং সমসের খাঁ কন্যা আমিনা ও দৌহিত্র ও দৌহিত্রীদের বলপূর্বক তার শিবিরে বন্দী করে রেখে নাগরিকদের ওপর দারুণ অত্যাচার চালাচ্ছে।

এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার সংবাদে নবাব আলিবর্দী খাঁ মর্মাহত হলেন। রাষ্ট্রবিপ্লবে সমগ্র দেশ বিপর্যস্ত, বিহার শত্রুকরতলগত, মহারাষ্ট্রীয়রাও বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। চতুর্দিকে বিপজ্জালে জড়িত হয়েও নবাব নিজের অভ্যস্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও মনস্বিতা হারালেন না। বৃদ্ধ বয়সেও দ্বিগুণ মানসিক বলের সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। প্রধান সেনানায়ক ও কর্মচারিদের মন্ত্রণাগারে আহ্বান করলেন, এবং উপস্থিত বিপদে কর্তব্য অবধারণের জন্যে সকলের পরামর্শ চাইলেন। নবাব বললেন—'আমার প্রাণসম জামাতা ও সহোদর বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহী হস্তে নিহত, দুহিতা ও পরিবারবর্গ অবরুদ্ধ, অবমানিত, জীবন আমার পক্ষে এক্ষণে দুর্বহ ভার মাত্র। আপনারা আমার প্রিয় সুহৃদ, যুদ্ধক্ষেত্রে সুখে দুঃখে সহচর, সকলেরই পরামর্শ এ সময়ে আমার কাজে সাহায্য করবে।'···সেদিনের নবাবের সেই অসময়ে তাঁর বিলাপে সকলেই শপথ গ্রহণ করে এগিয়ে এসেছিল। সকলেই কোরাণ স্পর্শ করে যুদ্ধযাত্রার জন্যে আয়োজন করতে এগিয়ে গিয়েছিল।

নবাব আলিবর্দী সেই দুর্যোগে কাকেও দূর করে রাখেননি, আবার কাছে ডেকে নিয়েছিলেন, তাঁর অন্তর দিয়ে মহব্বত দান করে বিশ্বাসঘাতককেও পথ ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। মীরজাফর খাঁর সঙ্গে এইসময় তাঁর পুনর্মিলন হয়েছিল। তাঁকে পূর্বপদে পুনরাভিষিক্ত করে নবাব তাঁর অধীনস্থ পাঁচ ছয় সহস্র লোককে আতাউল্লা খাঁ ও নওয়াজেস্ মহম্মদের সঙ্গে একযোগে নগর রক্ষা ও মহারাষ্ট্রীয়দের বাধাপ্রদান প্রভৃতির ভার দিয়ে সসৈন্যে নগর হতে বিদায় নিয়েছিলেন।

এসব কাহিনী বেশ ভাল করে সিরাজও জানে নবাব আলিবর্দীও বেশ অবগত

আছেন। তাই দুজনেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর আলিবর্দী একটু উপদেশের ছলে বললেন—বহিন্‌ শাহখানানের সোহাগ কোনদিন নবাবের বিচারে মীরজাফর আলির দেহচ্যুতির সংবাদ বহন করত কিন্তু তা কেন করিনি জানো,—রাজ্যের অন্যান্যদের যেমনি রাজনীতির বিচারে ক্ষমা করেছি, তেমনি আমার ভগ্নীপতিকেও ক্ষমা করতে বাধ্য হয়েছি। শয়তানকে আঘাত করলে পাছে অন্যান্য শয়তানরা বিদ্রোহী হয়ে আস্ফালন শুরু করে দেয় সেইজন্যেই সবাইকে বশে রাখবার জন্যে তাদের খুশী করেছি। এমনি করে রাজ্যের শত্রু মিত্রকে আপন করে রাখতে পেরেছি বলে তারা আমাকে সিংহাসনে বসতে সাহায্য করেছে, না'হলে আফগানদের মতো অন্তর্বিরোধের বহ্নিতে কোনদিন আমি সিংহাসনের পাশে পড়ে গিয়ে রক্তাক্ত-মুখ লুকোতুম।

তারপর আলিবর্দী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সিরাজের স্কন্ধে একটি হাত রেখে বললেন—সিরাজ, রাজ্য পরিচালনা করতে গেলে শুধু কৌশলের ওপর দিয়েই তা শাসন করতে হয়, রক্তচক্ষু দেখিয়ে না। তোমার ভয়ে মানুষ ভয় পাবে একদিন, কিন্তু যখনই তোমাকে কায়দায় পাবে, আল্লার নামে তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার প্রাণবধ করবে। তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য কর, আমি আমার নিজের হারেমের শান্তির প্রতি যত না লক্ষ্য দিই আমার প্রজাবর্গের শান্তির প্রতি তত লক্ষ্য দিই—কিন্তু কেন? এই কেনর প্রশ্নই রাজনীতি। ওরা সন্তুষ্টই থাকলে তবে আমার সিংহাসন থাকবে, তবে থাকবে নবাবী। আর নবাবী থাকলে আমার চিন্তা থাকবে। কিন্তু ওরা সন্তুষ্টই না থাকলে অন্তর্বিরোধের বহ্নি আমার পাশে দণ্ডায়মান আমারই মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে বিরাজিত হবে, তারা ছুরি শানিয়ে আমার কণ্ঠরোধ করবার জন্যে ওত পেতে থাকবে।

তারপর আবার বৃদ্ধ আলিবর্দী দম নিয়ে বললেন—সিরাজ, সেই সিংহাসনের আগামী নবাব তুমি। তোমাকেই আমি যোগ্য বলে এই সিংহাসনে বসিয়ে যাব—কিন্তু তোমার দাদু আলিবর্দীকে কখনও ভুলব না। তার রণকৌশল, কূটনীতি, রাজ্যপরিচালনার ক্ষমতাগুলি মনে মনে স্মরণ করে বাংলা, বিহার. উড়িষ্যার নবাবী তখ্‌তে বসে নবাবী বংশের ইজ্জতকে টিকিয়ে রেখ—আমার আত্মা কবরের তলা থেকে তোমার মঙ্গলের জন্যে আল্লার কাছে সর্বদা প্রার্থনা জানাবে।

হঠাৎ আলিবর্দী একটু চুপ করতে, সিরাজ আর থাকতে পারল না, একই কথার পুনরাবৃত্তি শুনতে শুনতে সে তিক্ত হয়ে গিয়েছিল, বলল—দাদু তুমি কি এবার চুপ করবে—না আমি প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাব।······যে কথাগুলি তুমি বলছ, তা তো আমাকে বহুবার শুনিয়েছ, আর কতবার শোনাবে বল। আমায় যদি সিংহাসন দিয়ে গেলে তোমার বিশ্বাস পুরোমাত্রায় থাকে তাহলে এও বিশ্বাস কর-আমি আমার দাদু আলিবর্দীকে কখনও বিস্মৃত হব না।

ম্লান হাসলেন বহুদর্শী ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দী। তারপর বললেন—একই কথার পুনরাবৃত্তি কেন করি তা যদি জানতে।······আমি

যত অসুস্থ হয়ে পড়ছি, শক্তিহীন হয়ে যাচ্ছি, ততই আমার ওপর যেন দুশমন এসে চেপে ধরছে আমার কণ্ঠ,—মুখব্যাদান করে চীৎকার করে আমায় শাসিয়ে বলছে—নবাবীবংশ আর বেশী দিন নয়, তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।······ আমার যেন চোখের ওপর ভেসে উঠছে এই রাজ্য, এই সিংহাসন অগ্নির লেলিহান শিখায় দাউদাউ করে জ্বলে উঠছে, আর আমি সেই আগুনের ভেতর থেকে আমার দাদু সিরাজের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, যেন আগুনে পুড়তে পুড়তে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে ক্রন্দনভারে ছিন্নভিন্ন হয়ে ভয়ার্তস্বরে চীৎকার করে আমাকে ডাকছে— দাদু আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, এ অভিশপ্ত সিংহাসনের চক্রান্ত থেকে আমাকে তুমি বাঁচতে সাহায্য কর।······আমি হাত বাড়াচ্ছি আমার দাদু সিরাজকে ধরবার জন্যে কিন্তু আমার হাত শেষপর্যন্ত পৌঁচোচ্ছে না, আমার দাদু তলিয়ে যাচ্ছে, একেবারে তলিয়ে যাচ্ছে অতলতলে। ·····উফ্ ! আলিবর্দী আবেগে চীৎকার করতে করতে হঠাৎ হুহু করে কেঁদে উঠলেন।

আর সিরাজ পাগলের মতো উত্তেজিত হয়ে আলিবর্দীকে ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে বলতে লাগল—না, না এ কখনই হবে না দাদু। তুমি কেন এতো উতলা হচ্ছ, আমি কখনও কোন অন্যায় করব না। তোমার সিংহাসন যাতে বজায় থাকে তার ব্যবস্থা করব। তুমি আমায় বিশ্বাস কর দাদু।

আলিবর্দী আবার কাঁদতে কাঁদতে বললেন আমি তো বলিনি দাদু তোর অপরাধে এ সিংহাসন ধ্বংস হয়ে যাবে। তোকে, তোকে ধ্বংস করে দেবে। এই সিংহাসনের অভিশপ্ত প্রেতাত্মা আমার সোনার দাদুর অঙ্গে কালিমালিপ্ত করে দেবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী যে অহরহ আমি প্রার্থনার মধ্যে শুনতে পাই। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবী তখ্ত একদিন ভাগীরথীর স্রোতে ডুবে যাবে। আর আমার আদরের দাদুর ছিন্নমুণ্ড মুর্শিদাবাদের পথের ধুলোয় লুটোবে।······কেন যে এই সব বিশ্রী দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে, বুঝতে পারি না, কিন্তু আমি তো জানি, যে দৃশ্য আমি চোখের ওপর দেখতে পাই, সে যে একদিন ফলে তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি। এক একসময় ভাবি, হয়ত বৃদ্ধ হয়েছি, জরা আমার শরীরে ছেয়ে গেছে বলে তাই আমার মনে হাজারো দুশ্চিন্তা আমাকে আতঙ্কিত করে তোলে কিন্তু সে যে দারুণ ভুল, তাও আমি জানি।

সিরাজ আর সহ্য করতে পারল না। আজ এ প্রাসাদে আসবার পর থেকে সব অমঙ্গলবার্তা শুনে শুনে কেমন যেন তার ভেতরের সমস্ত শক্তি ও সাহস আস্তে আস্তে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল, দাদু আলিবর্দীও সেই পরিবেশকে আরও চরম করে তুলতে তাই সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল, তার ইচ্ছা করল এই মুহূর্তে কোথাও গিয়ে নিজের মুখ লুকিয়ে এই অবস্থা থেকে নিজেকে প্রতিরোধ করে, কিন্তু কোথায় যাবে? দুনিয়ার দুটি স্নেহের ক্রোড় তার চির আকাঙ্ক্ষিত, সেই দুটি ক্রোড় আজ বিপদের আশঙ্কায় কাঁপছে, সে জানে না আগামী দিনে কি বিপদ আসবে, কিন্তু আসবার পূর্বে নবাব ও নবাববেগমের মুখ থেকে তার প্রতিধ্বনি শুনে সত্যিই তার

মনে ভয়ের উদয় হল। তবে কি তার জীবনে সুখ নেই, আছে আগুনের প্রদাহ? নবাবী সিংহাসনের হীরামোতির জৌলুস যেখানে তাকে নিয়ত প্রলুব্ধ করে ভবিষ্যৎ স্বপ্নে আত্মমগ্ন করে রাখে সেখানে সেই জৌলুস আসল জৌলুসের রোশনাই নিয়ে জ্বলে না, নকল রোশনাই তাকে প্রলুব্ধ করে বিপদের মধ্যে নিমজ্জিত করতে চায়? তবে সে সিংহাসন ও সিংহাসনের বৈভবে তার দরকার নেই। তার চেয়ে সে ভাগ্যান্বেষণে দেশে দেশে বিচরণ করে ফিরবে। সেইজন্যে সে দাদু আলিবর্দীর দিকে ফিরে বলল—নবাবদাদু, আমি তোমার সিংহাসন চাই না, চাই না রাজ্য, চাই না তোমার দৌলত—তুমি অন্য কাউকে তোমার এই সিংহাসন দিয়ে যাও·· ······ বলতে বলতে সিরাজের চোখে জল এসে গেল, সে তা রোধ করতে পারল না—ছুটে নবাবকক্ষ থেকে বেরিয়ে এল, একেবারে প্রাসাদের বহির্ভাগে চলে এসে অশ্বের ওপর সওয়ার হয়ে বসল। তারপর অশ্বের গায়ে চাবুকের শব্দ করে ছুটিয়ে দিল অশ্ব ঊর্ধ্বশ্বাসে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ এ নবাববংশ কখনও টিকবে না সে তা জানে, এ নবাববংশ বালির ওপর প্রাসাদ রচনা করে তৈরি হয়েছে অনেক অন্যায়ের মুসাবিদা করে। সে ইতিহাস খুব ছোটবেলা থেকেই সিরাজ জানে। এই কিছুক্ষণ আগে যে নবাববেগম খেদ প্রকাশ করছিলেন, সেই অন্যায়কে উদ্দেশ্য করেই। সে পাপ কিছুতে ক্ষমার যোগ্য নয় সে কথা নবাববেগম যেমনি জানেন নবাব আলিবর্দীও তেমনি জানেন।

সেই অন্যায়ের প্রতিকার কল্পে নবাব আলিবর্দী নবাবী তখ্‌তে বসে জীবনের বাকী দিনগুলি মানুষের কল্যাণ করবার চেষ্টা করেছেন, তাতে যদি তাঁর অপরাধের কিছুটা লাঘব হয় সেইজন্যে তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। দিন ও রাত্রির সূর্য ওঠার ও অস্ত যাওয়ার সময় আল্লার কাছে প্রত্যহ প্রার্থনা জানিয়েছেন শুধু সেই অপরাধের মার্জনার জন্যে। কোরাণের ব্যাখান আবৃত্তি করে তিনি মনকেই বোঝাতে চেয়েছেন, মনের শুদ্ধি এনে মনের মালিন্যকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেয়েছেন—তবু তাঁর মুক্তি হয় নি। তাই তিনি চোখের মধ্যে কেবল ধ্বংসের ছবি, কানের মধ্যে অমঙ্গলের সংকেত শুনে আতঙ্কিত হয়ে ছটফট করে ঘুরে বেড়ান।

সিরাজ ভাবল, আচ্ছা দাদু আলিবর্দীর সেই অপরাধ কি তারও ওপর প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্পে পরিণত হতে পারে? সে তো এখনও সজ্ঞানে কিছু মারাত্মক অপরাধ করে নি, তাহলে তার ওপর নবাব আলিবর্দীর অপরাধের শাস্তি বর্ষিত হবে কেন? হয়ত সে সেই গোস্তাখিবংশের সন্তান বলেই তার ওপর সর্বনাশের স্পর্শ লাগবে। আর সে যদি সেই কলঙ্কময় রুধিরাক্ত সিংহাসনে বসে—তাহলে তো কথাই নেই বংশকে ছারখার করতে তার ওপর নেমে আসবে শতমুখী সর্বনাশের শয়তানী খড়্গ।

সিরাজ আরও ভাবল—ছুনিয়ার নবাব, বাদশাহরা অপরকে ঠকিয়ে তাদের বেইমানী ক'রে মানুষকে হত্যা করে তবে তাদের একাধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে, নবাব আলিবর্দীও সেই পথ অবলম্বন করেছিলেন। তিনি এসেছিলেন

অনেক দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে ভাগ্যান্বেষণে এই বঙ্গদেশে। আলিবর্দী ছিলেন তুর্কবংশীয়। তাঁর পিতামহ বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের 'দুধভাই' বলে বাদশাহ-সরকারের সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহম্মদ্ যুবরাজ আজিম্‌শার কর্মচারী ছিলেন। আজিমশা পরাজিত ও নিহত হওয়ার পরে কিছুকাল এঁরা ভীষণ কষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন। তারপর একদিন সপরিবারে মাতার আত্মীয় সুজা খাঁর কাছে বঙ্গদেশে আগমন করেন। আলিবর্দী স্বয়ং প্রথমত মুর্শিদাবাদে উপনীত হন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা দূরে থাকুক বরং উপেক্ষাই প্রদর্শন করেছিলেন। চরিত্রহীনতার জন্যে জামাতা সুজার প্রতি বিরাগবশত এই ব্যবহার করেছিলেন, কেবল তাই নয় নবাগত অজ্ঞাতকুলশীল ভাগ্যমৃগয়ান্বেষণে ধাবমান্ মুসলমান সামন্তবর্গের প্রতি তাঁর কোন কালেই আস্থা ছিল না।

আলিবর্দী খাঁ ক্ষুণ্নমনে পিতামাতার কাছে উড়িষ্যায় সুজা খাঁর দরবারে গমন করেন। সুজা ইতিপূর্বেই তাঁর পিতা-মাতার জন্যে বৃত্তি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, এক্ষণে আলিবর্দী খাঁর বুদ্ধি, কৌশল ও কার্য-দক্ষতা লক্ষ্য করে তাঁকে একশত টাকা বেতনে একটি রাজকর্মে নিযুক্ত করেন। রাজকার্যে প্রখর বুদ্ধি ও যুদ্ধে অসীম সাহসিকতা দেখে তিনি অবিলম্বে আলিবর্দীকে এক বিভাগের ফৌজদারের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মক্কা প্রত্যাগত হাজি আহমদ্ তিনপুত্রসহ উড়িষ্যায় আগমন করে নানারূপ রাজকার্য সম্পাদন ও তৎসহ অর্থলাভে নিযুক্ত হন। তাঁদের দুই ভ্রাতার কার্যকুশলতায় ও আন্তরিক যত্নে সুজা খাঁর শাসনকার্যের উন্নতি সাধিত হতে লাগল, সুতরাং দিন দিন তাঁদের ওপর সুজার যথেষ্ট শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেতে লাগল।

কিন্তু এই মক্কা প্রত্যাগত আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহমদ্ যদি আলিবর্দীর সঙ্গে এসে যোগদান না করতেন তাহলে হয়ত ইতিহাসের চক্র অন্যদিকে ধাবিত হত, হয়ত আলিবর্দী আগামী দিনে বাংলা বিহার, উড়িষ্যার নবাব হতে পারতেন না কিন্তু একজন সৎলোক ও পরিশ্রমী বলে নাম থাকত। আলিবর্দী তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যেই নবাব হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং এই স্বপ্নই তার যত অপরাধের মূল।

তারপর সুজা খাঁ মুর্শিদাবাদের নবাব হবার পর আলিবর্দী খাঁ উপাধি ও মন্‌সবী (সেনানায়কত্ব) প্রাপ্ত হন। দিন দিন উন্নতির শিখরে আরোহণ করেন। হাজি আহমদ্, রায় রায়ান্ আলমচাঁদ ও ফতেচাঁদ জগৎশেঠকে নিয়ে 'সুজাখাঁ মন্ত্রীসভা' গঠন করেন। হাজির জ্যেষ্ঠ পুত্র নওয়াজেস্ মহম্মদ চুনাখালিস্থিত পাঁচউৎরা শুল্ক বিভাগের কালেক্টর, দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ আহমদ রঙ্গপুরের ও কনিষ্ঠ পুত্র সিরাজের বাপজান জৈনুদ্দিন রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত হন। আলিবর্দীর সমস্ত পরিবারটিই আস্তে আস্তে বর্তমান নবাবের সঙ্গে মিশে একেবারে নবাবের মতো হয়ে উঠতে লাগল। নসীব তখন আলিবর্দীর সত্যিই শুভ ছিল, আল্লা ছিলেন মেহেরবান। একদিন পাটনার শাসনকর্তা ফকৃরুদ্দৌলা পদচ্যুত হলে বিহারের নবাবীপদ সুজা-পুত্র

সরফরাজকেই দিতে চাইলেন কিন্তু সে দূর দেশে যেতে না চাইতে সুজা আলিবর্দী খাঁকেই উপযুক্ত মনে করে পাটনার নবাবী দান করলেন। সেইসময় আলিবর্দীর কনিষ্ঠা কন্যা আমিনার গর্ভে সিরাজ জন্মগ্রহণ করে। নবদৌহিত্র সৌভাগ্য নিয়ে ভূমিষ্ঠ হল দেখে খুশী হয়ে অপুত্রক আলিবর্দী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন এবং স্বনামে তার নাম দিলেন—মির্জা মহম্মদ।······পাটনায় বৎসরখানেক কাজ করবার পর তার দক্ষতা দেখে সুজা খাঁ খুশী হয়ে তাঁকে দিল্লী দরবার থেকে 'মহব্বত-জঙ্গ' উপাধি ও পাঁচ হাজারী মনসবী সনদ আনিয়ে দেন। আলিবর্দী খাঁ শ্রমশীল, কষ্টসহিষ্ণু ও সুবিজ্ঞ ছিলেন। উচ্চপদবী পেয়ে তিনি একেবারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কাজ করেন নি। এর মধ্যে থেকেই চক্রান্ত দানা বেঁধে উঠছিল, তাঁর সম্মুখ লক্ষ্য মুর্শিদাবাদের নবাবী —আর তাঁর প্রধান মন্ত্রদাতা হাজি আহমদ, তিনি ছিলেন সুজা খাঁর পার্শ্বচর হয়ে। একজন বলিষ্ঠ উন্নতচেতা পুরুষকে কি করে ক্ষীণজীবী করতে হয় তারই কৌশল সর্বদা হাজির মগজে।

নবাবী কায়েম করতে হবে, মুর্শিদাবাদের মসনদ হাতে আনতে হবে, দৌলত চাই, সৌভাগ্য চাই, মুসাফির বংশকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই সঙ্কল্প মনে রেখে হাজি দুনিয়ার সমস্ত মন্দ হাতিয়ারগুলি হস্তে ধারণ করলেন। সুজা খাঁকে আগেই বশ করেছিলেন এবার অবশ করতে লাগলেন বিলাস-সাগরে নিমজ্জিত করে। নিত্য নতুন আওরতের আমদানী করে সুজা খাঁকে প্রলোভিত করতে লাগলেন। সুজা আগেই চরিত্রহীনতার অপরাধে নিজ শ্বশুর নবাব মুর্শিদকুলী ও পত্নী জিন্নেতুন্নেসা বেগম কর্তৃক ঘৃণিত হয়েছিলেন সুতরাং হাজীর সাহায্যে তা চরমতম রূপ ধারণ করল। সুজা খাঁ তাঁর জীবনের শেষদিনগুলি মন্ত্রীবর্গের ওপর কার্যভার ছেড়ে দিয়ে সরাবের নেশায় চূর হয়ে প্রমোদ ভবনেই কালযাপন করলেন।

অবশ্য এসব কাহিনী সিরাজের শোনা দাদু আলিবর্দীর কাছ থেকে। কিন্তু তিনি এ কথা বলেন নি, হাজি আহমদ তাঁর কন্যাকে উপঢৌকন স্বরূপ নবাবকে নিবেদন করে কার্যসিদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। এই ঘৃণ্য কথা মনে এলেই কেমন যেন দেহের মধ্যে অস্বস্তি লাগে। এ সব কথা সিরাজ শুনেছিল লোকপরম্পরায়। তবে নওয়াজেস মহম্মদের কোন বহিন্ ছিল সিরাজ কখনও শোনে নি, হয়ত ছিল। যে কথা রটে তা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা হতে পারে না, সে তার ধারণা আছে। দাদু আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজির অসাধ্য কোন কাজ ছিল বলে সিরাজের জানা নেই। এই হাজি হতে যেমন উত্থানের ইতিহাস, তেমনি ধ্বংসের সূচনাও হয়েছিল। তারপর একদিন সুজা খাঁ শক্তিহীন হয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের সপ্তমার্গে পৌছে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

এরপর সুজা খাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ নির্বিবাদে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। কিন্তু তাঁর রাজোচিত গুণের নিতান্ত অভাব ছিল। ধর্মকর্মের ব্যবহারিক আচার নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। রাজ্যশাসন বিষয়ে তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টিও ছিল না, রাজকার্য রীতিমত পরিদর্শনের অবকাশও ঘটত না। সেইজন্যে কূটবুদ্ধি শত্রুপক্ষের চক্রান্তের

সুবিধা হল। সরফরাজ খাঁ প্রথমে পিতার অন্তিমকালের উপদেশ অনুসারে প্রবীণ রাজকর্মচারীদের স্বপদে স্থায়ী রেখেছিলেন কিন্তু তাঁর নিজের বন্ধুদের ও অনুগত ভৃত্যদের প্ররোচনায় শেষে হাজি আহমদকে প্রধান দেওয়ানী কার্য থেকে অবসর দেন। সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন, এই দুষ্ট লোকটির চক্রান্তেই পূর্ব নবাব একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেলেন। কিন্তু হাজির এতেই সুবিধে হল, গোপনে সরফরাজ খাঁকে রাজ্যচ্যুত করবার চক্রান্ত প্রবলভাবে ষড়যন্ত্রে পরিণত হল। কুটিল হাজি মনোভাব গোপন করে নিজের সম্মান রক্ষার্থে প্রচার করলেন—বৃদ্ধ বয়সে রাজকার্যের গুরুভার স্কন্ধ থেকে অপসারিত করে নবাব তাঁর সমূহ উপকারই সাধন করেছেন; তিনি এখন থেকে একান্ত মনে ধর্মচিন্তার সময় পাবেন, কিন্তু প্রয়োজন হলে প্রভুপুত্রকে রাজকার্যের পরামর্শ দিতেও প্রস্তুত থাকবেন।

অদ্ভুত মারণাস্ত্র। অসন্দিগ্ধ নির্বোধ সরফরাজ এই বক্তব্যে হাজির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হলেন। এই সময়ে হাজির পরামর্শে সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করে ব্যয় সংক্ষেপের ব্যবস্থা করা হল। অবসর প্রাপ্ত সৈন্যগণ হাজির কৌশলে আলিবর্দীর দলপুষ্ট হতে লাগল। তারপরে আর কি—একদিন সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনা করে তারপর বিশ্বাস-ঘাতকতার সৃষ্টি। ইতিহাসে উল্লিখিত হল—'গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধ।' একটি নবাব বংশের শেষ যবনিকাপাত, অপর একটি নবাব বংশের প্রতিষ্ঠা—কিন্তু সে প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ কলঙ্কময় ইতিহাস লিপিবদ্ধ করলে হাজি আহমদকে কেউই ক্ষমা করতে পারবে না। আর সেই হাজি আহমদ শেষপর্যন্ত নিহত হল সামান্য এক আফগান সর্দার সমসের খাঁর হাতে। হাজি আহমদ সমসের খাঁর হাতে অকথ্য অত্যাচার ও লাঞ্ছনা ভোগ করে তারপর নিহত হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর শাস্তির প্রয়োজন ছিল আরও অনেক বেশী। আজ তাঁরই জন্যে এই নবাব বংশের এত কলঙ্ক! যে কলঙ্কের পসরা মাথায় নিয়ে নবাব আলিবর্দী এতদিন ধরে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু নবাব আলিবর্দীই কি খুব ভাল কাজ করেছিলেন?

সিরাজ একবার উর্ধ্বে আসমানের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল। নবাব আলিবর্দী আজ জীবনের প্রান্তঃসীমায় এসে সূর্যাস্তের পূর্বমুহূর্তে দুনিয়ার অন্যপারের চিন্তায় আত্মসমাহিত হয়েছেন। তিনি ভীত হয়ে পড়েছেন মৃত্যুর পরের যন্ত্রণার জন্যে। এখানে শেষদিন পর্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে আবার যন্ত্রণা শুরু হবে এবং তাঁর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যুর পর কবরের তলায় হতে পারে ভেবে তিনি আতঙ্কিত হয়ে যত অলীক ঘটনা প্রত্যক্ষ করছেন। দাদু আলিবর্দী সাধু ও সজ্জন ব্যক্তি বলে বাংলার নবাব ইতিহাসে তাঁর নাম থাকবে তার জন্যে তিনি সমস্ত আয়োজন করে গেছেন। জীবনে সরাব স্পর্শ না করে মুসলমান সমাজে তিনি পীর পয়গম্বর উপাধি পেয়েছেন। সরফরাজ খাঁর পনেরো শত বেগম ও আওরত পেয়েও তিনি তাদের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি স্থাপন করেন নি, তাদের উচ্চ সম্মান দিয়ে, ইজ্জত বাঁচিয়ে সরফরাজ খাঁর বহিন নফিসা খাতুমের হেফাজতে রেখে নবাব ষ্টেট থেকে মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আওরতের প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়ে তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নবাবের

সম্মান ধূলায় ধূসরিত করে নিজে সম্মান গ্রহণ করেছেন। এ সবেরই মূলে যে বিগত সেই অপরাধ, সেই অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই প্রায়শ্চিত্ত করতে এই ত্যাগ স্বীকার।

দাদু আলিবর্দী আজ তার শ্রদ্ধার পাত্র, তাঁকে ছাড়া দুনিয়ার আর কিছু সে চিন্তা করতে পারে না কিন্তু তাই বলে এই অপরাধ সে কখন ক্ষমা করে দাদু আলিবর্দীকে একজন আদর্শ পুরুষ আখ্যা দিতে পারে না।

যদি কোন অঘটন নবাববংশকে ঘিরে কখনও সংঘটিত হয় তার তাহলে সে দাদু আলিবর্দীকে তার জন্যে দায়ী করবে। দাদু আলিবর্দীর অত্যাধিক লোভ তাঁকে বেইমানী করতে সাহায্য করেছে। মুসাফির এক বংশ ভাগ্যান্বেষণে এদেশে এসে একজনের কাজ থেকে আশ্রয় পেয়ে তারই বুকে ছুরি বসাল?

আজ যদি দাদু আলিবর্দীকে সে ভাল না বাসত, পেয়ার না করত তাহলে এই অধার্মিক ভণ্ড মুসলমানকে সে নিজে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করত। কিন্তু আল্লাও বোধহয় কখনও নিশ্চয় ক্ষমা করতেন না। তাঁর দুনিয়ায় অন্যায়ের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। সেই শাস্তির জন্যে নিজের দুইকন্যা এক ঘৃণিতজীবনের পাঁকে পড়ে দুর্গন্ধময় জঘন্য জীবনের সুরভি উপভোগ করছে। তার জন্যে সমস্ত নবাবপ্রাসাদের আবহাওয়া বিষাক্ত। সেখানে কিছুক্ষণ থাকলে কেমন যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়। কেমন যেন মনে হয়, কোন এক গোপন শয়তান চক্রান্ত করে শাণিত ছুরিকা নিয়ে সর্বদা হত্যার মতলব এঁটে সমস্ত প্রাসাদের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু তার মা, আম্মাজান কেন এই পাপচক্রের যজ্ঞে আহুতি দেবার জন্যে নির্বাচিত হলেন, কি তাঁর দোষ ছিল? কোন অপরাধে তিনি এক ঘৃণিত জীবনের অভিশাপের গর্ভে নিমজ্জিত হলেন?···পিতা জৈনুদ্দিনের যেটুকু দোষ ছিল, সে দোষ সমস্ত মরদেরই থাকে, তার জন্যে কোন বেগমের আক্ষেপ নীতিবিরুদ্ধ। তার জন্যে নিশ্চয় পরবর্তী জীবনে আম্মাজান লম্পট জীবনের ঝুঁকি নেন নি!···হয়ত আফগান সর্দার সমসের খাঁর শিবিরে তাঁর সে শালীনতার ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়েছে! হয়ত···। না, না, চিন্তা করতেও কেমন যেন মনটা কুঞ্চিত হয়ে যায়। নিজের আম্মাজানের ব্যভিচার, এ যে দুনিয়ায় তাকে লোকে কৃপার দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করবে? ব্যভিচারিণীর সন্তান বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ভাবী নবাব মির্জা মহম্মদ সিরাজউদ্দৌলা।

হঠাৎ পাগলের মতো আসমানের চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি তুলে হাঃ হাঃ করে অট্টহাস্য হাসতে চাইল সিরাজ—কিন্তু পরিবর্তে আবার তার চোখে জল এসে গেল। সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল এত কাতর মন নিয়ে সে জন্মাল কেন? কেন দিলের মধ্যে এমনি তাড়না তাকে সর্বদা ক্ষতবিক্ষত করে? সে অত্যাচারিত নবাব হতে পারবে না? মনের মধ্যে অন্যায়ের কোন মুসাবিদা হবার আগেই সে ভীষণ, ভয়ঙ্কর হয়ে চারদিকে রক্তচক্ষু মেলে বাতাসের বুকে চাবুক চালাবে। বিচার না, বিবেচনা নয়, এমনি অনুশোচনার কোমল স্পর্শ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রতারিত করে সে চৌচির হয়ে ফেটে পড়বে। তারও মধ্যে সন্দেহ আছে, সে কি তা পারবে?

সামান্য এক রূপসী আওরত ফৈজীকে সে এক রাতে বশ করতে পারল না। তাকে দিল স্বাধীনতা, আর তার পরিবর্তে সে গ্রহণ করল মনের মধ্যে এক তীব্র অনুশোচনার জ্বালা। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, ফৈজীর সাথে মহব্বতের রোশনাই জ্বালাতে হবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাশবিকতা সৃষ্টি করে বহু রমণীকেই তো সে গ্রহণ করেছে, তাতে তিক্ত অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় হয়েছে। যেটুকু উপ্‌রি সে পেয়েছে তাতে মন ভরে নি।

দিল্ আহত হয়েছে। তাই ফৈজীকে দেখে তার ভালবাসার মোহ জেগে উঠেছে। ফৈজী ভালবেসে দেবে যা, তাই সে গ্রহণ করে একটি রমণী-হৃদয়ে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করবে। যেমন লুৎফাকে সে পেয়েছে। তবে লুৎফাকে পাওয়ার জন্যে তার মেহনত করতে হয় নি, সে তারই জন্যে সৃষ্টি হয়েছে, তারই মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে ; যে মহব্বত বহু কষ্টকল্পিত উপায়ের সাফল্য, তার মূল্য অনস্বীকার্য। কিন্তু ফৈজী মনে হয়, মহব্বতের জন্যে সৃষ্টি হয় নি, বাদশাহের হারেমে কি মহব্বতের ছড়াছড়ি ছিল? সেখানে পণ্যার মতো আওরতদের দেহদান করেই নিজেকে নিবৃত্তি রাখতে হয়। তাহলে ফৈজী গতরাত্রে তাকে মুগ্ধ করে রাত্রির সুষুপ্তির কোলে পালঙ্কের নরম শয্যায় ভাবী নবাবকে খুশী করল না কেন? বরং ঘৃণা করে এমন কতকগুলি কথা বলল, শুনে তার চিত্তের ক্ষুব্ধভাব আরও বর্ধিত হল, সে আহত হয়ে সংযম রক্ষা করল নয়ত ফৈজীর রূপ গতরাত্রেই তার বিচারে নিঃশেষিত হয়ে যেত।···লুৎফা বলল—আওরতকে অধিকার করতে গেলে অত্যাচার নয়, মহব্বতের রোশনাইতে তাদের মুগ্ধ করতে হয়। লুৎফা বলল নিজের মনের কথাই। সব আওরতের মনের মধ্যে সেই একই ধারণা জাগে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে চেষ্টা করে দেখতে হবে, ফৈজী তার মহব্বতে বশ হয় কিনা! আর তা না হলে । সে কথা চিন্তার বহির্ভূত এখন, পরবর্তী চিন্তাগুলি ভাববার মতো মানসিক অবস্থা এখন তার নয়।

হীরাঝিলের তোরণদ্বারের কাছে আসতেই একটি খোজা প্রহরী এসে চুপি চুপি সিরাজকে বলল—জনাব, আপনাকে একটি সংবাদ জানানো অবশ্যই মনে করি বলে বলছি, মীরজাফর আলি খাঁ গোপনে বাঁদী সইদা বানুকে উৎকোচে বশীভূত করে আপনার নয়া আওরত ফৈজীর সঙ্গে মোলাকাত করতে এসেছিল।

সিরাজ চমকে উঠল, তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে বলল—তারপর!

ধরা পড়েনি খাঁ সাহেব, জাফর আলি পিছনের দরজা দিয়ে এসে ফৈজীর কক্ষে ঢুকেছিল, বেরিয়ে যাবার সময় তাকে দেখতে পেয়েছে খোজা মুইউদ্দিন, সে এসে বলতেই আপনার কাছে সংবাদ প্রেরণ করছি।

সিরাজ ক্ষিপ্ত হয়ে মাটিতে পা ঠুকে বলল—আহাম্মুকের দল! তাকে ধরতে পারলি না, ধরতে পারলে একেবারে দেখিয়ে দিতাম। সিরাজের প্রাসাদে ঢোকার প্রতিফল কি?—আচ্ছা, এর ব্যবস্থা সিরাজও করতে জানে। খোজার দিকে ফিরে বলল—খুব কড়া পাহারার ব্যবস্থা করবে চারদিকে, যাতে কেউ না প্রাসাদে

ঢুকতে পারে। আর বাঁদী সইদাকে প্রলোভিত করে চোরকুঠরীতে বন্ধ করে রাখবে।

সিরাজ আদেশ দিয়ে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। এত বড় দুঃসাহস প্রকাশ করার সাহস যার আছে, সিরাজের প্রাসাদে প্রবেশ করে তার আওরতকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হওয়াই উচিত। সে যে দুর্বল নয়, সে শক্তিহীনতার তপস্যা করে না, একবার সমস্ত মুর্শিদাবাদ কাঁপিয়ে প্রত্যেককে জানিয়ে দিতে হবে। অন্তত তামাম মুর্শিদাবাদের কোথাও একটি লোক থাকবে না, যে সিরাজের সমকক্ষ হবে। সিরাজ তার কোষবদ্ধ তরবারীখানায় হাতের স্পর্শ দিয়ে একবার বুলিয়ে নিল। কোমরে বদ্ধ ছোরাখানা তুলে ধার পরীক্ষা করে দেখে নিল, মনে মনে বলল—এই ছোরার আঘাতে কটি দুশমনের বুকের হৃৎপিণ্ড এফোঁড় ওফোঁড় করার ক্ষমতা কি সে রাখে না? তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে বলল—শয়তান শায়েস্তা করবার ক্ষমতা না থাকলে ভাবী নবাবের সিংহাসনে বসার পথ পরিষ্কৃত হবে না। এরই সূচনা যেন বাতাসের বুকে সঙ্কেত সৃষ্টি করতে শুরু করেছে।

ফৈজীর কক্ষের পাশ দিয়ে চলে যেতে গিয়ে হঠাৎ সিরাজ থমকে দাঁড়াল, কক্ষের ভেতর থেকে তবলার খটাখট শব্দ, তার সঙ্গে সারেঙ্গীর মধুর সুর। তারপরেই শোনা গেল ফৈজীর কণ্ঠ, তার সাথে ঘুঙুরের নিক্কণ।

'ধগ ধগ ধিন্ তাক, ধগ ধগ ধিন্।
ধধ কটেন্ তা, থুক্ থাক্, এক্ দো তিন্॥'

সঙ্গে সঙ্গে ফৈজীর পায়ের শব্দও হচ্ছে খুব জোর। সিরাজের মুখে হঠাৎ হাসি খেলে গেল। পাশে দরজার মুখে অপেক্ষা করছিল একটি বাঁদী। সিরাজ তাকে জিজ্ঞেস করল, কে ভেতরে আছে, কার সামনে ফৈজী নাচ পেশ করছে, জানো? বাঁদী উত্তরে বলল—কোই নহীঁ জনাব। নয়া বিবি কসরত করছেন।

সিরাজ জানত এই কথাই বাঁদী বলবে। ফৈজী যে ভাল নাচে, গতরাত্রে তার প্রমাণ হয়ে গেছে। তার রূপের রোশনাইয়ের সাথে নাচ যেন বেহেস্তের হুরীকেও হার মানায়। গতরাত্রে বহুলোক তার নাচ দেখেছিল, দেখে বুদ্ধু হয়ে গেছে। এবং তার পর থেকেই ফৈজীকে পাওয়ার ইচ্ছা, তাকে বক্ষে ধারণ করার ইচ্ছা তামাম মুর্শিদাবাদের সমস্ত মরদের। এবার সে আর ফৈজীকে সবার সামনে নাচ পেশ করার ফরমাইজ দেবে না। কিছুকাল আসর বসানো স্থগিত রেখে দেবে। মোসাহেবদের বলবে তার তবিয়ত আচ্ছা নেই বলে নাচ, গান, সরাব পান সব বন্ধ। হয়ত তারা ক্ষুণ্ণ হবে, হোকগে। আবার যখন সে আসর বসাবে, তখন মৌমাছির মতো আবার সকলে এসে গুনগুন করবে।

তাই সেদিন সন্ধ্যার পরে রংমহলের আলোর উৎসকে অন্ধকারের গহ্বরে নিক্ষেপ করে সিরাজ জ্বালালো ফৈজীর কক্ষেই যত আলো। নাচ সেদিন ফরমাইজ করল না সিরাজ, ফৈজীর কক্ষে প্রবেশ করে বলল—আজ দুজনে মিলে শুধু সরাব পান করব, তুমি আমাকে গুলাবী সরাবের পাত্র এগিয়ে দেবে, আমি দেব তোমাকে পান করিয়ে আমার উচ্ছিষ্ট গুলাবী সরাব। এই বলে খুশ মেজাজে সিরাজ হাসলো।

ফৈজী আজ সেজেছিল আরও অদ্ভুত, একটি মরদকে কাবু করার মতো—অবশ করার মতো ঐশ্বর্য তার দেহের থরে থরে লুব্ধ হয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। সিরাজ সেই দিকে চোখ না রাখতে পেরে মুখখানা ঘুরিয়ে রাখবার চেষ্টা করল। ফৈজী হেসে উঠল খিলখিল করে। সিরাজের আরও কাছে ঘেঁষে বসে তার দেহের সুরভির মৌতাত সিরাজের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে হাসতে হাসতে বলল—আমি বাদশাহের হারেমের আওরত, জনাব! আমার রোশনাইতে বাদশাহের দৌলতের চমক খাঁটি হয়। সেই বাদশাহের হারেম থেকে আমি বাংলা মুল্লুকে এসেছি।

সিরাজ ফৈজীর চম্পাকলির মতো হাতের আঙুলগুলি নিজের হাতে নিতে গেল, ফৈজী হাত সরিয়ে নিয়ে বলল—উহুঁ, আপনি ভাবী নবাব হুজুর। আপনার জীবনে আওরত আসবে বহু, দিলের এত ধড়ফড়ানি ভাল নয়।

সিরাজ বলল—তবে সরাব পান করাও।

আমি বাঁদী নয় হুজুর।

তবে কি?

আমি রোশনাই, মরদের সোহাগ, আমার রূপ মরদের দিলের প্রার্থনা। লাখো লাখো দৌলতের রোশনাই নিয়ে দুনিয়াতে আমার আবির্ভাব।

সিরাজ অসহিষ্ণু হয়ে বলল—তাহলে বাঁদীকে ফরমাইজ কর। কিন্তু এ কক্ষে তৃতীয় কেউ থাকে, আমার ইচ্ছা নয়।

ফৈজী খিলখিল করে হেসে বলল—সরম জাগে?

সরম নয়। সৌন্দর্য। তোমার সাথে আমার আলাপ নিভৃতে। কেউ তার প্রহরী থাক্ অন্তত আমার দিল তা চায় না।

ফৈজী আবার হাসল, হেসে বলল—ভাবী নবাবের মধ্যে কাব্য করার নেশা প্রচুর। আচ্ছা, আমিই সরাব পরিবেশন করছি, এই বলে ফৈজী উঠে সরাবের পাত্রের কাছে এগোল।

ফৈজী সরাব পরিবেশন করলে সিরাজ বলল—ফৈজী একটা গীত শোনাবে?

তোমার গীত বহুত মিঠে শোনাবে আমার কানে। দিলে ভী খুশ লাগবে। মেহেরবানি করে আচ্ছা গীত শুনাও।

ফৈজী বলল—দিল তো আমাকে দেখেই খুশ হয়ে আছে জনাব—তাহলে আর গীত শুনে কি হবে?

সিরাজের অবাক লাগছিল, এই রমণীটি গতরাত্রে তাকে প্রত্যাখ্যান করে অন্য এক চিন্তার মধ্যে হারিয়ে দিয়েছিল। আর আজ তার ঠিক বিপরীত। আজ হয়ত একে জয় করার খুব বেশী অসুবিধে হবে না। কিন্তু বিস্ময় জাগে, কাল এর কি হয়েছিল? দুশমন কি এর শরীরে ভর করেছিল। এই রহস্য জানবার জন্যে সিরাজ সংযম না ধরে রাখতে পেরে জিজ্ঞেস করল—ফৈজী, গতরাত্রে তোমার কি হয়েছিল? আমার দিলের মধ্যে দুখ দিয়ে আমাকে তক্‌লিফ দিলে কেন সারারাত!

ফৈজী হেসে বলল—দুশমন ঢুকেছিল জনাব।

এবার তাহলে আমার সব আর্জি কবুল করবে?

আর্জি না জেনে কবুল করব কি বলুন?

তুমি আমার বেগম হবে। আমি তোমাকে শাদী করব। আমি সিংহাসনে বসলে তোমাকে পাশে বসিয়ে সম্মান দেব।

ফৈজী ঠোঁট উলটে বলল—সব মরদই ঐ এক কথা বলে। ওতে আপনাই নেই। আমার রূপ মরদের দিলে গিয়ে দিল বিগড়ে দেয় বলেই মরদেরও মুখ থেকে ঐ সব জাদা বুলি বেরোয়। ঠিক চিড়িয়াকা মাফি! এই বলে ফৈজী খিলখিল করে হেসে উঠল।

আমি কসম খেয়ে বলছি। আমি তোমার সাথে মহব্বত করব। তোমার রূপের রোশনাইতে আমার দিলের রোশনাই মেশাব—দেহগত কামনায় এসব বলছি না তা তুমি বিশ্বাস কর।

তাহলে গতরাত্রে আমাকে হারিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কেন?

সিরাজ বলল—তোমাকে রংমহলের ওরা ইনাম দিয়ে আকর্ষণ করতে চেয়েছিল বলে আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম।

ফৈজী কথা বলল না। আওরত বুঝতে পারল—এই মরদকে দিয়ে সে যা করাবে তাই সে শুনবে। এ তার রূপের রোশনাইতে আকণ্ঠ ডুবে একেবারে বুদ্ধু হয়ে গেছে। এখন এর চোখে সরাবের নেশা নয়, আওরতের রমণীঐশ্বর্য পাওয়ার চিন্তায় আগ্রহান্বিত, তবে সে পাওয়া অন্যভাবে উপভোগ করতে চায়। বলপূর্বক নয়, বরং দয়িতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পুষ্পের সৌরভের স্পর্শে বেহেস্তের সুখ পেতে চায়। তার চিন্তার অনুমান ঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে দেখে সে পুলকিত হয়ে উঠল, তাই মনে মনে নিজেকে নিয়ে এই ভাবী নবাবের সঙ্গে খেলা করবার জন্যে মনের অদম্য ইচ্ছায় অস্থির হয়ে উঠল।

হঠাৎ ফৈজী খিলখিল করে হেসে উঠে বলল—অমন হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন জনাব?

দেখছি তোমাকে। আর ভাবছি, এত রূপ আল্লা তোমায় দিলেন কেন? মরদকে পাগল করবার জন্যে, আগুনে দগ্ধ করবার জন্যে তোমার এই সৃষ্টি কি ধ্বংসকেই স্মরণ করিয়ে দেয় না? তুমি যদি আজ আমাকে বিমুখ কর তাহলে আমার জীবন বরবাদ হয়ে যাবে, জানো? আমি হয়ত হারিয়ে যাব ফৈজী!

ফৈজী কিন্তু সে কথার জবাব না দিয়ে সিরাজের মনটা ঘোরাবার জন্যে গবাক্ষের বাইরে চোখ দিয়ে বলল—দেখুন দেখুন যুবরাজ, আসমানের আজ কি রূপ?

সিরাজ তাকাল না, বরং সে তার আবেশমাখা দুটি চোখ নিয়ে বলল—আমার কক্ষে আসমানের সবচেয়ে জ্যাদা রোশনী আছে, আমি ওরূপে আগ্রহান্বিত নয়, যে রূপ সজীব, তার রোশনাই আমার দিল টানে ফৈজী, আমি তাই তোমার দিকে তাকিয়েই অভিভূত হয়েছি।

ফৈজী হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে গেয়ে উঠল।

'(আরে) এজী মিঞা, ম্যাঁয় তো তুম্‌হারি।
তু বিন্থ সারি রাত ক্যায়সে গুজারি।
গরম্ হো তুম্ নরম্ দিল পর মারো হো কাটারি।'

ফৈজী আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

তাই দেখে সিরাজ কাতরভাবে বলল—আমার কাছে এবার এস ফৈজী। স্পর্শ না দিলে যে দিলের মধ্যে কেমন করে?

ফৈজী কাছে না এসে দূরে একটি কুর্সি রাখা ছিল তার ওপর গিয়ে বসল, আর মুর্শিদাবাদের ভাবী নবাব তার কাতর দুটি চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি নিয়ে উদ্ভিন্ন যৌবনভারে নত মাসুম লড়কা ফৈজীর বসোরাই গোলাপের মতো লোভাতুর দেহটির দিকে লোলুপ হয়ে তাকিয়ে রইল।

যেন একপাত্র গোলাপী সরাব। স্বর্ণময় পাত্রের বুকে উষ্ণ রক্তের ঢলঢলে দেহ নিয়ে চঞ্চল হয়ে নড়ছে। সরাব পানের পর নেশার যে মৌতাত দেহের শোণিতে চঞ্চলতা জাগায় তেমনি নেশার গাঢ় আমেজের মধ্যে চঞ্চলতা যেন সিরাজকে কুরে কুরে খেতে লাগল। সামনে কুর্সির ওপর বসে ফৈজী। ফৈজীর দুটি সুর্মা আঁকা মদির চোখের দৃষ্টিতে চপল হাসির হীরাজ্যোতি। চোখের মধ্যে যেন রাজ্যের আবেদন দয়িতকে ইসারায় হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকবে। বিলোল কটাক্ষে ভ্রূভঙ্গি করে ফৈজা নানাভাবে সিরাজকে মাতাচ্ছে। ফৈজী সমুদ্র তুফান লুব্ধ বক্ষশোভা অর্ধোন্মুক্ত করে মসলিনের পাতলা ওড়নার বন্ধনকে সরিয়ে সিরাজকে পাগল করতে চাইছে। আজ ফৈজী সেজেছে অপরূপভাবে। একটি পণ্যা আওরত যেমন মরদের মনোরঞ্জনের জন্যে হাজারো লোলুপ দেহের রহস্যকে উন্মুক্ত করে মেলে ধরে ঠিক তেমনি প্রকট সাজে সেজেছে ফৈজী।

সিরাজ যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাবার মুহূর্তে এসে পৌছল। সে ভাবল, বিস্ময়ে ভাবল, তার শক্তি কোথায় গেল? তার শক্তি কি ঐ সর্পিণী তার ছোবল বসিয়ে

শরীরে বিষ পুরে দিয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে! সিরাজ ক্লান্ত চোখে ইসারা করল ফৈজীকে কাছে আসবার জন্তে।

বাইরে আসমানের কোলে চাঁদের রূপোলী আলো। সমস্ত আসমানের চতুর্দিক ছেয়ে কি অপরূপ আলোর সে রূপ। হীরাঝিলের জলেও পড়েছে তার দ্যুতি। হীরাঝিলের জল আজ ধীর, স্থির। সে বোধ হয় চঞ্চল হতে ভুলে গেছে। কক্ষের মধ্যে আতরের খুসবু, বাইরের ফুলবাগানের বিচিত্র ফুলের সৌরভ গবাক্ষ দিয়ে ছুটে আসছে, কিন্তু সব সুগন্ধ নিশ্চিহ্ন। সমস্ত সুগন্ধকে করবিত করে ফৈজীর দেহের সুগন্ধ কক্ষের বাতাসে আমোদিত, সিরাজের নাসারন্ধ্রে সেই সুগন্ধের সৌরভ তাকে অর্ধচেতন করে তুলেছে। পানপাত্র হাতেই ধরা আছে, তা আর ঠোঁটের নাগালে পৌঁচচ্ছে না। সিরাজ আবার ডাকল, এবার সে নেশাজড়িত কণ্ঠে ডাকল—কাছে আসবে না ফৈজী? যদি নাই আসবে তবে আমার হৃদয়ে ঝড় তোলার কি প্রয়োজন তোমার? সিরাজের কণ্ঠে আকুতিভরা স্বর। সিরাজ যেন কাঁদছে।

ফৈজী কথা বলল না, শুধু কুর্সি থেকে উঠে আর একটু দূরে সরে গিয়ে নিজেকে নাগালের বাইরে রাখতে চাইল।

জীবনে সিরাজ যা চেয়েছে তাই পেয়েছে, নবাব আলিবর্দী এইটুকু উপকার তার সবসময়ে করেছেন, তাই না পাওয়ার নিরুৎসাহটি উপভোগ করার সময় সিরাজের জীবনে আসে নি। ফৈজী যতদূরে সরে যাবার চেষ্টা করতে লাগল, সিরাজের ভেতরের পশুপ্রবৃত্তিটা তার তত তাকে আঘাত হানতে লাগল, মনে মনে উৎসাহ দিতে লাগল, উত্তেজনা জাগাতে লাগল, আর সিরাজ রক্তে চঞ্চলতা নিয়ে বন্য আদিম হয়ে উঠতে লাগল মুহূর্তে। তার মধ্যে সমস্ত বিচার লয় হয়ে গেল, মহব্বতের রঙীন পবিত্র সৌরভের মাদকতা অন্তর্হিত হল, আওরতের ওপর সে অনেক ছোটবেলা থেকে যে ব্যবহার করে আসছে, সেই অভ্যাসের মেদুর স্পর্শে তার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শক্তির যেন চমক লাগল।

ফৈজী তাকিয়েছিল সিরাজের দিকে। হঠাৎ সিরাজ লম্ফ দিয়ে পালঙ্ক থেকে নেমে একদৌড়ে ফৈজীর কাছে চলে এল, এসে তাকে সবলে বক্ষে ধারণ করতে গেল কিন্তু ঠিকমতো আলিঙ্গনাবদ্ধ না করতে সক্ষম হতে ফৈজী সভয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিল।

সিরাজ ক্ষুব্ধভঙ্গিতে দাঁতে দাঁত চেপে বলল—জাফর আলি খাঁর ইস্তেজার যে করতে চায় তার প্রতি বলপ্রয়োগ করাই উচিত। পণ্যা আওরত—! সিরাজ দাঁতে দাঁত চেপে আবার এগিয়ে গেল। রুগ্ন, কৃশকায় ফৈজী ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল। হঠাৎ তার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হল না, সে কক্ষের একটি কোণে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। সিরাজের দুটি বন্য আদিম চোখের দৃষ্টিতে রক্তিমাভা।

কক্ষের দরজা ভেজানো ছিল, ফৈজী মুক্তির উপায় খুঁজছিল। এ অবস্থা থেকে এখুনি মুক্তি পেলে হয়ত অবস্থান্তর ঘটতে পারে, তখন পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়

সম্ভব। একরকম পশুসম আদিম প্রবৃত্তি সিরাজের মধ্যে লুকানো ছিল তা তার জানা ছিল না। যদি জানত, তাহলে কখনই এই আগুণ নিয়ে খেলার বাসনা তার মধ্যে জাগত না। সিরাজ তার সাথে মহব্বত করতে চেয়েছিল বলেই সে ভেবেছিল সিরাজ তার প্রতি অন্য আচরণ করতে চায়। কিন্তু মরদ উত্তেজনা অনুভব করলে যে সব ক্ষেত্রেই এক—এই অভিজ্ঞতা তার পূর্বাহ্নেই হওয়া উচিত ছিল।

তাই এই পরিবেশ থেকে পালানোর জন্যে ফাঁক খুঁজতে লাগল। একজন আক্রমণের জন্যে ওত পেতে রয়েছে। শক্তি দুজনেরই সমান। সিরাজ আবার তার দুবাহু বাড়িয়ে ফৈজীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে গেল। ফৈজী সিরাজকে অল্প একটু ঠেলে দিয়ে একদৌড়ে দরজার কাছে গেল, তারপর ভেজানো দরজাটি খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। সিরাজও পিছন পিছন ছুটলো এবং ফৈজীকে ধরবার জন্যে সে মরিয়া হয়ে উঠল। সামনে একটি বিরাট অলিন্দ, সে অলিন্দটি প্রায়ান্ধকার। অলিন্দের মাঝে মাঝে কয়েকটি বড় বড় থাম। থামের সঙ্গে জড়ানো কটি ঝাউগাছের ছায়া থামের আড়ালে ফৈজী নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল। সিরাজ সেখানে গিয়ে আর কোন দ্বিধা না করে একেবারে পাঁজাকোলা করে দুইবাহু দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে সেই পরিত্যক্ত কক্ষে ফিরে এল।

ফৈজী কেঁদে ফেলল, বলল—যুবরাজ, আমি মুক্তি চাইছি।

মুক্তি! দাঁতে দাঁত চেপে সিরাজ বলল—লাখো রূপেয়ার বিনিময়ে যে আওরত আমি সওদা করে এনেছি, তার এত দেমাক! আমায় যে ঘৃণা করে, তার ইজ্জত কখনও রক্ষা হবে না।

সিরাজ যেন মত্ত হস্তীর মতো প্রবল শক্তি প্রয়োগে ফৈজীকে বক্ষে আকর্ষণ করে পালঙ্কের শয্যার গহনে শুইয়ে তাকে চেপে ধরল। ফৈজীর দেহে যেটুকু পোশাকের আবরণ ছিল, সিরাজের ধস্তাধস্তিতে তার অধিকাংশ প্রায় নিরাবরণ হয়ে গেল, লোলুপ হয়ে উঠল ফৈজীর যৌবনপ্রবাহ।

রক্তবর্ণের গোলাপী দেহটি মরদের স্পর্শসুখেও আবেশঘন হয়ে এসেছে, সিরাজের অত্যাচারেও কৃশদেহটি শক্তিক্ষয়ের পরিশ্রমে ক্লান্ত। সিরাজ সরাবের নেশার মাদকতায় ফৈজীর দাম্ভিকা দেহটি যেন ছিঁড়েখুঁড়ে ভক্ষণ করবার জন্যে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো ফৈজীকে বুকের ওপর চেপে ধরল। তার অধরের পিপাসার্ত কম্পনস্পর্শ বার বার ফৈজীর নরম অধর প্রান্তে এঁকে দিয়ে ফৈজীকে অর্ধচেতন করে দিল। ফৈজী আগে বহু বাধার সৃষ্টি করার প্রয়াস জাগিয়েছিল কিন্তু আস্তে আস্তে কেমন যেন আবেশঘন হয়ে শক্তিহীনা হয়ে পালঙ্কের শয্যাগহনে নিস্তেজ হয়ে যেতে লাগল।

বাইরে অখণ্ড রাত্রির নিস্তব্ধতা। হীরাঝিল প্রাসাদের কোথাও মানুষের সাড়া নেই, নেই কোন শব্দের অনুরণন। শুধু কান পাতলে শুনতে পাওয়া যায়, প্রাসাদের পাশের ফুলবাগানের অরণ্য থেকে জোনাকিদের আলোর ঝলকানি ও তার সাথে মৃদুঝঙ্কার নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করছে। আর শব্দ আছে ঝিলের, জলের, স্রোতের।

ঝিলের জলের পাশে সারি সারি বিভিন্ন জাতের দীর্ঘ বৃক্ষ ছায়ার মতো ঝিলের জলকে আগলে রেখেছে। সেই গাছের অন্ধকার গহনে রাতপাখীর বিচিত্র ডাক— মাঝে মাঝে সেই ডাক রাতের স্তব্ধতাকে কেমন যেন চমকে দিয়ে ভেঙে দিচ্ছে। আর শব্দ জাগে অশ্রান্ত কলগুঞ্জন ভাগীরথীর জলে। রাতের সমস্ত ঐশ্বর্যকে নিয়ে একা জেগে আছে তুনিয়ার আসমানে চাঁদের অসামান্য রুপো আলো।

এতটুকু শরীরে বিচিত্র রহস্যময় আওরতের ঐশ্বর্যগুলি যে এত প্রকট কেমন করে হল তা বিস্ময়ে ভাবতে হয়! কিন্তু সিরাজ যা পাওয়ার জন্যে গতকল্য থেকে মরিয়া হয়েছিল তা নাগালের মধ্যে পেতে আর ফৈজীর স্পর্শসুখের মাদকতায় রোমাঞ্চিত হতে তার যেন তৃপ্তিভাব আরও বেড়ে গেল। কোষে কোষে তাই তার তপ্ত উষ্ণ স্পর্শ যেন তাকে নতুন এক অনুভূতির রাজ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলল। যে দেহটি সে ইচ্ছার মধ্যে দিয়ে গ্রহণ করতে চেয়েছিল, ফৈজী তার নৃত্যের ছন্দে তাকে হাসতে হাসতে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে তার অধরের সুষমা দিয়ে বাংলার ভাবী নবাবের দিল ভরিয়ে দেবে কিন্তু তা না হয়ে ফৈজীর আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে এই পাশবিকতার সাহায্যে তাকে গ্রহণ করতে হল বলে সিরাজ তৃপ্ত হয়েও যেন অতৃপ্ত হয়ে উঠল।

কক্ষের মধ্যে আলো ছিল না, সিরাজ আগেই আলো নিভিয়ে দিয়েছিল। শুধু চন্দ্রিমার রুপো আলো গবাক্ষ দিয়ে এসে ফৈজীর সমস্ত দেহটিকে রাঙিয়ে তুলেছিল। ফৈজী চোখ তুটি বুজে অর্ধচেতনাবস্থায় নিঃশব্দে পালঙ্কের ওপর পড়েছিল। সিরাজ কোমলস্বরে ডাকল, ফৈজী! ফৈজীর কোন সাড়া মিলল না। আবার ডাকল সিরাজ—ফৈজী! সেই একই অবস্থা, কোন সাড়া না। সিরাজের বিস্ময় জাগল— তবে কি ফৈজীর দেহে প্রাণ নেই! সে ফৈজীর নাকের কাছে হাত রাখল, হ্যাঁ, নিঃশ্বাস সমানগতিতে নির্গত হচ্ছে। আবার সে ঝাঁকি দিল ফৈজীকে। সিরাজের ইচ্ছা ফৈজী অন্তত তাকে সমর্থন করুক, সে তার সমর্থনে তাকে গ্রহণ করে সুখানুভব করবে। ফৈজীর এই অপরূপ সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যকে স্বইচ্ছায় নিবেদন করার মধ্যে সিরাজের যোগ্যতাই তাকে পূর্ণতার মধ্যে অভিনন্দিত করবে, সেইজন্যে সে এত সময় অপেক্ষা করেছে, এইমুহূর্তেও অপেক্ষা করবে। কিন্তু ফৈজীকে জাগাতে পারল না। ফৈজীকে জাগাতে না পেরে সে হতোদ্যম হয়ে ভাবতে লাগল, কি করবে? এই অনিচ্ছুক আওরতকে পরিত্যাগ করে চলে যাবে, না কোন অনুচরের কাছে পাঠিয়ে একে ধ্বংস করে দেবে।

এ সময়ে হঠাৎ রমণীকণ্ঠের চিল চীৎকার। একবার নয় তুবার সমস্ত হীরাঝিল প্রাসাদ যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। সিরাজ ফৈজীর বক্ষের ওপর থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে গেল কক্ষ ছেড়ে। তখনও কান্নার গোঙানি সারা প্রাসাদের পাথরে পাথরে অনুরণিত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। প্রাসাদের ঘুমন্ত মানুষগুলি বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সিরাজের অধীকৃত বহু আওরত তার কক্ষের আয়াস-শয্যা থেকে উঠে এসে প্রাসাদের অলিন্দে ব্যাকুলদৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, বাঁদীরা ছুটোছুটি করে নিভোনো আলোগুলি প্রজ্বলিত করে

দিচ্ছে, খোজা প্রহরীরা সঙ্গীণ তুলে প্রহরায় রত। সিরাজ তাদের মধ্যে দিয়ে ছুটল চোরকুঠরীতে। সেখানে বন্দী করে রাখা আছে সোফিয়া বলে একটি আওরতকে, যে আওরত সিরাজের আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে অস্বীকার করেছিল, তার শাস্তি সিরাজ চিন্তা না করেই সমাধা করেছিল, তিনদিন অনাহারে কক্ষের মধ্যে বন্দী থাকবে তারপর চাবুকের প্রহারে তার দেহ থেকে রক্ত বের করে তাকে অত্যাচার করা হবে এমনি করে যখন ক্ষীণ হয়ে আসবে দেহ, তারপর কোন এক অনুচরের অনুগ্রহে তার শীলতাহানি করা হবে। সিরাজকে যারাই অস্বীকার করেছে তাদের শাস্তি সিরাজ এমনিভাবে সমাধা করেছে। আর আজ বেইমান সইদাবানু বাঁদীকে তাঁর মধ্যে রাখা হয়েছে। সিরাজের চিন্তা হঠাৎ বিদ্যুৎ তরঙ্গে লম্ফ প্রদান করেছিল এই ভেবে যে, এই সইদা সোফিয়ার ওপর নিশ্চয় কোন অত্যাচার করেছে কারণ দুই রমণী একই কক্ষে কয়েক ঘণ্টা থাকলে তারা যে কখনও সদ্ভাবের মধ্যে থাকবে না, সিরাজের জানা ছিল। তারা নিশ্চয়ই কলহে প্রবৃত্ত হবে এবং দুজনে দুজনকে আক্রমণ করে পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করবে। এই অনুমানের ওপর নির্ভর করেই তাই চীৎকার শুনে একটি চাবুক মুষ্টিবন্ধনে চেপে ধরে ছুটে গেল সেই বন্ধকক্ষের সামনে। তারপর চাবি ঘুরিয়ে কক্ষের দরজা খুলে অন্ধকার কক্ষের মধ্যে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। কিন্তু কোন শব্দ শুনতে পেল না বা কোন দৃশ্য দেখতে পেল না। কক্ষটি নিবিড় অন্ধকারে পূর্ণ। শুধু জমাট অন্ধকার ছাড়া কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। এ কক্ষে কোন গবাক্ষ ছিল না, শুধু দুটি ছোট ছোট ফোকর রাখা ছিল অনেক উঁচুতে, সেই উঁচু ফোকর দুটি দিয়ে অল্প একটু বাইরের চাঁদের আলো কক্ষের মধ্যে এসে পড়ছিল তার মধ্যেও কোন কিছু দৃষ্টি গোচর হল না সিরাজের।

ইতিমধ্যে একটি বাঁদী তার পাশে একটি আলোদান নিয়ে এসে দাঁড়াল। সিরাজ সেই আলো অনুসরণ করে দেখল, কক্ষের দুই কোণে দুই রমণী, সোফিয়া হাঁটুর ওপর মাথা দিয়ে বসে আছে, তার চুলগুলি সামনের দিকে ছড়ানো, ওপাশে সইদা মেঝের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে অঘোর নিদ্রার কোলে। সিরাজ দু পা এগিয়ে গিয়ে সোফিয়ার মাথার ওপর চাবুকের অগ্রভাগ দিয়ে দুবার মৃদু আঘাত করে ডাকল, সোফিয়া মাথা তুলল। দুদিন অনাহারে সোফিয়ার মুখখানি পাণ্ডুর হয়ে গেছে। রূপসী সুন্দরী সোফিয়ার চোখের কোলে কালিমার চিহ্ন। চোখের কোলে কান্নারও চিহ্ন, চোখের পাতা দুটি ভারী মনে হল।

সিরাজ তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে সোফিয়ার মুখের দিকে। এই রমণীটিও ফৈজীর মতো ব্যবহার করেছিল, তবে সে ফৈজীর সাথে মহব্বত করতে চেয়েছিল, আর এই রমণীর রমণীঐশ্বর্য লুণ্ঠন করতে চেয়েছিল। তার উত্তরে সোফিয়া ঘৃণিতস্বরে থুতু ছিটিয়ে সিরাজকে বলেছিল—'আমি তোমায় ঘৃণা করি শয়তান কুলাঙ্গার! সোফিয়াকে অদম্য রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে এই বন্ধকক্ষে নির্বাসন দিয়েছে। কিন্তু আজ সেই সোফিয়াকে দেখে এইমুহূর্তে তার বড় মায়া হল। সোফিয়াকে তো সে হৃদয় দিতে চায় নি, তার ওপর আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চেয়েছিল।

লুৎফার একটা কথা বড় বেশী মনে পড়ে, দুনিয়ায় আওরতের চেয়ে বড় অসহায়া আর কেউ নেই। তারা অবলম্বন চায়, যে অবলম্বনের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আছে, স্বস্তি আছে, যে আশ্রয় তাদের বেহেস্তের সুখ প্রদান করে, সেই আশ্রয়ের জন্যে সব আওরতই লালায়িত। তাদের ওপর দুনিয়ার প্রত্যেকে অত্যাচার করে, তাই তারা অত্যাচার পেতেই অভ্যস্ত। কেউ যদি তার বিনিময়ে একটু মহব্বত জানায় আর যদি সেই মহব্বত তার মনের ইচ্ছাকে জয় করে তাহলে তার দ্বারা জগতের সবকিছু পাওয়া সম্ভব।

লুৎফা নিজের কথা ঘুরিয়ে বললেও অনেক কথাই সত্যি! সোফিয়াকে দেখে যেন সিরাজের মনে হল, সে বড় ভুল পথে এগিয়ে গেছে, এমনিভাবে এদের ওপর অত্যাচার না করলেই ভাল হত।

এইসময়ে খোজা প্রহরী এসে সিরাজের সামনে কুর্নিশ জানিয়ে বলল—হুজুর, একবার বারমহলে যেতে হবে। যেখানে নয়া এক আওরতের বহুত তক্‌লিফ হয়েছে।

সিরাজ বিস্ময়ে খোজা প্রহরীর দিকে তাকিয়ে শুধু একটি হুম, শব্দ করল, তারপর কোন কথা না বলে খোজা প্রহরীর পিছু পিছু এগিয়ে চলল।

হীরাঝিল প্রাসাদের বাইরের মহলে থাকে সিরাজের যত মরদলোক। মুনসুর-গঞ্জের সমস্ত কাজ-কারবার সবই এই মহলেই সমাধা হয়। কাছারি বাড়ির মতো এ মহল। দিনে বহু বাইরের লোক এই মহলে আসা-যাওয়া করে। মুনসুরগঞ্জের সমস্ত খাজনা এইখানেই জমা পড়ে। এখানে অনুচরদের পরিবারবর্গদের নিয়ে বসবাস করবার জন্যে বহু কক্ষ ছিল। নবাবের কিছু সৈন্যসামন্ত ও সিরাজের হেফাজাতে এখানে থাকত।

সিরাজ তার চাবুক হাতে এইমহলে এসে উপস্থিত হল। সেখানে বহু নারী পুরুষ জমায়েত হয়েছিল। খোজা প্রহরী সিরাজকে নিয়ে একটি কক্ষের সামনে এসে দাঁড়াল, তারপর সেই কক্ষে প্রবেশ করল। কক্ষের মধ্যে মেঝের ওপর একটি রমণী বিস্রস্ত বেশবাসে অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে, এই রমণীকে এর আগে কখনও দেখেছে বলে সিরাজের মনে পড়ল না। তবু তার সন্দেহ হল, বহু রমণী তার হারেমে আছে তাদের মধ্যে কেউ কিনা তা ঠিক সে জানে না। তবে মনে হল, একে কোনদিন বোধ হয় সে দেখেনি। রূপসী সুন্দরীর কোন দেহ তার অজ্ঞাত আছে বলে মনে হয় না। বিস্ময়ে তাকাল সে খোজা প্রহরীর দিকে। কিন্তু চোখে পড়ল,

কক্ষের অন্যপ্রান্তে। তারই এক ভীষণাকৃতি অনুচর ইয়ারজঙ্গ হস্ত-পদ বদ্ধাবস্থায় সেখান থেকে তার দিকে ভীতচোখে তাকিয়ে আছে।

খোজা প্রহরী বলল—এই বেইমান, এই আওরতকে গঙ্গার ধার থেকে চুরি করে এনে তার ওপর অত্যাচার করছিল, আওরতটি গর্ভবতী, সে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে চীৎকার করে উঠেছিল বলে আমরা জানতে পারি।

সিরাজ ক্ষুব্ধদৃষ্টিতে ইয়ারজঙ্গের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দিয়ে জিজ্ঞেস করল—সাচ বাত ইয়ারজঙ্গ ?

ইয়ারজঙ্গ ভীতস্বরে কাঁদ কাঁদ হয়ে কিছু বলতে গেল কিন্তু সিরাজের চাবুক বাতাসে আন্দোলিত হয়ে ইয়ারজঙ্গের ভীষণাকৃতি দেহের ওপর সপাসপ্ পড়তে লাগল। আর এক যন্ত্রণাকাতর চীৎকারের প্রতিধ্বনি রাতের শেষ প্রহরের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করল, সিরাজ নিজের মনের সমস্ত ক্রোধ যেন উজাড় করে দেবার জন্যে অমানুষিক ভাবে চাবুক চালাতে লাগল। অদ্ভুত বিরাট লাশের দেহ এতটুকু হয়ে চাবুকের আঘাতে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, মুখে কথা নেই ইয়ারজঙ্গের, সে যে অন্যায় করেছে এবং ধরা পড়েছে সে তা জানে, তাই সিরাজের কাছে পরিত্রাণ পাবে না বলে কোন অনুনয় সে করেনি।

কতকক্ষণ চাবুক চালিয়েছিল সিরাজ জানে না হঠাৎ তার দেহটা টলে উঠল। সে যেন অচেতন হয়ে পড়ে যেতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল, তার হাত থেকে চাবুকটি খসে পড়ল, চোখে অন্ধকার দেখল তারপর বিড়বিড় করে বলল—পাশে দণ্ডায়মান প্রহরীকে—সোফিয়া ও সইদাকে মুক্তি দিয়ে দাও। এই আওরতটির শুশ্রূষা করে ওকে ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দাও। এই বলে সিরাজ আর অপেক্ষা না করে মাতালের মতো টলতে টলতে নিজের কক্ষে গিয়ে শয্যার ওপর ক্লান্ত শরীরটা ঢেলে দিল। তারপর আর তার কোন খেয়াল রইল না। অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকল বাকী রাতটুকু।

সেদিনও রাত তার গতিপ্রবাহ নিয়ে একই নিয়মে প্রহর রচনা করছিল।

●
● ●

দিন কয়েক পরের একদিন সকালবেলা। কোথা থেকে ভেসে আসছিল কোন মুসাফিরের সুরেলা কণ্ঠে দরবারী সুরের একটি গজল গীত।

'জলমৎ কদমে মেরে সবি আগম কা যৌশ হায়।
এক সমা হায় দালিলে—এ মোহর সো খামোশ হ্যায়॥'

সিরাজের ঘুম ভেঙে গেল, সে ক্লান্ত শরীরে মখমলের শয্যার গহনে চুপ করে শুয়ে আবোল-তাবোল ভাবছিল। হঠাৎ চমকে উঠল গীতের অর্থ শুনে। অদ্ভুত অর্থ মনে ধারণ করে মুসাফির রাত্রি প্রভাতে গাইছে—'আঁধেরা ঘর প্রিয় বিরহে সব আশার

আলো নেভা জমাট অন্ধকার, মন কাঁদা রাত্রি শেষ।' জাগর রাত্রি মিলনের সাক্ষী ছিল ঐ প্রদীপ—সেও নিভে গেল। নিবিড়তর হয়ে ঘিরে আসে অন্ধকার তমসা, কূলকিনারা নেই দুঃখের। সেই রোশনীর হারানো শিখার শোকে হাহাকার করে সারা অন্তর। কি যেন অমূল্য সম্পদ হেলায় হারাতে বসেছে।

রাত্রির শেষে অন্ধকারকে বিদূরিত করে আলোর পূর্বাভাসে মুসাফিরের এই গীত যেন বিরহীকে সমস্ত ক্লান্তির উর্ধ্বে তুলে তাকে শোকার্ত করে তুলল, সিরাজের চোখে জল চিকচিক করে উঠল। ব্যথাঘন হয়ে উঠল তার মন। তারও জীবনে এল না কারও মহব্বত—সব অন্ধকার। হৃদয়ের তিমিরেও সেই অন্ধকারের রাজ্যে কারও আলো একটু ফুটে উঠল না। তাই সে মুখ লুকিয়ে এই প্রাসাদ কক্ষের মধ্যে বন্দী জীবন নিয়েছে, নিয়েছে অবসর। সে অসুস্থ বলে চারিদিকে সংবাদ ছড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু তার অসুখ কি? হাকিম কি কোন মারাত্মক দাওয়াই দিয়ে তার এ হৃদয়ের জ্বালা উপশম করে দিতে পারেন? পারেন না। সে বহুরমণী পরিবৃতা হয়ে জীবন নির্বাহ করেছে, নাচ, গান হল্লার মধ্যে সমস্ত জীবনের আনন্দ ফিরে চেয়েছে, কিন্তু পেয়েছে কি? তামাম হীরাঝিলের সমস্ত রংমহল ঘিরে বহু সুন্দরীর হাট। বহু আওরতের অশ্রু তার মনের মালিন্য মুছিয়ে তাকে সুখ দান করেছে,—কিন্তু সে কি সুখ পেয়েছে? হৃদয়ের ভেতরের জ্বালা বহুদিন ধরে তাকে যন্ত্রণা দিয়ে তাকে জীবনধারণে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে, সে তবু নিজেকে নিয়ে এক জঘন্য আনন্দের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিল কিন্তু আঘাত সম্পূর্ণ প্রচণ্ড হয়ে উঠল ফৈজীর প্রত্যাখ্যানে। ফৈজী তাকে চোখের ওপর দেখিয়ে দিল, দুনিয়ার সবচেয়ে ঘৃণ্যপুরুষ সে, তার তুলনা ঐ সামান্য এক সৈনিকের চেয়েও ঘৃণ্য। যদি এক সামান্য সৈনিকের সঙ্গে তার অভিসার রচনা হয়, তবু সে আনন্দ পাবে, যেখানে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ভাবী নবাব হয়েও সে পাবে না।

এত ঘৃণা এই সামান্য এক রমণীর মধ্যে জন্মাল কেমন করে? কেন সে ভাবী নবাবকে প্রত্যাখ্যান করে তার পণ্যা জীবনের ঐশ্বর্যকে বাঁচাতে চাইল? সিরাজ বুঝে উঠতে পারে না তার অপরাধ কি? সে কি ঐ দিল্লীর বাদশাহের চেয়েও ঘৃণ্য? দিল্লীর বাদশাহের হারেমে আছে লাখো লাখো খুবসুরত আওরত। বাদশাহ সেই আওরতের ইন্তেজারে জীবন নির্বাহ করেন। ফৈজী সেখান থেকে প্রেরিত। তাহলে ফৈজী কেন তাকে উপেক্ষা করল?

তাছাড়া সে চেয়েছিল মহব্বত, চায় নি পাশবিক প্রবৃত্তি জাগ্রত করে ফৈজীকে আকর্ষণ করতে। না পাওয়ার জন্যে যে দুর্বলতা প্রকাশ করেছিল সে দুর্বলতা যে তার জীবনের একটি অসহমুহূর্ত—সে কথা কি ঐ দাম্ভিকা রমণী উপলব্ধি করে নি? আজ সেই ফৈজীর প্রত্যাখ্যানে মানসিক ধৈর্য হারিয়ে অসুস্থতার ভান করে নিজের কক্ষের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে। আদেশ দিয়ে দিয়েছে, সমস্ত আওরতদের তাদের নিজ আস্তানায় পাঠিয়ে দিতে। যারা না যাবে তারা থাকবে, স্বইচ্ছায় কেউ যদি থাকতে চায়, তাদের নিয়েই হবে তার অভিসার রচনা। রংমহল অবশ্য উপস্থিত

বন্ধ করে দিতে আদেশ দিয়েছে, সেখানে সন্ধ্যার আঁধারে আলোর রোশনাই জ্বলবে না, সরাবের পানপাত্রের অস্বাভাবিক শব্দ অনুচ্চারিত হবে না। নর্তকীও ঠমকি ঠমকি চালে তার তনুশোভা বিকশিত করে নৃত্যের তুফান তুলবে না। মোসাহেবদেরও আর হৈ-হুল্লোড় শোনা যাবে না। আতরের খুসবু বাতাসে হিল্লোল ছড়াবে না। সমস্ত কিছু স্তব্ধ। হীরাঝিলের অন্যান্য প্রাণীরা অবাক হয়ে গেল। ভবিষ্যৎ নবাবের এই কর্মপন্থা বড় আশ্চর্যান্বিত করল তাদের। সমস্ত হীরাঝিল সন্ধ্যার পরে যেখানে আলোর মালায় নেচে বেড়াত, সেখানে এই স্তব্ধতা যেন বড় আশ্চর্যজনক।

সিরাজ নিজের কক্ষে বসে সংবাদই পেতে লাগল। আরও একটি সংবাদ তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তাকে উত্তেজিত করল, সে তার আম্মাজান ও মাতৃষ্বসা আমিনা ও ঘসেটির জীবনের জঘন্য কাণ্ড। সে এর পূর্বেই শুনে এসেছিল দুজনের কলহ। সংবাদদাতার মুখে শুনল, ঘসেটিবেগম ক্ষিপ্ত হয়ে তার আম্মা আমিনাবেগম ও হোসেনকুলী খাঁর মৃত্যু চায়? চমকে ওঠে সিরাজ এমনি দুঃসংবাদ শুনে।

মৃত্যু চায়! এত বড় স্পর্ধা ঘসেটিবেগম বিবির।—এখনও নবাব আলিবর্দী খাঁ বেঁচে আছেন, বেঁচে আছেন নবাব হারেমের শোভা নবাববেগম। তাঁরা কবরে শায়িত হবার পূর্বেই ঘসেটি এমনি ক্ষিপ্ত ঘোষণা ছড়িয়ে দিতে সাহস করেন? ঘসেটি কি ভুলে গেছেন সিরাজ বলে একটি পরিণত যুবক এখনও আমিনাবেগমের ইন্তেজার করে? আমিনাবেগম যত দোষই করুন তবু তাঁর গর্ভে স্থান পেয়েছে সিরাজ। সে তার মাকে শত্রু কবল থেকে না বাঁচিয়ে শত্রু কবলে হারিয়ে দেবে, এই চিন্তাই কি ঐ ঘসেটি বেগম করেন? নাকি ঘসেটি বেগম ভেবেছেন, সিরাজের কোন ক্ষমতা নেই, সে দুর্বল, শক্তিহীন, তাকে ভয় করার কোন মূল্য নেই।

হয়ত তাই, ঘসেটি যে ধরণের রমণী তিনি সবই চিন্তা করতে পারেন। নবাব বেগমের গর্ভের কন্যা হয়ে রমণীর সবগুলি অপরাধের অপরাধিনী হয়ে ঘসেটি এই মুর্শিদাবাদের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা জোর করে বজায় রাখতে চান। তিনি প্রকাশ্যে নয়, গোপনে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করবার ষড়যন্ত্রও করে চলেছেন, সে কথাও আর সিরাজের কাছে গোপন নেই, তার অনুচর জানিয়ে গেছে ঘসেটির সেই গোপন ষড়যন্ত্র। সিরাজ এখনও ঘসেটিকে এর জন্য কিছু বলেনি, কারণ নবাব আলিবর্দী নিজেই বলেছেন,—এসব তুচ্ছ ব্যাপার! আভ্যন্তরীণ গোলাযাগের দিকে মন না দিয়ে বাইরের ষড়যন্ত্র থামানোর বন্দোবস্ত করাই যুক্তিসঙ্গত। শুধু দেখে রাখো কে কোথায় মাথা তোলবার চেষ্টা করছে? আসলে নবাব আলিবর্দী নিজের কন্যার

ওপর কোন অত্যাচার চালাতে ইচ্ছুক নয় বলেই তিনি এমনি উপদেশ সিরাজের কাছে পেশ করেছেন। সিরাজ জানে, তিনি তাঁর কন্যাদের অত্যধিক স্নেহ করেন। আজ এই কন্যাদের জঘন্য ব্যবহার তাঁকে ভীষণ বেদনায় পোড়ায় কিন্তু তিনি এর জন্যে কোন আদেশ দিতে পারেন না, কুণ্ঠা অনুভব করেন।

সিরাজ জানে সব। সিরাজ সবই জানে বলে তার আজ মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে গেছে সে আজ হতোদ্যম। সে ভাবছে, সে যেন দিনের পর দিন মুর্শিদাবাদের আসমান থেকে একটু একটু করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। ভয়ে অনেকে তাকে মান্য করে কিন্তু ভয়প্রদর্শন করে যে মান্য তার মধ্যে স্থায়িত্ব কোথায়? সামনে অনেকেই ভয় করে, শ্রদ্ধা জানানোর ভঙ্গি করে কিন্তু পিছনে গেলে ছুরি শানায়? কিন্তু সে তো তা চায় না। যার যা মনের রূপ, প্রকাশ্যে উদ্‌ঘাটিত করবে। মেকি আসল তার প্রমাণ হয়ে যাবে।

লোকে বলে দাদু আলিবর্দীর পেয়ারের নাতি। জীবনে সে দাদুর অত্যধিক স্নেহে লালিত পালিত হয়েছে বটে কিন্তু তার চিন্তাধারা কি দাদুর চিন্তার সঙ্গে এক? সে তো দাদুকে কখনও অনুসরণ করে না। ছোটবেলায় দাদুর স্নেহক্রোড়ে বসে তার জীবন অতিবাহিত করেছে কিন্তু বড় হয়ে সে এই প্রাসাদ রচনা করে চলে এসেছে। লোকে তাতেও ব্যাঙ্গোক্তি করে বলে—সিরাজ উচ্ছৃঙ্খল জীবনের স্রোতে নিজেকে নিমজ্জিত করতে চায় বলেই এই প্রাসাদের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তারা জানে না এই প্রাসাদ যে তার আগামী নবাবের রাজপ্রাসাদ হিসাবেই নির্মিত হয়েছে। লোকে কতটুকুই বা তার সংবাদ জানে? সিরাজ উচ্ছৃঙ্খল। নবাব আলিবর্দীর বংশের সবচেয়ে চিহ্নিত পুরুষ বলে সে চিহ্নিত। এ ছাড়া আরও অনেক উপাধিই সে পেয়েছিল, সে ছন্নছাড়া। রমণী আসক্ত, মদ্যপ, বিলাসী, চিন্তাহীন—আরও আরও অনেক। কিন্তু তারা কি জানে, সিরাজ ভাবে কত আপন করে। তার অন্তরঙ্গতার সংবাদ, তার আন্তরিকতার স্পর্শ যদি কেউ পেত? কিন্তু কে পাবে? সবাই তাকে ঘৃণাই করল। ঘৃণ্যকে মহব্বত দিয়ে কাছে টেনে নিল না। তার অন্তরটা ভাল করে বিচার করে দেখল না।

লুৎফা অবশ্য সেই সিরাজের কিছু পরিচয় অবগত আছে। কিন্তু তাকেও কেমন যেন মাঝে মাঝে সিরাজ বুঝতে পারে না। রমণী মাত্রেই তার কাছে কেমন যেন রহস্য। নবাববেগম, আমিনাবেগম, ঘসেটিবিবি, লুৎফা-প্রধান যারা তার জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাদের সে কিছুতে বুঝতে পারে না। মাঝে মাঝে মনে হয় লুৎফাকে বুঝি সে স্পষ্টই বুঝে ফেলেছে কিন্তু পরক্ষণে তার আচরণে এমনি হতবুদ্ধি হয়ে গেছে যে তারপর সে স্বীকার করেছে লুৎফাকে সে বুঝতে পারে নি।

ঘসেটিবেগম ঘোষণা করেছেন, হোসেনকুলী ও আমিনার সে মৃত্যু চায়? সিরাজ কি এই কথা শোনার পর চুপ করে এই হীরাঝিলে বসে বসে তাদের মৃত্যুর সংবাদ শুনবে। মুর্শিদাবাদের সমস্ত বাতাসে যখন হা হা করে প্রচারিত হবে হত্যার সংবাদ! সমস্ত মুর্শিদাবাদ ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে থরথর করে কেঁপে উঠবে, তখন সে

এই হীরাঝিলের অলিন্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আসমানের ওপর তাকিয়ে দেখবে, সেই নীলাম্বর আসমানের জমিনে শুভ্র মেঘের শরীরে রক্তের ছিটে লেগেছে কিনা!

সংবাদটি শুনেছিল আজ গত তিনদিন। কিন্তু আজই ভোরবেলা তার ঘুম ভেঙে গেছে এক দুঃস্বপ্নের পর। সে চীৎকার করে উঠেছিল সেই দুঃস্বপ্ন দেখে। তার আম্মাজান রুধিরাক্ত হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কাতর হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলছে, 'বেটা সিরাজ, আমি পাপিষ্ঠা, আমি কলঙ্কিনী সত্যি কথা কিন্তু আমার অপরাধটাই তোমার চোখে এমনভাবে প্রত্যক্ষ হল যে, তোমার আম্মার হত্যাকারীকে তুমি শাস্তি দিতে এগিয়ে এলে না। আমি কি তবে জানব—আমার বেটা সিরাজ, রক্তমাংসের শরীরে একজন পুরুষ হলেও সে কাপুরুষ, মায়ের অপরাধের জন্যে তার ঘৃণ্যমন মাকে হত্যার জন্যে হত্যাকারীর সমীপে ঠেলে দিল। আসলে এসব কিছুই নয় সে দুর্বল, সে ভীরু, সে নবাববংশে জন্মেও নবাবী রক্তের অবমাননা করেছে, তার হাতে তরবারী কাঁপে, সে তরবারী চালাতে অক্ষম।

হঠাৎ যেন কার কান্না শুনে সিরাজের ঘুম ভেঙে গেল। ভেবেছিল, তার মা বুঝি রুধিরাক্ত হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তার শিয়রের পাশে বসে কাঁদছে কিন্তু চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, কোথাও কেউ নেই। যেটা ঘুমের মধ্যে শুনেছিল কান্না, সেটা কান্না নয়, সেটা ঐ মুসাফিরের কণ্ঠের দরবারী সুরের গান।

'এক সমা হ্যায় দালিলে—এ সোহর সো খামোশ হ্যায়॥'

জাগর রাত্রির মিলনের সাক্ষী ছিল ঐ প্রদীপ—সেও নিভে গেল।

সিরাজ পালঙ্ক থেকে উঠে ঝিলের ধারে অলিন্দে এসে দাঁড়াল। এখানে সে বহুদিন এমনি এসে দাঁড়িয়ে মনে মনে বিশাল আসমানের পরিমাণ কল্পনা করেছে আজও তা মনে করল। সূর্য সবে উঠতে শুরু করেছে। ভাগীরথীর অপর পারে মেঘের ওপর সূর্যের রক্তিমাভা দিগন্তবিস্তার করে আলো ছড়িয়েছে। পারাবত উড়ছে আসমানের বুকের ওপর। সোচ্চারে তরণী ভেসে চলেছে গঙ্গার কূল ছাপিয়ে। নিজামত কেল্লা থেকে সানাইয়ের মধুর রাগিণী ভেসে আসছে। এখান থেকে নিজামত কেল্লা অনেকদূরে। তবু সে ভোরের রাগিণী মানুষের কলরবের পূর্বে ছুটে এসেছে হীরাঝিলের অলিন্দে। সিরাজের কানে মধুর লাগছে সে রাগিণী। কিন্তু মধুর মাধুর্য আরও বিকশিত করত তার পাখা, যদি সিরাজ একটু শান্তি পেত। সিরাজ শান্তির জন্যে চঞ্চল হয়ে আবদ্ধ করেছে নিজেকে এই হীরাঝিল প্রাসাদে। বিশেষ করে ভোরের দুঃস্বপ্ন তাকে আরও চঞ্চল করে তুলেছিল আজকের এই সকালে। তার প্রথম কাজ অনুচর ডেকে নবাবপ্রাসাদের সমস্ত সংবাদ নেওয়া, এবং নবাব বেগমের কাছে পাঠিয়ে জেনে আসা—যে সিরাজের প্রয়োজন আছে কি না?

তার আম্মাজানের সঙ্গে অনেকদিন সে সাক্ষাৎ করেনি। একবার—সাক্ষাৎ করলে বড ভাল হত, সেদিন তিনি তাকে ডেকেছিলেন কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করে চলে এসেছে। সত্যিকথা বলতে কি—তাঁর ওপর সেদিন বড় ঘৃণা জন্মেছিল বলে সাক্ষাৎ করেনি। সন্তান হয়ে পাছে কোন অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করে ফেলে, তিনি

ব্যথা পান—সিরাজ নিজে আহত হয় বলেই সে পরে সাক্ষাৎ করব বলে পালিয়ে এসেছিল।

হ্যাঁ, বহুদিন সে তার আম্মাজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নি, মাতৃক্রোড়ের স্নেহ অনেকদিন সে পায় নি। দাদু আলিবর্দী ও নবাববেগমের কাছে স্নেহ পেয়ে সে লালিত কিন্তু তাই বলে তার মা আমিনাকে সে ভুলবে কেমন করে? তাঁর গর্ভে যে সে জন্মগ্রহণ করেছে। তাঁর দ্বারা যে সে এই দুনিয়ার আলো দেখেছে। মা আমিনার সঙ্গে এইমুহূর্তে দেখা করার জন্যে তার মন আকুলিত হয়ে উঠল। কিন্তু যেতে তার মন চাইল না। ঐ নবাবপ্রাসাদের ঘৃণ্য পরিবেশে এখুনি গেলে নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে যা সারাজীবনের অনুশোচনায় তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দেবে। কারণ তার মানসিক সংযম এখন অসংযমী হয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে মনে মনে উত্তেজিত হয়ে আছে। তা'ছাড়া দাদু আলিবর্দী বোধ হয় আবার তার সেই ভবিষ্যৎ কল্পনা নিয়ে তার সুন্দর স্বপ্নকে আঘাত হানবেন, আর তারই জ্বালাতে সে ভাববে কতকগুলি বিশ্রী দৃশ্য। বিশ্রী সে অতীত কাহিনী। যা এ নবাববংশের মজ্জায় মজ্জায় আন্দোলিত হয়ে অভিশপ্ত হয়ে আছে।

সিরাজ সেইজন্যে অনুচরকে ডেকে নির্দেশ দিল—এখুনি নবাবপ্রাসাদে গিয়ে তাদের কুশল সংবাদ আনয়ন করবে, আর জিজ্ঞেস করে আসবে নবাববেগমকে—সিরাজের কোন সাহায্য তাঁর লাগবে কি না।

অনুচর সেলাম জানিয়ে চলে গেলে সিরাজ একবার আল্লার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে চীৎকার করে বলল—ইয়া আল্লা, মেহেরবানি করে আমাকে এমনি কথা শুনিও না, যা আমার চিত্তে আলোড়িত হয়ে আমাকে উত্তেজিত করে!

সিরাজের প্রার্থনার প্রতিধ্বনি সমস্ত কক্ষে অনুরণিত হয়ে উঠল, সিরাজ মুখমণ্ডলের ওপর দুই হাতের তালু চেপে ধরে পালঙ্কের ওপর বসে পড়ল।

এবার একবার ফৈজীর সংবাদ পরিবেশনের প্রয়োজন। ফৈজী সে রাত্রে সিরাজের কাছ থেকে আশ্চর্যজনকভাবে উদ্ধার পেয়ে কেমন যেন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। সে মনে মনে খুব পুলকিত হয়েছিল সিরাজকে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে বলে। তার রমণী জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছাটা ভাবী নবাব সিরাজকে দেখার পর কেমন যেন বিদ্রোহী ওঠে, এবং তার পরবর্তী অধ্যায়গুলি রচিত হয় সেই মনন ইচ্ছাকে ভিত্তি করেই। ফৈজী যেন সমস্ত আওরতের কর্ত্রী হয়ে সিরাজকে আঘাত করবার জন্যেই আবির্ভূতা হয়েছিল। সে যখন প্রথম এসে জেনেছিল, বাংলার এই ভাবী নবাব বড় অহঙ্কারী, সে আওরতকে এতটুকু সম্মান দেয় না।

তাদের সাথে ব্যবহার করে ঠিক নফরের মতো। তখন থেকেই তার মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে—তারপরের ঘটনা অবশ্য সকলেই জানে।

ফৈজী তার অসহ্যরাত্রি পার হয়ে এসে হীরাঝিলের প্রাসাদের সবচেয়ে উঁচু চত্বরে দাঁড়িয়ে খুশিতে হাঃ হাঃ করে অট্টহাস্য হেসে উঠল। সে যেন সিরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাকে অপমানিত করে নিজেকে মহীয়সী করতে চায়—এমনি ধারা তার অহমিকা সোচ্চারিত হয়ে সকলকে চমকে দিল। কেউ কেউ ফৈজীর দিকে তাকিয়ে সভয়ে বলল, যুবরাজের শাণিত ছুরিকার ভয়ও কি এর নেই, এক মাসুম আওরত ক্ষীণকায় দুর্বল শক্তি নিয়ে কি করে ভয়ঙ্কর সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে চায়? তার উত্তরে ফৈজী জানাল তার রক্ত লক্ষ্ণৌর মাটিতে প্রথম শরীরে এসেছে, তারপর সে রক্ত শোণিতের ধারা হয়ে শিরায় শিরায় উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে—দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহর হারেমের জৌলুসের মধ্যে।

ফৈজী সিরাজের দুর্বল অংশগুলির অনুসন্ধান বেশ ভালভাবেই করেছিল। একটি আওরত যত সহজে একটি পুরুষকে বুঝতে পারে, একটি পুরুষ তত সহজে একটি আওরতকে বুঝতে পারে পারে না। এখানে ফৈজী হীরাঝিলে এসে যত তাড়াতাড়ি সিরাজকে বুঝতে পারল, তত তাড়াতাড়ি সিরাজ তাকে বুঝতে পারল না। সিরাজ একেবারেই কোনদিনই বুঝতে পারে নি। সিরাজের বুদ্ধির প্রখরতা ছিল বটে কিন্তু চঞ্চলতার জন্যে সে বুদ্ধির সংযম ছিল না। এ ছাড়া আওরতের ক্ষেত্রে সে একটি চিন্তাই মনে পোষণ করেছিল, আওরত খুবসুরত হলেই তাকে ভোগ করতে হবে, সেখানে আর কিছুর প্রশ্ন উদয় হতে পারে না।

ফৈজীর ক্ষেত্রে অবশ্য তার মহব্বত প্রথমে অনুচ্চারিত হয়েছে কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সেই একই পন্থা। সেই আওরতকে ভোগ করার অদম্য ইচ্ছা। ফৈজী প্রথম থেকেই এই চরিত্রহীন ভাবী নবাবকে দেখে মনে মনে প্রমাদ গুণেছিল। কিন্তু তারপর সেই অহঙ্কারী মানুষটিকে প্রলোভিত করতে তার এক মিনিটও লাগে নি। সেদিন সেই অশুভ মুহূর্তে হয়ত সিরাজ অতর্কিতে তার ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করে নিত, কিন্তু ফৈজী জানে, সিরাজের চোখে ছিল মহব্বত, সে ঐ ভাবে ফৈজীকে গ্রহণ করে কিছুতে খুশী হত না, বরং সে তারপর ফৈজীর কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করত। ফৈজী কি ক্ষমা করত?

সিরাজ নিজের কক্ষে বসে দুনিয়ার সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করে প্রচার করে দিল—সে অসুস্থ! কেউ যেন তাকে অহেতুক জ্বালাতন না করে। ফৈজী মনে মনে হাসল। মনে মনে বলল—এখন যদি সে যায় সেই দাম্ভিক পুরুষের সান্নিধ্যে তাহলে তার এই অসুস্থতার ভান করে নিজের কক্ষে আত্মগোপন করে থাকা কি স্থায়ী হবে? ফৈজী এই কদিনে হঠাৎ যেন একটু অধিকভাবে সিরাজের অন্তরের সমস্ত গোপন ইচ্ছাগুলি জেনে নিয়েছিল। সে যেন সিরাজের চরিত্রের সবটুকু চিত্র পর পর সাজিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারত। এই অভিজ্ঞতা তার হঠাৎ হয়ে যেতে সে একটু বেপরোয়া হয়ে উঠল। সিরাজের শাণিত ছুরির ভয়ে যারা সর্বদা কাঁপে, তারা ভীত

হয়ে ফৈজীর দিকে তাকাল। তারপর আফসোস করে বলল—আওরতটি বেঘোরে প্রাণটি দেবার জন্যে এমনি বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

সিরাজের ঢালাও আদেশে রংমহল বন্ধ কিন্তু ফৈজীর কক্ষ থেকে বাদ্য যন্ত্রের শব্দ ও তার সাথে নাচের নিক্কণ প্রাসাদের স্তব্ধতা কেড়ে নিল। ফৈজী নাচে আরও খুশীর মৌতাতে। তার পায়ের ছন্দ যেন আরও আড়ষ্টহীন সাবলীল ভঙ্গিতে স্রোতের উজান ছোটায়। তওফাওয়ালীর বংশের ইজ্জত যে এই নাচের মধ্যেই, সে কথা প্রমাণ করবাই জন্যে ফৈজীর নাচের ছন্দে উন্মাদ তরঙ্গ। বাজনদার হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ফৈজীর দিকে। মনে মনে সে বলে; রূপ না হলে সুরত না থাকলে রূপসীর নাচে বাহার কোথায়? ফৈজীর পরনে সাচ্চা সলমা জরির কাজকরা ঘাগরা—ফিকে আসমানী রং এর ওড়না, নিটোল পুরুষ্ট দেহের ভাঁজে ভাঁজে চেপে বসেছে সার্টিনের সালোয়ার। ফৈজী উত্তেজনায় কাঁপে। ঘাম ঝরে তার সারা মাখন শরীর চুইয়ে। ঘামে বুকের ঐশ্বর্যে ঢাকা কাঁচুলি বসে যায়। মাথায় জরীর উষ্ণীষের ফাঁক দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে সোনালী ফিতে জড়ানো দীর্ঘ বেণী। গতিবেগে সুঠাম ছন্দ দোলে।

বাজনদারের হাত কেঁপে ওঠে, মাঝে মাঝে তাল কেটে যায়। ফৈজী বিরক্ত হয় না, মনে মনে সে দুষ্টুমির ফাঁদ পেতে হঠাৎ থেমে পড়ে, তারপর বাজনদারের গালে টুসকি মেরে হেসে বলে—মিঞাজী, থোড়া সরাব পিয়ে নাও, দিল আচ্ছি হয়ে যাবে।

ফৈজীর ওপর সবার লোভ—কিন্তু কেউ সাহস করে এগোতে পারে না। একদিন ফৈজী জাফর আলিকে খুঁজেছিল কিন্তু তার উত্তরে শুনেছিল সিরাজ আদেশ দিয়ে রেখেছে কোন দিন যদি জাফর আলি এই প্রাসাদের ত্রিসীমানায় আসে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। নবাব আলিবর্দীর বহিনের সোহাগ বলেও তার ক্ষমা নেই। ফৈজী জাফর আলিকে ডেকে আনবার জন্যে আদেশ দিয়েছিল কিন্তু কেউ তার আদেশ পালন করে নি।

ফৈজী জাফর আলির আশা ছেড়ে দিয়ে অন্য কথা ভাবতে লাগল। সিরাজকে আঘাতের জন্যে তার মন ছটফট করতে লাগল। তাছাড়া তার প্রয়োজনও ছিল। তার রমণী জীবন যেন পুরুষের আলিঙ্গনের জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠল। নতুন মাশুক প্রয়োজন। যাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে সে সিরাজকে অবজ্ঞা করবে। কিন্তু কোথায় মাশুক? সব তার মতো আওরত হীরাঝিল প্রাসাদের মধ্যে। আওরত ছাড়া আর কেউ নেই। বাঁদীরাই সমস্ত পরিচালনা করে—আর কিছু খোজা প্রহরী আছে, কিন্তু তারা বাইরে বাইরেই থাকে। ফৈজীর বেরবার হুকুম নেই, থাকলে সে মুর্শিদাবাদের নবাবী পথ থেকে বহু খুবসুরত মাশুক পছন্দ করে ধরে নিয়ে আসত। আর সিরাজ ঈর্ষায় জ্বলে উঠে ক্ষিপ্ত হয়ে ছটফট করে প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে ছুটে বেড়াত। ফৈজী দেখত হাসত, খুশী হত। সেই আনন্দে রক্তে এক প্রতিশোধের আদিম উত্তেজনা অনুভব করে ফৈজী অনুসন্ধান করতে লাগল মাশুকের জন্যে।

একদিন প্রায়ান্ধকার গলিপথ দিয়ে সে তার কক্ষে ফিরেছে, হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে

কার বুকের সঙ্গে তার সুউন্নত বক্ষের ধাক্কা লাগল, ফৈজী সামলে নিয়ে তাকিয়ে দেখল একটি অদ্ভুত সুন্দর যুবাপুরুষ। বিস্ময়ে সে চমকে উঠল। একেই তো সে মনে মনে কামনা করছিল! যুবাপুরুষটি সিরাজের ভগ্নীপতি সৈয়দ মহম্মদ খাঁ, রাবেয়ার সোহাগ।

সৈয়দ মহম্মদও আচমকা ফৈজীকে দেখে চমকে উঠেছিল। মনে মনে তার বহুদিনের সাধ ছিল, ফৈজীকে একবার প্রাণভরে দেখে, উপভোগ করতে গেলে মৃত্যু ডেকে আনতে হবে। কিন্তু এই গলিপথে হঠাৎ এমনিভাবে অন্ধকারে ফৈজীকে এত কাছে পাবে সে আশা করে নি।

ফৈজীর দেহের সুবাসে তার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে উঠল। সে আর স্থান-কাল না ভেবে ফৈজীকে সবলে বক্ষে আকর্ষণ করে নিয়ে তার অধরে নিজের তপ্ত অধর স্থাপন করে চুম্বন রেখা অঙ্কিত করল। ফৈজীকে পাগল করে দিল। ফৈজীও কেমন যেন মোহাবিষ্ট হয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল মুহূর্তে। এমনি করে কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর ফৈজী ফিসফিস করে বলল, আমি কে জানো?

সৈয়দ মহম্মদ মাথা নাড়ল।

আমার কক্ষে যাবে?

সৈয়দ মহম্মদ আবেগঘন কণ্ঠে বলল—কিন্তু সিরাজ!

ফৈজী একবার সিরাজকে স্মরণ করল। কিন্তু তখন তার মনে সিরাজকে অপমান করার ইচ্ছাটা প্রবলভাবে জেগে উঠেছে। বলল, কোন চিন্তাই নেই। যদি কোন বিপদ আসে তার জন্যে আমি দায়ী থাকব।

মানুষের একটা এমন সময় আসে যে সময় সমস্ত চিন্তাশক্তি তার লোপ পেয়ে যায়। সৈয়দ মহম্মদেরও তাই হল। সে আর কোন কিছু চিন্তা করবার পূর্বেই ফৈজীর হাতের বন্ধনে তার সঙ্গে গিয়ে তার কক্ষে প্রবেশ করল।

তারপর!

তারপর সিরাজ যা ফৈজীর কাছে থেকে পাই নি। সৌভাগ্যবান সৈয়দ মহম্মদ প্রাণভরে তাই পেল ফৈজীর সম্পূর্ণ ইচ্ছার মধ্যে দিয়ে। সৈয়দ মহম্মদ কিন্তু ভীষণ ভীত হয়ে পড়ল। ফৈজীকে বলল—যদি জানতে পারে সিরাজ, তাহলে দুজনের গর্দান কিন্তু সে নেবেই।

ফৈজী হাসতে হাসতে বলল—আমি ভয় করি না তোমাদের সিরাজকে। যদি জিজ্ঞেস করে বলব—আমরা তওফাওয়ালীর জাত। আমাদের এক মন এক দিল নিয়ে ঘর করতে মানা। তারপর ফৈজী বলল—আমি কি তার ঘরের বেগম, যে আমার ওপর এত শাসন খাটাবে? আমার যাকে ভাল লাগবে তাকেই আমি গ্রহণ করব।

কিন্তু সৈয়দ মহম্মদ ভীত হলেও হঠাৎ বাড়তি এই সেরা বাইজীর দেহের রোশনাই উপভোগ করে তার যেন হৃদয়ের শোণিতে নেশার ঝড় উঠল। সে বার বার ফৈজীর কক্ষে হানা দিতে লাগল। আর ফৈজী তাকে বার বারই খুশী করতে লাগল কিন্তু মনে মনে ফৈজী এর পরিণাম চিন্তা করে হাসল। এতটুকু ভয় তার জাগল না।

সে যেন মৃত্যুকে নিয়ে খেলা করতে লাগল। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে সে জেতবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। এদিকে চলল দিনের পর দিন সৈয়দের সঙ্গে ফৈজার অভিসার রচনা।

ফৈজীর রক্তে দারুণ আগুনের তাপ। উত্তেজনায় সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সিরাজেরই প্রাসাদে তারই চোখের সামনে এই ব্যভিচার যেন সিরাজকে তীব্র উপেক্ষায় ব্যঙ্গ করতে লাগল। ফৈজী কোন কিছু গোপন করত না। সে সবার সামনেই সৈয়দ মহম্মদকে কণ্ঠালগ্ন করে নিয়ে নিজের কক্ষে প্রবেশ করত। হীরাঝিলের অন্যান্য বাঁদীরা দেখে শিউরে উঠত। সিরাজ তখনও জানতে পারে নি। কেউ জানায়নি তার কারণ এর পরিণাম ভেবে। এর পরিণাম যে মৃত্যু। হীরাঝিলের প্রাসাদে এ পর্যন্ত কোন মৃত্যু ঘটেনি কিন্তু এখন সকলে দেখল এবার মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা উপস্থিত। পবিত্র হীরাঝিল প্রাসাদ এবার রমণী রক্তে কলঙ্ক গ্রহণ করবে। সিরাজ জানতে পারলেই ফৈজীর হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নেবে। ফৈজী যে এই ব্যভিচার থেকে মুক্তি পাবে না, সেই কথা ভেবেই কেউ বলে নি এই মারাত্মক সংবাদ।

কিন্তু একদিন তাও জানতে পারল সিরাজ। সিরাজ মনে মনে ভেবেছিল এমনি একটি ঘটনার কথা। ফৈজী যে তার ওপর প্রতিশোধ নেবে সে যেন অনেকদিন আগেই উপলব্ধি করেছিল। কিন্তু সেদিন নিজে সচক্ষে দেখে যেন হতচকিত হয়ে গেল। সেদিন সে অপেক্ষা করছিল, নবাবপ্রাসাদের শুভসংবাদের জন্যে। নবাববেগমের কাছ থেকে এত্তেলার জন্যে। তার আশা আমিনার সংবাদ পাবার জন্যে। বহু সংবাদ নবাবপ্রাসাদ থেকে আসবে তারই জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিল নিজের কক্ষে। কক্ষের মধ্যে ছটফট করতে করতে একসময় নিজের অজান্তে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। বাইরে বেরিয়ে এসে অন্যমনস্ক হয়ে চলতে চলতে ফৈজীর কক্ষের সামনে এসে পড়েছিল। হঠাৎ তার অন্যমনস্কতা ছুটে গেল, সচকিত হয়ে ফৈজীর কক্ষের মধ্যে কান পাতল। শুনল ফৈজী কলস্বরে কাকে যেন সোহাগের রেণু দিয়ে আহ্বান করে কাছে ডাকছে।

সিরাজের মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল। সে উত্তেজিত হয়ে উঠল, কি করবে ভেবে না পেয়ে কোমর থেকে ছুরিখানা বের করে বজ্রমুঠিতে হাতে চেপে ধরল। রক্তবর্ণ হয়ে উঠল মুখখানা। দাঁতে দাঁত চেপে সে একবার ইতস্তত করে চিন্তা করে নিল, এরপর সে কি করবে? কিন্তু আর ভাবতেও সে পারল না। রমণী রক্তে হঠাৎ উত্তেজনা বশে হাত রঞ্জিত করবে? এক পণ্যারমণীর ব্যভিচারের দণ্ডদানের জন্যে তার এই হত্যার সৃষ্টি যে তাকেই কলঙ্কিত করবে—এ কথা যদি একবার সে শান্ত হয়ে ভাবত—কখনই সে হত্যার জন্যে উত্তেজিত হয়ে উঠত না! কিন্তু ফৈজী যখন তার মহব্বতের রোশনী ছিল, সেই ফৈজী তাকে উপেক্ষা করে অন্য মাশুকের সঙ্গে মিশে তার সঙ্গে মহব্বত করছে; একি কখনও সহ্য করা যায়? এ যে প্রতিটি পুরুষের রক্তের আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

সিরাজ যখন ভাবনা-চিন্তা স্থগিত রেখে ফৈজীর কক্ষের মধ্যে ছুরি হাতে ঢোকবার

জন্যে এগিয়ে চলেছে ঐ সময় পথিমধ্যে একটি অনুচরের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়ে থম্‌কে দাঁড়াল।

সংবাদ এসেছে নবাববেগম তাকে জরুরী তলব করেছেন। এখুনি যদি সে না যায় তাহলে নবাববংশে যে কলঙ্ক জমা হবে তার ক্ষতি সারাজীবন ধরে সিরাজকেই ভোগ করতে হবে। নবাববেগম খুলে কিছু জানান নি—তবে যা জানিয়েছেন তাতেই সিরাজ আর অপেক্ষা করতে পারল না, একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ফৈজীর কক্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল—উন্মুক্ত ছোরাটি আবার যথাস্থানে স্থাপন করে, সিরাজ নবাপ্রসাদের দিকেই ছুটল। মনে মনে সে অস্ফুটস্বরে প্রতিজ্ঞা করল—ফিরে আসি একবার নবাবপ্রাসাদ থেকে, তারপর দুনিয়ার সেরা খুবসুরতের শাস্তি কি করে বাংলার ভাবা নবাব দেয়, তা একবার সারা মুর্শিদাবাদ প্রত্যক্ষ করবে। সিরাজ আওরতের দেহ নিয়ে যেমনি রংমহলের আলোর বন্যায় আতরের মৌতাতে আনন্দ করতে পারে, তেমনি তাদের বেইমানীতে তাদের সেই সুন্দর ফুলের মতো কুসুমসম দেহের অভ্যন্তরে ছুরিকা প্রবেশ করিয়ে হৃৎপিণ্টা কেমন করে বের করে আনতে পারে—তাও সকলে দেখবে। ফৈজীর অসামান্য তনুর শোভা রক্তের বন্যায় কেমন করে আরও সুন্দর হয়, সেই বীভৎসরূপ মনের মধ্যে সিরাজ দেখে পৈশাচিক উল্লাসে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু তার চোখে জল আসে কেন ?

অশ্ব ছুটেছে দ্রুতগতিতে। তার ওপর সওয়ার হয়ে বসে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ভাবী নবাব মির্জা মহম্মদ সিরাজ জঙ্গ বাহাদুর। তার শরীরে দারুণ উত্তেজনা ও অশ্বের দ্রুত গতিতে প্রচণ্ডভাবে দুলছে। পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে ছায়া ছায়া বহু বৃক্ষের সারি। আসমানে রোদ্দুরের ঝাঁজ। তেতে উঠেছে মাটি। এই তাপে চিনচিনে জ্বালা নেই, কেমন যেন ঠাণ্ডা আমেজ। একটি স্নিগ্ধ আমেজ-মাখা পরিবেশ সর্বত্র। দ্রুত গতিতে দৃষ্টির পথের বাইরে চলে যাচ্ছে ঝুপিঝাপি জঙ্গল। বাতাসে মহুয়া গন্ধ। স্নিগ্ধ বাতাসে ছুটে আসছে মহুয়ার মিঠে সুবাস। অন্য সময় হলে সিরাজ উপভোগ করে পুলকিত হয়ে উঠত, আজ কিন্তু তার কোন সুবাসই নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করছিল না।

সে কাঁদছিল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদছিল। আওরতের মতো সে কাঁদছিল। নবাব আলিবর্দী যে ধ্বংসের কথা বলে তার চিত্ত ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছেন, সেই ধ্বংসের খেলা কি শেষ পর্যন্ত শুরু হল ? নবাব বংশের যত কলঙ্ক এতদিন ধরে স্তরে স্তরে জমা হয়েছিল তারা আজ পাখা মেলে সিরাজকেই আক্রমণ করতে চায় ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে হয় সিরাজই আজ সবার লক্ষ্য। সিরাজ বসবে দুদিন পরেই এই অভিশপ্ত সিংহাসনে। লোভী সিরাজ, সিংহাসনে বসবার জন্যে তার লোভের অন্ত নেই। নবাব আলিবর্দীকে সে ছোটবেলা থেকে বহু ইন্তেজার করে কায়েম করেছে সিংহাসনের জৌলুসের আসন।

সিংহাসনের যে জৌলুস তার ভেতরে রাজ্যের কলঙ্ক জমা আছে সে কথা জেনেও তবু লোভের জিহ্বা সিরাজ সংযত করতে পারে নি, আর তার জন্যেই নেমে এসেছে, মুর্শিদাবাদের সবুজ শ্যামলিমার ভেতর থেকে দন্তব্যাদান করে সহস্র হাত-পা মেলে অভিশপ্ত এক কালো ভয়াল মূর্তি। তারই ষড়যন্ত্রে সিরাজের সর্বনাশের আয়োজন সম্পন্ন হচ্ছে।......না হলে কোথাকার এক সামান্য আওরত, নর্তকীর বেশে এসে তারই শক্তি পরীক্ষায় নিজে অসমসাহসের কার্য করল? এ যে ভাবতে গেলেও শোণিতে কেমন যেন চঞ্চলতা জেগে ওঠে।

তাকে যেন কেউ অত্যাচারের ভেতর দিয়ে পরীক্ষা করবার জন্যে এইসব আয়োজন করেছে। সে হত্যার রক্তে হাত রাঙা করে স্বাভাবিক বুদ্ধিকে বিকৃত করে শয়তান হয়ে যাবে বলেই তার জন্যে এই অসংযমের আয়োজন। সিরাজ আর চিন্তা করতে পারল না। মনে মনে বলল—তবে তাই হোক্। অন্তর যাক্ চুরমার হয়ে—বুদ্ধি যাক্ ভ্রষ্ট হয়ে—সে অত্যাচারী শয়তান এই উপাধিই তাকে চির অক্ষয় করুক। আল্লার যে অভিপ্রেত—তাঁর যে ইচ্ছা তারই হোক্ জয়। ইতিহাসে লিখিত হোক্ সিরাজের পাতায়—তার মতো ভয়ঙ্কর অত্যাচারী শয়তান পৃথিবীতে দুর্লভ। কেউ যেন না জানে, সিরাজের একটি স্নিগ্ধ, বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন, ভালবাসার হিমেল অন্তর ছিল। যদি তা কেউ জানতে পারে তাহলে লোকে তার প্রতি অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকাবে—বলবে 'আহা, নসীবের এমনি বিচারে একটি স্নেহময় চরিত্র কালের চক্রে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল।'

কবরে শায়িত হয়ে সে অনুকম্পা কিছুতেই সহ্য করবে না। তাহলে তার আত্মা আবার চীৎকার করে সোচ্চারে ঘোষণা করবে—"আমি বিচার চাই নি, অনুকম্পা চাই নি, চেয়েছি ঘৃণা। আমি ঘৃণার মধ্যেই শ্রেষ্ঠ হয়ে শয়তান হয়ে বেঁচে থাকতে চাই। ফৈজী বলে একটি আওরতের সঙ্গে মহব্বত করতে চেয়েছি, সে কথা ভুল। আমি দেহটা ভোগ করার নেশায় পাগল হয়ে সেই আওরতের ঐশ্বর্যকে লুণ্ঠন করতে গিয়েছি, সেইজন্যে এই পরিণাম পরবর্তী দৃশ্যে সংঘটিত হয়েছে। ফৈজা রেখে গেছে মুর্শিদাবাদের মাটিতে সিরাজ চরিত্রের জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

নবাবপ্রাসাদে অশ্বপিষ্ঠ থেকে নেমে সে মাথা নত করে কোনদিকে না তাকিয়ে নববাবেগমের কক্ষের দিকে চলে গেল। সে যদি ভাল করে তাকিয়ে দেখত, তাহলে দেখতে পেত—একটি অশ্রুসজল চাউনি তার দিকে সাশ্রুনয়নে তাকিয়ে আছে—সে দৃষ্টি লুৎফাউন্নিসার। কিন্তু সিরাজের দেখার মতো তখন মন ছিল না। সে মাতালের মতো টলতে টলতে নবাববেগমের কক্ষের মধ্যে ঢুকল।

নবাববেগম তখন উত্তেজনায় কক্ষময় পায়চারি করছিলেন। সিরাজকে দেখে

তিনি কক্ষের একটি কোণে রোপ্যদানের ওপর রক্ষিত স্বর্ণ ভৃঙ্গারপূর্ণ সরাবদান থেকে সরাব একটি স্বর্ণপাতে ঢেলে চোখ বুজিয়ে চুমুক দিলেন, গলা দিয়ে নেমে গেল জলীয় পদার্থটা যেন। সিরাজের কাছে এসে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে ম্লান হেসে বললেন—অবাক লাগছে, না দাদুভাই ?

অবাক কি—সিরাজ হতচকিত হয়ে কেমন যেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। নবাববেগম সরাব পান করছেন! পঞ্চবিংশতি বয়েসের প্রান্তসীমা পর্যন্ত যেদিন থেকে তার জ্ঞান উন্মোচন হয়ে সে নবাববেগমকে দেখে আসছে, একেবারে ভিন্ন ধাতুতে একটি পবিত্র কুসুমের মাতা। যে আওরতকে উপলক্ষ করে তার এতদিনের শ্রদ্ধা মাথা নত করে তাকে সেলামই জানিয়ে এসেছে, সেই নবাববেগমও কোন একদিন উত্তেজনার মুহূর্তে স্খলিত হয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যেতে পারেন। তাহলে তাকে এবার বুঝতে হবে, দুনিয়ার সব মানুষই একই ধারায় নিয়ন্ত্রিত হয় !

কিন্তু আজকে আর তার তলিয়ে ভাবার সময় নেই। আজকে সে এমন একটি মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে সে সবকিছু নিঃসন্দেহে ভাবতে পারে, সবকিছু নির্বিবাদে বিশ্বাস করতে পারে। দুনিয়ার অবিশ্বাস্য নয়, আবার কিছু বিশ্বাস যোগ্যও নয়—সব কিছুই এই পৃথিবীতে যে কোন মুহূর্তে, যে কোন সময়ে ঘটতে পারে। আশাবাদী জগতে যে কিছু পাওয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়, আল্লা তাকেই সেই পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে। তার জীবন দিয়ে সে ভালভাবেই আজ সেই কথা উপলব্ধি করে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। এখন সে এখানে এসেছে সেই ধ্বংসের মাতনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে আরও ধ্বংস সাধন করতে—তাই নবাববেগমের কথায় মাথা নেড়ে বলল—অবাক কিছুই আমার লাগে না দিদিভাই, আমি এবার উপলব্ধি করেছি, দুনিয়াতে যা কখনও ঘটতে পারে না, তাই যে কোন সময়ে, যে কোন মুহূর্তের মধ্যে ঘটতে পারে।

নবাববেগম সে কথায় ম্লান হাসলেন। তার দেহ টলছিল নেশায়, চোখ দুটি আবেশে ডুবে আসছিল, জড়িতস্বরে বললেন—সে কথা ঠিকই তুমি উপলব্ধি করেছ। জীবনে কখনও যা আমি ভাবিনি, তাই আমাকে আজ ভাবতে হচ্ছে, জীবনে যা আমি করিনি, তাই আমাকে আজ করতে হচ্ছে—এর চেয়ে দুনিয়াতে বিচিত্র কি আছে ? পবিত্র জীবনের জন্যে আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রচুর—কিন্তু আল্লা আমার সে দম্ভ চূর্ণ করে দিলেন। আজ আমি এমন জায়গায় গিয়ে পৌচেছি. সেখান থেকে আর আমার কোন পরিত্রাণ নেই।

নবাবপ্রাসাদের চারিদিক ঘিরে আজ দূষিত বাতাস বিষাক্ত করে রেখেছে এর আবহাওয়া। আমার দুই কন্যার ওপর দিয়ে অভিশাপ কালিবর্ণের রূপ নিয়ে নবাবী দৌলতের ওপর ছোপ পরিয়ে সমস্ত কালি করে দিয়েছে। আলো নেই কোথাও এই নবাবপ্রাসাদে। সমস্ত নবাবপ্রাসাদ ঘিরে অন্ধকারের জমাট স্তব্ধতা। তার মধ্যে নবাববংশকে উচ্ছেদ করবার জন্যে শয়তান ঘিরে ফেলেছে প্রাসাদ। নিজামত কেল্লার চারিদিকে ঘিরে আগুনের শিখা লেলিহান জিহ্বা নিয়ে ছুটে

আসছে। সিরাজ এতকাল পবিত্র জীবনের তপস্যা করে কি পেলাম বলতে পার? পেয়েছি শুধু কান্নার জন্যে কিছু উত্তেজক স্মৃতি! আর আমার এই কন্যার জীবনে যে জঘন্য কলঙ্ক সমস্ত মুর্শিদাবাদের আসমানের জমিন কলঙ্কময় করে দিল, তার জন্যে ঘৃণা। দারুণ এক ঘৃণার কুণ্ডলি সমস্ত হৃদয় ছেয়ে আজ বিষাক্ত করে দিয়েছে।

সিরাজ মাথা নত করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল, নবাববেগমের সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি। নবাববেগম কাঁদছেন, তার চোখের কোল বেয়ে অশ্রুর স্রোত গালের দুই প্রান্ত বেয়ে নেমে যাচ্ছে। কুঞ্চিত গালের ওপর অজস্র বলি রেখার আঁকিবুঁকি। সমস্ত শিরাগুলি আজ জেগে উঠেছে সৌন্দর্যকে কবরিত করে। সারা দেহ ঘিরে আজ যেন মনে হচ্ছে, তার এই কদিনে বয়েস অনেক বেড়ে গেছে। তিনি ভেবেছেন মনে হয় অনেক। এবং সেই ভাবনার রেখাগুলি আজ সমস্ত দেহ ঘিরে।

নবাববেগম একটু থামলে সিরাজ বলল—কিন্তু আমাকে কেন ডেকেছ দিদিভাই?

নবাব বেগম বললেন—তোমাকে ডেকেছি কেন সে কথা শোনার পূর্বে—একটি শপথ তোমায় করতে হবে, আজ যা তোমায় বলব তার জন্যে তুমি আমাকে কোন দোষ দেবে না, আমি কেন এই ব্যবস্থা অবলম্বনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছি, সে কথা তোমায় নিশ্চয় আর ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না। শুধু তুমি আমাকে ক্ষমা করে আমার নিরুপায় অবস্থার জন্যে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর।

সিরাজ মাথা নেড়ে সায় দিতে, নবাববেগম বললেন—তুমি নিশ্চয় জানো, তোমার আম্মাজান আমিনাকে কে আজ কুপথগামিনী করেছে, কে তাকে চিরকলঙ্কিনী করে নবাববংশকে ধ্বংস করেছে? ঘসেটির স্বামী বেঁচে থাকাকালীন যে কলঙ্কে কলঙ্কিনী হয়েছে, তার জন্যে আমার মনে অতটা দাগ লাগেনি কারণ তার স্বামী নওয়াজেস্ মহম্মদ জীবিত থেকে তার বেগমের এই ব্যভিচারকে প্রত্যক্ষ করে প্রশ্রয় দিয়েছে, সে যখন কিছু বলে নি আমার তাতে মাথাব্যথা ছিল না—কিন্তু আমিনা আজ ভাবী নবাবের জননী হয়ে যে অন্যায় করছে, তার ক্ষমা নেই। তাই আমি মনস্থ করেছি, তুমি উপযুক্ত সন্তান হয়ে মায়ের এই ধর্মধ্বংসকারীকে হত্যা করে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দাও। এই হোসেন কুলী খাঁ হতেই যে নবাববংশের কলঙ্ক—সে তুমি জানো?

কিন্তু নবাববেগমের এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে সিরাজ চমকে উঠল। হত্যা, হত্যা হত্যা! হত্যায় রঞ্জিত করে তুলতে হবে নিজের সুন্দর হস্তখানি। আম্মাজানের প্রণয়ীকে বিনাশ করতে তার ছুরিকা এগিয়ে যাবে তার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়তে। তার গর্ভধারিণী মায়ের চরিত্রের পবিত্রতা ফিরিয়ে আনতে সন্তানের ছুরিকা দ্বিখণ্ডিত করবে মায়ের প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর দেহ! যে বক্ষের ওপর তার গর্ভধারিণী মা কতদিন শুয়ে শুয়ে সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখেছেন, বেহেস্তের সুখ কল্পনা করে আবেশের ঘোরে সমস্ত ভবিষ্যৎকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন—সেই জননীর কোলেই কিন্তু একদিন সে শুয়ে মায়ের স্নেহ গ্রহণ করেছিল, আজ সেই কোলের বেইমানী করে জননীর সেই

হৃদয়ের কুসুমকে দ্বিখণ্ডিত করে, রক্তাক্ত করে—জননীকে কাঁদিয়ে সে নবাববংশের কলঙ্ককে সমূলে উৎপাটিত করবে। অদ্ভুত একটি প্রস্তাব আজ নবাববেগম তাকে দান করেছেন। অদ্ভুত এই রমণীর মানসিক শক্তি! নবাববেগমকে চিনতে গেলে বহুদিন ধরে তাকে নিয়ে গবেষণা করতে হবে, তাকে বিচার করতে গেলে লাখো লাখো রমণীকে এক পাল্লায় রেখে নবাববেগমকে ওজন করতে হবে। অবশ্য তিনি আজ যে অবস্থায় এই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছেন, তাও যুক্তির বহির্ভূত নয়।

কিন্তু হত্যা! মানুষের সহজ উপায় মৃত্যু নয়, তার বক্ষে ছুরিকাঘাত করে রক্তাক্ত করে তাকে বিনাশ করতে হবে। নবাব বাদশাহের ঘরে মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলা অবশ্য নতুন নয়—বহু হত্যার বিনিময়ে, বহু মৃত্যুর উৎসবে তবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে সিংহাসনের স্থায়িত্ব। কত যুদ্ধে নির্বিবাদে কত অসংখ্য প্রাণ বলিদান হয়। রাজ্যের বিধানে কত অপরাধীর শাস্তি মৃত্যুই লিখিতে হয়। তাকে নানা উপায়ে যন্ত্রণা দিয়ে তারপর জল্লাদের খড়্গের তলায় ফেলে দেওয়া হয়। একটি মিনিট সময়ের বিলম্বে নেমে যায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে একটি দেহের মুণ্ড। রক্তাক্ত হয়ে ওঠে বধ্যভূমি। জল্লাদ কি তার জন্যে আফসোস করে?

সেও তো জল্লাদের মতো কার্য করার জন্যে নির্দেশ প্রাপ্ত হচ্ছে নবাববেগমের কাছ থেকে। কিন্তু জল্লাদের মতো আদেশ পালন করে সে উপলব্ধির বাইরে থাকবে না কেন? কেন তাকে এই হত্যা সংঘটিত করে চরম অবস্থার মধ্যে পতিত হয়ে হতবুদ্ধি হয়ে জীবনের সমস্ত সৌন্দর্যকে মুছে ফেলতে হবে? সমস্ত জীবনটা হয়ত এই হত্যার জন্যে বিষময় হয়ে যাবে, শান্তি মিলবে না। অশান্তির তীব্র দহনে জ্বলে পুড়ে একেবারে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু নবাববেগমের আদেশ সে কখনও অমান্য করে নি, আজও করতে পারবে না। তা ছাড়া তিনি যে যুক্তি উপস্থিত করেছেন, সে যুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার কিছুই নেই। তার আম্মাজান আমিনা বেগম। আমিনা বেগমের এই কলঙ্ক, তার কলঙ্ক।

যে গর্ভে সে জন্মগ্রহণ করেছে, সে গর্ভের মধ্যে কলঙ্কের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে নবাবী ইজ্জতকে কলঙ্কময় করেছে। নবাবী ইজ্জত না হয় সে অবহেলা করল, কিন্তু তার মায়ের এই ধর্মনাশ যে সন্তানের মনে ভীষণ আলোড়ন জাগিয়েছে—সে কথা কি একবারও তার মা চিন্তা করেন না? তার কাছে বড় হল, পুরুষের মহব্বতের স্পর্শানুভূতি! ইন্দ্রিয়ের দৌবল্যের কাছে সন্তানের স্নেহ বড় না। জগতে এই আওরতের মনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যেই বহু চেষ্টা করেছে সিরাজ—কিন্তু সে আজ অকৃতকার্য হয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। সেইজন্যে ফৈজী আজকে তাকে যেভাবে আক্রমণ করেছে, তাতে সে বুঝেছে আল্লা তাকে আরও হতবুদ্ধি করবার জন্যে ফৈজীর মতো এই বিশ্বাসঘাতক আওরতকে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবে ফৈজী তার অন্যায়ের শাস্তি ভোগ করবে এমন, সে চরমশাস্তি কেউ কখনও কল্পনা করতে পারে না।

সিরাজ কোন উত্তর দিচ্ছে না দেখে নবাববেগম ব্যঙ্গস্বরে জিজ্ঞেস করলেন—কি তাহলে জানব, যাকে এতদিন ধরে লালন করে এসেছি। স্নেহ দিয়ে বর্ধিত করে এসেছি, শক্তিবান বলে দম্ভ করেছি—সে কাপুরুষ। নবাববংশের কলঙ্ক মোচন করার ক্ষমতা তার নেই, সে হত্যাকে ভয় করে, রক্ত দেখে ঝিমিয়ে পড়ে—অথচ সিংহাসনে বসবার জন্যে তার আগ্রহ কম নয়।

সিরাজ নবাববেগমের তিরস্কারে কোন প্রতিবাদ করল না, শুধু ক্লান্তস্বরে বলল—আমি প্রস্তুত দিদিভাই।

মনে হল নবাববেগম যেন একটু আশ্বস্ত হলেন। সিরাজের কাছে সরে এসে তার হাতখানি ধরে একটু মোলায়েম কণ্ঠে বললেন—আমি জানতাম দাদুভাই, তুমি আমার আদেশ পালন করবে। তবে আল্লার কাছে আমি প্রার্থনা জানাই, যেন এই অপরাধের জন্যে তিনি যেন কাউকেই দোষী না করেন। তারপর বললেন—এ হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা আজকের নয়। বহুদিন ধরে নিজেকে প্রশ্ন করে করে তবে এই বিচারে উপনীত হয়েছি। ভেবেছিলাম, হত্যার কলুষতায় আর নবাববংশকে অভিশপ্ত করব না। সেইজন্যে নবাবকে বলেছিলাম, আর কখনও কারুর অপরাধের বিচার হত্যার মধ্যে দিয়ে সংঘটিত কর না। মানুষ মৃত্যুর সময় যে অভিসম্পাত মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে, তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে হয়ত সেই অভিসম্পাতের জন্যেই আজ নবাব বংশে এত অশান্তি।

সেই মৃত্যু থেকে সবাইকে রেহাই দিয়ে আমি নবাববংশকে বাঁচাতে চেয়েছি। সেইজন্যে আমিনাকে কত করে বলেছিলাম, হোসেন কুলীকে ত্যাগ কর। কিন্তু এত সহজে যদি সবাই পরিত্রাণ পাবে তাহলে আর এ নবাবীবংশের এত অশান্তি কেন? ঘসেটি এখন হোসেন কুলীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছে, সে এখন শত্রু তার। হোসেন কুলীর বিনাশে তার সমর্থন আছে, সেই আমাকে প্রলোভিত করে বলে যায়, এখন হত্যাই প্রয়োজন। জামাই নওয়াজেসের প্রিয়পাত্র এই হোসেনকুলী, তারও নাকি সমর্থন ঘসেটি প্রার্থনা করে এনেছে। ঘসেটির ওপর আমার ভয় ছিল, আমার গর্ভের কন্যা হলেও তাকে আমি যথেষ্ট ভয় করি। সে যখন এখন হোসেন কুলীর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে তখন এই সুযোগ নষ্ট হতে দেওয়া কিছুতে বাঞ্ছনীয় নয়।

সিরাজ থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করল—আর দাদু আলিবর্দী! তিনিও কি চান– তাঁর আদরের দাদুভাই সিরাজ হত্যায় কলুষিত করুক নিজের হস্ত? একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করে আসি, তিনি যদি সমর্থন করেন তাহলে আমার অরাজী হওয়ার কিছুই নেই।

নবাববেগম ম্লান হেসে বললেন—তিনি সমর্থন করেই পালিয়ে গেছেন কাজের অজুহাতে রাজমহলে। সমর্থন ছাড়া যে উপায় নেই জেনেই তারও কোন কিছু বলবার ছিল না।

সিরাজ আর অপেক্ষা করল না, শুধু বলল—সবারই যখন ইচ্ছে তখন তাই হবে। এই বলে সে দ্রুত নবাববেগমের কক্ষ পরিত্যাগ করল।

এসে দাঁড়াল তার আম্মাজান আমিনা বেগমের কক্ষের দরজার সামনে। কক্ষের মধ্যেই আমিনা ছিলেন। হয়ত তিনি বিছানায় শুয়ে পাগলের মতো কাঁদছিলেন। আলুলায়িত কেশদাম, বিস্রস্ত এলোমেলো বেশবাস। সিরাজের দিকে যখন তাকালেন, তার দুটি চক্ষু বেয়ে জলের ধারা নেমে চলেছে। কতক্ষণ ধরে কাঁদছেন —কে জানে? তবে এ কান্না যে কিছুক্ষণের নয়, সিরাজ তার মায়ের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল।

মায়ের চোখের অশ্রু দেখে সিরাজের চোখেও জল এসে গেল, কিন্তু সে তা রোধ করে ধরা গলায় অনুচ্চস্বরে বলল—মা, হোসেন কুলী খাঁকে বধ করতে চলেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

আমিনা বেগম আবার কান্নায় আছড়ে পড়লেন সিরাজের কথায়। কিন্তু সিরাজ আর দাঁড়াল না, অবরুদ্ধ অশ্রুকে রোধ করতে করতে সে ছুটে মহলের পর মহল ছেড়ে পার হয়ে গেল। লুৎফা তার কক্ষের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল, সে কান্নাভরে চীৎকার করে ডাকল—'সিরাজ শুনে যাও একটা কথা, এ হত্যা কর না—এ হত্যায় তোমার সমস্ত জীবন কলুষিত হয়ে যাবে।' সি—রা—জ!

সিরাজ লুৎফার অনুচ্চ কথাগুলি শুনতে শুনতে নবাবপ্রাসাদ পার হয়ে এসে অশ্বের পিঠে সওয়ার হয়ে বসল, তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে অশ্বের গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে মুর্শিদাবাদের ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলল। কিন্তু খানিকপদ যাবার পর দেখা গেল, সে তার মনসুরগঞ্জ প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না, এগিয়ে যাচ্ছে কোথায় কোন সুদূরের দিকে। তবে কি সিরাজ পালিয়ে যাচ্ছে? সে ভয় পেয়ে নবাবী বংশকে অভিশাপ দিয়ে এদের ত্যাগ করে দুনিয়ার অন্যপ্রান্তে গিয়ে নিজেকে লুকোতে চায়?

হয়ত সেদিন তাই যদি করত তাহলে বোধহয় এই কলঙ্ক তার মাথায় চেপে. তার জীবনটা বরবাদ করে দিত না। সে ইতিহাসে একজন কলঙ্কিত পুরুষ বলে অঙ্কিত হত না। মানুষ তাকে ভুল বুঝত না। মানুষের সে অভিসম্পাত পেত না। আশীর্বাদ পেত।

কিন্তু সিরাজের মাথায় ভূত চাপল। তার চোখের সামনে মৃত্যুর তাণ্ডব ছাড়া আর কিছুই ঠেকল না। সে যেন দেখতে পেল সমস্ত লোককে তার ছুরিকার আঘাতে রক্তাক্ত করে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়েছে। আর সে সেই রক্তাক্ত মৃতদেহগুলির উপর দাঁড়িয়ে নিজে হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হাসছে। সে যেন একজন নৃশংস পুরুষ, তাকে দেখে বাকী লোকগুলি ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে, সে তা সচক্ষে দেখতে পাচ্ছে, তার ভয়ে সবাই তার প্রতাপ নিজের মধ্যে লুকিয়ে জোড়হাত করে তার কৃপা ভিক্ষা করছে, আর সিরাজ নিজে সমস্ত ন্যায়ান্যায়ের উচ্চ সিংহাসনে উড্ডীন হয়ে সমস্ত বিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দুনিয়ার সম্রাট হয়ে বসেছে। তার মনের মধ্যে নেই কোন কোমলতার ছাপ, নেই কোন অনুগ্রহ প্রদর্শন করার অহেতুক চেষ্টা। মায়া, দয়া, ভালবাসা কিছুর প্রয়োজন নেই সম্পূর্ণ। আলাদা এক নৃশংস পুরুষ

বলে পৃথিবীর ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। শুধু রক্তের খেলা! আর প্রয়োজনে রঙের খেলায় সেরা সুন্দরী আওরতদের নিয়ে যথেচ্ছাচার। মহব্বত, মন দেওয়া নেওয়া, ফুলের মতো নরম কথায় সৌরভ ছড়িয়ে আওরতকে বশ করার চেষ্টাও না।

কিন্তু এ সব চিন্তা এই মুহূর্তে করারও কোন অর্থ হয় না। তাকে হোসেন কুলী খাঁকে হত্যা করতে হবে। নবাববেগমের আদেশ। নবাববেগম তাকে উত্তেজিত করে কথা আদায় করে নিয়েছেন। সে পালন করবে বলে সায় দিয়ে এসেছে।

কিন্তু আজ এই রাতের তিমিরে যে হত্যা সংঘটিত হবে—গতকল্য প্রত্যুষে তার কথা যখন সমস্ত মুর্শিদাবাদের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে—চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে কেন—হস্তীর পিঠে হোসেনকুলী খাঁর দ্বিখণ্ডিত রক্তাক্ত দেহ বহন করে রাজানুচররা সমস্ত মুর্শিদাবাদের চারিদিকে ঘুরিয়ে দেখাবে। যারা আমিনা ও ঘসেটির দুর্ণাম নিয়ে সরোগোল করে বেড়াচ্ছিল, তারা দেখবে, দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাবে। আর দেখবে, সিরাজের ক্ষমতা। সিরাজ সহ্য করে নি মায়ের দুর্ণাম। মায়ের প্রেমাস্পদকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে সমস্ত দুর্ণামকে মুছতে চেয়েছে। একদিকে লোকে যেমন সিরাজকে বাহবা দেবে, অন্যদিকে তার এই নৃশংসতা দেখে শিউরে উঠবে। কিন্তু তারা কি জানবে? এর পিছনে কার ষড়যন্ত্র এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করবার জন্যে বায়িত হয়েছে? নবাববেগম কি মুর্শিদাবাদের মানুষের চোখে অপরাধিনী সাব্যস্ত হবে? হয়ত কেউ বিশ্বাস করবে না। হয়ত কেউ করবে। কিন্তু অধিকাংশ লোক হত্যাকারীকেই দোষী সাব্যস্ত করবে। সিরাজ নিজের বুদ্ধি, বিবেক দিয়ে বিচার করেই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে।

কেউ বিশ্বাস করবে না সিরাজ নিরুপায় হয়ে এই হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। একদিকে সকলের সমর্থন তাকে নির্বাচিত করেছে হত্যাকারী সাজাবার জন্যে। অপর দিকে তার মায়ের এই কলঙ্ক। সে সন্তান হয়ে, শক্তিবান হয়ে মায়ের এই কলঙ্কের কালিমা যদি উপযুক্ত সন্তান হয়ে না মোচন করে তাহলে কে করবে? মনে পড়ে সিরাজের—নবাববেগমের ব্যঙ্গোক্তি: 'যাকে এতদিন ধরে লালন করে এসেছি, স্নেহ দিয়ে বর্ধিত করে এসেছি, শক্তিবান বলে দম্ভ করেছি—সে কাপুরুষ! নবাববংশের কলঙ্ক মোচন করার ক্ষমতা তার নেই, সে হত্যাকে ভয় করে, রক্ত দেখে ঝিমিয়ে পড়ে—অথচ সিংহাসনে বসবার জন্যে তার আগ্রহ কম নয়।'

একটি আওরত এই কথাগুলি বলে একটি শক্তিবান যুবাপুরুষকে একদিন উত্তেজিত করেছিল। এ কথা কেউ কি কোনদিন বিশ্বাস করবে? বিশ্বাস করবে—সিরাজ হত্যা করতে চায় নি। হত্যায় হাত কলুষিত করে নিজের জীবনে অভিসম্পাত গ্রহণ করতে চায় নি। লুৎফা তার কোমল মনের ভালবাসা দিয়ে কান্নাভরে যে কথাগুলি চীৎকার করে বলেছিল, সে কথাগুলিও সিরাজ ভোলে নি—'এ হত্যা কর না, এ হত্যায় তোমার সমস্ত জীবন কলুষিত হয়ে যাবে।' আজ বোঝা গেল, সত্যিই জগতে কেউ যদি তাকে ভালবাসে, মহব্বত করে—সে হল ঐ লুৎফাউন্নিসা—একটি শান্তশিষ্ট, নরম, সরম, কোমল আওরত।

সিরাজের সম্বিৎ ফিরতে তাকিয়ে দেখল সূর্যাস্তের শেষরক্তিম গোধুলির আলো ভাগীরথীর অশ্রান্ত ঢেউয়ের পরে আছাড়ি পাছাড়ি করছে। সে অশ্বের পিঠে সওয়ার হয়ে সেই ভাগীরথীর কূলেই দাঁড়িয়ে আছে। বিস্ময়ে ভাবল, এখানে কেমন করে সে এল? এ জায়গায় আসবার জন্যে তো তার মনের কোথাও আগ্রহ ছিল না। সে নয় হীরাঝিলে ফিরত, কিংবা হোসেনকুলীকে হত্যা করতে মোতিঝিলে অথবা হোসেনকুলীর বাসস্থানে যেত।

প্রভুভক্ত অশ্বটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার আজ পশুটিকে বড় ভাল লাগল। এতদিন এই পশুটির পিঠে সে সওয়ার হয়ে আসছে, কোনদিন একে ভাল করে উপলব্ধি করে নি। আজ যেন তার মনে হল, এই পশুটি নীরবে তার সেবা করে এসেছে, এবং এ তার মানসিক অবস্থার সব সংবাদ জানে।

তাই এই ভাগীরথীর কূলে তার ছন্নছাড়া মনটাকে জলীয় বাতাসের প্রলেপ পড়ানোর জন্যে নিয়ে এসেছে। কিংবা হয়ত সেই অজান্তে লাগাম টেনে ধরে এইদিকে ফিরিয়ে তাকে এই এখানে এনেছে। মানুষ অজান্তে অনেক কাজ করে—এও বোধ হয় সেইরকম অজান্তে হয়ে গেছে।

সিরাজ তাকিয়ে আবার দেখল—ভাগীরথীর অশান্ত ঢেউয়ের ওপর। হীরাঝিল থেকে বহুদিন সে দেখেছে, দেখেছে আর এই অশান্ত জলরাশির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়েছে। এর বিশালতা তাকে অবাক করে দেয়। এর উন্মত্ত জলরাশি তাকে বিস্ময় জাগায়। এক এক সময় তার মনে হয়, যদি সে এই বিশাল জলরাশির মধ্যে নিজেকে সঁপে দেয় তাহলে কি হয়? ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন তার মনে উদয় হয়ে তার পরিণত মনটা আবার পিছন দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। আজও সেই কথা তার মনে হল।

সিঁদুরের মতো জলের রং। যেন মনে হয় রক্ত। যেন মনে হয় আগুন জ্বালিয়ে জলের সমস্ত বুক পুড়িয়ে দিচ্ছে। জল তাই চঞ্চল হয়ে ছটফট করে আন্দোলন তুলছে। সিরাজের ইচ্ছে করল, এই অশ্বের ওপর সওয়ার হয়েই চলে যায় এই অশান্ত জলের গহ্বরে। থাক্, পড়ে থাক সিংহাসন! থাক নবাববংশ! কি প্রয়োজন এদের মাঝ থেকে নিজের জীবনটাকে বিড়ম্বিত করবার? তার চেয়ে এই জলের তলায় বেশ। গতকল্য সকালে সকলে জানবে, মুর্শিদাবাদের ভাবী নবাব আত্মহত্যা করেছে। ইতিহাসে লেখা হবে, এক শক্তিহীন কাপুরুষ যুবক রাজ্যের অবিচার সহ্য করতে না পেরে লোভের সিংহাসন ত্যাগ করে ভাগীরথীর জলে মুখ লুকিয়েছে।

সিরাজ দেখতে পেল তার আত্মহত্যার পরের ইতিহাসটি। কিন্তু ঘৃণায় তার মনটা রি রি করে উঠল। মহারাষ্ট্রীয়দের সঙ্গে যুদ্ধের পর নবাব আলিবর্দী তাকে উপাধি দিয়েছেন—'মনসুর উল মোল্ক'। তার অর্থ, শক্তিবান। সে শক্তির পরীক্ষা দিয়ে যুদ্ধেই মৃত্যু গ্রহণ করবে। নবাব, সুলতানের বংশে জন্মে বীরের মতো মৃত্যু সব বীরেরই কাম্য—সে বীরের মতোই মরবে। আত্মহত্যা করবে কেন? এসব

চিন্তাও যে অন্যায়। সিরাজের মনে ধিক্কার এল। হঠাৎ সে ভাবল, এসব কি ভাবছে সে—ছিঃ ছিঃ!

অন্ধকার নেমে এসেছে নিবিড় হয়ে আসমানের বুকে কালোর পসরা নিয়ে। ভাগীরথীর পরপারে রক্তিম আলো দিগন্ত থেকে মুছে গিয়ে সেখানে কালোর বর্ণ পড়াচ্ছে। এবার ঢেউয়ের মাথায় উঠবে কালির মুকুট। সে কালির মুকুট পরে নাচছে। এপারে দীর্ঘ বৃক্ষের সারি। পর পর সৈনিকের মতো সারি দিয়ে অন্ধকারকে আড়াল করছে। জলের ওপর অনেক দূরে দু-একখানি নৌকো। নৌকোর ওপর সাদা পাল তোলা, একটু আলোর নিশানা। বাতাস বইছে অল্প অল্প। শালপিয়ালের বনের মিঠে সুবাস ভেসে আসছে। মহুয়ার গন্ধও বাতাসে ভরে আছে। মুর্শিদাবাদে আরও অনেক বিচিত্র গন্ধের মাতন বাতাসের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু কোন কিছুই উপভোগ করার সময় নেই সিরাজের। সিরাজ আজ অন্য দুনিয়ার অন্যপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তখনও নিজেকে জিজ্ঞাসা করছে—আমি কি করব?

আল্লার কাছে তার কোন প্রার্থনা নেই, থাকলে সে আল্লাকেই জিজ্ঞেস করত—আল্লা পথ বলে দাও। কিন্তু সে আল্লাকে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে না তার কারণ, আল্লা বিপদের সময় মুখে ঘুরিয়ে থাকেন। তার দাদু আলিবর্দী জীবনের প্রায় সময় আল্লাকে ডেকেছেন, কিন্তু কি পেয়েছেন? সেইজন্যে সে একেবারে আল্লাকে ডাকাই ছেড়ে দিয়েছিল।

হঠাৎ ফৈজীর কথা তার মনে পড়ল। তার কথা মনে আসতেই সিরাজ চঞ্চল হয়ে উঠল। সেই বিশ্বাসঘাতক রমণী নর্তকী তার সঙ্গে জুয়োখেলা খেলতে চায়। ভেবেছে, সিরাজ শক্তিহীন। সিরাজ মহব্বতের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে তার উপেক্ষা সহ্য করবে? এতক্ষণ মনে ছিল না সিরাজের ফৈজীর কথা। মনে আসতেই তার রক্ত গরম হয়ে উঠল। অশ্বের মুখ ঘুরিয়ে সে অশ্ব ছুটিয়ে দিল। আর কোন চিন্তার প্রয়োজন নেই, কর্মপন্থা ঠিক হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে সে মুখটি বিকৃত করে বলল—এমন সাজা সে পাবে দুনিয়ার ইতিহাসে কখনও কোন আওরত এইরকম সাজা পায় নি! সিরাজকে অবমাননা করার শাস্তি বড ভীষণ!

উল্কার মতো ছুটে চলল সিরাজ হীরাঝিলের প্রাসাদের দিকে। পথ যেন আর ফুরোয় না। সময় যেন বড় বেশী লাগছে। সে বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল। চঞ্চল হয়ে হাঁটু দিয়ে অশ্বের পিঠে উত্তেজনায় আঘাত হানতে লাগল। অশ্ব আকাশ সমান লাফিয়ে উঠে এঁকে বেঁকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ এখুনি এখুনি, এইমুহূর্তে হীরাঝিল প্রাসাদে গিয়ে তাকে পৌছতে হবে আর বিলম্ব করবার সময় নেই। ফৈজী এখনও তার অপরূপ যৌবন শোভা বিকশিত করে প্রাসাদের কক্ষের অন্ধকার অংশ আলো করে বসে আছে, বসে বসে সে তার সঙ্গে আলাপ করছে আর বলছে—বাংলার ভাবী নবাব তার এতটুকু কৃপা

পাবার জন্যে লালায়িত। সে আমাকে আর যাই কিছু করুক—আমার জান পয়ছান করবে না। তারপর হেসে হেসে ঢঙিয়ে ঢঙিয়ে বলছে—সে যে আমার সাথে মহব্বত করে! মহব্বতের আওরতকে কি কেউ হত্যা করে?

হীরাঝিল প্রাসাদের বহির্ভাগে এসে সিরাজ অশ্বের পিঠ ঠেকে নামল, ছুটে চলল তার অনুচরদের বাসস্থানের দিকে। সামনে কটি ছোট ছোট খুপরী ঘর, সেই ঘরগুলির সামনে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে ডাকল—ইয়ারজঙ্গ!

মুহূর্তে মাটি ফুঁড়ে যেন বিশালকায় একটি কালো দেহ সিরাজের সামনে এসে দাঁড়িয়ে সেলাম জানাল—হুজুর!

সিরাজ তাকে নিম্নস্বরে কতকগুলি কি সব বলল, লোকটি আবার সেলাম জানিয়ে মাথা নেড়ে অন্ধকারেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

সিরাজ এবার দ্রুত চলে এল হীরাঝিল প্রাসাদের অভ্যন্তরে। মহলের পর মহল পেরিয়ে—অলিন্দের পর অলিন্দ। পাথরের গম্বুজের খিলানে খিলানে উজ্জল বর্তিকা। মর্মরময় সোপান শ্রেণীর চতুর্দিক আলোর মালায় বিভূষিত। প্রত্যেক বারান্দার চতুর্দিকেই লাল, নীল, পীত, শ্বেতবর্ণের দীপাবলী। সিরাজ আরও দ্রুত এগিয়ে চলল অন্দর মহলের দিকে। পাশ দিয়ে দু একজন বাঁদী সিরাজের চলার ভঙ্গি দেখে সভয়ে সরে গিয়ে দাঁড়াল। তারা যদি সিরাজের মুখমণ্ডলের চেহারা দেখত, তাহলে তারা সিরাজের রক্তবর্ণ ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডল দেখে আরও বিস্মিত হত।

ফৈজীর কক্ষের সম্মুখে একটি দালানের মধ্যস্থলে একটি রৌপ্যময় বেষ্টনীর মধ্যে, শ্বেতমর্মময় আধারের ওপর এক রজত নির্মিত গোলাপ জলের ফোয়ারা। সিরাজ একবার সেইখানে দাঁড়িয়ে ফৈজীর কক্ষের দিকে তাকাল, তারপর কোন চিন্তা না করে বেগে ফৈজীর কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করল।

ফৈজী কক্ষের মধ্যে কোমল সোফায় অর্ধশয়ন হয়ে চোখ বুজিয়ে আরাম উপভোগ করছিল। বুকের ওপর ওড়নার আচ্ছাদন ছিল না। বক্ষের সমুদ্র-সফেন উত্তালতা লোলুপ হয়ে কক্ষের আলোর মাঝে প্রকট হয়ে উঠেছিল। সে বোধ হয় ভাবছিল কিছু, কিংবা কিছুই সে ভাবছিল না। হয়ত তার নতুন মাশুক সৈয়দ মহম্মদের জন্যে সে অপেক্ষা করছিল। এই রাত্রিটি একটি জোয়ানী আওরতের বৃথা যাবে! মরদ কাছে না থাকলে, তার বলিষ্ঠ স্পর্শ আওরতের মাখন তনুতে পেষণ সৃষ্ট না হলে সুখ কোথায়? আওরতের সৃষ্টিই যে উপভোগের জন্যে। সে সৃষ্টি মরদও যেমন ভোগ করতে চায়, আওরত নিজেও কম উপভোগ করতে চায় না। ফৈজী

বোধ হয় সেই উপভোগের জন্যে মনের মধ্যে এক উদগ্র কামনার বাসনা নিয়ে অপেক্ষা করছিল রাত্রিটিকে সেলাম জানাবে বলে। কিংবা কিছুই নয়। ফৈজী বোধ হয় ভাবছিল, তার আগামী ভবিষ্যৎটি কি? দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে এসে এই বঙ্গদেশে ভাবী নবাবের সোহাগের পেয়ারের ইস্তেজারে নিজেকে ডুবিয়ে না দিয়ে তাকে ঘৃণা করেছে। এখন যা করছে, আসলে তার মধ্যে সত্যিকারের কোন লাভ নেই, শুধু খেলা। ভাবী নবাব সিরাজকে অবহেলা করার আনন্দ। সে এতদিন বহু আওরতকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা খেলেছে, কোন আওরত তার অত্যাচারের প্রতিবাদ করে নি, সে সেই সব অত্যাচারী আওরতের প্রতিনিধি হয়ে সিরাজকে উপেক্ষা করার আর কোন কারণ নেই। সিরাজের মতো রূপবান পুরুষকে যে কোন খুব্‌সুরত আওরতই পছন্দ করতে পারে।

এই বোধ হয় সে ভাবছিল, এই সময় সিরাজ বেগে কক্ষে প্রবেশ করে সবলে তার হস্তাকর্ষণ করে সোফা থেকে হ্যাচ্‌কা টান দিয়ে তুলে দাঁড় করাল, তারপর ক্ষিপ্তস্বরে চীৎকার করে বলল—কে তোমার কক্ষে প্রত্যহ আসা-যাওয়া করে? সত্যি কথা বলবে—চালাকি করবার চেষ্টা করবে না।

ফৈজী প্রথমে সিরাজের আকস্মিক আবির্ভাবে মুষড়ে পড়েছিল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে প্রকৃতস্থ হয়ে নিজের হাতটা সিরাজের বজ্রমুষ্টি থেকে ছিনিয়ে নিল, তারপর ক্ষিপ্তস্বরে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গমিশ্রিত অবস্থায় বলল—কেন হিংসে হচ্ছে? আপনারই ভগ্নীপতি সৈয়দ মহম্মদ খাঁর সঙ্গে আমার পেয়ার জমেছে, সেই আসে প্রত্যহ আমার কক্ষে।

দাঁতে দাঁত চেপে সিরাজ বলল—আমি দেখছি তুমি সত্যিই বেশ্যা?

ভুল জানেন নি। আমরা তওফায়ালীর জাত। পণ্য জীবন নিয়েই আমাদের বেসাতি করতে হয়। এক মন—এক দিল নিয়ে একজনের বাঁধা হয়ে থাকব, এই কি আপনি আশা করেছিলেন?

সিরাজ জবাবে বলল—এমন দিলের নিশানা আর কেউ কোনদিন যাতে না পায়, তারই ব্যবস্থা করব।

ফৈজী বুঝতে পারল তার জীবনে আজ যে কোন ঘটনা ঘটবে। সিরাজ তাকে কিছুতেই পরিত্রাণ দেবে না। তার ভীষণ আকৃতিই প্রমাণ দিচ্ছে। সিরাজ যেন ক্ষিপ্ত সিংহের মতো দাঁড়িয়ে ফুলছে। তাই সে জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে বলল—আমায় মিছে ভয় দেখাচ্ছেন জনাব, আমি যা কিছু করেছি সজ্ঞানেই করেছি। তাছাড়া আমার ব্যবসাই এই। আপনি যদি কখনও মনে করে থাকেন, আপনি জোর করে আমার মহব্বত পাবেন, তাহলে ভুল করেছেন। আওরতের কতটুকু আপনার জানা আছে? যদি জানতেন, তাহলে আমাকে এমনি করে তিরস্কার করতেন না।

হঠাৎ সিরাজের কণ্ঠে আদ্রতার ভাব পরিলক্ষিত হল, সে হয়ত কাতর হয়ে বলতে যাচ্ছিল—ফৈজী আমি যে তোমাকে কিছুতে ভুলতে পাচ্ছি না। কিন্তু সে কথা না বলে সে নিজেকে রোধ করে নিল।

ফৈজী একটু ভ্রূকুটি করে আবার বলল—যে তিরস্কার আমাকে আপনি করেছেন সে তিরস্কার যদি আপনি আপনার জননীর প্রতি প্রয়োগ করতেন তাহলে যথেষ্ট শোভা পেত!

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সিরাজের কর্ণে যেন কেউ অগ্নিশলাকা প্রবেশ করিয়ে দিল। সে উন্মত্ত হয়ে উঠল। দীর্ঘ হয়ে উঠল তার দুটি চোখ। স্ফীত হয়ে উঠল নাসিকা। সমস্ত শরীর চঞ্চল হয়ে কেমন যেন ভেঙে দুমড়ে যেতে লাগল। রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে কি করবে ভেবে না পেয়ে হঠাৎ কোমরে গোঁজা ছুরিটা তুলে ফৈজীর বক্ষ লক্ষ্য করল। তারপর বলল—না, তোমাকে এমনি করে হত্যা করা ঠিক হবে না, তোমার মৃত্যু হবে তিলে তিলে—যে মৃত্যু কখনও কেউ চিন্তা করেনি। বলেই সে আবার সবল মুঠিতে ফৈজীর হাতটা চেপে ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল। কক্ষের বাইরে নিয়ে এসে সিরাজ তেমনিভাবে চলল। ফৈজীর কণ্ঠে কোন আর্তনাদ নেই বা কোন চীৎকার—শুধু সে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করল।

প্রায়ান্ধকার পথ দিয়ে সিরাজ সেইটুকু রমণীদেহটি যেন হালকা একখণ্ড তুলোর মতো নিয়ে এসে তার সেই নির্দিষ্ট চোরকুঠরীতে ফেলল। তারপর ফৈজীকে তার মধ্যে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করতে করতে বলল—এখানেই শেষ হবে তোমার সমাধি।

তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে মিস্ত্রী ডেকে সেই প্রকোষ্ঠ ইষ্টক দ্বারা চিররুদ্ধ করে দেবার আদেশ প্রচার করল। যখন বাইরে থেকে ইষ্টক গেঁথে দরজা প্রায় চিররুদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, এমনি সময়ে রাতের স্তব্ধতা খান খান করে ভেঙে দিয়ে ফৈজীর আর্তনাদের চীৎকার সমস্ত প্রাসাদ কাঁপিয়ে প্রতিধ্বনি করে উঠল।

আর সিরাজ তখন তার কক্ষের সেই অলিন্দে দাঁড়িয়ে ঝিলের জলের দিকে তাকিয়ে নিজের চোখের অশ্রু লুকোচ্ছে। কিন্তু বার বার ফৈজীর আর্তনাদের শব্দ ভেসে এসে তাকে চমক দিচ্ছে! সে দারুণভাবে চমকে উঠে থরথর করে কেঁপে উঠছে। দুই হাত মুখের ওপর স্থাপন করে মুখখানাকে চেপে ধরে সে রক্তাক্ত করে তোলবার চেষ্টা করছে—আবার আর্তনাদ—আবার আর্তনাদ। সমস্ত প্রাসাদ কাঁপছে। সমস্ত প্রাসাদ যেন ভূমিকম্পে অস্থির। কিন্তু প্রাসাদের কারও মুখে কথা নেই। আজ যেন হীরাঝিল প্রাসাদ ঘিরে মৃত্যুর তাণ্ডব খেলা করছে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ভাবী নবাব সিরাজউদ্দৌলা আজ ছুরিকা শানিয়ে অপেক্ষামান।

এমন সময় সেই বিশালকায় কালো যমদূত অনুচর ইয়ারজঙ্গ সিরাজের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল—জনাব হোসেন কুলী খাঁ খতম, তার সাথে তার অন্ধ ভাইও জনাব খতম হয়ে গেছে। বাধা দিতে এসেছিল বলে বিলকুল খতম করে দিয়ে এসেছি।

হঠাৎ সিরাজ ঘুরে দাঁড়িয়ে ইয়ারজঙ্গের দেহ লক্ষ্য করে প্রচণ্ড এক লাথি প্রয়োগ করল, তারপর ক্ষিপ্তস্বরে বলল—যা, দূর হ—উল্লুককা বাচ্চা।

ইয়ারজঙ্গ ভয়ে পালিয়ে যেতে সিরাজ হঠাৎ পাগলের মতো উচ্চৈঃস্বরে অট্টহাস্য

করে উঠল। হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি-আরও ভয়াবহতা সৃষ্টি করল সে রাতের আসমান। তারপর হঠাৎ সে বসে পড়ে নামাজের ভঙ্গীতে উর্ধ্বদিকে হাত দুটো তুলে বলল— হে মেরে আল্লা, তুমি জানো আমার কি গোস্তাখি? তারপর তার মাথাটা মাটিতে ঝুঁকে পড়ল। অজ্ঞান, অচৈতন্য হয়ে সে লুটিয়ে পড়ল কক্ষের কার্পেট বিছানো মেঝের ওপর।

ভাগীরথী সেই একই নিয়মে প্রবাহিত হচ্ছে। পৃথিবী দিন ও রাত্রি ঠিক একই নিয়মে হয়ে চলল। কিন্তু সেদিনের রাত্রিটি সিরাজের জীবনে যে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে এসেছিল তার তুলনা বুঝি পৃথিবীতে বিরল।

সেদিনের রাত্রিতে যেন মুর্শিদাবাদের নবাবী ইতিহাসে রচিত হল এক জ্বলন্ত অধ্যায়। অত্যুজ্জল হীরাঝিল প্রাসাদ ঘিরে উত্থিত হল শুধু রমণীর কণ্ঠে মর্মভেদী চীৎকার। ফৈজী মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বদ্ধ কক্ষের মধ্যে থেকে চীৎকার করে আসমান ফাটিয়ে ফেলতে লাগল। হীরাঝিল প্রাসাদের মর্মর সোপান ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে লাগল। ফৈজীর কান্নার শব্দতে সমস্ত দুনিয়ার আওরতের চোখে জল এসে পড়ল। কিন্তু সিরাজ তখন কোথায়? সে অপরাধীর বিরুদ্ধে শাস্তি প্রয়োগ করে অজ্ঞান, অচৈতন্য হয়ে তারই কক্ষের মেঝের ওপর পড়ে আছে। কোন বাঁদীই তার কক্ষে প্রবেশ করেনি, কোন খোজা প্রহরীও না। সবাই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে স্থবির হয়ে গেছে।

কিন্তু সত্যিই কি সিরাজ অপরাধ করেছিল?

সে প্রশ্নের জবাব ঐ খোশবাগের মাটির তলায়। খোশবাগের মাটির তলায় সেই অশ্রান্ত মনের কবর আছে। সে সারাজীবন ধরে নিজেকে জিজ্ঞেস করেছে, আল্লার কাছে জিজ্ঞেস করেছে 'তার কি অপরাধ?' কিন্তু উত্তর বোধ হয় সে কোনদিনই পায়নি।

তাই সেই অশ্রান্ত মনের চঞ্চলতা কোনদিনই কমে নি।···ফৈজীর জ্বলন্ত স্মৃতি মুর্শিদাবাদের বাতাসের অণুতে অণুতে মিশে চির অক্ষয় হয়ে আছে। হয়ে আছে সিরাজের অন্যায়ের সাক্ষী। সিরাজের সাথে সাথে ঘুরে ফেরে সেই অপরূপ সুন্দরী নর্তকী ফৈজীর নাম। সিরাজ মহব্বত পায় নি বলে ফৈজীকে শাস্তি দিয়েছিল। কিন্তু কে বললে সিরাজ মহব্বত পায়নি? না পেলে দুটি নাম একই মালায় গাঁথা হল কেমন করে?

হোসেনকুলি খাঁর হত্যাও সিরাজের জীবনকে আলোড়িত করেছিল। সেদিনের সেই রাত্রি থেকে সে নতুনরূপে, নতুন মানুষ হয়ে একদিন মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে

বসেছিল কিন্তু আর কখনও তার নামের সঙ্গে হত্যার লোমহর্ষক ঘটনা সংযোজিত হয় নি।

তবু মানুষের বিচারে মানুষের সমাজে সে একজন ঘৃণিত পুরুষ বলে নাম পেয়েছে। জানি না, আল্লা কেন এই জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা খেললেন ? কেন করলেন অবিচার ?

সেই মুর্শিদাবাদ আজও আছে। আজও যেখানে দিন ও রাত্রি তার আপন উপস্থিতি নিয়ে উদয় হয়। ভাগীরথীর উন্মত্ত স্রোতধারা সেই একই চঞ্চলতা নিয়ে বয়ে চলেছে। কিন্তু একটি অশ্রান্ত মনের সেই প্রশ্ন, আর হাহাকার !

বাতাসে কান পাতলে শোনা যায়—কে যেন খোশবাগের ঐ মাটির তলা থেকে কাঁদছে—কেঁদে কেঁদে বলছে—আমার মুক্তি কই, আমি কেন অবিচার পেলাম ?

সন্ধ্যা নেমে আসে মুর্শিদাবাদের আসমানে। অন্ধকারের কালো বোরখায় ঢেকে যায় সমস্ত প্রান্তর। অবলুপ্ত সেই হীরাঝিলের প্রাসাদের মধ্যে যেন আবার রংমহল জেগে ওঠে। হাজারো ঝাড়ের আলোয় চারিদিক ভরে নৃত্যের তালে তালে কে যেন এগিয়ে আসে। বাতাস যেন কার ঘুঙুরের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। সরাবের পেয়ালা ভরে কে যেন আতরের খুসবু ছড়িয়ে এগিয়ে দেয় পানপাত্র।

কিন্তু আজ সবই স্বপ্ন। স্বপ্নের মতই সেই অবিশ্বাস্য ঐতিহাসিক হীরাঝিল। তার চিহ্ন আজ কোথাও আর মেলে না।

● ●
●

নর্তকী রাণাদিল

শাহই-বুলন্দ ইকবাল দারা শিকো, ভারতের শ্রেষ্ঠ মোগলসম্রাট শাহজাহানের প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকো। গর্বিত ভঙ্গি তার, বলিষ্ঠ ঋজুদেহের অহঙ্কারী দৃষ্টি নিয়ে দিল্লীর বাদশাহী পথের ওপর দিয়ে অশ্বের ওপর সওয়ার হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। অশ্বের পায়ের দ্রুত শব্দ হচ্ছে টগ্‌বগ্‌।

সূর্যের বর্ণাঢ্য আলোর মণিমানিকোজ্জ্বল স্বর্ণরেণু চারিদিকে আওরতের রোশনীর মত ঝলমল করছে। যুবরাজ দারা শিকোর বহু মূল্যবান মসলিনের পোশাকের ওপরও আলোর চমক। যুবরাজের মাথায় শিরস্ত্রাণ, সূর্যের প্রখর দীপ্তিও তার ওপর বেশি। কোষবদ্ধ তরবারী চলার তালে দ্রুত আন্দোলিত হচ্ছে। শব্দ হচ্ছে বিচিত্র।

হাসছে নবীন যুবরাজ তার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। ভবিষ্যতের স্বপ্নে তার সমস্ত সময় আচ্ছন্ন। সে হবে আগামী মোগল সিংহাসনের একজন ভাগ্যবান সম্রাট। পিতা তাকে বড় বেশি পেয়ার করেন। পিতার মনের ইচ্ছা আর তার অজ্ঞাত নয়। তাছাড়া সে মোগলসম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। উত্তরাধিকার সূত্রে তারই সিংহাসন পাওয়ার কথা। শুজা, ঔরঙ্গজেব, মুরাদ তারই অধীনে প্রদেশের শাসনকর্তা হয়ে থাকবে।

হঠাৎ অশ্বারোহীর চিন্তায় বাধা পড়ল। গতি হয়ে এল মন্থর। কানে এল যন্ত্রসঙ্গীতের তালে তালে ঘুঙুরের শব্দ। তাকিয়ে দেখল দারা শিকো। সেই পথ, সেই জায়গা। দিল্লীর চকের ধারে সে এসে পড়েছে। চকের চারিদিকে দেশ বিদেশের বহুমূল্য রকমারী সামগ্রী থরে থরে বিপণিতে সাজান আছে। ক্রেতাও অনেক। দিল্লীর রাজধানীতে তামাম হিন্দুস্তানের লোক। বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ভাষাভাষির ক্রেতা এ বিপণি থেকে ও বিপণিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিচিত্র কলকাকলীতে মুখর চকবাজার।

এই নিয়ে তার তিনবার হল। এই পথে এই সময় এখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়া, এবং ভীরু দৃষ্টি নিয়ে ঐ সামনে এক ঝাঁক ভীড়ের মধ্যে একটি লক্ষ্যে কাতরদৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকা। কেমন যেন মোগল সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ দারা শিকোর শোভা পায় না! কিন্তু হাজারো লোকের ভেতর থেকেও যে সুন্দর ব্যাকুল দৃষ্টিটি তার দিকে ছুটে আসে তাকেই বা সে অস্বীকার করে কেমন করে? সুর্মা-কালো ঐ দুটি চোখের আকর্ষণ যে তাকে ময়ূর সিংহাসনের চিন্তাও ভুলিয়ে দেয়। ভুলিয়ে দেয় তাকে তাম্বুলরাঙা দুটি ওষ্ঠাধরের মাঝে রূপোর তবকে মোড়া দন্তপংক্তির হাসি। এ রত্ন অবহেলায় পথে পড়ে ধূলোর মাঝে নিজের জীবন কলুষিত করছে, এ কিছুতে একজন সৌভাগ্যবান মরদের পক্ষে বরদাস্ত করা যায় না। কিন্তু তবু চিন্তার প্রয়োজন আছে, আর তার জন্যেই এই সংশয়।

পথচারিনী নর্তকীর নাম রাণাদিল। সুন্দর নাম। শুধু নাম সুন্দর নয়, অদ্ভুত রূপোর রোশনাই ছড়িয়ে সে দিল্লীর চকের পথকে ম্লান করে দিয়েছে। লুটছে পথচারী বিনা সওদায় রাণাদিলের দেহের যৌবন চমক।

দারা শিকো অশ্বের ওপর বসেই রাণাদিলের বিচিত্র যৌবন শোভার চমক উপভোগ করছিল। অদ্ভুত নর্তকী আওরতের দেহ ঘিরে যেন কি এক মাদকতার আমেজ। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই চোখে ঝিম্ লাগে। কিন্তু যুবরাজ দারা চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল না। সে সরাবের নেশার মত মত্ততা চোখে নিয়েই রাণাদিলের দিকে তাকিয়েছিল। রাণাদিল যুবরাজের দিকে তাকিয়ে তার মাসুম তনুটি আন্দোলিত করে, জওয়ানী দেহের লুব্ধ রহস্যে দোলা সৃষ্টি করে চোখে ছন্দ সৃষ্টি করছিল। দারা শিকো রাণাদিলের প্রশংসা করে মনে মনে বলল—'এ আওরৎ জানে মরদকে কি করে আপন করতে হয়!'

যন্ত্র-সঙ্গীতের তালে তালে পায়ের মুদ্রাগুলি অদ্ভুতভাবে কঠিন মাটিতে খেলা করে যাচ্ছিল। কোমরে একটি ছোট্ট মলিন ঘাঘরা, পায়ের অনেকখানি সুন্দর অংশ অনাবৃত। নাচের তালে তালে ঘাঘরাটি যখন ঘুরছে, পায়ের পাতা থেকে হাঁটুর ওপর অংশ পর্যন্ত কেমন যেন প্রকট হয়ে উঠেছে। যুবরাজ দারা শিকোর দেহের রক্তে কেমন যেন বিপ্লব। বক্ষের বাঁকেও সমুদ্র সফেন উত্তালতা। বক্ষের কাঁচুলী ভেদ করেও রাণাদিলের উদগ্র যৌবন যেন পথের হাজারো দৃষ্টির সামনে বড় অবহেলায় অবহেলিত হচ্ছিল। এর জন্যেও যুবরাজ দারা শিকোর কাতরতা। সে একজন সৌভাগ্যবান মরদ হয়ে এমন একটি রত্নকে পথে দেখে তাকে উদ্ধার করতে পারে না? আল্লা তাকে ক্ষমতা দিলেও সে ক্ষমতা সে ব্যবহার করতে পারে না? বার বার মনে

পড়ে সম্রাট পিতা শাহজাহানের কথা। মোগল রাজবংশের ইজ্জতের কথা। পিতার অসন্তুষ্টির কারণ হলে—তার সিংহাসনের পথ দুর্গম হয়ে যাবে। তখন এই রত্ন নিয়েই বা সে কি করবে ?

এইসব কথা সে এই তিনদিন ধরে এক নাগাড়ে ভেবেছে। কিন্তু কোন সমাধানে আসতে পারে নি। অথচ এই পথচারিনী নর্তকীকেও মন থেকে সরাতে পারে নি। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সে বিদ্রোহী হবে। এরকম কাপুরুষের মত পিতার অধীন হয়ে থাকা অন্তত রাজবংশের যুবরাজের শোভা পায় না। কিন্তু শক্তি কোথায় ? আম্মাজান মমতাজ বেঁচে থাকলে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করত। ভগিনী জাহানারার সঙ্গেও অবশ্য আলোচনা করা যায় কিন্তু সে পিতার স্বপক্ষেই রায় দেবে। বলবে—'একটি পথের নর্তকীর জন্য আব্বাজানকে তকলিফ দিও না। সিংহাসন পেলে ঐরকম খাবসুরৎ আওরত তুমি বহুৎ পাবে।'

কিন্তু জাহানারা নিজে আওরত। তার জীবনে আছে অঙ্গার। তার রূপও দিল্লীর হারেমের শোভা। সে বুঝবে না অন্য আওরতের রূপের চমক। তাই রাণাদিলের রূপের রোশনী ভাইজান দারাকে কি রকম দগ্ধ করে, সে উপলব্ধি করতে পারবে না। সবই ভেবেছে বুদ্ধিমান দারা শিকো। কিন্তু মনের উত্তেজনা দমন করতে পারে নি। সে তার এই তরুণ জীবনে আওরত অনেক পেয়েছে। মোগল হারেমের প্রতি প্রকোষ্ঠে পৃথিবীর সেরা সুন্দরীরা নিজেদের রূপ-যৌবন মেলে অবস্থান করছে। তাদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে একটি রাতের জন্য উপভোগ করে মোগল রাজবংশের যুবরাজের কর্তব্য সে সম্পাদন করেছে। তাছাড়া অপরূপ সুন্দরী উদিপুরী তার কণ্ঠালগ্ন যুবরাজ দারাকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তবু প্রয়োজন পথচারিণী ঐ নর্তকী রাণাদিলকে। রাণাদিলকে পেলে একদিনের সৌভাগ্য নয়, সারাজীবনের আনন্দ।

দারা শিকো মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, রাণাদিলকে পেলে সে সম্রাটপিতার হুকুম নিয়ে তাকে শাদী করবে। বেগুণাহ্ এক মাসুম জওয়ানী লেড়কী খাবসুরৎ যৌবনের রোশনী নিয়ে পথে পথে নেচে নেচে পথচারীদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করছে। সেই দুরবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করে তাকে সম্মানই দান করবে। পাশবিক প্রবৃত্তিতে তাকে অবহেলার কুণ্ডে নিক্ষেপ করবে না। মেয়েটির সঙ্গে এখনও আলাপ হয় নি দারা শিকোর, কিন্তু তার সম্বন্ধে অনেক পরিকল্পনা করেছে যুবরাজ দারা। আসলে যুবরাজ দারা শিকো মিঠে মৌতাতের বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে এই চকের ধারে আবার এসেছে।

অনেকেই তাকিয়েছিল দারা শিকোর দিকে। দিল্লীর ময়ূর সিংহাসনের সেরা বাদশাহ, শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকো পথের মাঝে এক নর্তকীর প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে অনেকেই মনে মনে কৌতুক অনুভব করছিল। হঠাৎ দারা অশ্বের ওপর থেকেই হাত নেড়ে রাণাদিলকে কাছে ডাকল। রাণাদিল মৃদু হেসে নাচ থামিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এল।

রাণাদিল কাছে এলে দারা মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, আমার সঙ্গে দিল্লীর হারেমে যাবে?

বাচাল বা মুখরা নয় রাণাদিল, তবে বেশ সপ্রতিভ, সে সেই ভঙ্গিতে বলল, কেন?

—তোমায় আমি শাদী করব।

শাদীর কথা শুনে রাণাদিলের মুখের ওপর একঝলক হাসি চল্‌কে উঠল, সে হেসে বলল, যুবরাজ দিল্লাগী করছেন কেন!

—দিল্লাগী নয় সাচ্‌ বাৎ।

কিন্তু আর কথা বলার আবশ্যক মনে করল না দারা। হঠাৎ এক অসম্ভব কাণ্ড করল, অশ্বের পিঠ থেকেই দারা রাণাদিলকে হাতের নাগালে অশ্বপিঠে তুলে নিয়ে দ্রুত অশ্ব চালিয়ে দিল। দারার বুকের মাঝে রাণাদিলের ছোট্ট দেহটি যেন বিরাট এক আশ্রয় পেল। সে দারার বুকের মধ্যে তার আপন মুখ গুঁজে দিয়ে যেন পরম নিশ্চিন্তে নিশ্বাস গ্রহণ করল।

দারা কিন্তু আর কোন কথা বলছিল না। তার তখন লক্ষ্য—দিল্লীর প্রাসাদ। ঊর্ধ্বশ্বাসে অশ্ব ছুটে চলেছে। সাইপ্রাস বৃক্ষের সারিগুলি চোখের সামনে থেকে অন্তর্হিত হচ্ছে। প্রখর সূর্যের রশ্মিমালা এদের এই যুগলমূর্তিকে স্নান করাচ্ছে। ঊর্ধ্বে নীল আকাশের বুকে নাম না জানা পাখির সারি ঝাঁক বেঁধে কোথায় কোন্‌ সুদূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। পাশেই যমুনার স্রোতধারা। সেখানেও যেন আজ উন্মত্ততা প্রকৃতিকে চঞ্চল করেছে। দিল্লীর প্রাসাদের মনোমুগ্ধকর শালিমার বাগের কথা মনে পড়ল দারার। সেখানে বিচিত্রবর্ণের পুষ্পরাজি সৌরভে চারিদিক আমোদিত করে রেখেছে। পুষ্পতনুর সন্ধানে মধুমক্ষিকার আনাগোনা। নিস্তব্ধ মুহূর্তে গুণ গুণ শব্দের ঐক্যতান যেন গীতবাদ্যসুধা পরিবেশন করছে। এই শালিমার বাগের কুঞ্জে যখন রাণাদিল ভ্রমণ করবে, তাকে কেমন দেখাবে?

হঠাৎ রাণাদিল দারার বুকের মধ্যে থেকে মুখখানা একটু তুলে জিজ্ঞেস করল —তুমি কি সত্যিই আমাকে শাদী করবে?

দারা রাণাদিলের প্রশ্নে তার মুখের ওপর অবাক হয়ে তাকাল, তারপর ম্লান হেসে মনে মনে বলল, বেচারী বেওকুফ জেনানা, বিশ্বাস করতে চায় না শাদী করে কোন মরদ তাদের সম্মান জানাতে পারে।

রাণাদিল যখন আবার তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল, তখন দারা হঠাৎ এক হাতে লাগাম ধরে আর এক হাতে রাণাদিলের থুত্‌নি তুলে আদর করে বলল, জী, হাঁ বেগমসাহেবা। যুবরাজ দারা শিকো মুহব্বতের রোশনী জ্বেলে তোমায় ইন্তেজার করছে। ঝুট নয়, সাচ্‌ বাৎ। দিল্লাগী নয়, দিলের ফরমাইজ।

যুবরাজ নিজের নির্দিষ্ট মহলে নিয়ে গিয়ে আলাদা একটি অংশে রাণাদিলের বাসস্থান ঠিক করে দিল। দিল তার হুকুমের জন্য কিছু বাঁদী। রাণাদিল স্নানাগারে ঢুকে ধুয়ে ফেলল পথের যত মালিন্য। পথচারিনী নাম ধুয়ে সে হল যুবরাজ দারা শিকোর মুহব্বতের রোশনী, দিলের চমক্। রাণাদিলের দেহে চড়ল মোগল হারেমের খানদানী আওরতের জন্য তৈরী বহুমূল্যবান পোশাক। হীরা, জহরত, পান্না, মণিমুক্তার অলঙ্কারে তার দেহের চমক যেন আরও খোলতাই হয়ে উঠল। দারা শিকো আবার যখন এই রূপে রাণাদিলকে দেখল, সে বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল, আর ভাবতে লাগল—আলো দর্পণের ওপর পড়ে চমক সৃষ্টি করে, আওরৎ অলঙ্কারে বিভূষিত হলে তার রোশনাই ঐশ্বর্যের চমককেও ম্লান করে। সেই রোশনাইয়ের রূপ বিশ্লেষণের চিন্তায় দারার কিছু সময় কেটে গেল। তারপর সে প্রকৃতস্থ হলে রাণাদিলের একটি হাত ধরে শপথ উচ্চারণ করে বলল, দুনিয়ায় আমি ঈশ্বরকেই সবচেয়ে বেশি পেয়ার করি, তবু আমার ভাইজানরা বলে আমি বিধর্মী। যাই হোক, তবু সেই ঈশ্বরের নামেই কসম জানিয়ে বলছি, আমার এই মুহব্বত কখনও ঝুটা হবে না।

•
• •

প্রাসাদের মর্মর সোপানে সোপানে সেই উদাত্তস্বরের শপথবাণী প্রতিধ্বনি তুলে সমস্ত আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করে দিল। শাহজাহান নিজে ছিলেন প্রেমিক। তাঁর শোণিতে ছিল মুহব্বতের বীজ। সন্তানের মধ্যেও সেই মুহব্বতের স্রোত বইবে এ আর অজানা কি ?

কিন্তু সংবাদ যখন সম্রাট শাহজাহানের কাছে গিয়ে পৌছল, তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, জলদগম্ভীর স্বরে খোজা প্রহরীকে হুকুম দিলেন—দারা শিকোকে সেলাম দাও।

সম্রাট শাহজাহান কেমন যেন আহত হয়ে নিজের কক্ষের ফরাস বিছানো মর্মর সোপানের ওপর পিছনে দুই হাত সন্নিবিষ্ট করে পায়চারি করতে লাগলেন। তিনি বার বার স্মরণ করতে লাগলেন, তাঁর প্রিয়তমা মহিষী মমতাজ বিবিকে। যে দিয়ে গেছে তাঁর সন্তানদের জিম্মা করে, লালন পালন করে মানুষ করে তাদের সুখে রাখতে বার বার বলে গেছে। দারা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র, তাঁর সমস্ত পেয়ার সে-ই পেয়েছে। জাহানারা তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা, তাঁর সমস্ত সোহাগ সে-ই পেয়েছে। এই দুজন কোন অন্যায় করলে তাঁর এই শোকসন্তপ্ত হৃদয় আর কিছু সহ্য করতে পারে না। তিনি যেন ভেঙেচুরে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যান। তাঁর সমস্ত সহ্যের বাঁধ যেন আলগা হয়ে কেমন যেন তাকে দুর্বল করে দেয়। চোখে তাঁর জল এসে পড়ে। বার বার তাই বলতে ইচ্ছে করল, 'মমতাজ এ তুমি আমাকে কি দিয়ে গেলে ? সমস্ত সাম্রাজ্যের বিনিময়ে এ দহন যে সহ্যাতীত।'

জাহানারা এসে কক্ষে প্রবেশ করল। তিনি তাকে দেখে বললেন—তুমি নিশ্চয় শুনেছ প্রিয়তমা বেটি, দারার এই ব্যবহার সাম্রাজ্যের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর। সে এক পথচারিনী নর্তকীর সঙ্গে মুহব্বতে সমস্ত রাজবংশ কলুষিত করেছে।

জাহানারা পিতাকে বোঝাতে চাইল—ভাইজান দারা কোন অন্যায় করে নি। মোগল সম্রাট আকবরের বিধানে কোন হুকুম নেই যে, নসীবের জন্য কোন আওরৎ পথচারিনী হলে তাকে সম্মান দেওয়া যাবে না। আমি শুনেছি, ভাইজান দারা যে আওরৎকে শাদী করতে চায়, সেই আওরৎ হিন্দু রমণী।

এই সময় দারা কক্ষে প্রবেশ করল। দারা কুর্ণিশ করে পিতার সামনে দাঁড়াতেই প্রবীণ সম্রাট কেমন যেন দারাকে আলিঙ্গনের জন্য মনের সমস্ত ক্ষোভ ঝেড়ে ফেললেন। দারাকে কাছে ডেকে সস্নেহে বললেন—বেটা, তোর আম্মাজানের কাছে আমি কসম খেয়েছিলাম, তোদের আমি কখনও তিরস্কার করব না, আজও তাই 'তোদের কোন তিরস্কার করতে চাই না। তবু বলছি, পেয়ারের বিনিময়ে আমার বেটারা এমন কোন গোস্তাখি করবে না, যা আমার দিল্‌কে আঘাত করতে পারে।

দারা অস্ফুটস্বরে বলল, সম্রাট, আমি এমন কোন অন্যায় করি নি, যাতে আমার পিতার দিলের দর্দ বাড়ে।

—তাহলে আমি যা শুনেছি তা কি ঝুট্ ?

—না ঝুট নয়। এক খাবসুরত আওরৎ আল্লার মেহেরবানি না পেয়ে পথের মালিন্যে পড়ে ধুলিময় জীবন নিয়ে রোদন করছিল, তাকে এনে আমার মহলে স্থান দিয়েছি, সে হিন্দু আওরৎ আব্বাজান, শাহেনশাহ আকবরের বিধানে মোগল বংশের যুবরাজদের একজন করে হিন্দু বিবি গ্রহণ করার আদেশ আছে—আমি রাণাদিলকে শাদী করে সেই আদেশ পালন করতে চাই বাদশাহ।

সম্রাট শাহজাহান একবার কন্যা জাহানারার দিকে ও একবার দারার দিকে তাকিয়ে বাইরে অলিন্দের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলেন। কি বলবেন তিনি তাঁর প্রিয়তম পুত্র দারা শিকোকে। আওরতের প্রতি লোভ তাঁরও কম না। তিনিও

প্রতিজ্ঞা করেছিলেন মমতাজের কাছে। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা তিনি রাখতে পারেন নি। মোগল রাজপ্রাসাদের কক্ষে কক্ষে যত ঐশ্বর্যের রোশনাই, তত সেরা সেরা আওরতের কুসুম-তনুর সমাবেশ। তাদের খাবসুরত যৌবন-শোভা দেখে মমতাজের কাছে তাঁর প্রতিজ্ঞা থাকে নি। গোপন অভিসারের যে সব ইতিহাস রাতের অন্ধকারে সৃষ্টি হয়েছে, তার সবকিছুই প্রিয়তমা কন্যা জাহানারার জানা।

কিন্তু কখন জাহানারা কক্ষত্যাগ করে চলে গিয়েছে, হঠাৎ তার অনুপস্থিতিতে সম্রাট শাহজাহান সচকিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু জাহানারা যেমনি অতর্কিতে বেরিয়ে গিয়েছিল আবার ঢুকল। দারাও সঙ্গে সঙ্গে চকিত হয়ে বহিনের দিকে তাকিয়ে রইল। জাহানারার সঙ্গে রাণাদিল। জাহানারার নির্দেশে রাণাদিল সম্রাট শাহজাহানকে তিনবার কুর্ণিশ করল।

সম্রাট শাহজাহান রাণাদিলের অপরূপ যৌবন শোভার দিকে তাকিয়ে মনে মনে পুত্র দারার তারিফ করলেন। তারপর হঠাৎ অস্ফুটস্বরে বললেন, জাহানারা, বেটি, শাদীর আয়োজন কর।

দারা ও রাণাদিল সম্রাটের এই আদেশে উৎফুল্ল হয়ে হাজারো কুর্ণিশ পেশ করতে লাগল, কিন্তু শাহজাহান আর সেদিকে না তাকিয়ে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন। জাহানারাও পিতার পিছু পিছু কক্ষ থেকে অদৃশ্য হল।

●
● ●

দিল্লীর বাদশাহী কক্ষের মধ্যে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকল দারা ও রাণাদিল। চার চোখে বার বার দৃষ্টি বিনিময় হতে লাগল, আর বার বার খুশির হিল্লোলটা উপছে কাণায় কাণায় ভরে তাদের যেন সুখাতীতে পৌঁছে দিতে লাগল। অদ্ভুত এক জীবনের হঠাৎ পরিবর্তনে রাণাদিল্ কেমন যেন কৃতজ্ঞতার চোখে দারার দিকে চেয়ে রইল। আর দারা ভাবল, এত সহজে সম্রাট পিতার অনুমতি পেয়ে সে রাণাদিলকে সারাজীবনের জন্য পাবে এ যেন তার কাছে অসম্ভব ছিল। সেই অসম্ভব সম্ভব হতে তাই সে বার বার রাণাদিলের দিকে তাকাতে লাগল।

আর রাণাদিল ভাবল, সবকিছুর মূল্যে যে ভাগ্য পরিবর্তন করেছে সে তারই সামনে দাঁড়িয়ে আছে, হিন্দুকন্যা হয়ে সেই দেবতাকে শ্রদ্ধা জানাতে একটি প্রণাম অঙ্কন করা উচিত। যদিও সে মুসলমানের বেগম হতে চলেছে, তবু সে হিন্দুর হিন্দুত্ব ভুলবে কেমন করে? ধর্মকে হারাতে তো কেউ তাকে শিক্ষা দেয় নি। সেইজন্যে সে অভিভূত দারার পায়ের কাছে হঠাৎ মাথাটা নুইয়ে প্রণাম এঁকে দিল।

দারা তাড়াতাড়ি তাকে ধরে নিজের বুকের আলিঙ্গনে টেনে নিল। আনন্দে রাণাদিলের দুটি সুন্দর চোখের কোণায় অশ্রুবিন্দু টলমল করে উঠল।

তখন সন্ধ্যায় গোধূলিআলো দিকচক্রবালে খেলা করছিল। প্রাসাদের নহবত তোরণখানায় পিলুরাগে সন্ধ্যাকে বন্দনার জন্য সানাই বাজছিল। সেই সানাইয়ের সুর বাতাসে ছড়িয়ে পরিবেশকে মধুর করেছিল। সেই মাধুর্যের সঙ্গে যেন দুটি হৃদয়ের সুর মিলে মিশে এক হয়ে গেল।

• • •

ক্রীতদাসী

ইতিহাস কি সত্য গল্প, না মিথ্যা!

গল্প গল্পকাররা বানিয়ে বানিয়ে লেখে কিন্তু ইতিহাস বানিয়ে লেখা কাহিনী নয় সে সত্যকাহিনী, সেই সত্যিটা পড়তে ভাল লাগে বলে গল্প। কিন্তু সেই ইতিহাস কত রোমাঞ্চকর কাহিনী হতে পারে ১৬২৮ সাল তার প্রমাণ। হুগলীর দাসবাজার আজ অবিশ্বাস্য কাহিনী। একদিন পর্তুগীজরা সেই হুগলীতে তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল এবং ব্যাণ্ডেল গীর্জার কিনারে নদীর ধারে জাহাজে করে মানুষ ধরে এনে বিক্রী করত। সেই মানুষ কিনত নানাদেশের লোক। যারা খৃস্টান হতে চাইত মুক্তি পেত। খৃস্টান করার ইচ্ছা পাদরীদের কিন্তু বোম্বেটে দস্যুদের ইচ্ছা ব্যবসা। এই ব্যবসা করতে গিয়ে তারা যে নৃশংসতার পরিচয় দিত তাই নিয়ে এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ। সেই দাসবাজারে জাহাজে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছিল সম্রাট শাহজাহানের দুটি বাঁদী। উদ্দেশ্য, দিল্লীর অন্তঃপুরের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি। কিন্তু মুক্তি কি তারা পেয়েছিল? একজন পথেই জীবন হারাল, একজন এই উপনিবেশে ঢুকে পড়েছিল। পর্তুগীজ উপনিবেশ স্বাধীন হলেও তখন সারা ভারতবর্ষের কর্তৃত্ব দিল্লীর বাদশাহের। তিনি হুকুম দিলেন, 'আমার দুটি বাঁদী পালিয়ে গিয়ে তোমাদের ওখানে আশ্রয় নিয়েছে, যদি তাদের ফেরৎ না দাও তাহলে তোপ দেগে উপনিবেশ উড়িয়ে দেব।'

এই কাহিনী, গল্পের মত সত্য। আর এটি লিখতে, 'Portuguese in India, 'The History of Bengal', 'In Bengal Past and Present', 'The Bengal Catholic Herald of India, Cal. 1842' এই বইগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

কে যেন রাগে ফুলে ফুলে থেমে থেমে চিৎকার তুলে দিচ্ছে, সা—হল্ট্ হুই—হো!

অন্ধকার আকাশ। চাপ চাপ্ আঁধারের ঘন কুহেলীতে থমথমে পরিবেশ।

দূরে ভাগীরথীর নিস্তরঙ্গ জল সাপের দেহের মত ভয়াবহতা নিয়ে নিঃশব্দে প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে। আরও চোখ মেললে দেখা যায়, সেই জলের ওপর ডিঙি, নৌকা, পানসি, অর্ণবপোত আরও—আরও নানান ধরণের জলযান। তারা নিঃশব্দে কোন এক নতুন আদেশের অপেক্ষায় অন্ধকারে ঘোমটা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আর কিছু দেখা যায় না। সব চুপ, নিস্তব্ধ।

রাত কত হবে কে জানে? জ্যোৎস্নার আলো বিকশিত হয়ে এই রহস্যময় রাতের সব কিছু সহজ করে দেবে কি না, তারও কিছু ঠিক নেই।

মাঝে মাঝে শুধু অন্ধকারে ঐ একটি শব্দই শোনা যায়, পর্তুগীজ সৈনিকের ঐ সাবধান বাণী। শুনলে যেন শরীরটা রি রি করে ওঠে। বুকে জমে কাঁপন। ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে যায়।

শব্দটা ওই দুর্গের মাথা থেকে আসছে। পর্তুগীজ ভাষা। সৈনিকের সাবধান-বাণী। সৈনিক প্রহরা দিচ্ছে অস্থায়ী একটি কাঠের মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে। তার ভারী জুতোর শব্দের বলিষ্ঠ পায়চারী আরও একটি শব্দের ঐক্যতান তুলছে খট্ খট্ খট্।

মাঝে মাঝে আরও এক শব্দ ছুটে আসে তবে বেশীক্ষণ গড়ায় না। কারা যেন হঠাৎ চিৎকার করছে, তারপর গলা চেপে ধরতে সব চুপ।

সেই চিৎকারটা অনুসরণ করে গেলে মেলে একটি খোলা ময়দান। কিন্তু ময়দানে ওকি? মনে হয় যেন বহু সংসার! সেখানেই সংসার পেতে দিন গুজরান করে চলেছে।

কিন্তু আর একটু চোখ মেললে দেখা যায়, সংসার নয়, কতকগুলি নারী, পুরুষ, শিশু কি এক যন্ত্রণার মাঝে তালগোল পাকিয়ে বার বার অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে কাকে যেন অভিসম্পাত জানাচ্ছে।

এই পৃথিবী! হা ঈশ্বর!

তারা মুখে কিছু বলছে না। এ শুধু মনের ভাষা। মুখে কিছু বললেই দূরে গাছতলায় বসে আছে বণিক সর্দার। তার হাতের চাবুক ছুটে আসবে এ পাশে।

তাই কারও মুখে কোন কথা নেই। কেউ কোন কথা বলতে সাহসই করে না। তবু যা বেরিয়ে আসে, বুকের ভেতর থেকে পাক খেয়ে বেরিয়ে আসা একদলা আর্ত দীর্ঘশ্বাস। তারা নিজেরা বের করে না। ভয়ে তারা জবুথবু। বেরিয়ে আসে তারা, যারা নির্ভয়, যারা সমস্ত পার্থিব জগতের বাইরে।

বণিক সর্দার সে শব্দ শুনেও লাফায়! তারা হাতের চাবুক বাতাসে দোল খায়।

রাতেও পরিত্রাণ নেই। খোলা মাঠের ওপর ইতস্তত এমনি পাহারা গাছতলার নিচে অসংখ্য ঘাপটি মেরে বসে আছে।

যদি কেউ পালিয়ে যায় তাকে ধরবার জন্যে এই শ্যেনচক্ষু। কিন্তু কেমন করে পালাবে সে তারা জানে না। পালাবার কোন সুযোগ আছে কিনা তাও ভাবে না। অথচ যাতে কেউ এই ভয়ঙ্কর ফাঁদ পাতা ব্যূহ ছেড়ে পালাতে না পারে, তার জন্যে কড়া ব্যবস্থাই করা আছে।

যুবা, বয়স্ক, বৃদ্ধ, শিশু, মধ্যবয়স্কা নারী সকলকেই এক সুতোয় গেঁথে ফেলে রাখা হয়েছে। শুধু সুন্দরী যুবতীদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। তাদেরও কোমরে দড়ি, দড়িতে ফাঁশ দেওয়া এক একটি গিঁট, সে গিঁট খুলে পালানো শক্ত। তবে তাদের হাত ফুটো করা হয়নি। দু'হাতের তালু ফুটো করে অন্যান্যদের যেমন ক্ষতবিক্ষত করে দড়ি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের তা হয়নি। এমন কি তাদের খাবার ব্যবস্থাও আলাদা।

সেই দিক থেকে আরও একটি মিষ্টি ভয়ঙ্কর গানের মত শব্দ ভেসে আসতে লাগল। কে যেন হাসছে। মেয়েলী হাসির মধুর তীব্রতা ছড়িয়ে ছড়িয়ে যেন সব ঘনত্ব জটিলতা ফিকে করে দিচ্ছে।

বণিক সিপাই হাসছে। হাতের চাবুক তার মুঠি থেকে শিথিল হয়ে নাগালের বাইরে ঝুলছে।

রাত যেন আরও ঘন। একটি বড় তারার কিছু বাড়তি আলো এসে পড়েছে। এক পাল যুবতী মেয়ে এক জায়গায় বদ্ধ। যেন এক দলা আগুন এই অন্ধকার খোলা মাঠে আরও আগুনের শক্তি নিয়ে পোড়াচ্ছে।

পর্তুগীজ সিপাই মুখে সিটি বাজাচ্ছে। সোনালী চুলের মাথায় ঢাকা টুপিটি আরও একটু কপালের নিচে নামিয়ে দিয়েছে। চোখ দুটি জ্বলছে। শ্বাপদের মত সেই দৃষ্টিতে যেন কিসের ইসারা। মুখের সিটিতে পর্তুগালের একটি রমণীয় গানের সুর। সুরে সুরে বাতাস আরও মাতাল।

এ-ইই! চাপা আহবান।

দড়ির মালার মধ্যে যৌবন তরঙ্গ। অনেক মেয়ে। অনেক বয়েসের। তবে বারো থেকে ত্রিশের মধ্যে তাদের পরিধি। শুধু যৌবন দেখে তাদের বেছে নেওয়া হয়েছে। যৌবন ছাড়া রূপও যাদের আছে, যারা বেশি দামে বিক্রী হতে পারে, চড়া লাভে লোভের থলি পূর্ণ করতে পারে, তাদের জন্যে আলাদা সারি!

সেই সারি থেকেই একজন সিপাইকে ডাকছিল।

মেয়েটির চোখ দুটি অন্ধকারে জ্বলছে। যেন দুটি ডাগর চোখে কি এক আগুনের শিখা।

মেয়েটির পরণে সালোয়ার কামিজ, কামিজটা বুক থেকে খানিক সরিয়ে দিয়েছে। মেয়েটি ফর্সা। দুধের মত গায়ের রঙ। কোমল নিটোল শরীর। স্বাস্থ্যবতী। এক মাথা ঢেউ খেলানো চুলের রাশি বুকের ওপর তুলে নিয়েছে। ফোলা ভারী

বুক। হাসছে মেয়েটি। শাণিত অধরে মুক্তার মত দাঁতের সারি মেলে হাসছে। তার হাসির মধ্যে কি যেন এক গুপ্ত সংকল্প।

এ-ইই সাহেব!

পর্তুগীজ যুবক ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে আছে। তার মনে পড়ে যাচ্ছে কত—কত কথা। ভাগ্যান্বেষী পথে পা বাড়িয়ে এই ভারতে এসেছিল। তারপর এক জঘন্য বৃত্তির সাথে জড়িয়ে পড়ে স্রোতের মত এগিয়ে চলেছে। জানে না এর শেষ কোথায়? তবু এক এক সময়ে কি যেন তার ইচ্ছে করে?

তার সিটি বাজান বন্ধ হয়ে গেছে। দূরে তাকিয়ে আছে তার আর এক সঙ্গীর দিকে। ঠিক ঠাহর হয় না। সে ঘুমিয়ে আছে না জেগে আছে।

তবু সিপাই এগোয়।

মেয়েটি হাসছে। অন্য মেয়েগুলি মজা দেখছে। হাসছে না কেউ। চোখে তাদের ভয় ও কৌতুকের ইসারা।

মেয়েটি খুশিতে ঘাড় নাড়ে। চোখে দৃষ্টি হানে।

হঠাৎ ওপাশ থেকে গম্ভীর হুঙ্কার ছুটে আসে। অ্যাই!

পর্তুগীজ যুবকটি থমকে দাঁড়ায়। কোমর থেকে পিস্তল বের করে নেয়।

মেয়েটি আবার খিল খিল করে হেসে ওঠে।

ওপাশে সারি সারি কুঠির ছাউনি। গুদামঘর। আরও আরও অনেক নিঃশব্দে পড়ে আছে।

ঘুমিয়ে আছে সব।

গাছে গাছে শুধু বাদুড়ের ঝটাপটি শব্দ। নিশাচরদের তাণ্ডব।

আর দুর্গের ভেতর থেকে ভেসে আসছে কেমন যেন নাচের ছন্দ। পিয়ানো, ড্রাম তারস্বরে বাজছে।

মাঝে মাঝে সুরেলা শব্দটা মৃদু হয়ে যাচ্ছে। এক সুরে ড্রিম ড্রিম করে এক নাগারি বেজে চলেছে। তখন মনে হচ্ছে এবার বুঝি দুর্গের মধ্যে সবাই ঘুমিয়ে পড়বে, আর কোন শব্দ শোনা যাবে না। কিন্তু আবার হঠাৎ একসময়ে জোরে জোরে বাজনা বেজে উঠছে। রক্তের মধ্যে তাণ্ডব জাগিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড হয়ে উঠছে আদিম পিপাসা।

দুর্গের ভেতর থেকে নারীপুরুষের কণ্ঠ ও হাসি উল্লাসের দমকে কেমন যেন চৌচির হয়ে ফেটে পড়তে চাইছে।

একটি অস্থায়ী গির্জাঘর। গির্জাঘরের দালানে কয়েকজন ধর্মযাজক। তারা ঘুমচ্ছে না, একটি মোমবাতির আলোর সামনে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বসে আছে। সামনে

একটি মেরী মাতার বিমল সৌন্দর্যের আলোক চিত্র। মোমবাতির কম্পমান আলোয় সেই মেরী মাতার মুখের ওপর কি যেন ঐশ্বরিক দ্যুতি।

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধ ঘুমন্ত এলাকা প্রতিধ্বনিত করে ঘোড়সওয়ারের ছুটে আসা শোনা যায়।

আবার সেই দুর্গের ওপরের সিপাই চিৎকার করে ওঠে।

সা—হল্ট্।

কিন্তু সেই ঘোড়সওয়ার থামে না, দুর্গের দরজার কাছে দাঁড়াতেই শব্দ করে দুর্গ দরওয়াজা খুলে যায়।

ঘোড়সওয়ার বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকে যায়।

সেনাপতি ডি মিলোর কপালে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে।

রাত শেষ হয়ে যায়। পূর্ব আকাশে কে যেন রঙের তুলি বুলোতে থাকে। গাছে গাছে পাখী ডেকে ওঠে। ভাগীরথীর জলেও জাগে আলোড়ন। রাতের সেই সাপের গায়ের মত গঙ্গার জলে সূর্যের ভুবন ভোলানো আলো পরে জল যেন কুমারী মেয়ের মত চোখ তুলে হাসতে থাকে।

ফুটে ওঠে একটি পর্তুগীজ উপনিবেশ। সোনালী চুল, কটা রঙের শরীর, খাকী প্যাণ্ট-সার্ট পরে গলায় টাই বেঁধে, কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে যারা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা সব পর্তুগালের বাসিন্দা।

কেউ সৈনিক, কেউ ব্যবসাদার। কেউ থাকে দুর্গের মধ্যে, কেউ থাকে ছোট ছোট কুঠির মধ্যে। তাদের আছে ব্যবসা। সে ব্যবসার লেন দেন হয় দেশ বিদেশের সঙ্গে। তবে দুর্গের সঙ্গেও তাদের যোগ আছে। পর্তুগালের রাজার সঙ্গেও তাদের মিতালী আছে কারণ তারাও যে পর্তুগীজ। দেশের জন্যেই নিজের কাজ। আবার নিজের জন্যেই দেশের কাজ। সব এক সুতোয় বাঁধা।

তাই এরা চট্টগ্রাম থেকে হুগলীতে মিলেছে। আধ ক্রোশ তফাতেই সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামের বন্দর একদিন হুগলীর চেয়েও উন্নত ছিল। আর ছিল একটি সমৃদ্ধশালী নগরী।

কিন্তু সেই সপ্তগ্রামের সূর্য আজ অস্তমিত। বন্দর আর আগের সেই কোলাহলে মুখরিত নয়।

সেখানেও ছিল পর্তুগীজ অধিকার। তবে কোন দুর্গ ছিল না। ছিল অনেক কুঠি, আর ছোট ছোট পাকা বাড়ী।

পর্তুগীজরা এ দেশের বহু মেয়ে বিয়ে করে এ দেশের রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। এমন কি তারা পোষাকও পালটেছে। পায়জামা, ধুতি, বেনিয়ান, জোব্বা, আর মেয়েরা শাড়ী, সালোয়ার, কামিজ কিছুই বাদ দেয় নি। ভাষাও অনেক রপ্ত, তবে জিবের আড়ষ্টতার জন্যে উচ্চারণ ঠিক হয় না।

দিগো রিবেলী বলে একজন উঁচুদরের ব্যবসাদারকে দেখলে আরও চমকাতে হয়। সে বিয়ে করেছে চারটি, একটি বউ শুধু নিজের জাতের, বাকি তিনটি এদেশী। তাও

তিন জায়গায়। একটি গোয়ার, একটি বেতোরের, আর একটি সপ্তগ্রামের। চট্টগ্রাম থেকেও একটিকে এনেছিল কিন্তু তাকে বিয়ে করার আগে অন্য এক জাত ভাই ফুঁসলিয়ে নিয়ে যায়।

তাছাড়া আছে অগুণতি উপপত্নী। আর সেই সব উপপত্নী কেনা এখানকার দাসবাজার থেকে। চড়া দামে সুন্দরী ডাগর মেয়েছেলে কেনা যেন দিগো রিবেলীর নেশা। প্রত্যহ গিয়ে দাঁড়ায় সেই দাস বিক্রয়ের বাজারের সামনে।

প্রত্যহ কেনে না, যেদিন পছন্দ হয়ে যায় বা দাম নিয়ে রেষারেষি হয়, তখন চড়াদামে তুলে নিয়ে যায় সেই পুষ্ট দেহের ডাগর গোলাপ কুসুমটি।

এমনি আনতে আনতেই অন্তঃপুরটা যেন হারেম বানিয়ে ফেলেছে।

তা হোক্ গে, তার জন্য সে ভাবে না। অর্থের প্রাচুর্য যেমন বাড়ছে, তেমনি খরচ করার পথও তো ভাবা দরকার!

দিগো রিবেলী বয়সের দিক দিয়ে একটু বৃদ্ধই হয়ে আসছে। তার জন্যেও সে ভাবে না। বহুদিন ভারতে এসেছে। বহু উত্থান পতন দেখেছে। দিল্লীর সিংহাসনে আকবর থেকে শুরু করে জাহাঙ্গীর, তারপর শাহজাহান।

শাহজাহান যখন পিতার ভয়ে বিদ্রোহী হয়ে পালিয়ে এসেছিল, তখন হুগলীর সুবেদার মাইকেল রোডরিগুয়েজ। মাইকেল তখন সম্রাটকে সাহায্য করেছিল, তার সঙ্গে সেও ছিল। তার হাতে ছিল তখন কিছু শিক্ষিত সেনা। সে তখন মনে প্রাণে সৈনিকই ছিল। তারপর একদিন সৈনিকের পোষাক ছেড়ে এ দেশের পোষাক পরল। এ দেশের মানুষদের সঙ্গে মিশে ব্যবসা ফাঁদলো। চালের ব্যবসা। তারপর চিনি। এ দেশেরই মাল; বিভিন্ন জায়গা থেকে কিনে আর এক জায়গায় বেচা।

তারপর আরাকানের মগদের সঙ্গে আর এক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ল। যদিও ব্যবসা করেই তাদের পয়সা। তবু সে কথা আজ আর মনে করতে চায় না। সেই ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন জীবনের উত্থান পতনের ইতিহাস, কত ন্যায় অন্যায়, পাপ পুণ্যের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে।

আজ দিগো রিবেলী সুখী ও সম্ভ্রান্ত ধনী। হুগলীর এই অঞ্চলের যতগুলি স্বাধীন পর্তুগীজ অধিবাসী আছে তাদের মধ্যে অন্যতম।

আর তার পাকা কুঠিটিও দেখবার মত। অনেকটা ফতেপুর সিক্রীর হাওয়া মহলের ঢঙে সৃষ্টি। সেই কুঠির সঙ্গে তার বড় বড় খড়ের চালের গুদাম ঘর, তারই মধ্যে আছে যত গুদামজাত মাল।

অনেক জমিও দিগো রিবেলী চাষ করত। ক্রীতদাস দ্বারা করাত।

লম্বা, রোগা, পাকানো শরীরের মানুষটি। মাথায় সোনালী চুল ছোট করে ছাঁটা। পরণে জাতীয় পোষাকই। তবে মুখের হাসিটি ও দেশের নয়, এ দেশের। মদ খেয়ে সর্বদা টং হয়ে থাকে। কিন্তু হাসিটি পরিবেশন করতে ভোলে না।

মদের জন্যে তাকে সর্বদা জাহাজ ঘাটায় শকুনের মত ঘুরতে হয়। জাহাজ এলেই প্রথম সে মদ সওদা করবে। বিলিতী মদের নেশা সে কিছুতে ভুলতে পারে না।

আর একটি বদ অভ্যেস তার আছে, সারাদিন ঘোরাঘুরি করতে করতে তার দরকার একটি সরু বিচালীর খড়। ডগা ধরে মুখে নিয়ে চিবুবে, তারপর গালের এপাশ ওপাশ কতক্ষণ করে ফেলে দেবে। আবার একটি পথ চলতে চলতে খড়ের গাদা থেকে তুলে নেবে।

সে দিন সকাল হতেই দাস বিক্রয়ের খোলা মাঠে গোলমাল শুরু হয়ে গেল। প্রত্যহ সকাল থেকেই চলে এই ব্যবসা। তারপর দিন শেষে অন্ধকার না নামলে বিক্রয় বন্ধ হয় না।

কিনতে বহু জায়গা থেকেই লোক আসে। সেদিনও আসতে লাগল নৌকা, বজরা, পানসি করে।

বন্দরের মাল খালাসী ঘাটে অন্য ব্যবসার কেনা বেচাও চলতে লাগল।

আর এই সময়ে সেই খোলা মাঠে দস্যুবণিক পর্তুগীজ সর্দার চিৎকার লাগিয়ে দিল। প্রত্যহ এমনি চিৎকারই সারাদিন চলে।

আর ঠিক ভেড়ার পালের মত মানুষের দল, হাতে ফুটো করা গর্তের মধ্যে দড়ির বাঁধনে বন্ধ থেকে, রক্ত, পুঁজ ও দগদগে ঘায়ের জ্বালা নিয়ে, রোদে পুড়তে পুড়তে অনাহারের ক্লান্ত শরীরে ব্যাকুল চোখে ক্রেতার দিকে তাকিয়ে থাকে।

তখন ঐ জঘন্য অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য নীরব কাতর প্রার্থনা।

কিন্তু ক্রেতা তার প্রয়োজনের দিকেই এগিয়ে চলে।

আর পর্তুগীজ ধর্মযাজকরা এসে ঢোলা জামা পরে দাঁড়ায়। বলে না কিছু, শুধু বিড় বিড় করে কাকে যেন প্রার্থনা জানায়।

কেউ কেউ কি ভেবে এগিয়ে আসে—খৃষ্টান হবে? খৃষ্টান হলে মুক্তি পাবে পর্তুগীজ প্রভুর কাছে থেকে ভূমি ও চাকরী, সুখে জীবন যাপন করবে, আর দাস থাকতে হবে না।

অনেক জ্বালা ও যন্ত্রণা। অনেক অভিশাপের মালা পরে অবিচার জীবন। তবু ধর্ম ত্যাগ করতে মন কারুর সায় দেয় না।

আর নিজের গ্রামে ফিরতে পারবে না। পাবে না সেই হারিয়ে যাওয়া আত্মীয় স্বজনকে। সে গ্রাম দস্যুরা রাতারাতি পুড়িয়ে জ্বালিয়ে নিয়ে এসেছে সেই গ্রামের নরনারী, শিশুকে। তারা একসঙ্গে কেউ নেই, হরির লুটের মত কে কোথায় ছিটকে গেছে, কার ভাগে কে পড়েছে, চলে গেছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দস্যু বণিকের নৌকো বোঝাই হয়ে। তারপর এই নানা দেশের দাসবাজারে।

প্রত্যহ যেমন যুবতী মেয়েদের আটক স্থানে ক্রেতার ভীড় হয়, আজও সেই দিকে খদ্দের এগিয়ে চলল।

সূর্য ভাগীরথীর স্রোতের ওপর পড়ে দামাল কিশোরীর মত খেলা করছে। বন্দরে দুর্গের ত্রিকোণ মুখের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বিদেশী জাহাজ। জাহাজের মাল সব দুর্গের মধ্যেই জমা হচ্ছে। তার মধ্যে অস্ত্রশস্ত্রও কম নয়।

দুর্গটা এমনভাবে তৈরী করা, যার তিনভাগ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, এক ভাগ জলের দিকে।

জাহাজ এসে নোঙর করলে, আর তার মাল দুর্গের মধ্যে ঢুকলে বাইরে থেকে কারুর বোঝবার উপায় নেই।

সেদিন এরই পাশে পাশে অসংখ্য বাণিজ্য নৌকা। কোন্‌টা এসেছে দক্ষিণ বাংলা থেকে। কোন্‌টা সন্দীপ, বাকলা, সুন্দরবন, বালেশ্বর, বেতোড়, আরও এগিয়ে গেলে চট্টগ্রাম, আরাকান, দক্ষিণের গোয়া।

সবাই কাজে এসেছে। বিনা কাজে কেউ হুগলি বন্দরে বেড়াতে আসেনি।

সেই ঘাটের ধারেও নানা ভাষার নানা উত্তেজনা।

যত বেলা বাড়বে, রোদের তাপ বাড়বে। যদিও এটা বসন্তকাল। তবু সূর্য মাথার ওপর উঠে পড়লে কেমন যেন তির্যক চোখে চায়।

আর সেই রক্ত চক্ষুতে ক্রেতা বিক্রেতার মাথা গরম হয়ে ওঠে। তাই সকালের এই ঠাণ্ডা আলোয় সকলেই তড়িঘড়ি কাজ সারতে চায়, তাই গোলমালটা একটু বেশী। সৈনিকদের কাজও বেড়ে যায়।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করবার জন্যে বন্দুক হাতে তাদের টহল দিতে হয়। এ পর্তুগীজ উপনিবেশ। এখানকার অধিকার পর্তুগীজদের।

স্বয়ং বাদশা আকবর এই ক্ষমতা তাদের দিয়ে গেছেন। সে ফরমান নাকি দুর্গের মধ্যে একটি লোহার সিন্দুকে সযত্নে রাখা আছে।

সপ্তগ্রাম ও হুগলী। পর্তুগীজরা তাদের নাম দিয়েছিল, পোর্টগ্রাণ্ডি, পোর্ট পিকুনো। চট্টগ্রামকে যেমন পর্তুগীজরা ছতিগান বলত, অর্থাৎ ছিটাগান থেকে ছতিগান, তেমন সাতগাঁওকে সতিগান।

যে পাশে রূপসীদের দড়ির বাঁধনে ধরে রাখা হয়েছিল সেই দিকে ভীড়টা গিয়ে থমকে দাঁড়াল। রূপসী যারা নয় অথচ যৌবনবতী, তাদের আলাদা একটি দল। আর যারা রূপসী, যাদের উপস্থিতিতে সেই ঘাস ওঠা নেড়া মাঠ আলোয় ভরে আছে, তাদের একটি দল ভাগে ভাগে ক্রেতার আসার অপেক্ষায় ছিল।

রাতের সেই পাহারাদার পর্তুগীজ যুবকটি, সে তখনও যেন কেমন চোখ করে তাকিয়ে ছিল ঐ রূপের হাটে।

রূপসী মেয়েরা ক্লান্ত, অবসন্ন, বাসী ফুলের মত ম্লান, তবু যেন তাদের শরীর ঘিরে কি? ক্রেতা লুব্ধ চোখে তাকিয়েছিল। কেউ থলির রেস্ত গুণছে। রেস্ত কুলোলে তুলে নিয়ে যাবে একটিকে।

তারপর, তারপর আর ভাবনা নয়।

আর যারা শুধু যুবতী মেয়ে কিনতে এসেছে, হয়ত বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ধান

ভাঙানোর কাজ করাবে, দরকার হলে কখনও কখনও সেবাদাসীও করতে পারবে, তাদের শুধু গড়ন, আর তার মধ্যে একটু রূপের তারতম্য খুঁজছে। কারো মুখটা ভাল, শরীরটা বড় পলকা, কারো শরীরটা নিটোল, মুখটি ভাল নয়। নাকটি কেমন যেন।

পর্তুগীজ বণিক সর্দার চাবুক হাতে, ভুঁড়ি থেকে প্যান্টটা তুলে এঁটে, চাবুক ঘুরিয়ে চিৎকার দিচ্ছে—তাজা মেওয়া, আসলি জহর, বারো থেকে ত্রিশ বছরের আওরত।

হাসছে ক্রেতা। ওটার কত দাম?

বিশ, বাইশ, ত্রিশ, পঞ্চাশ।

দিগো রিবেলী এসে দাঁড়াল সেই রূপের হাটে। মুখে একটি খড়ের ডগা। চিবুচ্ছে যেন চুইনগামের মত।

সে চোখ তুলে হাসছে। পরখ করছে রূপসীগুলোকে। এক, দুই, তিন···না, না। সবাই রূপসী কিন্তু সবাইকে যেন পছন্দ হয় না। এক পলকে দেখলে যাকে মনে ধরা যায় তাকে যেন খুঁজছে দিগো রিবেলী। হঠাৎ সেই রাতের মেয়েটির কাছে এসে দৃষ্টি তার থমকে দাঁড়াল।

পাহারাদার পর্তুগীজ যুবকটিও তাকিয়েছিল। তার চোখে যেন কি এক মন হারানো নেশা। টুপিটা আরও কপালের নিচে নামিয়ে দিয়েছে। দৃষ্টিতে লোভের ইসারা।

এরই মধ্যে অন্য এক ক্রেতার মেয়েটি পছন্দ হয়ে গেল। সে বণিক সর্দারের সঙ্গে দাম নিয়ে দর করতে লাগল।

কিন্তু দিগো রিবেলী গিয়ে সর্দারের সামনে দাঁড়াল।

আমি আরও দশ টাকা বেশী দেবো।

ক্রেতা, ভ্রূকুঞ্চিত করল।

আমিও দেব আরও বিশ টাকা।

দিগো রিবেলীও দর বাড়াল।

বাড়তে বাড়তে কেমন যেন রেষারেষির মধ্যে গিয়ে পড়ল। কেমন যেন একটা নেশার মত। দিগো রিবেলী এই নেশায় অভ্যস্ত। বহু যুবতী রূপসীকে সে এমনি ভাবে কিনেছে। তার পছন্দের ওপর কারও হাত পড়লে সে কখনও ছেড়ে দেয় না।

এবারের ক্রেতা ছিল দক্ষিণ বাংলার এক অবস্থাপন্ন অধিবাসী কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত দিগো রিবেলীর সঙ্গে পারল না।

তবু দুজনের মধ্যে সে এক প্রতিযোগিতা শুরু হল। ভীড় এসে থমকে দাঁড়াল এই দুজনের পাশে। উত্তেজনা ধাপে ধাপে ওপরে উঠতে লাগল।

দক্ষিণ বাংলার অবস্থাপন্ন অধিবাসীরই আস্ফালন বেশী। বয়েসে তরুণ, মেয়েটি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে তারই যেন উত্তেজনা চরম। কপালে ঘাম। চোখেও লোভের ইসারা। সে লাফিয়ে লাফিয়ে দর বাড়িয়ে চলেছে। ভাবছে প্রতিদ্বন্দ্বী তার দরের কাছে পারবে না।

কিন্তু দিগো রিবেলীকে সে জানে না। জানে নিলাম সর্দার। আর পর্তুগীজ অধিবাসীরা।

ভীড়ের মধ্যে অনেকেই এই কৌতুক তারিয়ে তারিয়ে দেখছিল।

কেউ বলল, এতো ঝামেলায় কাজ কি বাপু! মেয়ের তো মরুভূমি হয় নি। কত রূপসী মেয়ে রয়েছে তাদের একটাকে নিলেই হয়।

কিন্তু এমনি রেষারেষিই মাঝে মাঝে লেগে যায়।

দুজনেই একজনকে চায়। আর নিলামদারের দর বেড়ে যায়। নিলাম সর্দার এই চায়। তার দর বাড়ুক। দামের বেশী টাকা আসুক। সেও হাসে খল খলিয়ে।

দিগো রিবেলীর মনে কোন উত্তেজনা নেই। এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন মনে হয় না মেয়েটার জন্যে তার কোন আগ্রহ আছে। অথচ দর বাড়াচ্ছে সেও।

দক্ষিণ বাংলার অধিবাসী গলা চড়িয়ে যখন দর তুলে দিচ্ছে, তখন সময় নিচ্ছে দিগো রিবেলী অনেক।

নিলামদার চেঁচাচ্ছে। পঞ্চাশ এক, পঞ্চাশ দুই।

দিগো রিবেলী তখন মুখ থেকে খড়ের ড়গা বের করে ফেলেছে। সিক্সটি।

তখন নিলামদারের আরও চিৎকার কিন্তু দক্ষিণ বাংলার অধিবাসী তাকে চেঁচাতে দেয় না। সেও বলে ওঠে, আশী।

এইভাবে চলতে চলতে এক সময়ে টাকার অঙ্ক যেন সব মেয়েগুলি কেনবার দামে এসে পৌছোয়।

এদিকে ভীড়ের মধ্যেও উত্তেজনা জাগে।

দাস বাজারে ভীড় এই বাজার চলাকালীন। কিন্তু এদিনের ভীড় যেন এখানেই এসে থমকে দাঁড়ায়।

সবাই সব কাজ ভুলে যায়। ভুলে যায় কি সওদা করতে এসেছিল?

এমনটা তো খুব একটা দেখা যায় না।

এই রেষারেষি। একটা মেয়ের জন্যে এই কাঙালপণা। একজন বুড়ো, একজন তরুণ। তরুণের দাবীই স্বীকার্য কিন্তু ঐ বুড়োটা?

পর্তুগীজ অনেক তরুণ সাহেবও ঘুরছিল কিন্তু তারা দিগো রিবেলীর কাণ্ড দেখে হাসে। তাদের ভাষায় পরস্পরকে বলে, রিবেলী আমাদের জাতের দুর্ণাম করল।

এদিকে দক্ষিণ বাংলার তরুণের পুঁজিতে টান পড়ে। সে আর দর বাড়াতে পারে না। যা বাড়ায় তাও ধীরে ধীরে।

দিগো রিবেলী তা করে না, সে লাফিয়ে লাফিয়ে দর চড়ায়।

এক সময়ে দক্ষিণ বাংলার তরুণ থেমে পড়ে। সে লোভের চোখে বয়স্ক দিগো রিবেলীর মুখের দিকে তাকায়।

দিগো রিবেলী তখন খড়ের ডগা মুখে পুরে দিয়েছে। পুরু ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা।

দক্ষিণ বাংলার তরুণ না পাওয়া মেয়েটির ঢলো ঢলো মুখের দিকে একবার লুব্ধ চোখে তাকিয়ে ক্রুদ্ধভঙ্গীতে ভীড় কাটিয়ে অন্য পথ ধরে।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভীড় থেকে কে যেন বলে ওঠে, বেচারী।

হাসির একটা হল্কা ছুটে ছুটে বেড়ায় ফাঁকা জায়গার চারিদিকে।

এতক্ষণ অন্য মেয়েদেরও বিক্রী বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দিগো রিবেলী নিলাম সর্দারের হাতে গুণে গুণে টাকা দেয়।

মেয়েটি দিগো রিবেলীর সম্পত্তি হয়ে যায়।

মেয়েটিও খুশি। মেয়েটি এতক্ষণ বড় বড় ডাগর চোখ মেলে তার বিক্রী বাণিজ্য দেখছিল। কে জেতে তারও কৌতূহল? তার কারও ওপর কোন আগ্রহ নেই। শুধু বৃদ্ধ দিগো রিবেলীকে দেখে তারও মনের মধ্যে বিস্ময় জাগছিল।

ওদিকে সেই পর্তুগীজ পাহারাদার যুবকটি। কেমন যেন চোখে তাকিয়ে আছে। তাকে নিয়েই এতক্ষণ খেলছিল মেয়েটি।

তারপর দিগো রিবেলীর সম্পত্তি হয়ে গেল। মেয়েটি আর কিছু ভাবে না।

দড়ির বাঁধন থেকে ছাড়া পেয়ে নাচের মত পায়ে ছন্দ তুলে দিগো রিবেলীর পাশে এসে দাঁড়াল।

তারপর সেই পর্তুগীজ পাহারাদার যুবকটির দিকে কটাক্ষ দৃষ্টির সাথে হাসি পাঠিয়ে দিয়ে দিগো রিবেলীকে বলল, সাহেব, তুমি তো বুড়ো, তুমি আমাকে কিনলে কেন? আমাকে নিয়ে কি করবে? মেরীমাতার মত পুজো করবে? এই বলে মেয়েটি পুজো করবার মত জোড় হাত করল। তারপর শরীর দুলিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল।

নিটোল শরীর। তার সঙ্গে স্বর্গীয় রূপ যেন হাজারো জৌলুসের কণা দিয়ে বেঁধে রেখেছে কমনীয় শরীরটা।

দিগো রিবেলী সত্যিই ভাবতে লাগল। তাইতো একে দিয়ে সে কি করবে? এ যে দামাল, দুষ্টু, একটা ক্ষেপা হাতি, কিম্বা নদীর স্রোতের ধাবমান গতি। দিগো রিবেলী খড়ের ডগা চিবুচ্ছিল। হঠাৎ থু থু করে ফেলে দিয়ে, বাঁ হাতের তালুর উলটো পিঠ দিয়ে মুখ মুছল। ন্যাণ্ডো গেঞ্জি পরা ফসা লোমশ শরীর। নীল নীল শিরাগুলি বেরিয়ে পড়েছে! বুকে কটা ঘন লোম। দু'হাতের কবজির ওপর থেকে কনুই পর্যন্ত নানা চিত্রবিচিত্র উল্কির নক্সা। দিগো রিবেলী তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে। সোনা রোদের আলো পড়েছে সোনালী কদম ছাঁট চুলে।

মেয়েটিও তাকিয়েছিল কিন্তু কেমন যেন তার দৃষ্টিতে মাদকতা। সে যে ভয় পাওয়া অন্যান্য মেয়েদের মত, তা নয় বরং খুশি। খুশিতে সে মাঝে মাঝে টেরচা চোখে সেই পর্তুগীজ যুবকটির দিকে তাকাচ্ছিল।

ভীড়ের চাপ আরও বাড়ছে। দর কষাকষির শব্দ ভেসে আসছে।

কান্না বাতাসে ছড়াচ্ছে। আর্ত চিৎকারের প্রতিধ্বনি হঠাৎ আছড়ে পড়ে আবার কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

পর্তুগীজ সর্দারের চাবুকের শব্দ হচ্ছে। সপাং সপাং। মানুষের চামড়া নয় যেন গণ্ডারের চামড়ার বুকে চাবুকের আঘাত পড়ছে। ফুলে ফুলে উঠছে শিশুর কোমল শরীর। লাল চামড়ার বৃদ্ধের শরীর কেটে কেটে রক্ত ঝরছে।

খৃষ্টান পাদরীরা ঘুরছে টাকার থলি নিয়ে। বাতাসে শুধু একটি কথাই ছড়াচ্ছে। খৃষ্টান হবে, খৃষ্টান হবে। খৃষ্টান হলে মুক্তি পাবে।

তবু ধর্মত্যাগ করতে যেন অনেক দ্বিধা। কেউ কেউ আর অত্যাচার সহ্য করতে পারছে না। চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে না, জল শুকিয়ে যেন রক্তকণা নেমে আসছে।

তাই আবার দলে দলে এগিয়ে আসছে ধর্মত্যাগ করতে। দাসত্ব শৃঙ্খল পরে গোলামী করার চেয়েও তো এ ভাল! অন্তত বাঁচার চেয়ে মুক্তি বোধহয় প্রয়োজন। বুক ভরে বাতাস নিতে পারলে বুঝি প্রাণের শান্তি মিলবে।

এই যখন বর্তমানের জীবন, কতকগুলি বিদেশী দস্যুবণিকের হাতে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ, তাই দলে দলে এগিয়ে আসছে খৃষ্টান পাদরীর কাছে।

আর চলছে ক্রীতদাসরা মুক্তির আশায় দূরে একটি বড় গির্জার দিকে। যেটা গতরাত্রে দৃষ্টিগোচর হয়নি।

ব্যাণ্ডেল গির্জা।

লেডি অফ রোজারি। খৃষ্টানদের দেবীমূর্তি। মেরী মাতার পূণ্যস্নিগ্ধ মুখচ্ছবি। মুমূর্ষু মানুষ রক্তাক্ত শরীরে মুক্তির আশায় সেই দিকে চলেছে।

দীর্ঘ গির্জাবাড়ীর সুবিশাল স্তম্ভ। থমকে থেমে তাকিয়ে যেন নিঃশব্দে মানুষকে ডাকছে। এসো, এসো, এর মধ্যে আছে মুক্তি।

ভাগীরথীর জলে পণ্যবাহী জাহাজ চলেছে। চলেছে ক্রীতদাস মানুষের মিছিল নিয়ে আর এক দস্যু। এ বাজার থেকে ক্রীতদাস কিনে অন্য বাজারে বিক্রী করবে বলে তুলে নিয়েছে নৌকো ভরে।

কে যেন কুঁই কুঁই করে কেঁদে উঠল। কাঁদছে অনেকেই। মেয়েলী কান্নার মিঠেল স্বর গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। কেউ আবার না কেঁদে কেশর ফুলিয়ে এগিয়ে আসছে। চোখে আগুন জেলে সর্দারের দিকে চাইছে। তারপর কাসর ভাঙা কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠছে।

তুমি কেন আমাকে বেচবে? দস্যু কোথাকার, পাজি, ছুঁচো ফিরিঙ্গী!

বিচিত্র শব্দে যে ঘোমটার মধ্যে থেকে কাঁদছিল, দিগো রিবেলীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা চঞ্চল মেয়েটি তাকে দেখে খিল খিল করে হেসে উঠল।

অদ্ভুত সেই মেয়েটির ঘোমটা ঢাকা মুখটি। সদ্য বিবাহিতা কচি বয়সের ডাগর শরীরটি। হয়ত ফুলশয্যা হবার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দস্যুরা গ্রামে। কিম্বা এক রাতের পর সে জেনেছে নরনারীর কামনা-বাসনা।

দিগো রিবেলীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির মনে পড়ল। ঐ বধূটি যে দস্যু জাহাজে ছিল, সেও ভাগ্যচক্রে সেখানেই স্থান পেয়েছিল।

একটি পর্তুগীজ দস্যু লালসার চোখে কচি মেয়েটির ঘোমটা ধরে টেনেছিল। কিন্তু

পারেনি সে তার ঘোম্‌টা খুলতে। ঘোম্‌টা না খুলতে পেরে ধস্তাধস্তির মধ্যেও পর্তুগীজটা তার ঘোম্‌টার ওপর বার বার চুম্বন এঁকেছিল।

গত রাত্রেও ঐ মেয়েটিকে ঘোম্‌টা খুলতে বলেছিল সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যান্য মেয়েরা। কিন্তু সে খোলেনি।

রাগ করে অন্যান্য মেয়েরা ব্যঙ্গ করে বলেছিল—আহা লজ্জাবতী লতা যেন! এদিকে পাছার কাপড় সরে যাচ্ছে, ঘোম্‌টা টানছে।

সেই মেয়েটিকেই একটি পর্তুগীজ সওদা করতে চাইল।

চাওড়া লাল পেড়ে কাপড় পরে আছে। ঠিক একটি গ্রাম্যবধূর ছোট্ট চেহারা। অল্প বয়সের বিবাহিতা। কলসি কাঁখে পুকুর ঘাটে পাঠিয়ে দিলেই হয়।

তা সেই পর্তুগীজ খদ্দের ঘোম্‌টা খুলতে বললো।

বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে বেশ ছোটখাট মানুষটি। মুখখানি নিশ্চয় সুন্দর ও কচি ডাগর মেয়ে। এই ভেবে পর্তুগীজ খদ্দের ঝুঁকেছে। তা সেই পর্তুগীজ খদ্দের নিজেই এগিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে মেয়েটির ঘোম্‌টা খুলতে চাইল।

কিন্তু মেয়েটি ঘোম্‌টা না খুলে সরে দাঁড়িয়ে বিচিত্র শব্দে ঘোম্‌টার মধ্যে কাঁদতে লাগল।

দস্যু সর্দার হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

অ্যাই, অ্যাই, ঘোম্‌টা খুলবে, না জোর করে খুলে দেব?

দিগো রিবেলী তার কেনা মেয়েটির দিকে তাকাল। রোদ বাড়ছে। মেয়েটাকে আলভার হাতে সঁপে দিয়ে একবার লবণের গোলায় যেতে হবে। সেখানে একটি নেটিভ ক্রীতদাসকে শায়েস্তা করতে হবে। বড্ড গোলমাল বাঁধিয়েছে।

মেয়েটি হঠাৎ বলল, আমাকে খৃষ্টান করবে তো?

দিগো রিবেলী তার দিকে বিস্ময়ে তাকাল। খৃষ্টান হবে?

হ্যাঁ, আমার খৃষ্টান হতে বড় সাধ!

রিবেলী বুঝতে পারল না মেয়েটির কথার অর্থ। জোর করে খৃষ্টান করবার জন্যে কত মেহনত করতে হয়, আর এ বলে কি? মেয়েটির যেন সবই বিচিত্র।

হঠাৎ তার চোখ গেল রৌদ্রে ঝলমল লম্বা কামিজের দিকে। কেমন যেন জরি বসানো। সাচ্চার কাজ করা, খুব দামী। সন্দেহ হল, তবে কি এ কোন আমীর ওমরাহের ঘর থেকে ছিনিয়ে আনা আওরত! দিগো রিবেলী সন্দিগ্ধ হয়েই জিজ্ঞেস করল, তোমার ঘর কোথায় ছিল? তুমি কে? তোমার পরিচয় কি?

কথার ধরণে মেয়েটি চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে হেসে বলল, অতো জিজ্ঞাসায় দরকার কি সাহেব? তুমি কিনেছ, এখন আমি তোমার। তাড়াতাড়ি তোমার ঘরে নিয়ে যাবে কিনা বলো, নাহলে আর আমি রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়তে পারি না। এই বলে মেয়েটি মাটিতে বসে পড়তে চাইল।

দিগো রিবেলী তাড়াতাড়ি তার নরম হাতটি চেপে ধরল। বলল, অন্তত তোমার নামটাও তো বলবে? কি বলে ডাকবো?

মেয়েটি এবার দিগো রিবেলীর হাতের মধ্যে তার হাতটি সঁপে দিয়ে মুখ ভরিয়ে হাসল। তারপর বলল, হ্যাঁ, একটা নাম আমার আছে। সেটা ভুলতে পারিনি। তবে তুমি তো সাহেব আরেকটা নাম দিতে পার।

না, তোমার সেই নামটা বল। এদেশের মেয়েদের নামগুলো বড় মিষ্টি।

মেয়েটি আবার চপল কণ্ঠে খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, এ দেশের মেয়ের নামই শুধু মিষ্টি সাহেব, আর কিছু নয়?

দিগো রিবেলী হতবুদ্ধি হল। শিরার মধ্যে যেন জমে যাওয়া রক্তটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল, তারপর বলল, চলো চলো ঘরে গিয়েই কথা হবে। লোকগুলো যেন তোমার দিকে কেমন চোখ করে তাকিয়ে আছে।

লোক তাকিয়েছিল। একটি বয়স্ক লোকের সঙ্গে ভরা যৌবনের একটি মেয়ে। কারও কারও মনে লোভের ইসারা জাগছিল। এমন চোখে লাগার মত ভরাট যৌবন যেন বড় একটা দেখা যায় না।

মেয়েটিও দেখছিল। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে অন্য ভাবের খেলা।

হঠাৎ বলল—হ্যাঁ তাই চলো। মেয়েটি আর জোরে হাসল না। মুচকি হাসি ঠোঁটের প্রান্তে ঝুলিয়ে দিগো রিবেলীর হাতটা চেপে ধরে চলতে লাগল।

বাতাস ভারী হয়ে উঠল। রোদের তেজ গিয়ে জমছে দুর্গের মাথার ওপর। দুর্গের মাথার গম্বুজে উড়ছে পর্তুগীজ রাজার নিশানা। দলে দলে লোক চলেছে মুক্তির আনন্দে ব্যাণ্ডেল গির্জার দিকে। নারকেল গাছের ঢ্যাঙা মাথার ওপর লম্বা, লম্বা পাতার ফাঁকে শকুন বসে তাক করে আছে।

সেই পর্তুগীজ যুবকটি দিগো রিবেলীর পিছু পিছু ক'পা গেল।

তার দিকে তাকিয়ে চপল মেয়েটি জিব ভেঙাল।

যুবকটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর এগোল না।

দিগো রিবেলী চলে গেল মেয়েটিকে নিয়ে।

দিগো রিবেলী আবার জিজ্ঞাসা করল তোমার নাম কি?

মেয়েটি যেতে যেতে বলল—আমার নাম হীরা।

দিগো রিবেলী তাকিয়ে বলল, তুমি হিন্দু?

হীরা মাথা নাড়ল।

কিন্তু হিন্দুমেয়ে মুসলমানের পোষাক পরেছে কেন রিবেলী বুঝতে পারল না।

দাস বাজার তখন পূর্ণোদ্যমে চলেছে। বহু সওদা বিক্রী হয়ে গেছে, আরও হচ্ছে। যা পড়ে আছে তাও বোধহয় থাকবে না।

আজকের বাজারটাই কেমন ভাল ছিল। খদ্দেরও এসেছিল মন্দ নয়। এক

একদিন এমনি হয়। বণিকদের আর লালটুপি ঘুরিয়ে চাবুক চালাতে হয় না। যেন ভেড়ার চেয়েও এই মানুষেরা বেয়াদপ। এক একজন কত ভাল, কত শান্ত, শুধু তারা কাঁদে। তা কাঁদুকগে, কান্নার জন্যে তো অসুবিধে হয় না কিন্তু এক একজন এমন যে বনের হিংস্র পশুর মত। কিছুতে পোষ মানতে চায় না। এক এক সময় পিস্তল তুলে গুলি ছুঁড়ে দিতে হয়। লটকে পড়ে বেয়াদপরা। তাতে লোকসান হয় বেশী। মরা মানুষ তো কেউ কেনে না। মরা মানুষ শকুনের মজা হয় খাওয়ার জন্যে। তবে মারতে কোন বণিকই চায় না। মরে যাক্ এমন অত্যাচার করার চেয়ে মেরে মেরে শায়েস্তা করায় লাভ বেশী।

মেয়েরাই যেন জ্বালায় আরও বেশী।

এক একটি মেয়ে যেন লঙ্কার মত। যুবতী মেয়েদের নিয়ে অতো ভাবতে হয় না। তাদের এক আশা। তাছাড়া এদেশে মেয়েদের লজ্জাই চরম। ভাবতে হয় বেশী বয়সের গিন্নী ধরনের বয়স্কাদের নিয়ে। সংসারে হাবুডুবু খাওয়া কাতরে ওঠা অভিজ্ঞা গিন্নী। জাহাজে উঠেই রুখে দাঁড়াল, আর তেমনি মুখরা।

বিখ্যাত জলদস্যু পর্তুগীজ হার্মাদ পেড্রো রোদে পুড়তে পুড়তে সেই কথা ভাবছিল। বাংলাটা এখনও রপ্ত হয়নি। তাছাড়া এই বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা যেন কেমন? কেমন যেন শুনে কিছু বোঝা যায় না। সব ইঙ্গিতে সারতে হয়।

দেশের মাটি ছেড়েছে সাত বছর। দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে প্রথম ল্যাণ্ড করেছিল। তারপর এই চলেছে দিনের পর দিন। শুধু মানুষ ধরা। জাহাজ নিয়ে জলে জলে ঘোরা। ওৎ পেতে থাকা নদীর পাশাপাশি গ্রামের দিকে। তাল বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়া নিরীহ গ্রামের ওপর আগুন জ্বালিয়ে দিলে বেশ থ্রিল লাগে। মানুষের চিৎকার, কান্না। সে এক বীভৎস কাণ্ড। অ্যাডভেঞ্চারও হয়।

নিশুতি গ্রাম। চলতে চলতে নৌকো ভিড়িয়ে দলবল নিয়ে চুপিসারে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়া।

প্রথম প্রথম খুব ভয় করত। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শুকনো আম পাতা মাড়িয়ে সাপের গা ডিঙিয়ে, জ্যোৎস্নার আলোয় ভাসতে ভাসতে, জোনাকির আলো দেখতে দেখতে, ঝিঁ ঝিঁ পোকার গান শুনতে শুনতে; একবার একটি শিয়ালের অদ্ভুত ডাক শুনে পেড্রো চমকে উঠেছিল।

তখন সে এদেশে নতুন। ভাল করে এদেশের সঙ্গে পরিচয় হয়নি। শিশুর চোখের মত কৌতূহলী দৃষ্টি। সে সময়ের একটি স্মৃতি আজও মনে আছে। গ্রামের মধ্যে তখন ঢুকে পড়েছে।

সেদিনও নিশুতি রাত। একটি বিয়ে বাড়ীর সামনে গিয়ে তারা দাঁড়ায়। তখনও কিছু পেট্রোমাক্সের আলো সেই বিয়ে বাড়ীর দালানে জ্বলছিল। তবে মানুষ খুব একটা জেগে ছিল না।

এঁটো কলাপাতা পড়ে আছে বাড়ীর সামনে আগাছা জঙ্গলে। ক'টি কুকুর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে পাতাগুলো টেনে টেনে বের করছে।

পেড্রোর পেছনে তার দলবল। দলবল তৈরী। সঙ্গে বিবিধ আগ্নেয়াস্ত্র, আগুন জ্বালাবার জ্বালানী। বাঁধবার জন্যে দড়ি। আঘাত করবার জন্যে ছোরা, ভোজালি, সরুমুখের তরোয়াল।

একবার আদেশ পেলেই ঘুমন্ত গ্রাম লাফিয়ে উঠবে।

কিন্তু পেড্রো আদেশ না দিয়ে হঠাৎ উঠে গেল একটি গাছ বেয়ে সেই বাড়ীর দোতলায়। আজও মনে আছে সে দৃশ্য পেড্রোর।

বোধহয় সেদিন কারও ফুলশয্যার রাত্রি ছিল।

নর-নারীর মিলনের মাঝে খুলে যাচ্ছে নতুন এক জীবন রহস্যের দ্বার।

পেড্রো একটি ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরেছিল কিন্তু চোখ গলিয়ে দিয়ে আর চোখ রাখতে পারেনি। তারপর কি যে তার হল, নারীর সান্নিধ্য কখনও সে পায়নি, নারী পুরুষের কি কাজে লাগে তাও তার জানা ছিল না। যা জানা ছিল তা অনুমান। হঠাৎ দারুণ রাগে নিচের দিকে তাকিয়ে দলবলকে সঙ্কেতের স্বরে আদেশ জানাল।

তারপর মার মার শব্দ। আগুন ধরল। ঘর বাড়ী জ্বালান হল। বাধাদানকারীর রক্তে হাত রাঙা হল।

সেই নব দম্পতির স্বামীটিকে পেড্রো নিজের হাতে বধ করল। বধ করার সময়ে যেন কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে বধ করছে এমনি আক্রোশে ফুলল। আর মেয়েটাকে বুকের মধ্যে তুলে নিয়ে, যেমন করে তার স্বামী বুকে তুলে নিয়ে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিয়েছিল তেমনি করে নৌকোর মধ্যে নিয়ে চুম্বন করল।

না, সেও পরদিন এই হুগলীর দাসবাজারে বিক্রি হয়ে গেল। রাতের স্বপ্ন দিনে আর থাকেনি।

তাছাড়া মেয়ে নিয়ে করবে কি পেড্রো? দস্যুবৃত্তি করাই যাদের পেশা, ঘর বাঁধবে কোথায়? তবু যেন এদেশের মেয়েগুলোকে কেমন যেন ইচ্ছে করে বুকের মধ্যে ধরে রাখতে। নৃশংস প্রকৃতির অত্যাচারী পেড্রোও একথা ভাবছিল। তার মত ভয়ঙ্কর, মায়া দয়াহীন, যে হাসতে হাসতে খুন করে, কথায় কথায় চাবুক চালায়, যার মত কেউ নেই এই দস্যুবণিকদের মধ্যে, সেও এই কথা ভাবছিল। হঠাৎ পেড্রো চঞ্চল হয়ে উঠল, হাতের চাবুক ঘুরিয়ে চিৎকার করে খদ্দের ডাকতে লাগল।

হট্টগোল সেই আগের মত সরব।

হঠাৎ সেই ভীড়ের মধ্যেই কাদের যেন এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তাদের জুতোর শব্দে ধুলো উড়ল।

বন্দুকের কালো কালো গোলাকার নলগুলি দেখে ভীড় দু'পাশে সিঁথির মত ভাগ হয়ে যেতে লাগল।

বাজারের মধ্যে এসে দাঁড়াল দুর্গাধ্যক্ষ পর্তুগীজ সেনাপতি ডি মিলো।

জন ডি মিলো।

বয়স্ক নয়, তরুণ সেনাধ্যক্ষ কিন্তু মুখের ওপর বয়স্ক মানুষের ছাপ। গম্ভীর, রাশভারী। চলার ভঙ্গিতে অধিনায়কের পদক্ষেপ।

নিলামদারের উচ্চকিত ডাক থেমে গেল। নেটিভ মহাজনরা পা পা করে সরে দাঁড়াল।

ডি মিলোর মুখে চিন্তার ছায়া। তখনও যে ক'টি যুবতী মেয়ে দড়ির গিঁটে ধরা ছিল তাদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। কিন্তু মুখগুলো দেখে কিছু ঠিক করতে পারল না। হঠাৎ পেড্রোকে ডেকে ডি মিলো একপাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল—তুমি বলতে পার দিল্লীর সম্রাটের দুজন ক্রীতদাসী এখানে এসেছে? তারা এখন কোথায়?

একই জাত ভাই। একই স্বার্থকে কামাল করতে এদেশে এসেছে। কেউ দস্যুবৃত্তি নিয়ে মানুষ ধরে বেড়াচ্ছে, কেউ সৈন্য সেজে এদেশে পর্তুগালের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু দুজনের উদ্দেশ্য এক। তবুও মনের তফাৎ। স্বভাবের তফাৎ হলেও দেশের জন্যে, জাতির জন্যে একই কথা না ভেবে পারে না।

ডি মিলোর দু'পাশে সঙ্গীনধারী রক্ষী। তারা সতর্ক প্রহরায় কটমটে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাত্র একটি আদেশের জন্য। তারা আদেশ পালনকারী ভৃত্য। আদেশ ছাড়া এক পাও চলতে পারে না। একটি আদেশ পেলে গুলি ছুঁড়ে বাজারের সমস্ত হট্টগোল স্তব্ধ করে দিতে পারে।

দস্যুসর্দারদেরও এই দুর্গাধ্যক্ষের আদেশ মানতে হয়। একবার কি এক কারণে ডি মিলো এই দাসবাজারে দস্যুবণিকদের ওপর হামলা চালিয়েছিল।

একজন নিহতও হয়েছিল রক্ষীর হাতে।

দস্যুবণিকরা জানে, পর্তুগীজ সরকারের সব হুকুম এই সব দুর্গাধ্যক্ষদের হাতে আছে। আইন, শৃঙ্খলা বাঁচাবার জন্যে দুর্গাধ্যক্ষদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

মূর্খ দস্যুবণিক জানে না আইন শৃঙ্খলার কিছু। তাই তারা সরকারের প্রতিনিধিদের ভয় করে।

সঙ্গে মারাত্মক ধরণের অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও তারা হাত পা গুটিয়ে থাকে।

পেড্রোর মত অন্যান্য পর্তুগীজ সর্দারের কাছেও অনেক মারণাস্ত্র ছিল।

তবু পেড্রো ডি মিলোর কথায় চিন্তিত হল। বলল—বলতে পারছি না তো ক্যাপ্টেন।

ব্যাপারটা খুবই জটিল। ডি মিলো পদমর্যাদা থেকে নেমে এসে অন্তরঙ্গ

হয়ে উঠল। খবর এখনও আমার কাছে আসেনি। তবে মুর কমাণ্ডার কাশিম খান জুয়িনীর কাছে এসেছে। আমার গুপ্তচর খবরটা তুলে এনেছে।

তারপর ডি মিলো বলল—ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে আঁচ করতে পারছ? একটু অসাবধানতায় পর্তুগালের অধিকার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।

হঠাৎ ডি মিলো পদস্থ মর্যাদায় চিৎকার দিয়ে উঠল, ঠিক আছে বাজার শেষ হলে সর্দাররা আমার অফিসে চলে আসবে। একসঙ্গে বসে ব্যাপারটা কতদূর কি, আদৌ এটা সম্রাটের রাজনৈতিক চাল কিনা ভেবে দেখতে হবে।

ডি মিলো হুগলী দুর্গের সেনাধ্যক্ষ হলেও সে যেন ভারতে সকল পর্তুগীজদের মতই একজন। তাছাড়া ভারতের মাটিতে সব পর্তুগীজদের যা উদ্দেশ্য তার তো তার চেয়ে বেশী নয়। তাই সেনাপতি হয়েও কমাণ্ডিং বক্তৃতা দিল না, অন্তরঙ্গ হয়ে মিতালী চাইল। এরকম ঘটনা তো আর ঘটেনি! তাই তার কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। সে আবার তার রক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে দূর্গের মধ্যে ঢুকে গেল।

দাসবাজার আবার প্রাণ পেয়ে সচল হয়ে উঠল।

●

● ●

সন্ধ্যের সময়। বিলিতী নক্সাকাটা দেয়াল গিরির সামনে বসে সেনাপতি ডি মিলো। এটি একটি মিটিংকক্ষ। কক্ষটি বেশ লম্বা।

একটি জাম রঙের চকচকে লম্বা মেহগনি টেবিলের সামনে কজন লোক। সকলেই পর্তুগীজ। তার মধ্যে দস্যুবণিক পেড্রো ও স্বাধীন ব্যবসাদার দিগো রিবেলীকে দেখা যাচ্ছে।

ছায়া ছায়া অন্ধকারটা ছড়িয়ে আছে লম্বা হলঘরটায়। দেওয়ালের বিভিন্ন অংশে পর্তুগাল রাজাদের প্রতিকৃতি। ভারতে প্রথম পর্তুগীজ আগমনকারী ভাস্কো ডা গামা, রাজপ্রতিনিধি আলমিদা ও আলবুকার্কের ছবি। তাছাড়া আছে আংটায় ঝোলানো বিভিন্ন ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র। নানা ধরণের বন্দুক, হয়ত তা গুলি ভরা, নানাধরণের ছোরা, ভোজালি, রামদা। চকচক করছে আলো অন্ধকারে।

হলঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। বাইরের দরজায় প্রহরী বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। তার চলার ভারী জুতোর শব্দ নিস্তব্ধ হলঘরে ছুটে আসছে।

অনেক সৈনিক আছে এ দূর্গে। আর তারা সব সৈন্যবিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত। এসেছে পর্তুগীজদের দেশ থেকে। বাইরের অনেকেই জানে না এ সংবাদ। তবে এখানকার পর্তুগীজ অধিবাসীরা তা জানে। কেন এনে রাখা হয়েছে তাও তাদের অজানা নয়।

তবু ডি মিলো একটু গোপনতার আশ্রয় নিয়েছে। এ দেশের কোন লোককেই জানতে দেয়নি তার এই গোপন আয়োজন। তাই দূর্গ মধ্যে ঢোকার কড়াকড়ি আছে।

ব্যবসা করার অধিকার তারা পেয়েছে। আকবর, জাহাঙ্গীরের ফরমানই তার প্রমাণ কিন্তু কোন স্বাধীন রাজ্য গঠন করার অধিকার তাদের নেই।

সব হুকুম কি সবার কাছ থেকে নিতে হয়? নিতে গেলে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে হয়। বিশ্বস্ততা দেখাতে গেলে এদেশে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। অথচ এদেশে অধিকার প্রতিষ্ঠার বাসনাই তাদের আছে।

সেই অধিকারটাই সবার আগে দরকার। এ দেশের মানুষদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদেরই জায়গায় রাজা হয়ে বসতে হবে।

অন্যান্য বিদেশীরাও ভারতে এসেছে। ওলন্দাজরা এসে গেছে। ডাচ ও ফরাসীরাও আসতে শুরু করেছে।

ইংলণ্ড অধিবাসীরা মাঝে-মাঝে জলে জাহাজ ভাসিয়ে এশিয়া মহাদেশের দিকে এগিয়ে আসছে, তারপর কোথায় যেন সরে পড়ছে।

সপ্তগ্রামে কোন দুর্গ তৈরী করেনি পর্তুগীজ। করেছে হুগলীতে। এখন কাচা কাঠের দুর্গ আছে, ভেতরের বাড়ীগুলি শুধু ইঁটের। পরে দুর্গ পাকা করার ইচ্ছে আছে।

তারপর অস্ত্রাগারে জমছে প্রায়ই নানা ধরণের অস্ত্র। জাহাজ আসে বিদেশ থেকে নানাবিধ বিদেশী পণ্য নিয়ে কিন্তু আসলে জাহাজের খোলের মধ্যে থাকে লুকানো অস্ত্র-শস্ত্র। সে অস্ত্রের কিছু পরিবেশনও করা হয় পর্তুগীজ দস্যুবণিকদের। বণিকরা স্বাধীন ব্যবসা করে বটে কিন্তু সে জানে এ দেশের লোক। আসলে দস্যুবণিকরাও দেশের স্বার্থে এই সব করে। তাদের প্রতি নির্দেশ আছে এই সব করে পর্তুগীজদের দল ভারী করতে হবে। তাই দস্যুবণিকরা এক একজন ভয়ঙ্কর প্রকৃতির। এক একজন দস্যুবণিক যেন নরখাদক, হিংস্র বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

বাংলাদেশ তথা ভারতের অনেক স্থানের লোকেরা এই পর্তুগীজ জলদস্যুদের ভয়ে অতিষ্ঠ। স্বাভাবিক জীবন বলে যেন কিছু নেই। নদী দিয়ে পর্তুগীজ জাহাজ ঘোরাফেরা করতে দেখলেই তারা প্রাণের আশা ছেড়ে দেয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার চাপ বেঁধে দুর্গ মধ্যে ঘন হয়ে ছিল।

সৈন্যদের বাসকক্ষ থেকে ছুটে আসছে কিছু চাপা হট্টগোল।

সে হট্টগোল আনন্দের, খুশির। কোন ভয় বা সংশয় নেই তাদের মধ্যে। এ দেশটাও তাদের হয়ে গেছে এমনি তাদের মনের গতি।

ডি মিলো চিন্তিতকণ্ঠে বলল, খবরটা আমাকে গুপ্তচর রসুল আলি দিতেই চিন্তিত হয়ে পড়েছি। খবর যদি সত্যি হয়, তাহলে বিপদটা কতদূর গড়াতে পারে আশাকরি সকলেই আন্দাজ করবে! বাংলাদেশে পর্তুগীজ অধিকার এই হুগলীতে বেশ বিস্তার লাভ করেছে, হয়ত একদিন মুরদের অধিকার বাংলাদেশ থেকে তুলে দেওয়া যেতে পারে।

রসুল আলির দিকে উপস্থিত সকলে তাকাল। রসুল আলি মুঘলদের সৈন্য-বাহিনীর লোক। বাংলাদেশের সুবেদারের বাহিনীতে থেকে এদের গুপ্তচরের কাজ

করে। বিনিময়ে নতুন এক সুযোগের শপথ পর্তুগীজেরা করেছে। অবশ্য প্রতিটি মূল্যবান খবরের জন্যে নগদ বিদায় দেওয়া হয়।

আজকের খবরটা এত চরম যে ডি মিলো তা শুনে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় দিতে পারে নি। অবশ্য এই থাকার জন্যে হয়ত সুবেদার জেনে নেবে তার আসল পরিচয়। সেই কথা ভেবেই রসুল আলি ছটফট করছিল। এক সময়ে বলল, সাহেব, আমাকে ছেড়ে দিন। জানাজানি হয়ে গেলে আমার প্রাণ যাবার সম্ভাবনা।

কেউ তার কথায় কান দিল না।

বসেছিল কয়েকজন জংলী ধরণের দস্যুসর্দার। কারো এক মুখ দাঁড়ি, তেল তেলে মুখ। চোখ দুটো ভয়ঙ্কর ভাবে জ্বলছে। কেউ মুখখানি সেই অল্প আলোয় ধরে আরও ভয়ঙ্কর করতে চাইছে। কিন্তু সবার মুখেই উদ্বেগের ছায়া।

পেড্রোও তাদের মধ্যে ছিল। সে হঠাৎ ফেডরিক বলে এক চোখ কাণা একটি লোকের দিকে তাকিয়ে বলল—এই, তুমি তো ওপথ দিয়ে জাহাজ নিয়ে আসো, সম্রাটের কোন ক্রীতদাসীদের জাহাজে তুলেছ কি না মনে করতে পারো না ?

ফেডরিক এক চোখ হারায় এই দস্যুতা করেই। তাছাড়া তার একটি বদনাম আছে, সুন্দরী যুবতী পেলেই সে একবার ভোগ করে নিয়ে তবে বাজারে দেয়। ঐ চোখটায় একটি মেয়েই অতর্কিতে ছুরি বসিয়ে চিরতরে নষ্ট করে দিয়েছে। ফেডরিক সেই আক্রোশে আজও প্রতিশোধ নিয়ে চলেছে।

তার সঙ্গীরা তাকে কত নিষেধ করে। এদেশের লোককে চেনো না। এরা নারীদের মায়ের সঙ্গে তুলনা করে। তুমি কোনদিন বিপদে পড়বে।

ফেডরিক হাসে।

আজও সে তেমনি ভাবে হাসল, তারপর বলল, অতো-শতো কি মনে আছে ?

মনে কর। বিপদ সবার। সম্রাট যদি এই হেতু দেখিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমরা কিছুই করতে পারব না।

কিন্তু ফেডরিক সে কথায় কোন আমল দিল না। কানা চোখে মুখখানা আরও রসিকতার মত করে বলল, সেনাপতি যত ভয় করছেন, তত ভয়ের কিছু নেই।

নেই ? জন ডি মিলো কেমন যেন কৌতুক চোখে ফেডরিকের দিকে চাইল।

হুগলীর আর একজন কুঠিয়াল বারেটো। সে বলল, না, না ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। জাহাঙ্গীরের আমলে এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল। আমাদের জলপথের লোকেরা সম্রাটের একটি বহুলক্ষ টাকার পণ্যবাহী জাহাজ লুঠ করেছিল। তারা ভেবে পায়নি তার পরিণতি এত সাংঘাতিক হবে।

সম্রাট জাহাঙ্গীর সুরাটের শাসককে আদেশ দিলেন, মুঘল সৈন্য দিয়ে যেন পর্তুগীজদের ভারত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

অথচ এই বাদশাহ জাহাঙ্গীর আকবরের মতই পর্তুগীজদের ওপর বন্ধু ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি কোনদিনই পর্তুগীজদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নি। কিন্তু গোল বাধাল ঐ জাহাজ লুঠ। তখন আর করবার কিছু ছিল না। অনেক অনুনয়

বিনয় করেও লোক গিয়েছিল বাদশাহের কাছে। কিন্তু বাদশাহ তখন অসন্তুষ্ট। তিনি কোন কথাই কানে নিলেন না। যুদ্ধের দামাদা বেজে উঠল। জলপথে যুদ্ধ লাগল।

সুশিক্ষিত শাহী ফৌজ, জলপথের যুদ্ধেও পর্তুগীজরা পারল না। তারপর পরাজিত অধিবাসীদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়েছিল সে ঘটনাও বেশী দিনের কথা নয়। এখন ১৬৩১ সাল, ঘটনাটা ঘটেছিল ১৩১০ সালে।

বহু পর্তুগীজ অধিবাসী তখন ভারতের চতুর্দিকে আজকের মত বসতি স্থাপন করেছে। তাদের ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া হল আগ্রার রাজপ্রাসাদে। কয়েদ করা হল, অনাহারে রাখা হল বহু লোককে হাতির নিচে ফেলে দেওয়া হল। আগ্রা, লাহোরের গির্জা বন্ধ হয়ে গেল।

বারেটো বলল, তখন আমি এদেশে প্রথম একটি দক্ষিণ ভারতের মেয়ে বিয়ে করেছি। মেয়েটিকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল। আর আমাকে যেতে হল লাহোর জেলে। তারপর কর্জন জেস্থইট ফাদার গিয়ে জাহাঙ্গীরকে বোঝাল, তারপর মিটমাট হল।

বারোটা আবার বলল, তবে জাহাঙ্গীর এক ধরণের লোক ছিলেন কিন্তু পুত্র শাহজাহান সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। সে সিংহাসন পেয়েছে কতকগুলো ভাইকে হত্যা করে। একবার চিন্তা কর—সে যে কোন ওজর আপত্তি শুনবে না তা বোঝা যায়।

রসুল আলি বলল, সাহেব ঠিক বলেছেন। তাছাড়া সম্রাট, সম্রাজ্ঞী মমতাজের অনুরোধে এই আদেশ পাঠিয়েছেন। তাঁর হারেমমহল থেকে ক্রীতদাসী সরে পড়েছে বলে সম্রাজ্ঞী মমতাজ অসম্মানিত হয়েছেন।

ডি মিলো বলল, কিন্তু সেই দুজন ক্রীতদাসী পর্তুগীজরা ফুঁসলিয়ে নিয়ে গেছে, এ কথাই বা সম্রাট ভাবলেন কেমন করে?

রসুল আলি হেসে বলল, মুঘলরা আজ ভারতে রাজত্ব করছে কম দিন নয়, এ খবর তাদের যোগাড় করতে কি খুব অসুবিধে হয়?

কিন্তু এ খবর তাদের তো সত্যি নয়! আমরা তাঁর ক্রীতদাসী চুরি করিনি।

রসুল আলি উঠে দাঁড়াল, বলল, এবার আমায় বিদায় দিন সাহেব। সুবেদার কাশিম খান জুয়িনীর ফরমান দু'একদিনের মধ্যে এসে পড়বে, তখন এর জবাব দেবেন।

সকলেই তারপর উঠে পড়ল।

দস্যুবণিকরা একসঙ্গে বেরিয়ে গেল। বারোটা ও দিগো রিবেলী বেরিয়ে এল। আরও কজন সম্ভ্রান্ত পর্তুগীজ বাসিন্দা এসেছিল, তারাও অন্ধকারে পথ চলতে লাগল।

দিগো রিবেলী আগেও কোন কথা বলেনি, এখনও বলল না।

বারেটো যেতে যেতে বলল, মিঃ রিবেলী, আপনি তো কোন কথা বললেন না, আপনার কি মত? আমরা কি আবার সেই সম্রাটের চক্রান্তে পড়ব?

দিগো রিবেলী তাতেও কোন কথার উত্তর দিল না। যেন কি ভাবছিল। শুধু

এক সময়ে ম্লান হেসে বলল, কি জানি, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। হয়ত পর্তুগীজরা আবার মূরদের চক্রান্তে পড়বে।

তারপর দুর্গের বাইরে এসে বারেটো একদিকে গেল, দিগো রিবেলী নিঃশব্দে নিজের বাড়ীর দিকে রওনা দিল।

পথে ব্যাণ্ডেল গির্জা পড়ল। গির্জা ঘরের ঘণ্টা বাজছে। দিগো রিবেলী একবার তার মধ্যে ঢুকল।

গির্জার মধ্যে উঁচু সিংহাসনে মেরী মাতার ছবি। উঁচু সিংহাসনটাও রাজসিক। লাল ভেলভেটে মোড়া বেদীর আসন। আসনের চার পাশে রঙীন কাপড়ের ঘেরাটোপ। বড় বড় সাইজের মোমবাতি জ্বলছে কয়েকটি। ঢোলা পোষাকে ফাদারদের অদ্ভুত লাগছে। ফাদাররা ঘোরাঘুরি করছে গির্জা প্রাঙ্গণে। সদ্য ধর্মান্তরিত এদেশের নারী, পুরুষ, শিশুরা তন্ময় হয়ে প্রিয়দর্শিনী মেরীর দিকে তাকিয়ে আছে। ফাদার কাবরল ওল্ড টেস্টামেণ্ট থেকে পড়ে শোনাচ্ছে। গম গম করছে তার স্বরে গির্জা প্রাঙ্গণ।

দিগো রিবেলী হাঁটু নামিয়ে ঈশ্বরকে উপাসনা করল।

হীরাকে আলভার কাছে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল লবণের গোলায়। সেই বেয়াড়া ক্রীতদাসকে আজ চাবুক মারতে হয়েছে। চাবুক খেয়ে লোকটা গড়িয়ে গেছে। আর উঠে দাঁড়াতে পারে নি। মুখ দিয়ে কেমন যেন রক্ত পড়তে শুরু করেছিল।

তারপর ডাক্তার সুজা এসেছেন কিন্তু এসে ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে গেছেন।

এতটা হবে সে কি আশা করেছিল? লোকটার রোখ দেখে ভেবেছিল শক্তি আছে। কিন্তু ভেতরে যে এত দুর্বল, কে জানতো?

লোকটা খৃষ্টান হলেই তাকে মুক্তি দেওয়া হত। মুক্তি পাওয়া খৃষ্টান অধিবাসীরা যেখানে আছে সেখানে চলে যেত। মিশন থেকে ভার নিত। সংসারী করে দিত। কিন্তু লোকটা কেমন যেন একরোখা। বলে, তোমাদের ধর্ম কেন নেবো? তোমরা এ দেশের শত্রু। আমাদের মারধোর কর, ঘর জ্বালিয়ে দাও, বউ ছেলে কেড়ে নাও। তোমরা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

লোকটার আগুন জ্বালা কথা শুনেই দিগো রিবেলী আর সহ্য করতে পারে নি। চাবুক চালিয়ে দিয়েছে। সমস্ত শরীর দড়ি হয়ে রক্ত ফুটে বেরিয়েছে। চাবুকের পাকানো চামড়ার শত দড়ির ছাপ যেন ছবি হয়ে জেগেছে। তারপর লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে। আর উঠে দাঁড়ায় নি।

লোকটা মরে যেতে কেমন যেন সারাদিনটা দিগো রিবেলীর খারাপ লেগেছে।

দুপুরের ডিনারটাও ভাল করে খেতে পারে নি।

আলভা শুধিয়েছে, ডিয়ার, তুমি কি অসুস্থ ?

নো ডারলিং, এমনি।

পর্তুগীজ মেয়ে আলভা। এখানেই একদিন কুমারী অবস্থায় জাহাজে এসেছিল। তারপর দিগোকে বিয়ে করে থেকে গেছে।

আলভার মমতা যেন এ দেশের মেয়ের মত। স্বামীকে শুধু ভালই বাসে, নিরবে সেবা দেয়। কোন অনুযোগ নেই। স্বামীর খুশির ওপর তার খুশি। স্বামী বিলাস জীবনকে সে নিরবে সমর্থন করে, সাহায্য করে। নিজের অধিকারের জন্য কৈফিয়ৎ চায় না।

সেকেণ্ড ওয়াইফ অফ দিগো রিবেলী। প্রথম স্ত্রী গোয়ার। মুসলমান রমণী। খাঁটি মুসলমান ধর্মকে সে পালন করে। তার কাছ থেকেই দিগো রিবেলীর মুসলমানী আদব কায়দা শেখা। তারপরের দুটি হিন্দু। একটি রাজস্থানী মেয়ে, আর একটি বাঙালী ব্রাহ্মণ কন্যা। তা ছাড়া অন্তঃপুরে আছে অনেক উপপত্নী। তাদের দেখাশুনার ভার আলভার।

দুপুরে একবার নতুন মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ঐ লোকটা মরে যেতে, মনের ওপর চাপ পড়তে, কেমন যেন মনের সুরটা পালটে গেছে। তবু ডিনার টেবিলে আলভাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মেয়েটি কি করছে ?

আলভা মৃদুকণ্ঠে কেমন যেন নিজেই অপরাধীর মত মাথা নীচু করে উত্তর দিয়েছিল, সে ঘুমুচ্ছে।

দিগো রিবেলী জানে, আলভা কেন এমন করে ? সে তার অস্থির স্বামীকে নিজের কাছে ধরে রাখতে পারে না বলে লজ্জিত। দিগো রিবেলী সে দিকে মন দেয় না। ওসব দিকে মন দিলে তো ঝেঁটিয়ে অন্তঃপুর সাফ করে আলভাকে নিয়ে থাকতে হয়। না, না সে কখনও সম্ভব নয়। আলভা নিজের দেশের মেয়ে হলেও সে কেমন করে এই দেশের সুখ ছাড়বে। তা ছাড়া জীবনে উন্নতির জন্যে যে কায়িক পরিশ্রমের দরকার সে তো একদিন তা করেছে !

আজ অবসর জীবন। বাংলা দেশে পর্তুগীজদের মধ্যে সে সম্ভ্রান্ত। পর্তুগীজ রাজার কাছেও সে একজন বিশিষ্ট দেশবাসী।

দিগো রিবেলী এগিয়ে চলল নিজের বাড়ীর দিকে। তারার মালা পরেছে আকাশের চাঁদোয়া। দূরে দাসবাজারটা কেমন যেন নিঃশব্দে পড়ে আছে। দুর্গটা দূরে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। আমগাছের পাতার মধ্যে থেকে কে যেন ডেকে উঠল। দু'পাশে ঝুপিঝাপি ঘন আগাছা জঙ্গল। জোনাকি জ্বলছে মাঝে মাঝে।

দিগো রিবেলী এগিয়ে চলল ঘাসের গালিচা মাড়িয়ে।

ফাদার দা ক্রুজের সঙ্গে দেখা হল।

এই একজন ধর্মযাজক। অদ্ভুত তার মন ও চেহারা। এসেছে এদেশে যেন ধর্মপ্রচার করতে নয় ! কাউকে বলে না খৃষ্টান হতে। শুধু মাঠে মাঠে ছড়িয়ে যায়

কি যেন। বাঁ হাতে চেপে ধরা একটি সাধারণ থলি। সে সারাদিন সেই থলি থেকে কি বের করে ছড়িয়ে যায়।

অন্যান্য ফাদাররা তার ওপর খুশি নয়। তারা বলে, তুমি যীশু হত্যাকারী জুডাসের মত ধর্মের শত্রু।

তাতেও দা ক্রুজের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বলে, দেখবে, আমি কি করতে চেয়েছিলাম। এমনি করেই খৃষ্টধর্ম প্রচার হবে? অত্যাচারের চেয়ে ওদেশের ফুল এদেশে ফোটালে, এদেশের লোকের মনে ওদেশের ওপর বিশ্বাস জন্মাবে। ফুলকে কে না ভালবাসে?

কিন্তু দা ক্রুজের কথা কেউ বিশ্বাস করে না।

সে নিজের মনে ফুলের বীজই ছড়িয়ে যায়। আর মাঝে মাঝে ক্রীতদাসদের দাসবাজার থেকে মুক্তি দেয়। জোর করে কাউকে খৃষ্টান করতে চায় না। ক্রীতদাসকে ছেড়ে দিয়ে বলে, যাও তোমার যেখানে খুশি।

অদ্ভুত এই লোক দা ক্রুজ। দা ক্রুজ কি যেন ভাবতে ভাবতে পাশ কাটাল।

দিগো রিবেলী হঠাৎ কি ভেবে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, গুড ইভনিং ফাদার?

দা ক্রুজ অন্ধকারে তাকিয়ে শুধু হাসল। অন্ধকারেও হাসিটা তার সুন্দর দেখাল। কোন পর্তুগীজই আজ তাকে সম্মান করে না। তাই সোনালী সুর নাড়িয়ে বলল, গুড ইভনিং জেণ্টলম্যান।

দা ক্রুজ আর দাঁড়াল না, হন হন করে এগিয়ে গেল।

দিগো রিবেলীও পথ চলতে লাগল।

অন্ধকারটা ফিকে হয়ে আলো দেখা দিচ্ছে। ঘোলাটে মেঘটা ছাড়া ছাড়া হয়ে সরে যাচ্ছে।

হীরার কথা ভাবল দিগো রিবেলী। মেয়েটি যেন কেমন? আচ্ছা, ঐ সেই সম্রাটের ক্রীতদাসী নয় তো! পরণের পোষাকটা যেন কেমন? ঐ যদি হয়, তাহলে আর একজন কোথায় গেল? দুর্গাধ্যক্ষ ডি মিলো যেন বলল দুজন।

পা দুটো একটু দ্রুত চালাল দিগো রিবেলী। হীরাকে জিজ্ঞেস করতে হবে সে কথা।

কিন্তু যদি হীরা বলে, সে সম্রাটের ক্রীতদাসী ছিল, তাহলে? তাকে কি সে ডি মিলোর হাতে জমা করে দিয়ে আসবে?

দিয়ে আসাই উচিত। দেশের জন্যে, জাতির জন্যে সর্বনাশ হতে দেওয়া উচিত নয়। যদি সত্যিই সেই ক্রীতদাসী হীরা হয়, আর ভাবতে পারল না দিগো রিবেলী।

যতগুলি মেয়ে তার অন্তঃপুরে আছে হীরার মত যেন কেউ নয়। হীরা সত্যিই হীরকখণ্ডের মত।

অন্তঃপুরে ঢুকতে আলভা হাত ধরল।

কেমন যেন বিরক্তি জেগে উঠল দিগো রিবেলীর মনে। বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না, বলল—আলভা সরো!

আলভা আহত হয়ে সরে দাঁড়াল।

নতুন মেয়েটা কোথায় ?

আলভা জবাব দিল না। মাথা নিচু করে চোখের জল লুকোল।

দিগো রিবেলী আরও চটে উঠল, বলল, জবাব দিচ্ছ না কেন ? আমি নতুন মেয়েটার কথা জানতে চাইছি।

আলভা চোখের জল মুছে ধরা গলায় বলল, সে তেরো নম্বর ঘরেই আছে।

দিগো রিবেলী আর দাঁড়াল না, তেরো নম্বর ঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

মদ দিগো রিবেলী সব সময়ে খেয়ে থাকে। নেশা তার কম হয়। লাল মুখটা আরও যেন লাল দেখায়। হাসিটা সর্বদাই মুখে থাকে বটে কিন্তু সেই হাসিটাই যেন যেন কেমন ? হাসির যে অনেক রকম অর্থ হতে পারে দিগো রিবেলীর হাসি দেখলে তাই মনে হয়।

সে যখন তার ব্যবসার আড়তে থাকে তখনও ঠোঁটে ঝুলে থাকে হাসির রৌদ্র ; কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে সেই হাসির মধ্যে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা চলে। মাঝে মাঝে মেঘও গজরায়, গর্জনের সাথে চাবুক চলে।

দিগো রিবেলীর কথা মিষ্টি, পরিহাস তরল, আবার ভয়ঙ্কর দস্যুর মত মাঝে মাঝে আগুন হয়ে ওঠে।

জাহাজ ঘাটায় যখন মদ খুঁজতে যায়, তখন তার ছোট ছোট চোখগুলি দেখলে মনে হয় যেন শিশু। শিশু যেমন কিছু হারিয়ে ফেললে খোঁজার রেখা চোখে টেনে ঘুরে বেড়ায়, তেমনি ভাবে দিগো রিবেলী জাহাজ ঘাটায় ঘুরে বেড়ায়। আবার দাসবাজারে মেয়ে খুঁজতে গিয়ে এক রকম। আলভার কাছে এক রকম। তবে আলভাকে মাঝে মাঝে সে ভালবাসে। কোথাও স্নেহের অভাব দেখলে সে ছুটে আসে। সে জানে, এই বস্তুটি আলভা দিতে তাকে কার্পণ্য করে না।

তবু আলভাকে সে সহ্য করতে পারে না। আলভা যেন বড় বেশি তাকে আড়াল করে রাখতে চায়। তার স্বভাব, তার চরিত্র, তার ভাল মন্দ সবই যেন আলভা জানে। আলভা নিরবে তাকে এগিয়ে দেয় তার মনের চাওয়াটিকে, তবু না। আলভা না থাকলেই বুঝি ভাল হত এমনি তার মনে হয়।

তেরো নম্বর ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দিগো রিবেলী সেই কথা ভাবছিল। ঘরে ঘরে তার নির্বাচিত মেয়েলোক। অনেককে ভোগ করেছে, অনেককে এখনও মজুত রেখেছে। সকলের পরিচর্যার ভার এই আলভার।

বাইরের কোন পুরুষের ঢোকবার অধিকার এই অন্তঃপুরে নেই। এমন কি কোন

পর্তুগীজ জাতভাই জানে না তার অন্তঃপুরে কত মেয়ে আছে। তবে দিগো রিবেলীকে দেখে এদিকের সপ্তগ্রাম ও হুগলীর অধিবাসীরা হাসে। বলে, দিল্লীর সম্রাটের পর পর্তুগীজরা ভারতে রাজত্ব পেলে অন্তত দিগো রিবেলীকে অন্তঃপুরের সম্রাট করে দিতে হবে।

দিগো রিবেলী এসব কটাক্ষ শোনে কিন্তু উত্তর দেয় না। মেহনতের দাম এ জগতে ভোগের দ্বারা তুলে নিতে হয়।

তাছাড়া পর্তুগীজরা এদেশে ভাল কি করছে? করতে এসেছে সুদূর পর্তুগাল থেকে এদেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠা। ব্যবসার নামে করছে দস্যুতা। গোপনে অস্ত্রশস্ত্র মজুত করে দেশের রাজার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, শুধু সুযোগের অপেক্ষা!

দিগো রিবেলী এগিয়ে চলল তেরো নম্বর ঘরের দিকে।

সারি সারি ঘর। ঘরের দরজায় দামী পর্দা ফেলা। নানা বর্ণের, নানা ধরণের। গোল গোল মোটা মোটা থাম। থামের গায়ে পর্তুগীজ শিল্পীর সুনিপুণ হাতের মীনা করা নক্সা। ছোট ছোট ঝাড়ের আলোতে অলিন্দের মধ্যে মৃদু আলোর বিচ্ছুরণ। নানা রঙের ঝাড়। সবই বিদেশ থেকে আনা। ঝাড়ের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বাতাসে দুলছে কাচ কাঠি। শব্দ হচ্ছে বিচিত্র। পর্দা ফেলা ঘরগুলোর মধ্যে থেকে থেকে হাসির শব্দ ছুটে আসছে। কেউ গান গাইছে নিজের ভাষায়। কিছু কিছু যন্ত্রসঙ্গীতের শব্দও ভেসে আসছে।

দিগো রিবেলী সঙ্গীত পছন্দ করে না। তবে মাঝে মাঝে পিয়ানো বাজিয়ে আলভা গাইলে শোনে। এখানে এদের জন্যে গান, নাচ ও বাজনার ব্যবস্থা রেখেছে। তার সংগ্রহ করা মেয়েলোকেরা সেই সব ব্যবহার করলে অখুশি হয় না।

তার সব কায়দাই মুঘল হারেমের মত। সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজপ্রাসাদে কয়েকবার সে গিয়েছিল। হারেমে অবশ্য ঢুকতে পারেনি তবে বাইরে থেকে হারেমের সম্বন্ধে যা শুনেছিল, সেই শোনা থেকেই তার হারেম সৃষ্টি।

একবার বাদশাহের একটি বাঁদীর সাথে তার আলাপ হয়েছিল।

মেয়েটির কথা আজও মনে আছে দিগো রিবেলীর।

সে যদি বাদশাহের ভয়ে পালিয়ে না যেত তাহলে ফাষ্ট ওয়াইফ হত তার।

দিগো রিবেলীর বয়স তখন কম। সবে দেশ থেকে এসেছে। তরুণ মন।

সোনালী চুলের মাথা নিয়ে বিস্ময়ে ভারতবর্ষকে দেখছে।

দেখছে বাদশাহের ঐশ্বর্য।

সেই সময়ে ঐ মেয়েটির সঙ্গে দেখা।

আগ্রার পথ দিয়ে একদিন শরৎকালের বিকেলে নাচের ছন্দে আসছিল মেয়েটি বাদশাহ ফোর্ট থেকে। অদ্ভুত মেয়েটির চোখ মুখ।

দিগো রিবেলী তার পিছু না নিয়ে পারে নি। মেয়েটিও একটি সাহেবকে পিছু পিছু আসতে দেখে কোমর ভেঙে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে দিগো রিবেলী আরও মুগ্ধ।

পরনে বাঁদীর পোষাক। কিন্তু ঐ পোষাকেও মেয়েটিকে বিবির মত দেখাচ্ছিল। মেয়েটি কোন লজ্জা পেল না।

শরৎকালের সন্ধ্যাপূর্ব বিকেলে চোখ ঘুরিয়ে ঠোঁটে হাসির রেখা টেনে বিস্ময়ের ভান করে বলল, আমার পিছু নিয়েছ কেন সাহেব ?

দিগো রিবেলীর তখন বিড়ম্বিত অবস্থা। কি করবে ভেবে না পেয়ে মুগ্ধ দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে সরে বলে, ঠিক করেছি, কিন্তু মেয়েটি হঠাৎ চপল হয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল। ও সাহেব কেন দাঁড়িয়েছ আমাকে দেখে ? এই বলে মেয়েটি আবার বুকে ঢেউ তুলে হাসল। কেমন যেন বেকুব বানিয়ে দেবার ইচ্ছে।

দিগো রিবেলীর চলে যাওয়া উচিত কিন্তু সেই মুহূর্তে। তার চলে যেতেও ইচ্ছে করে না। বাদশাহের সৈনিক আছে, বাঁদীর জানাশুনা লোক আছে। তাছাড়া সে বিদেশী। এ দেশে এসেছে এই সব করতে নয়। তবু তরুণ মন, সামনে এই এদেশের যুবতী। যুবতীর দেহের দিকে যেন চোখ রাখা যায় না।

সেদিন এমনি ভাবেই শেষ হল তাদের দৃষ্টি বিনিময়।

মেয়েটি যাবার সময়ে হেসে হেসে বলে গেল, সাহেব, আর কোনদিন আমার পিছু নিও না।

দিগো রিবেলী পিছু নেবে না-ই ঠিক করেছিল। কিন্তু তরুণ সেই মনের মধ্যে তারপর থেকেই সেই মেয়েটির মুখটি ভাসে। দিগো রিবেলীর কাজকর্ম সব নষ্ট হয়ে যায়। মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে ছটফটানি। তবু সে নিজেকে ধরে রেখেছিল। ওদিকে আর কোনদিন যাবে না বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু মনই তাকে সোনালী চুলের ঝুঁটি ধরে সেই বিশেষ জায়গায় নিয়ে গেল।

আগ্রার দুর্গের ভেতরে যাবার সেই সমান সরল পথটা। সেদিনও সেই সন্ধ্যাপূর্ব মুহূর্ত।

মেয়েটি দূর থেকে দিগো রিবেলীকে দেখতে পেয়েছিল। এক মাথা সোনালী চুল হাওয়ায় উড়ছিল এলোমেলো ভাবে।

দুপাশে গাছপালার সারি। উঁচু নীচু পথ। ওপাশে বাদশাহ পরিবারের আত্মীয়দের কবর দেবার জন্যে খানিকটা ঘেরা জমি। সেখানে মৃতের মত এক নিস্তব্ধতা। মেয়েটি আগের দিনের মত আর ঘুরে দাঁড়িয়ে শাসন করল না। পাশ দিয়ে চলে গেল মিটি মিটি হাসতে হাসতে। সে দিনটা এমনি ভাবেই গেল।

পরের দিন দিগো রিবেলীই এগিয়ে গেল। মেয়েটি চলে যাচ্ছে দেখে সে সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মেয়েটি বিস্ময়ে চোখ দুটি তুলে বলল—একি সাহেব। তুমি আমার পথ জোড়া করে দাঁড়ালে কেন ?

দিগো রিবেলী কোন উত্তর দিতে পারল না। মুখের মধ্যে তখন সে তোতলাচ্ছে।

মেয়েটি তখন মাথা নামিয়ে নিয়ে মিটি মিটি হাসছে।

তারপর কদিন পরে দেখা গেল, ওরা দুজন যে পথে লোক চলাচল করে না সেই পথে ঘুরছে। দুজনের চোখেই মুগ্ধতার আবেশ।

মেয়েটি আর চপল হয়ে হাসছে না। দিগো রিবেলীর পাশে চলতে চলতে হারেমের অনেক ভয়াবহ ইতিহাস বলে।

দিগো রিবেলীর ওর কাছ থেকেই হারেমের ইতিহাস শোনা।

আসমানী বলে—সাহেব, তোমার এই ইচ্ছা তুমি ত্যাগ কর। আমাদের মজবুরী জীবন। মহব্বতের নেশা আমাদের রাখতে নেই।

দিগো রিবেলী তবু আসমানীর সঙ্গ ছাড়ে না। প্রতিদিনই তার আশায় সেই পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে।

আর আসমানীর চোখে জল দেখা দেয়।

সাহেব, কেন তুমি আমাকে এমনিভাবে ক্ষতবিক্ষত করছ ?

আমি তোমায় শাদী করব।

আসমানী বড় বড় চোখে দিগো রিবেলীর দিকে তাকায়।

আসমানীর মনে পুলকের জোয়ার আসে কিন্তু পরক্ষণে তার মুখের ওপর বিষাদের ছায়া নামে। সাহেব, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ ?

না, আমি পাগল হই নি। আমি জেন্টলম্যান। আমার ভালবাসার অধিকার আছে।

আসমানী এই দুঃসাহসী তরুণ সাহেবের সাহস দেখে কিছু বলতে পারে না। তাও মনের মধ্যে কি যেন সুর ঘোরে ফেরে। এমনি ভাবেই যদি চলত কি হত বলা যায় না।

আসমানী রোজ ছুটির পর নিজেই এসে সাহেবের সঙ্গে দেখা করে, ওরা চলে যায় দুজনে নির্জন নিরালা এক লোকালয়হীন জায়গায়।

আসমানীর মনে আর সাহেবের জন্যে কোন বিস্ময় নেই। সে সাহেবকে তাদেরই দেশের মত এক নওজোয়ান মনে করেছে। দুই তরুণ মনের মধ্যে শাশ্বত সেই মিলনের খেলাই চলে।

আসমানী হয়ত পালিয়ে যাবার কথাই ভাবছে। দিগো রিবেলী ভাবছে, ঘর বেঁধে ঘরণী নিয়ে কোথায় থাকবে। এ দেশেরই সে বাসিন্দা হয়ে যাবে।

এই সময়ে একদিন আসমানীর দেখা সে পায় না। একদিন নয় পর পর অনেক দিন।

সেই সন্ধ্যাপূর্ব বিকেল যেন দিগো রিবেলীর চোখ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই সুদূর দেশে এসে তরুণ মনের প্রথম ভালবাসা।

তবু আসমানীর আশা সে করেছিল। প্রথম প্রথম ভাবত, বোধহয় অসুখ করেছে তাই কাজে আসে না কিন্তু সে ভাবনাও একদিন চলে গেল।

দিগো রিবেলী আগ্রা দূর্গের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে।

সিপাই জিজ্ঞেস করে—ক্যায়া মাঙতা !

দিগো রিবেলী সেদিন যদি বাদশাহের ভয়ে চলে না আসত, তাহলে বোধ হয় তার প্রথম প্রেম এমনি ভাবে ক্ষতবিক্ষত হত না।

আসমানীর দেখা পেলে সেই হত রিবেলীর ফার্স্ট ওয়াইফ।

আজও মাঝে মাঝে দিগো রিবেলীর সেই আসমানীর কথা মনে পড়ে।

মনের মধ্যে জল বুদবুদের মত সেই অস্পষ্ট মুখখানি ভেসে উঠলে এই প্রৌঢ় বয়েসে একটা কথাই মনে আসে, সেই প্রথম রমণী তার জীবনে স্বপ্ন ছিল না। সত্যি ছিল? সত্যি যদি ছিল তবে আসমানী কোথায় গেল? তবে কি আসমানী বাদশাহ হারেমের সেই পঙ্কিল জীবনের মধ্যে হারিয়ে গেছে?

দিগো রিবেলী জানে না, সেদিন আসমানীর অবস্থা তাই হয়েছিল।

বাঁদীর জীবনে যে অভিশাপ, সেই অভিশাপে তার মনের মধ্যে স্বপ্নে গড়া সেই রঙিন পুতুল লালসার রঙে রাঙা হয়ে হারেমের মর্মর দেয়ালে মাথা ঠুকে মরেছিল।

দিগো রিবেলী আসমানীর জন্যে যে দুর্গের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। ও জানে না, ওরই পাশ দিয়ে একটি কফিন লোকের কাঁধে গোরস্থানে চলে গিয়েছিল। আর তারই মধ্যে বিষ খাওয়া নীলবর্ণ দেহে আসমানী অন্য এক মহব্বতের আশায় অন্য জগতে পাড়ি দিয়েছিল।

দিগো রিবেলী জানলে বোধহয় সেই মৃতদেহের ওপর আছড়ে পড়ত। সেই পরিণতি জানে না বলেই আজও আসমানীর কথা সে ভাবে। আর বলে মেয়েরা অবিশ্বাসেরই জাত।

এ দেশে অবস্থাপন্ন পর্তুগীজ অধিবাসীরা অধিকাংশ জীবন ধারণ মুসলমান কায়দায় করত। তবে মুসলমান মেয়ের চেয়ে হিন্দু মেয়েই সচরাচর বিদেশীরা পছন্দ করত। দাসবাজারে হিন্দু মেয়ে এলে তাই চড়া দামে বিক্রি হত।

আর পর্তুগীজ দস্যুবণিকরাও লুঠে আনবার সময় হিন্দু মেয়ের ওপর ঝোঁক দেয় বেশি। গ্রাম লুঠ করবার সময় কুমারী, অল্প-বয়স্কা বধূর ওপর তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে।

যারা এই হুগলীতে বসতি স্থাপন করেছে। হুগলী কেন, সপ্তগ্রাম, বেতোড়, চট্টগ্রাম, গোয়া যেখানে পর্তুগীজ তার প্রাধান্য বিস্তার করেছে, সেখানেই তারা হিন্দু মেয়ে নিয়ে ঘর বেঁধেছে। দেশের মেয়েও এদেশে আসে, তবে তার চেয়ে এদেশের মেয়েদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পর্তুগীজরা ভালবাসে।

এ দেশের মেয়েরা শুধু ভালবাসে না, স্নেহ করে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তারা স্বামীকে পূজা করে। এই দেখেই পর্তুগীজরা এতো ঝুঁকেছে এদেশের মেয়ের ওপর।

দিগো রিবেলীরও দুটি হিন্দু বউ আছে। একটি রাজস্থানী, তবে তার আদব কায়দা কেমন যেন। তার চেয়ে ব্রাহ্মণ কন্যাটিই মনের মত।

নাম সরমা।

হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ রামায়ণের কোন এক সাধ্বী পত্নীর নাম যেন সরমা। সে যাকৃগে। সরমা সত্যিই সাধ্বী। তার কাছে গেলে কেমন নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়। তার

সঙ্গে প্রথম দেখা হলে সে গলায় কাপড়ের বের দিয়ে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

তার ঘরে জলে সারারাত্রি তেলের প্রদীপ। সে দেয়ালগিরি ঐ ধরণের কোন উজ্জল আলো ব্যবহার করে না। প্রদীপের আলোয় কি সুন্দর স্নিগ্ধতা। ছায়া ছায়া আলো আঁধারির মধ্যে সরমাকে দেখায় যেন হিন্দুর পুতুল প্রতিমার মত। ঠিক গড অফ ওয়ারশিপ্।

দিগো রিবেলী সময় পেলেই তার কাছে যায়। যখন কিছু ভাল লাগে না, তখন সেখানে গেলে কেমন যেন শান্তি পায়।

শুধু দিগো রিবেলী নয়, পর্তুগীজরা যেন এই বাংলা দেশে আসল সম্পদের খোঁজ পেয়েছে।

আম সুপারি, কাঁঠাল গাছের দেশ। সবুজ স্নিগ্ধ বনানীর মাঝে, পাখী ডাকা দিনে, জ্যোৎস্না ভরা রাত্রে শুধু বিস্ময়ের চোখে দুটি কাজল কালো চোখের মেদুর দৃষ্টি মনের মধ্যে খেলা করে। এ সম্পদ ভারতের কোথাও নেই। এমনটি কাদের মধ্যে আছে ?

দিগো রিবেলী চলতে চলতে একবার থমকে দাঁড়াল। ভাবল মনটা আজ ভাল নেই, যাবে কি সেই সরমার কাছে ? হয়ত সে এখন তুলসীমঞ্চের সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে চোখ বুজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সাড়া পেলে চমকে উঠবে। কিন্তু তারপরই মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে এমন সুন্দর হাসিটি পরিবেশন করবে যা দেখলে সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। মনের আর কোন জড়তা থাকে না।

দিগো রিবেলীর পা দু'টি সেই দিকে যেতে চাইল কিন্তু কি ভেবে সে পা টেনে নিল।

তেরো নম্বর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। পর্দা সরাল।

আলোকিত ঘরের মধ্যে হীরা নতুন পোষাক পরে আড় হয়ে শুয়েছিল। সাহেবকে দেখে সে উঠে বসল। হাসল সুন্দর করে। চোখ দিয়ে দৃষ্টি হানল।

দিগো রিবেলী মনে মনে বাহবা দিল কিন্তু পরক্ষণে মনে পড়ল ডি মিলোর কথা। দেশের ও জাতির সর্বনাশ রক্ষা করতে গেলে সবার সাহায্য দরকার। সে কথা মনে পড়তে দিগো রিবেলী হীরার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার সেই ছাড়া পোষাকটা কোথায় ?

হীরা তাড়াতাড়ি পালঙ্ক থেকে নেমে এল। মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে দিগো রিবেলীর হাত ধরতে গেল।

কিন্তু রিবেলী হাত ধরতে দিল না ! বলল, আমার কথার জবাব দাও।

হীরার মুখে আরও বিস্ময় ফুটল, বলল—সে পোষাক কোথায় আছে আমি কি জানি ? আমি তো এখন তোমার দেওয়া পোষাক পরেছি।

না, সেই পোষাকটা আমার দরকার। সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে এমনভাবে কথা

বলতে রিবেলীর কষ্ট হচ্ছিল। যাকে এখনও স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। দাসবাজার থেকে মনে লাগা জিনিস কিনেছিল কি এই জন্যে? কিন্তু ঐ ডি মিলো যা বলল, আর এই মেয়ে যদি সত্যিই সেই সম্রাটের হারিয়ে যাওয়া সম্পদ হয়? দিগো রিবেলী আর ভাবতে পারল না।

যুবতী নারী অনেক ভোগ করেছে। কিন্তু এই হীরা যেন হীরক রত্নের মত দ্যুতিময়। দেহের মধ্যে উত্তাপ শিরার রক্তের মধ্যে মিশে কেন যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে।

হীরা পরেছে সুন্দর পোষাক। শাড়ী পরেছে একটি। জরি বসানো গাঢ় নীল রঙের। প্রসাধন চর্চিত মুখ। অপরূপ স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যের ঔজ্জল্যে শরীরের রমণীয় বাঁকগুলি কেমন যেন স্পষ্ট। হীরা হঠাৎ দুলে দুলে খিল খিল করে হেসে উঠল! চপল কণ্ঠে বলল, সে পোষাক নিয়ে কি করবে সাহেব? আমি তোমার কেনা মেয়ে মানুষ! কেমন যেন কোমর বেঁকিয়ে হীরা কথাগুলি বলল।

দিগো রিবেলীর মনেও তার স্পর্শ লাগল। অন্য সময়ে হলে রমণীর এই ভঙ্গিতে সে ঝাঁপিয়ে পড়ত কিন্তু তবু সে যেন কি ভাবতে লাগল। একবার ভাবল, দরকার নেই ডি মিলো যা বলেছে ভুলে গেলেই হবে। কিন্তু এদেশে পর্তুগীজদের অবস্থার কথা ভেবে আর সে ভুলতে পারল না। নিজের জাতির ওপর বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে নয়, সর্বনাশ তো তার নিজেরও। সত্যিই যদি সেই ক্রীতদাসী পালিয়ে আসা এই হীরা হয়, তাহলে সম্রাট কি এই সুযোগ ছেড়ে দেবে? হঠাৎ সে প্রভুর মত গম্ভীর হয়ে সেই গম্ভীর কণ্ঠেই বলল, হীরা একটা সত্যি কথা বলবে? তুমি কি সেই সম্রাটের পালিয়ে আসা ক্রীতদাসী, যাকে খুঁজতে লোক এসেছে আমাদের কলোনীতে?

অন্য মেয়ে হলে কি করত ভাবা যায় না কিন্তু হীরা আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। পুষ্ট ভারী বুকে জোয়ার তুলে বলল, ও তুমি বুঝি সাহেব সেইজন্যে আমার সেই পোষাক দেখতে চাইছিলে? তা আসল কথাটা বললেই পারতে!

দিগো রিবেলী একটু বিব্রতকণ্ঠে তাড়াতাড়ি বলল, তাহলে তুমি সে নও? বল, বল তাহলে আমি একটু শান্তি পাই!

হীরা দেয়ালে পিঠের ঠেস দিয়ে মুখখানি কাত করে মুখ টিপে হেসে বলল, মোটেই না। সম্রাটের ক্রীতদাসী হবার সৌভাগ্য যদি আমার হত তাহলে কি তোমার ক্রীতদাসী হতাম সাহেব!

এমন করে হীরা কথাগুলি বলল যে অবিশ্বাস করবার মত নয়।

দিগো রিবেলী কেমন যেন খুশি হল। তবু নিঃসংশয় হবার জন্যে বলল, তোমার ঐ সুন্দর পোষাক! ও কোথায় পেলে?

হীরা আবার মুখ ভরিয়ে হাসল, তারপর বলল, ওটার একটা আলাদা ইতিহাস আছে। তবে সে কথা জিজ্ঞাসা করো না সাহেব।

দিগো রিবেলী এবার নিশ্চিন্ত হয়ে হীরার পালঙ্কের ওপর উঠে বসল।

হীরা কিন্তু সেই আগের মতই দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ দুটি ঘিরে কি যেন মাদকতা ঝরে পড়ছিল।

রাত এগিয়ে চলেছে। ঘরে দিনের মত আলো। আলোয় ঘর ভাসছে। জ্যোৎস্নার মত রূপো আলো। বাইরে জ্যোৎস্না জেগেছে কিনা কেউ জানে না।

দিগো রিবেলী হীরার দিকে সহজভাবে তাকাতে পারল না।

হীরা বুঝতে পারল পুরুষের মন। সে মৃদু হাসতে লাগল।

দিগো রিবেলী একসময় মৃদুকণ্ঠে বলল, কাছে এস, দূরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

হীরা কাছে এল না। চোখ দুটি দিয়ে শুধু আকর্ষণের জাল ছড়াতে লাগল।

দিগো রিবেলী উঠে দাঁড়াল। আবার সে দুলে দুলে হেসে উঠল।

দিগো রিবেলী ভ্রূকুঞ্চিত করল।

আলভা আসবার সময় এক পেগ মদ দিয়েছিল। নেশাটা ঠিক জমেনি। আর একটু নেশার জন্যে সে এদিক ওদিক তাকাল।

পাশের ওপাশের আরও অন্যান্য ঘর থেকেও মেয়েলী হাসি ও তাদের ভিজে ভিজে মিষ্টি মিষ্টি কথা ছুটে আসছিল।

মেয়েটাকে কেনবার পর সে বলেছিল, তুমি বুড়ো বয়সে আমাকে নিয়ে কি করবে? সে কথা মনে পড়ল। তাইতো, সে কি সত্যিই বৃদ্ধ হয়ে আসছে! ডাকল, হীরা! জোরে ডাকতে গেল ভয় দেখাতে গেল কিন্তু নিজেই কেমন যেন দুর্বলতা অনুভব করল। চাবুকটা সঙ্গে আনলে ভাল হত। কেনা বাঁদী তার আবার অনিচ্ছা।

মেয়েটা যদি সম্রাটের সেই হারানো ক্রীতদাসী হয়, এই ভেবেই সে থমকে ছিল। না'হলে দিগো রিবেলী কি মেয়ে কিনেছে তাকে আসবাবের মত সাজিয়ে রাখবে বলে!

রিবেলী পালঙ্কে ফিরে গিয়েছিল আবার নেমে পড়ল। লাল মুখটা জ্বলতে লাগল আরও লাল হয়ে। নেশায় জড়ানো সহজ চোখ দুটো আবার যেন অন্য এক নেশায় হারাতে লাগল।

হীরা বুঝতে পারল সাহেবের মতলব।

এতক্ষণ সাপের ঝাঁপি খুলে যে মারাত্মক খেলা খেলেছিল, এবার যেন ঝাঁপিটা বন্ধ করতে চাইল। নিজের লোভাতুর ভরন্ত দেহটাকে কাপড় দিয়ে ঢাকা দিল। চোখের নেশা নেশা দুষ্টু দৃষ্টিটা পাল্টে কেমন যেন উদ্বেগে ভরে উঠল।

হঠাৎ হীরার মনে পড়ল। বলেছিল, সাহেব তুমি আমায় খৃষ্টান করলে আমি তোমার। সেই কথাই সে বললো।

রিবেলীর চোখ জ্বলছিল ক্ষুধিত শ্বাপদের মত। পর্তুগালের নীল রক্ত যেন শরীরের মধ্যে লাফাচ্ছিল। রক্তের স্রোতে দারুণ একটা দানবীয় শক্তি। শরীরের মধ্যে থেকে আদিম ক্ষুধাটা যেন প্রচণ্ডভাবে জেগে উঠেছে। কিন্তু হীরার কথা শুনে তার সেই স্বভাবগত হাসি আবার মুখের ওপর ফুটে উঠল। বলল, খৃষ্টান হবে? কথাটা যেন ব্যঙ্গের মত ঝলকাল।

হ্যাঁ, তোমাদের ধর্মটা আমার ভাল লাগে। বেশ গীর্জায় গিয়ে উপাসনা করব।

একথা শুনে দিগো রিবেলী বিস্মিত হল। দাসবাজারের মাঠেও প্রথম শুনেছিল। আবার। এ বলে কি? খৃষ্টান করার জন্যে ফাদাররা গ্রামে গ্রামে ঘুরছে। কত মেহনত করে তাদের খৃষ্টান করতে হয়। সহজে কেউ ধর্ম ছাড়তে রাজী নয়। সহজভাবে খৃষ্টান না হতে এই জুলুমের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

গ্রামে গ্রামে ঘুরছে পর্তুগীজ বণিকরা! ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে মেরে ধরে লোক নিয়ে আসছে। আর এ নিজেই খৃষ্টান হতে চায়?

তবু সে হেসে বলল, তুমি যখন আমার সম্পত্তি, আমার ঘরে যখন থাকবে, সে তো আমারই ধর্মপালন করবে। নতুন করে আর খৃষ্টান হয়ে করবে কি?

হীরা কেমন যেন ছোট মেয়ের মত ঠোঁট ফোলালো, না সাহেব, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চার্চে যেতে হবে। আমি বলে কত্‌তো কষ্ট করে তোমাদের এক দস্যুসর্দারের জাহাজে উঠে পড়েছিলাম। ক্রীতদাসী থাকার চেয়ে এ বেশ ভাল, ধর্মত্যাগ করেও তো মুক্তি, মুক্তি পেলে আমি আর কিছু চাই না।

দিগো রিবেলী সমস্যায় পড়ল, তারপর বলল, তোমাকে কিনেছি বটে তবে তুমি মুক্ত। আমার অন্তঃপুরে স্বাধীন ভাবেই থাকবে। তোমাকে কেউ কোনদিন ক্রীতদাসী বলবে না।

হঠাৎ হীরা আবার হেসে উঠল। চোখের দৃষ্টিতে রাতের কামনা মাখিয়ে বলল, আর যদি আমি পালিয়ে যাই সাহেব, তখনও কি তুমি স্বাধীনা বলে আমার পিছু পিছু যাবে না!

দিগো রিবেলী মহা সমস্যায় পড়ল। মেয়েটা তাকে বার বার কথার জালে হারিয়ে দিচ্ছে। এতো মহা ঝামেলা হল! বেশী সুযোগ পেলে মাথায় উঠতে চায়। হঠাৎ তার মনে হল, অন্যান্য মেয়েদের মত জোর করে নিজের প্রাপ্য ছিনিয়ে নিলে হয়। কিন্তু কি ভেবে তাও সে করল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আর হীরা বঙ্কিম ভঙ্গি করে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

রাত এগিয়ে চলল। ঘরে ঘরে হয়ত ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে অন্যান্য মেয়েরা। এখন কারো কাছে গেলে তাকে বিরক্ত করা হবে। হয়ত সকলেই শুনেছে, সাহেব আজ নতুন জহর কিনে এনেছে। না শুনলে সবারই আশা থাকত, তার ঘরে নিশ্চয় সাহেব উঁকি মারবে।

তাই যায় দিগো রিবেলী। প্রত্যহ রাতটা সারাদিনের পরিশ্রমের পর কারো ঘরে ঢুকে পড়ে। তারপর সেখানে কিছুক্ষণ একটি নরম কোমল শরীরকে লোফালুফি করে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ে। আর মাঝে মাঝে যায় সরমার কাছে। সরমার কাছে গেলে তার মনের উন্মাদনা কমে না। তবু কিসের যেন তৃপ্তি মেলে। হীরার কাছ থেকে ছুটে গিয়ে তার কাছেই যেতে মন চাইল। কিন্তু কেমন যেন শরীরের উত্তাপটা দেহের শিরায় মধ্যে খেলা করে মাথার মধ্যে জমছিল। আর মনে হচ্ছিল, সে কি এই মেয়েটাকে দাসবাজার থেকে কিনেছে শুধু খেলার সামগ্রী করতে?

তার শরীরে পর্তুগীজ রক্ত। তারা এদেশে এসেছে লুটতে। এদেশে পর্তুগালের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে। আর এ দেশের আসল সম্পদ, গাছগাছালি ঘেরা সবুজ গ্রামের মাঝে স্নিগ্ধ সব যৌবনবতী নারী, তাদের লুটে নিয়ে ভোগ করতে। তাহলে এই মেয়েটার কথা দাঁড়িয়ে শুনছে কেন? তাকে সুযোগ দিচ্ছে কেন তাতাবার? হঠাৎ দিগো রিবেলী লাফিয়ে উঠল। ঝাঁপিয়ে পড়ল হীরার ওপর।

হীরা বোধ হয় আগেই বুঝতে পেরেছিল তাই সে সরে দাঁড়াল। হঠাৎ কাপড়ের ভেতর থেকে, এখান থেকেই সংগ্রহ করা একটি ছোট্ট বাঁকানো ছুরি বের করে বলল, হীরার ওপর জোর করলে হীরা কখনও সুযোগ দেবে না। সাহেব তুমি আমার কথা শোন, তাহলে আমিও তোমার।

দিগো রিবেলীর লাল মুখটা আরও যেন অপমানে লাল হয়ে উঠল। নেশা অনেকক্ষণ ছুটে গিয়েছিল। সে ভ্রূকুটি করে থমকে দাঁড়াল। মনে পড়ল সকালের লোকটার কথা। চাবুকটা সঙ্গে আনলেই ভাল হত। কিন্তু এমন মেয়ের পরিচয় তো কখনও সে পায় নি। দেখে তো মনে হয় এ বাংলা দেশেয় মেয়ে। বাংলা দেশের মেয়ের স্বভাবও তার জানা। প্রথমে একটু বেয়াড়া হয়। তারপর জোর করলে লুটিয়ে পড়ে। এমনি কত মেয়ে তো তার অন্তঃপুরে আছে। কমলমণি, মাধবী, লায়লা আরও আরও যেন কি কি নাম।

তার মধ্যে সুরবালা বলে একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে। বেয়াড়া প্রথম প্রথম সব মেয়েই হয়। কে চায় একজন অন্য কোন পুরুষের ঘর করতে, তার ওপর এই এক পরিবেশে এক সাথে থাকা। তাই প্রথমে বেঁকে বসে। আলভা যেন তাদের কি বোঝায়। দু চারদিন এমনি যাবে। তারপর একদিন দিগো রিবেলী জোর করলেই সব জোর ফস্‌কে যাবে কিন্তু সুরবালা সেরকম ভাবে কোন সাড়া দেয় নি। তার জন্যে একটু মেহনত করতে হয়েছিল।

দু চারদিন আলভাও তাকে বুঝিয়েছিল, স্বামীকে ধৈর্য ধরতে বলেছিল। তারপর সেও একদিন ধরা দিয়েছে।

তাই দিগো রিবেলী সকলকেই জানে কিন্তু হীরার ব্যাপার দেখে সে বুঝতে পারে না।

হীরা তখনও ধারাল ছুরির ফলাটা আলোয় মেলে ধরেছে।

দিগো রিবেলী হাসতে লাগল। ব্যাপারটাকে সহজ করে নিতে চাইল।

কিন্তু হীরা চোখ পাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, আর একপাও যদি এগোও, তাহলে ছুরি চালানোর কসরৎ আমার জানা আছে সাহেব।

দিগো রিবেলী কেমন যেন ভয় পেল। পর্দার বাইরে তাকাতে গেল। অন্তঃপুরের কোথাও কোন শব্দ আছে কিনা কান পেতে শুনতে চাইল। আলভা অনেক সময় নতুন মেয়ে আনলে ঘরের বাইরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, আজও আছে কিনা জানতে চাইল দিগো রিবেলী। আলভা যদি একবার পিস্তলটা এনে দেয়! কিম্বা সঙ্গে পিস্তলটা নিয়ে এলেই পারত; কতদিন আলভা বলেছে ডারলিং, কিছু একটা

সঙ্গে রেখো, এদেশে আমরা অনেক ঝুঁকি নিয়ে থাকি। এদেশের লোক যে আমাদের ভাল চোখে দেখে না এ কথা কি জান না?

আজ আলভার কথাই ঠিক। এই মেয়েটা সত্যিই অদ্ভুত রূপসী এবং এমনটি কখনও পাওয়া যায়নি। দাসবাজারের ঐ গাদা-গাদা মেয়ের মধ্যে থেকে বেছে যা এনেছে তার তুলনা হয় না। আগেও এমনি অনেক বেছেচে কিন্তু আজকেরটি যেন অভিনব। কিন্তু মেয়েটি এমন করছে কেন? রূপের দিক দিয়ে রাজা বাদশার সম্পদ, মনের দিক দিয়ে এমন ভয়ঙ্কর কেন? হঠাৎ রিবেলী বলল, হীরা, তোমার ছোরা নামাও, তুমি আসলে কি চাও বলো? আমাকে কি তোমার পছন্দ নয়?

হীরা হঠাৎ কেমন যেন রূঢ়কণ্ঠে বলল, আজ তুমি সাহেব আমার ঘর থেকে যাও। দিনের বেলায় এ কথা আমাকে জিজ্ঞেস কোরো, উত্তর দেব।

রিবেলীর তবু যেন যেতে ইচ্ছে করল না। হীরার ভরা শরীর, রমণীয় শরীরের ঐশ্বর্য, উত্তেজনায় বুকের ঐ অংশ যেন সমুদ্রের ঢেউ নিয়ে ফুলছে। পর্তুগীজ সাহেব দিগো রিবেলী রাতটাকে বৃথা হতে দিতে চাইল না। বলল, হীরা, তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ কিন্তু এর পরিণাম কি জান?

হঠাৎ হীরা খিল খিল করে হেসে উঠল, হাসির দমকে দুলতে লাগল তার শরীর। ঘরটা যেন সেই হাসির ঢেউয়ে চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। তারপর হাসতে হাসতেই বলল, আমায় ভয় দেখাচ্ছ সাহেব! এদেশের মেয়েকে তুমি তাহলে চেন না। তারা যেমন মরতেও পারে মারতেও পারে।

দিগো রিবেলীর ইচ্ছে করল না ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। বড় আশা করে এসেছিল। আজ একটি খাসা সংগ্রহ হয়েছে। মাঝে ডি মিলোর জন্যে মনটা অন্যমনস্ক হয়েছিল। তারপর সে সংশয় যেতে দেহের শিরার মধ্যে আদিম উত্তাপ জেগে উঠেছে। হোক্ সে বৃদ্ধ হয়ে আসছে। তবু কি সে অকর্মন্য? এখনও তো তার অন্তঃপুরের মেয়েরা যন্ত্রণায় ছটফট করে।

হীরার ঘর থেকে বেরিয়ে এল নিষ্ফল এক কামনা নিয়ে। বেরিয়ে না আসার উপায়ও ছিল না। বেরিয়ে আসতে তার মন চাইল না। কয়েকবার জুল জুল চোখে তাকিয়ে তারপর পা টেনে টেনে ঘরের বার হ'ল। তবে মনে মনে শপথ করল, আজ যাচ্ছি কাল আর কেউ ঠেকাতে পারবে না। মনে মনে হাসলই সে।

মেয়েদের সম্ভ্রম, ও আর কতক্ষণ তারা আড়াল করে রাখতে পারে! কত মেয়েই তো তার অন্তঃপুরে আছে কেউ কি পারল? রিবেলীর ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি খেলে গেল।

তবু হীরার ব্যবহারটা তার ভাল লাগল না। এতটা সে আশা করেনি। হীরার ঘরের পর্দা সরাতেই বাইরের দেয়ালে ঠেসান দিয়ে আলভাকে দেখতে পেল দিগো রিবেলী। যত রাগ গিয়ে পড়ল তার ওপর। গর্জে উঠল, এখানে কি করছ?

আলভা উত্তর দিতে পারল না, মাথা নত করল।

কিন্তু দিগো রিবেলী কি ভেবে তার হাতটা চেপে ধরল, বলল, এসো ঘরে যাই।

আলভা মৃদু আলোয় স্বামীর মুখ দেখবার চেষ্টা করল কিন্তু লম্বা স্বামীর মুখের নাগাল পেল না।

দিগো রিবেলী আলভার হাত ধরে এগিয়ে গেল। এক সময় বলল, তুমি যখন সব শুনেছ তখন পিস্তলটা আমাকে দিয়ে আসতে পারলে না!

আলভা এবারও কথা বলল না, তারপর বাঁ হাতের মুঠিতে চেপে ধরা পিস্তলটা নিঃশব্দে স্বামীর হাতে তুলে দিল।

রিবেলী হাতে নিয়ে বিস্মিত হয়ে বলল, এনেছিলে, তবে দিলে না কেন? এক আধটা মার্ডার তো আমাদের এই কলোনীতে নতুন নয়!

আলভা তবুও কোন কথা বলল না। সে কেন পিস্তলটা এনেছিল সে যদি স্বামীকে বলতে পারত?

দিগো রিবেলী সে রাত্রে আলভার শয়ন ঘরে গিয়েই ঢুকল।

আলভা তার হারানো প্রত্যাশাকে আবার ক্ষণিকের জন্যে ফিরে পেয়ে মনের বিরাট অভাবকে একদিনের জন্যে সরিয়ে দিল।

পর্তুগীজ উপনিবেশ হুগলীতে দিনের আলো ফুটে উঠল। দাসবাজার জাগল। সেই খোলা ময়দানে লোক আসতে লাগল। ভাগীরথী উত্তাল হল। পণ্য বোঝাই নৌকা, বজরা, পানসি সারা রাত্রি উজান ঠেলে হুগলী বন্দরে এসে দাঁড়ায়।

দুর্গের মাথার ওপর পর্তুগালের রাজার নিশান। সূর্যের আলো ফুটছে।

ব্যাণ্ডেলের গির্জার প্রাঙ্গণ ছেড়ে বেরিয়ে আসছে ধর্মযাজকের দল। তাদের বিশ্রাম মেলে কম। সারাদিনই তাদের কাজ করতে হয়। লক্ষ্য খৃষ্টধর্ম প্রচার করা। মানুষকে অন্য ধর্ম থেকে নিয়ে এসে খৃষ্টধর্মের সারমর্ম বোঝানো। অনেক বোঝানোর পর হয়ত কেউ কেউ স্বইচ্ছায় খৃষ্টান হতে এগিয়ে আসে কিন্তু সে এত নগণ্য যে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

তাই পর্তুগীজ দস্যুবণিকরা অন্যপন্থা নিয়েছে। মানুষকে জুলুম করতে হবে, ফাঁদে ফেলতে হবে, তারপর ভীষণ অত্যাচারের মধ্যে তারা বাধ্য হয়ে ধর্মান্তরিত হবে। তা তাদের কথা ফলেছে। দাস ব্যবসা প্রবর্তন করে এখন মানুষ বাঁচবার জন্যে স্বইচ্ছায় খৃষ্টান হয়ে মুক্তি চায়। দাস প্রথা ভারতের সর্বত্র ছিল। মানুষ কিনে তাদের বিক্রি করা এ নতুন নয়। মুঘল রাজপুরীতে বহু ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী আছে।

তবু পর্তুগীজ দস্যুদের এই চরম পন্থা স্বাভাবিক মানুষের জীবনকে বিপন্ন করার চেষ্টা, এ যেন মনুষ্য সমাজের চরমতম জঘন্য নিদর্শন।

পর্তুগীজ এদেশের ব্যবসা করতেই এসেছিল। প্রাচ্য দেশগুলির সাথে ব্যবসা করার ফন্দিই তাদের ছিল।

ভাস্কো-দা-গামা যখন এ দেশে আসে। তখন সে অনেক প্রতিকূল অবস্থার ভেতর

দিয়ে আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল পার হয়। তারপর উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে কালিকট বন্দরে আসে। এইসময় থেকেই য়ুরোপের খৃষ্টানদের সঙ্গে ভারতের প্রত্যক্ষ বাণিজ্য শুরু।

১৪৪৩ সালে কন্স্টান্টিনোপল তুর্কীদের হাতে পড়ার পর স্থলপথে প্রাচ্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনা করা খৃষ্টানদের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। তারপর দ্বাদশ শতাব্দীতে লাগে মুসলিম ও খৃষ্টানদের মধ্যে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ।

এই যুদ্ধের পরে খৃষ্টানদের পক্ষে ঐশ্বর্যশালী ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক সমুদ্র পথ ছাড়া আর সম্ভব হয় না।

এইজন্যে পর্তুগাল তার নাবিক ও দুঃসাহসী দলকে বার বার ভারত মহাসাগর দিয়ে পাঠাতে থাকে।

ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপের হুকুমনামা নিয়ে পর্তুগাল ভারত মহাসাগরকে তাদের নিজস্ব এলাকা বলে ঠিক করে। প্রাচ্য দেশ যাত্রার জলপথ আবিষ্কার তাই পর্তুগালের প্রাপ্য।

ভাস্কো-দা-গামা কালিকটে এসে হিন্দুরাজা জামোরিণের অভ্যর্থনা পেয়েছিল। কিন্তু মালাবারের বণিকদের মনোভাব তার প্রতি প্রসন্ন ছিল না।

আরও কয়েক বছর পরে পর্তুগীজদের দ্বিতীয় ব্যক্তি পেড্রো আলভারেজ ক্যাব্রলি যখন এল, তখন কালিকটে হিন্দুরাজা জামোরিণ ও মুসলিম বণিকদের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা লক্ষ্য করল। তারা স্পষ্টই বলল, গো ব্যাক খৃষ্টান ফরেনার।

কিন্তু পেড্রো আলভারেজ বুদ্ধিমান ব্যক্তি। জামোরিণের প্রতিদ্বন্দ্বী কোচিনের হিন্দু রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করল। কোচিন ও ক্যানানূরে আশ্রয় পেল। কোচিনের বন্দর খুব ভাল হওয়ায় পর্তুগীজদের সুবিধা হল। তারা পরে এই বুঝল, এদেশের রাজাদের পরস্পরের ওপর দারুণ বিদ্বেষ আছে। সেটা কাজে লাগাতে পারলে সুবিধে হবে।

ভাস্কো-দা-গামা আবার যখন এল, তখন জামোরিণকে দলে টানার চেষ্টা করল কিন্তু না পেরে জব্দ করার ফন্দি খুঁজতে লাগল। তাতেও অপারগ হয়ে চরম যে নৃশংসতা, মানুষের ওপর কতখানি নিষ্ঠুর হওয়া যায় পর্তুগীজরা তা দেখাল। সেই নিষ্ঠুরতা তাদের আজও চলেছে। পর্তুগীজদের দেখলে তাই মানুষ ভয়ে কাঁপে। যেন সাক্ষাৎ তারা অভিশাপ।

তারপর এল রাজপ্রতিনিধি আলমিদা পরে আলবুকার্ক।

আলবুকার্কই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তার লক্ষ্য ছিল আরও একটু অভিনব। ব্যবসার জন্যে কয়েকটা জায়গা দখল করে সেখানে প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা করা। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মিতালী করে তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা এবং ধীরে-ধীরে নিজেদের উপনিবেশ গড়ে তোলা, যেখানে তা সম্ভব নয়, দুর্গ নির্মাণ করে স্থানীয় রাজাদের কাছ থেকে কর আদায় করা।

আলবুকার্কের নীতি পর্তুগীজদের পছন্দ হয়েছিল। বহু পর্তুগীজ তাই এদেশে এসে এদেশের মেয়ে বিয়ে করে জায়গায় জায়গায় ঢুকে গেছে।

আবার প্রয়োজনে স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অত্যাচার করতেও দ্বিধা করে নি। আগে পর্তুগীজদের আচার ব্যবহার কেমন ছিল জানা যায় না। তবে পরে তারা দুটি নীতিই পালন করত, এ দেশের মানুষদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন করা ও দ্বিতীয় তাদের মেয়ে বিয়ে করে এ দেশের রক্তের মধ্যে মিশে যাওয়া।

আর ধর্মান্তরিত করার মতলব, খৃষ্টান হলে আর খৃষ্টানদের ওপর শত্রুতা করবে না। দলে ভিড়ে যাবে। তবু খৃষ্টান করতে গিয়েও ধর্মযাজকরা পেরে উঠত না। তারপর দস্যুতা করে বোম্বেটে নাম নিয়ে মানুষ বেচাকেনা করতে লাগল। একদিকে তাদের লাভের ঘরে কড়ি জমা হতে লাগল। অন্যদিকে ধর্মের উপকারে হাজার হাজার খৃষ্টান করার সহজ পন্থা জুটে গেল।

সেইজন্যে দুঃসাহসী হার্মাদ দস্যুদল তাদের দেশের চোখে এক একজন কৃতীপুরুষ। ফাদারদের তারা বলে, তোমরা যতই গ্রামে গ্রামে ঘুরে ধর্মপ্রচার কর, গরীবমানুষকে সাহায্যের লোভ দেখাও, আমাদের পন্থা সম্পূর্ণ অভিনব। কত ধর্মান্তরিত খৃষ্টান এদেশে তৈরী হচ্ছে গুণে দেখো!

আলবুর্কাকের নীতি অনুসরণ করে পর্তুগীজদের অধিকারে বহু জায়গায় উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে বাংলা দেশে প্রথম এই সপ্তগ্রামে।

সপ্তগ্রামের কথা বলতে গেলে বলতে হয় হুগলী বন্দর সৃষ্টি হবার আগে এই সপ্তগ্রাম একটি সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল। হুগলীর আগে সপ্তগ্রাম ছিল গাঙ্গেস রিজিয়া। ভাগীরথীর কূলে যতগুলি সমৃদ্ধিশালী নগর ও বন্দর আছে তার মধ্যে এ অন্যতম। সোনার গাঁ যেন এই সপ্তগ্রাম। হুগলীর মতই বন্দরে ভিড়ত অসংখ্য পণ্যবাহী জাহাজ। কেনাবেচা চলত সারাদিন। জলপথ স্থলপথে মানুষ আসত অন্ন সংস্থানের জন্যে।

সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামকে নিয়ে বহু কিম্বদন্তী আছে। লোকে বলে, এ অঞ্চল বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও উন্নত। হর্ষবর্ধনের বংশের কুটুম্ব ও আত্মীয়-স্বজনরা এখানে বাস করত। তা ছাড়া সাতটি গ্রাম সাতটি সাধুর নামে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল বলে এর নাম সপ্তগ্রাম হয়েছে। পরে সপ্তগ্রামের শ্রেষ্ঠত্ব দেখে পর্তুগীজরা ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পৌছোয়। এখানেই তারা তাদের ঘাঁটি স্থাপন করে।

তারপর তারাই সপ্তগ্রামকে একদিন কানা করে দিয়ে হুগলীতে এসে দুর্গ বানায়। সপ্তগ্রামের বন্দর আজও আছে। সেখানেও হাট বসে, কেনাবেচা হয়; ঘাটে পণ্য বোঝাই নৌকাও দাঁড়ায়, তবে আগের সে রূপ নেই। সোহাগিনী বধূকে যেমন স্বামী ভুলে গেলে তার রূপও ম্লান, তেমনি আজকের সপ্তগ্রামের অবস্থা।

তবু স্থানীয় অধিবাসীরা ভুলেও হুগলীতে আসে না। হুগলীতে পুরোপুরি পর্তুগীজ উপনিবেশ। সেখানে যা অধিবাসী আছে সবই খৃষ্টান।

নদীর ধারের হুগলীকে ভাগ করলে এক ভাগে থাকে ধর্মান্তরিত খৃষ্টান, আর অন্য ভাগে থাকে পর্তুগীজরা।

সকালবেলা ধর্মযাজকরা গির্জা থেকে বেরিয়ে একদল যায় দাসবাজারে আর

অন্যদল যায় এই সব ধর্মান্তরিত খৃষ্টানদের বাড়ী বাড়ী। পর্তুগীজ সরকারই তাদের দিয়েছে জমি, বাড়ী ঘর তৈরীর রসদ, আর উপার্জন করবার উপায়।

কেউ কেউ এ পাশে এসে পর্তুগীজ ব্যবসাদারদের কুঠিতে চাকরী করে। তাদের গোলায় লবণ তোলে, জাহাজে তুলে দিয়ে আসে চিনির বস্তা। বিনিময়ে বেতন পায়। তবে ব্যবসাদাররা ক্রীতদাস-দাসী দিয়ে এই সব কাজ করাতে পছন্দ করে। দাসবাজার থেকে কিনে আনা নর-নারী শিশুদের দিয়ে যে কাজ করানো যায়; বেতনভোগী খৃষ্টানদের দিয়ে তা করানো যায় না। তাই তারা ক্রীতদাস দাসী কিনেই কাজ চালায়। তবে ধর্মান্তরিত খৃষ্টানদের কাজ দিতে হবে এই রকম একটা হুকুম নামা থাকার জন্যে বাধ্য হয়ে কিছু কিছু কাজ দেয়।

কিন্তু ধর্মান্তরিতদের কখনও জাতে উঠতে দেয় না। একপাশে বসে খানাপিনা তো দূরের কথা, উপাসনা কক্ষেও পর্যন্ত পাশাপাশি বসে না। এই নিয়ে মাঝে মাঝে কলহ লেগে যায়।

তবে প্রত্যেক পর্তুগীজই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র বহন করে ঘুরে বেড়ায়। চাবুক তাদের নিত্যকালের সঙ্গী।

ধর্মযাজকরা চেষ্টা করে দু পক্ষের মাঝে একটা বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করার। কিন্তু খৃষ্টধর্মের আদি কথা শুনিয়েও পর্তুগীজদের বাধ্য করা যায় না। যদিও তারা এ দেশের মেয়ে বিয়ে করে সংসারী হয়েছে।

আবার সেই এদেশের মেয়ে, সেও এক মজার কাণ্ড, তারা এখন পর্তুগীজদের পত্নী। কর্তা যদিও বা একটু নরম হয়, গিন্নী চরম। গিন্নী যে আক্রোশ প্রকাশ করে তা সীমাহীন।

সে রাত্রে অন্যান্যরা চলে যাবার পর দুর্গাধ্যক্ষ সেনাপতি ডি মিলো দস্যুবণিকদের একত্র করে তারা যাতে সম্রাটের সেই দুই পালানো ক্রীতদাসীকে খুঁজে বের করতে পারে, তার জন্যে একটি মৃদু আদেশ জারী করে। এবং পরদিন সকালে প্রত্যেক পর্তুগীজ অধিবাসীকে জানিয়ে দেয় সম্রাটের পরবর্তী হুকুম।

যদিও তখনও সুবেদারের কোন হুকুম নামা আসেনি।

তবু অনেকেই জানত বাংলাদেশে পর্তুগীজদের এই স্বাধীন উপনিবেশের ওপর সম্রাট শাহজাহান খুশি নয়।

তাঁর বহু উপদেশমূলক ও শ্লেষমিশ্রিত সাবধানবাণী জানিয়ে চিঠি এসেছে। '...আপনাদের শুধু লবণ, সোরা, চিনি, মশলা, কাপড় ব্যবসা করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মানুষ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার অনুমতি দেওয়া হয়নি, বন্ধ করুন আপনাদের দাস ব্যবসা।'

মুঘল সম্রাটের এই চিঠিকে পর্তুগীজরা অবজ্ঞা করেছে। বরং আরও পূর্ণোদ্যমে দাস বাজারের ব্যবসাকে চালিয়ে আসছে।

বাদশাহ্ শাহজাহান খৃষ্টান ধর্মযাজকদের কাছেও চিঠি দিয়েছেন। 'আপনারা খৃষ্টধর্মের প্রবর্তক। প্রত্যেক ধর্মই পরধর্মাবলম্বীদের কাছে শ্রদ্ধার মত। আপনারাও শ্রদ্ধেয় কিন্তু আমার দেশের মানুষদের আপনারা জোর করে আপনাদের ধর্ম চাপিয়ে দিতে পারেন না, সে আদেশ আপনাদের আমি দিইনি। আপনারা শুধু নিজেদের ধর্মজীবন যাপন ও উপাসনাগৃহ নির্মাণের অধিকার পেয়েছেন।'

ব্যাণ্ডেল গীর্জার ধর্মযাজকেরা চিঠির উত্তর দিল: 'সম্রাট অহেতুক আমাদের ওপর দোষারোপ করছেন। আপনার পিতামহ ও পিতৃদেবের ফরমান অনুযায়ী আমরা কাজ করছি। এ দেশের মানুষকে খৃষ্টান করবার অধিকার আমাদের আছে। দরিদ্র এই দেশের মানুষেরা ধর্মান্তরিত হলে মনুষ্য সমাজের কল্যাণ হবে বলে তাই মনে করি। আমাদের ধর্মে আছে মানুষের কল্যাণের জন্যে আত্মনিয়োগ করাই উচিত। সকল ধর্মেরই সার কথা মানুষের সেবা।'

এরপর বাদশাহ শাহজাহানের অনুরোধ জানিয়ে পত্র এল। '...মানুষের সেবা করতে গিয়ে জোর করে ধর্মান্তরিত করবেন না। কেউ স্বইচ্ছায় খৃষ্টান হতে চাইলে কিছু বলার নেই, তবে আপনারা যে কায়দায় মানুষ দাসবাজারে নিয়ে যাচ্ছেন তারপর নিরুপায় হয়ে সেই বিপন্নরা প্রাণ বাঁচানোর জন্যে খৃষ্টান হচ্ছে। আমাদের ফরমানে কি এমন কথা লেখা আছে, যে আমাদের দেশের মানুষের নিরুপায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের ধর্মান্তরিত করবেন?'

পর্তুগীজ ধর্মযাজকরা উত্তর দিল না। তারপর একেবারে চুপ। সেই আগের নিয়মেই প্রত্যহ কাজ চলতে লাগল। দাসবাজার তেমনি পূর্ণোদ্যমে চলল। তেমনিভাবে বিপন্ন মানুষেরা খৃষ্টান হয়ে মুক্তি পেতে লাগল।

তারপর অনেকদিন চলে গেছে, এখন এল এই নতুন উপসর্গ।

সেনাপতি জন ডি মিলোরই চিন্তা বেশি। কারণ তার অধীনে হুগলী উপনিবেশ। হুগলী উপনিবেশের কিছু হলে জবাব তাকেই দিতে হবে।

গোয়ার দিকে যে জাহাজ যাচ্ছিল গতরাত্রেই একটি চিঠি লিখে ক্যাপ্টেন ভন্‌ডির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিছু আরও সৈন্য দুর্গের মধ্যে মজুত হবে। যদি যুদ্ধ লাগে; যুদ্ধই করতে হবে। মুঘল সৈন্যের সঙ্গে পারা মুস্কিল, তবে পারলে মুঘলরা হটে গেলে পর্তুগীজ ক্ষমতা আরও বাড়বে।

এই সব ভেবেই ডি মিলো গোপনে তৈরী হতে লাগল।

মিশনের ধর্মযাজকদের ডেকে সম্রাটের নতুন চক্রান্তের কথা শুনিয়ে দিল।

তারা গিয়ে উপাসনা গৃহে বসল। উপাসনা চলতে লাগল অষ্টপ্রহর।

পর্তুগীজরা খুঁজতে লাগল সেই দুটি মেয়েকে, যাদের জন্যে তাদের আজ বিপদ।

কেউ কেউ বলল, এ সম্রাটের চাল। আসলে আমাদের বাংলাদেশে থাকতে না দেবার ফন্দি।

তবু খোঁজার বিরাম থাকল না। সকলেরই দৃষ্টি দাসবাজারের ওপর। যুবতী মেয়েদের আলাদা ডেকে দস্যুসর্দাররা জিজ্ঞেস করতে লাগল।

সেখানেও আবার এক অত্যাচার শুরু হল।

সন্দেহ হয় এমন মেয়েকে দাসবাজার থেকে তুলে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করা হল উত্তর দেয় না, অনেক মেয়ের স্বভাবই এমনি। হয়ত অল্প কথা বলা অভ্যেস।

কিন্তু পর্তুগীজ স্বার্থ!

স্বয়ং ডি মিলো সামনে দাঁড়িয়ে সৈনিককে বলল—বন্দুক তুলে ধরো, আদেশ করলেই ফায়ার করবে। নিজের হাতে উদ্ধত চাবুক।

সালোয়ার, কামিজ পরা রূপসী মেয়ে। আগুনের মত যৌবন নিয়ে দাঁড়িয়ে। সৈনিকরা হাসছে।

কিন্তু ডি মিলো হাসছে না। সে পদমর্যাদায় গম্ভীর। তা ছাড়া সামনে সমূহ বিপদ। সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারেনি।

উত্তম্যান, তুমি সত্যি কথা বলো, যদি সত্যিই সম্রাটের ক্রীতদাসী হও, তাহলে আমরা তোমায় সাহায্য করব। সম্রাটের কাছে ফেরৎ পাঠাব না, পরিবর্তে তোমাকে যথোপযুক্ত আশ্রয় দেব।

পরের দিনও কিছু যুবতী মেয়েদের দাসবাজার থেকে তুলে আনা হল কিন্তু কেউ স্বীকার করল না।

কিছু কিছু অত্যাচারও করা হল। সুন্দর দেহগুলি চাবুকের দ্বারা রক্তাক্ত হল, বন্দুক তুলে ফায়ার করা হবে বলে ভয় দেখানো হল, তাতেও কেউ স্বীকার করল না।

সমস্ত হুগলী উপনিবেশ সেদিন সকাল থেকে যেন কি এক আশু ধ্বংসের নেশায় ছটফট করতে লাগল।

দাস বাজার ঠিক আগের নিয়মেই চলতে লাগল। তবে অন্যান্য দিনের মত সে রকম স্বতঃস্ফূর্ত নয়।

বণিক সর্দারের চাবুক ঘুরছে। দাস নরনারী যন্ত্রণায় ছটফট করছে। শকুন ঘুরপাক খাচ্ছে সূর্যের মাথার ওপর।

নিলামদার চেঁচাচ্ছে। পঞ্চাশ, একশ, দুশো···যুবতী মেয়েরা খিল খিল করে হাসছে।

ফাদাররা ঘুরছে টাকার থলি নিয়ে, তবু সবই যেন কেমন নিষ্প্রাণ।

ঠিক এই সময়ে দেখা গেল মুঘল দূত আসছে ঘোড়ায় চড়ে ধুলোর ঝড় তুলে। সে দুর্গের বিরাট দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

দরজা খুলে গেল শব্দ করে। মুঘল দূতের হাতে সুবেদার কাশিম্ খান জুয়িনীর পত্র।

ডি মিলো দূতের হাত থেকে পত্র নিল।

'মহামহিম মুঘল আলো শ্রদ্ধেয়া সম্রাজ্ঞী মুমতাজ মহল আপনাদের ব্যবহারে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আপনারা তাঁর দুটি যুবতী বাঁদীকে মুক্তি দেবার লোভ দেখিয়ে

হুগলীতে স্থান দিয়েছেন। এই পত্র পাওয়ার সাতদিনের মধ্যে যদি তাদের ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা না করেন, তাহলে সমূহ বিপদের সম্মুখীন হবেন। আর যদি সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করে ফেরৎ দেন, আপনাদের ক্ষমা করা হবে।'

দূত অভিবাদন করে আবার অশ্ব পৃষ্ঠে উঠে চলে গেল।

ডি মিলো পত্রটি হাতে করে তার অফিস ঘরে দাঁড়িয়ে রইল। চিঠিটা আবার পড়ল। কয়েকবার পড়ার পর মুখস্ত হয়ে গেল। শেষের কথাটা পড়ে যেন পর্তুগীজ রক্ত তার লাফিয়ে উঠল। 'অপরাধ ক্ষমা করা হবে।'

হঠাৎ সে দেয়ালে টাঙান চাবুকটা হ্যাণ্ড থেকে খুলে নিয়ে চিঠিটার ওপর সপাং সপাং করে লাগাতে লাগল।

কাদের অপরাধ কে ক্ষমা করবে? তাদের বাঁদী হারাল, দোষ পর্তুগীজদের।

রাগে মাথা খারাপ হয়ে গেল ডি মিলোর। চিঠিটা চাবুক খেয়ে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেল। হঠাৎ খেয়াল হতে প্রকৃতস্থ হল। তারপর চিঠির টুকরোগুলি তুলে নিয়ে টেবিলের ওপর ফেলে জোড়া দিতে লাগল।

তারপর আবার মন্ত্রণা সভা বসল। এল পর্তুগীজ মান্যগণ্যরা, এল গির্জা থেকে ধর্মযাজকরা। তারা সকলেই চিঠিটা পড়ল।

সবারই স্বার্থ এই চিঠির সঙ্গে জড়িত। সকলেই উদ্বিগ্ন হল। পরামর্শ সভা বসল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল।

সমাধান কিছু হল না। সকলেরই উত্তর, এ মনে হয় সম্রাটের চাল। তাদের উপনিবেশ ভেঙ্গে দেবার ফন্দি।

কি জবাব তো একটা দিতে হবে! ডি মিলো ককিয়ে উঠল।

কিন্তু কি সে জবাব? সাতদিন মাত্র সময়। তা ছাড়া বাদশাহ চেয়েছেন বাঁদী ফেরৎ। চিঠির বিরুদ্ধে চিঠি চান নি। কিন্তু সেই দুজন বাঁদীকে কোথায় পাওয়া যাবে?

হুগলীর পর্তুগীজ উপনিবেশের আকাশ থমথম করতে লাগল।

যাদের হাতের চাবুক বাতাসে ঘোরে, যারা শুধু অত্যাচার করেই আনন্দ পায়, তারাও কেমন যেন জোরে চাবুক চালাতে ভুলে গেল। দুর্গের মধ্যে বহু নরনারী। দেহের অনেক অংশ কেটে তাতে লবণ দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছিল। রোদ্দুরে পড়ছিল, আর চিৎকার করছিল। এমনি বহু অত্যাচারের নমুনা। ফুটন্ত গরম জল কারুর ওপর ঢেলে দেওয়া হচ্ছিল।

বন্দী নরনারী ঐ দস্যুবণিকদের জাহাজেই এসেছে। তারা কোন পোষই মানে নি। ভীষণ বেয়ারা ও বেয়াদপ। তারাই শুধু এই দুর্গে স্থান পায়। প্রত্যহ এমনি জমা হয়, আর তাদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়।

খ্রীষ্টান হও, অথবা ক্রীতদাস প্রথা মেনে নাও।

কিন্তু বন্দীর আর্ত চিৎকার: কিছুতেই মানব না। তোমরা কত অত্যাচার কর দেখব? তোমরা কি মানুষ?

সেই অত্যাচারও কেমন যেন লঘু হয়ে কারাকক্ষের দেয়ালে হারিয়ে গেল।

বন্দীদের কানেও গেল সম্রাটের হুকুম। তারা ভগবানকে ডাকল।

কিন্তু ভগবানকে ডাকল না আর একদল যারা নতুন ভাবে যীশুকে পেয়েছে।

উপনিবেশের এক পাশে নতুন পল্লী। যেখানে শুধু নতুন নতুন খোড়ো চালের বাড়ি গজিয়ে উঠেছে। যেখানে হারানো সংসারের মানুষ নতুন ধর্ম পেয়ে নতুন ভাবে বাঁচতে শুরু করেছে। সেখানে শুধু নেই আনন্দ। তারা বাদশাহের নতুন হুকুম শুনে বলল, এ আবার কি আপদ?

তাদের সবুজ মাঠে সোনালী ধান ফলেছে। মিশনারীদের কৃপায় মিলেছে বাঁচবার অধিকার। নতুন ঘরণী, নতুন ঘর। ধর্ম এসেছে সাহেবদের দেশ থেকে। এখন তারা মোটামুটি সাহেব। ইচ্ছে করলে জাহাজে উঠে য়ুরোপ পাড়ি দিতে পারে; গির্জায় অবশ্য পর্তুগীজরা এক সারিতে বসে না। তা না বসুক। য়ুরোপে গেলে আর কোন বিভেদ থাকবে না। সবার মুখে তাই বিদেশী ভাষা। পরণের দেশী পোষাক ছেড়ে সাহেবী পোষাক পরছে। খানার সাথে গরুর মাংস। খানা গ্রহণের সময় পিয়ানোর সুরে সঙ্গীতের রিদিম। ঘরে ঘরে মেরী মাতার পুণ্যস্নিগ্ধ মুখচ্ছবি। সকাল, সন্ধ্যা উপাসনার হিড়িক। ব্যাণ্ডেল গির্জায় গিয়ে সবার আগে উপাসনা। খ্রীষ্টধর্মের আসল মর্মার্থ মন দিয়ে শোনা। মন দিয়ে বুঝে হৃদয় দিয়ে পালন করা।

এরাই একদিন ধর্মান্তরিত হতে অস্বীকার করেছিল।

তারা শুনে সম্রাটের নামে মেরীমাতার সামনে তাঁর ধ্বংস চাইল। কেউ কেউ এগিয়ে এসে ধর্মযাজকদের জানাল, দরকার হলে আমরা বাদশাহের বিরুদ্ধে লড়ব। আমাদের হয়ে আমাদের অভিমত ক্যাপ্টেন ডি মিলোকে জানাবেন।

এমনি তখন হুগলী উপনিবেশের উত্তপ্ত অবস্থা। থমথমে আকাশ।

তখন একজন লোক, ফাদর দাক্রুজ, তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়। আর থলি থেকে বীজ নিয়ে সবুজ মাঠে ছড়িয়ে যায়!

তার কথা কেউ ভাবে না, তার দিকে কেউ চায় না। অন্যান্য খ্রীষ্টান ধর্ম-যাজকরা মনে করে, সে দেশের শত্রু, খ্রীষ্টানদের শত্রু, তাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়াই উচিত। এমন কি তাকে ব্যাণ্ডেল গির্জার বড় প্রাঙ্গণেও মাঝে মাঝে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

তার আলাদা একটি খোড়ো চালের কুঁড়েঘর আছে, আর আছে সেখানে একটি মেরীমাতার ছবি। সে নীরবে তার কাছেই কি যেন জানায়।

সোনালী নূর থুতনিতে ঝুলছে, চোখ দুটি নীল, ঢোলা আলখাল্লা পরে কোন দূরে যেন তাকিয়ে আছে।

তাকে যখন সম্রাটের নতুন আদেশ জানানো হল, সে শুধু অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। তার অভিমত জানতে চাওয়া হল কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না।

প্রশ্নকর্তা পরিহাস কণ্ঠে বলল, তুমি ফুল ফোটাবার জন্যে যে বীজ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছ, সে ফুল কি করবে ? কবরে শুয়ে দেখবে ?

স্বল্পভাষী দাক্রুজ তাতে উত্তর দেয় না। নীল চোখ মেলে কি যেন ভাবে। কোন্ সুদূরে যেন তাকিয়ে থাকে।

দিন তিনেক পরে হুগলী বন্দরে আর একটি দস্যুবণিকের জাহাজ এসে থামল। তাতেও ধূর্ত মানুষের মিছিল।

মানুষ ধরা নৌকা, বজরা, জাহাজ প্রত্যহ আসত। প্রত্যহই দাসবাজার গমগম করত। তবে মাঝে মাঝে দূর পাল্লার বিশেষ জাহাজগুলি এসে থামত কয়েকদিন অন্তর। ভারতের অনেক পথ জলপথে ঘুরে অনেক দূর দেশ থেকে মানুষ ধরে আনত।

এমনি একজন বণিক সর্দার ফেডরিক ডি ফনসিকা। যে এক চোখ হারা। যার চোখ হারানোর পিছনে কোমল হাতের দুশমনী ছিল। সে আজও সেই আক্রোশে সুন্দরী যুবতী জাহাজে তুললে একবার ভোগ না করে দাসবাজারে বিক্রী করে না। সেই ফেডরিক ডি ফনসিকা জাহাজ হুগলী বন্দরে ভিড়িয়ে কাপড়ে মোড়া একটি মৃতদেহ নিয়ে সেনাপতি ডি মিলোর কাছে চলে এল।

কাপড়ে মোড়া মৃতদেহটি একটি যুবতীর। পচা মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

বাতাস মুহূর্তে ভারী হয়ে উঠল। তবে সে কাহিনী তিনদিন পরের।

তিনদিন কাটবার আগে আরও অনেক ঘটনা সেই হুগলীর পর্তুগীজ উপনিবেশে ঘটেছিল।

পরদিন। দিগো রিবেলীর অন্তঃপুর।

সারাদিন দিগো রিবেলী সেই এদেশীয় রূপসী মেয়েটির রাত্রিকালের ব্যবহার ভোলেনি। তবে সকালবেলা হাতে কাজ অনেক। ব্যবসার অনেক রকম ফন্দি ফিকিরে সময়টা শেষ হয়ে যায়। সেদিন সকাল থেকেও তাই কাজের মধ্যে প্রবীন ব্যবসাদার ডুবে গেল।

বন্দরে গিয়ে দু'একবার দাঁড়াল। কয়েক বোতল বিলিতী পানীয় সওদা করল। কিন্তু দাসবাজারে দাঁড়াল না। খড়ের ডগা মুখে চিবুতে চিবুতে ভীড় ঠেলে ঠেলে এগোল। কিছু প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা হল। শুনল তাদের কাছ থেকে সেই আগের দিনের কাহিনী কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। খড়ের ডগা চিবুতে চিবুতে সে নিজের গোলার দিকে এগোতে লাগল ! সেই সাণ্ডো গেঞ্জি পরা সরু ঢ্যাঙা দেহ। নীল নীল শিরাগুলি লাল দেহ থেকে বেরিয়ে আছে। আজ সঙ্গে রেখেছে একটি পিস্তল, চওড়া চামড়ার কোমর বন্ধনী কোমরে আঁটা। ডান পাশে ঝুলছে পিস্তলের খাপ।

সূর্যের আলো পড়েছে দাসবাজারে। নারকেল গাছের মাথাগুলি দুলছে। কুঠিয়াল ডমিকার সঙ্গে দেখা হল।

সে রিবেলীর হাতে মদের বোতল দেখে রসিকতা করল, বলল, সকালবেলাই কি এগুলো শেষ করবে সর্দার?

রিবেলী সারাদিন মদ খায়। সকালবেলাও খেয়ে বেরিয়েছিল। লাল লাল চোখ তুলে শুধু ডমিকোর কথায় হাসল।

ডমিকো জাহাজ খানার দিকে চলে গেল। বলল, একবার সতিগানে যেতে হবে। কিছু চাল এসেছে সতিগান বন্দরে। সেটা আনতে যাচ্ছি। তুমি যাবে নাকি সেখানে?

রিবেলী মাথা নাড়ল। বলল, না, ওখানে আমার কোন দরকার নেই। তাছাড়া গোলায় অনেক কাজ পড়ে আছে।

ডমিকো হাসল রিবেলীর কথায়। বলল, তোমার আর কাজ কি? কাজ তো সব মাইনে করা লোকেরাই করে। তুমি শুধু দেখাশুনা কর। তারপর কাছে সরে এসে চাপাস্বরে চোখ নাচিয়ে বলল, চলো না, ওখানে গেলে তুমি লাভবান হবে। ভাল ভাল অনেক মেয়ে আছে সতিগানে। ডমিকো দাঁত মেলে অদ্ভুত ভাবে হাসতে লাগল।

কিন্তু রিবেলী হাসল না। বলল, না থাক ডমিকো, তুমি যাও। আমার অনেক কাজ আছে।

ডমিকো হাসতে হাসতেই চলে গেল।

রিবেলী ফিরল।

কাল রাত্রে আলভা যদি তাকে না নিয়ে যেত তাহলে ঠিক সে আবার চাবুকটা নিয়ে ফিরে আসত। একটা বিশ্রী কাণ্ড হয়ে যেত। মেয়েটা স্ব-ইচ্ছায় কিছু না দিলে জোর করত। এমনি জোর অনেক করেছে। চারটি পত্নী ছাড়া আরও চল্লিশটি মেয়ে আছে তার অন্তঃপুরে। সবগুলি না হোক অন্তত দশটার ওপরও তাকে বলপ্রয়োগ করতে হয়েছে, কিন্তু এই মেয়েটি যে ব্যবহার করল কোনটি আর এমন করে নি।

ছুরি দেখে কি সে ভয় পেয়েছিল? ভয় ঠিক নয়, আশ্চর্য হয়েছিল। মেয়েদের এই সাহস সে কখনও দেখেনি। এমন কি তাদের দেশের মেয়ে আলভাও কোনদিন নিরাপত্তার জন্যে অস্ত্র তুলে নেয় নি।

কাল আলভা তাকে নিয়ে এল বলে মেয়েটি বেঁচে গেল। কিন্তু বাঁচবে আর কদিন?

আজ রাত্রে সে কি করবে? বহু অভ্যস্ত অভিজ্ঞ দিগো রিবেলী মনে মনে হাসল। আজ কামাল করে দেবে। আলভাকে বলে এসেছে মেয়েটিকে যেন বুঝিয়ে রাজী করায়।

আলভা সান্ত্বনা দিয়েছে, ডারলিং তোমায় কিছু ভাবতে হবে না।

আলভা কাল খুব খুশি হয়েছে। মেয়েটিকে না পাওয়ায় উত্তপ্ত মন অন্য কোন উত্তাপ পেলে হয়ত শান্ত হত না, কিন্তু আলভা স্বামীকে খুশি করার প্রক্রিয়া জানে। সারারাত আলভার নেশা জাগানো শরীরে ডুবে কেমন করে যেন মিথুন রাত্রি কেটে গেছে। মনেই থাকেনি এক নারীর কাছ থেকে না পাওয়ার দুঃখ।

যা হোক, আজ আর তাকে কোন অবস্থায় মুক্তি দেওয়া হবে না। এই কথা ভেবেই দিগো রিবেলী সারাদিন ধরে নতুন এক পাওয়ার আনন্দে থেকে দিনটা কাটিয়ে দিল।

তার পরদিন বিদায় নিল। মাঝে একবার সে বাড়ী গিয়েছিল। ডিনার খেতে খেতে আলভাকে শুধিয়েছিল, সেই নটি গার্ল এখন কি করছে?

আলভা মাথা নত করে উত্তর দিয়েছিল, হয়ত সে বিশ্রাম নিচ্ছে।

আলভা যেন কেমন? অন্য মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করলেই মাথা নিচু করে ফেলে। এ শুধু আজ নয়, চিরকাল। অথচ এই আলভাই সমস্ত অন্তঃপুর দেখাশুনা করে। আলভা না থাকলে এই অন্তঃপুর সৃষ্টি করাও দিগো রিবেলীর পক্ষে মুশকিল হত। এক জায়গায় দুটি মেয়ে থাকলে বনিবনা হয় না তো চল্লিশটি মেয়ে! চল্লিশ জনের চল্লিশটি ঘর আছে। প্রত্যেক ঘরে তারা আলাদা থাকে। তাদের সব অভাব অভিযোগ আলভা পূরণ করে।

আলভা না থাকলে—চিন্তাই করতে পারে না দিগো রিবেলী। সে অন্তঃপুরে ঢোকে সারাদিন পরিশ্রমের পর কোন ঘরে বিশ্রাম নিতে। এ ছাড়া আর কিছুই তাকে দেখতে হয় না। দেখতে হলেই মুশকিল হত।

একবার কটি মেয়ের ঝগড়ার মাঝে পড়ে গিয়েছিল। এদেশী মেয়ে কেন, সব দেশের মেয়েরাই ঝগড়ায় পটু। স্নানের জল নিয়ে ঘটনা।

দিগো রিবেলী বাড়ীতে একটি কূয়ো কেটে দিয়েছিল, সেই কূয়োর জল তুলে পরিচারিকা বাথটবে বয়ে দিত, মেয়েরা যে যার এক এক করে স্নান করত। কোন একটি নতুন মেয়ে নদীর জলে স্নান করবে বলেছিল। তার জন্যে লোক দিয়ে নদীর জল আনানো হয়েছিল।

নতুন মানুষের সব আবদারই প্রথম প্রথম শুনতে ভাল লাগে। তখনও মনে মদির নেশাটা থাকে বলেই সব আবদার মেনে দেওয়া হয়। এ সব মেয়েদের বেলাই এক রকম। কিন্তু সেই নদীর জল নিয়ে লাগল কলহ।

পর্তুগালের মানুষ হলে কি হবে, দিগো রিবেলী এ দেশে থাকতে থাকতেই কেমন যেন এ দেশের মত হয়ে গিয়েছিল।

আলভা কিন্তু তা নয়, সে বলে, না, নিজের দেশকে ভুলবো কেন? মাদার ল্যাণ্ড অলওয়েজ আট্রাকস্ মি।

দিগো অতোটা ভাবতে পারে না। কবে দেশ থেকে চলে এসেছে। আজ মনেই পড়ে না। সুতোর মত ভাসে মনের আয়নায় কি যেন এক স্মৃতি। মনে পড়ে ছোটবেলা এদেশে তার কাটেনি। ছোটবেলায় খুব দুষ্টু ছিল। বাবা রাজপ্রাসাদে কাজ করত। বড়দিনের সময় তাদের ভাঙা বাড়ী খুব সাজানো হত। বাবা ইঁটের

সাইজ একটি কেক নিয়ে আসত। মা খুব ভাল গান গাইত। মার গান শুনতে কত কত লোক আসত। সে স্কুলে পড়ত তখন। তারপর আর কিছু মনে পড়ে না।

কেমন করে যেন তারপর কেউ চাকাটা ঘুরিয়ে ছিল। সব তালগোল পাকিয়ে গেল। হারিয়ে গেল। হারিয়ে গেল তাদের বাড়ীটা। বাপ মা কোথায় গেল আজ জানে না। যখন জ্ঞান হল, সেখান থেকে আবার তার জীবন শুরু হল, সেই জীবনের কথাই মনে পড়ে। ইণ্ডিয়ান ওশান্ দিয়ে যখন জাহাজ যাচ্ছিল সে দেখল নীল জলের মহাসাগর পেরিয়ে সে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। তারপর জানল সে এক বণিক জাহাজে চড়ে ইণ্ডিয়ায় যাচ্ছে। সেইখান থেকেই তার জীবন শুরু। তাই সে দেশের পোষাক ছাড়া আর কিছু শরীরে রাখেনি।

আলভাও এসেছিল তেমনি অতর্কিতে। এই হুগলী বন্দরেই একদিন জাহাজ থেকে নামছিল, সে মদ সওদা করছিল। কতকগুলি হন্যে পর্তুগীজ তাকে সেণ্টার দেবার জন্যে ব্যগ্র। কিন্তু সে তাদের কাছে না গিয়ে দিগো রিবেলীর কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর বলল, হ্যালো, হাউ ডু ইউ ডু। তুমি কি আমাকে সঙ্গ দিতে পার ?

দেশের মেয়ে। তারপর স্ব-ইচ্ছায় সে আত্মসমর্পণ করছে। তার প্রতিও তো কর্তব্য আছে ! তবু নিজের জন্মভূমিটা যেন বিস্মৃত হতে পারে না।

আলভাকে চার্চে নিয়ে গিয়েই বিয়ে করেছিল। সাহেবী ফাংশন।

সেই আলভা তার স্ত্রী। আলভা সাধ্বী স্ত্রীর মতই অন্তঃপুরের সব ঝঞ্ঝাট পালন করে।

সেই মেয়েদের জল নিয়ে ঝগড়া এত সপ্তমে উঠেছিল যে আলভা শান্ত করতে পারে নি। দিগো যখন বিশ্রামের জন্যে অন্তঃপুরে ঢুকছে হঠাৎ একদল মেয়ের এক জোট চিৎকার তার সামনে এসে আছড়ে পড়ল।

তারা সকলেই চাইল সাহেবের কাছ থেকে বিচার। কিন্তু দিগো রিবেলী হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তখন ক্লান্তিতে তার মাথা দুলছে। মদের নেশায় চোখ লাল। তা ছাড়া আদিম কামনাটা সারাদিন পর কেমন যেন সন্ধ্যে থেকে মাথার মধ্যে জমতে থাকে। তখন শুধু কোন একটি পুষ্ট যৌবনবতীকে নিয়ে তার নরম শরীরে মুখ ঘষতে ঘষতে সময় কাটাতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু ঐ এক গুচ্ছ রণরঙ্গিনী, শঙ্খিনী, হস্তিনী, মোহিনী মেয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাত পা ছুঁড়ে যা করতে লাগল তাতে করে দিগো রিবেলীর মেয়েদের ওপর থেকে সেই রাত্রের সমস্ত আকর্ষণ চলে গেল।

আলভা দূরে দাঁড়িয়েছিল।

আলভার সাহায্য নিতে হল। তারপর আলভার সাহায্যেই তাদের জানানো হল, আগামী কাল থেকে সবার জন্যে নদী থেকে জল আসবে।

সে রাত্রে আর এই ঝগড়াটে মেয়েদের ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে হয়নি ! আলভার ঘরেই ঢুকেছিল।

সন্ধ্যের একটু আগেই দিগো রিবেলী বাড়ীতে ফিরল। নিজের ঘরে বসে প্রচুর মদ খেল।

আলভাও বলল সম্রাটের হুকুম। সুবাদারের আদেশ জারী চিঠি এসেছে জানালো।

দিগো রিবেলী শুনে ওদিকে মন দিল না। আলভাকে বলল, ড্রিঙ্ক সার্ভ কর।

আলভা মাথা নিচু করে মদ পরিবেশন করল।

কয়েক গ্লাস খেয়ে তারপর আলভাকে বলল, একটা গান কর।

আলভা পিয়ানোর সামনে বসে একটি ধর্মসঙ্গীত গাইল।

অর্ধেক গাওয়া হয়েছে, হঠাৎ চিৎকার করে থামিয়ে দিয়ে দিগো রিবেলী লাল চোখ তুলে জড়িতকণ্ঠে বলল, কে তোমার কাছ থেকে ধর্মসঙ্গীত শুনতে চেয়েছে? হটস্ লাভ সঙ্গীত গাও।

আলভা মনের বেদনাটা উপশমের জন্যে পিয়ানোর রিড টিপে একটা ভাল সুর বাজাতে লাগল।

বড়বৌ মরিয়ম ঘরে ঢুকল। তার পোষাক বিচিত্র। সেও সুন্দরী তবে বড় লম্বা ও চওড়া। পরে এসেছিল একটি গাউন। কিন্তু গাউন পরে তার শরীরটা কেমন বেঢপ দেখাচ্ছিল। হাসতে হাসতে বলল, সাহেব দেখো আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?

দিগো রিবেলী তার দিকে বড় লাল চোখ দুটো তুলে তাকাল, তারপর ভ্রূকুটি করে বলল, মোটেই তোমাকে ভাল দেখাচ্ছে না। মেমসাহেব হয়েছ কেন? আমি এ পছন্দ করি না।

মরিয়ম ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, বারে. তোমার মেমসাহেব স্ত্রী যে গাউন পরেছে!

পরুকগে, ও ওর জাতীয় পোষাক, তুমি তোমার পোষাক পরবে।

আমার বুঝি মেমসাহেব হতে ইচ্ছে করে না! তুমি আমার সাহেব হাসব্যাণ্ড কেন?

দিগো রিবেলী বিরক্ত হল, বলল, মরিয়ম তুমি এখন এখান থেকে যাও। বিরক্ত কর না।

মরিয়ম কি ভেবে বিদায় নিল।

দিগো রিবেলী উঠে দাঁড়াল। কোমরে পিস্তল, হ্যাণ্ড থেকে চাবুকটা তুলে নিল।

আলভা তাড়াতাড়ি কাছে এসে হাত ধরল। বলল, ডারলিং আজ না হয় ওখানে না গেলে?

দিগো রিবেলী আলভার দিকে ঘৃণাদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, লোভী ডগ, দূর করে দেব একদম। দিগো রিবেলীর নেশা জড়ানো চোখ জ্বলছে।

আলভা অপমানিত হল, তবু বলল, তুমি ড্রিঙ্ক করেছ বেশি, সেইজন্যে বলছি। তুমি অন্য কারও ঘরে যাও। আলভা লজ্জায় মাথা নত করল।

না, আজ তার কাছেই যাব। ড্রিঙ্ক করলেও আমি ঠিক আছি বলে দিগো রিবেলী আর দাঁড়াল না। চাবুকটা হাওয়ার বুকে আছড়াতে আছড়াতে সেই হারেম অন্তঃপুরের দিকে এগিয়ে চলল।

রাত জমে উঠেছে। বাইরে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। গাছ গাছালির বুকে যেন কি এক ইশারা। আজও বাইরে জ্যোৎস্না ফোটেনি। শুধু তারা আর জোনাকি। আকাশে সলমা চুমকির মত তারার আলো। নিচে বনজঙ্গলের আঁধারে জোনাকিরা জ্বলছে।

দিগো রিবেলী এগিয়ে চলেছে চল্লিশটি ঘর পেরিয়ে। যেতে যেতে হীরার মুখটি তার মনে পড়ল। নিটোল দেহের অসামান্য যৌবন যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের রক্ত কেমন যেন লাফাতে লাগল।

মেয়েদের যৌবন এই এদেশের জীবন নিয়ে অনেক ভোগ করেছে। ঐ মরিয়ম, অহল্যাবাঈ, সরমা, আলভা, তারা যেন আজ আবর্জনার মত। তার চল্লিশটি রক্ষিতা। তাদের শরীর ছুঁতে ছুঁতে তাদের শরীরের সব রহস্য জানা হয়ে গেছে। যেন নদীর স্রোতের মত সব তরল হয়ে গেছে। দু'চার-দিন একটি মেয়ের ঘরে রাত কাটালে আর তার কাছে যেতে ইচ্ছে করে না। এমন কেন হয় সে জানে না। অথচ প্রথম দেখে শরীরটা যেন কেমন করে। কেমন যেন শরীর থেকে বেরিয়ে আসে এক দানবের শক্তি।

হয়ত এই হীরার বেলাতেও সেই একই ইচ্ছার পুনরাবৃত্তি হবে। কিন্তু তার আগে কি দুর্দমনীয় আকর্ষণ? মনে হয় যেন এই রাতে তাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে রক্তাক্ত করে দেবে। দিগো রিবেলী কি এক আসুরিক শক্তিতে শক্তিবান হয়ে চাবুকটা হাতে চেপে ধরে এগিয়ে চলল।

কে একটি মেয়ে পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে তাকে দেখতে পেল। চোখে এক ধরণের ভঙ্গি করে আর সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরিয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে আকর্ষণ করতে গেল। কিন্তু দিগো রিবেলী চাবুকটা তুলে ধরতে মেয়েটি হাতটি সরিয়ে নিল। তারপর মেয়েটিই ক্রুব্ধস্বরে বলল, আমায় চেনোনি সাহেব, আমি সুন্দরবনের মেয়ে। বাপ ছিল শিকারী, আমি কত বাঘ মেরেছি বাপের তীরধনুকে। একদিন তোমাকে শেষ করে দেব এ তোমায় বলে রাখছি।

দিগো রিবেলা উত্তর দিল না, একটু দ্রুত পা চালিয়ে তেরো নম্বর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকেই অন্য মেয়ে দেখে রক্ত তার মাথায় উঠল।

সেই মেয়েটি মৃদু হেসে বলল, এসো সাহেব।

মেয়েটি চেনা। একে যেন আগে ভোগ করেছে সে। শরীরটা দেখে মনে হচ্ছে কোথায় কোথায় তার স্পর্শ ছুঁয়ে আছে। কিন্তু সে কথা না ভেবে দিগো রিবেলী হঠাৎ গর্জে উঠল, ব্লাডি সোয়াইন, তুম্ হিঁয়া কাঁহে। উও কাঁহা গিঁয়া।

মেয়েটি কিন্তু ভয় পেল না। বুকে জোয়ার তুলে চোখে কটাক্ষ সৃষ্টি করল। বলল, ও কোথায় গেছে জেনে লাভ কি সাহেব? এসে যখন পড়েছ, আজ এখানেই কাটিয়ে যাও। আমার সুরত কি তোমার পছন্দ নয়? মেয়েটি দিগো রিবেলীর দিকে গা দুলিয়ে এগিয়ে এল।

ব্লাডি, সোয়াইন, সব চাবুক মেরে ঠিক করে দেব। দিগো রিবেলী রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঘর ছাড়ল।

ঘরের বাইরে আসতেই আলভাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। আলভা কেমন যেন ভীতদৃষ্টিতে, পাংশুবর্ণ মুখ নিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্বামীকে দেখে সে কম্পিত হল।

আলভাকে দেখে যেন পর্তুগীজ সাহেব তার লাল রক্তের উত্তাপ ভুলতে পারল না। যত রাগ আলভার ওপর চাপিয়ে দিল। চাপাবার কারণও ছিল। এই মেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তার। তাই আলভাকে দেখে দিগো রিবেলী হীরাকে না পাওয়ার আক্রোশে ফুলে উঠল। কোন কথা না বলে হাতের চাবুক বাতাসে আন্দোলিত করে উন্মত্ত সাহেব আলভাকে এলোপাথারি মারতে লাগল। সোয়াইন, ডগ, বিস্ট, নানা গালাগালির ফুলঝুরি বর্ষণ করে অন্তঃপুরের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করল।

আলভা কিছু বলতে গেল। চাবুকটা চেপে ধরতে গেল। তারপর হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল।

কিন্তু উন্মত্ত সাহেব যেন উন্মাদ হয়ে কি এক ভয়ঙ্করের দিকে এগিয়ে চলল।

ঘরগুলি থেকে মেয়েগুলি ছুটে এল কিন্তু কাছে এগিয়ে আসতে সাহস করল না। দূরে দাঁড়িয়ে তারা আতঙ্কে চোখে হাত চাপা দিল।

হঠাৎ দিগো রিবেলী আলভার ক্ষতবিক্ষত, চাবুকের আঘাতে ফোলা ফোলা বিকৃত দেহটি টানতে টানতে নিয়ে চলল। উত্তেজনায় রিবেলীর শরীর দিয়ে ঘাম ঝরছে। চোখ দুটি আরও লাল। হাঁপাচ্ছে। বুকটা তার ওঠা নামা করছে। তখনও বলছে, আজ তোকে শেষই করে দেব। এত বড় আস্পর্ধা, আমার সখের জিনিস, সরিয়ে দিয়েছিস! আলভাকে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে গেল দিগো রিবেলী। আলভার তখনও জ্ঞান ছিল, শুধু কোমল অঙ্গ চুঁইয়ে রক্ত ঝরছিল। স্কার্টটা ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে। সুন্দর মুখখানি চাবুকের আঘাতে কেমন যেন বীভৎস। জল গড়িয়ে গাল ভেসে যাচ্ছে। হঠাৎ পিস্তলের শব্দ হল। একবার নয় দুবার।

আলভা আর কথা বলতে পারল না। একটা চিৎকার তুলতে গিয়ে না পেরে তার নিস্পন্দ দেহ মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

দিগো রিবেলী তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে মৃত আলভার দিকে। তখনও তার হাতে উদ্যত রিভলবার।

হঠাৎ যেন তার সব উত্তেজনা কমে গেল। কেমন যেন রাতের রহস্যময় প্রবৃত্তির শক্ত বাঁধন থেকে ছাড়া পেয়ে বুঝতে পারল, সে কি করে ফেলেছে! কিন্তু যা করেছে তাতো আর ফিরে আসবে না! যে গুলি হাত থেকে ছিটকে গেছে সে রক্ত নিয়েই মুখ থুবড়ে পড়েছে। কিন্তু দিগো রিবেলী পিস্তলটাকে দূরে ফেলে দিয়ে ঢক্ ঢক্ করে মদ গিলল, তারপর অন্ধকার পথে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সামনে ভীড় করে দাঁড়িয়ে থাকা আতঙ্কিত মেয়েদের দিকেও ফিরে তাকাল না। এমন কি সরমা যে শান্তচোখে, কমনীয় মুখ নিয়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে এসে দাঁড়িয়েছে,

যে সরমার মুখ দেখলে দিগো রিবেলী ভুলতে পারে না, সেই সরমার দিকেও না তাকিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে চলল।

বাইরের আকাশে তখন জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ ঐশ্বরিক আলো। অশরীরী গাছগুলি যেন অতীতের হারানো আদিম পিপাসা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘুমে অচেতন আর সব।

দিগো রিবেলী সেই ঘুমন্ত গ্রামের পথ দিয়েই যেন কোথায় এগিয়ে চলল।

●

● ●

আলভা দোষ অবশ্য করেছিল। সে যে কেন হীরাকে সরিয়ে দিল সে নিজেই জানে না। সেদিন সকালে সেই এসে প্রস্তাবটা হীরার কাছে তুলে ধরেছিল।

হীরা শুনে আশ্চর্য হয়েছিল। হীরাও চাইছিল। হীরাও চাইছিল এমনি একটা কিছু। আজ না পালালে আজ আর রাত্রে সাহেব তাকে রেহাই দেবে না।

তবু আলভার কথা শুনে তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। কৌতুক করে জিজ্ঞেস করে, তোমার এতে স্বার্থ? সাহেব যখন জানতে পারবে?

আলভা কথা বলেনি। শুধু অনেক পরে চাপাকণ্ঠে অস্ফুটস্বরে বিচিত্র শব্দ করেছিল।

হীরা খিল খিল করে হেসে উঠেছিল।

আলভা রাগতকণ্ঠে বলেছিল, তুমি হাসছ কেন? তোমাকে মুক্তি দিতে চাইছি, নেবে না?

বললাম তো, তোমার কি স্বার্থ আছে বলো, তাহলে আমি রাজী হতে পারি।

আলভা এবার স্পষ্টস্বরে বলেছিল, তুমি মেয়ে হয়ে এ কথা বোঝো না? স্বামীকে আমি নিজের করে পেতে চাই।

হীরা আবার হেসে উঠেছিল। তারপর হাসি প্রশমিত হলে বলেছিল, মরেছ তুমি? সাহেবের তো অনেক সোহাগী! তুমি আমাকে সরিয়ে দিয়ে কি করবে? সাহেব আবার বাজার থেকে কিনে আনবে।

তা আসুক, তুমি যাবে কিনা বলো।

হীরা আর আলভাকে চটায়নি। আলভার হাত ধরেই দিগো রিবেলীর অন্তঃপুরের বেষ্টনী ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছিল। হীরা মনে মনে এই চাইছিল। পালাতে হবে কিন্তু কেমন করে পালাবে সে জানে না। তাই বাইরে বেরিয়ে এসে সে মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নিয়েছিল। কোথায় যাবে তাও তার জানা ছিল। যে জন্যে হুগলীতে পালিয়ে এসেছে, সেই মুক্তি, মুক্তিই সে পেতে চায়।

সকালের রোদ্দুরটা সবুজ ঘাসের বুকে খেলা করছে। ধোয়া কাপড়ের মত আকাশ নীলের ছোপ বুকে নিয়ে জেগে আছে।

দিগো রিবেলীর বাড়ীটা নদীর তটভূমি ছেড়ে একটু ভেতরে।

ধানীজমি, হলুদ ধানের সোনালী বর্ণ নিয়ে ধানচারাগুলি রোদে ঝলমল করছে। গাছে গাছে পাখি ডাকছে। পুকুরে সাহেবদের দাসদাসী।

হীরাকে দেখে অনেকে চোখ তুলল। হীরার পরণে সেই দিগো রিবেলীর পোষাক। হীরা খুব দ্রুত চলছিল। মনে ভয়, যদি সেই সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাহলে আর পালানো হবে না। কেনা বাঁদী, জোর তার আছে। তাকে দিয়ে যা খুশি করাতে পারে।

আমগাছের ডালে শালিক বসে কিচির মিচির করছে। অশ্বত্থ গাছের লম্বা পাতায় রোদ্দুরের ঝিলিক।

হীরাকে দেখে অনেকে চোখ ঘোরাচ্ছিল। হীরার যৌবন দেখে ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত পর্তুগীজ চাষীরা শিষ দিয়ে উঠল।

একজন চাষী ধান গাছের চারা লাগাতে লাগাতে গান গেয়ে উঠল।

একজন চোখ ঘুরিয়ে বলল—কে রে? কোথায় যাচ্ছে? ধরে নিয়ে আয় না?

হীরার কানেও সে কথা গেল। সে চোখ ঘুরিয়ে সেই বক্তাকে দেখল।

হীরা কোনদিকে না তাকিয়ে এগিয়ে চলল। তার চলার তালে তালে সমস্ত অঙ্গ দুলতে লাগল। কামিজ ভেদ করে তার ফুটন্ত যৌবন ফুলের মত হাওয়ায় ভেসে ভেসে নৃত্যের ছন্দে এগিয়ে চলল। যে চাষী ধরে নিয়ে আয় বলেছিল তার দিকে কয়েকবার ফিরে ফিরে হীরা দেখল।

বেচারার লিকলিকে চেহারা। চোখের মধ্যে শুধু লালসা থকথক করছে। হীরা মনের মধ্যে হাসির ঢেউ ছড়িয়ে দিয়ে আরও শরীরটাকে দুলিয়ে দিল।

ওপাশ থেকে সেই চাষী বলল—বাপরে বাপ, যেন সাপের মত ছোবল দিচ্ছে।

হীরা অন্য পথ ধরল! কোন পথই সে জানে না। শুধু আন্দাজে আন্দাজে এগিয়ে চলা। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, আর চলতে পারল না। যে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল তাকে দেখে চিনতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন হাসিতে ভেঙে পড়ল সে। বলল, মুরোদ নেই শুধু দেখার সাধে আত্মহারা। ছিলে কোথায় বাপু কাল, কাল ঐ বুড়োটার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারলে না!

হীরা আবার হেসে উঠল, তারপর পথরোধকারীর গা বেয়ে ডিঙিয়ে ওপাশে চলে গেল।

হীরা আবার চলতে লাগল। হারিয়ে যাওয়া সাহসটা তার ফিরে এল। আর ভয় থাকল না। ভয় তার এমনই খুব একটা ছিল না। এমন কি দিগো রিবেলীর সামনে পড়লেও যে সে ভয় পাবে না এমন মনে হল।

যে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল সে সেই দাসবাজারের পাহারাদার রক্ষী পর্তুগীজ যুবক। যার চোখের দৃটির ভাষা পড়ে হীরা উচ্ছল হয়েছিল।

কিন্তু সে ঘটনা গতকাল চুকে বুকে গেছে। হীরা ভুলেও গিয়েছিল তার কথা। একটি তরুণ ছেলে, সবে মুখটিতে গোঁফ দাড়ি উঠে পাকতে শুরু করেছে। চোখে হয়ত রঙ লাগে কিন্তু তারপর আর কি? আসল জায়গায় আসতে এখনও অনেক

দেরি। সেই জন্যে হীরা তাকে নিয়ে এক গাদা মেয়ের মধ্যে ছেলে ভুলানো খেলা খেলেছিল। তারপর ভুলে গেছে।

পর্তুগীজ যুবকটি পা মেলাতে পারছিল না। তার পরনে সেই আগের পোষাক। এবার টুপিটি অনেকখানি তুলে দিয়েছে।

সোনালী চুলগুলি সোনা রোদে ঝিলমিল করছে।

নীল চোখে কেমন যেন দৃষ্টি।

এই ম্যাডাম, আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় ভাল সেণ্টার দেব।

হীরা ঘুরে দাঁড়াল। মুখে তার দুষ্টুমির হাসি। বলল, পারবে? যদি পারো, তাহলে আমি তোমার···

যুবকটির নাম মাইকেল গারসিয়ান। থাকে ঐ পর্তুগীজ দুর্গের মধ্যে। চাকরি, দাসবাজারে পাহারা দেওয়া।

হীরার কথায় মাইকেল যেন সাহসী হল। বলল, দেখোই না আমার ক্ষমতা।

তাহলে তখন কেন সে সাহস দেখাও নি, তাহলে তো আমাকে এত হুজ্জতি পোয়াতে হত না।

মাইকেল কোন জবাব দিল না। হঠাৎ অন্য একটি পথ ধরে বলল, এসো, আমি তোমায় লুকিয়ে রাখব।

হীরা হঠাৎ বড় বড় চোখ করে মুচকি হাসল, বলল, থাক সাহেব, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমি এখন যাব তোমাদের গির্জায়। তারপর তোমাদের ধর্ম নিয়ে যা হয় করব।

মাইকেল মাথা নেড়ে খুশি হয়ে বলল, না, না ওসব করতে হবে না। তোমাকে আমি বিয়ে করব, তাহলে আমাদের ধর্মে এসে যাবে।

বিয়ে করবে? হীরা মুখ টিপে হেসে বড় বড় চোখ মেলে তাকাল।

তারপর কি ভেবে বলল, কথাটা মন্দ বলনি সাহেব? তোমাকে আমি একটু বিশ্বাস করতে পারি। আচ্ছা, চলো কোথায় নিয়ে যাবে? তোমার দৌড়টা একবার দেখে আসি। মাইকেলের পিছু পিছু হীরা এগিয়ে চলল।

ওরা এগিয়ে চলল সেই ধর্মান্তরিত খৃষ্টানদের পল্লীর দিকে। যেতে যেতে তারা দেখতে পেল দাক্রুজ ধর্মযাজক মাঠে মাঠে ফুলের বীজ ছড়িয়ে চলেছে।

দা ক্রুজ তাদের দিকে একবার চাইল।

হীরাও,তাকে দেখল। তার যেন ফাদারকে কেমন ভাল লাগল।

হাওয়ার বুকে রোদ্দুরটা ঘুরছে। চেনা চেনা এ দেশের লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হীরা যত এগোতে লাগল, তত মানুষগুলিকে যেন তার চেনা লাগতে লাগল। মনে তার আত্মীয়তার সুর জেগে উঠল। মাইকেলকে জিজ্ঞেস করল, এরা কারা! এদের সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ কি?

মাইকেল বুঝিয়ে দিল সম্বন্ধটা।

শুনে হীরা তাকিয়ে রইল। খৃষ্টান ধর্মের নতুন মানুষ। মুক্তি পাগল ক্রীতদাসের

দল ধর্ম করেও বাঁচবার চেষ্টা করছে। তারপর ভাবল, সেও তো তাই করতে চলেছে! তার জন্যেই তো সে এত পথ এসেছে। হঠাৎ মাইকেলের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

মাইকেল মৃদু হাসল, বলল, বিশ্বাস করে এসো।

তারপর এগিয়ে গিয়ে সারি সারি নতুন খড়ের চালের ঘরের এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল।

মাইকেল কার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকল।

ঠিক কোন গ্রাম্য অধিবাসীদের পর পর ঘরের দাওয়া। ধানের মরাই আছে, হাঁস মুরগী চরে বেড়াচ্ছে। লাউয়ের ডগা ঘরের চালে উঠেছে। পেঁপে গাছে ফল ধরেছে। শুধু স্বতন্ত্র নারী পুরুষের পোষাক। কেমন যেন দেশী শরীরে বিদেশীর ছাপ।

মাইকেল ডাকতে কে যেন একটি ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

এ দেশী লোক, কাল চেহারা, পরেছে সাহেবী পোষাক। মাইকেলের সঙ্গে পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলল। তারপর হীরার দিকে তাকিয়ে এ দেশী ভাষায় মৃদু হেসে বলল, তুমি নিশ্চিন্তে এখানে আশ্রয় নিতে পার। মাইকেল আমার ছোট ভাইয়ের মত। তাছাড়া আমরা এখন পর্তুগীজ সরকারের অধীন, একদিন এ দেশে পর্তুগীজরা রাজা হবে আর তাদের ভক্ত প্রজা হব আমরা। আমাদের স্থান প্রথম সারিতে কে আটকায়? এই বলে এ দেশী কালো লোকটি সাদা দাঁত মেলে হা হা করে হাসল। তারপর নিয়ে গেল একটি ঘরের মধ্যে।

ঘরও সেই বাংলা দেশের কোন এক পল্লীর মত। তবে ঘরের দেয়ালে ঝুলছে মেরী মাতার ছবি। আর ঘরের মাঝে পাতা চেয়ার টেবিল। সেই কালো দেশী সাহেব লোকটি তাদের চেয়ার টেবিলে বসতে দিল।

হীরা তাকিয়েছিল ঘরের আসবাবের দিকে।

লোকটাও একটা চেয়ার অধিকার করে বসল, তারপর কি ভেবে জামার ভেতর থেকে গলার কারে ঝোলানো লম্বা ক্রুশটা বের করে চোখ বুজে কাকে যেন ডাকল, তারপর জামার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে হেসে বলল, পাপ কথা মনে আসছিল, তাই আওয়ার লেডির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম।

মিসেস ঘরে এসে ঢুকল। তাকে দেখে মনে হল অন্য কোন ভারতীয়। অন্তত মুখখানি বাংলা দেশের মত নয়। তাকে দেখিয়ে কালো লোকটা বলল, আমার মিসেস, সবই আওয়ার লেডির কৃপায় পেয়েছি। তা এ বেশ ভালই হয়েছে। ছিলাম এক গণ্ড গ্রামের নাপিত বংশের ছেলে। জাত ব্যবসা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত। সাহেবের কৃপায় জাতে উঠে গেলাম। এখন ফাদারদের দাক্ষিণ্যে মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থালী।

মোটামুটি রূপসী মিসেস এসে হীরার হাত ধরল। কালো লোকটা বলল, আমাদের মাইকেলের ইয়ে, বুঝতে পারছ। খাসা কিন্তু। লোকটা হাসল।

মিসেস কেমন যেন দৃষ্টি দিয়ে স্বামীকে তিরস্কার করল।

মাইকেল মৃদু হেসে বলল, স্যামুয়েল, তাহলে আমি যাই। ডিউটি খতম হলে নাইটে আসব। মাইকেল উঠে দাঁড়াল। আর স্যামুয়েল তাকে বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল।

স্যামুয়েলের হিন্দু নাম ছিল কালিপদ। পদবী পরামাণিক।

মিসেস স্যামুয়েলের এ দেশীয় যে নাম ছিল কেউ জানে না। সে ঐ দাসবাজারের বণিক সর্দারের হট্টগোলে হারিয়ে গেছে। এখন সে মারিয়া পরামাণিক। মারিয়া হীরার দিকে তাকাল, তারপর মৃদু হেসে বলল, এসো ভাই, তোমাকে বাথরুমটা দেখিয়ে দিই।

হীরা আর তখন কিছু ভাবছিল না। ধর্ম হারানো এদেশী লোকদের খৃষ্টান গৃহস্থালী দেখছিল। সবই বাংলা দেশের পল্লী ছবি। সেই ধানের মরাই, ঢেঁকি কোটার শব্দ। খড়ের চালে লাউ, কুমড়ো ঝুলে আছে। উঠোনে হাঁস মুরগী চরছে। গোয়ালে গরু জাবর কাটছে। পেঁপে গাছে পেঁপে, বেগুন গাছে বেগুন। গ্রীষ্মের চড়া রোদে কাঁঠাল পাকছে।

হীরার কি যেন মনে পড়তে লাগল। কোথায় যেন হারিয়ে যাওয়া বিস্মৃতির অতলে ছোট্ট একটু স্মৃতি।

এমনি একটি পল্লীর সোনা রোদে রাঙানো মাটির ঘর। দুরন্ত সে দিনগুলি তিরস্কারের মধ্যে দিয়ে কেটে যেত মধুর কত স্বপ্ন নিয়ে। মেয়ের সব জায়গায় যেতে মানা। পুকুরে যাসনি পড়ে যাবি, রোদ্দুরে ঘুরিসনি রঙ কালো হয়ে যাবে। মেয়ে হয়েছিস্ মনে নেই, ছেলেদের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াস্। হীরার যেন সে সব কথাই আজ মনে পড়ে।

মনে পড়তে বুক চিরে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। হঠাৎ আচমকা ব্যাণ্ডেল গির্জা থেকে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসে। সে চমকে উঠে বর্তমানে ফিরে আসে।

তারপর কেটে যায় তিনদিন। মাইকেল এই তিন দিনে কবার এসেছে। হীরা আগের মত আবার উচ্ছল। মাইকেল এলে হীরা আরও উচ্ছল হয়। তার মনে প্রজাপতির মত রঙের ঘোর লাগে। এ দিগো রিবেলী নয়, দেনা পাওনা নিয়েই তার কারবার। মাইকেল তরুণ। লাজুক লাজুক চাউনি দিয়ে কি যেন জড়ানো স্বরে বলতে চায়। তখন হীরার বুকে সমুদ্রের জোয়ার ওঠে। আকাশের রঙ ফেরা দেখে। সে আর আগের মত মাইকেলকে নিয়ে পরিহাস করে না। ডাগর চোখে কটাক্ষ হেনে তাকায়। মুখ টিপে হেসে ঘন হয়ে মাইকেলের পাশে বসে।

মারিয়া বলে, তোমরা দেরী করছ কেন বাপু? চার্চে গিয়ে ম্যারেজটা সেরে এস।

হীরাও যেন নিজের মনের কথা বুঝতে পারে।

মাইকেল কিছু বলে না।

ওরা নদীর দিকে যায় না। দুর্গের দিকে হাঁটে না। ঘুরে বেড়ায় নতুন খৃষ্টান

পল্লীর আনাচে কানাচে। মাইকেল নিজের দেশের গানের সুরে সিটি বাজায়। হীরা শুনে পুলক অনুভব করে।

দূরে ব্যাণ্ডেল গির্জার দিকে উপাসনার জন্যে যায় পল্লীবাসীর দল। হীরা তাকিয়ে দেখে। এত সুখ, এত শান্তি, তবু যেন কিসের ভয়ে সে এক সময়ে মুষড়ে পড়ে। তখন মাইকেলকেও তার ভাল লাগে না।

মাইকেল কোন অসভ্যতা করে না। কোনদিন কোন কথা বা ইঙ্গিত। শুধু পাশে বসে। হয়ত ঘন হয়ে বসে। বসে কাতর চোখে তাকিয়ে থাকে। চোখ জুটোয় কিসের যেন দৃষ্টি। হীরার মনে হয় মাইকেল বিদেশী নয়। তাদের দেশেরই কোন তরুণ যুবক। তাকে ভালবেসে সব কিছু দিতে চায়।

প্রজাপতি ফুলের বৃন্তে বসে কি যেন তুলে নেয়। আনন্দে দুলে ওঠে ফুলের তনু।

রাত নামে কি যেন ঘোর নিয়ে। হীরা তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভুলে যায় সব। তবু যেন তার কেমন ভয় করে? অন্ধকার রাতে গাছের পাতা নড়ে উঠলে তার বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। তার মনে হয় মাইকেলের সঙ্গে তার ঘর বাঁধা হবে না। কেউ যেন তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে। দিগো রিবেলী নিশ্চয় তাকে খুঁজছে, সেই কিনা তাও সে বুঝতে পারে না। তাই সব আনন্দ সব খুশি, মনের রঙবদল মাঝে মাঝে সব ভুলিয়ে দেয়, আবার মনে পড়লে সে মাইকেলের সঙ্গে কথা বলতেও ভুলে যায়।

মাইকেল তার এই ভাব পরিবর্তন দেখে মৃদুকণ্ঠে বলে, তুমি কিসের জন্য এত ভয় পাচ্ছ? সেই বুড়ো সাহেবটা তোমার কোন খোঁজই পাবে না। তাছাড়া খোঁজ যদি পায়, যে টাকা দিয়ে তোমায় কিনেছে, দিয়ে দেব। এবং একটা খবর অবশ্য জানো না, মিঃ রিবেলী তার পর্তুগীজ স্ত্রীকে নিজের পিস্তল দিয়ে হত্যা করেছে।

শুনে হীরা চমকে ওঠে। কাগজ সাদা মুখে বলে, কারণ?

কারণ কি কেউ জানে না। তারপর মাইকেল তাচ্ছিল্য ভরে বলে রিবেলীর ওপর কেউ খুশি নয়। লোকটা পাকা একটা শয়তান।

হীরা হাসতেও পারে না, কিন্তু আলভার মুখটা মনে পড়তে তাকে পালানোর সাহায্য করার ঘটনাটা মনে পড়ে। বেচারী আলভা! তাকে সরিয়ে দেবার জন্যেই রাগে রিবেলী তাকে খুন করেছে।

হঠাৎ একদিন বন্দর ঘাটা থেকে স্যামুয়েল পরামানিক দৌড়তে দৌড়তে বাড়ি এল। হাঁফাতে হাঁফাতে যা বলল তা রীতিমত ভয়াবহ।

বাদশাহ শাহজাহানের একটি বাঁদীকে পাওয়া গেছে কিন্তু সে মৃত। বণিক ফেডরিক আগ্রা থেকে চল্লিশ মাইল দূরে এক জঙ্গল থেকে সেই মৃতদেহ তুলে এনেছে।

আরও খবর যোগাড় করেছে, আর একটি বাঁদী নাকি এই হুগলীতেই এসেছে। তবে কবে দাসবাজার থেকে বিক্রী হয়ে গেছে কেউ বলতে পারে না।

ফেডরিক সেনাপতি ডি মিলোকে আশ্বাস দিয়েছে, ভাবনার কিছু নেই, একজনকে যখন পাওয়া গেছে তখন অন্য জনকেও পাওয়া যাবে। সে ভার ফেডরিকই নিয়েছে। এখন মুঘল সুবাদার কাশিম খান জুয়িনীর কাছে সেই বাঁদীর মৃতদেহ পাঠান হচ্ছে।

স্যামুয়েল এই কথা পৌছে দিয়ে আবার দুর্গের দিকে চলে গেল।

তখন দুর্গের মধ্যে ভীড়ের চাপ অত্যধিক। বাঁদীর দুর্গন্ধময় গলিত মৃতদেহ বাইরের খোলা জায়গায় রাখা হয়েছে। সবারই নাকে কাপড় চাপা দেওয়া। সুন্দর দেহটি কি এক আতঙ্কে বিস্ফারিত। চোখে মুখে আতঙ্ক নিয়ে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে। মাছি ঘুরছে দলে দলে। মেয়েটির শরীরে একটি সালোয়ার ও কামিজ, তবে মূল্যবান। এবং এমন রকমারী যে সম্রাটের অন্তঃপুর ছাড়া এ মূল্যবান পোষাক কেউ পরতে পারে না। এই পোষাক দেখেই ফেডরিক ধরেছে। এ সেই হারানো বাঁদী। মেয়েটির ওপর যে বলপ্রয়োগের চেষ্টা হয়েছে তা তার চেহারা দেখেই বোধ হয়।

ফেডরিক সব কথাই বলেছে। মেয়েটিকে সেই একদিন জঙ্গলে পেয়েছিল। সঙ্গে দু'জন ছিল। একজন তার হাতে পড়ে ইজ্জত দিয়েছিল কিন্তু মৃত্যু কেমন করে হল সে জানে না। মেয়েটি ইজ্জত দিয়ে তার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। আর একটি ঘটনা সে বলল না, তারই জাহাজে যে আর একটি মেয়ে পরে এসে উঠেছিল, সে কথা চেপে গেল। সে মেয়েটির ইজ্জত নেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু মেয়েটির সঙ্গে বল প্রয়োগে পারেনি। যতবার চেষ্টা করেছে, মেয়েটি একটা না একটা অস্ত্র নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারপর সেও কি ভেবে ছেড়ে দিয়েছে কারণ তখন জাহাজে ভোগ করবার মত আরও মেয়ে ছিল। এসব কথা ডি মিলোকে বললে সেনাপতি হয়ত অন্য চার্জ আনতে পারে ভেবে চেপে গেল। শুধু বলল, কিছু ভাবনার নেই সর্দার, আমি দ্বিতীয়টিকে খুঁজে দেব। মনে হয়, এ এখানে এসেছে, তারপর অন্য মেয়ের মত বিক্রী হয়ে গেছে।

ফেডরিক সেই দিনটিকে স্মরণ করে রূপসী মেয়েগুলি কার কার কাছে বিক্রী হয়েছে স্মরণ করবার চেষ্টা করল।

এদিকে তখন মুঘল সেনাপতির কাছে মৃত বাঁদীটিকে পাঠাবার তোড়জোড় চলেছে। ডি মিলো সেনাপতির চিঠির উত্তরের খসড়া করে ফেলল: 'এই সঙ্গে একটি বাঁদী পাঠাচ্ছি, দ্বিতীয়টিও বোধহয় পাঠাতে পারব, তবে আর ক'দিন সময় অতিরিক্ত দরকার। পর্তুগীজরা আর যাই হোক, বেইমান নয়। ধর্মের কল্যাণের জন্যে তারা কখনও মানুষের ওপর অত্যাচার করে না। তাছাড়া সম্রাটের পালানো বাঁদী আমরা ফুঁসলিয়ে নিয়ে এসেছি বলে যে দোষারূপ করা হয়েছে তা সত্য নয়। একটি বাঁদীকে আগ্রা প্রাসাদের চল্লিশ মাইল দূরে একটি জঙ্গলে পাওয়া গেছে। তাকে সম্ভবত কোন পশু আঘাত করে শেষ করেছে। আমাদের একজন কমরেড

বহু অনুসন্ধানের পর খোঁজ পেয়েছে। আওয়ার লেডির কৃপায় আমরা ধর্ম বিশ্বাসী বলে এই বিপদে বেঁচেছি। সম্রাটকে লিখবেন, অন্য বাঁদীটিরও খোঁজ করছি। কতকগুলি অসহায় লোক সামান্য ব্যবসার জন্যে এদেশে এসেছে, তাদের অন্যায় ভাবে দায়ী করবেন না। নিজেদের অসাবধানতার গলতি পরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার মত মূর্খতা আর নেই।'

চিঠির খসড়া হয়ে গেল।

পর্তুগীজ সরকারের বজরা ঘাটে ভিড়ল। ক'জন সৈনিক সেই মৃতদেহ ধরাধরি করে বজরায় তুলল, ডি মিলোর চিঠি সঙ্গে নিয়ে চলে গেল।

ভিড় কিছু কিছু কমে গেল।

ক্রেতা বিক্রেতা আবার দাসবাজারে গিয়ে জমা হল। দড়িতে বাঁধা, হাতের ফুটোতে জড়ানো, গোয়ালের গরুর মত সব মানুষের পাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছিল।

বিক্রেতা চিৎকার করতে লাগল। ক্রেতা হাত বাড়াল।

এক চোখ কাণা ফেডরিক এক চোখের শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে ঘুরতে লাগল। বাজপাখীর মত তার দৃষ্টিতে অরণ্যভেদী রহস্যময়তা। সে স্মরণ করবার চেষ্টা করতে লাগল সেদিনের ঘটনা। মৃত মেয়েটির মত মূল্যবান সালোয়ার কামিজ পরা ঐ মেয়েটি যেন কেমন বাচাল। হাসিটা ধারাল। সমস্ত জাহাজ কাঁপিয়ে সে হাসত। রাত্রিবেলা কাউকে ঘুমোতে দিত না। সে নিজেই এসে উঠেছিল জাহাজে।

জাহাজ ভাগীরথীর উজান ঠেলে সারা ভারত খুঁজে মানুষ সওদা করে নিয়ে আসছিল। ফেডরিক তখন জাহাজের উঁচু মঞ্চে দাঁড়িয়ে। দেখছে বাতাসের গতি। পাল নামিয়ে দেবে কিনা ভাবছে। মদের বোতল হাতে।

সকালের মিষ্টি রোদ্দুর দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। খোলা জলের অফুরন্ত স্রোত ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়ছে। দু'পাশে অরণ্যের ঝুপিঝাপি সবুজ গাছপালা। নিঝুম হয়ে পড়ে আছে। সোনালী আলো লেগে, বাতাসের ঢেউয়ে গাছপালা নড়ছে। চিল উড়ছে আকাশে।

পাশ দিয়ে অন্য পণ্যবাহী নৌকাও যাচ্ছে। তারা পর্তুগীজ জাহাজ দেখে ভয়ে পাশ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে।

এ পথ ফেডরিকের চেনা। সারা বছরই এ পথে তাকে যাওয়া আসা করতে হয়। অনেক মুঘল রণতরীর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ লেগে যায়। তার রক্ষীরাও তৈরী। জলপথে বাদশার সৈন্যরা পারে না; দূর থেকে বন্দুক তুললেই পালিয়ে যায়।

জলপথে পর্তুগীজদের সঙ্গে পারা এ দেশের কর্ম নয়। তাই তারা সরে পড়ে। সেইজন্যে বাদশাহের রাগ।

একবার মুসলমান তীর্থযাত্রীর হজে যাওয়ার জাহাজ আটক করেছিল। জাহাজের নারী পুরুষদের সে কি কান্না? তারপর বাদশাহের বিশেষ অনুরোধে তাদের ছেড়ে দিয়েছিল।

এ দেশের রাজাকে এখন চটিয়ে কোন লাভ নেই। ধীরে ধীরে সেই মুঘল

শক্তিকে বশীভূত করে তারপর ভারতবর্ষ কেড়ে নিতে হবে। ফেডরিক নিজের মনেই হা হা করে হাসে। এই সব কথাই ফেডরিক সেই জাহাজের উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ভাবছিল।

জাহাজের ভেতর থেকে ধরা মানুষের কলরব ভেসে আসছিল। রক্ষী চাবুক তুলে তাদের থামানোর চেষ্টা করছে।

হঠাৎ ফেডরিক চমকে উঠল কি যেন কানে শুনে। এক চোখ দিয়ে সেই চিৎকার অনুসরণ করে দূরে ভাগীরথীর কিনারে দেখল, দেখল একটি মনুষ্য শরীর জাহাজের দিকে একটুকরো কাপড় উড়িয়ে তাদের ডাকছে।

হঠাৎ সেই কাপড়টাও অসাবধানে উড়ে গেল। তখন সে হাত নেড়ে ডাকতে লাগল।

ফেডরিক এক চোখ দিয়ে শ্যেনদৃষ্টি পাঠিয়ে দিয়ে বুঝল যে ডাকছে সে একজন নারী। দূর থেকেও বোঝা যায় তার ছোট্ট শরীরকে বেষ্টন করে চাকচিক্য পোষাক আলো জেলে সব কিছু পরিষ্কার করে দিয়েছে। ফেডরিকের চোখে খুশি ঝলকে উঠল। এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। যারা দস্যুতা করে মানুষ জাহাজে তোলে, তাদের জাহাজে কেউ স্বইচ্ছায় আশ্রয় নিতে আসে তা এই প্রথম। সে আর দ্বিরুক্তি করল না। হঠাৎ সেই উঁচু অংশ থেকেই লাফিয়ে পড়ল ভাগীরথীর ঘোলা জলে। তারপর সাঁতার দিয়ে নির্দিষ্ট পাড়ে গিয়ে পৌছলো।

মেয়েটি ফেডরিককে দেখেই চমকে উঠল কিন্তু তখন আর উপায় নেই। ফেডরিকও চিনল তাকে। জল থেকে উঠে হাতটা চেপে ধরে শয়তানের মত হেসে উঠল।

মেয়েটি ভ্রূকুটি তুলে বলল, তুমিই তো জুলেখার সর্বনাশ করেছ?

ফেডরিক এক চোখ নাচিয়ে হাসি ছড়িয়ে বলল, আর তুমি পালিয়েছিলে!

কিন্তু মেয়েটি হঠাৎ কেমন যেন প্রগলভা হল। মৃদু হেসে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, মোটেই না। আমি তোমাদের একদম ভয় করি না।

ফেডরিক বলল, ভয় যখন কর না, তবে চল আমরা বনের মধ্যে যাই!

মেয়েটি হঠাৎ ফুঁসে উঠল, ইস্ এত সহজে নাকি?

ফেডরিকের বেশ মজা লাগছিল। তার ভিজে পোষাক থেকে জল ঝরছিল। সে কানা চোখ থেকে জল সরিয়ে দিয়ে বলল, তবে ডাকলে কেন?

তোমার জাহাজ এটা মোটেই ভাবিনি।

এখন তো দেখতে পারছ আমার জাহাজ, তা কি করবে বলো? জাহাজটা দূরে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়েছিল। সেই দিকে তাকিয়ে মেয়েটি কি ভাবল। ওড়নাটা জাহাজকে নিশানা করতে গিয়ে হাত থেকে জলে পড়ে গেছে। ভরাটি বুকটির দিকে সম্পূর্ণ লোলুপ দৃষ্টিতে এক চোখ কাণা সাহেবটা তাকিয়ে আছে। কি ভেবে মেয়েটি বলল, তোমার জাহাজ কি হুগলীতে যাচ্ছে? যদি সেখানে যায় তাহলে আমি যাব। আমি খৃষ্টান হয়ে তোমাদের ধর্ম নেব।

এ মেয়েটা বলে কি ? ফেডরিক এক চোখ নিয়েই পিটপিট করে চাইল। এদের নিয়ে যেতে কত মেহনত করতে হয়, আর এই সুন্দরী যুবতী, যার রূপ দেখে হাত পাগুলো নিস্‌পিস্‌ করছে। হঠাৎ মেয়েটাকে সে কোন কথা বলতে দিল না। ততক্ষণে একটি ছোট্ট নৌকা এসে গেছে। ফেডরিক মেয়েটিকে ঝাপটে তুলে নিয়ে বল খেলার মত ছুঁড়ে দিল নৌকোয়। আর একজন ক্যাচ তুলে নৌকোর মধ্যে বসিয়ে দিল মেয়েটিকে। তারপর নৌকো দাঁড় বেয়ে গিয়ে জাহাজে ভিড়ল।

এসব কোন কথাই ফেডরিক ডি মিলোকে বলেনি।

তাই দুর্গাধ্যক্ষর কাছে বাদশাহের বাঁদীর কথা শুনে জাহাজ নিয়ে প্রথম গিয়েছিল। যেখানে সে জুলেখাকে বলপ্রয়োগ করেছিল।

সেও একটি গভীর অরণ্যসঙ্কুল জায়গা। সেই গভীর বনের সীমানা ছাড়ালে ওপাশে লোকালয়ের বসতি। ফেডরিক নদীতে জাহাজ রেখে কয়েকটি সঙ্গী নিয়ে পার হচ্ছিল। হাতে গ্রাম লুঠ করবার বিবিধ সরঞ্জাম। হঠাৎ একটা চোখই বড় হয়ে যায়। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পালা। সঙ্গীরা অপর একটির পিছন পিছন ছুটল কিন্তু ফেডরিক এক লাফে জুলেখাকেই ধরে ফেলল। তারপর বলপ্রয়োগ করতে খুব বেশি দেরী হল না, কিন্তু মেয়েটি ছাড়া পেয়েই পালিয়েছিল। ফেডরিক আবার জাহাজ নিয়ে সেখানেই প্রথম গেল কিন্তু সমস্ত বনাঞ্চল তচনচ করেও সেই মেয়েটির দেখা পেল না। অবশ্য দেখা পাওয়ার আশা নিয়ে সে আসেনি। বনের পশু নয় যে নির্দিষ্ট বনের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। তবু যদি পাওয়া যায়, পাওয়া গেলে হুগলী উপনিবেশ সরকারের একটা দুর্ভাবনা কমবে। তাছাড়া এ স্বার্থ সমস্ত পর্তুগীজদের। তখন যদি একবারও বুঝতে পারত তাহলে কি তাদের পালিয়ে যেতে দিত ?

ফেডরিক তারপর এল দ্বিতীয় মেয়েটিকে যেখান থেকে তুলেছিল। সেটাও নদীর ধার। তবে আগেরটার মত অতো গভীর বন নয়, বনের মধ্যে গাছপালা আছে, তবে গাছের লম্বা চেহারা সব আকাশমুখী। নিচে শুধু তাদের থামের মত মোটা মোটা শরীর। তাছাড়া বেশ পরিষ্কার জায়গা। খুঁজতে অসুবিধে হল না।

মেয়েটিকে যে নদীর ধার থেকে উদ্ধার করেছিল সে সেই পথ ধরে এগিয়ে চলল, তারপর বনের গভীরত্ব বাড়ল। দু একটি হিংস্র জন্তু পাশ দিয়ে গর্জন করতে করতে চলে গেল! ফেডরিক বন্দুক তুলে ফায়ার করল। অসংখ্য বাঁদর এগাছ থেকে লাফিয়ে ও গাছে পালাল। বনফুল ফুটে রয়েছে। ফেডরিকের সঙ্গেও কজন সঙ্গী। তারাও এ একজন দস্যু। হঠাৎ একজন চিৎকার করে সর্দারকে ডাকল।

আর সঙ্গে সঙ্গে ফেডরিক ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌছল।

একটি মাটির উঁচু ঢিপি, তার মধ্যে গুহার মত। গুহার মধ্যে ঢুকে বেশ নিশ্চিন্তে থাকা যায়। ফেডরিকও সঙ্গীর সঙ্গে ভেতরে ঢুকে যা দেখল তাতে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। গুহার বাইরের আলো যা ঢুকেছে তাতেই বেশ দেখা যাচ্ছে, ফেডরিকের দেখা সেই ইজ্জত হারানো মেয়েটি মরে পড়ে আছে। তাকে পিঁপড়ে

আর মাছিতে ঢেকে ফেলেছে। ফেডরিক বুঝতে পারল না, এর এমন অবস্থা হল কেমন করে? কে মারল একে? ক্ষতস্থান দেখা যায় কিনা দেখবার জন্যে সে মৃতদেহটি উল্‌টে পালটে দিল। তারপর কিছু বুঝতে না পেরে সঙ্গীদের দ্বারা বয়ে নিয়ে জাহাজে তুলল।

তার মৃত্যু আজও রহস্যাবৃত। তবে দ্বিতীয় মেয়েটি ধরা পড়লে বোঝা যাবে। এরা যে দুজন এক জায়গায় ছিল বোঝা যায়। মনে হয় প্রথম মেয়েটি মারা গেলে বা তাকে মেরে দ্বিতীয় মেয়েটি সরে পড়েছে।

ফেডরিক ভাবতে ভাবতে সেই দাসবাজারে ঘুরতে লাগল। এত ঘটনা ভেতরে আছে যদি জানত তাহলে কখনও সেই মেয়েটিকে সাধারণের মত দাসবাজারে নিলামে চড়িয়ে দিত না। মেয়েটি জাহাজ থেকে নামতে নামতেই বলেছিল, আমাকে খৃষ্টান করবে তো!

চ, চ বেটি আর দিক্ করতে হবে না।

ফেডরিক শুনেছিল তার এক সঙ্গীর কথা।

মেয়েটি তার দিকেও তাকিয়েছিল কিন্তু সে তখন পৈশাচিক এক আনন্দে টলছে। কত মেয়েই তো কত কথা বলে, কে তা কানে নেয়? তাই সেও কানে নেয়নি। তারপর নেমে গেছে দড়ির বাঁধনে আটকে দাসবাজারে।

হঠাৎ চলতে চলতে রক্ষী মাইকেলকে ধরল ফেডরিক। বলল, এই তুমি তো রোজ বাজার পাহারা দাও। থার্টিন সকালে একটি মেয়ে বিক্রী হয়েছে, কে কিনেছে বলতে পার? তার পোষাক ছিল বেশ জমকালো। সালোয়ার, কামিজ পরেছিল, আর বেশ স্ট্রং ইয়ং ছিল। এই বলে ফেডরিক হাতের আকার দেখিয়ে মাইকেলের দিকে তাকিয়ে হাসল।

মাইকেল মাথা নেড়ে জানাল, সে জানে না।

বাজারে আরও পাহারাদার ছিল তাদেরও দিকে ফেডরিক এগিয়ে গেল। তাদেরও মেয়েটির আকৃতি, কথা বলার ঢঙ সব নকল করে দেখালো। তারা মুচকি হেসে মাথা নাড়ল।

প্রত্যহ কত মেয়ে আসছে, কত বিক্রী হচ্ছে, কেউ কেউ এই উপনিবেশে পর্তুগীজ সাহেবের কেনা হয়ে থাকছে, কেউ খৃষ্টান হয়ে নতুন পল্লীতে ঢুকছে। আবার চড়া দামে কেউ কিনে নৌকা করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কে কার খবর রাখে? থার্টিন কেন, থার্টিন্, ফোর্টিন সব তারিখই এক।

একজন পাহারাদার একটু রসিক। ঠিক যুবক নয় আবার প্রৌঢ়ও নয়। সে কোন কাউকেই ভ্রূক্ষেপ করে না। মাথা থেকে টুপিটা খুলে হেসে বলল, সাহেব আমাকে বলে রাখলে আমি সব মেয়ের চেহারা মনের মধ্যে ধরে রাখতাম।

ফেডরিকও রসিকতায় অপটু নয়। এক চোখ টিপে বলল, পারতে না। তোমার তো বয়েস হয়ে গেছে। এত মেয়ের চেহারা মনে ধরে রাখতে গেলে তুমি ভেবমিত্তে মারা যেতে।

ফেডরিকের কথা শুনে অনেকে শব্দ করে হেসে উঠল।

রসিক পাহারাদারও আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল। ওপাশ থেকে একজন তাকে চোখ টিপল। বাড়াবাড়ি করা ভাল নয়।, সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে।

ফেডরিক তবু হাল ছাড়ল না। আরও এগিয়ে চলল।

কিন্তু মাইকেল গার্সিয়ান ভাবছে। ভাবছে যেন কি? ভাবছে এই তালে দিগো রিবেলীকে জড়িয়ে দিলে কেমন হয় লোকটা আসল ধূর্ত? বাড়ীটা যেন এক রূপের হাট বানিয়ে রেখেছে। তাদের জাতের লোক। এদেশে এসে পয়সা করেছে। তাছাড়া আদব কায়দা কেমন যেন উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। হীরাকে সেই টাকা দিয়ে কিনেছিল। তবে কি হীরা সেই মেয়ে?

বণিক সর্দার ফেডরিক যে চেহারার বর্ণনা দিল তার সঙ্গে হীরার অনেক মিল আছে। হীরাও জমকালো সালোয়ার, কামিজ পরেছিল, যদিও সে পোষাক এখন আর নেই। সে পোষাক নিশ্চয় ঐ কামুক বুড়ো রিবেলীর ওখানে ফেলে এসেছে। হীরা যদি সেই মেয়ে হয়, তাহলে? মাইকেল আর ভাবতে পারল না।

হীরা যদি সেই মেয়ে হয়, তাহলে লুকিয়ে রাখা যাবে না। কানা ঐ বণিকটা যে রকম উঠে পড়ে লেগেছে ঠিক বের করবেই। মাইকেল কেমন মুষড়ে পড়ল। স্যামুয়েলের বাড়ীতে হীরাকে তার মনে পড়ল। হীরা তাকে আবার ভালবাসতে শুরু করেছে। সে আর আগের মত তাকে নিয়ে রগড় করে না। এখন হীরা স্বপ্ন দেখছে একটা ঘর বাঁধার। স্যামুয়েলের স্ত্রী মারিয়ার মত সে গৃহিণী হতে চায়।

হীরা নাচতেও পারে সুন্দর। সেদিন মিউজিকের তালে কি সুন্দর নাচল। যদিও ওয়েষ্টার্ণ ড্যান্স নয়। কিন্তু রাজা মহারাজার রঙমহলে যে নাচ হয় তার মত, হীরা কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে নিটোল শরীরকে ভেঙে ভেঙে সমুদ্রের ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ার মত বুকে জোয়ার তুলে নাচল।

হীরা এখন তাকে নিয়েই স্বপ্ন দেখে। সেদিন বলল, জানো মাইকেল, হঠাৎ ভোরে স্বপ্ন দেখলাম, আমরা চার্চে গিয়ে ফাদারের সামনে দাঁড়িয়েছি! আমরা রিং বদল করলাম। উপস্থিত অতিথিরা আমাদের ফুলের তোড়া উপহার দিলেন। তারপর এক বজরা ফুলের মধ্যে উঠে নদী দিয়ে ভেসে কোথায় যেন চলে গেলাম।

তারপর বলল, আচ্ছা মাইকেল, বল না ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয় না?

মাইকেল মনে মনে পুলকিত হল, বুঝতে পারল সে জয় করেছে এদেশের একটি অসামান্য রূপসী মেয়েকে। বলল, সত্যি হলে কি তুমি খুশি হবে?

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল হীরা। সেই বড় বড় ডাগর চোখে। অন্য সময় হলে হয়ত সেই ডাগর চোখে দুষ্টুমির রেখা টেনে তনুতে হিল্লোল ছড়িয়ে দিয়ে হাসত কিন্তু এ সময়ে হাসল না, কেমন যেন লজ্জিত হয়ে মাথা নত করল। তারপর মাথা নত করে মৃদুকণ্ঠে বলল, মাইকেল, আমি দুঃখ পাই এমন কথা নাই বা বললে?

মাইকেল বোঝে না, এই কথার মধ্যে দুঃখের কি আছে?

আজকাল হীরা যেন কেমন হয়ে গেছে। কেমন সুরে যেন কথা বলে? মেয়েদের

সম্বন্ধে ধারণা তার নেই। নিজের দেশের কিছু কিছু জানে, পুসি, সোফিয়া, য়োজি এরা তখন যুবতী। তাদের দেখেছে তারাও যেন কি এক আনন্দে ফুলের মত ঘুরে বেড়াত। তারা তখন তার ছোট ছোট গাল টিপে দিয়ে বলত, নাইস য়ু আর— বড় হলে অনেক লেডির মাথা মুড়োবে।

আজ সে সব কথার মানে বোঝে। বোঝে না এদেশীয় মেয়েদের। এরাও যেন কেমন? তবে কারুর কাছাকাছি যায়নি। শুধু হীরার কাছে গেছে। হীরাকে দেখে যেন সে তার বুকের মধ্যে কি এক নতুন স্পন্দনের সাড়া পায়।

অভিনব সে অনুভূতি। তাই সে হীরার জন্যে এগিয়েছে। হীরাকে আপন করে পেলে এই ভারতবর্ষে বাসা বাঁধবে। চাকরী আর করবে না! কোথাও আলাদা থেকে ব্যবসা করবে। এই সব কথাই আজকাল সে ভাবে। তবু তার ভয় করে। হয়ত হীরা একদিন মত পরিবর্তন করবে। মেয়েদের মন সে বুঝতে পারে না। সেইজন্যে তার ভয় বেশি। ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। হীরার গায়ে হাত দিতে বড় ইচ্ছে করে। হীরার শরীরটা কত নরম একবার পরীক্ষা করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ভয় করে যে সুর ও ছন্দ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, তার যদি হঠাৎ সুর পালটায়?

হঠাৎ কি যেন ভেবে সে ফেডরিককে কাছে ডাকল, মিস্টার, থার্টিন তারিখে আমি একটি মেয়েকে দেখেছি, যার বর্ণনার সঙ্গে তোমার বর্ণনা মেলে, তাকে কিনেছে এখানকারই এক ব্যবসাদার দিগো রিবেলী।

দিগো রিবেলীকে মাইকেল ক'দিন ধরে দেখছে, উড়ন চণ্ডীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিজের পত্নীকে খুন করে সে যেন আরও সীরিয়াস হয়ে গেছে। আর যত্র তত্র পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়ে খোঁজে সেই পালিয়ে যাওয়া হীরাকে।

মাইকেল দিগো রিবেলীর নাম বললো এইজন্যে যে তাকে ফেডরিক ধরলে কিছুদিন তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকবে। তাছাড়া ঐ বুড়োকে একটু জব্দ করা উচিত। ব্যাটা কামুক ছুঁচো। সেদিন রাত্রে হীরা ঠিক উচিত মতই শাস্তি দিয়েছে।

মাইকেলের মনে পড়ল সেই সব কথা। হীরাকে দিগো রিবেলী নিয়ে চলে যাবার পর সে ডিউটি খতম হলে ঐ বুড়োর বাড়ির পেছনের জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অন্ধকার গাছপালার পাতার আড়ালে মশার কামড় খেয়ে লুকিয়ে থেকে সে হীরার ঘরের সব ঘটনাই দেখেছিল। হীরা যদি ছুরি তুলে আত্মরক্ষা না করত তাহলে সে পিস্তল চালিয়ে ঐ বুড়োকে শেষ করে দিত।

ফেডরিক শুনে বলল, দিগো রিবেলী নামটা শোনা শোনা। কিন্তু তার দেখা পাব কোথায়? তারপর বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, সেনাপতি ডি মিলো নিশ্চয় তার ঠিকানা জানে। তারপর বলল, তুমি ঠিক দেখেছো তো পাহারাদার, তারপর একটা ভুল সংবাদ নিয়ে ঝামেলায় পড়ব নাতো! ফেডরিক চলে গেল দুর্গের দিকে দ্রুতগতিতে।

মাইকেল সেই দাসবাজারে অন্যান্য পাহারাদারদের সঙ্গে তখনও দাঁড়িয়ে। মনে তার ভীষণ হাসি পেল। সেই বুড়ো ব্যবসাদার মিষ্টার রিবেলীর মুখটা মনে পড়তে আরও হাসি পেল। ব্যাটা কদিন ধরে যেন হন্যে হয়ে ঘুরছে। হীরার দেখা একবার পেলেই হয়। জলজলে চোখে যেন কাম থৈ থৈ। হীরাকে পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এবার কানা বণিক ফেডরিকের সেনাপতি ডি মিলোর পাল্লায় পড়ে জবাব দিতে দিতে প্রাণটা যাবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে দেখতে পেল, ডি মিলো সামরিক পোষাক পরে, দু'কোমরে দুটো পিস্তল গুজে ফেডরিকের সঙ্গে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসছে।

তারপর তারা পর্তুগীজ পল্লীর দিকে হাঁটতে লাগল। মাইকেলের মুখ ভরিয়ে আবার হাসি ঝলকে উঠল। তারপর সে খোলা জায়গায় মুখটা উচু করে হা হা করে হেসে উঠল।

মাইকেল এমনভাবে কখনও উদ্ধত ভঙ্গি হাসে না, তার হাসি দেখে অন্য পাহারাদার বলল, কি হে, মনে হচ্ছে খুব একটা মজা কিছু পেয়েছ?

মাইকেলের বলতে ইচ্ছে করল ঘটনাটা কিন্তু ঘটনাটা যে বলা যায় না ভেবে চুপ করে রইল।

রোদের তাপ বাড়ছে। গলছে অনেক কিছু। শকুন ঘুরপাক খাচ্ছে। অশ্বত্থ গাছের ছায়ার নিচে নীলমদাররা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু পুড়ছে রোদে ধৃত মানুষের দল। ধুঁকছে তারা। একটু জলের জন্য জিব বের করে কি যেন বলতে চাইছে। চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। মুখে জল দেওয়া হচ্ছে না, পরিবর্তে নদী থেকে জল তুলে এনে ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জিব বের করা, হাঁ করা প্রাণগুলো এক ফোঁটা জলের জন্যে যেন বেরিয়ে যায় যায়। ছেটানো জলের ফোঁটা চোখে মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে জিব দিয়ে তা তুলে নেবার চেষ্টা করছে।

নীলামদার দাঁত মুখ খিঁচোচ্ছে, তোদের এই রোদে থাকতে কে বলেছে? বিক্রী হয়ে যেতে পারিস না?

ক্রেতা ঘুরছে, তবে তেমন বেশি নয়। তারা আরও যাচাই করছে। দর, দাম করে বাড়তি মাল গোলায় পুরবে, তার জন্যে আরও সময় নিচ্ছে।

ফাদাররা বলছে, খৃষ্টান হও, তাহলে আর এ কষ্ট সহ্য করতে হবে না। পর্তুগীজ সরকার তোমাদের সুখে রাখবে। মিশন তোমাদের সাহায্য দেবে।

মাইকেল হঠাৎ তাকিয়ে দেখল, ডি মিলো ও ফেডরিকের সঙ্গে তর্ক করতে করতে রিবেলী এগিয়ে আসছে। কি তাদের তর্ক বোঝা যায় না। তর্কের ভাষাও বেশ জোরালো।

দিগো রিবেলী বেশ হাত পা নাড়ছে। তার মুখে খড়ের ডগা, চিবুচ্ছে না। মুখে লাগিয়ে কথার ফুলঝুরি ছড়াচ্ছে। আর আশ্চর্যভাবে খড়ের ডগাটা নড়ছে, তবু পড়ছে না।

তারা দুর্গের মধ্যে ঢুকে গেল। মাইকেল আর থাকতে পারল না, অন্য এক সঙ্গীর কাছে ডিউটি জমা দিয়ে সে পা পা করে এগিয়ে গেল।

তারপর সেও ঢুকে পড়ল দুর্গের মধ্যে। তার অনধিকার প্রবেশ নয়, দুর্গের মধ্যেই তার আস্তানা।

মাইকেল এসে দাঁড়াল দুর্গাধ্যক্ষের অফিস ঘরের সামনে। কান রাখল ঘরের মধ্যে।

ফেডরিকের কথাই কানে গেল। লোকটা যেমন ধূর্ত, তেমনি শয়তান। কেমন জাতের দোহাই দিচ্ছে। বলছে, মিষ্টার রিবেলী, আমরা উভয়েই এক দেশের লোক। ইণ্ডিয়ান ওশান পার হয়ে আমরা সবাই এসেছি! আপনি স্বাধীন ব্যবসাদার, আমিও স্বাধীন, তবে একটু নোংরা কাজ করি। দেশের জন্যেই মানুষ ধরে এনে বিক্রী করি। তাদের জোর করে খৃষ্টান করি। কেন করি নিশ্চয় আপনার জানা আছে। দেশের জন্যে আমি যা করি, আপনি তা করেন না। আপনি নিজের জন্যে সব কিছু করেন। তবু আপনাকে কিছু আমাদের বলার নেই। কারণ আপনাদের মত সজ্জন, সম্ভ্রান্ত গৃহীও আমাদের দরকার।

কিন্তু এবার আমাদের একটু সাহায্য করতে হবে, যে মেয়েটিকে থার্টিন তারিখে কিনেছেন, অবশ্য বলতে পারছি না সেই সম্রাটের হারানো বাঁদী কিনা! তবু তাকে দেখলে আমি বুঝতে পারব সে কিনা!

দিগো রিবেলীর মুখটা আরও যেন অপমানে লাল হয়ে উঠল, মাথা নেড়ে বলল, আমি তো সবই আপনাদের দেখালাম। আমার অন্তঃপুরে যে কটি মেয়ে আছে সকলকেই দেখলেন। আর আমি যে ঘটনার কথা বললাম সেটা বিশ্বাস করছেন না কেন?

বিশ্বাস করছি না এইজন্যে যে, গত এক সপ্তাহ আগে যে মিটিং এই ঘরে হয়েছিল, আপনার কাছে তখন সেই মেয়ে ছিল। আপনি আমাদের আলোচনা শুনেও সহযোগিতা করেন নি।

দিগো রিবেলী রাগত কণ্ঠে বলল, দিস ইজ ভেরি অফেনসিভ! আমি এ ধরণের কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে রাজী নই।

নিশ্চয় রাজী হবেন। ফেডরিকের এক চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল। বলল, এ আমাদের সবার ভাগ্য। বাদশাহ যদি সৈন্য নিয়ে অ্যাটাক করেন তাহলে আমাদের এই এত মেহনতে গড়ে তোলা পোর্টো পিকুনো ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে।

ডি মিলো এইসময় শান্তকণ্ঠে বলল, ফেডরিক, এটা ঝগড়ার সময় নয়। মিঃ রিবেলী যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তার ওপর আমরা ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

দিগো রিবেলী বলল, কিন্তু আমি তো সবই বললাম কমাণ্ডার। মেয়েটি ফোর্টিন তারিখের সকালে কোথায় যে পালিয়ে গেছে আজও সন্ধান করে পাই নি।

ফেডরিক হঠাৎ হেসে উঠে বলল, হাওয়াতে তাহলে ভেসে গেছে বলুন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার বলল, আপনি আপনার পর্তুগীজ ওয়াইফকে মার্ডার করলেন কেন?

দিগো রিবেলী উঠে দাঁড়াল। বলল, বণিক, তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি।

ফেডরিকও মারমুখী হয়ে এগিয়ে এল। বলল, ভয় দেখাবেন না। যা সত্য তাই বলছি। হয়ত সেই মেয়েটিকেও সেইরকম ভাবে সরিয়েছেন।

ডি মিলো কেমন যেন ভেবে পাচ্ছিল না কোনদিক দিয়ে এগিয়ে যাবে। তাই চুপ করে থেকে দুজনের তর্ক শুনছিল।

হঠাৎ দিগো রিবেলী উঠে চলে যাচ্ছে দেখে আর থাকতে পারল না, বলল, মিঃ রিবেলী, আপনি চলে গেলে কিন্তু ব্যাপারটার সমাধান হবে না। আপনি বসুন। আলোচনা হওয়া দরকার, সমস্যা আমাদের সবার। আলোচনা না করলে ব্যাপারটার সমাধান হবে না।

দিগো রিবেলী গম্ভীরকণ্ঠে বলল, যা বলার আমি চিঠি মারফৎ পর্তুগীজ সরকারকেই জানাবো। এইভাবে কিছু অশিক্ষিত বোম্বেটেদের সঙ্গে কথা বলতে আমার ইচ্ছে নেই।

ফেডরিকের একটি চোখ হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল কিন্তু ব্যাপারটা খুব নাটকীয় হয়ে উঠবে বলে সামলে নিয়ে সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বলল, কমাণ্ডার, আমাকে—আমাকে উনি অশিক্ষিত বোম্বেটে বলেছেন কিন্তু ওর ঘরে যে মেয়েছেলের হাট দেখেছি, কোন্ সভ্য দেশের সভ্য মানুষ এইরকম জঘন্য জীবন যাপন করে?

দিগো রিবেলী আর দাঁড়াল না, রাগে কাঁপতে কাঁপতে কোমরের প্যাণ্ট ঠিক করে নিয়ে দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ফেডরিক বলল, সেনাপতি, আপনি ওকে চলে যেতে সুযোগ দিলেন? ওকে বন্দী করা আপনার উচিত ছিল।

ডি মিলো ফেডরিকের কথার উত্তর দিল না। সে ভাবতে লাগল কি যেন! যদি সেই মেয়েটি সম্রাটের বাঁদী হয়, তাহলে খুব চিন্তা করে এগোতে হবে। দিগো রিবেলীকে এমন ভাবে চটিয়ে কোন কাজ হবে না। তাছাড়া···তাছাড়া মনে হয় সে সত্যি কথাই বলেছে। মেয়েটি তার হাত ছাড়া হয়ে গেছে। ফেডরিককেও হাতে রাখতে হবে। সে অনেক উপকার করেছে। তারই চেষ্টায় মৃত বাঁদীটিকে পাওয়া গেছে। হয়ত তার কথাই শেষপর্যন্ত ফলবে। অন্য বাঁদীটিকেও পাওয়া যাবে।

তাই বলল, ফেডরিক, তুমি বরং দু'চারদিন এখানে থাকো। মিঃ রিবেলী চলে গেলেও তিনি তো আর হুগলী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন না। তা ছাড়া মেয়েটি যদি এখানে থাকে, যাবে কোথায়? বরং কিছু গুপ্তচর লাগিয়ে দিই। আর মিঃ রিবেলীর সঙ্গে অন্যভাবে কথা বলি।

ফেডরিক অধীনের মত মাথা হেলিয়ে সায় দিল, তারপর বলল, ঠিক আছে, আপনি যা ভাল হয় করুন। আমিও তাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করব।

ফেডরিক বেরিয়ে আসবার আগেই মাইকেল সরে পড়ল।

স্যামুয়েল পরামাণিকের বাড়ী সেদিন একটি ছোটখাট উৎসব ছিল।

মারিয়ার জন্মদিন। মারিয়াও ক্রীতদাসী। সেও একদিন সবার মত জাহাজ বোঝাই হয়ে দাসবাজারে এসেছিল। দক্ষিণ দেশের মেয়ে। ফাদার অ্যামুয়েল তাকে কিনে স্যামুয়েলকে উপহার দিয়েছিল। তাদের গির্জায় খৃষ্টান মতে বিয়ে হয়েছে। তা সেও আজ ক'বছর হয়ে গেল। অনেকগুলি ব্যর্থ ডে তারা পালন করেছে। মারিয়ার দুঃখ, তার একটিও সন্তান হল না। মা না হলে মেরীর মত মাতৃত্বের কথা কি করে বুঝবে? মেরী, আওয়ার লেডি, ঈশ্বরের মত সন্তান গর্ভে ধরেছিলেন বলেই তো তিনি শ্রেষ্ঠা। মারিয়ার দুঃখ অনেক।

আর কালিপদ স্যামুয়েল পরামাণিক নতুন জীবনে মারিয়াকে বার বার সুখী করার চেষ্টা করে।

সেদিন মারিয়ার বার্থডে উৎসবে কয়েকজন ফাদার ও মাইকেলের মত স্যামুয়েলের কজন পর্তুগীজ বন্ধু এসেছিল। আর সব সেই পল্লীর বাসিন্দা। তারাও নিমন্ত্রিত।

ঘরের টেবিলের ওপর বাড়িতে বানানো প্লাণকেক ও তার চারপাশে মোম বাতি জ্বলছিল। অতিথিরা/গোল হয়ে বসে আছে।

মারিয়াও সেজেছে সুন্দর। তার সঙ্গে হীরাও আরও সুন্দর।

হীরার দিকে অনেকে তাকিয়ে আছে। হীরার পরণে শাড়ী, আর মারিয়ার পরণে বিলিতী কাপড়ের ফিকে নীলচে রঙের লম্বা গাউন। মাটিতে লুটোচ্ছিল গাউন। সে গাউন বাগিয়ে ধরে সবাইকে নিচু হয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিল।

স্যামুয়েলও আজ সেজেছে সুন্দর। সাদারঙের সুটে তাকে সাহেব দেখাচ্ছে। যদি গায়ের রঙটা একটু পালটাতে পারত, তাহলে আর স্যামুয়েলের কোন দুঃখ থাকত না। সে হঠাৎ অ্যানাউন্সমেণ্ট করল, মিস হানা আপনাদের একটি পর্তুগীজ সঙ গেয়ে শোনাবে।

হীরা এখানে নাম পরিবর্তন করে হানা হয়েছিল। যখন খৃষ্টানই হবে তখন নামটাও চালু হয়ে যাক না। মাইকেল হীরা নামটা জানত না, হানা বলেই ডাকত। সেই হানা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে লজ্জিত হয়ে স্যামুয়েলের দিকে তাকিয়ে জিভ ভেঙাল।

স্যামুয়েল দুষ্টুমীর হাসি হেসে আবার ঘোষণা করল, হানা নতুন পর্তুগীজ ভাষা

শিখছে, আপনারা যারা এখানে খাঁটী পর্তুগীজ আছেন তাঁরা দয়া করে হানার উচ্চারণে ভুল ধরবেন না। আবার সকলে হেসে উঠল।

হানা আবার লজ্জায় রাঙা হয়ে চোখের তর্জনী তুলে স্যামুয়েলকে শাসাল। তারপর সে পিয়ানোর দিকে এগিয়ে গেল।

এই সময়ে মাইকেল এসে সেখানে দাঁড়াল।

তখন হানার পর্তুগীজ গান শুরু হয়ে গেছে। গানটি মাইকেলেরই শেখানো। সে সিটি বাজিয়ে যে সুর বার করত সেই সুরে মাইকেলের শেখানো হানার গলার গান। হানা গান গাইছিল কিন্তু সুরের সাথে উচ্চারণটা কেমন যেন মিলছিল না। অথচ গানটি বিখ্যাত একটি লাভ সঙ্গীত।

বিখ্যাত গান বলেই উপস্থিত পর্তুগীজ যুবক যুবতীরা হানার সঙ্গে গলা মেলাল। অনেক কণ্ঠে গানটা যেন সুরে ছন্দে নতুন হয়ে পর্তুগাল থেকে ফিরে এসে সেই ঘন সন্ধ্যার হুগলীর খৃষ্টান পল্লীতে সরব হয়ে উঠল। মাইকেল কিন্তু গলা মেলাল না, সে তখন গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবছিল।

বাইরে চাপ চাপ আঁধার জমে উঠেছে। দূরের জিনিসকে কেমন যেন রহস্যময় দেখাচ্ছে। ঘন গাছগাছালি। এ অঞ্চলে সবার বাগান আছে। যেমন বাগানে আনাজ তরকারী ফলে তেমনি ফুলের গাছও আছে। বাংলা দেশের সেরা ফুল গাঁদা, টগর, বেল, যুঁই, জবা, আকন্দ। তাছাড়া বনফুল। যাদের জন্ম অবৈধ সন্তানের মত, যেখানে সেখানে ফুটে উঠে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তারাও বাহার নিয়ে জেগেছিল।

আর এসেছিল পর্তুগাল থেকে কিছু ফুলের চারা। বিচিত্র ধরনের ফুল। লাল, গোলাপী, বেগুণী, সাদা নানা রঙের। ফাদার দাক্রুজ যে বীজ ছড়িয়ে যায় তারও কিছু কিছু চারা ফুল হয়ে ফুটে উঠেছিল। তবে এখনও কারো দৃষ্টি কাড়েনি। তবে ফুল হবার আগে দাক্রুজই একটা নাম চালু করেছিল, কৃষ্ণ মাটির দেশে কৃষ্ণবর্ণের মানুষের নামে ফুলের নাম 'কৃষ্ণকলি'। আরও তার এই নাম দেওয়ার কারণ, দাক্রুজ খৃষ্টান ধর্মযাজক হয়েও হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ না পড়ে থাকে নি। হিন্দুর মহাকাব্য রামায়ণ, মহাভারত তার মুখস্ত।

শ্রীকৃষ্ণের মত একজন শ্রেষ্ঠ ধার্মিক মানবাত্মার চরিত্র পড়ে সে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। তাই ভারতের মানুষকে সে শ্রীকৃষ্ণের মতই মনে করে। সে কোন কথাই কারও সঙ্গে বিশেষ বলে না, তবু তার মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে বেরিয়ে যায়, অন্য ধর্মযাজকরা শুনে বলে, তুমি বিশ্বাসঘাতক, এদেশে এসেছ খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে নয়, মানুষের মধ্যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করার প্রচার কার্য চালাতে।

স্বপ্নিল চোখে শুধু ফাদার দাক্রুজ তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে থাকে, উত্তর দেয় না, শুধু ঠোঁটের একফালি হাসি যেন কি জন্যে তার জেগে ওঠে। কি যেন সে বলতে চায়, কি যেন বলে না। ব্যাণ্ডেল গির্জার মধ্যে আওয়ার লেডির সামনে তাকে সেখানকার ফাদাররা খুব একটা যেতে দেয় না। তাতেও তার কোন দুঃখ নেই।

তার ছোট্ট কুঁড়েঘরে যিনি আছেন, তিনি অন্যরূপে গির্জার উঁচু মঞ্চে সবার উপাসনা নিয়ে পুণ্য, স্নিগ্ধপ্রভা উজ্জ্বল বিমুগ্ধদৃষ্টিতে জেগে থাকুন।

তার ঘরে যিনি আছেন, তিনি কি একান্ত লোকচক্ষুর বাইরে দীনা বলে একটি মাত্র ভক্তের আকুল প্রার্থনায় কান দেবেন না ?

দা ক্রুজ যেন অন্য এক ভাবের, অন্য এক মানুষের শক্তিতে অন্য জগতের মানুষ। এ মানুষ কোন দেশের বা কোন কালের মনে হয় না।

অত্যাচারী পর্তুগীজদের মাঝে, এমন কি ধর্মের সত্যকে প্রচার করতে যে যে ধর্মযাজকরা এদেশে এসে খৃষ্টান করার জন্যে বহু মানুষের ওপর অত্যাচারেরই ভূমিকা নিয়েছে, সেখানে এই দাক্রুজ কেমন যেন দল ছাড়া। দাক্রুজও এসেছিল মারিয়ার জন্মদিনে। এক পাশে চুপ করে বসেছিল। অন্যান্য ধর্মযাজকের মত খুব একটা কথা বলছিল না।

হীরা প্রগলভা। হীরা উজ্জ্বল মোমবাতির কম্পমান আলোর মত দ্যুতিময়। তার কথার জালে, হাসির মধুর ধ্বনিতে, চোখের মোহময় দৃষ্টি তীক্ষ্ণ আকর্ষণে মারিয়ার জন্মদিন মুখর হয়ে উঠেছিল।

সকলেই জানে মাইকেলের সঙ্গে এই দেশীয় মেয়েটি একদিন ঘর বাঁধবে। সবই প্রস্তুত, শুধু চার্চে গিয়ে শুভকাজটা শেষ করলেই হয়।

যুবকরা সেইসব কথা ভেবে ঈর্ষান্বিত হয়ে হীরার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পড়ছিল। আর চেষ্টা করছিল যদি মাইকেল থেকে মনটা সরিয়ে তাদের কারও দিকে মেয়েটি ঢলে পড়ে।

সেইজন্যে অনেক রঙ্গ তামাশাও চলছিল। রক্ত রঙের বেলুনটা বার বার ফুলে ফুলে উৎসব মুখরিত ঘরে গড়াচ্ছিল।

কেউ বলল, মিস হানা নাইস !

সঙ্গে সঙ্গে হীরা ঘুরে দাঁড়িয়ে চোখে কটাক্ষ হেনে বলল, কি নাইস ? প্রণকেক না আমি ?

অন্য একজন বলল, কেক তো খেলেই শেষ হয়ে যায়। তুমি শেষ হবে না। কেকের চেয়েও তুমি উপাদেয়।

হীরা ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল। রূপের প্রশস্তি কে না চায় ? হীরা চোখের দৃষ্টি হেনে যুবকটিকে মোহিত করে বলল, তাই বুঝি !

আর একজন বলল, মাইকেল ভাগ্যবান।

জবাব হীরার মুখে তৈরী। সেও জানে কথার যাদু কোন পথ দিয়ে এসে একই আবর্তে ঘোরাফেরা করে। কেন করে ? কি চায় এই মানুষেরা ? সে সব জানে। তবু তার হাসি, দৃষ্টি এতটুকু ম্লান না হয়ে আরও সরস হল।

মাইকেল যে এসেছে সে দেখেনি। আর মাইকেলও তাকে দেখা দেয়নি। কতকগুলি সুসজ্জিত নারী পুরুষের ভীড়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কি যেন ভাবছিল দূর থেকে দাঁড়িয়ে।

হীরার দিকে সে তাকিয়েছিল। আর ভাবছিল ডি মিলো চতুর্দিকে চর ছড়িয়ে দিয়েছে। এই ভীড়ের মধ্যে কেউ কি ঘাপটি মেরে হীরার দিকে তাকিয়ে নেই? ফেডরিক সেই মেয়েকে নাকি চেনে। ফেডরিক যদি হীরাকে দেখে চিনতে পারে? হীরা যে সেই, এ যেন আর ভুল নয়।

মাইকেলের মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে গেল। সে আর কিছু ভাবতে পারল না। কতক্ষণে উৎসব শেষ হবে, হীরাকে আলাদা করে পাবে সেই কথা ভাবতে ভাবতে তার অসহ্য সময় কাটতে লাগল। তাকে পেলে আজই সন্দেহ ভঞ্জন করে নিতে হবে। সে যদি সত্য কথা বলে, ভাল। হীরা কি সত্যিই তাকে সত্যি কথা বলবে? কে জানে? নারীমন বোঝা মুস্কিল। হীরা যে রকম ভাবে খুশিতে দুলে দুলে ফুলের মত রূপ বিলিয়ে সবার মধ্যে ছোটাছুটি করছে, তাতে তাকে এ সময়ে কোন কথা বললে গুরুত্ব দেবে কিনা সন্দেহ!

কে একটি যুবক তার হাতটা ধরে টানল। তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে হীরা এমন মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে দিল যে আর কোন কথা বলতে সে পারল না। কেমন যেন মদনের রতি সুন্দরীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বিবশ কামনা ঘুরে ঘুরে ফিরতে লাগল। আর অভ্যাগতদের জ্বালাতে লাগল। হানা, হানা, হানা।

এক সময়ে মারিয়ার জন্মদিন উৎসব পালিত হল। মোমবাতির অনির্বাণ শিখাগুলি পূর্ণ আয়ু নিয়ে মারিয়ার দীর্ঘ জীবন কামনা করল। ফাদাররা এক সময়ে গির্জার ধর্মসঙ্গীত গেয়ে উঠল। তার সঙ্গে অতিথিরাও যোগ দিল।

●

● ●

মাইকেল এসে দাঁড়াল শ্যামুয়েলের বাড়ী ছেড়ে একটি নিমগাছের তলায়।

আকাশে ধীরে ধীরে আলো ফুটছে। মেঘ সরে যাচ্ছে। রাতের ঐশ্বরিক আলো বেরিয়ে আসছে। তবু দূরে দূরে অন্ধকার। কে যেন দূরের ঐ আলপথে একটা কালো কাপড়ের পর্দা ফেলে দিয়েছে।

মাইকেল বরাবরই রাতে বেরোয়। এই নিয়ে দুর্গ পাহারাদারদের সঙ্গে তার কত ঝগড়া। দুর্গে শেষ ঢোকার হুকুম রাত আটটায়। আটটার পর কেউ এলে পাহারাদার কিছুতে খুলে দেয় না কিন্তু মাইকেল স্বতন্ত্র। তবে সে যদি বাইরে বেলেল্লা জীবন যাপন করে আসত, তাহলে হয়ত পাহারাদার খুলত না কিন্তু পাহারাদার জানে মাইকেল কেন যায়।

মাইকেল সারাদিনের ডিউটির পর নদীর ধারে বন্দর ঘাটে বসে থাকে। দেখে সারাদিনের হট্টগোলের পর বন্দর কেমন নিশ্চুপ ও শান্ত।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে মাল খালাস করে জাহাজগুলি, কিম্বা দূর পথে আবার চলে যাবে বলে আলো জ্বেলে নাবিকরা জাহাজ সারাচ্ছে।

কোন কোনদিন সন্ধ্যে থেকেই আকাশে আলো ফোটে। তখন জলের চেহারা

হয় টলায়মান কোন আলোময় সমুদ্রের মত। দূরের সেই ওপার, যা দিনের বেলাতেও ধোঁয়াটে, তা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মাইকেল কোন কোনদিন উঠে চলে যায় ঐ নতুন ধর্ম পাওয়া খৃষ্টান পল্লীতে। এখানে তবু একটা জীবনের ছন্দ দেখতে পায়। নিজেদের জাত ভাইয়ের পল্লীতে ঢুকলে তার যেন গা কেমন ঘুলিয়ে ওঠে।

ঘরে ঘরে হুল্লোড় জীবন। সন্ধ্যে থেকেই বাড়ীতে মিউজিক। নাচের ছন্দে, নেশার মৌতাতে, মদের সুগন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। যেন পর্তুগালের কোন নৈশ পানশালায় সে ঢুকে পড়েছে।

এই সব বাড়ীর মধ্যে কর্তা পর্তুগীজ, কর্ত্রী অধিকাংশ এদেশীয়। নিজের জাতের মেয়েও আছে, তবে খুব কম। এই সব পরিবারে যে সব ছেলেমেয়েরা জন্মেছে, তারাও যেন দুই দেশের রক্তের সংমিশ্রণে রুক্ষ ও কোমলতায় এক নতুন মানুষ হয়েছে।

মা হয়ত এ দেশীয় মানুষ, স্বামীর ভাষা রপ্ত করেছে। বাপ পর্তুগীজ ভাষা ছেড়ে এ দেশের হাবভাবে নিজেকে গড়ে তুলছে।

মাইকেল এই সময় ভাবল, হীরার সাথে বিয়ে হলে তাদের ছেলেমেয়েও কি এই রকম হবে? না, সে ছেলে হলে নিজের মত গড়বে, মেয়ে হলে মায়ের মত।

রাতেও সময় তার অল্প। প্রত্যহ দুর্গে ফিরে তাকে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতেই হয়। তারপর শেষরাত থেকেই তার আবার ডিউটি।

তখন বন্দরে এসে পড়ে মানুষ বোঝাই জলযান। অন্ধকার পথেই জলযানগুলি বন্দরে এসে দাঁড়ায়। সেই থেকে শুরু হয় তার পাহারা দেওয়ার কাজ।

দুর্গের মধ্যে আরও থাকে তার মত সহকর্মী। তারা এলে তাকে ডেকে নিয়ে যায়। তার মধ্যে একজন শুধু নতুন বিয়ে করেছে।

রিচার্ড, রিচার্ড পর্তুগীজ পল্লী থেকে আসে।

তার কথা শুনে হাসি পায়, বলে, দোস্ত এ কাজ একদিন ছেড়ে দেব। চুঁচুড়ায় চলে যাব। সেখানে স্বাধীন ব্যবসা করব। নতুন বিবাহিত জীবনে রাতে মিসেসকে ছেড়ে আসতে ইচ্ছে করে না। সেও ছাড়তে চায় না।

তার কথা শুনে অনেকেই হাসে।

মাইকেল দেখতে পেল স্যামুয়েলের বাড়ী থেকে অনেকেই চলে যাচ্ছে। সেও ছটফট করে উঠল। রাত এগিয়ে চলেছে। একটু বিশ্রাম নিতে হবে। আবার তো জাহাজ ঘাটায় গিয়ে প্রত্যহের ডিউটি। দিগো রিবেলা বেশ জব্দ হয়েছে। ফেডারিকের পাল্লায় পড়ে এবার চৈতন্য হবে।

আলোটা আরো ঘন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। রুটির মত গোল চাঁদটা চষামাটির ওপর আলো ফেলে দুলছে।

মাইকেল গাছটার তলা থেকে একটু সরে এল। মাথাটা গাছের পাতার ছায়া থেকে বের করে অন্য একটি গাছের আড়ালে দাঁড়াল।

তাকে কেউ দেখতে না পায় এমন করে নিজেকে আড়াল করল।

স্যামুয়েলের বাড়ী থেকে বেরিয়ে যে যার পথে ছড়িয়ে পড়ছে।

তারা কথা বলতে বলতে চলেছে। অনেকের মুখে হীরার কথা। হীরা নয় হানা। উৎসব মারিয়াকে নিয়ে হয়নি, হয়েছে হীরাকে নিয়ে। তার সঙ্গে নিজের নামও শুনতে পেল মাইকেল।

কেউ যেন বলল, তাকে ঠিক দূরে থেকে চিনতে পারল না। মাইকেল যদি মেয়েটাকে রিফিউজ করে, আমি এনগেজ করতে পারি। সি ইজ এ বিউটিফুল অ্যাণ্ড মোস্ট নাইস উত্তম্যান।

সঙ্গের সঙ্গী বলল, তুমি হাত ধুয়ে বসে থাকো। মাইকেল ছেড়ে দিচ্চে আর তুমি নিচ্ছ।

বক্তা বলল, আমি প্রপোজ করেছিলাম কিন্তু মেয়েটি বড় চালাক। এমন সুন্দর ভাবে কথাটা এড়িয়ে গেল যে কিছুই বলতে পারলাম না।

দুজন পর্তুগীজ যুবক এই আলাপ করতে করতে যাচ্ছিল। তারা বেশ জোরে জোরে কথা বলছিল। কেউ ঘাপ্‌টি মেরে লুকিয়ে থেকে শোনবার নেই বলেই হয়ত বলছিল। কিন্তু মাইকেল সবই শুনতে পেল।

বাংলাদেশে অনেকদিন থেকে অনেক বাংলাভাষাও তারা রপ্ত করেছে। প্রত্যেক পর্তুগীজ নরনারীই ভাঙা উচ্চারণে কিছু বাংলা বলতে পারে। সুন্দর কথা একটি কানে লাগলেই মুখস্ত করে নেয়। মানে হয়ত সব সময় জানে না। তবে জায়গা অনুযায়ী লাগিয়ে দেয়। তেমনি সেই দুই পর্তুগীজ যুবকের মধ্যে একজন হঠাৎ বাংলা কথাই বলে উঠল।

চলনাময়ী, রোহস্যময়ী। বলে সে হো হো করে হেসে উঠল। তারা দূরে মিলিয়ে গেল।

আরও অনেকে চলে গেল। ফাদাররাও এক সময়ে গেল। পল্লীবাসীরা যে যার বাড়ীর পথে চলে গেল। মাইকেল তারপর স্যামুয়েলের বাডীর দিকে ফিরল।

উৎসব শেষে ভাঙা আসর। ছড়িয়ে আছে কিছু ফুলের অবশিষ্টাংশ। তেলের জোরালো আলোগুলি তখনও জ্বলছে।

মাইকেলকে প্রথম দেখতে পেল মারিয়া। মারিয়ার দেহে তখনও জন্মদিনের সাজ। সে মাইকেলকে দেখেই অভিমানী হল। চিৎকার করে স্বামীকে ডেকে বলল, দেখো, তোমার বন্ধুর এই আসার সময় হল?

কিন্তু আলোতে মাইকেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সে যেন কেমন হয়ে গেল। মাইকেল নিজেও জানে না, তার দুর্ভাবনা মুখের ওপর ফুটে উঠেছে।

মারিয়া জিজ্ঞেস করল, তোমার কি হয়েছে মাইকেল? অসুখ করেছে? মুখের চেহারা তো ভাল দেখছি না!

সেখানে স্যামুয়েল ও হীরা এসে উপস্থিত হল।

হীরা তখনও আনন্দে খুশি খুশি। সে মাইকেলকে দেখে অচেনার মত ভাণ

করল। কিন্তু মাইকেলের সে সব লক্ষ্য ছিল না। সে শুধু হীরার দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে, শুনবে?

হীরা খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে হাল্‌কা স্বরে বলল, বলো।

স্যামুয়েল হঠাৎ বলল, কি হয়েছে মাইকেল তোমার? মারিয়ার বার্থডে ফেষ্টিভালে এলে না কেন?

মাইকেলের উত্তর দিতে ইচ্ছে করছিল না। তবু বলল, এসেছি তো! অনেক লোক ছিল বলে দেখতে পাওনি। হীরার দিকে তাকিয়ে আবার বলল, বিশেষ কথা, সবার সামনে বলা যাবে না।

হীরা মনে মনে দারুণ অভিমানী হয়েছিল। যাকে উৎসবের মধ্যে কত খুঁজেছে, আর এই উৎসব শেষে আসা। কে চায় এই শেষের ভাঙা আসরে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলতে? কত লোক তাকে অতিরিক্ত সঙ্গ দিয়ে প্রেম জানাতে এসেছিল, তাদের সে আবর্জনার মত ঠেলে দিয়েছে একজনের জন্যে। যাকে মন প্রাণ নিবেদন করে হৃদয় ভরে রেখেছে। সেই মানুষ এখন মরা মানুষের মত মুখ করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দূর, জীবনটাই যেন কেমন? মনের সঙ্গে যদি কোন মুহূর্ত মেলে! তাই সে সেই অভিমানেই মাইকেলকে দূরে ঠেলে দিতে চাইল। বলল, আমি এখন বড় ক্লান্ত। কাল তোমার কথা শুনব।

মাইকেল কোনদিনও হীরার কথার প্রতিবাদ করেনি। শুধু সমর্থন করে গেছে। আর তুলে নিয়েছে যেটুকু নিঃশব্দে পাওয়া যায়। কিন্তু সে আজ বলল, কাল শুনলে চলবে না। কাল হয়ত এসব কথার অর্থও থাকবে না।

হীরা একটু বিস্মিত হল, কেমন যেন সে ভয়ও পেয়ে গেল।

স্যামুয়েল বলল, বেশত হানা, মাইকেল কি বলতে চায় শোনো না? হয়ত সত্যিই আজ তোমার জানা দরকার।

স্যামুয়েল ওদের ঘর ছেড়ে দিয়ে যেতে চাইল।

কিন্তু হীরা বলল, না না চলো, আমরা বাইরে কোথাও বসে কথাটা শুনি।

হীরা ইচ্ছে করে মাইকেলকে শাস্তি দিতে চাইছিল। সে যেমন আজ জব্দ করেছে সেও করবে, কিন্তু মাইকেলের মুখ, তার কথা, তার হাবভাব সবই যেন তাকে ভয় পাইয়ে দিল। অভিমানের ঢাকনাটা সরে গেল। উৎস মুখ আবার মাইকেলের জন্যে কাতর হয়ে উঠল। তাছাড়া সে ভয় পাচ্ছিল, মাইকেলের দিকে তাকিয়ে। কি এমন সে বলতে পারে, অনুমান করতেও পাচ্ছিল না।

তবে কি মাইকেল আজ নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে? রূপের মোহ তার চোখ থেকে সরে গিয়ে এখন সে অন্য কথা ভাবছে? হয়ত সে সেই কথাই বলবে, হানা, এক্সকিউজ মি। না সে সেকথা বললেও হীরা আর নিজেকে রোধ করতে পারবে না। আজ যে মনে মনে অনেক স্বপ্ন জমা হয়েছে। সে স্বপ্ন হঠাৎ ফুৎকারে নিভে যাবে কেন? মাইকেল তাকে যে সুখ ও সৌভাগ্যের পথ দেখিয়েছে, যে ভালবাসা দিয়ে ইমারত গড়েছে, সে তো রাতের আকাশের মত দুর্বোধ্য কখনও মনে হয় নি!

এখন আর সমুদ্রের এপার ওপার নেই। দুটি মানুষ, দুটি সেই নরনারী। তাদের ভাষা আলাদা, তবু মনে হয়েছে, ব্যবধান যা বাহ্যিক থাক অন্তরের নিচে যে প্রবাহিনী ধারা আছে তার স্রোতে কোন ভেদাভেদ নেই। সেই স্রোতে তারা ভেসেছে। সেই স্রোতেই তারা একদিন ঘর বাঁধবে।

ওরা এগিয়ে চলল অনেকখানি দূরে। খোলা মাঠের ওপর আলো যেন হাসছে। অন্য সময়ে হলে হীরা ছোট্ট মেয়ের মত খোলা মাঠের আলোয় ভাসতে ভাসতে ছুটে বেড়াত। বাতাস বইছে। জোনাকি জ্বলছে। হীরা একটা জায়গা ঠিক করে বসল। তার শরীরে তখনও উৎসবের পোষাক। মাথার খোঁপায় ফুলের স্তবক। মুখে প্রসন্নতার সঙ্গে দুর্ভাবনা। বড় বড় চোখ তুলে বলল, তাড়াতাড়ি তোমার কথা শেষ কর মাইকেল, আমি আর ধৈর্য্য ধরতে পারছি না।

রাত এগিয়ে চলেছে। মাইকেল তবু সময় নিল। কি ভাবে শুরু করবে ভাবতে লাগল। দিগন্তে আলো উৎসবের নিঃশব্দে যাওয়া আসা। সারি সারি অশরীরী গাছের বুক ছুঁয়ে আলোর বিন্দু খেলা করে বেড়াচ্ছে।

গ্রীষ্মকালের মাটি। মাটি ফেটে ফেটে ফালা ফালা কাপড়ের মত দেখাচ্ছে। দূরে দূরে নতুন খড় ছাওয়া পল্লী। এখনও সেই সব খড় ছাওয়া ঘরের জানলা থেকে ভেসে আসছে আলোর শিখা। বাতাসের হা হা চিৎকারে শুকনো পাতা খসে পড়ছে। শিয়াল ডেকে উঠল।

হীরা হঠাৎ ছটফট করে উঠল, কই বলো! তোমরা সাহেবরা বড় সময় নাও!

মাইকেল তবু ভাবছে। হঠাৎ সে গম্ভীর অথচ উদাসকণ্ঠেই বলল, তুমি একটা কথার আমার জবাব দেবে? তুমি সত্যিই আমাকে ভালবাসো?

হীরা হঠাৎ ভাবনাহীন কণ্ঠে হেসে উঠল, এই কথা? তার জন্যে এতো ভনিতার কি ছিল?

আমার কথার এখনও উত্তর পাইনি কিন্তু?

হীরা উত্তর দিল না, কেমন যেন লজ্জা এসে তাকে মাথা নত করিয়ে দিল।

মাইকেল বলল, কি হল?

হীরা এবার সলজ্জ হেসে মাইকেলের দিকে দুষ্টুমীর দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর বলল, তুমি বোকা। তুমি সত্যিই বোঝ না কিছু। আবার তারপর হীরা বলল— তুমি মারিয়ার জন্মদিনে এলে না কেন? আমি তোমায় কত খুঁজেছি!

মাইকেল কিছু না বুঝতে পেরে বলল, আমি তো এসেছিলাম, তুমিই তো আমাকে দেখতে পাওনি।

বারে, দেখতে পাই নি না ছাই। আমার চোখ সর্বদা তোমার জন্যে ঘুরছিল।

ঘুরলে আমাকে দেখতে পেতে।

ও হরি দেখতে পাইনি বলেই বুঝি রাগ হয়েছে?

মাইকেল কি যেন ভাবল, বলল, না, আমি রাগ করিনি। আজ বিশেষ

একটা দুর্ভাবনায় পড়েছি বলে তোমাকে এখানে ডেকে নিয়ে এসেছি। ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়।

হীরা হঠাৎ ভয় পেয়ে, মাইকেলের কাছে তাড়াতাড়ি সরে এল।

মাইকেল বলল ভয়ের কিছু নেই। তুমি যদি আমার কথার ঠিক ঠিক উত্তর দাও তাহলে পরে বাকী ব্যবস্থার একটা কিছু করা যাবে।

হীরা বড় বড় চোখে মাইকেলের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, বলো।

তুমি কি সেই মেয়ে, যে দিল্লীর বাদশাহের হারেম থেকে পালিয়ে এসেছে?

হীরা সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে থর থর করে কেঁপে উঠল।

মাইকেল বলল, আমার কাছে লুকিও না হানা। যদি সত্যিই তুমি সেই হও তাহলে আমাকে বলো। হয়ত এখনও সময় আছে তোমাকে সরাতে পারব। আর একদিন দেরী হলে ডি মিলোর চর চারিদিকে ঘোরাফেরা করছে, ঠিক ধরে ফেলবে। তাছাড়া সেই কানা ফেডরিক, সে আরও ধূর্ত। সেও ঘুরছে, তার জাহাজে নাকি মেয়েটি এসেছে, মেয়েটিকে দেখলে সে ঠিক চিনে ফেলবে।

হঠাৎ হীরার চোখ দুটি জলে ভরে উঠল. কান্না ভরা কণ্ঠে বলল, মাইকেল তুমি, কি জানলে তোমাদের জাতির স্বার্থের জন্যে আমাকে ধরিয়ে দেবে?

মাইকেল কি যেন ভাবল, তারপর ম্লান হাসল, বলল, হয়ত দেশের জন্যে তাই করা উচিত। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল—কিন্তু তা আমি পারব না। তাড়াতাড়ি বলো, রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে। আবার আমাকে ফোর্টে ফিরতে হবে।

হ্যাঁ, আমিই সেই মেয়ে যে বেগম হারেম থেকে পালিয়ে এসেছিল।

মাইকেল চমকে উঠল না, শুধু কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল।

হীরার চোখে জল, বলল, তুমি আমাকে ধরিয়ে দাও মাইকেল! হীরা এবার ডুকরে কেঁদে উঠল।

মাইকেল ভাবতে লাগল, তার অনুমান সত্যে পরিণত হয়েছে বলে ভাবল না, ভাবতে লাগল এবার সে কি করবে? তারপর হঠাৎ চঞ্চল হয়ে বলল, তুমি বার বার ও কথা বলছ কেন হানা? তোমাকে ধরিয়ে দেব বলে কি ছুটে এসেছি। আমি পর্তুগীজ, দেশের স্বার্থ আমার দেখা উচিত, তবু তোমাকে ওদের হাতে তুলে দিয়ে আমার কর্তব্য করতে পারব না। এখন আমার প্রথম কর্তব্য হবে তোমাকে এখান থেকে সরানো, কি করে সরাবো তাই ভাবছি।

হীরা চোখের জল মুছল, মৃদুকণ্ঠে বলল, আমাকে সরাতে হবে না মাইকেল। আমি ধরাই দেব। এতটা ভয়ঙ্কর হবে আমি ভাবিনি। বাদশাহের হারেমে আছে হাজার হাজার ক্রীতদাসী, দু'একটি গেলে তাঁর কি ক্ষতি? তাই হুগলীতে পর্তুগীজ উপনিবেশে ছুটে এসেছিলাম। এসেছিলাম দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্তি পাব বলে। কিন্তু মুক্তি তো মিলল না, পরিবর্তে বিরাট এক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম। আজ তোমাদের সমস্ত ভাগ্য নির্ভর করছে আমাকে ধরিয়ে দেওয়ার ওপর। এতগুলি মানুষের সর্বনাশ করে নিজে বাঁচব সে রকম মেয়ে আমি নই।

জুলেখার মৃতদেহ যখন পর্তুগীজরা উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে, তখন থেকেই বুঝেছি আমাকেও একদিন ধরা দিতে হবে। কিন্তু আমি কি অন্যায় করেছি? এই পৃথিবীতে বাঁচবার অধিকার কি আমার নেই? হীরার চোখ দিয়ে আবার জল ঝরতে লাগল। তার চোখের ওপর ভেসে উঠল সেই বাদশাহী অন্তঃপুর থেকে হুগলীতে এসে পৌছনো পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনা।

জুলেখা ও সে।

রত্নখচিত অন্তঃপুরের দেওয়াল, জাফরী কাটা জানলা, ছোট ছোট ছিদ্রের ভেতর দিয়ে কি জৌলুষের ছড়াছড়ি সেই হারেমে! সোনার পাতে মোড়া সব দিক। বিলাস আর বৈভব দিয়ে সবার দিনরাত্রি মোড়া। এই হারেমে বসেই একদিন দেখেছে হীরা, বাদশাহ বদল। সম্রাট জাহাঙ্গীর মারা গেলেন। তারপর প্রাসাদ ঘিরে নেমে এল শুধু রক্ত তাণ্ডব। সম্রাট শাহজাহান তখন বহু বহু দূরে। হীরা হারেমেই ছিল, তখন বয়স কম বলে বাচ্চামহলে বড় হচ্ছিল। একদিন হঠাৎ খানা বন্ধ হয়ে গেল।

খানা বন্ধ হল কেন? প্রত্যহের প্রতিটি নিয়ম হঠাৎ ভেঙে যেতে হীরা বুঝতে পারল, প্রাসাদে কিছু হয়েছে। অনেক নিয়মই কদিন ধরে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে রইল। হঠাৎ সব ঠিক হয়ে গেল।

নতুন সম্রাট সিংহাসনে বসলেন। আবার প্রাসাদের চতুর্দিকে আনন্দের বন্যা বইতে লাগল। কালো পর্দা সরে গেল। নতুন নতুন মানুষে অন্তঃপুর ভরে গেল। হীরাও অন্য জায়গা থেকে এসে নতুন কাজে বহাল হল। নতুন সম্রাজ্ঞীর খিদমত খাটবার জন্যে অনেকগুলি বাঁদী তার মধ্যে হীরা একজন।

নতুন সম্রাজ্ঞী মমতাজমহল মানুষ হিসাবে খারাপ নয়, কিন্তু অধীনার ওপর মমতাহীন। তারপর দেখতে দেখতে অনেকদিন কাটল।

হীরার শরীরে যৌবন এল কিন্তু সে বাঁদী। আর দেখলো এখানে বাঁদীদের জীবন কেমন। আর সে জানল সে ক্রীতদাসী। মুখ থুবড়ে এখানে পড়ে থাকা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

বাঁদীদের জীবন এখানে এই বিলাসী অন্তঃপুরে শুধু পাশে থাকবার জন্যে। উঠতে বসতে গঞ্জনা, অত্যাচার, কোন মুক্তি নেই। আর দেখল চোখের সামনে অন্তঃপুরে মেয়েদের জীবন। বাদশাহ একজনই পুরুষ অন্তঃপুরে আসেন। তাঁকে খুশি রাখার জন্যে সম্রাজ্ঞীরও চেষ্টার ত্রুটি নেই।

খোজারা সঙ্গীন উঁচিয়ে শ্যেনদৃষ্টি মেলে পাহারা দিয়ে চলেছে। বাঁদীদের কোন

বেয়াদপি যেন ক্ষমার যোগ্য নয়। অথচ কি এক জঘন্য জীবন চলে বেগম মহলে। নতুন নতুন রূপসী কোত্থেকে যেন আমদানী হয়, আর তাদের নিয়ে লোফালুফি খেলা চলে। মমতাজ বেগমও স্বামীর সুখের জন্যে বিলাসের উপকরণ এগিয়ে দেন। তবু কড়া নিয়ম।

হীরার যেন হাঁফ ধরতে লাগল। ভয় হল, নিজের শরীরে তখন দিন দিন রূপের জৌলুস খুলছে। মেয়েরাও এখানে সরাব পান করে মাতাল হয়। রাত্রি হলে অন্তঃপুরে যেন কি দানবীয় উল্লাস জেগে ওঠে। যে মেয়েটিকে নাচবার জন্যে হুকুম করা হয় সে নেচেই চলে। পা ধরে এলেও সে থামতে পারে না।

হীরার চোখ ফেটে জল আসে। শুনেছিল তাকে নাকি বাদশাহ্ সিপাই বঙ্গদেশ থেকে নিয়ে এসেছিল। ছোটবেলা থেকেই তার শরীরটা সুন্দর ছিল। তার বাড়ীঘর কোথায় আজ আর তা মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে, তার সব ছিল, তারা একটি গ্রামে থাকত বাবা বাইরে যেন কোথায় কাজ করত। মা কেবলই বকত, ছেলেদের মত বাইরে বাইরে বেশী ঘুরবি না।

স্বপ্নের মতই সেই সব স্মৃতি মনে পড়ে। মনে পড়ে না মায়ের মুখটা। ছোট একটা ভাই ছিল সে খুব দুষ্টু। আর গোয়ালে দুটি গরু ছিল। সে মার কাছে বকুনি খেয়ে ঘরের বাইরে পলাশ গাছটার কাছে দাঁড়ালে, দড়িতে বাধা খোলা জায়গায় ঘাস খেতে খেতে তাদের মঙ্গলা সরে আসত। তারপর মাথাটা বাড়িয়ে দিয়ে আদর নিতে চাইত। সে কখনও রাগ করে বলত, মঙ্গলা জ্বালাসনি বলছি যা! মঙ্গলা সরে না গেলে সে চড় কষিয়ে দিত, তারপর আবার কি ভেবে তাকে কাছে টেনে নিত।

এই সব স্মৃতিই এখন মনে পড়ে। যদি একবার সেই বাড়ীটা কোথায় জানতে পারত? জানতে পারলেই কি হীরাকে তারা মনে রেখেছে? তারা ভেবেছে, হীরা মরে গেছে, কিম্বা···। তাকে যে বাদশাহ্ সিপাই ধরে নিয়ে গেছে অনেকে জানত।

একদিন দুপুর বেলা একা একা পুকুর ঘাটে গিয়ে জলে মাছ ঘোরা দেখছিল।

আকাশ থমথমে ছিল। দুপুরের ঝিমুনি ছিল গ্রামের মধ্যে। রোদের তাপ ছড়িয়ে ছড়িয়ে ওপরে উঠছিল। ঘুঘু ডাকছিল কোথায় যেন? হঠাৎ কেমন যেন মাটির বুকে দুম দুম শব্দ হল।

পুকুরের পাশেই বড় গঞ্জে যাবার পথ। সেই পথ দিয়ে কতকগুলি ঘোড়াসওয়ারকে ছুটে আসতে দেখল। ধুলো উড়ছে ঘোড়ার খুরের সাথে। হঠাৎ ঘোড়সওয়াররা থমকে দাঁড়াল। তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে একটা খানা লাফ দিয়ে পার হয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল। তারপর আর কোন কথা বলতে না দিয়ে তাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। ঘোড়ার শব্দে অনেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাকে তুলে নিতে দেখল কিন্তু প্রতিবাদ করে কি শেষকালে প্রাণ হারাবে? ঘোড়সওয়ারদের সবার কোষবদ্ধে তরোয়াল ছিল।

গ্রামের লোকেরা কি বাড়ীতে খবর দেয় নি? ঘোড়সওয়াররা কারা, তাও

তাদের অজানা ছিল না। বাদশাহ সৈন্যদের পোষাকেই তা প্রমাণ হয়েছিল। সে বন্দিনী, এইটুকু আগ্রায় এসে সে বুঝেছিল। বন্দী সে আজও কিন্তু মুক্তি কি পাওয়া যায় না? হঠাৎ কানে গেল ক্রীতদাসদের মুক্তি দিচ্ছে হুগলীর পর্তুগীজরা।

মমতাজ বেগমের বাঁদী ছিল সতেরজন। তার মধ্যে জুলেখাও একজন। জুলেখার সঙ্গে হীরার ভাব ছিল। জুলেখাও মাঝে মাঝে বলত, হীরা পালাবি এখান থেকে? না পালালে একদিন সম্রাটের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিতে হবে।

পালাব কেমন করে? হীরা ভয়ে ভয়ে পাঁচিল তোলা অন্তঃপুরের দিকে চাইত।

জুলেখার কিন্তু আরও সাহস ছিল, সে বলত, অমন তাকিয়ে দেখছিস কি, পালাতে গেলে পাঁচিলও ভাঙতে হবে। তুই রাজী থাকিস তো বল্‌ তাহলে একটা ব্যবস্থা করি। আমরা পালিয়ে গিয়ে সেই হুগলীতে উঠব। তারপর খৃষ্টান হতে পারলেই মুক্তি পেয়ে যাব।

হীরার শুনে খুব ভাল লাগত। কিন্তু এই আগ্রা থেকে সেই হুগলী, কোথায় তাও জানে না। এ কি সম্ভব? শুধু শুধু অবাস্তব চিন্তা।

জুলেখা শুনে বলত, তোকে ওসব ভাবতে হবে না। তুই রাজী হলেই সব ভার আমার। আমি তোকে যা যা বলব করবি, তাহলে ঠিক গিয়ে হুগলীতে পৌছব।

তারপর একদিন সেই মুহূর্ত এল। জুলেখা দিনের বেলা এসে চুপি চুপি বলল, হীরা, তোর গয়নাগুলো দে, আজ রাত্রে পালানোর ব্যবস্থা করেছি।

বাঁদীদের কিছু কিছু গয়না রাজসরকার থেকে দেওয়া হয়। কেউ সব পরে ঝমঝমিয়ে বেড়ায়, কেউ অল্প পরে আলাদা জায়গায় সরিয়ে রাখে। এসব দিকে মনিবদের লক্ষ্য থাকে না। হারাও তার আলাদা বাক্সে রেখে দিয়েছিল। সেই গয়না সে জুলেখার হাতে তুলে দিল। তারপর চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, এখানে দেয়ালেরও কান থাকে, কিরে ব্যাপার কি, আজ রাত্রেই?

জুলেখা তখন আরও চাপাস্বরে বলল; আস্তে, এখন কিছু জানতে চাস না, তবে রাত্রি বেলাতেই সব বলব। এখন গয়নাগুলি তাড়াতাড়ি গছিয়ে দিয়ে আসি। এই বলে জুলেখা উত্তেজনা দমন করতে করতে ওড়নার মধ্যে লুকিয়ে গয়নাগুলি নিয়ে চলে গেল।

আবার তার সঙ্গে জুলেখার দেখা হল, জুলেখা তাকেই খুঁজছিল, দেখা হতেই বলল, থাকিস কোথায়? খুঁজে খুঁজে মরছি, আজ রাতে নয়, ঠিক কাল সন্ধেবেলা এখান থেকে সরে পড়ব। যখন খোজাদের রাতের ডিউটি বদল হবে ঠিক সেই সময়ে। কার সঙ্গে কেমন করে সে অনেক কথা।

হীরা বড় বড় চোখ করে জুলেখার দিকে তাকিয়ে রইল তারপর বলল, সত্যি, কিন্তু কেমন করে রে বলবি তো!

জুলেখা কেমন যেন কৃতিত্বের চোখে হাসল, বলল—এক আতর বেচনেওয়ালী। দু'বেলা হারেমে আতর বেচতে আসে, সে আমাদের প্রাসাদ থেকে বার করে দেবে। রাজী কি হয়? শেষে তোর আমার দুজনের গয়না দিয়েছি, তারপর অনেক করে

রাজী করিয়েছি। খোজাদের ডিউটি বদলের আগে আতর বেচতে আসবে, তারপর যাবার সময়ে আমাদের নিয়ে বেরিয়ে যাবে। তখন নতুন খোজা পাহারায় থাকবে, সে বুঝবে এরা সকলে আতর বেচতে এসেছিল। সেই শেখ ওমদাদ আলির ঘরবালী আমাদের জন্যে ছুটো বোরখাও আনবে।

হীরা সব শুনে যেন কেমন হয়ে গেল। সে বিশ্বাসই করতে পারল না তারা একদিন মুক্তি পাবে। সারাদিন ধরে ভয়ে তার বুকটাও কাঁপতে লাগল। যদি ধরা পড়ে যায়? ধরা পড়ে গেলে কোন ক্ষমা নেই। মুঘল রাজ কানুনে ঘাতকের খড়্গ দেহ দ্বিখণ্ডিত করবে। সে ভয়ে ভয়ে সঙ্গে নিল একটি বিষ ভর্তি আংটি। যদি ধরা পড়ে; শাস্তি পাবার আগে সে পৃথিবী থেকে সরে যাবে। ঐ নির্মম ঘাতকের কাছে গিয়ে গলা বাড়িয়ে দেবার আগে এ মৃত্যু অনেক ভাল। তবু জুলেখাকে বলতে পারল না, এই এত ঝুঁকি নিয়ে নাই বা গেলাম?

মুক্তি, মুক্তি সেও কি চায় না? যদি শেষ পর্যন্ত গিয়ে হুগলীতে পৌঁছোয়, আর যদি তারা খৃষ্টান হয়ে ওখানেই ঘর বাঁধতে পারে। জুলেখার চেষ্টা দেখে তার যেন কেমন বিশ্বাস হয়েছিল তারা ঠিক একদিন হুগলীতে গিয়ে পৌঁছবে। তবু তার পূর্ণ সাহস আসে নি। এসেছে অনেক পরে। সারাদিন চরম উত্তেজনার মধ্যে দিন খাবার পর সন্ধ্যেবেলা জুলেখা এসে বলল, কিরে তুই তৈরি!

তৈরি হবার কি আছে? শরীরে একই ধরনের ছুজনের সালোয়ার ও কামিজ। জুলেখা তাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালো এক গলি পথের মধ্যে।

সে জায়গাটায় অন্তঃপুরের অফুরন্ত আলোর ছিটে ফোটাও আসেনি। শুধু শোনা যাচ্ছিল হামাম ঘরের জল পড়ার শব্দ। জল গড়াচ্ছে নালি দিয়ে। সুগন্ধি ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে।

একটা পাঁচিলের ব্যবধান। ওপাশে গোলাপ বাগ থেকে মৌমাছি ভেসে আসছে। কে যেন নারীকণ্ঠে খিল খিল করে হেসে উঠল। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হল না।

গাঢ় আঁধার সেই গলি পথের মধ্যে হঠাৎ সেই আতর বেচনেওয়ালীর দেখা পাওয়া গেল। ভুর ভুর করছে তার গায়ে আতরের গন্ধ। কিন্তু বোরখায় ঢাকা শরীর। সে এসেই ঝটিতি বলল, তাড়াতাড়ি তোমরা বোরখা দিয়ে ঢেকে নাও।

ছুটো বোরখা বাড়িয়ে দিল। দিলো আরও ছুটি ঝোলা। সম্ভবত তার মধ্যে আতরের শিশি ছিল কয়েক ডজন। দিয়ে বলল, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে আমার মেয়ে। তারপর বোরখা ঢাকা তিনটে মূর্তি অন্তঃপুরের বড় দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

খোজা প্রহরী মুখ তুলে জিজ্ঞাসাও করল না, শুধু রসিকতা করে বলল, কি হে আতর বেচনেওয়ালীরা, মুখগুলো একবার দেখাও না! কিন্তু তারা সরে এসে মুখগুলো দেখলও না বা কোন সন্দেহ করল না।

শুধু আতর বেচনেওয়ালী সুর করে বলল, গরীব মানুষ, তোমরা বাদশাহের ঘরের বড় মানুষ। তোমরা কি দেখবে বাবা আমাদের মুখ।

খোজারা হেসে উঠল হ্য হ্য করে। তারপর আর বাধা নেই। বড় ফটক পার হতেও দেরী হল না। অনেক লোক, যে যার নিজের কাজে যাচ্ছে। ফটকের মুখে সান্ত্রী পাহারাদার। বাইরে দু'মুখো কামান।

আতর বেচনেওয়ালী বেশ নিশ্চিন্ত মনে তার দুই বেটিকে নিয়ে আগ্রা দুর্গ ছেড়ে যমুনার তীর ধরল। দু হাজারী, তিন হাজারী ঘোড়সওয়াররা পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে।

হাওয়া বইছে। এ পাশটায় চাপ চাপ অন্ধকার। যমুনার জলে জোয়ার। নীল জলে যেন আঁধারের ছায়া পড়ে কালো দেখাচ্ছে। থমথমে আকাশ। দু'পাশে সারি সারি ঝাউগাছ মাথা দোলাচ্ছে। মাঝখান দিয়ে পথ। সে পথ কোথায় গেছে কে জানে? থমথমে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে ভর্তি আকাশের দূর দূর উজানে যেন রাগ করে সরে থাকা দু একটি তারা।

হঠাৎ আতর বেচনেওয়ালী মুখের সামনে থেকে বোরখার ঢাকনা সরিয়ে বলল, এবার বাপু তোমরা যেদিকে খুশি যাও, আমি আমার কথা রেখেছি।

জুলেখা হীরার হাত চেপে ধরে থমকে দাঁড়াল। মাথার ওপর আকাশ। মুক্ত তারা। এবার যেদিকে খুশি যেতে পারে। কিন্তু কোথায় যাবে, কেমন করে যাবে তারা ভেবে পেল না। হুগলী এখান থেকে কতদূর কে জানে? তারা একটি বড় গাছের পেছনে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়েছিল।

সেই আতর বেচনেওয়ালীর মুখটি দেখা যাচ্ছিল। মধ্যবয়সী রমণী। আগ্রার চকবাজার থেকেই রোজ হারেমে আতর বেচতে আসে। তার আতর নাকি খুব খুসবাই। সে আবার বলল, তোমরা কোথায় যাবে যাও না। আর এখানে দাঁড়িয়ে কি শেষকালে বিপদে পড়বে? আমিও কাজটা করে যে খুব ভাল করলুম না এখন বুঝতে পারছি। সম্রাজ্ঞী জানতে পারলে আমার গর্দান নেবে।

জুলেখা হঠাৎ নিজের বোরখাটা খুলে দিয়ে হীরাকে বোরখাটা খুলে দিতে বললো। তারপর তারা বিপরীত মুখো হয়ে চলতে লাগল।

পথ জানা নেই। অন্ধকার। তবু যেতে হবে। তবে মানুষ-চলা পথে তারা গেল না, যে পথ দিয়ে মানুষ যায় না সেই দুর্গম পথের দিকে পা বাড়াল। যেতেই হবে সেই হুগলী। এতটা যখন সফল হয়েছে বাকীটা কি হবে না? আবার এদিকে ধরা পড়বার ভয়। বুকে দারুণ উত্তেজনা। বুকটা ভয়ে ঢিপ ঢিপ করছে। হীরাই কেমন যেন ভয়ে পেছিয়ে পডতে লাগল, আর জুলেখা তাকে ধরে নিয়ে এগোতে লাগল।

দু'দিন দু-রাত্রি দুটি মেয়ে চড়াই উৎরাই পথ বেয়ে গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল। তারা বিশেষ করে নদী পথের পাশ দিয়ে এগোল, উদ্দেশ্য যদি কোন পর্তুগীজ দস্যুবণিকের জাহাজ মেলে তার ওপর উঠে বসবে। তারপর আর হুগলী পৌঁছতে অসুবিধা হবে না। আর লোকালয়ের দিকে যায় নি ধরা পড়বার ভয়ে। তারা অনাহারে থেকেছে তবু ক্লান্তি আসে নি। মনে মুক্তির আনন্দ। মাঝে মাঝে নদীর জল দিয়ে তৃষ্ণা মিটিয়েছে আর পেলে গাছের ফল তাও অনেক সময়ে খায় নি।

তারপর হঠাৎ একদিন দুজনে চলতে চলতে এক পর্তুগীজ দস্যুদের সামনে পড়ে গেল। হীরা তবু পালিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারল। কিন্তু জুলেখা পারল না। জুলেখার সম্ভ্রম নষ্ট করল একটি এক চোখ কানা পর্তুগীজ দস্যু তারপর অবশ্য জুলেখা পালিয়েছিল।

জুলেখা ও হীরা দুজনে আবার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল কিন্তু জুলেখা কেমন যেন আর সহজ মনে চলতে পারল না। কান্নায় তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। বার বার বলল, হীরা, মেয়েদের যেটুকু মূল্যবান, তা আমার খোয়া গেছে। আমার আর হুগলীতে গিয়ে কি হবে? তুই যা, আমি আর সেখানে যাব না।

হীরা কত করে বোঝাল, তোর দোষ কি? তুই তো স্বেচ্ছায় নিজেকে সঁপে দিস্‌নি! জুলেখা, তুই যদি এমন করিস তাহলে আর আমারও কোথাও যাওয়া হবে না। তোর সাহসেই তো আমরা এতদূর এগিয়ে এসেছি।

সেদিনের রাত্রি নেমে এল। এ পাশটায় জঙ্গল খুবই কম। একটা নিরাপদ জায়গা দেখতে গিয়ে তারা পেল একটি গুহার মত।

সেই গুহার মধ্যে তারা রাতটা কাটাল। তখন তাদের আর কোন হিংস্র পশুকেও ভয় ছিল না। দুজনে পাশাপাশি সেই গুহার মধ্যে শুয়েছিল। জুলেখা কাঁদছিল, তার কান্না একবারও বন্ধ হয়নি।

হীরা ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ যখন তার ঘুম ভাঙল, দেখল গুহার মধ্যে দিনের আলো ঢুকছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে গিয়ে দেখতে পেল পাশে শুয়ে জুলেখা কিন্তু কেমন যেন অসহায়ের মত পড়ে আছে। হীরা ডাকতে গিয়ে গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠল। হিমশীতল দেহে প্রাণ নেই। জুলেখা চলে গেছে মুক্তির পরপারে। সে আছড়ে পড়ল জুলেখার মৃতদেহের ওপর। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। সঙ্গীর জন্যে শোক করল। হঠাৎ নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল, তার সেই বিষভর্তি আংটিটি হাত থেকে খুলে নিয়ে জুলেখা আত্মহত্যা করেছে। জুলেখা এমনিভাবে মরে যাবে সে একবারও ভাবেনি। তার উৎসাহেই একদিন হীরা সম্রাটের হারেম ছেড়েছিল। সে চলে যেতে তার মনে হয়েছিল, আর এগিয়ে কি হবে? তার চেয়ে আবার সেই আগ্রাতে ফিরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করাই ভাল।

কিন্তু মুক্তির নেশায় মানুষ যে সব ভুলে যায় পরের ঘটনাই তার প্রমাণ।

হীরা চুপ করতে মাইকেল বলল, সকালের সব ঘটনা। দিগো রিবেলীর নাম সে বলে দিয়েছে শুধু সেনাপতি ও ফেডরিকের মন ঐদিকে ঘুরিয়ে রাখবার জন্যে। তারপর বলল, যাক তুমি যখন আমার কাছে সব বললে এবার আমার ওপর সব ভার ছেড়ে দাও, দেখি আমি কি করতে পারি?

হীরা বড় বড় প্রসাধনচর্চিত কালো চোখে মাইকেলের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মাইকেলকে খুব ভাল লাগল।

মাইকেল আবার বলল, এসব কথা আর কাউকে বলো না। এমন কি স্যামুয়েলও যাতে জানতে না পারে সেই চেষ্টা করবে। ওরা এ দেশের নতুন খৃষ্টান। খৃষ্টানদের

সাহায্য করবার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত। এ সংবাদ যোগাড় করতে পারলে এক মুহূর্ত দেরি করবে না, ছুটে গিয়ে খবরটা পৌছে দিয়ে আসবে কমাণ্ডারের কাছে।

হীরা অসহায়কণ্ঠে ম্লান হেসে বলল, মাইকেল আমি আর কিছু ভাবতে পাচ্ছি না। তুমি যা হয় কর। যদি আমাকে আবার সম্রাটের হাতে তুলে দিলে তোমাদের মঙ্গল হয় তাতেও আমার কোন আপত্তি নেই।

আলো আরও ছড়িয়ে পড়ল। খোলা মাঠ যেন আলোর গয়না পরে হাসতে লাগল।

রাত আরও গভীর হয়ে এল। আর কোথাও কোন শব্দ নেই। শুধু বাতাস হা হা শব্দ করতে করতে গাছের পাতায় ঝাপটা দিয়ে চলে গেল। শিয়াল ডেকে উঠল পাশ দিয়ে। মাইকেল উঠে দাঁড়াল, হীরাও। তারপর তারা এগিয়ে চলল নিঃশব্দে স্যামুয়েলের বাড়ীর দিকে।

স্যামুয়েলের সঙ্গে দেখা হল, সে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল, তারপর পরিহাসকণ্ঠে বলল, লাভ অ্যাফেয়ার্স, আমি একটা ঘর ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম মাইকেল।

হীরা এই রসিকতায় যোগ দিল না সে পাশ দিয়ে অন্যত্র চলে গেল।

মাইকেল শুধু স্যামুয়েলের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

তারপর সেও গুড নাইট বলে বিদায় জানিয়ে পথে এসে নামল।

মাইকেল ভাবতে ভাবতেই চলল পথটা। হীরাকে বাঁচাতে হবে। পর্তুগীজ সরকারের হাতে তুলে দিয়ে তার জীবন নষ্ট করলে হবে না। তার জীবন নষ্ট হলে সেও আঘাত পাবে। কিন্তু এমন কেন হল? জীবনে যদি বা এদেশে মিলল একটি মনের মত মেয়ে! হীরা যে তাকে ভালবাসে, আজ প্রমাণ হয়ে গেছে। ওর রূপ, ওর যৌবন, ওর মন সব সে তাকে দিয়েছে। সে বলল, সে আর ভাবতে পারছে না। কিন্তু সেই বা এই ভার নিয়ে কি করে এগোবে? তাকে জাতির চোখে, দেশের চোখে বিশ্বাসঘাতক হতে হবে। মাইকেলের চোখ দুটো কেমন যেন কড়্মড়্ করতে লাগল। এক ভয়াবহ সমস্যায় তার মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

দিগো রিবেলী, ডি মিলো, ফেডরিক তিনজনে খুঁজছে সেই পলাতক মেয়েকে। এই অবস্থায় থাকলে একদিন ঠিক তারা খুঁজে পাবে। হয়ত স্যামুয়েল সন্দেহ করে দুর্গাধ্যক্ষর কাছে গিয়ে বলে আসবে। মাইকেল আবার ছটফট করে উঠল। পথ চলতে গিয়ে চেনা পথেই ক'বার হোঁচট খেল।

কিন্তু পরের দিন সকালে আশ্চর্য ভাবে সব কিছু বদলে গেল। ভাবনা যেন আর থাকল না।

প্রত্যহের মত হুগলী বন্দরের কাজ শুরু হচ্ছিল। দাসবাজার জেগে উঠেছে। মাইকেল সেই একই ভাবে অশ্বথ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

ধৃত মানুষেরা চিৎকার করছে। মেয়েরা হাসছে। যুবতীরা যৌবনের ভারে

চোখে কটাক্ষ টানছে। ক্রেতা ঘুরছে, শকুন নেড়া গাছের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। নিলামদার চিৎকার করছে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভয়ে কাঁপছে। দস্যুবণিকের চাবুক ঘুরছে। রক্তে দাস মানুষের শরীর ভেসে যাচ্ছে। ক্ষত হাতের ফুটো দিয়ে পুঁজ গড়াচ্ছে।

ভাগীরথীর জলে জোয়ার। নৌকা, বজরা, পানসি, দুলছে। মাল কেনা বেচা চলছে। হঠাৎ সেই হুগলী বন্দরে খবর এল, মুঘল সম্রাজ্ঞী মমতাজ মারা গেছেন। খবর এনেছে অন্য একটি পর্তুগীজ সর্দার। ৭ই জুন রাত্রে সম্রাট যখন বুরহানপুরে, সম্রাজ্ঞী সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা গেছেন। খবরটা ঠিক কিনা এইটুকু জানতে শুধু কয়েক ঘণ্টা সব কিছু চুপ হয়ে থাকল। তারপর খবর যখন সত্যি বলে প্রমাণিত হল, সেই হুগলীর পর্তুগীজ উপনিবেশে উৎসব লেগে গেল। বড দিনের আনন্দের মত। এক সর্বনাশ থেকে বেঁচে সবাই খুশি হয়ে উঠল।

বাদশাহের নির্মম ঘোষণায় সকলেই উদ্বিগ্ন ছিল। একটি বাঁদীর মৃতদেহ পৌঁছে গেছে কিন্তু দ্বিতীয় বাঁদীটিকে পাঠানো হয়নি। বাদশাহের দ্বিতীয় পত্রও আসেনি। ডি মিলোর চিঠি নিশ্চয় পেয়েছেন। সময় চেয়ে ডি মিলো চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু সময় দিয়ে উত্তর আসেনি বা কোন চিঠি। তাই সকলেই আশা করেছিল, হয়ত সুবাদার যে কোন মুহূর্তে হুগলীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এদিকে ফ্রেডরিক খুঁজে চলেছে বাঁদীকে। তার জাহাজ বন্দরে নোঙর করা আছে। ডি মিলো চিন্তায় ক্লিষ্ট।

দিগো রিবেলীকে আর ঘাঁটাতে সাহস করেনি। তাকে অন্যভাবে জিজ্ঞেস করবার ফন্দি খুঁজছে ডি মিলো। নিজের জাত ভাইকে চটিয়ে কোন লাভ নেই। সেই মেয়েটি যদি তার কাছে থাকত না হয় কথা ছিল। তা যখন নেই তখন জল ঘোলা করে লাভ কি?

এই সময়ে এল এই খবর। আশ্চর্য ভাবে এই পরিবর্তন। ফাদাররা ছুটল গির্জায়। তারা মেরীর সামনে উপাসনায় বসে গেল। তাঁরই ক্ষমতায় যে এই অলৌকিক পরিবর্তন, এ যেন তারা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে।

বাদশাহ মহিষী মরেন নি, বাঁচিয়ে দিয়ে গেছেন সম. পর্তুগীজদের। এবার বাদশাহের আর এদিকে মন থাকবে না। তিনি পত্নী বিয়োগের বেদনায় মূহ্যমান হয়ে শোকে বিহ্বল হবেন। তারপর হয়ত একদিন পর্তুগীজদের ওপর ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন তা ভুলে যাবেন।

ভুলে না যান, এখন তো কিছু কালের জন্য সব বন্ধ। এখন এদিকে নিশ্চয় মাথা ঘামাবেন না। সেই ভেবেই সকলে খুশি হল। তাতেই আনন্দ উৎসবের আয়োজন হল। তবে উৎসবটাও যাতে বাইরে বেরিয়ে না পড়ে তার জন্যে ডি মিলো সৈনিকদের কড়া হুকুম দিল।

বাদশাহের মহিষী মারা গেছেন। এ দেশের সম্রাট, তাঁর প্রিয়তমা পত্নী। এ দেশের প্রজা হয়ে এতটা স্পর্ধা নিশ্চয় বাদশাহ সহ্য করবেন না।

তাছাড়া তারা আনন্দ করছে, মহিষীর মৃত্যুর জন্যে নয়, মহিষীর সঙ্গে তাদের কোন শত্রুতা নেই। তাদের আনন্দ একটা দারুণ ভাবনা থেকে সমস্ত পর্তুগীজরা কিছুকালের জন্যে মুক্তি পেয়েছে বলে।

মাইকেলও খুশি। সারারাত সে ভেবেছে। ডিউটি দিতে দিতে এই সকালেও ভাবছিল। হীরাকে সে কেমন করে বাঁচাবে? কাউকে এ কথা বলার নয়। বলে যে উপদেশ নেবে তারও উপায় নেই।

ফেডরিক ঘুরছে। এক চোখের শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে ঘুরে চলেছে। ওপাশে ব্যাণ্ডেল গির্জার ওখানে ডি মিলোর চর। প্রতিটি এদেশীয় মেয়ের ওপর সতর্ক দৃষ্টি দিচ্ছে।

এই সব দেখে মাইকেল কিছু আর ভাবতে পারছিল না। বুঝতে পারছিল, হীরাকে সরাবার আর কোন উপায় নেই।

বারবার মনে পড়ছিল হীরার মুখটি। আর কষ্ট পাচ্ছিল। হীরা ধরা পড়লে কারও ক্ষতি হবে না, তার হবে। আবার মনে হচ্ছিল কেন হীরা ধরা পড়বে? তার কি শরীরে পর্তুগীজ রক্ত নেই? এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই ডিউটি দিচ্ছিল।

এই সময় সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু খবর এল।

ডিউটি দিতে দিতেই সে সেই আনন্দ সাগরে ডুবে গেল। কতক্ষণে হীরার কাছে যাবে তাই ভাবতে লাগল। হীরা নিশ্চয় এতক্ষণে খবর পেয়েছে। অন্তত কিছুকালের জন্যে ভাবনা নেই। তবু হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও চলবে না। হীরাকে এখান থেকে এই অবসরে সরাতে হবে। ডি মিলো যদি একবারও হীরার কথা জানতে পারে, তাহলে সম্রাটকে খুশি করতে আর এতটুকু দ্বিধা করবে না। হীরাকে নিয়ে সে পালাবে। হীরাকে বিয়ে করে কোথাও এই বাংলা দেশের মধ্যে লুকিয়ে যাবে কিন্তু কি করে যাবে সে জানে না। সেই চিন্তাই সে উৎসবের মধ্যে করতে লাগল। তারপর ডিউটি খতম হল। স্যামুয়েলের বাড়ী গেল। হীরাকে দেখল। হীরার দিকে তাকিয়ে সে হাসল।

হীরা কিন্তু আগের মত পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে হাসল না। কেমন যেন গত রাত্রের পরিবর্ত্তনে তার মুখের হাসি কে শুষে নিয়েছে?

মাইকেল আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, অতো ভাবনার কি আছে? এখন তো কিছুদিন আর এ নিয়ে কোন আলোচনা হবে না। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, আমার ওপর যখন নির্ভর করেছ তখন আর কিছু ভাবতে হবে না।

হীরা ম্লান হাসল মাইকেলের কথায়।

এমনি ভাবে মাইকেল সান্ত্বনা দিয়ে চলল। তারপর দু পাঁচ দিন আরও এমনি ভাবে বিদায় নিল। এদিকে মাইকেল উপায় ভেবে চলেছে, আর ডি মিলো, ফেডরিকও দিগো রিবেলীর ওপর সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে রেখেছে।

ডি মিলো কেমন যেন অন্য কাজে ব্যস্ত। ফেডরিক আবার জাহাজ নিয়ে গেছে। আর দিগো রিবেলী পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে যেন সুস্থ নেই। মদ আগেও খেত, এখন যেন আরও বেশি মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে পথ চলতে লাগল।

ডি মিলো সেই বিদ্রোহী ব্যবসাদারদের ধরে এনে পঞ্চাশ ঘা করে চাবুক লাগাল।

সেই নিয়ে কিছু আন্দোলন। হুগলী উপনিবেশে একটা চাপা হট্টগোল জেগে থাকল।

আবার একদিন সব সহজ গতিতে চলতে লাগল। তবে দাসবাজার সেই আগের মতই সরব হয়ে রইল। এই বাজারের যেন মন্দা নেই। এই ব্যবসার যেন কোন শেষ নেই। দস্যু বণিকরা প্রত্যহই কিছু না কিছু দাস নরনারী ধরে নিয়ে আসে।

পর্তুগীজ দস্যুবণিক অনেক। তাদের জাহাজ ঘুরছে ভারতের নদী পথে যত্র তত্র। গ্রাম উজাড় করে ঘর জালিয়ে মানুষ ধরে আনতে তাদের কোন ক্লান্তি নেই। কখন যে কোন্ গ্রামের ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে কে জানে? সে সময়ে মানুষের নিরাপত্তা দেবার ক্ষমতা কারও ছিল না। সকলেই গ্রাম বা নগরে প্রাণ হাতে করেই থাকত।

ফেডরিক মাঝে মাঝে জাহাজ নিয়ে ফিরে এসে ঘুরতে লাগল। সে এক চোখের দৃষ্টি নিয়ে খুঁজে চলে। সে যেন ভুলতে পারে না সেই মেয়েটিকে। ফেডরিকই মাঝে মাঝে ডি মিলোকে তাতায়, তাও দেখতে পায় মাইকেল।

মাইকেল ভাবছে, একটা কিছু পন্থা অবলম্বন করে হীরাকে নিয়ে সরে পড়তে হবে। হীরাকে সে আর স্যামুয়েলের বাড়ীর বাইরে নেয় না। তবু তার ভাবনার অন্ত নেই।

এখান থেকে একা পালাতেও ভয় করে। পর্তুগীজদের চোখ চারিদিকে। পর্তুগীজদের সে ভয় করে না। ভয় করে ফেডরিককে, আর দিগো রিবেলীকে। ওরা দুজনে জানে হীরাকে। হীরাকে দেখলে ওরা সনাক্ত করবে, এই সেই বাঁদী! সেই জন্যে যা কিছু ভয়।

হঠাৎ মনে পড়ল, দাক্রুজকে। দাক্রুজকে তার বিশ্বাস হল। ঐ একটি মানুষ যাকে নির্ভয়ে বলা যায় এবং যে ধর্মের জন্যে, জাতির জন্যে কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না। বরং তার কাছে সে সাহায্য চাইলে পেতে পারে।

মাইকেল দাক্রুজকে বলবে বলেই ঠিক করল। তবু আরও সময় নিল। ভয়, যদি ফাদার দাক্রুজও বেইমানী করে?

হঠাৎ একদিন শুনল, সুবাদারের ভায়া হয়ে বাদশাহের আবার একখানি পত্র এসেছে। বাদশাহ লিখেছেন, 'আপনারা আমার ক্রীতদাসীকে ফেরৎ দেন নি। আপনাদের ঔদ্ধত্য সীমাহীন। আমি সুবাদার কাশিম খানকে নির্দেশ দিয়েছি, তোপ দিয়ে যেন হুগলীর পর্তুগীজ উপনিবেশ উড়িয়ে দেওয়া হয়।'

এই চিঠি আসার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাধ্যক্ষ ডি মিলো যেন ক্ষেপে উঠল।

আবার দুর্গের সেই বড় হল ঘরটায় আলোচনা সভা বসল। লোক ছুটল গোয়াতে। 'বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে তার জন্যে সৈন্য ও গোলা বারুদ দরকার। যা দুর্গে আছে তা পর্যাপ্ত নয়। আর পথে পথে ঘোষণা করে দিল, যে সেই বাদশাহের বাঁদীর খোঁজ দিতে পারবে তাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে। হুগলীর অধিবাসীরা নতুন নতুন মেয়ের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল।

কেউ কেউ দু একজনকে দুর্গে ধরে নিয়ে এল। ফেডরিক নেই, সে জাহাজ নিয়ে আবার মানুষ ধরতে গেছে। দিগো রিবেলীকে বসিয়ে ডি মিলো সনাক্ত করতে লাগল।

মাইকেল ডিউটি ছেড়ে এগিয়ে এল। খুঁজতে লাগল ফাদার দাক্রুজকে। খুঁজতে খুঁজতে সে পেল দাক্রুজকে এক মাঠের মধ্যে। সে সেই বীজ ছড়িয়ে চলেছে।

ফাদার দাক্রুজের মুখে কেমন প্রশান্তি। যেখানে সমস্ত হুগলীর অধিবাসীরা ভাবছে সেখানে ফাদার দাক্রুজের মুখে ভাবনা নেই।

মাইকেল ভাবল হয়ত ফাদার শোনে নি বাদশাহের নতুন ঘোষণা। সে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ফাদারকে অভিবাদন করল, তারপর বলল, ফাদার তুমি শোননি বাদশাহের নতুন ঘোষণা! বাদশাহ সাফ জানিয়ে দিয়েছে তার বাঁদীকে ফেরৎ না দেওয়ার জন্যে তোপ দিয়ে পর্তুগীজ উপনিবেশ উড়িয়ে দেওয়া হবে।

দাক্রুজ প্রশান্ত মুখে এক টুকরো হাসি টানল, তারপর মাথাটা হেলিয়ে বলল, শুনেছি।

তোমার ভয় করছে না ফাদার?

ভয়? ফাদার আবার মৃদু হাসি মুখে টানল, তারপর রৌদ্রভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, না।

বাদশাহ এই হুগলী কলোনী উড়িয়ে দিলে আমরা সবাই মরে যাব, তুমিও তো মরে যাবে ফাদার! তবু তোমার ভয় করছে না!

দাক্রুজ আবার উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল—মৃত্যু তো একদিন আসবেই তার জন্যে ভয়ের কি আছে?

মাইকেল তাকিয়ে থাকল দাক্রুজের দিকে। বিশ্বাসও করল। সত্যিই এ মানুষের ভয় নেই। ভয় থাকলে তাহলে সে আর মাঠে বীজ ছড়াতে পারত না।

যে ভয়ে ব্যাণ্ডেল গির্জার ফাদাররা মেরীর সামনে বসে উপাসনা করতে শুরু করে দিয়েছে, যে ভয়ে পল্লীতে পল্লীতে কান্নার রোল উঠেছে, সেখানে এই মানুষ মৃত্যু ভয়ে ভীত না হয়ে সে অবিচলিত ভাবে নিজের প্রত্যহের কাজ করে চলেছে।

ফাদার দাক্রুজকে লোকে বলে পাগল। অন্য ধর্মযাজকরা বলে বিশ্বাসঘাতক কিন্তু অনেকেই জানে, ফাদার এমন একজন মানুষ, যা কারুর সঙ্গে মেলে না।

মাইকেল সেইজন্যে ছুটে এসেছে এই ফাদারেব কাছে। সে পারে একমাত্র বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। দাক্রুজ আবার এগিয়ে গিয়ে বীজ ছড়াচ্ছিল। তার যেন কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। এই মাত্র যা শুনল তাও যেন কথার কথা। আতঙ্ক তো নয়, প্রত্যহের কাজেও কোন শৈথিল্য নেই।

মাইকেল আবার দু পা এগিয়ে গেল। আর যে সময় নেই। হীরাকে আজ না সরাতে পারলে ঠিক ধরা পড়বে। বলল, ফাদার, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

দা ক্রুজ নীল চোখে তাকাল। চোখের দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

মাইকেল হীরার সম্বন্ধে সব কথা বলে গেল। এতটুকুও গোপন করল না। শেষে বলল, নিজের ইচ্ছা। ফাদার তুমি যদি আমাকে সাহায্য না কর তাহলে কমাণ্ডারের হাতে হীরাকে তুলে দিতে হবে, কিন্তু প্রাণ থাকতে আমি তা পারব না। হীরাকে আমি বিয়ে করব, হীরাকে নিয়ে ঘর বাঁধব।

দাক্রুজ সব শুনে উদাস চোখে মাইকেলের দিকে তাকিয়ে রইল।

কিছু বলল না দেখে মাইকেল আবার ছটফট করে উঠল, ফাদার আমি বড় নিরুপায় হয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে না?

ফাদার অনেক পরে কথা বলল, তুমি কি সাহায্য চাও বলো?

ফাদার, আমি জানি না। তুমি যা বলবে তাই আমি মেনে নেব।

হঠাৎ দাক্রুজ অস্ফুটকণ্ঠে বলল, বিপদে মানুষকে সাহায্য করা মানুষের ধর্ম। তারপর বলল, বাদশাহের ক্রীতদাসী কি সেই, যে স্যামুয়েলের বাড়ীতে আছে?

মাইকেল মাথা নাড়ল।

দাক্রুজ বলল, চলো, আগে তাকে সরিয়ে রাখি।

ওরা দ্রুত স্যামুয়েলের বাড়ীর পথ ধরল।

স্যামুয়েল বাড়ী ছিল না, মারিয়ার সঙ্গে দেখা হল, সে মাইকেলকে দেখে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, মাইকেল, সত্যি করে বলতো, হানা কে? হানা কি সেই মেয়ে, যার জন্যে আমাদের সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে?

এ কথা কেন বলছ মারিয়া?

আমাদের সন্দেহ হচ্ছে। স্যামুয়েল গেছে সেনাপতি ডি-মিলোর কাছে। যদি সেই হয়, তাহলে আমরা বাঁচবার জন্যে তাকে ধরিয়ে দেব।

মাইকেল হাসবার চেষ্টা করল, কথাটা উড়িয়ে দিতে চাইল কিন্তু সহজ না হতে পেরে শুধু বলল, তোমাদের মাথা খারাপ হয়েছে! সবাইকে তোমরা বাদশাহের ক্রীতদাসী ভাবছ!

দাক্রুজ তখন হীরাকে সঙ্গে নিয়ে অনেক দূর চলে গেছে।

মাইকেল বেরিয়ে এসে কোথাও না তাদের দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হল। তারপর সেও দুর্গের দিকে এগিয়ে চলল। পথে দেখা স্যামুয়েলের সঙ্গে। স্যামুয়েল তাকে দেখেই গম্ভীর হল। তারপর বলল, মাইকেল, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

বলো। মাইকেল হাসবার চেষ্টা করল।

হানা যে সেই ক্রীতদাসী, তুমি জানতে না!

মাইকেল আশ্চর্য হবার ভাণ করে বলল, কই না।

হানার লুকিয়ে লুকিয়ে কান্নাতেই আমরা বুঝতে পেরেছি। সেনাপতিকে সেই কথা বলে এলাম। তিনি বললেন, মেয়েটাকে নিয়ে আসতে। তা তোমার জিনিস, তুমি গচ্ছিত রেখেছ, আমরা কেমন করে নিয়ে যাই? তুমি যদি হুকুম দাও তাহলে ফোর্টে নিয়ে যেতে পারি।

মাইকেল ভাবল, একবার বলে, নিয়ে যাও, আবার কি ভেবে বলল, স্যামুয়েল তোমাকে একদিন যথেষ্ট সাহায্য করেছিলাম মনে পড়ে? সেদিন যদি তোমাকে সাহায্য না করতাম তাহলে তোমার জীবন বিপন্ন হত। হানা যদি সত্যিই সেই মেয়ে হয়, তাহলে তুমি কি সাহসে আমার নির্বাচিত পাত্রীর বিষয়ে কমাণ্ডারকে বলতে গেলে?

স্যামুয়েল অস্থির হয়ে বলল, অন্যায় কি? আজ একটি মেয়ের জন্যে আমরা মরতে বসেছি। যদি হানা সেই মেয়ে হয়, তাহলে বাদশাহকে ফেরৎ দিলে নিশ্চয় আমরা বেঁচে যাব। তুমিও পর্তুগীজ। তোমারও দেশের স্বার্থ দেখা উচিত।

মাইকেলের ইচ্ছে করল স্যামুয়েলকে একটা চড় মারে। তারপর কি ভেবে ব্যঙ্গ করে বলল, বন্ধুত্বের অদ্ভুত প্রমাণই তুমি দেখালে! বেশ ভাল নিরাপদ জায়গাতেই তাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। মাইকেল ঘৃণার দৃষ্টিতে স্যামুয়েলের দিকে তাকিয়ে পথ চলতে লাগল।

স্যামুয়েল চিৎকার করে বলল, হানাকে নিয়ে কি করব বলে গেলে না তো!

মাইকেল মুখ ঘুরিয়ে বিকৃত কণ্ঠে বলল, যা খুশি তাই করতে পারো, আমার কোন কিছুতেই আপত্তি নেই।

মাইকেল তখন নদীর তীরে ফিরে এল। সে এবার নিশ্চিন্ত। ফাদারের হাতে যখন হীরা গেছে তখন আর ভাবনার কিছু নেই।

পড়ন্ত বেলা নেমে আসছে। বেচা কেনা সারা, ভিন দেশের নৌকা বাড়ীর পথে পাড়ি দিতে শুরু করেছে।

রণতরী সাজানো হচ্ছে। সৈন্যেরা আর বসে নেই। গুদাম থেকে গোলা বারুদ বের করে আনছে। যুদ্ধ সাজে তৈরি হচ্ছে হুগলী উপনিবেশ।

তবু ভয়, এ আর কি হবে? বাদশাহের বিস্তৃত মুঘল বাহিনীর কাছে এদেশের পর্তুগীজরা নগণ্য। একটি সাম্রাজ্যের কাছে একটি ক্ষুদ্র শক্তির হাত পা ছোঁড়া শুধু শিশু সুলভ। তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই।

মাইকেল দেখতে লাগল, ফাদাররাই কত মেয়ে ধরে এনে দিগো রিবেলীর সামনে উপস্থিত করছে।

ডি মিলো তাকে খাতির করে ড্রিঙ্ক এগিয়ে দিচ্ছে। দিগো রিবেলী মদে চুর হয়ে মাথা নাড়ছে। মাঝে মাঝে নেশাজড়িত কণ্ঠে বলছে, একবার তাকে পেলে হয়, সে আমাকে ছুরি দেখিয়ে পালিয়েছিল। আমাকে বলেছিল, বুড়ো। দিগো রিবেলীর কষ বেয়ে মদের গ্যাঁজলা গড়িয়ে পড়ছে। সে লাল চোখে মেয়েগুলোর দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

মাইকেল আবার বেরিয়ে এল দুর্গ থেকে। তার ভয় করতে লাগল, স্যামুয়েল বাড়িতে গিয়ে হীরাকে না পেয়ে যদি ডি মিলোকে এসে তার নাম বলে দেয়! দাক্রুজ আসছিল। তাকে দেখে মাইকেল তার কাছে এগিয়ে গেল।

দাক্রুজ তাকে দেখে চাপাকণ্ঠে একটা জায়গার নাম বললো। আরও বলল,

সন্ধ্যের আগেই সেখানে পৌঁছবে। বিয়ের সব আয়োজন হচ্ছে, বিয়ে শেষ করেই এখান থেকে তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে। নৌকারও ব্যবস্থা হয়েছে। ফাদার দাক্রুজ তারপর অন্য পথে চলে গেল। তারপর আঁধার নামতে লাগল। পশ্চিমে সূর্য চলে পড়ল।

মাইকেল এগিয়ে চলল চণ্ডীপুর গ্রামে। পাশেই চুঁচুড়া, সেখানেও একটি গির্জা ছিল। সেই চুঁচুড়াতেই চণ্ডীপুর গ্রাম। মাইকেল দ্রুত এগিয়ে চলল। শুনল, আজ রাত্রেই নাকি সুবাদার কাশিম খান হুগলী আক্রমণ করবে।

আজই সরে পড়তে হবে এখান থেকে। যাবার সময় ফাদারকেও নিয়ে যেতে হবে। মনে দারুণ উত্তেজনা, মাইকেল চেনা পথই কতবার ভুল করল। বিশ্বাস-ঘাতকতা সে করবে! এ ছাড়া উপায়ই বা কি? হীরাকে সেনাপতির হাতে তুলে দিতে মন চায় না। হীরাকে সে ভালবেসেছে। হীরাকে ছাড়া সে চিন্তা করতেই পারে না। সেই হীরার জন্যেই আজ সে দেশের শত্রু হয়ে উঠল। না আর ভাববে না। জগতে প্রণয়ের জন্যে অনেক ঘটনা ঘটেছে। এও একটা দৃষ্টান্ত থাকবে। শুকনো পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে মেঠো পথ ধরে, গাছ গাছালির ভেতর দিয়ে মাইকেল দ্রুত এগিয়ে চলল।

ফাদার দাক্রুজ যে কথা অতি সহজে বুঝল, তার বুঝতে এখনও দ্বিধা। পর্তুগীজ হয়ে পর্তুগীজদের সর্বনাশ করতে মনে যেন কেমন লাগছে। তবু হীরাকে মন থেকে সরিয়ে দিতে সে পারবে না।

হীরা বলেছিল, আমি আর ভাবতে পারি না। তুমি যেটা ভাল হয় কর। তুমি যদি মনে কর, আমাকে সঁপে দিলে তোমরা সর্বনাশ থেকে বাঁচবে, আমি না করব না। হীরা যে কত ভাল এই দৃষ্টান্তই তার প্রমাণ।

মাইকেলের মনে আছে, দিগো রিবেলীর বাড়ী থেকে যখন পালাচ্ছে তখন তার দেখা পেতেই বলেছিল, 'মুরোদ নেই শুধু দেখার সাধে আত্মহারা। ছিলে কোথায় বাপু কাল…'

হীরা ভীষণ হাসত। আজকাল হাসে না। আজকাল যেন হাসি শুকিয়ে গেছে। সেই মেয়েকে ধরিয়ে দিলে অনুতাপ হবে না!

না, না এসব কি সে ভাবছে? হীরাকে ধরিয়ে দেবার মতলব মনে আসছে কেন? তবে কি তার ভালবাসার কোন দাম নেই? আকর্ষণ যেটুকু তা ঐ বাহ্যিক ভাল লাগা? কিছুই বুঝতে পারল না মাইকেল। ধোঁয়াটে পথ ধরে এগিয়ে চলল।

তারপর চণ্ডীপুর গ্রামের ছোট্ট খোড়ো চালের গির্জা ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে হীরাকে দেখতে পেল না। দুজন ফাদার তাকে অভিবাদন জানাল। তারপর ফাদার দাক্রুজ এল। দ্রুত বিয়ের আয়োজন হল। হঠাৎ কোথা থেকে যেন খৃষ্টান মেয়ের মত সাজিয়ে হীরাকে আনা হল। সঙ্গে দুজন মেমসাহেব। হীরাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। সাদা সিল্কের গাউন পরণে। মাথায় কনের মত ঘোমটা টানা।

মোমবাতি জ্বলছে অনেক! সেই মোমবাতির জোরালো আলোর সামনে

হীরার পাশে গিয়ে মাইকেল দাঁড়াল। ফাদাররা মন্ত্র পড়তে লাগল। হঠাৎ গর্বে মাইকেলের বুক ভরে গেল। ভালবাসার সার্থকতা পরিণয়ে সমাপ্তি হয়। যদি সেই ভালবাসায় সার্থকতা থাকে।

তাদের পরিণয় সমাপ্ত হল। পৃথিবীর দুই দেশের মানুষ নয়, দুটি শাশ্বত নরনারী। তারা পরস্পরকে ভালবেসেছিল, তাই এই মিলন সার্থক হল। কটি মুহূর্তের মধ্যে মোমবাতি প্রজ্বলিত শিখার সামনে দাঁড়িয়ে মাইকেল প্রতিজ্ঞা করল, আজ থেকে হীরার সব ভার আমি নিলাম। সমস্ত আপদ বিপদ থেকে তাকে আমি সারাজীবন রক্ষা করব। বিয়ে শেষ হয়ে গেল।

ফাদার আর এতটুকু সময় দিল না তাদের অপেক্ষা করতে। ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের নিয়ে গিয়ে নদীর ধারে তুলল। সেখানে ব্যবস্থা করাই ছিল। পাড়ে নৌকা বাঁধা। সেই নৌকায় দুজনকে তুলে দিয়ে ফাদার চাপাস্বরে বলল, পশ্চিম দিকে জোর দাঁড় টেনে চলে যাও, আজই সুন্দরবনের মধ্যে ঢুকে পড়বে। তবে ভুলেও পূবদিকে যাবে না, তাহলে হুগলী বন্দরে ধরা পড়বে মাইকেল বলল, ফাদার, তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো। আজই হয়ত বাদশাহের সৈন্য হুগলী আক্রমণ করবে।

ফাদার দাক্রুজ আবার সেই মৃদু হাসি ঠোঁটের কোনায় আনল। তারপর বলল, তোমরা যাও। তোমরা বাঁচলেই আবার নতুন মানুষ জন্ম নেবে।

ফাদার জলে নেমে নৌকো ঠেলে দিল। আর কোন কথা হল না। মাইকেল দাঁড় ধরে বসল।

নৌকো উত্তাল ভাগীরথীর ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল। হীরা মাথা নিচু করে বসেছিল। মাইকেল কয়েকবার তার দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না।

চাঁদের আলো পড়েছে জলের ওপর। হীরার চোখেও আলো। কে যেন তাকে বিয়ের সাজে সাজিয়ে দিয়েছিল। বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল।

মাইকেল জোরে জোরে দাঁড় বাইছে। মনের অনেক দুর্ভাবনা গেছে। এখন কোন নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে পারলেই নিশ্চিন্ত। হঠাৎ দূর থেকে তোপ দাগার শব্দ কানে এল। মুহুর্মুহু তোপ দাগা। যেন এক সঙ্গে আকাশটা ভেঙে পড়ল। অন্ধকার আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেয়ে খেয়ে উঠতে লাগল। আর মানুষের গগনভেদী চিৎকার। বাদশাহের সৈন্য হুগলী আক্রমণ করেছে।

মাইকেল দাঁড় বহা বন্ধ রেখে পূর্বদিকের লাল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ যেন কি তার হল? পূবদিকেই নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে জোরে জোরে বাইতে লাগল।

হীরা প্রথমে বুঝতে পারল না মাইকেলের মতলব। হঠাৎ সে বুঝতে পেরে আর্তস্বরে চিৎকার করে বলল, এ তুমি কোথায় যাচ্ছ মাইকেল?

মাইকেল তখন উত্তেজনায় কাঁপছে। জোরে জোরে দাঁড় বেয়ে বেয়ে সে এগিয়ে চলল।

মাইকেল, এ তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

তোপের শব্দে হীরার কথা হারিয়ে যেতে লাগল।

হঠাৎ মাইকেল হা হা করে হেসে উঠল। কেমন যেন উন্মাদ একটা মানুষ, পাগলের মত বলল, জাতিকে ও দেশকে রক্ষার জন্যে তোমাকে ধরিয়ে দিতে যাচ্ছি।

স্তব্ধ হীরা। দু'চোখে জল। তার মুখে আর কোন কথা নেই। মাথা থেকে অবগুণ্ঠন খসে পড়েছে। একসময় বলল, মাইকেল, আমি যে তোমার স্ত্রী। আমাকে তুমি ধরিয়ে দিয়ে জাতিকে বাঁচাবে ?

ওরা হুগলী বন্দরের অনেক কাছে চলে এসেছিল। তোপ ফাটার শব্দে ও আগুনের ভয়ঙ্কর আলোয় সে এক বীভৎস পরিস্থিতি।

চতুর্দিকে গোলা ফাটছে। আগুনের ফুলকি বাতাসে ছুটছে। ঘর বাড়ী জ্বলছে। মানুষের চিৎকার উঠছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার। হঠাৎ একটি গোলা এসে মাইকেলের নৌকায় পড়ল। নৌকাটা শূন্যে উঠে চৌচির হয়ে ফেটে গেল।

কোথায় বা হীরা, কোথায় বা মাইকেল। তখন সেই হুগলীর পর্তুগীজ উপনিবেশে শুধু মৃত্যুর মরণোৎসব। আর ভাগীরথীর স্রোতে তখন কি এক দামাল রূপ।

ঐতিহাসিক সেই যুদ্ধ তিন মাস ধরে চলেছিল।

সম্রাট শাহজাহান হুগলী থেকে পর্তুগীজদের চিরতরে নির্বাসন দিয়েছিলেন। কত মৃতদেহ ঐ ভাগীরথীর স্রোত দিয়ে বয়ে চলেছিল। তার মধ্যে হীরার মৃতদেহ খুঁজলে বোধ হয় পাওয়া যেত। আর মাইকেল ! না, মাইকেলের কথা থাক্।

মাইকেল শেষ মুহূর্তে কেন এই চেয়েছিল ? জাতিকে সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে গিয়ে ভালবাসাকে কেন রক্তাক্ত করেছিল ? কিন্তু কে তার উত্তর দেবে ?

আরও বহু বছর পরে পর্তুগীজরা আবার ব্যাণ্ডেল গির্জা স্থাপন করেছিল। ফাদার দাক্রুজ সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে হুগলীতে ৭৭৭ বিঘা জমি পর্তুগীজদের জন্যে পেয়েছিল। আবার স্থাপনা করেছিল তার আওয়ার লেডিকে। দাক্রুজ জানত, হীরা ও মাইকেলকে সরিয়ে দিয়ে সে এক মহৎ কাজ করেছে। মহতী পরিকল্পনা কিন্তু পরের ঘটনা সে জানত না।

আজ যেন সেই ব্যাণ্ডেল গির্জায় গেলে সেই হীরাকেই বার বার মনে পড়ে। মাইকেল কেন শেষপর্যন্ত এমনি কাজ করল ? হীরাকে সুখী করতে সে কি দেশের শত্রু হতে পারত না ? কিন্তু তারও জবাব কে দেবে ? দেবে কি দাক্রুজের ছড়ানো বীজে সৃষ্টি হুগলীর মাটিতে বেড়ে ওঠা ঐ লক্ষ লক্ষ সেই কৃষ্ণকলি ?

●

● ●

এ পথ দিয়ে এখনও চলে যেন কেউ। চলে লীলা কৌতুকী, সদ্যস্নাতা কিশোরী নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি। তার চলার ছন্দে বাজে মৃদঙ্গ। তার চলার ভঙ্গিতে ভাঙে অবহেলায় পড়ে থাকা গাছের শুকনো পাতা। কে সেই তন্বী তরুণী? কবির হৃদয় সরোবরে আনন্দ স্নানে ধন্যা হয়ে চাঁদের মত আকাশের পটে উজ্জ্বল হয়ে আছে!

'পীরিতি পীরিতি কি রীতি মুরতি হৃদয়ে লাগল সে
পরাণ ছাড়িলে পীরিতি না ছাড়ে পীরিতি গড়ল কে॥'

এ বুঝি কোন এক যুগের কথা নয়। যুগের পর যুগ ধরে সেই একই কথা ঘুরে ফিরে আসে। প্রজাপতি ফুলের বৃন্তে বসে। রঙে রঙে পৃথিবী নতুন রঙে বিভোর হয়।

নান্নুরের এই পথে এখনও কেউ এলে থমকে দাঁড়ায়। ছায়া-ছায়া নিস্তব্ধ পল্লীটা যেন পাখীর মুখর তানে আবার সরব হয়ে ওঠে। 'ঠাকুর এ আমার কি হল? একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।' সেই বিস্মৃতিপ্রায় যুগের কথা যেন আবার দুটি কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়ে পাপীয়ার তানে তানে মুখর হয়ে ওঠে।

লুব্ধ পথিকের দল এসে দাঁড়ায় চোখে বিস্ময় নিয়ে। ছায়াঘন সেই শান্ত পল্লীটা দ্বিপ্রহরের নিঝুম ক্লান্তিতে আবার চমকে চমকে ওঠে। আবার সে শুনতে পায় বক্তার মুখের কথা। এখানেই রজকিনী রমণী কাপড় কাচত, এই সেই পাটা। আর ঐ দূরে চণ্ডীদাস পুকুরের পাড়ে বসে মাছ ধরতেন।

বক্তার মুখে আর কথা সরে না। লুব্ধ পথিকের দল শুব্ধ বিস্ময়ে কি কথা ভেবে যেন নির্বাক হয়ে যায়। যেন মানসচক্ষে দেখতে পায় নিটোল যৌবনবতী একটি মেয়ে কোমরে নীল শাড়ীর আঁচল জড়িয়ে জলের ওপর পা দু'খানি মেলে দিয়ে পাটার ওপর কাপড় আছড়ে চলেছে। দুলছে সমস্ত নিটোল অঙ্গ। চোখে তার কটাক্ষ। দূরে তাকিয়ে আছে বঙ্কিম ভুরুতে রাজ্যের এক বিস্ময় নিয়ে। ঠোঁটে হাসি চাপছে। চাপা ঠোঁটের ভেতর থেকে যেন রৌদ্রের কণা রেণু রেণু হয়ে ঝরছে।

আর ওপাশে গাছের ছায়ার নীচে যে বসে মাছ ধরছে, তার গৌরবর্ণ দেহের শুভ্র উপবীত যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তার লক্ষ্য জলের ওপর। কিন্তু মাঝে মাঝে চোখ চলে যাচ্ছে কোথায় যেন? দূরে শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে যে পাটার ওপর কাপড় কাচছে তার সামনে এসে থামছে। চারি চোখে দৃষ্টি মিলছে। ক্লান্তিতে রজকিনীর কপোল বেয়ে স্বেদবিন্দু নামছে। মুখে কাপড় আছড়ানোর জলের ফোঁটা। তবু ঠোঁটে ঠোঁট চাপা হাসি।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের বহু আগে নান্নুরের এই পল্লীতে এমনি এক ঘটনাই ঘটেছিল। চণ্ডীদাস ও রামী। রজকিনী রামী। রজক ঘরের এক মেয়ে বিশালাক্ষী দেবীর পূজারী এক ব্রাহ্মণের প্রেমে পড়েছিল। আর সে প্রেম অমর হয়ে আছে চণ্ডীদাসের পদাবলীতে।

চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রতি ছত্রে ছত্রে সেই প্রণয়ের জয়োগান। পরবর্তীকালে আচারনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ চণ্ডীদাসের পদাবলী থেকে রজকিনী রামীর নামটি নিঃশেষে মুছতে চেয়েছিলেন কিন্তু যাকে দেখে চণ্ডীদাসের মধ্যে প্রেরণা, কবিতা লেখার উৎস, যার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'জানি না, কিবা রূপে কিবা গুণে মন মোর বাঁধে। মরমের কাহিনী ভাষার অতীত। মুখেতে না সরে বাণী প্রাণ মোর কাঁদে। প্রতিকারের উপায়ও থাকে না। যে এ দশা করিয়াছে সে নিষেধ মানে না।'

আজ সেই চণ্ডীদাসকে নিয়ে কত না কাহিনী, কত বিস্ময়!

রামী বুঝি না থাকলে চণ্ডীদাসের পদাবলী অমর হত না। রামী জীবনে না এলে বুঝি চণ্ডীদাস কবিতাই লিখতে পারতেন না।

অথচ চণ্ডীদাস কি জানতেন, রজক ঘরের মেয়ের কাছে তার জীবন, যৌবন সবই বাঁধা পড়বে?

বীরভূমের এই নিরালা পল্লীতেই চণ্ডীদাসের জন্ম। ফুল যেখানে আপনি ফোটে, পল্লীর স্নিগ্ধ ছায়াশীতল মমতায়, আপন স্বভাবে ও প্রকৃতির সোহাগে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। বিশালাক্ষীর মন্দিরে দেবীর সামনে প্রত্যহ পূজায় বসতেন। পূজা সমাপ্তে গিয়ে বসতেন বাড়ারই একান্তে পুষ্করিণীর ধারে মাছ ধরবার জন্যে।

হঠাৎ একদিন দেখেন রামীকে।

কে জানত এই রজক ঘরের মেয়ে একদিন এক প্রতিভাবানের সৃষ্টির মাঝে চির অমর হয়ে যাবে। অথচ রামী থাকত কাটোয়া অঞ্চলের তেহাই নামক গ্রামে। পিতৃমাতৃহীন হয়ে রামী চলে আসে নান্নুরে এক আত্মীয়ের বাড়ি।

চণ্ডীদাস ছায়াঘন গাছের তলায় বসে তাকান অপরিচিতার দিকে। বুঝতে পারেন না এ কে?

রামী পুকুরে এসে পাটার ওপর কাপড় ফেলে আছড়ায়। দেহ নানা ছন্দে বাঁক নেয়। আবার চলে যায় কাপড় কেচে নিয়ে জলসিক্ত কাপড়ে।

চণ্ডীদাস বিস্ময়ে ভাবেন। বুকের মধ্যে যেন তার কি করে ওঠে?

পরের দিনও এমনি। রামী আসে বেলা গড়িয়ে এলে ঘাটে। তার হাতে ময়লা কাপড়ের বোঝা। সে কাপড়ের বোঝা হাতেই তাকায় চণ্ডীদাসের দিকে। তারপর মুখ নামিয়ে নিয়ে কি যেন ঠোঁটে চেপে এক মনে কাপড় কাচতে থাকে।

কখন তন্ময়তার ঘোরে চণ্ডীদাস নিজের মধ্যে হারিয়ে গেছেন জানেন না। হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠেন নারী কণ্ঠস্বরে—ঠাকুর, তোমার ছিপে কি আর মাছ পড়বে?

সচকিত হয়ে ওঠেন চণ্ডীদাস। ছিপটি তুলতে গিয়ে দেখেন ছিপের সুতো ছিঁড়ে মাছ কখন পালিয়েছে।

দাঁড়িয়ে আছে রামী জলসিক্ত বসনে। চোখ ভরে দেখছে চণ্ডীদাসকে।

সেদিন চণ্ডীদাস কিছু বলেন নি, বলতে পারেনও নি। রামীও তাকিয়ে তাকিয়ে কেমন যেন পিছু হটে চলে গিয়েছিল।

কিন্তু কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল দুজনার কেউ জানে না। হঠাৎ একদিন রামী ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল চণ্ডীদাসের কোলের ওপর।

রামী বলল—ঠাকুর, এ আমার কি হল?

চণ্ডীদাসের মুখে কথা নেই।

বিশালাক্ষী মন্দিরে দেবীর সামনে পূজোয় বসেন চণ্ডীদাস। গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করেন। কিন্তু চোখের সামনে যেন রামীর মুখ ভেসে ওঠে।

তাদের এ মেলামেশা গ্রামবাসীর চোখে গোপন থাকে না। সমাজপতিরা চণ্ডীদাসের পাতিত্য ঘটেছে বলে ঘোষণা করেন। প্রায়শ্চিত্ত না করলে এ দোষ মুক্ত হবে না।

উৎসবের সমারোহ প্রাঙ্গণে চণ্ডীদাস বসে আছেন। প্রায়শ্চিত্তের জন্যে সমাজ-পতিরা উদগ্রীব। এই সময়ে রামী ছুটে আসে সেই উৎসব প্রাঙ্গণে। চণ্ডীদাসের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে বলে—ঠাকুর, তুমি নাকি আমাকে ভালবেসে পতিত হয়ে গেছ?

চণ্ডীদাসের মধ্যে এই প্রশ্নেরই সমাধান হচ্ছিল না কিছুতে। সে সমাধানের পথ যেন রামী এসে উৎসব প্রাঙ্গণে সহজ করে দিল। সমাজপতিরা দেখলেন দুটি হৃদয়ের আকুলতা। তবু যেন কোথায় থাকে দ্বিধা। সমাজের উচ্চনীচ ভেদাভেদের চুলচেরা হিসেব যেন এদের কিছুতেই এক করে নিতে পারে না।

কিন্তু চণ্ডীদাস তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন। রচিত হতে লাগল চণ্ডীদাস পদাবলী। পদাবলীর প্রতি ছত্রে ছত্রে রজকিনী রামীর রূপ গুণ। চণ্ডীদাস লিখলেন—'রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ কামগন্ধ নাহি তায়।'

চণ্ডীদাসের গানে হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় অনুভূতির এমন এক ভাব বিহ্বলতা প্রকাশ পেল যে রামী নিজেই তন্ময় হয়ে তার স্রষ্টার দিকে তাকিয়ে থাকে।

চণ্ডীদাসের মধ্যে ছিল কবিত্ব শক্তি কিন্তু সে শক্তি স্ফুটনের মুখে এসে পাপড়ি মেলতে পারছিল না। রামীর সাহচর্য তাকে দিল সেই ফোটার প্রেরণা। অজস্র মুক্তার মত বাণীবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে এল অমৃতময় সুধারস, চণ্ডীদাস গাইলেন—

'নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী চমকি চাহিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী ততহি উদয় ভেল।'

রামী বলল—ঠাকুর, আমি সামান্য মেয়ে তুমি আমার মধ্যে কি দেখো?

চণ্ডীদাস ডাকেন—রামী। রজকিনী রামী। তুমি রজক রমণী নও, তুমি আমার রমণী।

বিশালাক্ষী মন্দিরে পূজার আসনে বসে চণ্ডীদাস চোখের জলে ভাসেন। কি অপূর্ব এক ভাবাবেগ তাঁর মধ্যে খেলা করছে। শুধু ভাষা চাই।

রামী অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে তার দয়িতের দিকে। ছুটে চলে যেতে চায় তার মন। প্রাণ কেঁদে ওঠে কিসের যেন আকুতিতে।

চণ্ডীদাস একটি কীর্তনীয়ার দল গড়লেন। দলের সঙ্গে রামী।

তারপর নেমে এল এক অজানা বিপদ দুজনার মাঝে। কীর্তনের জন্যে ডাক পড়ল কীর্ণাহারে কিলগির খাঁর রাজসভায়। সেখানে রামীও সঙ্গে গেল।

রাজসভায় দলে দলে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি। চিকের আড়ালে বসে মেয়েরা।

গৌরকান্তি অনিন্দ্যসুন্দর চণ্ডীদাস। নিজের রচিত প্রেমের কাজলে ডোবানো কীর্তনের পদ। সুরে ও গানে বিভোর করে দিলেন রাজসভা।

কিন্তু চিকের আড়াল থেকে কে যেন মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে চণ্ডীদাসকে বরণ করলেন। চণ্ডীদাস জানলেন না তার কিছুই। রামীর হাত ধরেই রাজসভা থেকে অজস্র সুখ্যাতি বুকে তুলে নিয়ে প্রেয়সীর হাতে হাত জড়িয়ে পথে এসে নামলেন।

কিন্তু হঠাৎ সিপাই এসে চণ্ডীদাসের গতিরোধ করল। নিয়ে চলল চণ্ডীদাসকে সিপাইরা বন্দী করে।

যে রাজা একসময়ে তাঁকে অজস্র সুখ্যাতিতে ভূষিত করেছিলেন, হঠাৎ তাঁর চোখে অগ্নিদীপ্তি জ্বলে উঠল। চণ্ডীদাস জানলেন, রাজার এক বিবি তাঁর প্রণয়াসক্ত।

কিন্তু কোন কিছু ভাবার আগেই রাজার বিচার হয়ে গেল। হাতীর সঙ্গে বেঁধে তাঁর মৃত্যু ঘটানো হবে।

রামী জানল না এসব কিছুই। তার মনে তখনও সেই কীর্তনের সুর। মনে ভাবাবেগ। সে বুঝতে পারে না রাজার লোকেরা কেন তার প্রিয়জনকে আবার নিয়ে গেল।

সেও ফেরে পিছন টানে। কীর্ণাহারের পথ দিয়ে চলতে চলতে তার রূপসী তনু যেন কি এক আনন্দে আরও রূপের পসরা মেলে। গুণ গুণ করে গান গায় কি কথা ভেবে যেন।

'থির বিজুরী বরণ গৌরী দেখিনু ঘাটের কূলে।'

তার চণ্ডীদাসের রচনা।

হঠাৎ তার স্বপ্ন ছুটে যায়। রাজবাড়ির সিংহ দরজার দিকে তাকিয়ে কণ্ঠের গানও থেমে যায়। হাতীর সঙ্গে বদ্ধ অবস্থায় তার প্রাণের প্রতিম। বুঝতে পারে না কিছু। ছুটে যেতে চায়। সিপাইরা তাকে বাধা দেয়। তারপর ভেঙে পড়ে মাটিতে চোখের জলে। ঠাকুর, এমন যে কিছু একটা ঘটবে এ তো আমি জানতুম! এত সুখ কি আমার এ জীবনে সয়?

চণ্ডীদাসের পদাবলী শুধু সত্য আর সবই আজ গল্প। চণ্ডীদাসকে নিয়ে আজ অনেক কাহিনী। নান্নুর শুধু বীরভূমে ছিল না। বাঁকুড়া জেলার ছাতনায়ও আছে। কেউ বলেন, তাঁর প্রণয়িণীর নাম শুধু রামী ছিল না। তার অনেক নাম, রাই, রাসমণি রামিনী অষ্টোত্তর শত নাম।

বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে বাজে আজও ঘণ্টা ঢং ঢং। কে যেন মেঘের কোল বেয়ে নীল শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে কোথায় চলে যায়। শুধু চমকই জাগে, আর সব বিস্মৃতি।

বাঈ বেগম বাঁদী

কলঙ্কময় এক অধ্যায়

আকবরের রাজত্বকালে প্রথম কয়েকবছর ছিল কলঙ্কময়। প্রথমে তিনি ছিলেন অপরিণত, তারপরে হয়েছিলেন বিলাসী। অন্তঃপুরের বিলাস প্রমোদের মধ্যে গা ভাসিয়ে দিয়ে রাজকার্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। প্রথমে অভিভাবক ছিলেন, বৈরাম খান। পরে অন্তঃপুরের জেনানারা রাজ্যশাসন করতে আরম্ভ করেন।

ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ এই 'জেনানা শাসন' এর নাম দিয়েছিলেন 'Petticoat Goverment'। এ সম্বন্ধে তার উল্লেখ লিপিবদ্ধযোগ্য—'The young monarch, as his biographer repeatedly observes, remained behind the veil, and seemed to care for nothing but sport. He manifested no interest in the affairs of his kingdom, which he left to be mismanaged by unscrupulous women, aided by Adam Khan Pir Muhammad and other men equally devoid of scruple.'

দিল্লীপ্রাসাদকূটে
'হোথা বারবার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।
কাদের কণ্ঠে গগনমন্থে, নিবিড় নিশীথ টুটে—
কাদের মশালে আকাশের ভালে আগুন উঠেছে ফুটে?'

'রবীন্দ্রনাথ'

সূর্যের স্নিগ্ধ প্রখরোজ্জ্বল রশ্মি প্রাসাদের শীর্ষচূড়া চুম্বন করেছে। কক্ষের মধ্যে স্বর্ণবর্ণের এক ঝলক রোদ্দুর। জাফরীর ভেতর দিয়ে এসে হর্মতলে দেহ মেলে দিয়েছে। আজানের উদাত্ত কণ্ঠস্বরের আকুতি বাইরে থেকে এসে হৃদয় দ্রবীভূত করছে। নহবতখানায় সানাইয়ের মধুর রাগিণীও আছে, তবে ফকির নূরউল্লার কণ্ঠসঙ্গীতই সোচ্চার।

এই সময় কেন, সে গভীর রাত্রি থেকে যখন পৃথিবী সুষুপ্তির কোলে নিমজ্জিত হয়, কোন কোন দিন রূপালী চাঁদ আলোর বর্ণাঢ্য নিয়ে উদিত হয়, কিম্বা আকাশ সেদিন অন্ধকার পক্ষে, নূরউল্লা অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিয়ে কি এক অসহনীয় বেদনার গান গেয়ে চলে। তার গান জেগে ওঠে অতিথিশালার নিম্ন প্রকোষ্ঠে কিন্তু সে গানের সুর সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, তার অবাধ গতি প্রাসাদের চতুর্দিকে। যেন নির্জীব প্রস্তরময় দেয়ালের কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত করে মহলের পর মহল ছুটে বেড়ায়।

গভীর রাত্রি থেকে উষার মুহূর্ত পর্যন্ত। ফকির নূরউল্লা যেন কার বিহনে ব্যথাতুর। বেদনার ভাষার সঙ্গেই যেন এই গীত সুরের সম্পর্ক। কেমন যেন সুর কানে পৌঁছলেই হৃদয়ের মাঝে গোপনে লুকানো প্রিয়জন হারানোর বেদনা জেগে ওঠে। আর চোখ দিয়ে আপন থেকেই জল নেমে আসে।

কান্না ভাল নয়। কাঁদতে কারই বা ইচ্ছা জাগে। তবু যখন এমন কোন প্রিয়জন হারিয়ে যায়, যাকে কিছুতেই মন থেকে মুছতে ইচ্ছা করে না, তখন বক্ষ আলোড়িত করে তার জন্যে চোখের কোলে অশ্রুনদী স্রোতস্বিনী হয়। তেমনি এক অশ্রুস্রোত ফকিরসাহেবের গান শুনলে বেরিয়ে আসে। সুপ্ত শোক আবার জাগ্রত হয়ে অন্তর মথিত করে।

কিশোর আকবর এই ফকির নূরউল্লাকে কালানৌর দুর্গে থাকাকালীন এক দরগা থেকে নিয়ে এসেছিল। সেদিনও কিশোর আকবর এই ফকিরের গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিল। ত্রিশোত্তীর্ণ একটি শীর্ণকায় মানুষ। ছিন্ন ও মলিন একটি আলখাল্লা পরিধানে। কোটরগত দুটি চক্ষু। ভগ্ন গণ্ডদ্বয়। থুতনিতে কয়েকগুচ্ছ দাড়ির চিহ্ন। বক্ষের পাঁজরগুলি গোনা যায়।

শুধু গান শুনে নয়, দীন দরিদ্র মানুষটিকেও দেখে রাজকুমারের কিশোর মন আপ্লুত হয়েছিল। ছুটে গিয়ে হাত ধরে বলেছিল তুমি আমার সঙ্গে যাবে ফকিরসাহেব।

ফকির নূরউল্লা জৌলুসে রাঙানো রাজকুমারের পোষাক দেখে অভিভূত হয় নি। বরং নিষ্প্রভদৃষ্টিতে ম্লান হেসে আকবরকে অভিবাদন করেছিল। তারপর বলেছিল— গোস্তাখি মাফি হয় জাঁহাপনা। আমি কোথায় যাবো? দুনিয়ায় আমার স্থান কই?

আকবর তবু বলেছিল, তুমি অমত কর না ফকিরসাহেব। তোমার গান আমায় মুগ্ধ করেছে। তোমার গান আমার কাছে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য উৎপীড়ন করছে। তুমি যে খোদার মেহেরবানি পেয়েছ তা জগতে দুর্লভ। তুমি চলো মিঞাসাহেব, আমি তোমায় আরামের মধ্যে রাখবো।

'আরাম!' ফকিরসাহেব ম্লান হেসেছিল।

এই দুনিয়ার সমস্ত আরাম আমার বিদায় নিয়েছে জাঁহাপনা।

কি তোমার দর্দ আমি জানি না। তবে তোমার গানের মধ্যে যে দর্দ আছে, তা আমার অন্তর স্পর্শ করেছে।

ফকিরসাহেব এর পর হাতজোড় করে বলেছিল—আমার গান আপনার দিল কেড়েছে, তার জন্যে আমার সেলাম গ্রহণ করুন জাঁহাপনা। শুধু আমাকে মেহেরবানি করে আপনার প্রাসাদে যেতে বলবেন না। রাজসিক বৈভব আমার অন্তর কেড়ে নেবে। আমি ভুলে যাবো তাকে, যাকে সর্বদা আমি গানের সাথে কাছে পেতে চাই। তাছাড়া আমি দরিদ্র মানুষ, আমার স্থান এই দীন দরগাতেই শোভা পায়।

আকবর একটু বিরক্ত হয়েছিল, হঠাৎ বিরক্তি চেপে না রাখতে পেরে বলেছিল—আমি যদি তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাই! তুমি নিশ্চয় জানো, আমার পিতা ভারত সম্রাট হুমায়ুন। আমি তার পুত্র। ভাবী সম্রাট।

নূরউল্লার ঠোঁটে সেই ম্লানহাসি। ভীত না হয়ে নিস্পৃহকণ্ঠেই বলেছিল—আমার দেহটাই আপনি অধিকার করতে পারবেন, অন্তর যাবে না আপনার রাজপ্রাসাদে। আর যে গানের জন্যে আপনি আমায় নিয়ে যেতে চাইছেন, সে গানও আর কণ্ঠ থেকে বের হবে না।

কিশোর আকবর সেইমুহূর্তে বুঝতে পেরেছিল, বলপূর্বক শত্রু ধ্বংস করা যায়। বল প্রয়োগে দুনিয়ার সবকিছু সমাধান করা যায় না। তাই লজ্জিত হয়ে বলেছিল—ভুল হয়ে গেছে ফকির সাহেব। আমি মাফি চাইছি।

তারপর আকবর হাতজোড় করেছিল। আমার বিনীত অনুরোধ। তুমি যেমনভাবে থাকতে চাইবে থাকবে, তবু আমার কাছাকাছি থাকবে। তুমি গান গাইলে যেন আমার কানে গিয়ে প্রবেশ করে।

কাতর প্রার্থনা। অন্তরের একান্ত চাহিদা। অন্তস্পর্শী আবেদন অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা কারো নেই।

ফকির নূরউল্লা তাই প্রত্যাখান করতে পারে নি। আকবরের সাথেই কালানৌর দুর্গে এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

কালানৌর দুর্গেও ফকির থাকতো প্রাসাদের বাইরে একটি মসজিদ প্রাঙ্গণে। সেখানে থেকেই গাইতো গান, আর শুনতো রাজকুমার আকবর অলিন্দে দাঁড়িয়ে। রাত্রের নিদ্রা তাঁর চোখ থেকে সরে যেত। চোখ দিয়ে নেমে আসতো দরবিগলিত ধারায় অশ্রু। ব্যথা নেই কিন্তু কি এক বেদনার কম্পন রাজকুমারের হৃদয় মথিত

করে বেরিয়ে আসতো। হয়তো মনে পড়তো তাঁর, যুদ্ধের ভয়ঙ্কর দৃশ্য। মানুষের মৃত্যুর পরিত্রাহি চীৎকার। তিনি তাই ভেবেই হয়তো কাতর হতেন। এক এক সময় মনে হত বন্ধ করে দিতে সেই গান। যে গানে হৃদয় জখম হয়, দিল কেড়ে নেয়, মন দুর্বল করে দেয়, শক্তি লুপ্ত হয়—সেই গান বন্ধ করে দেওয়াই শ্রেয়! কিন্তু বন্ধ করে দিতে কোথায় যেন বাধা জেগে ওঠে।

পিতৃবন্ধু বৈরাম খান একদিন বললেন, শাহাজাদা, ঐ বেসরম ফকিরকে গান বন্ধ করে দিতে বলো। ওর গান সৈনিকদের দুর্বল করে, ঐ গান আর কিছুদিন চললে আমরা সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হব। যদি ও উল্লাসের গান গাইতে পারে তাহলে তাই গাইতে বলো। প্রাণের এখন প্রাচুর্য দরকার। আমাদের এখন উৎসাহ দরকার। উৎসাহের গান গাইলে আমরা তাকে যুদ্ধের সময় সঙ্গে নিয়ে যাব।

কথাগুলি একেবারে অসত্য নয়, এ গান প্রাণের আনন্দ কেড়ে নয়, শুধু কান্না পায়। তবু যেন কাঁদতে ইচ্ছা করে। কাঁদলে যেন অনেক আরাম। নূরউল্লার বেদনার সাথে বেদনা মিশিয়ে কাঁদতে পেলে যেন আর কিছু ইচ্ছে করে না। রাজকুমার এই কান্নার মাঝে প্রশান্তির রূপ দেখতে পেয়ে বৈরাম খানের আদেশ উপেক্ষা করলো।

কিন্তু তখন রাজকুমার আকবরের শক্তি কতটুকু! সে বালক মাত্র। তার বুদ্ধি পোক্ত হলেও সে নাবালক। হয়তো ফকিরসাহেব নূরউল্লা দুর্গ থেকে বিতাড়িত হত, যদি না হঠাৎ এক দুর্ঘটনার সংবাদ ছুটে আসতো।

ছুটে এল। বাতাসের পূর্বেই সেই অসহনীয় দুঃসংবাদ ছুটে এল। মুহূর্তে দুর্গের মাঝে শোকের হিমস্রোত প্রবাহিত হল। সম্রাট হুমায়ুন অপঘাতে মারা গেছেন।

জেনানামহল থেকে রমণীদের কান্নার রোল উঠলো। আকবরের মা হামিদা তখন পুত্রের কাছে। তিনি হর্ম্যতলে আছড়ে পড়লেন। এ কি সংবাদ তাকে শুনতে হল? শেষকালে অপঘাতে মৃত্যু হল অতবড় একজন পুরুষের! এ যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না।

স্বামীর বিগত দিনের কথা ভেবেই হামিদা আরো রোরুদ্যমনা হলেন! একদিনও মানুষটি জীবনে শান্তি পেল না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষের সন্তান হয়ে, ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়ে শুধু ঘুরে বেড়ালেন।

হামিদার কণ্ঠই জেনানামহল ছাপিয়ে বাইরে প্রতিধ্বনিত হল। তাঁর অভিযোগ অনেক। মৃত সেই মানুষটির জীবনের অনেকগুলি দিনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। কত বিনিদ্র রাত্রি, কত বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতি। রাজ্য হারিয়ে ভ্রাতাদের চক্রান্তে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়ে—অথচ কোমল মনের সেই ক্ষমার দৃষ্টি। তিনি শুধু ক্ষমা করে গেছেন! আর নসীবের ওপর করাঘাত করে বলেছেন—এ তাঁরই ভাগ্যের ফল। মানুষের দোষ কি?

আকবর জ্ঞান হবার পর থেকে পিতার এই টানাপোড়েন চাক্ষুস দেখেছে। আর মাতার কাছ থেকে শুনেছে পিতার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস কিন্তু মাতার স্নেহক্রোড়ও

পিতার আলিঙ্গনও বা সে কদিন পেয়েছে! তার সব লালন পালনের ভার ধাত্রীদের ওপর। সে একরকম পরের কাছেই মানুষ। মাতা থাকতেন পিতার সঙ্গে সঙ্গে। আর পিতা রাজ্যোদ্ধারের জন্যে ছুটে ছুটে বেড়াতেন। পিতামাতার স্নেহ একরকম তার কাছে স্বপ্নের মতই। অন্তত এই চোদ্দ বছর পর্যন্ত। বরং তাদের স্নেহ দুর্লভ হতেই কিশোর আকরের মন তাদের স্নেহের জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকতো।

আজ সেই পিতা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। একান্ত আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু। অন্তত সংবাদ আসবার আগে পর্যন্ত কেউই ভাবতে পারে নি, এমনটি কখনও হতে পারে।

মা হামিদা আর জেনানামহলের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রোদন করলেন না, কয়েক-ঘণ্টার মধ্যে দেখা গেল তিনি দিল্লী যাবার জন্যে তৈরী হয়েছেন। সঙ্গে খুব বিশেষ কেউ নেই, শুধু কয়েকজন দেহরক্ষী সৈনিক ছাড়া। যাবেন অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে। শুধু অবরোধ থাকবে মুখের ওপর একটুকরো কাপড়ের ঘেরাটোপ। এমন-ভাবে বহুবার তিনি স্বামীর সাথে দূর দূর দেশে গমন করেছেন. তাই আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সুফী গুরু মীর্জা আকবর জামীরের কন্যার সম্মানই তিনি রেখেছেন।

তিনি যখন আকবরের কক্ষে এসে বেটা বলে দাঁড়ালেন, আকবর বিস্মিত হল না। বরং সে মায়ের দিকে তাকিয়ে অবাক হল, মার চোখে একবিন্দু জল নেই। মুখখানি বিষণ্ণ কিন্তু সে মুখে সূর্যের দীপ্তি। দীপ্তি ব্যক্তিত্বের, দীপ্তি কর্তব্যের। তিনি শুধু ভগ্নকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—বেটা, সাবধানে থাকবে; খাঁ সাহেবের কথা শুনবে। ভুলে যেও না এখন তোমার কর্তব্য অনেক। তিনি চলে গেছেন কিন্তু রেখে গেছেন তোমার জন্যে অনেক গুরুভার। সেই গুরুভার যদি বহন করতে পারো, তবেই জানবে তুমি তার উপযুক্ত পুত্র!

হামিদা বানু আর দাঁড়ালেন না, পুত্রকে কোনকিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত কক্ষ পরিত্যাগ করলেন।

আর আকবর একান্ত অসহায়ের মত নিশ্চুপ হয়ে অনাদি অনন্তকাল ধরে সেই কক্ষের হর্মতলে দাঁড়িয়ে রইল।

চোখের সামনে তাঁর কিন্তু নেই। সামনে শুধু একখানি প্রস্তরময় দেয়াল। দেয়ালের এক কোণে একটি ঘুলঘুলি। ঘুলঘুলির মধ্যে একটি শ্বেতমর্মরখচিত ফুলদানী। সেই পাত্রের ওপর প্রাসাদের অম্বুরী বাগের রক্ত গোলাপ। গোলাপগুলি থেকে যেন তাজা রক্ত নিঃসৃত হয়ে পাথরের বক্ষ রক্তাভ করেছে।

কিন্তু রাজকুমার সে সব কিছুই দেখছিল না। সে তখন সমস্ত অনুভূতির বাইরে। চোখের সামনে কালো অন্ধকারের কুহেলিকা। মনের মধ্যে অনেক আলোড়ন কিন্তু মনে হয় কোথায় যেন সব স্থির হয়ে গেছে। কোন উন্মাদনা নেই, কোন অস্থিরতা নেই। বিশাল সমুদ্র কোথায় যেন ঢেউহীন হয়ে স্থির হয়ে গেছে। জলের মাঝে কোথাও বুদবুদ নেই। কোথাও সাড়া নেই।

যে শব্দ ধরে এতটুকু পথ এগিয়ে চলা যায়। তাই মা চলে যাবার পর আকবর

এমন প্রদেশে গিয়ে বাসা বাঁধলো, যেখানে কোন প্রাণীর পৌছবার ক্ষমতা নেই। সে পিতৃহীন হয়েছে। অবলম্বন হারিয়েছে। পাহাড় সরে গেছে, এবার উন্মুক্ত ক্ষেত্র। দুস্তর মরুভূমির ওপর দিয়ে একা তাকে ছুটতে হবে। পাশে কেউ থাকবে না বরং ছুরিকা উত্তোলিত করে শত্রু পিছু নেবে।

সেই মুহূর্তে এসব চিন্তাও আকবরের ছিল না। এসব চিন্তা যদি মনে আসতো, তাহলে মন্ত্রী, সেনাপতির কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করতো। এ সমস্যারও হয়তো সমাধান হত। মা হামিদা তাকে সে সম্বন্ধে সচেতন করে গেছেন। এখন তার কর্তব্য অনেক। শক্ত মুঠিতে তরবারী ধরতে হবে।

আকবরকে হারেমের অনেকে সান্ত্বনা দান করলো। পিতার অন্যান্য বেগমরা যাঁরা ছিলেন তাঁরা এসে অনেক সান্ত্বনার কথা বললো। অন্যান্য রমণীরা ও অন্তঃপুরের শালীনতা বজায় না রেখে ছুটে এসে আকবরের কক্ষে দাঁড়ালো। এলো মন্ত্রী, সেনাপতি, উজীর, কাজী, মনসবদার। তারা স্ব স্ব পদমর্যাদা অনুযায়ী জানালো এখন থেকে তারা নবীন সম্রাটের প্রাণরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

আকবর কিন্তু নিরুত্তর। তাঁর মুখে কোন ভাষা নেই। তাঁর দৃষ্টিতে কোন শোভা নেই। তাঁর দৃষ্টি বিবশ। মনের গতি স্থির।

একবার তাঁর শুধু মনে হয়েছিল, মার সঙ্গে দিল্লী চলে গেলে কেমন হত? পিতার মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে অশ্রুবর্ষণ করলে কি সান্ত্বনা মিলতো না? শক্তি আহরণ করা যেত না?

কিন্তু এ চিন্তাও মনে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নি। কারণ তখন থেকেই কক্ষের মাঝে লোক আসতে শুরু করেছে। সংখ্যাতীত সান্ত্বনার মোলায়েম বাণী। অন্য সময় এই স্তুতি কানের মধ্যে গেলে হয়তো মনে গর্ব সৃষ্টি হত। কিন্তু এ সময়ে সেই সান্ত্বনায় যেন কোথায় আন্তরিকতা ছিল না। শুধু ছিল আগামী দিনের সম্রাটের কাছ থেকে কৃপালাভের চেষ্টা।

তাই কিশোর আকবর তেরো বছর পূর্ণ হয়ে চোদ্দ বছরে পড়বার মুখে, তাঁর সমস্ত মানসিক চিন্তাধারা হঠাৎ পরিণতির মুখে এসে পৌছলো। যেন সেইদিনের সেই মুহূর্তে তার বয়স তেরো থেকে তিপান্নতে পৌছে গেল।

শোকের নাম সবার শোনা কিন্তু শোকের আসল আকৃতি অনেকেই উপলব্ধি করতে পারে না। কিশোর আকবর পিতার মৃত্যুতে কাঁদতে চেয়েছিল। মা হামিদার মত কেঁদে পিতার স্নেহের প্রমাণ দিতে চেয়েছিল কিন্তু চোখে আসে নি একবিন্দু জল। তখনই তাঁর মনে হয়েছিল তবে কি সে পিতাকে শ্রদ্ধা করে না? নাকি পিতার প্রতি তাঁর মনে কোন অবজ্ঞা আছে?

এই সন্দেহের পরিসমাপ্তি ঘটলো, রাত্রিবেলা সেই ফকির নূরউল্লা যখন তার ব্যথার গান গেয়ে উঠলো। তখন কিশোর আকবর বুঝতে পারলো, তাঁর অবরুদ্ধ কান্না কোথায় যেন সহসা বন্দী হয়ে গিয়েছিল। গানের সুরে সেই বন্দী মুক্তি পেয়ে অশ্বারূঢ় য় ধাবিত হল। সে গতি রোধ করবার সাধ্য কারো ছিল না।

আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে সেই কান্নার স্রোত কিশোর আকবরের বক্ষ ভাসিয়ে নির্গত হল।

ফকির নূরউল্লা গান গায়। সমস্ত দুর্গের পরিধি ঘিরে শোকের ছায়া অবগুণ্ঠনবতী রমণীর মত ঘুরে বেড়ায়। প্রাসাদের বিলাসকক্ষে রাত্রির উৎসব স্তব্ধ হয়ে গেছে। ঘুম নেই কিন্তু নিদ্রার ইচ্ছাও কারো নেই। রমণী, পুরুষের সবার চোখেই জল। যেন নতুন করে ফকিরসাহেব এসে নতুন মেজাজে কণ্ঠে সুর পরালো। আর সে সুর মৃত সম্রাট বিহনের জন্যে।

এইসময় ফকিরসাহেব নূরউল্লাকে কিশোর আকবরের বড় ভাল লেগেছিল। এই আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় সময় সে গান শুনতে শুনতে কেমন যেন বিভোর হয়ে সেই ভগ্ন মসজিদে চলে গিয়েছিল, যেখানে বসে নূরউল্লা গান গায়। গান শুনতে শুনতে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে রাজকুমার বার বার শপথ করেছিল, যতদিন এই পৃথিবীতে জীবনধারণ করবে, সঙ্গীতকে কখনও বিস্মৃত হবে না। সঙ্গীতই হবে তাঁর প্রাণস্পন্দনের সঙ্গী।

কিশোর আকবরের সেই কৈশোরের শপথ কখনও পথভ্রষ্ট হয় নি।

পিতার মৃত্যুর পরের সেই আটচল্লিশ ঘণ্টা আকবরের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। সেদিনের প্রতিটি মুহূর্ত বড় নিদারুণভাবে অতিবাহিত হয়েছিল। পাশে কেউ নেই, কোন আত্মীয়স্বজন। সকলেই পরমাত্মীয় কিন্তু পরমশত্রু।

এরই মাঝে পিতা যাঁকে সবচেয়ে বিশ্বাস করতেন, অভিভাবক ও সেনাপতি বৈরাম খান চোদ্দ দিনের মধ্যেই আকবরকে দিল্লীর সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। এর পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে সেই কালানোর দূর্গে তার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হল।

আকবর ক্রীড়নকমাত্র। কোমরবন্ধে তরবারী রাখা আছে, আছে একখানি বক্রাকৃতি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা কিন্তু তা থেকে লাভ নেই। সে যাদের প্রহরাধীনে বাস করছে তাদের একটি ইঙ্গিতেই তো তার মৃত্যু! সুতরাং সে পরাধান, সে নাবালক। উত্তরাধিকারী হিসাবে তাকে সিংহাসনে বসালেও বুদ্ধি নাকি তার রাজকার্য্যের উপযুক্ত নয়, সেইজন্যে নামে মাত্র সম্রাট হয়ে শাসনকার্য্যের দায়িত্ব পিতৃবন্ধু বৈরাম খানই গ্রহণ করলেন।

পিতা গেছে। আপন বলতে আছে মাত্র গর্ভধারিনী মা। মা কি তাঁর গর্ভের সন্তানকে ভুলতে পারবেন! সেই আটচল্লিশ ঘণ্টার পর হঠাৎ আকবর তাঁর মাকে দেখার বাসনা পোষণ করলো। আকবর প্রকৃতিতে ছিল গম্ভীর ও একরোখা। তার ইচ্ছার অর্থ, পালন করা। আর পালিত না হলে আকবর সহজে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে না।

বৈরাম খান বোঝালেন দিল্লীর অবস্থা না বুঝে সেখানে যাওয়া সমীচিন হবে না। অশ্বারোহী দূত প্রেরণ করা হয়েছে, সে সুসংবাদ নিয়ে ফিরলেই সেখানে যাওয়া হবে। সম্রাটের মৃত্যুর পর বহু শত্রু গোপনে লুকিয়ে আছে, তাদের প্রকৃতি না দেখে গেলে বিপদ অনিবার্য।

কিন্তু আকবর কিছুতেই কোনকথা শুনলো না। বলল—আমার মা যখন সেখানে আছেন, তখন আমার কোন ভয় নেই। মা যদি শত্রু কবলিত হয়ে থাকেন, তখন সন্তানের আত্মগোপন করা কি উচিত?

বৈরাম খান তবু বোঝালেন—তুমি সম্রাট, তোমার মা মৃত-সম্রাটের পত্নী। তোমার প্রাণের মূল্য ও তোমার মায়ের প্রাণের মূল্য এক নয়। বুদ্ধিহীনের পরিচয় দিয়ে তুমি অন্যায়কে প্রশ্রয় দিও না!

আকবর তবু মাথা নেড়ে বললো—আমি যখন মনে করেছি, তখন আমি যাবই। আমার মা আপনাদের কাছে তুচ্ছ হতে পারে, আমার কাছে এই রাজ্য ও রাজত্বের চেয়ে মূল্যবান।

অগত্যা দিল্লী যাওয়াই স্থির হল।

তবে এসব কাহিনী আরো তিন বছর আগের।

গত রাত্রের কথা এখানে লিপিবদ্ধ যোগ্য।

গভীর নিশুতি রাত্রি। সেদিন আকাশে শুধু স্বচ্ছ নীলিমার মাঝে শুভ্র মেঘের আলপনা দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। চাঁদ উঠেছে। প্রকৃতি সেজেছে রহস্যময়ী সাজে, তবে চাঁদের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে না। শুধু রূপো আলো ঝরে পড়ছে নিশুতি রাত্রির বুকে।

সেদিন দিল্লীর প্রাসাদে তারা বাস করছিল না। দিল্লী পরিত্যক্ত হয়েছে পূর্ব সম্রাটের অপঘাত মৃত্যুতে। এখন আগ্রা প্রাসাদ। প্রাসাদের কোল ছুঁয়ে যমুনা বয়ে চলেছে। রাত্রি সেই যমুনার কালোজলে যৌবনপ্রাপ্তা কিশোরীর মত খেলা করছিল। সেই কিশোরীর রক্তিম অধর কাঁপছিল, চোখে লজ্জা নেমে আসছিল। সু-উন্নত বক্ষ উদ্বেলিত হচ্ছিল।

নতুন করে আবার রাজপ্রাসাদ পোষাক পরিবর্তন করেছে। এখন তার নতুনরূপ। বৈরাম খানের খুশির ওপর প্রাসাদের প্রাণস্পন্দন। সম্রাট নাবালক। তার বয়স আরো তিনবছর যোগ হয়েছে বটে কিন্তু বুদ্ধি বাড়ে নি বরং মানুষের চক্রান্তে বুদ্ধি আরো কমেছে। আকবর এখন প্রত্যহ একবার করে দরবারের সময় সিংহাসনে বসে বটে। তার নামে খোতবাও পড়া হয় কিন্তু ঐ পর্যন্ত। সমস্ত ক্ষমতার অধীশ্বর সুচতুর ঐ খানখানান বৈরাম খান। তাঁর হুকুমে প্রতিটি কর্মচারী মাথা নত করে। তাঁর বিচারে অপরাধী শাস্তি ভোগ করে। আকবরের সেখানে কোন ক্ষমতা নেই। তার নামে পাঞ্জা আছে বটে কিন্তু সে পাঞ্জা সম্রাট নিজে ব্যবহার করতে পারে না। ছেলেমানুষের হাতে যেমন হাতিয়ার দিলে সে দিশেহারা

হয়ে পড়ে, তেমনি আকবরের অবস্থা। অবশ্য এসব উক্তি পদস্থব্যক্তির, বৈরাম খানের—। সুতরাং আকবর ছেলেমানুষ বলে তার নাবালকত্বের দোহাই দিয়ে বৈরাম খানই রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন।

পিতৃবন্ধু। পিতা এঁর সাহায্যে অনেক বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করেছেন। তাই মৃত্যুর সময় এঁকেই দিয়ে গেছেন তার পরিবারের ওপর সমস্ত কর্তৃত্ব। কিন্তু কেন যে পিতা এইকাজ করে গেলেন? তিনি কি একবারও ভাবেন নি, মানুষ ক্ষমতার অধীশ্বর হলে বিশ্বাস রাখে না। তাঁর দোস্ত যখন ঐশ্বর্যের অধিকার পাবে, তখন যে বেইমানি করতে পারে—এ কথাটা ভাবলেই তিনি অন্তত নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না। তবে পিতাকেই বা দোষ দেওয়ার কি আছে?

তিনি সারাজীবন এমনিভাবেই আঘাত পেয়ে পেয়ে তবু বিশ্বাস করে গেছেন। এরজন্যে অবশ্য সম্পূর্ণাংশে দায়ী তাঁর কোমল মন। পিতার মনটাই ছিল বেইমান। অন্তত সুলতানের পক্ষে এমনি নরম মন থাকা উচিত হয় নি। যুদ্ধ তিনি করেছেন। একটি দিনের জন্যে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। নিজের ভায়েরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আর তিনি তাদের ক্ষমা করেছেন। ক্ষমাই তার বাহুর সমস্ত শক্তি হরণ করেছে।

আকবর আজ পিতার সমালোচনা করতে পারছে। পিতার প্রকৃতি সে যত স্মরণে আনছে. তার চরিত্রে এক দৃঢ়তার ছাপ পরিস্ফুট হচ্ছে। অন্তত তাঁকে যদি রাজ্য পরিচালনা করতে হয়, পিতার স্বভাবের দুর্বলতাগুলি পরিহার করতে হবে।

যুদ্ধ তাদের পরিবারের জীবনের প্রধান অঙ্গ। যুদ্ধ ব্যতিরেকে জীবনধারণ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের জাতি যুদ্ধের জন্যে সৃষ্টি, তাই ছোটবেলা থেকে সে নিপুণভাবে যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ব করেছে। এখন অন্তত এই বাহুতে একখানি তরবারির দ্বারা একশত লোকের মহড়া নিতে পারে। তার প্রমাণ দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ।

সেই বিরাট যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষমতা একাই গ্রহণ করেছে। সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তার নিজের। অথচ জয়োল্লাস পেল তারই অভিভাবক বৈরাম খান। যুদ্ধক্ষেত্রে কে বর্শার দ্বারা হিমুর চক্ষু বিদ্ধ করেছিল? যুদ্ধের কোলাহলে সে কথা চাপা পড়ে গিয়েছিল, জয়ই যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য, কেমন করে জয় হল কেই বা জানতে চায়।

তবে বৈরাম খানের জন্যেই যে কতকটা হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার হল, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। আজ পাশে বৈরাম খানের মত ব্যক্তি না থাকলে যে কি হত, ভাবাই যায় না। পিতার মৃত্যুর পর যেটুকু মুঘল অধিকারে ছিল সব গেল। গেল দিল্লী, আগ্রা, গোয়ালিয়র। হিমু হয়ে উঠলো হিন্দুস্তানের সম্রাট।

হিমুর আসল নাম ছিল হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্র মহারাজা বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করলো।

আজ আকবরের বলতে কোন লজ্জা নেই। সে তখন জেনানা হারেমের সাথে আওরতের পোষাকে আত্মগোপন করেছে। সংবাদ রটনা হয়েছিল, মহারাজা

বিক্রমাদিত্য আকবরকে খুঁজছেন। কারণ আকবরকে পৃথিবী থেকে সরাতে পারলেই মুঘল রাজ্যের অবসান হয়।

এদিকে মুঘল সৈন্যরা ভীত ও সন্ত্রস্থ।

দিল্লীর শাসনকর্তা তরদী বেগ সামান্য খণ্ডযুদ্ধের পর সরহিন্দে পলায়ন করেছেন। আলী কুলী সাইবনীও আত্মগোপন করেছেন। অগত্যা বৈরাম খানকে ত্বরিৎপদে হারেম সরানোর ব্যবস্থা করতে হল। কারণ এই হারেমে আছে পূর্বতন সম্রাটের বেগম, খুবসুরত রমণী, নর্তকী, পরিচারিকা প্রভৃতি। হুমায়ুনের পিতৃদেব বাবরের বহু পত্নী ও উপপত্নী, হুমায়ুনের নিজের বহু মহিষী, তাছাড়া আরো নতুন নতুন অনেক খুবসুরত আওরত প্রত্যহ এসে হারেম শোভা করেছিল। তাদের কেন আনা হচ্ছিল আকবর জানে না, তবে তাদের চলে যেতে কখনও দেখেনি নাবালক সেই আকবর। আওরতদের কেন প্রয়োজন—তখনও সে অভিজ্ঞতা আকবরের হয় নি। তবে যারা গান ও নাচ করতে পারতো, তাদের কথা স্বতন্ত্র। আকবর ছোটবেলা থেকেই গান-নাচের ভীষণ ভক্ত ছিল। রমণীদের এই ক্ষমতার প্রতি আকবরের তীব্র দৃষ্টি ছিল বলে সে রমণীদের এই পর্যায়ে সম্ভ্রম করতো।

হিমু যেদিন দিল্লীর প্রাসাদ অধিকার করলেন, তখন গোপনে এই হারেমটি স্থানান্তরিত করলেন বৈরাম খান। আর সেই হারেমের সাথে রমণীর পোষাক পরে আকবরকেও যেতে হয়েছিল। প্রথমে মর্দানা সম্ভ্রমে আঘাত লেগেছিল আকবরের, নিজের পৌরুষ জলাঞ্জলি দিতে স্বীকৃত হয় নি কিন্তু বৈরাম খানের হুকুম। তিনি কঠিন দৃষ্টিতে সেই বালককে বাধ্য করালেন তাঁর হুকুম তামিল করতে।

আকবরকে পালাতে হল জেনানা হারেমের সঙ্গে লাহোরের দিকে। অন্ধকার রাত্রিতে দুর্গম পথ পরিক্রমা করে তাঞ্জামের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে লাহোরের পথে যেতে হল।

আকবর যদি বয়ঃকনিষ্ঠ না হত তাহলে হয়তো মুঘল শক্তিকে প্রতিহত করতে এমন দ্রুত আন্দোলন জেগে উঠতো না। শেরশাহের আকস্মিক মৃত্যুর পর হুমায়ুন রাজ্যোদ্ধার করলেও শূরবংশীয় আফগানরা বিনষ্ট হয় নি, বরং তারা মুঘলশক্তি প্রতিহত করবার ক্ষমতা জয় করছিল। হুমায়ুনের মৃত্যু হতেই শূরবংশীয় আফগানরা আবার জেগে উঠল।

শেরশাহের মৃত্যুর পর তার চার পুত্র ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল। তখন জ্যেষ্ঠপুত্র আদিল খান শূর রণথম্ভর এবং কনিষ্ঠ পুত্র জালাল খান রেওয়া রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। শেরশাহ জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিল খানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন, কিন্তু আমীররা শেরশাহের মৃত্যুর পাঁচ দিনের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র জালাল খানকে তার কর্মদক্ষতা, সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং শৌর্যবীর্যের জন্যে কালিঞ্জর সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। জালাল খানের রাজ উপাধি ছিল 'ইসলাম শাহ'।

এই ইসলাম শাহের সঙ্গেই পরবর্তীকালে হুমায়ুনের বহু সংঘর্ষ হয়েছিল, তবে ইসলাম শাহ পিতার মত রণকৌশলী ছিল না, তাই রাজ্যবিস্তারে সমর্থ হয় নি।

হুমায়ুন জীবিত থাকতেই ইসলাম শাহের মৃত্যু হয়েছিল। ইসলাম শাহের দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্র ফিরুজ সিংহাসনে বসেছিল। কিন্তু শেরশাহের ভ্রাতা নিজাম খানের পুত্র মুবারিজ খান শূর এই কিশোরকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। এই মুবারিজ খানই পরবর্তীকালে মুহম্মদ আলি শাহ্ উপাধি ধারণ করেন। এই আদিল শাহ ছিলেন হীন চরিত্র, অকর্মন্য ও বিলাসপ্রিয়। সুরার পাত্র ও রমণী সুঠাম তনুর লীলায়িত ছন্দ ছাড়া তার মনে রাজ্যের কোন চিন্তা ছিল না।

প্রজারা এই রাজার অকর্মন্যতায় বিরক্ত হয়ে উপহাস করে আদিল বা অর্ধ-সম্পূর্ণ আখ্যা দিয়েছিল। আলির শাহ যেমন নিজে দুর্বল ছিলেন, কতকগুলি দুর্বললোক তাঁর মোসাহেব ছিল। এবং নিসঙ্কোচে তাদের রাজসম্মানে সম্মানিত করতে দ্বিধা করেন নি। এইসব রাজসম্মানিত লোকেরা দেশের ও সমাজের কোন মঙ্গল সাধন করে নি, তবে আদিল শাহকে উচ্ছন্নের পথে নিয়ে যেতে এতটুকু বিলম্ব করেন নি। তবে এদেরই মধ্যে একজন লোক পরবর্তীকালে বিশেষ ক্ষমতা ও শ্রদ্ধালাভ করেছিল, তার নাম হেমচন্দ্র ওরফে হিমু।

বিশ্বস্ততার জন্যে হিমু ছিলেন সকলের শ্রদ্ধা-ভাজন। প্রথমে হিমু ছিলেন ইসলাম শাহের বিশ্বস্ত কর্মচারী। পরে আদিল শাহ তাকে বিশ্বাস করেন। তিনি শতদোষে দোষী হলেও হিমুকে অবিশ্বাস করেন নি। সমস্ত পাপের বুঝি এখানেই প্রায়শ্চিত্ত।

আদিলশাহের দুর্বলতার সুযোগে বহু আফগান আমীর স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাজখান কররাণী বিহার অঞ্চলে, ইব্রাহিম খান শূর দিল্লী অঞ্চলে এবং আহম্মদ খান শূর সেকেন্দর খান শূর উপাধি নিয়ে পাঞ্জাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাঙ্গলার শাসনকর্তা মহম্মদ শাহ্ শূর স্বাধীনতা ঘোষণা করে মহম্মদ শাহ গাজী উপাধী ধারণ করেন। এরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব প্রাধান্য স্থাপনের জন্যে ঈর্ষা, বিবাদ ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল।

সেকেন্দর শাহ লাহোর থেকে আশী হাজার সৈন্য নিয়ে ইব্রাহিম শূরকে আক্রমণ করলো। ইব্রাহিম সেদিন পরাজিত হয়ে এটাওয়ায় পালালো।

এই সুযোগে হুমায়ুন কাবুল থেকে আবার হিন্দুস্থান পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। মুঘল শক্তি সেদিন যেন নতুন করে আবার রাজত্বের স্বপ্ন দেখলো। হুমায়ুন যদি এই সুযোগ সদ্ব্যবহার না করতেন, তাহলে পিতৃদেব বাবর শাহের মুঘল রাজত্ব চিরতরে লুপ্ত হয়ে যেত। মুঘল রাজ্য আর কোনদিনও মাথাতুলে দাঁড়াতে পারত না।

সেদিনের জন্যে বার বার আকবর পিতাকে সেলাম জানায়। যে পুরুষ বার বার রাজ্য জয় করতে গিয়ে পরাজয়ই বরণ করেছেন, তারই এই উদ্যম প্রশংসার যোগ। বিফলতাই যে মানুষকে দৃঢ় হতে শেখায়, হুমায়ুনই তার প্রমাণ।

পিতৃরাজ্যকে পুনরুদ্ধার করার জন্যে, মুঘল শক্তিকে আবার জাগাবার জন্যে হুমায়ুন অতর্কিতে লাহোর অধিকার করলেন।

এদিকে সেকেন্দর লোদী ইব্রাহিম শূরকে পরাজিত করে পাঞ্জাবে হুমায়ুনকে

প্রতিরোধের জন্য উপস্থিত হলেন। দীপালপুরের কাছে মাছিওয়ারার যুদ্ধে আফগান সৈন্য পরাজিত হল। এবং সেকেন্দর শূর সরহিন্দের যুদ্ধে পরাজিত হল। এবং সেকেন্দর শূর সরহিন্দের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিলেন। হুমায়ুন দিল্লী অধিকার করলেন।

●

● ●

তারপর মাত্র আটটি মাস গত হয়েছিল।

মুঘল পতাকা তখন দিল্লী প্রাসাদের উচ্চচূড়ায় বাতাসের স্পর্শে আন্দোলিত হচ্ছে। প্রাসাদের মহলে মহলে নেমে এসেছে নতুন আনন্দের সাড়া। মহলের কক্ষে কক্ষে নতুন ঝাড়ের ওপর রঙিন আলোর ঝিলিক।

বাবরের বিজয়ী দিল্লীর সিংহাসন আবার এসেছে পুত্র হুমায়ুনের হাতে। হুমায়ুন কি তখন দিল্লীর সিংহাসনে বসে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন ?

কে জানে, তখন তাঁর মনোভিপ্রায় কি হয়েছিল ? মাত্র আটটি মাস। কতদিন আর ? একটি রাজ্যের জীবনে কি খুব বেশীদিন ? নতুন করে প্রাসাদ সংস্কৃত করতেই তো অনেকদিন লাগে ! হুমায়ুন জীবনে একটি দিনের জন্যে পেলেন না একটু স্বস্তি ! পেলেন না নির্বিঘ্নে একদিনও শয্যার ওপর শুয়ে নিদ্রা যেতে !

নেমে এল তাঁর শিরে চরমতম এক শাস্তির খড়্গ। শাস্তি নয় এবার বুঝি শান্তিই তিনি পেলেন। সম্রাটের পুত্র হয়ে কি করে অকর্মন্য জীবন যাপন করেন ! তাই তাঁকে বার বার যুদ্ধ করেই জীবন ধারণ করতে হয়েছে। তাই আর যুদ্ধ নয়। এবার শান্তি।

পিতৃ অধীকৃত সিংহাসন হস্তান্তরিত হয়েছিল আবার ফিরে পেতে—যিনি অলক্ষ্যে আছেন তিনি তাঁর পূর্ণগৌরব ফিরিয়ে দিয়ে তুলে নিলেন।

শেরমণ্ডল নামক গ্রন্থাগারের শিলা সোপান থেকে তাঁর পদস্খলন হল। আর তারপরই মৃত্যু।

এই মৃত্যুই আবার মুঘল বংশের জীবনে বিপদ ডেকে নিয়ে এল।

হিমু হুমায়ুন বেঁচে থাকাকালীনই আগ্রা আক্রমণ করেছিল। সেই সময় হুমায়ুনের দিল্লীতে মৃত্যু হয়। হিমুর আর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ থাকলো না। সে অতিসহজেই গোয়ালিয়র অধিকার করলো, তারপর আগ্রা। আগ্রা জয় করে দিল্লীতে আসতে আসতেই বৈরাম খান আকবরকে নিয়ে দিল্লী পৌঁচেছিল। কিন্তু তখন মুঘল সৈন্যরা ভীত ও সন্ত্রস্ত, তাদের কিছুতেই আয়ত্ব আনতে পারা গেল না।

হিমুর তখন সৈন্যবল, লোকবল অজস্র। দেশের স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে মানুষের মনে আগুন জ্বালিয়েছে। তাই তার সৈন্যসংখ্যা সংগৃহীত হয়েছে, লক্ষাধিক তুর্ক, আফগান, রাজপুত সৈন্য। আর তাছাড়া পেয়েছে দিল্লীর রাজকোষ।

হিমু তখন আদিল শাহের প্রভুত্ব মুক্ত হয়েছে। সে নিজেই একচ্ছত্র স্বাধীন রাজা। সমস্ত আফগানরা তখন আদিল শাহের আচরণে বিক্ষুব্ধ। তার কারণ আদিল শাহ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে শ্বাসরুদ্ধ করে, হত্যা করে যথেষ্ট অন্যায় করেছে। সমস্ত আফগানরা তখন হিমুর প্রভুত্ব চাইলো। আর হিমু এই সুযোগ প্রত্যাখান করলো না। মহারাজা বিক্রমাদিত্য নাম নিয়ে দিল্লীর দুর্গেই নিজের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করলো।

কিন্তু সে রাজত্বও মাত্র দু-পক্ষকাল স্থায়ী হয়েছিল।

আকবর সেদিন জেনানাদের সাথে তাঞ্জামে চড়ে কিছুতে যেতে চায় নি। বারবার তার বিবেকে আঘাত সৃষ্টি হয়েছিল। মুঘল বংশের পূর্বপুরুষদের জীবন প্রণালী নিয়ে আলোচনা করেছিল, বাবর শাহের কথা ভেবেছিল, তিনি যখন পিতার রাজ্য ফরঘণা পান, তখন তাঁর বয়স কত ছিল? মাত্র এগারো বছর। তিনি কি তাঁর মত এমনি আওরত সেজে তাঞ্জামে চড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন?

তবে সে কেন যাবে?

সেদিন অন্ধকার রাত্রি। দিল্লী থেকে প্রধান সড়ক দিয়ে আঠারো খানা তাঞ্জাম চলে নি, চলেছিল ঘুরপথে। কারণ হিমুর সিপাহীরা খুঁজে বেড়াচ্ছে আকবরকে। নাবালক সম্রাটকে খতম করতে পারলেই রাজত্ব কায়েম। সেইজন্যে ঘুরপথে বহু বন জঙ্গলের বেষ্টনী দিয়ে পার হতে হচ্ছিল।

আকাশে সেদিন মসীলিপ্ত অন্ধকার। অন্ধকার মেঘের সীমান্তে শুধু নক্ষত্রের ফুলকি। সঙ্গে মাত্র দশটি সশস্ত্র সৈনিক ছাড়া কেউ নেই। তারা নিঃশব্দে অশ্বারূঢ় হয়ে আঠারোখানি তাঞ্জামের প্রহরায় চলছিল।

যদি এখুনি কোন শত্রুপক্ষ আক্রমণ করে তাহলে নিশ্চিত পরাজয়। বৈরাম খান জেনে শুনেই এই অল্পসংখ্যক সৈন্য সঙ্গে দিয়েছিল। জেনানারা যদি পথে আক্রান্ত হয়, লুণ্ঠিত হবে। তার জন্যে ভাবলে কি হবে? রাজ্য যদি হয়, তাহলে আবার নতুন করে হারেম সৃষ্টি করলে হবে। দেশে কি সুন্দরী আওরতের অভাব?

কিন্তু আকবর? নবীন মুঘলসম্রাট? তার নিরাপত্তার জন্যে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হল? যদি এখুনি হিমুর সিপাহী তাঞ্জাম অধিকার করে?

একটি তাঞ্জামের মধ্যে আকবরের মা হামিদা, ধাত্রীমা জিজি আনাঘা ও আকবর। আকবরকে তখন পুরুষ বলে মনে হচ্ছিল না, পরণে সালোয়ার, কামিজ মাথায় ওড়নার আবরণ। একটি পরচুলা দিয়ে রমণীর মত চুল বিন্যাস করা হয়েছে। অধরে রক্তরাগ, চোখে সুর্মা, গণ্ডে গুলাবী আভা। তবু কি আকবরকে রমণী বলে মনে হচ্ছিল? বিরাট মুখের আদলটা কোথায় যাবে? কোথায় যাবে প্রশস্ত বুকখানি? পুরুষচিহ্ন যে সবই আকবরের ছিল।

হামিদা আকবরের মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। বার বার তাই রুদ্ধ তাঞ্জামের মধ্যে পুত্রের হাত চেপে ধরছিলেন। তাঁর জীবনে এই মুহূর্তটি নতুন নয়, তিনি এরকম বহু সময়ের মুখোমুখি হয়েছেন। স্বামীর সাথে তাঁর সর্বদা থাকতে হত। বিপদ সর্বদা তাঁদের জীবনে আসতো।

তিনি তখন ভাবছিলেন পুত্রের কথা। আগামী দিনের সম্রাটকে রক্ষা করা তাঁর একান্ত কর্তব্য। শুধু পুত্র নয়, মুঘল বংশের ভবিষ্যৎ। স্বামীকে যেমন সর্বদা ছায়ার মত তাঁকে রক্ষা করতে হয়েছে, আজ তেমনি পুত্রকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু তিনি যেন কেমন বুদ্ধিভ্রষ্টা হয়েছেন? রক্ষার কোন সন্ধানই খুঁজে পেলেন না। স্বামীর মৃত্যুতে শোক পর্যন্ত করতে সময় পেলেন না। দুদণ্ড কাঁদতে পেলে বুঝি মনের শক্তি আবার ফিরে আসতো।

মাত্র কদিন শুধু স্বামীর সঙ্গত্যাগ করেছিলেন। পুত্রকে অনেকদিন দেখেন নি বলে দিল্লীতে গিয়ে স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে কালানৌর দুর্গে গিয়েছিলেন। তারপরেই খবর গেল, নিদারুণ সে সংবাদ।

হামিদা আজ তাই বার বার ভাবেন, সেদিন স্বামীর কাছ ছাড়া না হলেই বুঝি ভাল হত। কাছ ছাড়া হয়েছিলেন বলেই বোধ হয় খোদা অলক্ষ্যে মৃদু হেসে সুস্থ মানুষটিকে সরিয়ে নিলেন।

সেদিনের সেই ঘটনা কিছুতে মন থেকে মুছে যায় না। বার বারই কেমন করে যেন চোখের দুই কোণে নোনাজলের স্রোত বেরিয়ে আসে। বক্ষ হয় উদ্বেল। বুদ্ধি যেন কোথায় কোলাহলেব মাঝে হারিয়ে যায়।

শুধু ভয়। সে ভয়টা স্বামীর পাশে থাকতে কখনও তাঁর জাগে নি। বরং সর্বদা উৎসাহ দিয়েছেন, বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে স্বামীকে অনুমতি দিয়েছেন।

আজ যে কি হল? এই বিপদে পুত্রকে কোন উপদেশই দিতে পাচ্ছেন না। শুধু ভয়ে পুত্রের হাত বার বার চেপে ধরছেন।

তাঞ্জাম চলেছে উর্ধ্বশ্বাসে। বন জঙ্গল ডিঙিয়ে, নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে, বন্যজন্তুর আক্রমণকে প্রতিহত করে তাঞ্জাম চলেছে। গন্তব্যস্থান মানকোট রাজগিরির। সেখানে পৌছতে অনেক দেরী, অন্তত যে কোন নিরাপদ স্থানে পৌছলেই শান্তি।

এই সময় আকবব তাঞ্জামের রুদ্ধ দ্বার খুলতে চাইল।

হামিদা চমকে উঠলেন। হাত চেপে ধরে বললেন—বেটা দুঃসাহসের কাজ কর না। তোমার ওপর নির্ভর করছে মুঘল রাজবংশের ভবিষ্যৎ।

আকবর একবার থমকে মাতার কথাগুলি শুনলো, তারপর চাপাস্বরে বললো—তাহলে ছেড়ে দাও মা, দুঃসাহস মুঘল রাজপুত্রেরই শোভা পায়।

কে জানে কি ভাবলেন আকবর জননী হামিদাবানু। হঠাৎ হাতের গ্রন্থি তাঁর শিথিল হয়ে গেল। বুঝি মনে পড়ে গেল স্বামীর কথা! কত কষ্টে উদ্ধার করা তাঁর রাজ্য!

তবু একবার তিনি কাতরকণ্ঠে বললেন—কোথায় যাবি বেটা?

আকবর মাথা নাড়লো। জানি না। তবে যাবার জন্যেই মন ব্যগ্র হচ্ছে। যেতে হবেই। দিল্লী উদ্ধার করতে হবে। ওখানে আছে আমার পিতার নিঃশ্বাস। ওখানে আছে আমার পূর্বপুরুষের স্পন্দনা।

কিন্তু তুমি যে বড় ছেলেমানুষ বেটা।

সে বাধা আমাকে লঙ্ঘন করতেই হবে।

নেমে এল আকবর তাঞ্জাম থেকে। তারপর একটি সৈনিকের সাথে পোষাক পরিবর্তন করে তারই অশ্বে সওয়ার হয়ে বসলো।

চোদ্দ বছর ক'মাস তখন বয়স মাত্র আকবরের।

সেই অন্ধকার মসীলিপ্ত রাত্রে সহায়হীন এক নবীন সম্রাট রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে ছুটলো আবার পশ্চাৎমুখী। তখন যদি কিছু সংখ্যক শত্রুসৈন্য এই কিশোরের সন্ধান পেত—একা কতক্ষণ আর ঐ কিশোর—বলশালী যোদ্ধাদের সাথে লড়তো।

দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধ জয় করেছিলেন বৈরাম খান। লোকে বলে। ইতিহাসকাররাও সেই উক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু আকবর যদি সেদিন তাঞ্জাম পরিত্যাগ করে মুঘল সৈন্যদের মাঝে না গিয়ে দাঁড়াতো, তাহলে কি যুদ্ধে জয়লাভ হত? নবীন সম্রাট আকবরকে দেখেই তো মুঘল সৈন্যরা হৃতশক্তি পুনঃলাভ করলো। নব বলীয়ানে তারা সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করে শত্রু ধ্বংসের ব্রত গ্রহণ করলো।

আকবরের সে সময়ের মূর্ত্তি বড় দর্শনীয় হয়েছিল। কে বলবে তার বালকসুলভ আকৃতি? শত্রু ধ্বংসের জন্য সৈন্যদের মাঝে তার মুখমণ্ডল হয়েছিল পশুসদৃশ ভয়ঙ্কর। তরবারী হাতে নিয়ে যখন সৈন্যদের মাঝে দাঁড়ালো, তাঁর পেশীবহুল বাহুর ভঙ্গি দেখে দৈত্যের মত মনে হল। এদিকে সর্বদেহে রাজবংশের আভিজাত্য বিদ্যমান। প্রশস্ত ললাট, খর্ব নাসিকা, উদ্ধত গ্রীবা, আয়ত উজ্জ্বল দুই চক্ষুর দৃষ্টি দেখে মুঘল সৈন্যরা যেন নতুন করে সাহস আহরণ করলো। মনে মনে তারা তাদের নবীন সম্রাটকে হাজারো সেলাম পেশ করলো।

এই জন্যেই কি পাণিপথের যুদ্ধ জয়লাভ হয় নি? তবু কেন ঐতিহাসিকরা ভুল তথ্যের উপর নির্ভরশীল হলেন? কেন তাঁরা বৈরাম খানকেই দিলেন শ্রেষ্ঠ বীরের সম্মান?

মুঘল সৈন্যরা নবীন সম্রাট আকবরের সম্মুখে যে শপথ গ্রহণ করেছিল তারা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। সমস্ত শক্তি তারা নিয়োগ করে মুঘল রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছে।

না হলে হিমুর অপরিমিত শক্তির কাছে জয়লাভ করা বড় সহজ কাজ ছিল না। হিমু ছিল হিন্দু। হিন্দুরাজ্য গঠন ও দেশের স্বাধানতা সৃষ্টির জন্যে দেশমাতৃকার আহ্বানে দেশের লোক সৈন্যসাজে এসে হিমুর পাশে দাঁড়িয়েছিল।

সেই পাণিপথের রণক্ষেত্র। যে বিস্তৃত ক্ষেত্রভূমিতে শুধু রক্তচিহ্ন, মানুষের কঙ্কাল। আর বাতাসে শোনা যায় যুদ্ধের বাদ্য, রণকোলাহল ও মানুষের আর্তনাদ।

প্রথম পাণিপথের যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছিল দুইদলে—ইব্রাহিম লোদীর সাথে বাবর শাহের। সেই যুদ্ধে যদি বাবর পরাজিত হতেন, তাহলে মুঘল বংশের ভারতে রাজ্যবিস্তার চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যেত। সেখানেও এক দারুণ ভাগ্য পরীক্ষা হয়েছিল।

পরবর্তী দ্বিতীয় পাণিপথ যুদ্ধে একই ভাগ্যপরীক্ষা। এখানেও সেই মুঘল শক্তির সাথে দ্বিতীয় ও শক্তিশালী শক্তির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ। যে হারবে তাকে দিল্লী ছাড়তে হবে। দিল্লীতে উড়বে বিজয়ীর পতাকা।

যুদ্ধ এক সময়ে আরম্ভ হয়েছিল। দু'দলই শক্তিশালী। দু'দলেরই রণক্ষমতা তুলনাবিহীন।

সূর্য সেদিনও মধ্যগগনে উজ্জ্বল রশ্মি বিকীরণ করে প্রান্তর আবোরিত করেছিল।

একদিকে হিমু তার তুর্ক, আফগান, রাজপুত বাহিনী নিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। অন্যদিকে বৈরাম খান ও আকবর। বৈরাম খান তখনও আকবরকে নাবালক ভাবছিলেন। যেখানে আকবর অশ্বপৃষ্ঠে সশস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল, তার চারপাশে কয়েকজন বেশ দক্ষ সৈনিক। এক রকম আকবরকে প্রহরার মধ্যে রেখেছিল। খান সাহেবের হুকুমে এই ব্যবস্থা হয়েছিল। বৈরাম খান তখনও আকবরের নিরাপত্তার জন্যে চিন্তিত। যদি কোন মারণাস্ত্র অতর্কিতে এসে বন্ধুপুত্রের জীবন নাশ করে, তাহলে তাঁর আক্ষেপের আর অবধি থাকবে না।

কিন্তু আকবর এই ব্যবস্থায় যথেষ্ট অপমানিত বোধ করেছিল। সে নাবালক হতে পারে বটে তবে ভীরু বা কাপুরুষ নয়—একি পিতৃবন্ধু ও অভিভাবক বৈরাম খান জানেন না? নাকি জেনে শুনেই তিনি এই কৌশল অবলম্বন করেছেন। যদি যুদ্ধে জয় হয়, তাহলে সবটুকু কৃতিত্ব তাঁর নিজের—আর যদি পরাজয় হয়?

সে সময় আকবর আর কিছু ভাবতে পারে নি। শুধু চীৎকার করে সৈন্যদের উৎসাহদানের জন্যে বলেছিল—ভাইসব, তোমরা নিশ্চয় শুনেছ, এই পাণিপথের ক্ষেত্রেই এর আগে আর একটি বিরাট যুদ্ধ হয়ে গেছে। সেই যুদ্ধ আর আজকের এই যুদ্ধ প্রায় একই। সেদিন মুঘলসম্রাট বাবর শাহ দিল্লীর সম্রাট ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, জয় হয়েছিল মুঘলদের। আজ মুঘলরা কি হিমুর বিস্তৃত বাহিনী দেখে পিছু হটবে? তারা তাদের অতীত গৌরব রক্ষার জন্যে প্রাণসমর্পণ করবে না? মুঘলসম্রাট বাবরশাহ নেই কিন্তু তারই বংশধর আকবর শাহ তোমাদের সম্মুখে আছে। সে প্রতিজ্ঞা করেছে—জয়, নয় মৃত্যু। তবু পরাজয় বরণ করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবে না।

মুঘল সৈন্যরা আকবরের এই সগর্ব উক্তিতে রণতাণ্ডব অনুভব করলো এবং রণহুঙ্কারে মুঘলশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে ভীষণ বিক্রমে হিমুর বাহিনী আক্রমণ করলো।

বৈরাম খান আকবরের রণনীতিতে কি চমকিত হন নি? তখনও কি তিনি আকবরকে বালক ভাবছিলেন? কে জানে? তাঁর অভিপ্রায় কি—জানবার কোনই সুযোগ ছিল না।

এদিকে হিমু এমন বিক্রমে আক্রমণ করলো যে সমস্ত মুঘল সৈন্য ধূলার সাথে কোথায় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। পরাজয় বুঝি অবশ্যম্ভাবী।

তখন বৈরাম খান কি করেছিলেন? ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের সবশে ফিরিয়ে আনার

জন্যে মরীয়া। কিন্তু বিপক্ষের বিক্রমের কাছে মুঘল সৈন্যরা তখন প্রাণরক্ষার জন্যে ব্যস্ত।

এদিকে আকবর প্রহরার মধ্যেই যুদ্ধ করে চলেছে। সে এগিয়ে গেছে অনেকখানি। একেবার অগণিত শত্রুর সামনে। অসংখ্য মৃত্যুর মুখোমুখি। কিন্তু আকবরের ভয় নেই! তবে কি সে সাহস দেখাবার জন্যে এতদূর এগিয়েছে? কিন্তু যদি অতর্কিতে কেউ চরম আঘাত হানে?

সত্যিই আকবরের তখন কিছুই মনে ছিল না। বোধ হয় তার তখন রক্তে বংশের প্রচলিত ধারার ঢল নেমেছে। মুঘল বংশ যুদ্ধের বংশ। রণ ছাড়া যে জাতি কখনও জীবনধারণ করে নি। সেই রণতাণ্ডবের হুঙ্কার বুঝি আকবরের স্পন্দনের সাথে যুক্ত হয়েছে। অগণিত তীর সে নিক্ষেপ করে সৈনিক বধ করে চলেছে। সামনে যে আসছে তাকে তরবারীর আঘাত। এক আঘাতেই ভূমিশয্যা। কে বলবে তখন আকবর বালক? বয়স তার মাত্র চোদ্দ।

আকবর তখন বুঝতে পারছিল, তাদের বাহিনী ছত্রভঙ্গ—তার এই যে শত্রুর বাহিনীর মধ্যে বেপরোয়া হয়ে প্রবেশ—পরিণাম অচিন্তনীয়। তবু সে যেন গতিরোধ করতে অক্ষম। শুধু এগিয়ে যাচ্ছে। জয়লাভ করতেই হবে। জয় না হলে ফিরেও যাওয়া যাবে না। মুঘল রাজপুত্রের মৃত্যুই তখন হবে সকল গৌরবের সমান।

আকবর শুধু সেইজন্যেই কি যাচ্ছিল? এছাড়া কি আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না? কিন্তু তার দুটি আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু লৌহজালের মধ্যে দিয়ে শ্যেনদৃষ্টিতে কি সন্ধান করে ফিরছিল? এইসময় একটি তীক্ষ্ণধার তীর এসে আকবরের বামবাহুতে বিদ্ধ হল। আকবর ক্ষিপ্রহস্তে তীরটি স্থানচ্যুত করলো। রক্ত ছুটলো প্রবল বেগে। মুহূর্তে রক্তে তার কামিজ ভিজে গেল।

কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আকবর যাকে খুঁজছিল, তাকে হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে দেখতে পেল।

হিমু সেই সন্ধানী ব্যক্তি। আর সঙ্গে সঙ্গে আকবরের হাত থেকে ছুটে গেল একটি সুতীক্ষ্ণ বর্শা। অব্যর্থ লক্ষ্য। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের মুখের লৌহজাল ছিন্ন করে একটি চক্ষুর মাঝে সেই বর্শা হল সন্নিবিষ্ট। চক্ষুর অন্তনীলে গহ্বরের মাঝে যেন বর্শার ফলা এক নতুন ইতিহাস রচনা করলো। মহাপরাক্রমশালী হেমচন্দ্র ওরফে মহারাজা বিক্রমাদিত্য সমস্ত শক্তি হারিয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন।

দলপতির আঘাতে বিজয়ী সেনারা দিশেহারা হয়ে পড়লো, এই অবসরে মুঘল সৈন্যরা হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার করলো।

জয়ের পতাকা উঠলো পাণিপথ ক্ষেত্রে মুঘলের বিজয়বার্তা বহন করে। দ্বিতীয়

পাণিপথ যুদ্ধ আবার ইতিহাসের পাতায় লিখিত হল মুঘলের প্রতিষ্ঠাকে নতুন কালিতে রঞ্জিত করে।

সেই বালক আকবর। বালকই তাকে বলতে হবে। সবাই তাকে ক্ষুদে সম্রাট বলে।

দিল্লীতে যখন বিজয় বাহিনী গিয়ে পৌঁছলো, তখন জয়ধ্বনি শুধু সম্রাট আকবরের নামেই হল না। সঙ্গে বৈরাম খানের জয়ধ্বনিও শোনা গেল।

আকবরের প্রতিবাদ করবার বাসনা জেগেছিল, গর্জন করে বলতে ইচ্ছা হয়েছিল —এ ভুল। বৈরাম খান তার অভিভাবক হতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তার। সে না হিমুকে ঘায়েল করলে এই জয়ধ্বনি চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যেত। কিন্তু তার প্রতিবাদের তখন কোন ক্ষমতা ছিল না। সে একটি হস্তীর পৃষ্ঠে শুয়ে বাহুর অত্যাধিক রক্তক্ষরণে ক্লান্ত। তাছাড়া যন্ত্রণাও তার সমস্ত উৎসাহ হরণ করেছে।

তখন তার বিশ্রামই দরকার। একযুগ বিশ্রাম। একটি সুকোমল শয্যা, কিছু আহার্যবস্তু। আর কোমল হাতের সেবা। মা যদি এখন কাছে থাকতেন? মায়ের স্পর্শের জন্যে তার মন লালায়িত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মা তখন কোথায় কে জানে। মানকোট কিম্বা কাবুলে সেই আঠারোখানি তাঞ্জাম পৌঁচেছিল কিনা কেউ জানে না। অন্তত তার কাছে কেউ তাদের নিরাপত্তার সংবাদ প্রেরণ করে নি। কে জানে, তার মা বেঁচে আছে কিনা! যদি না থাকে, তাহলে এই জয়ের কোন আনন্দই সৃষ্টি হবে না।

বিজয়বাহিনী দিল্লী প্রাসাদের মধ্যে পৌঁছবার আগেই আকবর জ্ঞান হারিয়েছিল।

বাহুর ক্ষতের জন্যে নয় অবশ্য। বীরপুরুষদের এই ক্ষত সামান্যই। আকবর অপরিণত বয়স্ক যুবক হলেও বীর যে, সে বিষয়ে অস্বীকার করা যায় না। তবু সে জ্ঞান হারিয়ে থাকলো।

প্রাসাদের সবচেয়ে আরামদায়ক কক্ষে রাজসিক শয্যার ওপর নিস্পন্দ দেহে অনেকদিন পড়ে থাকলো। রাজবৈদ্য চিন্তিত হল। বৈরাম খানের মানসিক অবস্থা বোঝা গেল না, তবে নবীন সম্রাটের আরোগ্যের জন্যে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন।

বিজয়ী সেনারা নতুন সম্রাটের জ্ঞান ফেরার জন্যে একান্ত উদ্বেগে অপেক্ষা করতে লাগলো। মসজিদে মসজিদে পীরসাহেবরা নবীন সম্রাটের জন্যে প্রার্থনা করতে লাগলো।

প্রকৃতিও বুঝি আর চুপ করে থাকতে পারলো না। সূর্যদেবের প্রখররশ্মি কোথায় যেন লুকিয়ে গেল। আকাশ হল মেঘাচ্ছন্ন। মনে হল বুঝি এখুনি কান্নায় সমস্ত পৃথিবী জলপ্লাবিত হবে। ঝড় উঠলো ঝড়ের উন্মত্ত তাণ্ডবে ঝাউবীথিকায় প্লাবন জাগলো। যমুনার স্রোতে জোয়ার উঠলো। বৃন্তচ্যুত হল ফুলতনু।

নির্মূল হল প্রাসাদের অঙ্গুরীবাগের সমস্ত পুষ্পসজ্জা। বিদ্যুৎ চমকাল। পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে শুধু আলোর প্রতিফলন। ডমরু যেন বেজে উঠলো। এবার নাচবে প্রলয়রূপী ভয়ঙ্কর জটাধারী মহাদেব।

যেন কাল বৈশাখী এসে পৌঁছলো। অথচ সেটা বৈশাখ মাস ছিল না। অকালে

অকাল প্রলয় আর কি। সেটা ছিল রমজানের পর শওয়াল মাস। পবিত্র রমজানের পর এ মাসটাও নাকি পবিত্র হয়। এ মাসে কোন অঘটন ঘটে না। প্রকৃতি থাকে শান্ত। মঙ্গল হয় সব শুভকাজের। রমজানের আগে শাবান মাস যেমন, ঠিক তেমনি।

অথচ ধরিত্রীর এই প্রলয়রূপ ঘটলো।

কিন্তু যতই ঝড় উঠলো, গর্জন আকাশসীমা লঙ্ঘন করলো—বৃষ্টি ঝরলো না। আকাশের চক্ষু থেকে কান্নার জল পড়লো না। শুধু কিছু ধ্বংস করে দিয়ে গেল। বৃক্ষশাখে যে পত্রটি খসবে না বলে প্রাণপণে নিজেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিল, সে আর রক্ষা পেল না—এক ধাক্কায় কোথায় যে চলে গেল, কোন্ মহাশূন্যে উড়তে উড়তে কেউ তার ঠিকানা জানে না। এমনি হারিয়ে গেল অনেক নতুন পত্রগুচ্ছ। যারা অনেক সম্ভাবনা বুকে ধারণ করে বৃক্ষশাখে জন্ম নিয়েছিল, বাতাসে মৃদুমন্দ স্পর্শে দোল খেয়েছিল, তারা কি জানতো এই বাতাসই একদিন ক্ষুব্ধ হয়ে প্রবল শক্তি দিয়ে সবকিছু ধ্বংস করে দেবে?

শুধু বৃক্ষপত্রই জীবন আহুতি দিল না। যমুনার জলের নীরবধি সেই ঝরণার গান হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। তার পরিবর্তে তার বুকে লাগলো দারুণ জোয়ার। সে নিজের মধ্যে ভীষণ হয়ে নিজেকে প্রহার করতে লাগলো। তার সেই রূপ দেখে কে বলবে অতীতে সে ছিল সঙ্গীতিকা। মধুর স্বরে সে গান গেয়ে পারের মানুষকে নিদ্রাসুখ বিতরণ করতো!

আকবরের জ্ঞান ফিরলো।

তার জ্ঞান ফিরলো কার যেন কোমল করস্পর্শে।

প্রকৃতি তখন আবার স্ব অবস্থায় ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে পৃথিবী স্বচ্ছ এক নীল মেঘের স্নিগ্ধতা নিয়ে। দু'একটি পারাবতকেও দূর দূর উজানে চক্রাকারে দেখা যাচ্ছে।

আকবর দুটি ব্যাকুলদৃষ্টি নিয়ে তার শয্যার পাশে তাকালো। সে তখন তার মাকে বোধ হয় খুঁজছিল কিন্তু যার কোমল হাতখানি তার কপালে ছিল, সে যে মা নয়—এই ভেবে তার মনে উদ্বেগ সৃষ্টি হল। ইচ্ছে করলো পাশে বসে থাকা ধাত্রীমাকে জিজ্ঞেস করে, আমার মা-কি ফিরে আসেন নি কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সরম লাগলো। সে যে এখন শিশু নেই, এই বোধটা তাকে ভুলতে হবে। এখন মায়ের জন্যে উতলা হওয়া যে শোভন নয়, তাছাড়া সে এখন সম্রাট, বালক নয়—এজন্যেও তাকে সংযম ধারণ করতে হবে।

কি কষ্টকল্পিত যে এ সংযম—যে বেদনা না বুঝবে, উপলব্ধি করতে পারবে না! কিন্তু মা-কি প্রাসাদে ফেরেন নি? ফিরলে তার শিয়রে কি না এসে পারতেন? তাঁর পুত্র যুদ্ধে জয়লাভ করেছে, এতে তাঁর কি গর্ব হয় নি? তিনি গর্বিতা নন! কে জানে, দিল্লীতে খবরটা কিরকমভাবে পরিবেশিত হয়েছে। হয়তো বৈরাম খান নিজেই সমস্ত কৃতিত্ব আত্মসাৎ করেছেন। আর সবাই তার দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। বালক যুদ্ধে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে বলে অসুস্থ হয়েছে।

হয়তো মাও তাকে সেই সহানুভূতির চোখে দেখবেন—বেটা, তুমি এখনও অপরিণত, নিজেকে তৈরী কর, তারপর যুদ্ধে যেও।

কিন্তু মা যদি প্রাসাদে থাকতেন, একথা শুনেও তো পুত্রের শিয়রে এসে উদ্বিগ্নমনে বসতেন। তার যে পুত্রস্নেহ অগাধ! তিনি যে তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে কখনও বিস্মৃত হন না?

যদিও আকবরের লালন পালন সদ্বংশীয় ধাত্রীদের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল। পিতা হুমায়ুন দেশদেশান্তরে রাজ্যোদ্ধারের জন্যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতেন বলে ধাত্রীর হেপাজতে পুত্রকে রেখে দিতেন। তখন সঙ্গে হামিদাবানুও থাকতেন। সেইজন্যে মায়ের স্নেহ আকবর অল্পই পেয়েছে।

তবু স্নেহের কাঙালপণার যেন শেষ নেই। মায়ের স্নেহ না পাওয়ার জন্যেই আকবরের মনের মধ্যে হাজারো আকাঙ্ক্ষা জমা হত। তাই মাকে যখন পেত, কোলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লে আর মাকে ছাড়তো না। মাও তাকে কোন সময়ে অবহেলা করেন নি। কিন্তু বড় হয়ে তাকে সেই ছেলেমানুষী ত্যাগ করতে হয়েছে। এখন কোন ঝাঁপিয়ে পড়বার বাসনা জাগলেও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না। কারণ বাধা অনেক। সে বড় হয়ে গেছে। লোকে বলবে কি?

আজও সেই জ্ঞান ফিরে আসবার পরে মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতে তার লজ্জা করতে লাগলো। অনেক ইতস্তত করে, গবাক্ষের মাঝে অনেকক্ষণ ধরে চোখদুটি ন্যস্ত করে তারপর এদিকে ফিরে জিজি আনাঘার দিকে সে তাকালো।

এ রমণীটির বয়সও মায়ের মত। তবে মনে হয় মায়ের চেয়ে কিছু ছোট! কারণ এখনও তার শরীরের বাঁধুনিতে আছে মায়ের মতই রমণীয় স্বাস্থের লক্ষণ। দেহের লালিমা চন্দ্রের সুষমার মত দীপ্তিময়। চোখের দুটি কালো তারায় আছে পুরুষের হৃদয় হারানোর আকর্ষণ।

সেই মুহূর্তে এসব কথা অবশ্য আকবর ভাবেনি। সে শুধু চুপ করে চোখ বুজে শয্যার মধ্যে পড়েছিল।

আর জিজি আনাঘা তাকিয়েছিল ব্যাকুলদৃষ্টিতে পুত্রসম সম্রাট আকবরের দিকে।

শুধু বেতনভোগী ধাত্রী ছিল না এই জিজি আনাঘা। আকবরের যখন তিনবছর বয়স তখন থেকেই এই রমণী তাকে পালন করে আসছে।

আকবরের শৈশবকাল ছিল একটি উপন্যাসের মত চমকপ্রদ।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী ছিল তখন পৃথিবীর ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ। মধ্যযুগ বিলীয়মান। সর্বদেশের চিন্তাকাশ তখন নবচিন্তার নবারুণরাগে উদ্ভাসিত।

ইউরোপে রেনেসাঁ, ক্যাথলিক প্রটেস্টাণ্ট বিরোধ, পারস্যে শিয়া-সুন্নী সংঘর্ষ, ইসলামে মাহাদী নূতন ধর্মসংস্থাপক আন্দোলন, ভারতে সুফী ধর্মপ্রবাহ—বহু ফকীর সাধুসন্ত ধর্মপ্রবর্তকের আবির্ভাব হয়েছিল। সে এক অপূর্ব মিলনের সুর। সেই যুগে সকল দেশেই বিশেষ শক্তিশালী রাজবংশ, শক্তিমান রাজা রাজপুরুষের আগমন হয়। সকল রাষ্ট্রেই তখন রাষ্ট্র-শাসনে নূতন ব্যবস্থার সূচনা লক্ষিত হয়েছে।

এই মহা চাঞ্চল্যের যুগেই হয় আকবরের জন্ম। আকবরের জন্ম ইতিহাসও বেশ চমকপ্রদ। হুমায়ুন তখন পলায়নমুখী। হঠাৎ খবর পেলেন তাঁর পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে।

হামিদা তখন আশ্রয় লাভ করেছিল, সিন্ধুর অন্তর্গত থর ও পার্কর জিলার মাঝামাঝি অমরকোটে রাণা বীরশালের গৃহে।

হুমায়ুন তখন অমরকোট থেকে পঁচাত্তর মাইল দূরে নিজের শিবিরে। পুত্রজন্মের সংবাদ পেয়ে তিনি আনন্দে সৈন্যসামন্তকে একখণ্ড কস্তুরী ভেঙে দান করেছিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এই কস্তুরীর সুগন্ধের মতই তাঁর পুত্রের যশ পরিব্যাপ্ত হবে।

পিতা তার পুত্রের জন্যে সর্বদা উত্তম ভবিষ্যদ্বানীই প্রকাশ করে। এটাই স্বাভাবিক। হুমায়ুন পিতৃকর্তব্যই পালন করেছিলেন। পরে সেই ভবিষ্যদ্বানী সফল হয়েছিল কিনা, সে কথা পরে বিবেচ্য।

তখন শুধু ভূমিষ্ঠ শিশুসন্তানকে নিয়ে হামিদা রাণা বীরশালের গৃহে! অবশ্য রাণা বীরশাল তাদের কোন অযত্ন করেননি। তবু তো অনিশ্চয়তার ওপর জীবন! স্থিতি কোথায়? অন্তত সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুকে রক্ষার ভিন্ন অনেক দায়িত্ব আছে কিন্তু উপায় কি? রাজ্যহীন পিতা যেখানে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাঁর পুত্রের রাজ অট্টালিকা, সুকোমল শয্যা কোথায় মিলবে? আত্মীয়-স্বজনও তখন বিমুখ ছিল।

আকবরের জন্মের একমাস পাঁচদিন পর ঝুনের শিবিরে হামিদা তাঁর পুত্রকে নিয়ে স্বামীর কাছে পৌঁচেছিলেন।

হুমায়ুন খুশি হয়েছিলেন পত্নী ও পুত্রকে দেখে কিন্তু তাঁর তখন এতটুকু অবসর ছিল না। শত্রু পশ্চাতে, সম্মুখে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সব শত্রু। সকলেই তরবারী উন্মোচিত করে ছুটে আসছে সংহার করতে।

হুমায়ুনের তখন তিনটি ভাই-ই শত্রু! কামারণ, আসকারী, হিন্দাল। হিন্দাল তো একবার বাগে পেলেই হয় হুমায়ুনকে। তার মনের মানুষকে বৈমাত্রেয় ভাই অধিকার করেছে, ক্রোধ কি সহজে মেটে? আজ হামিদা তারই বেগম হত। কোত্থেকে হুমায়ুন এসে হাজির হল। হামিদাকে দেখলো সে। অমনি চারচক্ষে মিলন হয়ে গেল। হামিদা অবশ্য প্রথমে রাজী হয়নি কিন্তু হিন্দালের মাই আগ্রহান্বিতা হয়ে এই মিলন করিয়ে দিলেন।

এ ছাড়া অধিকার নিয়েও হিন্দাল হুমায়ুনের ওপর ক্ষিপ্ত। রাজ্যের অধিকার নিয়ে একই কারণে কামারণ, আসকারীও হুমায়ুনের ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। এমন কি

তাঁরা বিদেশী শেরশাহের হাতে রাজ্য তুলে দিয়েছিল, তবু ভ্রাতাকে সাহায্য করে নি।

হুমায়ুন যখন ঝুনের শিবিরে বসে পুত্রের মুখদর্শন করছেন, প্রিয়ার বাহুডোরে নিজেকে সঁপে দিয়ে একটু স্বস্তির আশা করছেন, এমনি সময়ে সংবাদ পেলেন ভ্রাতা আসকারী দশহাজার সৈন্য নিয়ে ঝুন শিবির আক্রমণ করতে আসছে।

হুমায়ুন মহাচিন্তায় পড়লেন। তাঁর সৈন্যবল খুব অপর্যাপ্ত নয়। অর্থ নেই, সামর্থ্য নেই। ভ্রাতার অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে পেরে ওঠা মুস্কিল। সুতরাং পালানো ছাড়া গতি নেই। কিন্তু কোথায় পালাবেন? সঙ্গে আছে এক মাসের শিশু পুত্র।

হঠাৎ হামিদার অনিচ্ছার ওপরই হুমায়ুন ব্যবস্থা করলেন, শিশু আকবর ভ্রাতার অনুগ্রহের প্রত্যাশায় এখানে পড়ে থাকবে। যদি তার ইচ্ছা হয় তাকে রক্ষা করবে, কিম্বা শত্রু ভেবে ঐ শিশুকে মেরে ফেলবে।

হামিদা শুনে মুখে হাত চাপা দিয়ে ক্রন্দনভারে ভেঙে পড়লেন, এও কি সম্ভব? একটিমাত্র পুত্র জন্মের পর যাকে দেখে কত আনন্দ মনে জেগেছে। শিশুর সরল মুখখানির ওপর বসরাই গোলাপের মত ঔজ্জ্বল্য। তাকে ফেলে যেতে হবে? আমি মা না রাক্ষসী! .

কিন্তু উপায় কোথায়? শিশুকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে নিয়ে যেতে গেলেও তো মৃত্যু ঘটবে। আর তাছাড়া পথে পথে কত নিয়ে ঘুরবে? মৃত্যু তো তাতেই হবে।

রোরুদ্যমানা হামিদা তবু কিছুতে নিজেকে প্রকৃতস্থ করতে পারলেন না। কি করে পারবেন? দশমাস ধরে কি তাকে কোন যন্ত্রণাই ভোগ করতে হয় নি? কি নিদারুণ যে এই অবস্থা?

হুমায়ুন সে সময় পত্নীকে বোঝাবেন কি? অত বড় যোদ্ধা, বালকের মত পত্নীর সামনেই কেঁদে ভাসিয়েছিলেন। তাঁরও মনে হচ্ছিল, শিশুর বুঝি আর পরিত্রাণ নেই। তার মৃত্যুও কেউ রোধ করতে পারবে না। ভ্রাতা আসকারী তাকে না পেয়ে তার পুত্রের ক্ষুদ্র দেহই এক কোপে দ্বিখণ্ডিত করে দেবে।

কিন্তু আর ভাবনার সময় ছিল না। অন্ধকার পথ দিয়ে বেগে ছুটে আসছে অশ্বক্ষুরের ধ্বনি। যেন কাড়া নাকড়া, দুন্দুভি কেউ বাজাতে শুরু করেছে।

আর যদি ভাবতে শুরু করেন, তাহলে নিশ্চিত ধরা পড়তে হবে। সুতরাং এখুনি পালাতে হবে। হুমায়ুন চোখের অশ্রু ত্যাগ করে, মনের দৃঢ়তা সঞ্চয় করে সৈন্যদের সরে পড়তে বললেন এবং নিজে হামিদাকে সামনে তুলে অশ্বে উঠে বসলেন।

পড়ে থাকলো একমাস পঁচিশ দিনের বালক তাঁবুর একটি খাটিয়ার ওপর। অনিশ্চিত তার জীবন। বাঁচবে কি মরবে কেউ জানে না। কেউ জানে না শিশুর নিরাপত্তা কেমন করে রক্ষিত হবে! শিশু আকবর শুধু তখন তাঁবুতে প্রজ্জলিত একটি মশালের দিকে চেয়ে নিজের মনে হাসছে।

কোথাও কোন লোক নেই। শুধু বাইরে আছে উন্মুক্ত ক্ষেত্র, আর জোনাকিদের ঐক্যতান।

এইসময় আসকারী তাল দলবল নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হল। উন্মুক্ত তরবারী হাতে শিবিরে শিবিরে ভ্রাতার অন্বেষণ করতে লাগলো, তারপর একটি শিবিরে ভ্রাতুস্পুত্রকে দেখতে পেয়ে উল্লাসে আত্মহারা হয়ে উঠলো। তীক্ষ্ণ তরবারী উত্তোলিত করে শিশুকে হত্যা করতে যেতেই কেমন যেন শিশুর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে পত্নীর কথা স্মরণে এল। বেগম সুলতানম্ আজও একটি সন্তান লাভ করে নি। তার অন্তর সেইজন্যে বুভুক্ষ। হয়তো এই সন্তানটি ক্রোড়ে পেলে তার মুখে হাসি ফুটবে।

এছাড়া এ সন্তানকে বাঁচালে একদিন ভাইকে হাতে পাওয়া যাবে। কারণ সে পুত্রের নিরাপত্তার জন্যে নিশ্চয় কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

এই ভেবে আসকারী সেই সন্তানকে বুকে তুলে নিল ও পত্নীর সমীপে পৌছে দেবার জন্যে দ্রুত অশ্ব চালিত করলো।

আসকারীর বেগম সন্তানহীনার বেদনা ভুলে হুমায়ুন পুত্রকে সযত্নে দু'বছর পালন করেছিল।

এই শিশু আকবরকে মধ্যস্থ করে দুই ভ্রাতার মধ্যে বহুদিন ধরে সংঘর্ষ চলেছিল। বিনাযুদ্ধে আসকারী এই পুত্রকে হস্তান্তরিত করে নি। হামিদা কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়েছিলেন, নিজে স্বহস্তে চিঠি লিখে পুত্রের বিনিময়ে নিজেকে সঁপে দিতে চেয়েছিলেন, তবু না।

শেষকালে আসকারী হুমায়ুনের হস্তে পরাজিত হল। আসকারীর বেগম সুলতানম্ আকবরকে নিয়ে পলায়ন করলো।

হুমায়ুন তখন পর পর দেশ অধিকার করছেন। কান্দাহার অধিকার করলেন, কাবুল অধিকার করলেন। হুমায়ুনের ভাগ্য আবার সুপ্রসন্ন হতে লাগলো। কাবুল অধিকার করবার সময় কামরাণ পরাজিত হল। কামরাণের হারেমে ছিল শিশু আকবর। সেখানে আশ্রয় পেয়েছিল আসকারীর বেগম সুলতানম্।

কাবুল অধিকার করবার পর কামরাণের হারেম থেকে হুমায়ুন আকবরকে উদ্ধার করলেন, তখন আকবরের বয়স তিন বছর ন'মাস।

জিজি আনাঘা তখন থেকেই আকবরের ধাত্রী।

শামসউদ্দীন ছিল হুমায়ুনের সেনাদলের একজন বিশ্বস্ত সেনা। হুমায়ুন যখন কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন, সেইসময় এই শামসউদ্দীন তাকে বাঁচায়।

এই শামসউদ্দীনের পত্নীই ছিল জিজি আনাঘা। বুদ্ধিমতী এই মুঘল রমণীকে দেখে শামসউদ্দীনের মতই তাকে বিশ্বাস করেন হুমায়ুন। তাই তাঁর পুত্রের পরিচর্যার ভার অর্পণ করেন।

জিজি আনাঘা এত বছর ধরে সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করে আসছে। নিজের

একটি পুত্রসন্তান আছে কিন্তু তার ওপর যত না সে দৃষ্টি দেয়, ততদৃষ্টি দেয় এই পালিত পুত্রের জন্যে। বেতন ভোগই শুধু নয়, আন্তরিকভাবে তার আগ্রহ এই প্রভুপুত্রের জন্যে !

সে থাকাকালীনই আরও কটি ধাত্রী আকবরের জন্যে নিযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু তারা চাকরীই বজায় রেখেছে, জিজি আনাঘার মত কেউ আন্তরিকতা প্রকাশ করেনি।

আকবরও এই জিজিমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতো। নিজের মায়ের পর আর কোন রমণীকে যদি সে ভালবাসে, তাহলে এই জিজিমাই তার অপর জন। তবু সেইসময় সেদিন আর কাকেও ভাল লাগছিল না। মাকে কাছে পেলে বুঝি সে সমস্ত অবসাদ মুছে ফেলে উঠে দাঁড়াতে পারতো।

সেইজন্যে একান্ত নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো—অন্দরমহলের সবাই কি ফিরে এসেছে ?

জিজি আনাঘা আকবরের কথার অর্থ বুঝতে পারলো না। শুধু কোমলকণ্ঠে উত্তর দিল—হ্যাঁ, রাজকুমার। সকলেই ফিরে এসেছেন।

'আমার মা!' এ কথাটা জীবের তালুতে এসে গিয়েছিল কিন্তু কণ্ঠ ঠেলে অভিমান এসে বাকরুদ্ধ করে দিল। না, জিজ্ঞাসা সে করবে না। মা যখন তাঁর সন্তানের জন্যে ব্যগ্র নয়, তখন কেন সন্তান মায়ের জন্যে উতলা হবে ?

মা আপন গর্বে অন্যচিন্তা মনে স্থান দিন্। অন্য কাউকে তাঁর স্নেহ দান করুন, তার কিছু তাতে এসে যায় না। হয়তো মা তার পুত্রের ওপর সব আস্থা পরিত্যাগ করেছেন, সেইজন্যে বোধ হয় এই অবহেলা। বীরের পত্নী বীরকেই ভালবাসে। পুত্রকে কাপুরুষজ্ঞানে পরিত্যাগ করেছেন। ভালই করেছেন।

আকবরের দু'চোখে জল এসে পড়লো, কিছুতেই সে তা রোধ করতে পারলো না।

জিজি আনাঘা বোধ হয় রাজকুমারের মনকষ্ট বুঝলো এবং অনুমান করলো কিছু। তাই সে সান্ত্বনার স্বরে বললো—বেগম মহিষী প্রাসাদে ফেরেন নি। কাবুলে শাহজাদা মির্জার মাতা তাঁকে দু'একদিনের জন্যে বিশ্রাম নিতে রেখেছেন। সংবাদ নিয়ে লোক কাবুলে গেছে, বোধ হয় শীঘ্রই তিনি আসবেন। তিনি তোমার সংবাদ শুনলে আর একদণ্ডও অপেক্ষা করবেন না।

আকবর মনে মনে নিজেকে সংযত করলো। মনে মনে নিজেকে অভিসম্পাত দিল। নিজের মাকেও সে সময়ে সময়ে ভুল বোঝে ! এই সন্তানের মৃত্যুও যে ভাল ছিল ! ছোটবেলায় অনেক বিপদ জয় করে সে আজ এই বয়সে এসেছে। তার জীবন অনেক জয়ের পর এই পর্যায়ে পৌঁচেছে। অথচ সে দৃঢ় হয়ে ওঠেনি। কত ছোট্ট উপলব্ধিতে ভেঙে গুড়িয়ে যায়। কত মৃদু আঘাতে সে শয্যাশায়ী হয়। হায়রে !

সেদিনই সে শয্যাত্যাগ করলো ও রাজকার্যে নিজেকে ব্যাপৃত করলো।

দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রাসাদে কোন উৎসব হয় নি। আকবরের আরোগ্য লাভে সেই উৎসব ঘোষিত হল।

বৈরাম খান হলেন সেই উৎসবের কর্তা।

আকবর অল্পবয়স্ক বলে উৎসবের আদিম আনন্দে তার কোন অনুমতি থাকলো না। নাচমহল সাজানো হল। অন্দরমহলের বিশেষ নর্ত্তকীরা অপরূপ সাজে সজ্জিত হল। সরাবের অপর্যাপ্ত ভৃঙ্গার চতুর্দিকে পরিবেশিত হল। আমীর ওমরাহরা মূল্যবান বসনে ভূষিত হয়ে কানে আতরের খুসবু লাগিয়ে মদির নেশায় ঢুলু ঢুলু চোখে নাচমহলে এসে ঢুকলো।

আকবর নিজের খাসকক্ষেই থাকলো। উৎসবের জন্য তার কক্ষে ভৃত্যরা একপ্রস্থ মূল্যবান পোযাক নিয়ে এল, আর নিয়ে এল কিছু মূল্যবান খানা।

সে কোন কিছুই স্পর্শ করলো না। বরং সে সন্ধ্যাবেলা তারই কক্ষের পাশের অংশ থেকে শুনতে পেল নারীপুরুষের কলকাকলি। অনেক আলো আর তার রোশনাই। অনেক মধুর বাদ্যধ্বনি ও তার সাথে রমণীকণ্ঠের গীত। গীতের সাথে ঘুঙুরের ঐক্যতান।

আকবর নিজেকে আর দমন করতে পারলো না। হঠাৎ দারুণ আগ্রহে সে কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে এল।

দরজার কাছে প্রহরী বসেছিল, সে আকবরের পথরোধ করে বললো—হুজুর, কসুর মাপ করবেন। আপনার বাইরে যাওয়া মানা।

আকবর ঘুরে দাঁড়ালো—কার হুকুম !

ভীত হয়ে প্রহরী বার তিনেক সেলাম করে বললো—বান্দার গোস্তাখি মাফি হয় জাঁহাপনা। হুজুর খানসাহেব আজ রাত্রে আপনার বাইরে যাওয়ার পথ বন্ধ করে গেছেন।

কেন ?

তা জানিনা হুজুর।

আকবর জানতো তার অভিভাবক বৈরাম খানসাহেব তাকে বালক জ্ঞানে বড়দের আনন্দ উৎসব থেকে সরিয়ে রেগেছেন। আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য এই আচরণ উপকারের। ছোট মনে বড়দের স্বরূপ প্রকাশ হলে অকালে পঙ্গু হবার ভয় থাকে। আকবর বড় হতে চায় না। চিরকাল যদি সে ছোট থাকতে পায়, তাহলে বেশ ভাল হয় কিন্তু তা যদি হত ? আস্তে আস্তে সবই তার প্রকাশ হতে শুরু হয়েছে। জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতি। বড়রা তাকে কেন এড়িয়ে চলে ? বড়রা কি আনন্দ এই উৎসবের ভেতর থেকে আহরণ করে ? কেন অন্দরমহলে নৃত্যনতুন সুন্দরী আওরত এনে রাখা হয় ? সব, সব সে বুঝতে পারে। সেই জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ তার মধ্যে আস্তে আস্তে চোখ মেলেছে বলেই আজ সে বাইরে যেতে চায়। এই উৎসরের মাঝে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিতে চায় কিছু অভিজ্ঞতা। বিনিময়ে যদি কিছু আনন্দ মনে পরতে জমা হয়, ক্ষতি কি ! অন্তত যে কৌতুহলতা মনে জমা হয়েছে তার নিবৃত্তি হবে।

সে সম্রাট ছোট আছে বলে তার অভিভাবক রাজ্য পরিচালনা করছে। চিরকাল

তো আর সে ছোট থাকবে না। মুঘল রাজ্যের সূর্য যাতে প্রখর আলোদান করে সমস্ত ভারতবর্ষের অধিকার বিস্তৃত করতে পারে, তা তাকে দেখতে হবে। আর তারই জন্যে তাকে বড় হতে হবে। বয়স সেই পরিণতিতে আসতে সময় নিলেও বুদ্ধি তাকে বড় করে দেবে।

সেইজন্যে সে খানসাহেবের নিষেধ লঙ্ঘন করবে বলেই মনস্থ করলো। প্রহরীকে বললে—পথ ছেড়ে দাও, আমি বাইরে যাবো।

হুজুর, আমার নোকরী থাকবে না, আমার গর্দ্দান যাবে।

আমি সম্রাট আকবর। তোমার কোন অপরাধ নেই, আমি নিষেধ অমান্য করছি, যদি কৈফিয়ৎ দিতে হয় আমি দেব।

আকবর আর দ্বিরুক্তি না করে বাইরে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ অন্ধকার থেকে আলোয় এলে যেমন অবস্থা হয়, আকবরের অবস্থা সেরূপ হল।

রোশনীভরা রাত্রি। যেন পূর্ণিমা চাঁদের আলো প্রাসাদের মর্মরদেয়াল ধৌত করেছে। চতুর্দিকে কোলাহলের মুখরতা, তার সাথে বর্ণাঢ্য। রমণী পুরুষের পোষাকে আজ লেগেছে বেলোয়ারী ঝাড়ের দ্যুতি। কত বিভিন্ন সুরের প্রাণমাতানো বাদ্যধ্বনি। শুধু হাসি, কান্না নয়। শুধু আনন্দ, দুঃখ নয়।

আকবর অনেককেই প্রাসাদের চতুর্দিকে দেখতে পেল। তারা যুদ্ধের সময় সৈনিক ছিল। এখন আনন্দের সময় তাদের চিনতে কষ্ট হল। রণনিপুণ যোদ্ধার আকৃতি হয়েছে অন্যরকম। তারা পোষাক পরেছে বহুবর্ণের। কণ্ঠে দুলিয়েছে মুক্তার মালা। তাদের হাতের মুঠিতে এক একটি সুন্দরীর হাত ধরা। একহাতে সুন্দরী, অন্য হাতে সরাবের পাত্র। সুন্দরীর পোষাকের মধ্যে কেমন যেন নির্লজ্জতার চিহ্ন। স্বল্প বসনে কেমন যেন বীভৎস। তাই দেখে আকবরের শরীর রোমাঞ্চিত হল। তার সামনেই একজন পুরুষ একটি রমণীকে ক্রোড়ে তুলে নিয়ে বুকের সীমিত চেপে অধরে চুম্বন আঁকলো।

আকবরকে তখন কেউ চিনতেই পারলো না। কত লোক তার মধ্যে আকবরকে চেনা অবশ্য দুষ্কর। তবে একটু ভাল করে চোখ মেললেই তাকে দেখা যেত। সে তো আর ছদ্মবেশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল না কিন্তু তখন কারও চেনার মত মনের অবস্থা ছিল না। আর যদিও চিনে থাকে, এ অবস্থায় কিছুই করবার নেই। সম্রাট সে থাকবে নিজের খাসকক্ষে আপন মেজাজে বন্দী। পথে এসে কেন এই আনন্দে তাদের ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে!

আর আকবর তখনও সম্রাটের মত শ্রদ্ধা পেত না। সে নামে সম্রাট, ক্ষমতা

সব তার অভিভাবকের। যা কিছু মান্য করার সেই অভিভাবকই পায়, সে পায় না।

তাই একান্ত নিশ্চিন্ত হয়ে আকবর উৎসব পুরীতে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কেউ তাকে বাধা দেবে না বলেই নিশ্চিন্ত হল। অন্তত খানসাহেবের কাছে গিয়ে তাকে কেউ সনাক্ত করবে না।

এগিয়ে চললো। এগিয়ে চলতে অনেক বাধা। এক একসময় এক একজন এসে মাতাল হয়ে তার ঘাড়ে পড়ছে। তাকে ঠেলে সরাতে যেতেই আর একজন। এমনি বাধা সর্বত্র। তাছাড়া নির্লজ্জ সব আচরণ ও অবস্থান। সোপানশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরে রমণী পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান ও উপস্থিতি। তরুণমনে কেমন যেন কৌতূহল, কেমন যেন বিস্ময়। আকবরের চোখকে বড় পীড়া দিচ্ছিল। মনের মধ্যে কিসের যেন উন্মাদনা।

আর একটু এগিয়ে যেতে এক জায়গায় দেখলো, সেখান থেকেই গুলাববাগের শুরু। গুলাববাগে নানারঙের পুষ্পস্তবকের বিচিত্র সারি। রক্তবর্ণের পসরা যেন কেউ গুলাববাগে মেলে দিয়েছে। সেখানেই একটি মর্মরখচিত প্রস্রবণ। প্রস্রবণের জল ধ্বনি সৃষ্টি করে বয়ে চলেছে।

মর্মরময় প্রস্রবণ। শ্বেতনির্মিত মর্মর। আসমানের আলো এখানে ঔজ্জ্বল্য দান করেছে। সেই আলোতে একটি রমণীকে সেই শ্বেতমর্মর সোপানে শুয়ে থাকতে দেখা গেল।

রমণীটি একা। আসমানের আলো তার দেহবর্ণের শুভ্রতাকে আরো প্রখর করেছে। দুটি আয়ত কালো চোখে সুর্মার অঞ্জন। মেয়েটি আকবরকে দেখে উঠে বসেছিল, এবার তাকে মৃদু হেসে কাছে ডাকলো।

আকরর সভয়ে দূরে পালাচ্ছিল কিন্তু রমণীটির খিল খিল হাসিতে তাকে থমকে দাঁড়াতে হল। তার পৌরুষে আঘাত লাগলো। অন্তত আওরতের কাছে ক্ষুদ্র পুরুষেরও মূল্য আছে।

কাছে যেতে রমণীটি আবার হেসে বললো—পালাচ্ছিলে কেন?

আকবর কোন উত্তর দিল না। শুধু মাথা নত করে চোরাচাহনিতে রমণীটিকে দেখতে লাগলো।

রমণীটি আবার খিল খিল করে হেসে উঠলো, বললো—এ সময়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? রাত হয়েছে, নিদ যাবে না?

আকবর তবুও কোন উত্তর দিল না।

তুমি বাচ্চা মর্দানা, বড়দের এসব আনন্দ দেখতে সরম পাও না! তোমার আম্মা কোথায় থাকে? তার কাছে চলে যাও।

মনে মনে আকবর ক্ষিপ্ত হল। মেয়েটি তাকে একেবারে বাচ্চা মর্দানা বললো। প্রকাশ করে দেবে নাকি সে সম্রাট আকবর!

শুনলেই মেয়েটি বাকরুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আবার সন্দেহ জাগলো যদি মেয়েটি

আরো প্রগলভ হয়ে ওঠে। তার সম্রাট ক্ষমতা কিছু নেই বলে যদি ব্যঙ্গ করে? তাকে আরো ছেলেমানুষ আরো বাচ্চা বলে যদি উপহাস করে?

সে কথা ভেবেই সে নিজেকে সংযত করলো। তাকিয়ে রইল দূরে আর একটি স্থানের দিকে। টিউলিপগাছ। সুন্দর বড বড ঝাকড়া গাছের মত টিউলিপের সমাবেশ। এটা সে এর আগেও একবার দেখেছে। এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার হল। পিতা হুমায়ুন এরই বিপরীত পাশে পঁচিশ হাতদূরে শেরমণ্ডল গ্রন্থাগারের সোপান শিলা থেকে পড়ে মারা গেছেন। সে কখনও শেরমণ্ডল গ্রন্থাগারে যায় নি। পুস্তক দেখলেই কেমন যেন তার মাথাটি ঘুরে যায়।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে টিউলিপ গাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলি। মাথার ওপর চন্দ্রের রূপালী আলো পড়ে ঝিকমিক করছে। ঠাকুর্দা বাবরশাহ যখন প্রথম দিল্লী জয় করেছিলেন, কাবুল থেকে আনিয়ে এই টিউলিপ বৃক্ষ এখানে রোপণ করেছিলেন। শুধু বৃক্ষই নয়, তার সাথে কৃত্রিম পাহাড় ও ঝর্ণা সৃষ্টি করেছিলেন। আর আছে স্থানে স্থানে পীতবর্ণের খুবান ফুলের গাছ। এও কাবুলের আমদানি।

আকবর দেখতে পেল, সেই খুবান ফুলের গাছে লাল রংয়ের ছিটে দেওয়া পীতবর্ণের ফুল ঝুমকোর মতো দুলছে। দূর থেকে তার নয়নাভিরাম দৃশ্য বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

মনে মনে আকবর পিতামহের সৌন্দর্যজ্ঞানের প্রশংসা করলো।

পিতামহের পর এই দিল্লা প্রাসাদ কতজন অধিকার করেছে, ভেঙেছে কত সুন্দর জিনিস। গুলাববাগ নষ্ট করে অশ্বকে দিয়ে তা ভক্ষণ করিয়েছে। সুন্দর সুন্দর গোলাপ পুষ্প চিরতরে তাদের বিকশিত যৌবনতনু হারিয়েছে। তবু এই টিউলিপ বৃক্ষের সারি কেউ নষ্ট করে নি।

হঠাৎ তার কানে প্রবেশ করলো পরিচিত এক কণ্ঠস্বর। সঙ্গে সঙ্গে তার চিন্তা অন্তর্হিত হল এবং চমকিত হল।

বৈরাম খান! তারই কণ্ঠ সে শুনেছে।

পালাবার জন্যে সে চতুর্দিকে তাকালো কিন্তু কোথায় পালাবে? সেই রমণীটির দেহস্পর্শ করে খানসাহেব দাঁড়িয়ে। তাকিয়ে আছেন তিনি আকবরের দিকেই।

আকবর মাথা নত করলো। একবার ভাবলো, তার দীপ্ত পৌরুষ সে জাগিয়ে তুলে বৈরাম খানের কথার প্রতিবাদ করবে কিন্তু কেমন যেন নিজেকে সে অসহায় মনে করলো।

বৈরাম খান কোন তীরস্কার করলেন না, শুধু শান্তকণ্ঠে বললেন—শাহজাদা, আমি তোমার ভালর জন্যেই সবকিছু করি। আমার হুকুম অমান্য করার জন্যে আমি দুঃখিত হয়েছি। ভবিষ্যতে এমন আর না করলে সুখী হব।

সেই রমণীটির কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। সে হাসলো আবার খিল খিল করে, তারপর বললো—বেওকুব লেড়কা। ওর হয়তো ইচ্ছে হয়েছে, বড়দের মত একটু আশনাই করবার। রমণীটি আবার কলস্বরে হেসে উঠলো।

আকবর শুনতে পেল বৈরাম খান বলছেন—সলিমা, এ কে জানো? হিন্দুস্থানের ভাবীসম্রাট বন্ধুপুত্র আকবর শাহ।

সঙ্গে সঙ্গে সলিমা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সেলাম পেশ করতে লাগলো।

আকবর আর দাঁড়ালো না, ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। অসহ্য। এই অবমাননা কি আল্লা তার কোনদিনও দূর করবেন না?

পরে শুনেছিল এই সলিমা তার একরকম আত্মীয়া হয়। পিতার বিমাতা গুলরুখ বেগমের কন্যা।

কিন্তু সলিমা বৈরাম খানের সঙ্গে কেন অমনি আচরণ করলো? তখন অপরিণত বয়সে যে সে কত ছেলেমানুষ ছিল!

সেই উৎসব রাত্রে বৈরাম খানের ওপর তার রাগ হয় নি, হয়েছিল ঐ খুবসুরত্ত আওরত সলিমার ওপর। জেনানামহলের আওরত। আবরু রক্ষা করা অবশ্য উচিত। তা না করে বংশে কলঙ্ক আরোপ করে উৎসবে এসে ভিড়ে পড়েছে। অবশ্য একথা মনে হয়েছিল, যখন সে জানতে পারলো, সলিমা তার আত্মীয়া।

পরে সে মনে মনে সঙ্কল্প করেছিল, যখন সে উপযুক্ত ক্ষমতা অধিকার করবে, অন্তত নিজের আত্মীয় পরিবারের শালীনতা রক্ষার জন্যে অন্দরমহলের আলাদা ব্যবস্থা করবে। বাইরের পুরুষেরা কখনও যে অন্তঃপুরের কঠিন অবরোধ ভাঙতে পারবে না, তারই মত ব্যবস্থা।

সলিমার এই নির্লজ্জতা সে সময়ে ঘোরতর অপরাধ বলে বিবেচিত হত। শাদী না হওয়া আওরতের এই বেলেল্লাপণা সীমাহীন।

পরে যখন পরিণত মন জাগ্রত হয়, তখন এই বিষয় তার মনে আর কোন আলোড়ন জাগে নি। তখন সে মনে মনে হেসেছিল। মহব্বত বলে যে একটি অনুরাগ রমণী পুরুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়, তা সে জানতো না। জানবার পর নিজেরই কেমন লজ্জা জেগেছিল। তবু তার সঙ্কল্প অটুট ছিল। হারেমের শালীনতা সে রক্ষা করবে। মহব্বত রাজার ঘরে শোভন নয়, ওর পথ যাযাবরদের জন্যে। কোন অভিজাত বংশে এই ধরনের আচরণ ঠিক নয়।

তাও অনেক পরের কথা।

উৎসবের পরদিন থেকেই নতুন এক কথা মহলের মধ্যে শুনতে পেল।

বৈরাম খান শাদী করবেন।

শাদী করবেন কেন? তার শাদী করা তিনটি বেগম হারেমে আছে। তারা বেশ সুন্দরী। তাদের দেখেছে আকবর যখন তাঞ্জামে করে পালিয়ে যাচ্ছিল।

আঠারোখানি তাঞ্জামের একটিতে তিনটি বেগম। অপরূপ সুন্দরী তারা। দুধে আলতা রঙের ওপর মণি-মুক্তার রোশনাই। শুনেছিল এই বেগম তিনি পেয়েছিলেন পিতা হুমায়ুনের কাছ থেকে। একটি কাবুলের মেওয়া ফলের মত। একটি কাশ্মীরের নীল হ্রদের মত। একটি আরবের মরুপ্রান্তরের ইহুদী। তিনটিরই আলাদা রঙ, আলাদা দেহসৌন্দর্য। তাছাড়া আরো আছে হারেমে অনেক সুন্দরী। বৈরাম খানের আলাদা একটি রঙমহল। সেখানে হরেক সুন্দরীর হাট।

এর পরও তিনি রমণী দেখলে উৎসুক হন—এই কথা ভেবে সেই অল্প-বয়েসের আকবর বিস্মিত হয়? পিতা বেঁচে থাকতে বৈরাম খান যে সাহস প্রকাশ করেন নি, এখন যেন পূর্ণ স্বাধীনতা! সমুদ্র সমান ক্ষমতা। খুশির পালতোলা নৌকা ছুটিয়ে দিলে কেউ তাঁকে বাধা দেবার নেই।

আরো সে শুনলো, সলিমাকে শাদি করছেন কেন? মুঘলদের সঙ্গে আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্যেই এই তাঁর বাসনা।

বৈরাম খান একজন সৎব্যক্তি। এই খ্যাতিটা সমস্ত মুঘল রাজ্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। সে নাকি মহিষী হামিদার কাছে কসম খেয়ে ওয়াদা করেছিল, তাঁর প্রাণে একবিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত সে মুঘল পরিবারের ইজ্জত রক্ষা করবে। শাহজাদা আকবরকে দেখবে। তাকে সিংহাসনে বসবার মত উপযুক্ত করে তুলবে।

সেইজন্যে সকলে তাঁকে বিশ্বাস করে। তাঁব কার্যের কেউ সমালোচনা করে না। তিনি যা কিছু করেন, মুঘল পরিবারের মঙ্গলের জন্যে। তাই সকলে তার অন্যায়ও দেখতে পায় না।

কিন্তু আকবর অপরিণত হলেও অনেক অন্যায় সে দেখতে পায়। তাই তার বার বার ইচ্ছা করে, এই অভিভাবকত্ব ঘুচিয়ে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে।

সলিমার সাথে শাদিতেও কেমন যেন তার বিক্ষোভ মনে জাগে। বৈরাম খান আসলে একটি ধূর্ত স্বভাবের ব্যক্তি। মুঘল বংশকে পাকে পাকে জড়িয়ে পরাধীন করবার জন্যেই এই শাদির আশা।

এই সময়ে মাকে যদি পেত? মার কাছে তার মনের কথা প্রকাশ করতে পারতো! বলতে পারতো, মা, আমার যেন মনে হচ্ছে, এই শাদি সুখের হবে না? এর পিছনে কোন ষড়যন্ত্র নিহিত আছে।

মার কাছেই সে সব বলতে পারতো, আর কারুর কাছে নয়! অন্য কাকেই বা সে বলবে? কে তার মনের কথা বুঝবে? সে ছেলেমানুষ। তার বুদ্ধি পরিণত হতে এখন অনেক সময় লাগবে। তখন যদি উপযুক্ত হয়, না হয় তার কথার মূল্য থাকবে।

বৈরাম খানকে নৃশংস ধূর্ত প্রকৃতির মানুষ বলে মনে হয়। তিনি কেমন করে ঐ সলিমার মত কুসুম মনের কোমলতন্ত্রে ভালবাসা রচনা করতে সক্ষম হবেন!

বৈরাম খান ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মানুষ না হলে বন্দী হিমুকে কি করে নিজহস্তে হত্যা করতে পারলেন? বন্দীকে নিজ আয়ত্তে পেয়ে মূষিকের মত হত্যা করা—এ যে ঘোরতর অন্যায়। অন্তত বীরের ধর্ম তা নয়। জাতির ধর্মেও তা কলঙ্ক।

অথচ ঐ খানখানানসাহেব সুস্থ মস্তিষ্কে শৃঙ্খলাবদ্ধ হিমুর বুকে আমূল তরবারী প্রবেশ করিয়ে দিলেন।

আজ নয় এর আগেও বৈরাম খানের নৃশংস পরিচয় আকবর বহু ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে। পিতা যখনই তাকে কোন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছেন, অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছেন এই ব্যক্তিটি। অথচ এই ব্যক্তিটিকে যে সে কিছুতে দেখতে পারে না, একথা সে কি করে বোঝাবে? পিতার অগাধ শ্রদ্ধা বৈরাম খানের ওপর।

আর খানসাহেবও এমন চতুর প্রকৃতির ব্যক্তি, পিতার সামনে তার আচরণ দেখবার মত। মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

আর পিতা মুগ্ধ হয়ে পরিবর্তে উপদেশ দেবেন,—তুমি বালক পুত্র, আমি যদি কোন সময়ে না থাকি তাহলে এই বৈরাম খানই পিতৃতুল্য কাজ করবে। তাকে আমি আমার সমস্ত পরমাত্মীয়ের চেয়ে বিশ্বাস করি।

সেইজন্যে বৈরাম খান আকবরের সঙ্গেই সর্বদা ছায়ার মত থাকতেন। আকবর মনে করে তার জীবনে এই একটি শনি। দুষ্টগ্রহ।

তার যখন ন'বৎসর বয়স পিতা আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে গজনীর শাসনভার দিলেন। নামে মাত্র শাসন পরিচালনা। সিংহাসনে সে বসে থাকতো, আর পরিচালনা করতেন বৈরাম খান। পিতার অন্যতম ভ্রাতা হিন্দালের মৃত্যুর পর এই প্রদেশ তাদের হাতে এসেছিল। তারপর গজনী থেকে লাহোর। লাহোরেও সে একাধিকভাবে তিন বছর রাজ্য পরিচালনা করেছে।

ঘটনাটি ঘটে এই লাহোরেই।

কাহিনীটি এত স্পষ্ট ও এত ভয়ঙ্কর যে সেই চার পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা, তবু ম্লান নয়। যেন এখনও সেই সজল মুখখানি নির্যাতনের যন্ত্রণায় স্পষ্ট। সেদিনও ঐ বৈরাম খান কোন প্রতিবাদই শোনেন নি। শাস্তি দেওয়ার পূর্বে গভীর রাত্রে ছুটে গিয়েছিল আকবর তাঁর খাসকামরায়। অনুরোধ করেছিল, বেগুণা আওরতকে আপনি মুক্তি দিন। যদি ও কোন দোষ করে থাকে তবে লঘুদণ্ড দিন। রমণী হত্যা করে মুঘল বংশ কলঙ্কিত করবেন না।

বৈরাম খান যখন আকবরের কথা শোনেন নি, তখন সে পিতার কাছ থেকে আদেশ আনার জন্যে দ্রুতগামী অশ্বারোহীকে কাবুলে পাঠিয়েছিল। তখন পিতা হুমায়ুন কাবুলে। একরাত্রে সেই খবর নিয়ে অশ্বারোহী আসতে পারে না। তাকে প্রচুর ইনাম দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আকবর রাজী করিয়েছিল। কারণ পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই সেই বেগুণা রমণীর শাস্তি হয়ে যাবে।

আজ পিতা এজগতে নেই। থাকলেও কারো মনের স্বাধীন চিন্তার ওপর হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা তার ছিল না। পিতা কি চোখে যে বৈরাম খানকে দেখেছিলেন। অশ্বারোহী উত্তর নিয়ে এল পিতার স্বলিখিত হস্তাক্ষর, অবিশ্বাস করার উপায় নেই। 'আমি যাকে ক্ষমতা দান করেছি, তাকে বিশ্বাস করেই

দিয়েছি। সে যা উপযুক্ত বলে মনে করেছে, তাই হবে। তার কর্মের সমালোচনা করার অধিকার স্বয়ং ঈশ্বরেররও নেই।'

তারপর ভিন্নভাবে উপদেশ দিয়েছেন— তুমি এখন বালক মাত্র। পড়াশুনায় মন দিলেই খুশি হব। পড়াশুনার সাথে অস্ত্রবিদ্যা, শরীরচর্চা এসব নিয়মিত করবে। আমাদের মুঘল পরিবার শিক্ষিত পরিবার। অন্তত সে পরিবারের সুনাম রক্ষার জন্যে সচেতন থাকবে।'

চিঠিটি বৈরাম খানও দেখেছিলেন। সেদিন তিনি উল্লাসে হেসেছিলেন।

তারপর আর কি? চোখের সামনে দেখতে হয়েছিল সেই রমণীর নির্মম মৃত্যু। মানুষ অপরাধীর এমনি বিচার করতে পারে? তাছাড়া সে যখন স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক দুর্বলতা নিয়েই পৃথিবীতে আসে। তার দেহে শক্তি প্রয়োগ করা এ যে দস্যুতুল্য। খোদা যাদের রূপগুণে মহিয়সী করে পৃথিবীতে পাঠায়, তারা যত দোষই করুক, অন্তত বীরপুরুষ তাদের ধর্ম নষ্ট করে না।

এর বেশী সেদিন ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে আর কিছু আকবর ভাবতে পারে নি। বয়স তখন যে সন্ধিক্ষণে ছিল, তাতে সে রমণীটিকে সহোদরা বহিন ভেবেছিল।

যখন উজ্জ্বল সূর্যরশ্মির মাঝে উন্মুক্ত ক্ষেত্রে তাকে দাঁড় করানো হল, তাকে দেখেই আকবরের চোখে জল এসে গিয়েছিল।

বেচারী মেরে বহিন।

মুঘল সৈন্যেরা চারিদিকে বর্শা হাতে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে অপরাধিনীকে পাহারা দিচ্ছিল। এমনভাবে ঘনবদ্ধ হয়ে পাহারা দিচ্ছিল, যেন পালিয়ে যেতে না পারে।

কিন্তু ঐ রমণীর পালাবার কোন ইচ্ছা ছিল না, বরং সে মৃত্যুর জন্যে এত নির্ভীক যে দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। দাঁড়িয়েছিল দৃঢ়ভঙ্গিতে সূর্যের দিকে মুখ করে, যেন কাকে সে তার নিরুপায় অবস্থার জন্যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করছে। কিম্বা হয়তো মনে মনে সে আল্লাকে ডাকছিল।

দূর থেকে আকবরের ইচ্ছে করলো, চীৎকার করে ঐ মেয়েটিকে সে তার মৃত্যু সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়। অন্তত মেয়েটি মৃত্যুর জন্যে একটু কাঁদুক। একটু শোক করলে তার শাস্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে।

দর্শক উপস্থিত হয়েছে প্রচুর। লাহোরবাসীও অনেক আছে। পুরীর রমণীরা অবরোধে এসে জমা হয়েছে। তাদের কলস্বর মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে।

মেয়েটিকে প্রস্তর নিক্ষেপের দ্বারা হত্যা করা হবে। কটি হাতীর সাহায্যে এসেছে ছোট, অনেক প্রস্তরখণ্ড। নিক্ষেপের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে পঞ্চাশজন বিশালকায় বলশালী সৈনিক।

খানসাহেব আদেশ প্রচার করলেই শুরু হবে সেই ক্রীড়া। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আকবরের পাশেই। ওরা একটি উঁচুমঞ্চে দাঁড়িয়েছিল। তার পাশে ছিল আমীর, ওমরাহ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা। বেশ ভীড় ছিল সেই মঞ্চটিতে।

সকলেই কৌতুক অনুভব করছিল। নৃশংস কৌতুক। বিশেষ করে আওরক্ত

বধ হবে। যে আওরত অন্দরমহলে শোভা পায়। যে আওরত নাচমহলের বিশেষ মুহূর্তে ঝাড়লণ্ঠনের নীচে নৃত্যের ছন্দে দেখতে ভাল লাগে। যে আওরতকে সোহাগের ইস্তেজারে আবদ্ধ করে সুকোমল শয্যার সীমিতে প্রত্যাশা করতে ইচ্ছে জাগে—সেই আওরতকে উন্মুক্ত ক্ষেত্রে শাস্তির জন্যে দেখে অগণিত নারী-পুরুষেরা যেন কি এক ক্রীড়ায় মেতে উঠলো।

রক্ত ফুটছে জলন্ত কড়ায়। প্রতি রমণী পুরুষের শিরায় শিরায় যেন সীমাহীন উত্তেজনা। বক্ষ উদ্বেল হচ্ছে। নিঃশ্বাস দ্রুত বইছে।

আকবর একসময় খানসাহেবকে চুপি চুপি বললো, আমাকে অনুমতি দিন, আমি এস্থান পরিত্যাগ করতে চাই।

হঠাৎ খানসাহেব অট্টহাস্য করে হেসে উঠলেন। তাঁর হাসিতে উপস্থিত ব্যক্তিরা কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

বৈরাম খান ক্ষমতার গর্বে গর্বিত হয়ে উপস্থিত ভদ্রলোকদের দিকে তাকিয়ে একটি বালককে অপমানেব লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। উদ্দেশ্য করেই বললেন—শুনেছেন আপনারা রাজকুমারের কথা! সে এই মৃত্যু দেখে ভয় পাবে বলে কাপুরুষের মত এইস্থান পরিত্যাগ করতে চায়। উপযুক্ত মুঘল বংশধরের কথাই বটে। যে পিপীলিকার মৃত্যুতে আতঙ্কিত হয়, তার ভবিষ্যৎ আপনারা বিবেচনা করুন। সম্রাট হুমায়ুনের উপযুক্ত পুত্রই বটে। তৈমুরলং এইরকম বংশধরের জন্ম হবে জানলে বংশ লোপ করে যেতেন।

উপস্থিত ব্যক্তিরা বৈরাম খানের কথায় উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন।

আকবর মাথা নীচু করে সে অপমান সহ্য করলো। লজ্জায় তার মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা করলো। তখনই কারও কাছে পালিয়ে যেতে তার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু কে আর তার আছে? আত্মীয়স্বজন যারা আছে, তারা স্বার্থপর। আর সব বেতনভোগী। নিমকের মর্যাদা রক্ষা করে। হুকুম তামিল ভিন্ন আন্তরিকতা নেই।

এই সময়ে বৈরাম খান অপরাধিনীকে হত্যার আদেশ দিলেন। সেই পঞ্চাশজন সৈনিক একটি অবলা রমণীর ওপর প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করতে লাগলো।

ইতিহাসে চিরকাল লেখা থাকবে এই নৃশংসতা।

ওদিকে গৌরবর্ণ সুন্দর খুবসুরত অষ্টাদশী এক রমণীকে জোয়ান জোয়ান পঞ্চাশজন লোক প্রস্তরখণ্ড ছুঁড়ে হত্যা করছে, এদিকে উন্মাদ দর্শকেরা উত্তেজনায় চীৎকার করতে লাগলো।

রমণীর পরিধানে ছিল একটি কালো আলাখাল্লা। সেখানি ছিন্ন হল। দেহবর্ণ রক্তাক্ত হল। কপাল, মুখ, চোখ, মাথা থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। তারপর ঢলে পড়লো মাটিতে। তখনও প্রস্তরখণ্ডের বৃষ্টি অবিরামগতিতে চলেছে। শেষে দেখা গেল, মেয়েটি প্রস্তরখণ্ডের তলায় চাপা পড়েছে।

এই সময় আকবরের কানে গেল রমণীটির অপরাধের গুরুত্ব। কি অপরাধ সে করেছিল আকবর জানতো না।

রমণীটি নাকি ব্যভিচারিণী হয়েছিল। ব্যভিচারিণী কাকে বলে তখন আকবরের অজানা ছিল। শুধু বুঝতে পেরেছিল একটা কিছু ঘোরতর অন্যায়। আওরতের এই অন্যায়ের ক্ষমা নেই।

আরো শুনলো, খানসাহেব এই রমণীটির প্রতি লুব্ধ ছিলেন।

মেয়েটি ছিল অন্দরমহলের পরিচারিকা। বেগমদের ফরমাইজ খাটাই তার কাজ। একদিন খানসাহেব তাকে দেখে লুব্ধ হয়ে তাঁর খাসকক্ষে আহ্বান করেন কিন্তু মেয়েটি দুঃসাহসিকভাবে এই আহ্বান প্রত্যাখান করেছে। তাতে অবশ্য সে কোন শাস্তি পাই নি।

একদিন অন্দরমহলে গভীর রাত্রে তার কক্ষে একটি পুরুষকে ছল করে পাঠানো হয়। পুরুষটি প্রবেশ করতে ইমলি চিৎকার করে উঠেছিল। তারপর রক্ষীর ছুটাছুটি। খবর যখন খানসাহেবের কাছে পৌছলো, তিনি বিচার তৈরী করিয়েই রেখেছিলেন।

আসলে বাঁদী নষ্টা। সে ব্যভিচার রচনা করে শেষপর্যন্ত পুরুষটিকে ধরিয়ে দেবার জন্যে এই প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়েছে। অন্তঃপুরের শালীনতা নষ্ট করার জন্যে তার মৃত্যুদণ্ড হল। শুধু দণ্ডের নিয়মটি একটু বৈচিত্র্যধর্মী। ব্যভিচারিণীর শাস্তি অবশ্য মৃত্যুদণ্ডই মুঘল আইনে লেখা আছে।

কিন্তু ইমলিবাঁদী কেন ব্যভিচারিণী নাম পেল? বৈরাম খানের আসক্তির নিম্নে নিজেকে বলি দেয় নি বলেই কি এই অপরাধ?

আকবর আবার পিতাকে পত্র লিখলো। সমস্ত বৃত্তান্ত সহজভাষায় লিখে পিতার কাছে প্রেরণ করলো। লিখলো, পিতা বিচার চাই। নিরপরাধিনীর এই শাস্তি সহ্যাতীত। এর বেশী সেদিন আকবর পিতাকে কিছুই বলতে পারে নি, আসলে সেদিন পিতাকে সে বেশী ভয় করতো। আজ হলেও কি সে পারতো? গুরুজনকে শ্রদ্ধা করতেই সে শিখেছে, অবমাননা করতে নয়।

পিতার সেদিন উত্তর লিখিত পত্রখানিও তার হৃদয় চূর্ণ করেছিল, বিস্মিত হয়েছিল কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারে নি। পিতা নির্মম ভাষায় তার চিঠির প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন।

'তোমার জন্যে একজন উপযুক্ত শিক্ষক প্রেরণ করছি, আর বৈরাম খানকে তোমার পড়াশুনার জন্যে নজর দেবার ক্ষমতা দান করছি। তুমি এখন বালক মাত্র। রাষ্ট্রনীতি বোঝার বয়স হলে তোমার পত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করবো। কোমল মন রমণীদেরই শোভা পায়, তোমার মনের কোমলতার জন্য চিন্তিত হলাম। যে বাঁদী মৃত্যুদণ্ড পেয়েছে, আমার ধারণা উপযুক্ত বিবেচনাতেই পেয়েছে। তুমি মন শক্ত করবে, যুদ্ধই আমাদের বংশের পুরুষদের ধর্ম। মানুষকে মেরে ক্ষমতা অধিকার করাই আমাদের কর্ম। আমার অবর্তমানে তোমাকে সেই বংশের সুনাম রাখতে হবে। মনে রেখো, সেখানে তোমাকে অনেক কঠিন কাজও করতে হবে। তোমার পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে আসছে।'

কিন্তু পিতার উপদেশ আকবরের বালক মনে রেখাপাত করেনি। পিতার পত্রের উত্তরে তার চোখে জল এসেছিল। আর কাতর হয়েছিল সেই মৃতা বাঁদীর জন্যে।

কঠিন হতে হবে। হৃদয়কে বধ করে নির্মম হতে হবে।

সবই সত্যি কথা! তাই বলে নিরপরাধকে শাস্তি দিয়ে নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন. একি মানুষের ধর্ম? মুঘলরা যুদ্ধবাদী। যুদ্ধ করে রাজত্ব করাই তাদের ধর্ম, সেখানে করুণা নেই, মমতা নেই। এসব কোমল বস্তুর কোন অধিকার নেই বলে কি বুঝতে হবে তারা কোন নীতিরও ধার ধারবে না। তৈমুরের নির্মমতাই বংশধররা অনুসরন করবে? তৈমুরের হৃদয়বত্তার কোন অনুসন্ধান কেউ করবে না? তাই যদি হয়, তাহলে পিতামহ বাবর কেন বার বার শত্রুকে ক্ষমা করেছেন? তিনি কোন্ মন নিয়ে কবিতা রচনা করতেন? সঙ্গীতের মধুর সুর তো নির্মমতার থেকে আসে না। পিতামহের কথা কেন? পিতা হুমায়ুনই বা কি নির্মমতার পরিচয় দিয়েছেন? পিতার মৃত্যুর পর কেন ভাইদের রাজ্যবণ্টন করেছিলেন? তিনি তো ইচ্ছে করলে বেইমানী করতে পারতেন?

উপদেশ দেওয়া যায় কিন্তু উপদেশ পালন করাই শক্ত।

সেদিন সেই ইমলি বাঁদীর মৃত্যুতে বৈরাম খানও আকবরের কাছে ক্ষমা পাননি, পিতা হুমায়ুনও না। কারণ বাঁদীর মৃত্যুর সেই দৃশ্য কখনও চোখ থেকে আকবরের সরে যায়নি।

তারপর হিমুর মৃত্যু।

এক চক্ষু অন্ধ, ক্ষতবিক্ষত সেই বন্দীকে হত্যা করার জন্যে বৈরাম খান তাকে অনুরোধ করলেন। লোভ দেখালেন 'গাজী' উপাধি লাভ করার এই সুযোগ।

পিতা আজ নেই, তাছাড়া এই বিশাল যোদ্ধাকে সে-ই এক বর্শার দ্বারা কাবু করেছে। আজ সেই বন্দীকে হাতে পেয়ে তাকে বধ করবে? পিতা থাকলে হয়তো তাঁর হুকুম পালন করতে হত। আজ যদি তার মনোভিপ্রায় না ব্যক্ত করে, সঙ্কল্পে দৃঢ় না হয়, তাহলে ভবিষ্যতের সম্রাটের ক্ষমতা কোথায় সৃষ্টি হবে? তাই সে প্রথম বৈরাম খানের অবাধ্য হল।

অবশ্য তার নীতিগত ধারণা বুঝিয়ে বললো—বন্দীকে আঘাত করা বীরের কর্ম নয়। অন্তত আমি তা পারবো না।

প্রথমে বৈরাম খান ক্ষিপ্ত হলেন, গর্জে উঠে আকবরকে শাসন করতে চাইলেন। তারপর বোধহয় তাঁর স্মরণ হল, এখন আকবর আর বালক নয়। তাছাড়া

সিংহাসনের অধিকারী এখন আকবর। একে ক্ষেপিয়ে তুললে ভবিষ্যতে তাঁরই অসুবিধে। তাই হঠাৎ স্বর কোমল করে আকবরকে বোঝাতে লাগলেন।

কিন্তু আকবর অটল। তার সঙ্কল্প সে কিছুতেই ছাড়তে চাইলো না। শুধু বললো—আমি তো বলেছি চাচা, বন্দীকে আঘাত করতে পারবো না।

দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধ কে জয় করলো? কে এই হিমুকে বধ করলো? সব কৃতিত্ব নিজেই আত্মসাৎ করেছিল বলে আকবর বৈরাম খানের ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। তাই সঙ্কল্প হল আরও দৃঢ়, বজ্রের মত কঠিন হয়ে সেই কিশোর হিমুর অর্ধমৃত দেহের সামনে দাঁড়িয়ে রইলো।

বৈরাম খান আবার চটলেন। আবার ভয় প্রদর্শন করে আকবরকে আদেশ পালন করাতে চাইলেন।

কিন্তু আকবর কঠিনস্বরে বললো, আমার অভিপ্রায় আমি ব্যক্ত করেছি। এরপর যদি আপনি বলপ্রয়োগ করেন, তাহলে আপনার সম্মান ক্ষুণ্ণ হলে আপনি আমাকে দায়ী করবেন না। মুঘল বংশের একটা নীতি আছে, আমি মুঘলবংশধর, বংশের নীতির বাইরে আমার কোন কাজ করা আশা করি উচিত নয়।

অগত্যা বৈরাম খান নিস্তেজ হলেন। তারপর ম্রিয়মানকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে বন্দীকে নিয়ে তুমি কি করতে চাও?

আকবর চুপ করে থেকে বললো—বন্দী এক সময়ে ছিলেন খুব বলশালী, রণনিপুণ যোদ্ধা। তুর্ক, আফগান, রাজপুত এক বিস্তৃত সৈন্যের অধিকারী। আজ তিনি সব হারিয়ে নিঃস্ব। এক চক্ষু তাঁর চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে। একটি হাত ও পা তাঁর পঙ্গু—এখন তাঁকে ছেড়ে দিলেই মনে হয় উপযুক্ত আচরণ করা হবে। কারণ তাঁর আর সে শক্তি নেই, তিনি পুনরায় রাজ্যজয়ের জন্যে প্রস্তুত হবেন। আর যদিও হন, আমরা কি তাকে পুনরায় পরাজিত করতে পারবো না?

কিন্তু বৈরাম খানের একথা মনঃপুত হল না। তিনি উত্তরে তিক্তকণ্ঠে বললেন—তোমার পিতা তোমার জন্যে আমাকে সব সময় সাবধান করে গেছেন। তোমার কোমল মনের জন্যেই তুমি বন্দীকে মুক্তি দিতে চাইছো কিন্তু এ. কখনই রাষ্ট্রনীতির ধর্ম নয়।

তখন আকবর বললো, পিতামহ বাবরের রণনীতির কথা কি আপনি শোনেন নি? পিতা হুমায়ুন কি শুধু বন্দীকে নির্মমভাবে হত্যাই করেছেন? কেন নিজের ভ্রাতাদের তিনি বার বার ক্ষমা করেন নি?

যখন বৈরাম খান তর্কে আকবরের সঙ্গে পারলেন না, তখন নিজেই একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারী হাতে করে হিমুর অর্ধমৃত দেহের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং দ্বিরুক্তি না করে বন্দীর বুকে বসিয়ে দিলেন।

আকবর চোখে হাত চাপা দিয়ে নিজের কক্ষে পালিয়ে গেল।

কী নৃশংস প্রকৃতির মানুষ এই পরম হিতৈষী পিতৃবন্ধু বৈরাম খান! এর নাম কি বীরত্ব? না কাপুরুষতা! দুর্বলকে হাতের নাগালে পেয়ে সবলের এই

অমানুষিকতা—না, না এর নামই যদি রাজত্ব হয়—তাহলে প্রয়োজন নেই সে রাজ্যের। তার চেয়ে একক জীবন নিয়ে লোকালয়ের বাইরে গিয়ে বাস করা অনেক ভাল।

সে যদি যথার্থ কোনদিন সম্রাট হয়ে সিংহাসনে বসে, তবে মনুষ্য রক্তের কোনদিন অবমাননা করবে না। নিজের শিরাতেও যে মনুষ্য রক্ত প্রবাহিত! সে রক্তের সম্মান সে যথার্থ ভাবে রক্ষা করবে। বিনা কারণে যেমন সে মনুষ্যশরীরে আঘাত হানবে না, তেমনি ক্ষমা দিয়েও অপরাধীকে করবে না কোন করুণা। অপরাধী যে তার উপযুক্ত শাস্তিই সে পাবে, তবে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী। অহেতুক প্রাণহানি যেমন অন্যায়, অহেতুক ক্ষমাও অপরাধ।

সেই বৈরাম খান মহব্বতের সোহাগ দিয়ে তার ভগ্নী সলিমার হৃদয় জয় করতে চায়। না, না যার মনে সঙ্গীত নেই, সে কখনও একবার আসমানের সামনে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির রঙ ফেরা দেখেনি, সে কি জানবে ভালবাসার মর্ম? বরং সে সলিমার মনে দুর্বলতার ছায়া ফেলে তাকে প্রতারণা করতে চায়।

ঐ নৃশংস প্রকৃতির মানুষ, ঐ বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষ—যার মনে এতটুকু দয়ার লেশমাত্র নেই। যে মুসলমান হয়ে কখনও আল্লাকে ভজনা করে না, যে ভাল পোষাক ছাড়া, ভাল খানা ছাড়া একদণ্ড বসবাস করে না, তার মনে জাগবে আওরতের প্রতি আকর্ষণ! আকর্ষণ জাগতে পারে, সে আকর্ষণ মহব্বতের জন্যে নয়, কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্যে।

যদি মহব্বতই থাকতো, থাকতো তাহলে সঙ্গীত। তাহলে সেই বাঁদী নির্মমভাবে মৃত্যুর মাঝে লীন হয়ে যেত না।

সলিমা বোধ হয় বৈরাম খানের প্রকৃতি জানে না। জানে না বলেই একজন বীরপুরুষের বেগম হতে চেয়েছে। আচ্ছা যদি তাকে কেউ খানসাহেবের প্রকৃতির আসল পরিচয় জানায়, তাহলেও কি সে এই শাদীকে সমর্থন জানাবে?

কিন্তু তাকে জানাবে কে? আকবর নিজে জানাতে পারে না, কারণ সলিমা তাকে বাচ্চা মর্দানা বলে উপহাস করে। অবশ্য সলিমার বয়স তার চেয়ে বেশী নয়। তবে আওরত কম বয়সেও পরিণত শরীর ও মন পায় বলে আকবর তার কাছে বাচ্চা।

জানাতে পারে এক বৈরাম খানের অন্যতম ইহুদী বেগম লল্লা। লল্লাকে দেখেছে আকবর, সে সব সময়ে ঈর্ষান্বিতা হতে চায়। ওড়নার আড়ালে তার দুটি সুর্মা আঁকা আয়ত চোখে যেন কিসের জ্বালা। সে বৈরাম খানের কোন বেয়াদপি সহ্য করে না। খাসকক্ষ পরিত্যাগ করে রঙমহলে রাত্রিবাস করলে সে বিক্ষুব্ধ হয়। পরদিন স্বামীর ওপর নানান কটূক্তি করে তাকে অপদস্থ করে। এসব অবশ্য লোকের আলোচনাতেই আকবর শুনেছে, সঠিক কিছু জানে না। তবে রটনার কিছু যে সত্যি সে বিশ্বাস করে। কারণ তা না হলে বৈরাম খানের অন্যদুটি বেগমের কথা কেউ বলে না কেন?

আকবর আরো শুনেছে, এই ইহুদী বেগম লল্লা সুরা পান করে। মাতাল হয়ে

সারারাত্রি ধরে বিবস্ত্র থেকে নৃত্য করে। কেউ কিছু বলতে গেলে বলে—বেশ করেছি। অন্তঃপুরের নামে যে বন্দীশালায় আমাদের পূরে রাখা হয়েছে তা থেকে মুক্তি না দিলে এই করবো? আরো যদি বেশী কিছু করার ক্ষমতা থাকে তাও করবো। কারো নিষেধ শুনবে না। শাস্তি পেতে হয়, তাও গ্রহণ করবো। অন্তত মৃত্যুর মত শাস্তি যেন পাই। মরলে সব শান্তি।

লল্লা কাঁদে। সরাব পান করে পাগলের মত কাঁদে। গান করে। সুন্দর গান করে। তবে সে গান কান্নার।

আকবরের এক একসময় ইচ্ছা করে সেই গান শুনতে কিন্তু অন্তঃপুরে ঢোকবার অধিকার থাকলেও বৈরাম খানের বেগম মহলে ঢোকবার অধিকার নেই। বিশেষ কটি মহলে কারুরই ঢোকবার অধিকার নেই। সেখানে শুধু পরিচারিকার গতিবিধি। তবে পরিচারিকাদের কিছু উৎকোচ দিলেই কাজ হাসিল হয়।

পরিচারিকাদের হাত দিয়ে সেইজন্যে অন্তঃপুরে ঘটে গোলমাল। আগে এসব আকবর বুঝতো না। মাঝে মাঝে অন্তঃপুরের সমস্যা নিয়ে পিতাকেও অনেক মাথা ঘামাতে দেখেছে। মা হামিদাও অনেক সময় এই অন্তঃপুরের ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। মায়ের রাগ সে কখনও দেখেনি কিন্তু অন্তঃপুরের সমস্যা নিয়ে অনেক সময় তিনি চীৎকার করেছেন।

পিতার সঙ্গে মাতারও এই নিয়ে অনেক সময় মনোমালিন্য হত।

তখন আকবর দেখেছে, পিতা মায়ের কাছে কেমন যেন ভীরু। পিতা কাকুতি মিনতি করতেন, মা মাথা নেড়ে অসমর্থন জানাতেন।

শেষে পিতা মাতার হাত ধরতেন।

কিছু কিছু কথাবার্তাও আকবরের মনে আছে।

মা হয়তো বললেন—তোমাদের বংশে এই উচ্ছৃঙ্খলতা কেন, কেন তোমরা বহুরমণী ভোগ্য হও? এদিকে তোমাদের মুঘলবংশ শৌর্য বীর্যের জন্যে খ্যাত। যুদ্ধে মৃত্যুপণ করে এগিয়ে যাও। ন্যায় নীতির সব দিক থেকে তোমাদের জাতি প্রশংসা লাভ করেছে। অথচ তোমরা সময় পেলেই সুরা পান করে রঙমহলে ঢুকবে। রমণীর সুঠাম তনুর ছন্দদোলার নৃত্য উপভোগ করবে। তাদের স্বর্গীর রূপের পায়ে নিজেদের বীরমন সঁপে দেবে। উপভোগ করবে রমণীর রমণীয় দেহ। প্রয়োজন ছাড়াই যেখানে যত খুবসুরত দেখবে, তুলে নিয়ে এসে হারেমে পুরবে। তারপর তাদের একটিবার উপভোগ করে তাদের নষ্ট করে দেবে। আওরতগুলি সারাজীবনের হাহুতাশ নিয়ে মর্মরদেয়ালে মাথা কুটবে—তোমরা আর তাদের দিকে ফিরে চাইবে না।

এখন মনে পড়ছে আকবরের। সেবারে কে যেন একটি আওরত পিতার হারেম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সে ধরা পড়েছে। পিতা তাকে শাস্তি দিতে চান, মাতা দিতে দেবেন না। মাতার ইচ্ছে—আওরতটি যেখানে পালিয়ে গিয়েছিল, সেখানেই তাকে ছেড়ে দিয়ে আসা হোক।

জন্যেই এই প্রয়াস। আর এই কাজে লল্লাকে নিযুক্ত করলে সফল হওয়ার পথ খুবই সহজ।

কিন্তু একবার তার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলো, কাজটি করা কি তার উচিত? সে সম্রাট। গুরুত্বময় জীবন। সে সামান্য এই রমণীর বিষয় নিয়ে নিজের অমূল্য মুহূর্ত নষ্ট করবে? তারপর ভাবলো, মন্দই বা কি? রাজকার্যের এও তো একটা অঙ্গ। বৈরাম খান মুঘল পরিবারের কন্যা গ্রহণ করে আত্মীয় হতে চাইছেন। তাঁকে আত্মীয়তা থেকে বহিষ্কৃত করলেই রাজ্যের মঙ্গল। সে রাজ্যের স্বার্থের জন্যে কৌশল অবলম্বন করছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ নয় বৃহত্তর মনীষা।

আর চিন্তা না করে সে তার খাসভৃত্যকে গোপনে উৎকোচ দানে বশীভূত করে বেগমমহলের একটি সুপটু বাঁদীকে হস্তগত করলো। তারপর তার হাত দিয়ে লল্লা বেগমের কাছে পাঠিয়ে দিল একটি চিঠি। সেই চিঠিতে বৈরাম খানের নবতম কীর্ত্তি ও সলিমার কথা লিখে দিল। উত্তর আনবার জন্যেও সেই সঙ্গে আদেশ দিল।

ঝুঁকি নিতে হল না। আগে আকবর ভেবেছিল, লল্লার সঙ্গে সে গোপনে দেখা করবে কিন্তু তাতে যদি অন্য সন্দেহ সৃষ্টি হয়? কারণ লল্লার স্বভাব সবর্জনবিদিত। নবীন সম্রাটকে হাত করে অন্য সম্বন্ধ সৃষ্টি করাও বিচিত্র নয়। লল্লা ছিল সেই প্রকৃতির রমণী। না পাওয়ার বেদনায় একটি বিক্ষুব্ধ হৃদয় ক্ষুব্ধ মনের জ্বালায় আগ্নেয়গিরি।

সেই ভেবে আকবর পত্র বিনিময় করলো।

কিন্তু আশ্চর্য এই রমণীর মন। লল্লাকে অন্য স্বভাবের আওরত বলেই আকবরের মনে হয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে তার ভুল ভাঙলো।

হঠাৎ অতর্কিতে বৈরাম খান এসে কক্ষে ঢুকলেন। হাতে তাঁর আকবরের সেই চিঠি। আকবর ব্যাপারটা চিন্তা করে মনে মনে শঙ্কিত হল। বুঝতে পারলো, এর পরের ঘটনা কি হবে?

বৈরাম খান চিঠিখানি সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—স্পর্দ্ধার একটা সীমা থাকে রাজকুমার।

হঠাৎ আকবর নিজেই একটা কাণ্ড করলো। পালঙ্ক থেকে নেমে হাঁটু গেড়ে নীচে বসে খোদার কাছে প্রার্থনার মত জোড়হাত করে বললো—অন্যায় স্বীকার করছি। ক্ষমা করুন।

বৈরাম খান অনেক কিছু বলবেন বলে ছুটে এসেছিলেন কিন্তু হঠাৎ আকবরের অদ্ভুত আচরণে থমকে গেলেন। বিস্ময়ে কিছুক্ষণ আকবরের নতমুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে বৈরাম খান উল্লাস অনুভব করলেন কিন্তু পরক্ষণে তাঁর মনে এল চিঠির কথাগুলি। দারুণ এক ষড়যন্ত্র। লল্লার মনে ঈর্ষা সৃষ্টি করে সলিমার সাথে কলহ উপস্থিত করার চেষ্টা। সলিমা যে ভুল করতে চলেছে সেটুকু তাকে বুঝিয়ে দিয়ে তাকে প্রতারিত করার আকাঙ্ক্ষা।

বৈরাম খান চিঠির ভাষাগুলিতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন কিন্তু বুঝতে পারেন নি,

আকবর হঠাৎ এমন কাজ করলো কেন? তাই তিনি একটু সময় চুপ করে থেকে কণ্ঠে উষ্মা সৃষ্টি করে বললেন, কিন্তু কেন তুমি এ কাজ করলে বলবে কি? তোমার মনোভিপ্রায় অবগত হলে আমি খুশি হব রাজকুমার?

আকবর উত্তরে মাথা নেড়ে বললো, আমি ক্ষমা চাইছি। অপরাধীকে ক্ষমা করলে কি তার অপরাধের গুরুত্ব লঘু হয় না? আমি বুঝতে পাচ্ছি, আমি অন্যায় করেছি। কিন্তু অন্যায় করার প্রবৃত্তি দমন করতে পারি নি বলেই এই অপরাধ।

বৈরাম খান জিজ্ঞেস করলেন—তবে কি বুঝবো, এ তোমার নিছক প্রবৃত্তির তাড়না?

নিছক প্রবৃত্তির বেয়াদপি।

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে যায় না। তবে তুমি লল্লাবেগমকে কেন ক্ষিপ্ত করলে? সলিমার কাছে সরাসরি পত্র পাঠালেই তো তোমার অভিসন্ধি পূর্ণ হত।

আবার আকবর জোড়হাত করে বললো—ক্ষমা। আমার বেয়াদপির ক্ষমা! পিতা যেমন পুত্রকে ক্ষমা করে, তেমনি আমাকে ক্ষমা করুন। আর কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে আমার যন্ত্রণা বর্ধিত করবেন না।

বৈরাম খান আর বিশেষ কিছু না বলতে পেরে কক্ষত্যাগ করে চলে গেলেন। ভবিষ্যতের যে সম্রাট, যার হাতে একদিন পৃথিবীর সমস্ত শক্তি আসবে, তাকে আর বিশেষ কিছু বলা শোভা পায় না। যখন সে নিজেই মানসিক দৈন্যতা প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়েছে। তাছাড়া আরো একটি কারণ আছে, সলিমাকে যে লোভ দেখিয়ে জয় করেছেন, তা যদি প্রকাশ হয়ে যায়, তাহলে তার প্রকৃতি ধরা পড়ে যাবে কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি ধরা পড়লে সমূহ বিপদ। খুব নিপুণ কৌশলের দ্বারা ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হবে। আকবরকে করতে হবে বুদ্ধিহীন। তাকে বাইরের আলোয় বেশীক্ষণ চলাফেরা না করতে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে রাখতে হবে। সে যাতে বেশী রাজকার্যে মাথা না ঘামায়, তার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। সে সঙ্গীত ভালবাসে, সেই সঙ্গীতে করতে হবে মুগ্ধ। মনে সঙ্গীতের সুর থাকলে বৈষয়িক বুদ্ধি থাকবে না। পড়াশুনায় মন নিয়োজিত করিয়ে রাখতে হবে। জ্ঞান বাড়ুক ক্ষতি নেই, তবে সে জ্ঞান কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।······সলিমাকে একটি গুরুত্ব বিষয়ের আলোকলাভ করিয়ে জয় করেছেন। নিজে একদিন সিংহাসনে বসবেন আর পাশে বসবে সম্রাজ্ঞী হয়ে সলিমা বিবি। না হলে সলিমার মত একটি সদ্যফোটা কুসুম কলিকাকে কি জয় করা যেত? মুঘল পরিবারের আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাদেরই একদিন ধ্বংস করতে হবে। শুধু ভয় কিছুটা আকবর। তাকে সত্যিই ভয়। তাকে আর ছেলেমানুষ বলে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

এই সব কথা ভেবেই আকবর ক্ষমা চাইতে বৈরাম খান আর বিশেষ গোলমাল সৃষ্টি করলেন না। সত্যি, মানুষ যখন ক্ষমা চায়, তার মনের ইচ্ছাগুলি অধীনতা না স্বীকার করলে ক্ষমা চায় না। আকবর যখন ক্ষমা চাইলো, তাতেই বুঝতে হবে সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে।

কিন্তু যদি লল্লা বিশ্বাসঘাতকতা না করতো? লল্লা যে কেন এত ভাল ব্যবহার করলো, তাও বোঝা মুস্কিল!

আকবরও একলা ঘরে চতুর্দিকে পায়চারী করতে করতে সেই কথা ভাবলো। আজ সে একটি কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে অকৃতকার্য হল। তারই ভুল হয়েছে, অন্তত ভাবা উচিত ছিল পিছনের কথা। সে একাই ধূর্ত বলে নিজেকে চিন্তা করে ভুল করেছে। আওরত চরিত্র কি অদ্ভুত রহস্যময়? লল্লার স্বভাবের যেটুকু পরিচয় সে অবগত হয়েছে তাতে এই বিশ্বাসঘাতকতা, না আর কিছু ভাবা যায় না। এবার আর কোনদিন কোন বেসরম জেনানাকে বিশ্বাস করে নিজেকে ছোট করবে না!

এত ছোট হয়ে গেল যে বাধ্য হয়ে তাকে ক্ষমা চেয়ে উদ্ধারলাভ করতে হল। কিন্তু এই ক্ষমা চাওয়ার পর মানসিক যে জ্বালা তার শরীরে দাহ সৃষ্টি করলো, তার নিবারণ কেমন করে হবে? শুধু সে অসম্মানিত হল না, তার স্বভাবের গতিবিধি নিরূপণ করে বৈরাম খান সচেতন হয়ে উঠলেন। একে সব সময় তিনি তার ওপর সতর্কদৃষ্টি রেখে চলেছেন, তার ওপর এই কারণ উপস্থিত করে আরো সতর্ক করা হল।

কিন্তু কেনই বা সে হঠাৎ ক্ষমা চাইতে গেল? সে সম্রাট, তার নামে আছে পাঞ্জা। তার নামে রাজ্যশাসিত হয়। প্রত্যহ প্রত্যুষে মোল্লাদের উদাত্তস্বরে তার নামে ঈশ্বরের প্রার্থনা শোনা যায়। দরবার কক্ষে আমীর, ওমরাহরা আসন গ্রহণ করবার পূর্বে শতবার সম্রাটকে কুর্ণিশ প্রদান করেন, সম্রাটের নাম উচ্চারণ করে দীর্ঘায়ু কামনা করেন! দেশ দেশান্তর থেকে লোক আসতে শুরু করেছে, নবীন সম্রাট আকবরকে দর্শন করতে, নজরানা দিতে। সেই আকবর হঠাৎ দুর্বল মনের পরিচয় প্রদান করে ক্ষমা চেয়ে বসলো? সামান্য সৈনিকের মত এক আচরণ! যার নেই কোন সম্বল, ফকিরীবেশ, স্কন্ধে একটি মলিন ঝোলা। যে দরজায় দরজায় ঘুরে উদরপূর্ণ করে—ঠিক সেরূপ ব্যবহার করলো আকবর।

কেন সে হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে বৈরাম খানের মুখোস খুলে দিতে পারলো না? বলতে পারলো না, বেইমান, বেতমিজ, দেশের লোককে নিজের কর্তৃত্বে বশীভূত করে অধীন করতে চাইছো! আমীর, ওমারাহদের হাত করেছ, মুঘল পরিবারের হিতকাঙ্খী সেজে সাধুতার পরিচয় দিচ্ছ কিন্তু তুমি কি ভুলে গেছ—আমাকে বালক সাজিয়ে কতদিন আর নিজের স্বেচ্ছাচারিতা বলবৎ রাখবে?

কিন্তু একথা এখনও বলা যায় না। এখনও মুঘল রাজত্ব বিপদ-মুক্ত নয়। এখনও তার মাথার ওপরে খড়্গ ঝুলছে। চতুর্দিকে অন্ধকার, সেই অন্ধকারে হারিয়ে যাবারই ভয় বেশী। এইসময় বৈরাম খানের মত একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিরই অভিভাবকত্ব দরকার। তাঁর সাহায্য যখন প্রয়োজন, সুতরাং তাঁর কিছু বেয়াদপিও সহ্য করতে হবে! সময় হলেই এই বেয়াদপির উপযুক্ত সাজা দিলেই হবে।

এই ভেবেই হঠাৎ আকবর ক্ষমা চেয়ে বসেছে। অবশ্য অন্যায় যখন করেছে, তখন ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে কোন অপরাধ নেই। নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতে গেলে অনেক কৌশল অবলম্বন করতে হয়। পৃথিবীতে এই কার্যসিদ্ধির জন্যে অনেক

ছোট কাজও করেছেন। তাদের পূর্ব-পুরুষ চেঙ্গিজ খাঁ, তৈমুর লং, বাবর শাহ এরা কি কোন ছোট কাজ করেন নি?

আকবর নিজেকে নিশ্চিন্ত করতে চাইলো কিন্তু মনকে বোঝালেও কোথায় যেন বিবেকের দংশন তাকে স্থির হতে দিল না।

এইসময় তার কানে গেল, মা হামিদা গত দু-দিন হল রাজপুরীতে ফিরেছেন। কিন্তু তিনি ফিরে স্বামী যে শেরমণ্ডল নামক গ্রন্থাগারের সোপান থেকে পড়ে মারা গেছেন, তারই সংলগ্ন একটি মহলে অবস্থান করছেন। তিনি এখন স্বামীর শোকে মূহ্যমান। তার সাথে কেউ কোন কথা বলতে পারছে না। তিনি কারো সঙ্গে কোন কথাই বলছেন না। সম্পূর্ণ চক্ষু দুটি নিমীলিত করে স্বামীর কথাই এক মনে ভাবছেন, স্বামীর মুখখানি স্মরণ করে দু' চোখে শ্রাবণের ধারা বইছে। কিছুই আহার করছেন না, কোন রাজসিক পোষাক তার শরীরে নেই। কালো একটি কাপড়ে আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করে বসে আছেন একাসনে স্থির হয়ে।

আকবর কথাগুলি শুনে কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গেল! মা ফিরেছেন? মা ফিরে স্বামীর জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন, পুত্রের জন্যে নয়। তাহলে এখনও পত্নী স্বামীর জন্যেই ব্যাকুল। মাতা পুত্রের জন্যে নয়!

দারুণ এক অভিমানে আকবরের হৃদয় দ্রবীভূত হল। সে একা। পৃথিবীতে তার কেউ আপন নেই?

এই সময়ে কক্ষের মধ্যে খাসভৃত্য কয়েকটি লোকের সাহায্যে রূপোর ট্রেতে করে বিবিধ রাজসিক খাদ্য সামগ্রী নিয়ে প্রবেশ করলো, সেই দেখে আকবরের যত ক্রোধ তার ওপর গিয়ে পড়লো। অভিমান থেকে ক্রোধের উৎপত্তি। হঠাৎ সে ক্ষিপ্ত হয়ে উষ্ণ খাদ্য সামগ্রীর ট্রেগুলি লোকগুলির হাত থেকে নিয়ে ফরাসের ওপর আছাড মারলো। ছড়িয়ে গেল মোগলাই খানা বহুমূল্য ফরাসের ওপর। কিছু বা লোকগুলির দেহের ওপর পড়ে দগ্ধ করলো গাত্রচর্ম। যন্ত্রণা ছুটলো কিন্তু প্রভুর ক্রোধমূর্তির সামনে ভৃত্যের যন্ত্রণা প্রকাশ করবার ক্ষমতা নেই। তাই নীল হল তাদের মুখ। আর লাল হল আকবরের বাদশাহী অবয়ব।

কিন্তু আপসোস হল না। বরং খাসভৃত্য ইমাদ আলিকে তীব্রভাবে ধমক দিয়ে কক্ষের বাইরে পাঠিয়ে দিল।

না, আহার নয়। বিশ্রাম নয়। আরামের জন্যে কোন কাম্যই নয়। কেন সে আরাম উপভোগ করবে? কার জন্যে করবে? কিসের জন্যে করবে? কে তার আপন বলতে আছে? সব বেতন ভোগী ভৃত্য। হুকুমের দাস। ফরমাইজের জন্যে তৈরী হয়ে থাকে। ফরমাইজ পেলে তামিল করে, নতুবা ত্রিসীমানায় থাকে না। সব জিনিসের কি ফরমাইজ দেওয়া যায়? দিলের চাহিদার কি কোন আকার আছে? তার কি সবসময়ে তাড়না থাকে? অথচ এক একসময় এমন বস্তু কাছে পেলে মন আপন থেকেই তার অভাব উপলব্ধি করতে পারে। সেই অভাব সবসময়। তার কোন ফরমাইজ নেই বটে কিন্তু পেলে যেন তার অভাব অনুভব করা যায়।

কিন্তু সে অভাব ভৃত্য মেটাবে কেমন করে? ভৃত্যকে ফরমাইজ দিতে হয়, আর জীবনধারণের কতকগুলি প্রাত্যহিক তালিকা থাকে, তারা নিয়মিত সেই তালিকা মেনে চলে। তার বাইরে তারা কিছু জানেও না, করতেও পারে না।

এই জায়গায় প্রয়োজন আপন লোক। অতি আপনার জন কেউ। যার সাথে নিকট রক্তের সম্পর্ক। যে বুঝতে পারবে নিজের মন দিয়ে অন্যের মনের অভিব্যক্তি। নিজের স্বভাব দিয়ে উপলব্ধি করতে পারবে অন্যের মনের চাহিদা।

আকবর তবে কি খাদ্যবস্তু নষ্ট করে দিল ঐজন্যে? ভৃত্যের ওপর রাগ করে আপন লোকের আক্রোশ মেটাল! তাই যদি হয়, তাহলে সে ভুল করেছে! সামান্য বেতনভোগী ভৃত্যের অপরাধ কোথায়? অপরাধ যদি কিছু থাকে, তাহলে সে অপরাধ আকবরের পরমাত্মীয়ার। মা যদি তাকে ভুল বুঝে থাকে, অন্যে তার ফলভোগ করবে কেন?

কিন্তু রাগ মানুষকে চণ্ডালে পরিণত করে? তাছাড়া আকবর রাজবংশধর। তার ক্রোধের পরিমাণ একটু মাত্রাধিক্য হওয়াই স্বাভাবিক। তাই বোধ হয় তার অভিমান ক্রোধে পরিণত হয়ে একটা বিপ্লব অঙ্কিত করলো।

একটি স্বল্পদীর্ঘ শ্বেতমর্মরখচিত কক্ষের হর্মতলে বসে যুবতী এক রমণী। এখনও সূর্য অস্তমিত হয় নি। আছে দীপ্তি। সে দীপ্তিতে আছে সেই আগের মতই রোশনাই। তবে সূর্য মধ্যগগনে ঢলে পড়েছে বলে কিছু তাপ ম্লান হয়েছে। উত্তপ্তভাব মন্দগামী হলেও পূর্বগৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নি। যে বৃহৎ পুরুষ একদিন তাকে একবার দেখে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, সেই যুবতীর রূপই তার আছে, শুধু মাঝের যা একটু সময়, সে এমন কিছু নয়। কালের ছোঁয়া লেগে সমুদ্রের পারে ঢেউ লেগেছে বটে। বয়স হয়তো তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে কিছু চিহ্নের জন্য কিন্তু সে চিহ্ন এমন কিছু নয়। এখনও বহু পুরুষের হৃদয়াকাশে ঝড় তুলতে পারে এ রমণী।

কিন্তু সেই রমণী তার যৌবনের দোসর, ইহজীবনের দেবতা, পরলোকের শান্তির জন্যে হর্মতলে বসে প্রিয়বিচ্ছেদের বেদনায় রোদন করছে। ভাবছে ষোলটি বছরের স্মৃতি। ষোলটি মুক্তার মালার গ্রন্থি একটি একটি করে মোচন করছে, আর ছুটে আসছে কত সজীব স্মৃতি। স্বামীকে কাছ ছাড়া কখনও সে করে নি। যখনই সে কাছ ছাড়া করেছে, তখনই যেন মনে হয়েছে দারুণ এক বিচ্ছেদ; আজ সেই বিচ্ছেদ চিরকালের। আর সেই স্বামী তার কাছে আসবে না। তাকে আদর করে নাম ধরে ডাকবে না। সোহাগ পরিয়ে দেবে না আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করে! সুখে দুঃখে আপন সঙ্গী করে বিপদে আশ্রয় চাইবে না তার কাছে। সমস্ত পরিসমাপ্তি

একদিন এরই সংলগ্ন বাইরের সোপানে সংঘটিত হয়ে গেছে। তিনদিন বেঁচেছিলেন তিনি। তিনদিন ছিলেন এই কক্ষের এই জায়গায়, যেখানে আজ সে বসে তাঁকে একমনে ডাকছে। এখানে একদিন তাঁর প্রাণবায়ু এই পৃথিবী থেকে চলে গেছে। আর ঐ ঘাসের জমিনের নীচে তাঁর নশ্বরদেহ চিরনিদ্রার মাঝে লীন হয়ে শুয়ে আছে। আর ডাকলে কথা বলবেন না। স্পর্শ দিলে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নেবেন না।

কিন্তু তাঁর চির সুকুমার দেহটি দেখারও সাধ মিটলো কই? সংবাদ যখন পৌঁচেছিল, সে অনেক পরে। বিলম্ব সে এতটুকু করে নি। স্বামীর শেখানো অশ্বেই সওয়ার হয়ে দ্রুত চলে এসেছিল কিন্তু পথ তো কম নয়? তবু বিলম্ব হয়েছিল। আর শুনলো, গোপনে বাদশাহকে মাটিচাপা দেওয়া হয়ে গেছে। কারণ শত্রুপক্ষ জানবার আগেই এ কাজ করা হল এইজন্যে, বাদশাহ মারা গেছেন কাউকে জানতে দেওয়া হবে না। নকল বাদশাহ সিংহাসনে বসে রাজ্যশাসন করছেন।

নকল বাদশাহ। নকল হুমায়ুন শাহ! তার স্বামী, সেই সুপুরুষ জোয়ানব্যক্তির নকল অবয়ব! এ কেমন করে হয়? শোকে মুহ্যমান হয়ে হামিদা চীৎকার করে বলেছিলেন—বন্ধ কর এই বেসরম ফিকির! বাদশাহ হুমায়ুন একজন হতে পারে, আর সেই তিনি। জগতে তাঁর দ্বিতীয় নেই। তিনি অদ্বিতীয়। তখনই হামিদার মনে হয়েছিল, এমন মানুষের বুঝি দোসর আর হয় না। যৌবনে যে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, অনুতপ্ত হয়ে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। প্রায়শ্চিত্ত শুধু নয় যে সাহস, যে শ্রম, যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, পৃথিবীতে বুঝি তার কোন তুলনা নেই!

চাক্ষুস দেখা। লোকমুখে শোনা নয়। মানুষটির সেই প্রতিদিনের রোজনামচা দেখলে বিস্ময়ই জাগে। পত্নী না হয়ে যদি নিত্যের সহচরও হতেন, তাহলেও বুঝি সহানুভূতি জাগতো। আর সে নিজে পত্নী। শয়নে, স্বপনে, তন্দ্রায়, জাগরণে যার অঙ্গের সাথে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ ছিল। আজ চোখ দিয়ে শুধু জল ঝরে, যখন সেই মানুষটি বিপদের মুখে পথ খুঁজে পেতেন না।

তারই এই দুই বাহুর মাঝে নিজেকে সঁপে দিয়ে ক্রোড়ে মুখ লুকিয়ে রণনিপুণ সেই যোদ্ধা বালকের মত দিশেহারা হয়ে পথের সন্ধান চাইতেন—'বিবি, পথ বলে দাও। চিরাগ জ্বালা দেও। কোন পথে গেলে পারবো আমি পিতার স্বপ্নের রাজ্য হিন্দুস্থান উদ্ধার করতে?' ছন্নছাড়া সেই মানুষ নিজের জীবনরক্ষার জন্যে পথ চাইতেন না, হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে। 'পিতার রাজ্য আমি অক্ষম সন্তান রক্ষা করতে পারি নি! আমি কর্তব্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছি। পিতা আমার জীবন রক্ষার জন্যে নিজের জীবন ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেছেন। আর আমি অকৃতজ্ঞ। উপযুক্ত পিতার অনুপযুক্ত সন্তান।'

শুধু তাঁর এই সওয়াল। শুধু তাঁর এই আপসোস।

সেই মানুষের জন্যে আজ মন হাহাকার করবে না! কেউ না জানুক, সে তো তাঁর অন্তরের সবকিছু জানতো। জানতো বলেই আজ সবকিছু মনে হচ্ছে নিরর্থক।

এমন বিচ্ছেদ বুঝি আর কারো হয় না। এমন বেদনা বুঝি আর কারো জীবনে আসে না।

একটিবার যদি তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হত! ঘাসের আস্তরণ সরিয়ে, মাটির রুদ্ধদ্বার খুলে ফেলে একটিবার তাকে দেখতে দেবার জন্যে অনুরোধ করেছিল কিন্তু কেউ তার কথা শোনে নি। কেউ তার মনের ভিতরটা দেখে নি। অবশ্য কবর সরিয়ে দেবারও নিয়ম নেই। তাতে মৃতদেহের প্রতি অবিচার করা হয়। না হয়, একবার অবিচার করা হল। পৃথিবীতে তো নিত্যনতুন কত অবিচার সংঘটিত হচ্ছে।

একদিন এই মানুষটিকে সে শাদী করতে চায় নি। ষোলবছর পূর্বের সেই ঘটনা। এখনও উজ্জ্বল। এখনও স্পষ্ট। যাঁরা রাজা, বাদশাহ তারা অনেক উপরের মানুষ। ঐ আসমানের ওপরে তারা বাস করে। তাদের কাছে সামান্যরা পৌঁছতে পারে না বলেই তার ধারণা ছিল। অন্তত রাজপরিবারের সেই বিরাটত্বের চেয়ে একজন সামান্য লোকের আন্তরিকতা অনেক মূল্যবান। বাদশাহের সঙ্গে শাদী হলে অন্তঃপুর বাদশাহের খাসকক্ষ থেকে অনেকদূর। বিনা আদেশে কখনও কেউ কারও কাছে যেতে পারবে না। তাও নিয়ম মাফিক।

নিয়মের বাইরে ছাড়া দয়িতের সঙ্গে মিলতে পারবে না বলেই বাদশাহকে প্রথমে প্রত্যাখান করেছিল।

তার মনে ছিল স্বপ্ন! সুন্দর একটি স্বর্গীয় স্বপ্ন মনের মধ্যে খেলা করে বেড়াতো। একটি সুপুরুষ নওজোয়ানের আকৃতি যথেষ্ট পুলক সৃষ্টি করতো। হামিদার মনেও পুলকের সঞ্চার হয়েছিল, সেও ভালবেসেছিল কিন্তু তার প্রত্যাখান অন্যকারণে।

প্রথমত হুমায়ুন সেই বয়সে বহু রমণী ভোগ্য। দ্বিতীয়ত বাদশাহের বিরাটত্ব। তৃতীয় কারণও অবশ্য ছিল তবে সে কারণ এখানে আর লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। যা অতীত, তা অস্তমিত। তার কোন স্মৃতি নেই। হিন্দাল অবশ্য মনে মনে আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতো। সাক্ষাত কোন আবেদন প্রকাশ করে নি। তবে সময়ান্তরে হয়তো পাণিগ্রহণ করতো। তখন শুধু মৌনমনের মিলন। পূর্বরাগের আবেগ মূর্ছনা। তার জন্যেও হামিদার মনে কিছু সঙ্কোচ উপস্থিত হয়েছিল।

তবে হিন্দালের মাতা দিলদার সৎপুত্র মাহামের সোহাগ নাসীরউদ্দীনের জন্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। নাসীরউদ্দীন হুমায়ুনের আদরের নাম ছিল। আপন মাতা মাহাম বেগম যে নামে হুমায়ুনকে ডাকতেন সেই নামে দিলদারও ডাকতেন। মাহাম ছিলেন বাবর শাহের পাটরাণী। তিনি ছিলেন পরিবারের কর্ত্রী। বাবর শাহের অনেক পত্নী ও উপপত্নী ছিল কিন্তু মাহামের মত কেউ নয়। সেই মাহামের পুত্র হুমায়ুন। সবার জ্যেষ্ঠ। মাহামের কোন কন্যাসন্তান ছিল না বলে তিনি দিলদারের কন্যা গুলবদনকে পোষ্য নিয়েছিলেন। এই দিলদার মনে মনে সপত্নীর প্রতি ঈর্ষান্বিতা ছিলেন, তবু কখনও প্রকাশ করেন নি। শুধু কন্যা গুলবদনই নয়, হিন্দালও মাহামের দত্তক পুত্র ছিল।

আজ সেই মাহাম নেই, কোন ঈর্ষাও নেই। অথচ একদিন এই মাহামই স্বামীর

অবর্তমানে পরিবার প্রতিপালনের গুরু দায়িত্ব বহন করেছিলেন কিন্তু সেও বা কদিন? অনাথ পুত্রকন্যাদের ভার এই দিলদারকেই নিতে হয়েছিল। স্মৃতিকে মুছতে হয়েছিল।

হুমায়ুন পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান, তার প্রতি অনেকেরই মোহ থাকা স্বাভাবিক। দিলদারেরও ছিল।

হুমায়ুন তখন রাজ্যহারা হয়ে একদিকে ভ্রাতাদের ষড়যন্ত্র অন্যদিকে দুর্দান্ত শত্রু শূরবংশীয় নৃপতি শেরশাহের ভয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন। সিন্ধুপতির আশ্রয় প্রার্থনা চেয়ে লাঞ্ছিত ও প্রতারিত। সেই সময় হিন্দাল মাতাকে নিয়ে মূলতানের কাছে পাট নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেছে। এখানেই ছিল হামিদা বানু। দিলদারের স্নেহের শান্তছায়ায়। হিন্দালের সুফী গুরু মীর্জা আকবর জামীরের সুন্দরী কন্যা। উদ্দেশ্য অবশ্য অন্য ছিল। হয়তো শেষপর্যন্ত সেই সঙ্কল্প কাজে পরিণত হত যদি না হুমায়ুন এসে বাধা সৃষ্টি করতেন।

হুমায়ুন সেই কিশোরীর রূপমাধুর্য ও প্রস্ফুটিত যৌবনতনু দেখে কেমন যেন হতচকিত হলেন। হৃদয়ে তখন তাঁর রাজ্যহীনের বিক্ষোভ। নিরাপদ আশ্রয়ের চিন্তা। সর্বোপরি তাঁর জীবনে তখন শান্তি ছিল না। সেইসময় এই রমণীসৌন্দর্য তাকে বিমুগ্ধ করলো। যার আশ্রয় নেই, সে চায় শাদী করতে।

হামিদার রূপলাবণ্যই এর জন্যে দায়ী। হামিদা এমন এক কুসুম কোমল গোলাপ ফুলের মত বর্ণশোভা বিকিরণ করেছিলো, যার মধ্যে ছিল চির অশান্তির শান্তি। বিক্ষুব্ধ মনের ছায়াঘন সবুজ বর্ণ দীপ্তি।

ছিল হয়তো তার মধ্যে যৌবনের অশান্ত জোয়ার। সীমাহীন উত্তপ্ত মনের তপ্ত কামনার দাহিক শক্তি। পুরুষ যা দেখলে স্বভাবত পাগল হয়, ছুটে যায় সোহাগরঞ্জন পরিয়ে সেই রমণীকে সম্ভোগের মাঝে আকর্ষণ করতে—হামিদার সে সবই উপকরণ ছিল, তবু যেন তার চেয়ে স্থিতির কল্পনাই প্রধান। হুমায়ুন সে সময়ে ভাবলেন, এই রমণীকে জীবনের সঙ্গিনী করলে তার তিক্ত জীবনের প্রাণপ্রাচুর্যই সঞ্চিত হবে। একটি নিরাপদ আশ্রয় মিলবে।

তাই প্রথম সাক্ষাতে হামিদার তিনি হস্ত আকর্ষণ করেছিলেন। ব্যাকুলকণ্ঠে জানিয়েছিলেন তাঁর মহব্বতের সঙ্গীতময়বাণী। অন্তর থেকে নিঃসৃত হয়েছিল এক প্রার্থনার আকুতি নয়, তার জীবন রক্ষার জন্যে একটি পরম নির্ভরতা।

অন্তরের ভাষা বুঝি সব অন্তরের স্পর্শ পায়। বালিকা হামিদা সেই কথা শুনে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু মুহূর্তে পালিয়েছিল অন্যকথা চিন্তা করে। তাছাড়া ছিল প্রচণ্ড সরম। লাজরক্তিম সরম তার সমস্ত গণ্ডে সিঁদুর আভা ছড়িয়ে তাকে পলায়নে সাহায্য করেছিল।

আজ সে সব কথা ভাবলেও যেন ভাল লাগে। কেমন যেন সেই সেদিনকার মোহ এসে আবার হৃদয় চঞ্চল করে তোলে!

হামিদা সেদিন আনন্দিত হয়েছিল কিন্তু আনন্দের চেয়ে ভয়ই তাকে কেমন ভীরু

করে তুলেছিল। দিলদারের কাছে শোনা আছে, এই বাদশাহের অনেক কথা। দিলদার প্রশংসাই করেছিলেন। বীরের সম্মানই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। স্নেহদান করে আরো স্নেহ অপরের মনে সৃষ্টি করে অপরিচিত ব্যক্তিকে পরিচিত করে দিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তি আজ এসেছেন। অনুরাগ সৃষ্টি হওয়া কি স্বাভাবিক নয়?

কিন্তু হামিদা জানালো প্রতিবাদ, হয়তো মহব্বতে যে বাধা, সেই বাধা সৃষ্টি করে দয়িতের মন পরীক্ষার জন্যে সে জানালো তার অভিমত।

আজ হামিদা সেইজন্যে বলেন, সেদিন পরীক্ষার জন্যেই তিনি ঐ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। নিখাদ প্রেমের আকর্ষণই আলাদা, যিনি তাকে ভালবেসেছেন, তার মোহ সাময়িক কিনা দেখবার জন্যে এই কৌশল। সেদিন যদি তিনি বিমুখ হয়ে চলে যেতেন, হয়তো তার অন্তর দগ্ধ হয়ে লীন হয়ে যেত।

খোদা তাকে সেদিন বিমুখ করেন নি, তার জন্যে আজও সহস্র কোটি ধন্যবাদ।

হামিদা চেয়েছিলেন বাদশাহকে নয়। চেয়েছিলেন একটি বিশুদ্ধ অন্তর, উদার হৃদয় আর নিবীড় ভালবাসা। পেয়েছিলেন তিনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে। যৌবনের অঙ্গার যখন তাকে বার বার দগ্ধ করতো, তখন স্বামীর সোহাগের আলিঙ্গন তাকে মুগ্ধ করতো। তিনি স্বামী সুখে সোহাগিনী ছিলেন।

'তিনি যে স্পর্দ্ধাভরে বলেছিলেন, তাঁর বাহু যাঁর কণ্ঠলগ্ন হতে সমর্থ হবে, তাঁকেই তিনি পরিণয়পাশে আবদ্ধ করবেন। এমন কাকেও তিনি স্বামীত্বে বরণ করবেন না, যার বস্ত্রপ্রান্ত স্পর্শ করতে তাঁর হস্ত পৌছবে না।'

এই ভয় তার ভবিষ্যতে আর ছিল না। হুমায়ুন বহু রমণীতে আসক্ত হলেও পত্নীপ্রেমে কখনও অবহেলা প্রকাশ করেন নি। বরং সেখানে তিনি বাদশাহ ছিলেন না। সেখানে ছিলেন একজন পত্নীপ্রাণ সাচ্চা মরদ।

কত কথাই আজ বিরহকাতর মনে স্মৃতির মত জেগে ওঠে। ধূপ পুড়ে গেছে কিন্তু তার সৌরভ মিলায় নি। সেই সৌরভ বুঝি হৃদয়ের সমস্ত বিড়ম্বনাকে নতুনভাবে শোককাতর করে যন্ত্রণা সৃষ্টি করছে। গিয়েছিলেন তিনি কাবুলে মির্জা হাকিমের মায়ের কাছে হৃদয়ের জালা নির্বাপিত করতে কিন্তু থাকতে পারেন নি। হারিয়েছে তারই যে বেশী। তার শোক কার অন্তর স্পর্শ করবে? কে বুঝবে তার বেদনা? কে দেবে তেমনিভাবে সান্ত্বনা?

নেই, নেই, কেউ নেই। পৃথিবী আজ অসার শূন্য। সেইজন্যেই তিনি রাজসিক প্রাসাদ থেকে নির্বাসন নিয়ে এই স্মৃতিবিজড়িত স্বামীর শেষ আশ্রয়ের স্থানটিতে নিজেকে এনে স্থাপন করেছেন। কিন্তু তাতেও যেন আরো হাহাকার। আরো হাহুতাশ। আরো শোকের নিদারুণ নীলবর্ণ বেদনা।

রাজপুরীতে ফিরে তিনি অন্তঃপুরে একবারও যান নি। কেমন যেন আজ তাঁর লজ্জা। যেন শত লজ্জা তাঁকে ঘিরে সম্পূর্ণ এককজীবন গ্রহণে সাহায্য করেছে। তাঁর মনে হয়, পৃথিবীতে যে ঐশ্বর্য আছে, যে দৌলত রোশনাইতে ভরিয়েছে ভুবন, যে

সৌভাগ্য এখনও থরে থরে চতুর্দিকে সজ্জিত, তার ভাগিনী হওয়ার অধিকার আর তাঁর নেই! তাই তিনি ঐশ্বর্যমণ্ডিত অন্তঃপুরে আর প্রবেশ করেন নি।

এ মুখ আর কাউকে দেখাতে চান না! এ আকৃতি কারুর কৃপা পেয়ে সহানুভূতির রঙে রঞ্জিত হবে, এ প্রত্যাশাও তিনি করেন না! একদিন তাঁর যে সৌভাগ্য ছিল, জগতে আর কারুর ছিল না। আজ তার সে সোহাগ অস্তমিত। অন্যের উপহাস তাঁর অন্তর দগ্ধ করবে। সেইজন্যে তিনি সবার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চান। ঈর্ষা নয়, ঈর্ষা তাঁর নেই। জগতের নিয়মের বৃত্তেই তিনি নিজের সবকিছু উৎসর্গ করেছেন। বুদ্ধিহীনা তিনি নন। বুদ্ধি আছে বলেই স্বামী হারার বেদনা তাকে ভুলতে দিচ্ছে না। প্রিয় মিলনের সেই নিরবিচ্ছিন্ন সুখ অন্তর্হিত হচ্ছে বলেই অন্তর হাহাকারে ভরে যাচ্ছে!

তিনদিন গত হল এই একাত্মকক্ষে। এখানে কেউ নেই। বৈরাম খান সংবাদ পেয়ে নিজে এসেছিলেন। কিন্তু হামিদা তার সামনে উপস্থিত হন নি! পরিচারিকার দ্বারা বলে পাঠিয়েছেন, আমার কোন অভাব নেই। আপনি বৃথা দুশ্চিন্তা মনে পোষণ করবেন না, আমি ভাল আছি।

তবু বৈরাম খান মৃত সম্রাটের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তার প্রিয়তমা পত্নীর জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। পাঠিয়েছেন মূল্যবান পোষাক, আরামদায়ক কেদারা, মূল্যবান শয্যা। ব্যবহারের জন্যে নানা দাসী সামগ্রী। কিন্তু সে সব দেখে মনে মনে হামিদা বিরক্ত হয়েছেন। কে এসব রাজবৈভব চেয়েছে আরামের জন্যে? ফেরৎ পাঠিয়ে তিনি ভৃত্যদের কড়া হুকুম দিয়েছেন। এখানে কারুর আসার দরকার নেই। আমার প্রয়োজন কিছু নেই। আমি শুধু একলা থাকতে চাই।

তবু একজন পরিচারিকা থেকে গেল। প্রাসাদপুরী থেকে এই মহলটি অনেক দূরে। যদি হঠাৎ কিছু প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাহলে মহিষী অসুবিধায় পড়তে পারেন। এই ভেবেই পরিচারিকাটি হামিদার নিষেধ প্রত্যাখান করেও থেকে গেল। শেষপর্যন্ত হামিদা সেই পরিচারিকার সঙ্গ স্বীকার করলেন কিন্তু তার বেশী নয়।

হামিদা সমাহিত হলেন আপন ধ্যানের মাঝে। রাজপুরী থেকে রাণীর উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী পাচিকা বয়ে নিয়ে এল কিন্তু হামিদার সেই ধ্যানস্থমূর্তি দেখে কেউ তাঁকে সজাগ করতে সাহস করলো না। পড়ে থাকলো রাজসিক খাদ্যবস্তু।

হামিদা এই তিনদিন ধরে অল্প আহার ও সামান্য নিদ্রা গ্রহণ করলেন। বেঁচে থাকতে হবে বলেই এই গ্রহণ। বেঁচে না থাকলে বুঝি ভালই হত। স্বামীর পাশে চিরশয্যায় শয়ন করে চিরসুখের মধ্যে চক্ষু বুজতে পারলেই বুঝি মিলতো শান্তি।

এই তিনদিনে তার শরীর অনেক শুষ্ক হল। অনেক ম্লান হল দেহলাবণ্য! ব্যথার চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ হয়ে কেমন যেন স্ফীতকায় হয়ে গেল। সুন্দর মুখখানির ওপর কেমন যেন নেমে এল যোগিণীর রূপ। যোগিণীই বটে! যার বসন ছিল রাজসিক! যিনি সর্বদা বাহারে রঙীন পোষাক ছাড়া পরতেন না। সাজতেন সুন্দর করে। মণিমুক্তার

অলঙ্কারে দেহ অলঙ্কৃত করে রাখতেন। চোখে সুর্মা, অধরে গোলাপীরং, গণ্ডে সিঁদুর রাঙা, হাতের তালুতে মেহেদী শোভা। একমাথা রেশমের চুলে হাজার রকম বিন্যাসের কেরামতি।

সেই বিলাসিনী রমণী আজ নিরাভরণে একটি কালো কাপড়ে নিজেকে আচ্ছাদিত করে সব মোহ থেকে সরিয়ে নিয়েছেন।

আজ যেন নতুন করে আবার বাদশাহ হুমায়ুন শাহ মারা গেলেন। হামিদার শোকের প্রাবল্যে রাজপুরী যেন নতুন করে মৃত বাদশাহের শোক অনুভব করলো। তাই রাজপুরী হল স্তব্ধ!

এরই মধ্যে একদিন প্রত্যুষে আকবর এসে মায়ের দরজার সামনে দাঁড়ালো।

অভিমান আর ধরে রাখতে পারে নি রাজকুমার। মাতার শোকের কথা শুনে সব অভিমান তার অপসারিত হয়েছে। বরং মনে হয়েছে, পিতার মৃত্যু সত্যিই আকস্মিক। এই আকস্মিকতার জন্যেই সবার শোক ঘনীভূত হওয়া স্বাভাবিক। এতদিন হয় নি, তার কারণ বাদশাহের মৃত্যুতে রাজপরিবারের মাঝে সর্বনাশের রূপ ফুটে উঠেছিল। ভীষণ দর্শনা কালো দূত এসে সব অন্ধকার করে দিতে চেয়েছিল। তাই বাদশাহের বিচ্ছেদে শোক প্রকাশ করার অবসর মেলে নি। তখন হামিদার দিকে দেখারও অবসর ছিল না।

আজ প্রিয়তমা পত্নীর শোকোচ্ছ্বাসে নতুন করে শোকের ঢেউ লাগলো রাজপরিবারে। আকবর রাজপুরীর চতুর্দিকে সেই ছায়া দেখে আর অভিমান নিয়ে থাকতে পারে নি, ছুটে এসেছে মায়ের কাছে। মাকে সান্ত্বনা দেওয়া কি তার কর্তব্য? কি জন্যে সে এসেছে, তা জানে না, তবে আসবার জন্যে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় তাকে উৎসাহী করে তুললো, তাই সে এলো।

পিতার জন্যে তার কি কোন বেদনা নেই? সেকথা এখানে অবান্তর, কারণ তার শোকের কাল বহুপূর্বে গত হয়েছে! কান্না তার সহজে আসে না। একদিন সে পিতৃশোকে ক্রন্দন করেছিল, যখন ফকির নূরউল্লা কান্নার গীত পরিবেশন করে তার মন দ্রবীভূত করেছিল।

আজ কাঁদতে গেলে, শোক করতে গেলে উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন। নূরউল্লা আবার না গান গাইলে তার দু'চোখে জল আসবে না। চোখে জল আসবে না। চোখে জল অনেকের অনায়াসে আসে, আবার চোখের সামনে অতি প্রিয়জনের মৃত্যু দেখলে আসে না। আকবর দ্বিতীয় পরিপন্থির মানুষ।

কিন্তু কাতরতা জাগলো মাতার জন্যে। রাজপুরীর সকলের মুখে শুধু মহিষী হামিদার কথা। বেগম আজ স্বামীর শোকের জন্যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। আরাম পরিত্যাগ করে ভিখারিণী হয়েছেন। কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দিয়ে এমন এক ভূমিকার পরিচয় দিচ্ছেন, যা রাজপরিবারের আতঙ্ক।

শুনে মায়ের জন্যে আকবরের মন উতলা হয়ে উঠলো। আর অভিমানী হয়ে চুপ করে নিজের পরিধির মধ্যে কাটাতে পারলো না।

একদিন হামিদা কোন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি। এমন কি পরিচারিকার মুখ পর্যন্ত দেখেন নি। তিনি শুধু আঁখি মুদে স্বামীর প্রিয় মুখখানি দেখবার চেষ্টা করেছেন। অনুভূতির মধ্যে স্বামীর সুখ গ্রহণ করবার চেষ্টা করে আরো নিঃশব্দ হয়েছেন। রাজ্য নয়, রাজত্ব নয়, দৌলত, ঐশ্বর্য, বিলাসিতা, জাঁকজমকতা কিছু নয়—শুধু সেই মৃতমানুষের পুনরুজ্জীবন। যেন মরেও তিনি সজীব হয়ে প্রিয়তমার কাছে আসেন।

হঠাৎ আকবরকে চোখের সামনে দেখে তিনি চমকিত হলেন, তখন তাঁর মনে পড়লো, তিনি তো শুধু স্বামী সোহাগিনী পত্নী নন, তিনি যে মা জননী, গর্ভধারিণী। পুত্র নিজে এসে তার অবস্থান প্রকাশ করে নি, স্বামী অন্তরালে থেকে পুত্রকে পাঠিয়ে তাকে সচেতন করে দিয়েছেন। তিনি নেই, আছে তাঁরই ঔরসজাত সন্তান, তাঁর রক্তের সম্বন্ধ, তাঁর আকৃতির হুবহু প্রতিবিম্ব। এখন এই পুত্রের মাঝে নিজেকে অন্তরীন করলে তাঁর প্রতি ভালবাসাই প্রকাশ করা হবে। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ হামিদার ভাবান্তর ঘটলো, তিনি দু'হাত বাড়িয়ে পুত্রকে ব্যাকুল হয়ে কাছে ডাকলেন, বেটা, মেরে বেটা!

আকবর মনে প্রাণে তখনও শিশু, তখনও তার হৃদয় মাতৃস্নেহের জন্যে ব্যাকুল। সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। কেমন যেন শিশুর মত ছুটে গিয়ে মাতার প্রসারিত হাতের মধ্যে নিজেকে ধরা দিল।

মাতা-পুত্রের মিলন হল। কোথায় বুঝি কোন অন্তলীনে নীহারিকার ওপারে তূর্যধ্বনি হয়ে উঠলো। শঙ্খধ্বনি হল নিঃশব্দে কোন্ নিস্তব্ধপুরীর প্রকোষ্ঠে প্রতিধ্বনি তুলে। কিছুক্ষণ ধরে কেউ কোন কথাই বললো না। হামিদা বললেন না, নিঃশব্দ অনুভূতিতে তাঁর হৃদয় পূর্ণ হয়েছিল বলে। আকবর বললো না, তার অন্তরে কিসের যেন ঢেউ ছাপাছাপি হয়ে তাকে পূর্ণ করে দিয়েছিল বলে। এই মাতৃস্নেহের জন্যেই বোধ হয় একদিন আকবর মুঘল বংশের সবচেয়ে বড় আসনটি অলঙ্কৃত করেছিল। তৈমুর কি তাঁর মাকেও এমনিভাবে ভালবাসতেন? তৈমুরের নামও তো মুঘল বংশের সবার মুখে মুখে। তাঁকে অনুসরণ করার জন্যে মুঘলদের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। তারপর বাবর শাহ। ভারতবিজয়ী বাবর শাহ্ জীবনের অর্ধশতাব্দী শুধু রণাঙ্গনেই অতিবাহিত করেছেন। তিনি সে শক্তি পেলেন কোথায়? তাঁব মা নিগার খানুমকে কি তিনি ভালবাসতেন না?

আকবর শুধু মাকেই ভালবাসতো। মায়ের জন্যে তার মনের তলে কিসের যেন আলোড়ন। জীবনের অধিক সময় তার ধাত্রীমাদের হেফাজতে কেটেছে, মাকে সে খুব অল্প সময় কাছে পেয়েছে বলে হয়তো এই ব্যগ্রতা!

আর সেইমুহূর্তে সন্তানের জন্যে হামিদার মনে পড়লো বিগতদিনের একটি স্মৃতি। তখন এই সন্তানকেই একমাস বয়েসের সময়ে ফেলে তাদের পালাতে হয়েছিল। স্বামী ও তাঁর এই পুত্রের জন্যে একই দুরবস্থা।

স্বামীকে সেদিন তাঁর কঠিনই মনে হয়েছিল। নিজেদের জীবন রক্ষার জন্যে

ভাইয়ের হাতে বাঁচতে গিয়ে একমাসের শিশুকে ফেলে পলায়ন। ভ্রাতা আসকারী হত্যা করেনি তাই, যদি করতো যদি সেদিন এই সন্তান হারাতো, তাহলে আজকে কি নিয়ে জীবন কাটতো ?

স্বামীর ওপর সত্যিই তাঁর সেদিন রাগ হয়েছিল। অশ্বে সওয়ার হয়ে যখন ঁারা পারস্যাভিমুখে এগিয়ে চলেছেন. বার বার তিনি অশ্ব থেকে নেমে যেতে চেয়েছেন।

আমার পুত্র, আমার বেটা। তুমি আমাকে সেই শিবিরেই ফিরিয়ে দিয়ে এস। আমার পুত্রের সাথে আমায় যদি হত্যা ক'রে কোন ক্ষতি নেই। তুমি কেন আমাকে জোর জবরদস্তি করে আনলে ?

স্বামী পূর্বে কোন কথাই বলেননি। কোন সান্ত্বনা, কোন প্রতিবাদ।

হঠাৎ চন্দ্রলোকের আলো মেঘের অন্তরাল থেকে প্রকাশ হল। ওঁরা একটি উন্মুক্ত ক্ষেত্র দিয়ে ছুটে চলছিলেন। একই অশ্বের ওপর দুজনে সওয়ার হয়েছিলেন। হামিদা সামনে, হুমায়ুন পিছনে। চন্দ্রের আলো ওঁদের ওপর পড়তে হামিদা স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাক্যস্ফূরণ বন্ধ হয়ে গেল।

বাদশাহ হুমায়ুনের দু'চোখ গড়িয়ে জল নেমে এসে পুরুগণ্ডের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে হামিদা বুঝতে পারলেন, কাকে তিনি আঘাত দিয়ে চলেছেন ? যার ক্ষত অনেক বেশী, তার কাছ থেকে সান্ত্বনা পাওয়া মুস্কিল, তেমনি তাকে আঘাত করাও অন্যায়। তিনিও যে সদ্যজাত পুত্রের জন্যে নিঃশব্দে কেঁদে চলেছেন।

হুমায়ুন একসময় বললেন, জুলিবিবি, তুমি আমার অপরাধ নিও না। এছাড়া পথ ছিল না বলেই এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছি। তোমাকে ওখানে রেখে এলে আসকারী তোমার সম্মান রক্ষা করতো না। শুধু শিশুকে ফেলে এলাম এইজন্যে যে, যদি শিশুর মুখ চেয়ে দুশমন ভ্রাতা তার তরবারী রুদ্ধ করে। অন্তত শিশুর কুসুম কোমল মুখ দেখে শয়তানেরও রক্ত শীতল হয়।

শুধু অনুমানের ওপর জীবন রক্ষা। হতেও পারে, নাও হতে পারে। সোহাগ ছিন্ন হতেও পারে, আবার রক্ষা পেতেও পারে। অনুগ্রহের সেতু।

সেদিনের সেই সে আতঙ্ক—আজ মনে এলে এখনও যেন কেমন হৃদ্‌কম্প হয়। যদি সেদিন আকবর হত হত ?

হামিদা পুত্রের দিকে তাকিয়ে আবার তার দেহে নিজের হস্তস্পর্শ দিলেন। আজ আবার তার মনে সেই কম্পন এল।

এ কম্পন পারস্য সাম্রাজ্যে অবস্থান করেও দমিত হয় নি। পারস্য সম্রাট শাহ তহমাস্পের নিরাপদ আশ্রয়ে যতই তাঁরা আদর যত্ন পেয়েছেন, এই শিশু আকবরের জন্যে ততই তাদের চিত্ত বিকল হয়েছে। উদ্বিগ্ন হয়েছেন। একটি সংবাদের জন্যে সমস্ত মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়েছে। সে কি বেঁচে আছে ? শয়তান চাচা আসকারী ভ্রাতুষ্পুত্রকে ক্ষমা করে বাঁচতে সাহায্য করেছে ?

হুমায়ুনও সেদিন কম ছটফট করেন নি। বার বার পারস্য সম্রাটকে উদব্যস্ত

করেছেন, আপনি কোন লোক পাঠিয়ে একটু সংবাদ নিন। আমার শয়তান ভ্রাতা আমার পুত্রকে হত্যা করে আমার ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে কিনা!

কিন্তু পারস্য সম্রাটের তখন কোন উপায়ই ছিল না খবর এনে দেওয়ার। উত্তর ভারতের চতুর্দিকে তখন আফগানরা তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছে। দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ব্যক্তি শেরশাহ দিল্লীর সিংহাসনে আসীন। এদিকে মুঘল বংশধররা ভ্রাতৃবিরোধে লিপ্ত, মীর্জা বেগেরা খণ্ড খণ্ড ভূখণ্ড অধিকার করবার জন্যে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত সংগ্রাম চালিয়ে চলেছে।

এই সময়ে কোন পারস্য সৈন্য ভারতবর্ষে প্রবেশ করলে প্রাণ নিয়ে ফেরবার উপায় থাকবে না। সুতরাং সংবাদ আনা দুষ্কর বলেই পারস্যসম্রাট ভিন্নভাবে দুই স্বামী স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

পারশ্য সম্রাটের সেই আতিথ্য আজও ভোলবার নয়। আজও বার বার মনে পড়ে হামিদার—সম্রাট শাহ তহমাস্পের কথা, তার ভগিনী সুলতানামের কথা। কি সুন্দর সেই রমণী ছিল সুলতানাম। সম্রাটের ভগিনী বলে এতটুকু অহঙ্কার ছিল না। যেমন রূপ ছিল তেমনি ছিল গুণ। চন্দ্রের জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ রূপ, এতটুকু উগ্র নয়। উগ্র নয় বিলাসিতার প্রাচুর্য। অথচ উগ্র আভিজাত্যে পূর্ণ ছিল রাজপুরীর মহলগুলি! অন্তঃপুরের রমণীরা ছিল অলঙ্কারের রাণী। জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে থাকতেই তাঁরা ভালবাসতেন কিন্তু বর্তমান সম্রাট ও তার ভগ্নী যেন অন্য মানুষ। অন্য ধাতুতে গড়া।

ভগ্নী সুলতানাম অমায়িক ব্যবহার নিয়ে হামিদাকে ও সম্রাট শাহ তহমাস্পের দৃষ্টি সর্বদা মুঘল বাদশাহ হুমায়ুনকে ঘিরে। এই অতিথি দম্পতি কিসে পুত্রবিচ্ছেদ বিস্মৃত হয়ে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন সেদিকে সর্বদা দৃষ্টি। মহানুভব শাহ তহমাস্প শোকসন্তপ্ত সম্রাটকে প্রফুল্ল রাখবার জন্যে নিত্য নব আমোদের ব্যবস্থা করতেন। শিকারের আয়োজন করে সম্রাটকে ভুলিয়ে রাখতেন।

শিকারে যখন হুমায়ুন যেতেন হামিদাও তার সঙ্গ ত্যাগ করতেন না। অশ্ব, উষ্ট্রপৃষ্ঠে বা দোলারোহণে মৃগয়ার উল্লাস উপভোগ করতে যেতেন। সঙ্গে শাহজাদী সুলতানামও অশ্বারোহণে তাদের অনুসরণ করতেন।

এই করেই সেদিন পুত্রবিচ্ছেদ ভোলবার চেষ্টা করতে হয়েছে। পারস্যের সেই দুই ভ্রাতা ও ভগ্নী যদি এমনভাবে সান্ত্বনা দান না করতো, তাহলে আকবরের সংবাদের জন্যে ও তার মুক্তির জন্যে হয়তো আসকারীর কাছে গিয়েই উপস্থিত হতে হত। আসকারী বোধ হয় সেই আশা করেই ভ্রাতুষ্পুত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর দুষ্কার্য করে নিজেদের জীবন বিপন্ন করতে হয়নি বলে আজ সবচেয়ে ধন্যবাদ সেই ভ্রাতা ও ভগ্নীকে দেওয়া উচিত।

সেই সন্তান আজ আস্তে আস্তে বেড়ে উঠছে। সেই সন্তান আজ মুঘল সাম্রাজ্যের উজ্জ্বল সিংহাসন অলঙ্কৃত করবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। পিতার মতই রণনিপুণ, পিতামহের মত শক্তিশালী, তৈমুরের মত দুর্ধর্ষ হবে বলেই যেন শরীরে তার আভাস

ফুটে উঠছে। হামিদা আকবরের পৃষ্ঠদেহে সস্নেহে হাত বুলিয়ে ধীরে ধীরে নিম্নস্বরে বললেন—বেটা আকবর। মেরে বেটা আকবর। অনেক কথা মনে এল কিন্তু কোন কথাই তিনি বলতে পারলেন না। কণ্ঠের কাছে কি যেন ঢেলার মত এসে তার সব কথা রুদ্ধ করে দিল।

তারপর অনেক পরে আবেগদমিত কণ্ঠে নিম্নস্বরে বললেন—বেটা পারবি? পারবি তুই মুঘল বংশের মুখোজ্জ্বল করতে! তুই আমার গর্ভজাত সন্তান, তোর পিতার হৃদয় মনের উচ্ছ্বাস। তোর ওপর মুঘলবংশের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আমার সম্মান রক্ষা করে তুই পারবি শক্তির পরিচয় দিতে? পিতা, পিতামহ সমস্ত পূর্বপুরুষদের শক্তিকে ম্লান করে নতুন এক কীর্তি, নতুন এক খ্যাতি।.........তুই যদি পারিস, তাহলে আজকের এই শোক আবার শান্ত হবে। আমি আবার তোরই জন্যে নতুন করে উৎসাহ আহরণ করবো।

আকবর মাথা নত করে বললো, কসম খাচ্ছি আম্মা। যদি না পারি নিঃশব্দে সরে যাবো। মুঘল বংশকে কলঙ্কিত করতে জীবিত থাকবো না।

আবেগের উচ্ছ্বাসে হামিদা বানুর চোখে জল এসে পড়লো, সস্নেহে বিচলিত হয়ে বার বার পুত্রের হাত ধরলেন, তার গণ্ডে স্নেহচুম্বন দিলেন।

আকবর তাকিয়ে থাকলো মায়ের দিকে একদৃষ্টে। কি যেন সে দেখতে লাগলো? কোন্ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে সে তুলে নিয়ে এল পৃথিবীতে নতুন এক শক্তির আধার। বুঝতে পারলো শক্তিরূপিনী শক্তিময়ী তার পাশে থাকলে সে মুঘল বংশের নতুন এক কীর্তি ঘোষণা করতে পারবে। সে কীর্তি বুঝি এ পর্যন্ত কেউ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। মসজিদে মসজিদে, দরজায় দরজায় ঘরে ঘরে তাকে নতুনরূপে বন্দনা করবার জন্যে বসে যাবে খোদার মত প্রার্থনা করতে। অন্ধকার থেকে আলোর উজ্জ্বল তারা যেমনি রহস্যময় রাত্রিকে অলঙ্কার পরায়, তেমনি তার কীর্তিতে অলঙ্কারের মত উজ্জ্বলতা প্রতিভাত হবে।

সেই অদৃশ্য লোকের স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠা ভবিষ্যতের চিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে কিশোর আকবর কেমন যেন তৃপ্তি পেল। জানে না সে তার সেদিন আসবে কেমন করে? সে দুর্গম পরিখা সে পার হয়ে কেমন করে সমুদ্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে, মানুষের মনে আনবে শান্তি। শত্রু তার ভয়ে বশ্যতা স্বীকার করে শক্তি দমিত করবে, মাথা নত করে নিবেদন করবে নিজেদের কর্মক্ষমতা।

এক বিস্তৃত আকাঙ্ক্ষা। বিরাট এক পর্বত সমান প্রত্যাশা।

এই সূত্রে তার মনে পড়লো পিতামহ বাবর শাহকে। পিতামহের আত্মজীবনীতে লেখা আছে একটি বিরাট আশাবাদী মনের ছবি। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের কল্যাণ। যুদ্ধ করে শত্রু ধ্বংস করে রাজ্যজয় করা অবশ্য বীরের ধর্ম কিন্তু অন্যায়ভাবে মানুষের ওপর অত্যাচার করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। তিনি সুযোগ পেলেই কবিতা রচনা করতেন কিন্তু কবিতার কোথাও তার এতটুকু রক্তের দাগ ছিল না, বরং থাকতো স্নিগ্ধ সবুজ মনের একটি ছায়া ঘন পত্রপল্লবিত প্রতিচ্ছবি।

এমনি মনই আকাঙ্ক্ষা করতে হবে। এমনি একটি আদর্শকেই বুকে পোষণ করে তরবারী ধারণ করতে হবে। গীতের সুধায় মন ভরিয়ে অসির ঝনঝনানিতে আনতে হবে রণতাণ্ডব। মানুষকে হত্যা করতে হবে, মানুষকে ভালবাসতে হবে। ভালবাসার স্বর্গরচনার করে মানুষের শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রত্যাশা করতে হবে। তবে মিলবে আকাঙ্ক্ষিত যশ, কীর্তির উজ্জ্বল শিখা সূর্যের উজ্জ্বলতার সাথে মিশে নতুন এক ইতিহাস রচনা করবে।

হঠাৎ আকবর উঠে দাঁড়িয়ে মায়ের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে নামাজের ভঙ্গিতে বললো, দুনিয়ায় আপন বলতে আমার তুমি। তুমি পাশে থাকলে আমি অসাধ্য সাধন করতে পারবো। পিতা আমাকে শিখিয়ে গেছেন অসি চালনার কৌশল। তুমি দেবে আমার সেই অসিতে অপরাজেয় শক্তি। আমি কসম খাচ্ছি, পিতার সম্মান, তোমার সম্মান ও মুঘল বংশের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবো।

হামিদা বানু চোখের জল মুছলেন। স্বামীর উদ্দেশ্যে দূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁকে মনে মনে প্রার্থনা করলেন। মনে মনে বললেন, আমাকে নতুন বসন পরতে সাহায্য কর। নতুন শরীর দান কর। নতুন মনে পুত্রের কল্যানের জন্যে কর্তব্য করতে দাও। এছাড়া উপস্থিত আর কোন প্রার্থনা নেই। আর তুমি সর্বদা মৃত্যুর পরপারে থেকে ছায়ার মত পাশে থেকো! যদি বেহেস্ত বলে কিছু থাকে, তাহলে তুমি সেই বেহেস্তে আত্মমগ্নে বিভোর না থেকে তোমারই প্রিয়তমার সুখের জন্যে যত্নবান হোয়ো।

হামিদা বানু আবার রাজপুরীতে ফিরে এলেন। সেখানে প্রতীক্ষিত আত্মীয়-স্বজন তাঁর আগমনের জন্যে ব্যগ্র ছিল। মহিষীর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ শুনে মহলে মহলে নতুন এক সাড়া পড়ে গেল। মন্ত্রী, সেনাপতি, উজীর, নাজির, সরকার, বাবুর্চি প্রভৃতি কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে হয়ে উঠলো। হঠাৎ নহবতখানায় ইমনকল্যাণ সুরে সানাই বেজে উঠলো। মঙ্গল পারাবত মুঘল সাম্রাজ্যের বার্তা নিয়ে নীল আকাশের নীলিমার সুদূরে বিলীন হল।

মঙ্গল ধ্বনি উচ্চারিত হল। মঙ্গল বাদ্যে চতুর্দিক ভরে উঠলো। এ কদিন মহিষীর শোকে রাজপুরী কেমন যেন শোকাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। মহিষীর প্রত্যাবর্তনে সেই শোক অপসারিত হয়ে আবার নতুন রাগিনীতে চতুর্দিক ভরে উঠলো।

আবার নতুন এক শিক্ষক এসে আকবরের কক্ষে প্রবেশ করলো। রক্ষী জানালো,

জনাব, মন্ত্রী খানসাহেব, ও মহিষীর ইচ্ছায় এই মৌলভী সাহেব আপনার শিক্ষার ভার গ্রহণ করবেন।

মীর আবদুল লতিফ সেই শিক্ষক। পারস্যদেশীয় লোক। বৈরাম খানের বিশেষ অনুরোধে সাবালক সম্রাটকে শিক্ষা দিতে এসেছেন।

আকবর ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করে তাকিয়ে থাকলো সেই শিক্ষক ব্যক্তির দিকে কিন্তু দেখতে দেখতে কেমন যেন তার মোহসঞ্চার হল।

পারস্যদেশীয় লোকটির আকৃতিতে কেমন যেন এক কমনীয়তা। মুখখানি কেমন যেন সুন্দর। চোখ দুটিতে কি যেন এক বুদ্ধির দীপ্তি। একমুখ দীর্ঘ দাড়ির জঙ্গল, তবু যেন সেই জঙ্গল ভেদ করে বের হচ্ছে নতুন এক জ্যোতির সূর্য। এমন বুদ্ধিদীপ্ত লোক সেজীবনেও কখনও দেখে নি। এমন আকৃতির মানুষ এই রাজপুরীতে একটিও নেই। তবে কি শিক্ষার ধর্মই এই? অনেক জ্ঞানের রশ্মি মনের মধ্যে চাপা না থেকে বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ে? সে যদি প্রচুর অধ্যয়ন করতে পারতো? কিন্তু রসহীন এই অধ্যয়নের মাঝে কোন আনন্দ নেই বলে বচমন থেকেই সে অধ্যয়ন করতে পারলো না। গ্রন্থ দেখলেই তার কেমন যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়।

অথচ পিতা তার মুঘল নিয়ম অনুযায়ী শিশুকালেই শিক্ষারম্ভের ব্যবস্থা করেছিলেন! চার বৎসর, চার মাস, চারদিন বয়সে তার মকতব আরম্ভ হয়। শিক্ষক একটি নয় বিভিন্ন পাঠের জন্যে তেরোটি। পীর মহম্মদকে পিতা বিশেষ ক্ষেত্র থেকে যোগাড় করেছিলেন। তিনি আরবী, ফার্সী ভাষা বিশেষভাবে জানতেন এবং বহু জ্ঞানগর্ভ কিতাব মুখস্ত করে আবৃত্তি করতে পারতেন। কোরাণেও বিশেষ দখল ছিল।

এই পীর মহম্মদ পরিবারের অনেকেরই শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছিলেন। এমন কি মুঘল শাহজাদীরা চিকের আড়াল থেকে, পীরমহম্মদের কাছ থেকে কোরাণের শ্রুতিমধুর ব্যাখা শুনতেন। পরে এই পীরমহম্মদ আর শিক্ষকতা করেন নি, রাজকার্যের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন।

কিন্তু আকবর এই পীরমহম্মকে সহ্য করতে পারতো না। মিঞাসাহেবের প্রধান দোষ, তিনি প্রতিদিন হস্তলিপি অভ্যাস করাতেন। আর আকবরের মনে হত, পৃথিবীতে এইটি সবচেয়ে দুরূহ কাজ। হস্তলিপি অভ্যাসের মত একঘেয়ে কাজ আর দুনিয়াতে নেই। অথচ পীরমহম্মদ বলতেন, শিক্ষার প্রধান অঙ্গ এইটি। এই যদি শিক্ষার প্রধান অঙ্গ হয়, তাহলে আকবরের শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্তির পথে। কারণ ধৈর্য ধরে আরবী ও ফার্সী হরফগুলি সুন্দর করে বসাতে গিয়ে মনে হত, এর চেয়ে অসি চালনা অনেক সহজ কাজ। অথচ আকবরের অসাধারণ স্মরণশক্তি। কোন কিছু শুনে মুখস্ত বলায় তার কোন কষ্ট ছিল না।

পীরমহম্মদ যখন বিখ্যাত ফার্সী কবি সাদির গুলিস্তাঁ ও বুলিস্তাঁ মুখস্ত বলতেন, আকবরের কণ্ঠস্থ। ঐ শিশুর মুখে পরিবারের লোকেরা সাদির কবিতা মুখস্ত শুনে চমকিত হত কিন্তু লেখাপড়ায় উৎসাহ কম দেখে নিরুৎসাহ হত।

আজও আকবরের মনে আছে. পিতা তার এই শিক্ষার অবহেলা দেখে পূর্বপুরুষদের কথা ব্যাখা করে তাকে ভৎর্সনা করতেন কিন্তু করলে কি হবে? কিতাবের হরফগুলি পঠনের চেয়ে যে অন্যকিছু করতে সবচেয়ে উৎসাহ জাগে, এ কে বুঝবে?

পায়রা পোষা, শিকার করা, ঘোড়ায় চড়া, তীর ছোঁড়া, অসি চালনাতে আজও উৎসাহী। যত বয়স এগিয়ে চলেছে, আকবর বিদ্যাচর্চার চেয়ে এইসব ক্রীড়াতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। এ অবশ্য তার জীবনের একটি প্রধান দুর্বলতা। মুঘল পরিবারের বৈশিষ্ট্য বিদ্যাচর্চা। সেই বৈশিষ্ট্য সে বজায় রাখতে পারল না।

কিতাব দেখলে কেমন যেন তাদের শত্রু মনে হয়। অথচ মুঘল পরিবারের জন্য ভিন্ন একটি গ্রন্থাগার সর্বদা তাদের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। অবসর সময়ে অধিকাংশ রমণী-পুরুষের পুস্তক অধ্যয়ন একটি প্রধান কাজ। পরিবারের রমণীরা পর্যন্ত সেই অভ্যাস আয়ত্ব করে চলেছে। বেগমরাও পর্যন্ত তার ব্যতিক্রম নয়। যত বয়স বাড়ছে, আকবরের জ্ঞানোন্মেষ হচ্ছে, সে তার অভাব বুঝতে পারছে। মানুষ সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করতে গেলে সর্ববিষয়ে পারদর্শী হওয়ার দরকার। সে যদি কোনদিন মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে, আর যদি শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে নাম রাখতে চায়, তাহলে তাকে বিদ্যাচর্চা অভ্যাস করতে হবে। মুঘল পূবপুরুষরা যাঁরাই ইতিহাসে নাম অঙ্কিত করেছেন, তাঁরা সকলেই সুপণ্ডিত ছিলেন।

আজ সবই বোঝে নবীন সম্রাট্ আকবর শাহ। বয়স তার নিম্নগামী হচ্ছে না, উধ্বর্গামী হচ্ছে। বয়স যখন বাডছে, তখন বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ হচ্ছে। বুঝতে পারছে অভাবটা। কিন্তু উপায় কি? যা তার মনের উৎসাহ বর্ধন করে না, স্পৃহা জাগায় না বরং রক্তের কোথায় যেন শীতলতার স্পর্শ অনুভূত হয়, সেই কাজ যত উন্নতির পরিপন্থী হোক্—কি করে তা করা সম্ভব?

তাই আবার শিক্ষক সামনে দেখে তার ভুরুদ্বয় কুঞ্চিত হয়েছিল।

কিন্তু আবদুল লতিফকে দেখে হঠাৎ তার সে ভাব অন্তর্হিত হল। সে সুমিষ্টহাস্যে মুখ উদ্ভাসিত করে বললো—বন্দেগী আলি জাঁ।

মীর আবদুল লতিফও তাঁর ছাত্রকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলেন। মুঘল রাজ্যের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই যুবক একদিন নিজ বাহুবলে সমগ্র দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হবে, অথবা শত্রুর এক আঘাতে যমুনার অতল জলের তলায় ডুবে যাবে আজকের জেগে ওঠা এক টুকরো হীরক। শিক্ষিত মানুষ শিক্ষার চোখ দিয়ে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখছিলেন। হঠাৎ আকবর গুরুকে অভিবাদন করতে গুরুও ছাত্রকে হাত তুলে কুর্নিশ করে বললেন—বন্দেগী জাঁহাপনা!

আকবর মৃদুহাস্যে এবার বললো, আপনার মত একজন পণ্ডিতব্যাক্তির সঙ্গ পেয়ে আমি যথেষ্ট আনন্দ বোধ করছি কিন্তু আপনি কি শোনেন নি—মুঘল পরিবারের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করতে আমি অক্ষম? অর্থাৎ আমি মূর্খ হয়ে সমস্ত মুঘল পূর্বপুরুষদের অপমান করেছি। কিতাবের নীরস অক্ষরগুলি যখন চোখের সামনে ভাসে মনে হয় যেন সেগুলি মৃত ঘৃণ্যকীট, মরেও তাদের দংশন ক্ষমতা বিলুপ্ত হয় নি। সেই কঠিন

কীটবিশিষ্ট নীরস অক্ষরগুলির মর্মোদ্ধার করে কিছু উপলব্ধি করা আমার সাধ্যতীত। তাই তাদের দেখে ও আপনাদের দেখে আমি নিরুৎসাহ বোধকরি। আমার এই দুর্বলতার জন্যে আমাকে ক্ষমা করুন।

মীর আবদুল লতিফ যখন কথা বলেন, তখন বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলেন। তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আমি পারস্যদেশীয় একজন শুভবুদ্ধি সম্পন্নব্যক্তি, জীবনে আমি বহুলোকের সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু নবীন জাঁহাপনার মত এমনি আর কাকেও দেখি নি। এমন স্বীকারোক্তি কে করে? যার হৃদয় এমনি উদার তারই তো মহত্ত্ব প্রকাশ পায়! মূর্খ কি কখনও তার পরিচয় উন্মোচন করে? বরং বিদ্বান ব্যক্তির মত অভিমানই মনের ওজন বাড়ায়।

তারপর থেমে আবদুল লতিফ বললেন—আমি জাঁহাপনাকে কোন নীরস কিতাবের ব্যাখান মুখস্থ করতে উৎপীড়িত করবো না। আমার পঠনপদ্ধতি অন্যধরণের। মনের প্রসার বাড়ে, চোখের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়, অথচ জ্ঞানোন্মেষের পথ সুগম করে এমনি পাঠই দেব। আমাকে যদি শিক্ষক মনে কর, দোস্ত মনে কর, তাহলে খুশি হব।

আকবরের প্রথমেই এই নবনিযুক্ত শিক্ষককে পছন্দ হয়েছিল। এখন তাঁর কথা শুনে আরো উল্লসিত হল। মনে মনে এমনি একটি ব্যক্তিকেই সে প্রত্যাশা করছিল। মনের মধ্যে অনেক কথা এক একসময় আসে, অনেক ছবি এক একসময় ফুটে ওঠে কিন্তু তার প্রকাশ হয় না। এমনি একজন আপনব্যক্তি, অথচ যিনি জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, ব্যক্তিত্বে মহান, বয়সে বড়—কাছে থাকলে মনের কথা খুলে বলা যায়! সরম এসে কণ্ঠরোধ করে না। তার দেখা পেয়ে শিক্ষার চেয়ে সঙ্গ প্রার্থনায় খুশি হয়ে আকবর বরণ করে নিল।

দুজন যুক্ত হল তার জীবনের একটি সন্ধিক্ষণে। একজন ফকির নূরউল্লা ও অপরজন এই শিক্ষিত ব্যক্তি মীর আবদুল লতিফ।

আবদুল লতিফ এরপর ছাত্রকে 'সুলেহ কুল' শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। পুস্তকের কোন গুরুগম্ভীর ব্যাখান নয়, বিশ্বশান্তির মন্ত্র। মানুষের কল্যাণ। শুভবুদ্ধির আদর্শ জীব ও জগতের নির্বাণ কল্পনায় নতুনভাবের উন্মেষ।

মন পবিত্র হল নবীন সম্রাটের। দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন এক স্বচ্ছ নীলিমার রঙ লাগলো। রাজপুরীর কোলাহলের মাঝে, মানুষের স্বার্থে যেখানে স্পষ্ট, সেখানে কোন সুদূর তুষারমৌলি শিখর থেকে নেমে এল এক জ্যোতির্ময় রূপ। সম্রাট আকবর কখনও প্রত্যহ নামাজ পড়তো না, হঠাৎ সে নামাজের ভঙ্গিতে বসে সেই জ্যোতিময় রূপের প্রার্থনা করতে লাগলো।

আবদুল লতিফ ছাত্রের কানে কানে বললেন—এই জ্যোতিময় রূপ চোখের তৃপ্তিই শুধু নয়, মনের বিকাশের জন্যে এর প্রকাশ কিন্তু তুমি পৃথিবীর মানুষ, তোমাকে দুর্গন্ধময় পঙ্কের ভেতর থেকে পঙ্কজকে তুলে আনতে হবে, তারপর এই রশ্মির প্রভাবে জড়িয়ে নিয়ে তাকে যোগ্য করে তুলতে হবে। কিন্তু ক্ষেত্র বড় দুরূহ।

অনাচার, মিথ্যাকথা, ভেদাভেদ, রাহাজানি, প্রবঞ্চনা ; ব্যভিচার সমস্ত কিছু নিয়ে এই পৃথিবী। তাদের ঘৃণাও করতে পারবে না, উপেক্ষা করতে পারবে না। এদের বন্ধু করেই এদের ভেতর থেকে ঈশ্বরের সেই মহাণকীর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

এখনও আকবরের সেই বুদ্ধি হয় নি, সব কথা তার বোধগম্য হয় না। তবু ভাল লাগে। আবদুল লতিফকে শিক্ষক বলেই মনে হয় না। কেমন যেন উৎসাহ এনে দেন। এই যদি শিক্ষার মন্ত্র হয়, তাহলে সে শিক্ষা মুঘল রাজকুমার গ্রহণ করবে।

ভোরের আলো তখনও ফোটে নি, সবে কিশোরীর যৌবন ফোটার মুহূর্তের মত। রক্তিমাভা। আকবর প্রত্যহের মত প্রাসাদ ছেড়ে চলেছে অনেকদূর। দ্রুত তার গতি। এই অভ্যাস অনেকদিনের।

রাত্রির শেষ প্রহর থাকতে যখন আসমানে শুকতারাটি ললাটে টিপের মত জ্বলে, আকবর নিদ্রা পরিত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। এই সময় অশ্ব তার তৈরী হয়ে সহিস জলমান খাঁর সামনে প্রভুর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। আকবর সাধারণ সৈনিকের পোষাকে বেরিয়ে আসে, সঙ্গে কোন দেহরক্ষী থাকে না, সম্পূর্ণ একা ও নির্ভীক।

একবার সে শুধু আসমানের দিকে তাকিয়ে শুকতারাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। রাত্রির শেষক্ষণ কিনা দেখবার চেষ্টা করে কিন্তু তারপরেই শেষ প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি প্রাসাদ প্রকম্পিত করে প্রতিধ্বনি তোলে। প্রত্যহ এমনি হয়। আকবর নিঃসন্দেহ হয়ে অশ্বের ওপর লম্ফ দিয়ে উঠে বসে। জলমান খাঁ সেলাম পেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে আকবরের অশ্বক্ষুরের শব্দ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। ঘুমন্ত প্রাসাদের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে আকবরের অশ্ব দুর্দাম হয়ে ওঠে।

প্রত্যহ রাত্রি শেষযামে এমনি ধ্বনি হয়। রাজপুরীর সকলেই জানে, কে এমনি সময় বাইরে চলে যায়? তাই বিশেষ আর কেউ সচকিত হয় না। সারা রাত্রি ডিউটি দেবার পর যে সব রক্ষীরা ঘুমে ঢোলে, তারা মাঝে একটু সচকিত হয়— নবীন সম্রাট ভ্রমণে বেরিয়ে গেলে আবার নিদ্রা, এই ভেবে তারা হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। তারপর অন্ধকারে শূন্যের উদ্দেশ্যে সেলাম পেশ করে আবার নিদ্রার কোলে হারিয়ে যায়। ওরা বাদশাহকে দেখতে পায় না, শুধু শব্দকে অনুসরণ করে সেলাম জানায়।

কিশোর আকবর তখন তেজীয়ান অশ্বের ওপর শক্তিমান সওয়ার। লাগামের চর্মরশি দুটি হাতে চেপে ধরে পায়ের রেকাব দিয়ে অশ্বের উদরে আঘাত হানছে।

শিক্ষিত অশ্ব, সে জানে এই আঘাতের উদ্দেশ্য কি? সেও উল্কার বেগে ক্ষুরের ধ্বনি জাগিয়ে ছুটছে।

সিংহদরজার সীমানা ছাড়িয়ে সামনেই সড়ক পথ। সেই পথ লাহোর পর্যন্ত চলে গেছে। পথের দু'ধারে সারি সারি বৃহৎ বৃক্ষের ঘন আড়াল। দেবদারু, সাইপ্রাস, বটবৃক্ষ নানান বৃক্ষের সমান সজ্জা। পথের এই সজ্জা শূরবংশীয় নৃপতি শেরশাহের কীর্তি।

তখনও অন্ধকার ঘন। চাপ চাপ অন্ধকারের কুহেলী চতুর্দিকে দৃশ্যমান। এখনও প্রত্যূষের আলো বরণডালা নিয়ে উদয় হয় নি। তবে উদয়ের পূর্বাভাস। প্রত্যহ কিশোর আকবর চলতে চলতে এই আলো ফোটার ক্ষণটি দেখতে থাকে। যেন জননী-জঠর থেকে শিশু ধীরে ধীরে ধরণীর বুকে নেমে আসে। গতি অশ্বের দুর্বার। পথে কোথাও সে থামে না। দুর্বার গতিতে চলতে চলতেই সে দেখতে থাকে পূর্বাকাশে উষার উদয়।

ধীরে ধীরে অন্ধকার পশ্চিমে লগনে সরে যায়। দূরে বহুদূরে নীলিমার নভপ্রদেশ থেকে ফুটে ওঠে মেঘের বুকচিরে একটুকরো আলোর প্রকাশ। তারপর সেই আলো আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিক। স্নিগ্ধ যে আলোর বিন্দুগুলি যেন সমুদ্রের জলে স্নান করে উষার প্রতিলিপি নিয়ে উদয় হয়। এই ঐশ্বরিক প্রকাশ দেখতেই বুঝি আকবর আসে। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অবর্ণনীয় রূপমাধুর্য উপভোগ করার শিক্ষা আকবর পেয়েছিল পিতা হুমায়ুনের কাছ থেকে। তিনি একদিন এই মুহূর্তে নিদ্রাভঙ্গ করে বাইরে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি প্রত্যহ এই সময় বাইরে যেতেন। আকবর রহস্যের সন্ধান পেয়ে আর নিদ্রার কোলে থাকেনি, প্রত্যহ কেউ নিদ্রা থেকে জাগ্রত না করলেও তার নিদ্রাভঙ্গ হয়। সে আপন থেকেই উঠে অশ্বে সওয়ার হয়ে চলে আসে এই মুক্তপ্রদেশে। যেখানে নেই কোন দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, বিপ্লব। আছে মুক্তির এক অনাবিল আস্বাদ।

আকবর এই মুহূর্তটিতে যেন নতুন এক জীবনের আমোদ পায়। যেন হীরা, চুনি, পান্নার মত দ্যুতি নয়, তার চেয়েও উজ্জ্বল, তার চেয়েও অবর্ণনীয়।

সেদিনও আকবর শিক্ষাগুরু মীর আব্দুল লতিফের বাণী মনে ধারণ করে চোখের ওপর উষার প্রথম লগ্ন প্রত্যক্ষ করছিল। আর ভাবছিল, কী সুন্দর এই দুনিয়া! মানুষ কেন এই সুন্দর পৃথিবীতে শুধু শয়তানের রূপ পরিগ্রহ করে? দুনিয়া সবার। এখানে নেই কোন শ্রেষ্ঠত্বের হুমকি। শ্রেষ্ঠ সকলে। অধিকার সকলের। তবে কেন অধিকারের জন্যে এই হানাহানি?

হঠাৎ আজানের বিলম্বিত স্বর কানে গিয়ে প্রবেশ করলো। আকবরের চিন্তাধারা ছিন্ন হল। সে দেখলো, সে দাঁড়িয়ে আছে যমুনার কিনারে। যমুনার নীলজলের ওপর পড়েছে উষার প্রথম রক্তিম চুম্বন। আসমানে ছুরির ফলার মত ধারালো বিদ্যুৎ। সোনালী জরির কাজ করা বসন কে যেন পরে দাঁড়িয়ে আছে নীল জলের কিনারে।

এই যমুনার ধারে অনেক মসজিদ। বিরাট বিরাট গম্বুজওয়ালা মসজিদে পাঠান সম্রাটের কীর্তিই ঘোষণা করছে। ফিরুজ শাহ তুঘলকের সেই পুরোণো কীর্তি। তুঘলকাবাদের ঐতিহ্য এখনও ম্লান নয়। লোকে এখনও দিল্লীকে তুঘলকাবাদ বলে।

আকবর যেখানে অশ্বপৃষ্ঠে বসে অপেক্ষা করছিল, ঠিক তারই সামনে একটি মসজিদ। মসজিদটির নির্মাণ কৌশল বড অদ্ভুত। হিন্দুর ভাস্কর্যের নক্সা মসজিদগাত্রের সর্বত্র, এমন কি উপরের গম্বুজের নির্মাণও অনেকটা হিন্দুর মন্দিরের ধরণের।

মসজিদটি যে মন্দিরকে ভেঙে নির্মিত হয়েছে, এইতে প্রমাণিত হয়।

কিশোর আকবর তখনও পরিণত মনের অধিকারী হয় নি বলে ধর্ম পরিবর্তনের এই নজিরে মনে কষ্ট পেল। কেন এই ধর্মের সঙ্গে ধর্মের সংঘাত? হিন্দুর ধর্ম কি মুসলমানের ধর্ম নয়? মুসলমানের ধর্ম কি হিন্দুর নয়? তবে কেন এই পরিবর্তন? কেন এই ঈশ্বরকে নিয়ে মতবিরোধ?

উষার উদয়কালে নামাজের সেই গম্ভীর প্রাণদায়িণী সুরে আকবরের মনে কত কথাই জাগলো। প্রত্যহ এমনি সে মসজিদের ভেতর থেকে শোনে ঈশ্বরের অমৃতময় বাণী। মন পবিত্র হয়ে যায়। আজও তার তেমনি মনটি শুচিশুভ্র এক মহান অনুভূতিতে ভরে গেল।

ফকির নূরউল্লার সঙ্গীত মনে পড়লো। কয়েকদিন ধরে নূরউল্লা আর গীত পরিবেশন করে না। দারুণ জ্বরে তার কণ্ঠের সুমিষ্ট ক্রন্দনগীত শুষ্ক হয়ে গেছে। এখন ভগ্ন মসজিদের প্রাঙ্গণে শুয়ে সে জ্বরের ঘোরে আল্লাকে ডাকে। রাজবৈদ্য গিয়েছিল দাওয়াই দিতে কিন্তু সে দাওয়াই গ্রহণ করে নি! বলেছে, আমি সামান্য ব্যক্তি, রাজসিক দাওয়াই আমার দেহের উত্তাপ শান্ত করবে না। যিনি উত্তাপ দিয়েছেন, তিনিই গ্রহণ করবেন।

শুনে আকবর নিজে গিয়ে নূরউল্লার সামনে দাঁড়িয়েছে—ফকিরসাহেব, তুমি দাওয়াই গ্রহণ করবে না কেন?

উত্তাপে মুখখানি কালিমাবর্ণ হয়ে গেছে। চোখ দুটি রক্তবর্ণ। একটি স্তম্ভের পিঠে হেলান দিয়ে আড়ভাবে শুয়েছিল। বাদশাহকে দেখে উঠে বসবার চেষ্টা করলো কিন্তু শরীর দিল না সে কাজ করতে।

সেই দেখে আকবর তাড়াতাড়ি বললো, আরাম কর ফকিরসাহেব, উঠ না। আমি জিজ্ঞেস করতে এসেছি, তুমি দাওয়াই নিলে না কেন? তোমার গান আর কতদিন শুনতে পাব না। তোমার গান না শুনতে পেলে আমার যে দিল বিগড়ে যায়।

থোড়া দিন জনাব। ঔর থোড়া দিন গেলেই বিলকুল সব আচ্ছা হো যায়গা।

তবে দাওয়াই নাও।

ও বাত কভি নেহি। খোদা যো দিয়া হ্যায়, খোদাই লে লেগা।

কিছুতে নূরউল্লাকে আকবর দাওয়াই নিতে রাজী করাতে পারলো না।

সেই নূরউল্লাকে আবার মনে পড়লো। নূরউল্লাকে মনে পড়লেই তার সঙ্গীত

মনে আসে। সেই কণ্ঠ যেন সেই কটি গানের জন্যেই সৃষ্টি। এমনি সৃষ্টি বুঝি আর কখনও হয় নি।

একদিন মা হামিদাবানু তার কথা বললেন। বেটা, এই সঙ্গীত শিল্পীর বুঝি তুলনা হয় না। ওকে দীন-দরিদ্রের জীবন ত্যাগ করে রাজকার্যে বহাল করে দাও। কিম্বা গায়ক দলে নোকরী দিয়ে গীতমহলে নিযুক্ত কর।

কেন জানি মাতার কথা শুনেই আকবর শিউরে উঠেছিল। ফকির নূরউল্লা খাঁ গীতমহলে নোকরী নিয়ে গান গাইবে? এ যে কত বড় অসম্ভব, সে একমাত্র সেই জানে। মনে হয়, পরম আশ্চর্য কথা বুঝি এর চেয়ে আর কিছু নেই। মাতা যদি পুত্রকে ঘাতকের কাছে প্রেরণ করে হত্যার আদেশ দিতেন, তাহলেও বোধ হয় আকবর এত বিস্মিত হত না।

তাই মাতার কথার উত্তরে অসহিষ্ণুকণ্ঠে বলেছিল, তাহলে ফকিরের মৃত্যু হবে। আর ঐ গান ওর কণ্ঠে কখনও আসবে না। ঐ গান দৈন্যের গান, নিঃস্বের গান— ওখানে রাজসিকতার স্পর্শ লাগলে খোদাই সেই শক্তি কেড়ে নেবে।

কিশোর আকবর বুঝি এমন করে আর কাউকে বোঝে নি, যতটা বুঝেছিল ফকির নূরউল্লাকে।

উষার আলো পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। পক্ষীরা কলস্বরে ক্রীড়া করে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। আকবর প্রাসাদে ফেরার জন্যে অশ্বের মুখ ঘোরালো। আবার ছুটলো অশ্ব ঝড়ের বেগে।

ঝড় উঠলো পথের বুকে। দু-পাশে সুরম্য বৃক্ষের সারি। পত্রগুচ্ছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের রশ্মি এসে পথের ওপর খেলা করছে। আকবরের কণ্ঠে আসছে গান। সে নূরউল্লারই একটি গানের কলি গুন গুন সুরে গাইতে লাগলো। সবই ঈশ্বরকে নিবেদনের গান, সবই খোদার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি। কিন্তু তবু যেন প্রিয়তমের গান। খোদাই সেই প্রিয়তম না হয়ে যদি অন্য কেউ মানবী হয়, তাহলেও এই গান তাকে নিবেদন করা যায়।

যে ছিল একদিন অতীতে। দিয়েছিল সে অনেক সোহাগ, দিয়েছিল অনেক স্মৃতি। তার রূপ যৌবন, দেহের উত্তাপ দিয়ে বেহেস্তের সুখ প্রদান করেছিল, প্রতিটি বিনিদ্র রজনী সেদিন স্পর্শসুখের সহানুভূতিতে সে ভরিয়ে দিয়েছিল। সহস্র কোমল ওষ্ঠের চুম্বন ওষ্ঠে দিয়ে রচনা করেছিল নতুন এক স্বর্গ।

আজ সে নেই। কোন একদিন রজনীর নিশিভোরে নিদ্রিত দয়িতের পাশ থেকে উঠে চলে গেছে। প্রেম গোলাপ হয়েছে কিন্তু দেহের শোনিত মেখেছে সেই গোলাপ। গোলাপের সুরভি এখনও আছে। এখনও তার গন্ধসুবাস বিলিয়ে প্রাণমন আকৃষ্ট করে। এখনও রাত্রি স্বপ্নলোকের বসন পরিধান করে সুর্মাকাজল পরে হাতছানি দিয়ে ডাকে কিন্তু সে যে নেই, সেই প্রিয়তমা যে চলে গেছে রাত্রি জানে না।

নূরউল্লা গানের ভেতর দিয়ে সেই বিরহসঙ্গীত প্রকাশ করে। সে বার বার

ক্ষমা চায় সেই পলায়িতা প্রিয়তমাকে উদ্দেশ্য করে। বলে, আমি যদি অজ্ঞানে তোমায় কোন আঘাত দিয়ে থাকি, একবার মার্জনা কর। আর একবার আমাকে তোমার সান্নিধ্যলাভের সুযোগ দাও। যে মহান, সে যে নিজের গুণে অপরের দোষ ম্লান করে দেয়! অপরাধী যদি ক্ষমা চায়, তাহলেও কি তাকে ক্ষমা করা যায় না?

আসমানে কত আলো, সেই আলোতে প্রকৃতি অভিসারিকা হয়। রাত্রের তমিস্রার মাঝে প্রিয়তমা কাছে না থাকলে নিদ্রাও দু'চোখে নামে না। আজ কতদিন আমি নিদ্রাহীন জীবন যাপন করছি। আমার বসন মলিন হয়েছে, ছিন্ন হয়েছে। দেহ কৃশ আকার ধারণ করেছে। আহারে রুচি নেই। একদিন তো তুমি আমাকে ভাল বাসতে! আমার এতটুকু কষ্টে তোমার বুকে ব্যথা বাজতো। আজ আমি এত যন্ত্রণা ভোগ করছি, তবু তুমি নীরব কেন?

আকবর এই গীতের অর্থ বুঝে অনেকবার নূরউল্লা খাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি এখন রাজশক্তির সাহায্য পেয়েছ, তোমার সেই প্রিয়তমা কোথায় পালিয়ে গেছে বল না! একদল সৈন্য পাঠিয়ে তোমার কাছে তাকে আনিয়ে দিই।

নূরউল্লা খাঁ তার উত্তরে হেসেছিল। তারপর বলেছিল, বহুৎ মেহেরবানি শাহনসা! কিন্তু কোথায় পাঠাবেন বাদশাহী সৈন্যদের? সে কোথায় আছে তাই কি আমি জানি? পরে মাথা নীচু করে সলজ্জভঙ্গিতে বলেছিল—আর সে আমাকে গ্রহণ করবেই বা কেন? সে যে এখন দৌলতের রাণী। দৌলতের সিংহাসনে বসে মসলিনের বসন পরে নতুন মাশুখের জন্যে দিন গণনা করছে।

আকবর নূরউল্লার হেঁয়ালীপূর্ণ কথার অর্থ বুঝতে পারে নি। হঠাৎ বাদশাহী ভঙ্গিতে গর্জে উঠে বলেছিল—আলবৎ গ্রহণ করবে। আমি তোমায় তার মত উপযুক্ত করে দেব। আমাদের দৌলতখানা থেকে তোমার জন্যে যাবতীয় দৌলত আনিয়ে দেব। আম্মার অনেক ভাল পোষাক আছে, দেব তা থেকে অনেকগুলি। বল সে কোন রাজ্যে আছে, কার হারেমে আছে?

নূরউল্লা সেলাম জানিয়ে হেসে বলেছিল, বাদশাহ আপনি শান্ত হোন্। আমি আর তাকে চাই না। জোর করে কি কারও মহব্বত পাওয়া যায়? মন যখন ভেঙেছে, সে আর জোড়া লাগবে না। তারপর হেসে বলেছে—এসব ঝুট বাদশাহ। আমার কোথাও কেউ নেই। প্রকৃতির বিরহে আমি আত্মহারা। খোদার প্রেমে আমি অভিভূত। খোদার কাছেই আমার প্রার্থনা, সে যেন আমাকে ক্ষমা করে।

নূরউল্লা একটি চরিত্র। এ চরিত্রের মধ্যে যে কি আছে, সমুদ্রের মাঝে ডুব দিয়েও বুঝি পাওয়া যায় না। কিশোর আকবর তখন জটিল জীবনের কিছু বোঝে না তাই নূরউল্লার চরিত্র বুঝতে পারলো না। শুধু সে বুঝলো, একটি সজীব আদর্শ। এ আদর্শকে অনুসরণ করলে ক্ষতি হবে না, বরং লাভ হবে।

তাই বার বার অন্তরের মাঝে শূন্যতার সৃষ্টি হলে সে নূরউল্লাকেই ভাবে। নূরউল্লার সঙ্গীত তার হৃদয় মনের শক্তি বৃদ্ধি করে।

হঠাৎ তার কানে গেল একটি অশ্বক্ষুরের ধ্বনি।

আকবর সচকিত হয়ে তাড়াতাড়ি লাগাম ধরে অশ্বের গতি মন্থর করলো।

একটি পথের বাঁকে অন্য একটি পথের মিলন হয়েছে। সেই মিলনস্থানের চতুর্দিকে ঝাউবৃক্ষের বিস্তার। আরও আছে অনেক হরেক রকমের বৃক্ষরাজি।

সেই পথ দিয়ে একটি অশ্ব ছুটে আসছিল। আকবর দাঁড়িয়েছিল সেই পথের সঙ্গমস্থানে। দূর থেকে সেই অশ্বারোহী তাকে দেখে অশ্বের গতি মন্থর করে কোষবদ্ধ থেকে তরবারী বের করলো। সূর্যের আলোয় সেই তরবারী ঝলকে উঠলো।

আকবর মৃদুহেসে কোমরবন্ধ থেকে তরবারী বের করে দাঁড়ালো।

সামনে এসে উপস্থিত হল একটি অশ্বারোহী। কিন্তু ওকি? অশ্বারোহী তো একা নয়, তার পিছনে একটি লডকী! ওড়নার দোপাট্টা বাতাসে উড়ছে। মুখখানি দেখা যাচ্ছে না, তবে বোধ হচ্ছে সে ভয়ে অশ্বারোহীর পিঠে মুখ লুকিয়েছে।

তবে কি অশ্বারোহী একে নিয়ে পালাচ্ছে?

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আকবর গর্জে উঠলো—দুঃসাহসী সৈনিক, বশ্যতা স্বীকার কর, নতুবা এইমুহূর্তে তোমার শোনিতে পথের বুক রঞ্জিত হবে।

যুবক হঠাৎ হাঃ হাঃ করে অট্টহাস্য করে বললো—আমি রাজপুত, কাপুরুষ নই। তুমি আমার পথ ছাড়ো, নইলে আমিই তোমার শোনিতে এই হস্ত রঞ্জিত করবো।

হঠাৎ দুইবীরের অসিতে ঝঙ্কার উঠলো। দুজনেই অশ্বের ওপর বসে পরস্পরের অসি দিয়ে আঘাত হানলো। সূর্যের রশ্মির চন্দ্রাতপে ঝাউবাথিকার পথে যেন নতুন এক যুদ্ধের সূচনা হল।

রাজপুত যুবক জানে না সে কার সঙ্গে অসিযুদ্ধ করছে? দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধের বীভৎসতা তখনও অস্তমিত হয় নি। মুঘল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত যে ঐ দিল্লীর দুর্গের গম্বুজের মাথায় নিশান উড়িয়েছে, এ কে না জানে? পাঠানের প্রতাপ আজ শেষ হয়ে এসেছে, নতুন শক্তির উদ্ভব যেটুকু হচ্ছে, তাতে সমগ্র এশিয়া জয়ের পরিকল্পনা নিয়ে কেউ আর ভারতে শক্তিবৃদ্ধি করছে না। মুঘল শক্তি অনেকদিন ধরে মার খেয়ে খেয়ে নতুন এক সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে।

বাদ্‌শাহ হুমায়ুন যাবার পর হিন্দুস্তানের অন্যান্যরা ভেবেছিল, বুঝি মুঘল রাজ্যের অবসান হল। সেইজন্যে হিমুর উৎপত্তি। কিন্তু হিমু সাংঘাতিকভাবে পরাজিত হয়ে প্রমাণ করলো, মুঘল রাজ্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে মসীলিপ্ত নয়, বরং সমুজ্জ্বল। তাদের উন্নতি কেউ রোধ করতে পারবে না। বৈরাম খান উপযুক্ত অভিভাবক, তাছাড়া যুবরাজ আকবর কোন অংশে মুঘল সিংহাসনের অনুপযুক্ত নয়।

সেই আকবর দেহরক্ষীহীন অবস্থায় এক সামান্য রাজপুতসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছে! যদি হঠাৎ অতর্কিতে কোন আঘাত সম্রাটের প্রাণহানির কারণ হয়? কিম্বা যদি জানতে পারে রাজপুত সৈনিক, যে যার সঙ্গে যুদ্ধ করছে, সে আর অন্য কেউ নয়—স্বয়ং কিশোর সম্রাট আকবর। তাহলে কি সে একবারও চেষ্টা করবে

না সম্রাটের প্রাণ সংহার করতে? অন্তত জাতির কাছে, দেশের কাছে এই বাহবা নেওয়ার চেষ্টা থেকে কি বিচ্যুত থাকবে?

কিন্তু হঠাৎ দুজনেই অসিযুদ্ধ থামিয়ে দিল। যেমন কলের পুতুল হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে থমকে দাঁড়ায়, ঠিক তেমনি।

কিন্তু যোদ্ধা দুজনেই হঠাৎ থমকে গিয়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলো, তারা কেন থেমেছে?

রাজপুত যুবকটির পিছনে যে লড়কী সভয়ে আত্মরক্ষার জন্যে অশ্বের ওপর বসেছিল, তার চিল চীৎকারে তারা থেমেছে।

মেয়েটি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল বলে সে সভয়ে চীৎকার করে উঠেছিল।

এবার পরিশ্রান্ত আকবর উন্মুক্ত তরবারী হাতে সেই মেয়েটির দিকে তাকালো।

বারো-তেরো বছরের এক কিশোরী। এখনও যৌবনের পুরুছাপটি তার দেহকে ঘিরে ক্রীড়া করে নি। অর্থাৎ যৌবন এখনও দ্বারদেশে এসে উঁকিঝুঁকি মারছে। তবে কিশোরী পেয়েছে বেহেস্তের রূপ। এমন রূপসী মুঘল হারেমে বুঝি একটিও নেই। এই রূপ যখন যৌবনের পূর্ণ ছোঁয়াচ পাবে বুঝি চাঁদ আকাশে আর তার গর্ব প্রকাশ করবে না।

কিশোর আকবর সেই কিশোরীকে দেখে মুগ্ধ হল।

এবার সেই কিশোরীটি ভয়চকিত কণ্ঠে অথচ সাহস করে বললো—আমার ভাইজানকে তুমি বধ করছো কেন? ভাইজান বধ হলে আমাকে যে কেউ দেখবার থাকবে না, একি বুঝতে পারছো না?

শত্রুকে এই ধরণের কথা বলা শোভা পায় না বলেই হঠাৎ কিশোরীটি লজ্জিত হয়ে স্তব্ধ হল।

সে তাড়াতাড়ি তরবারী কোষবদ্ধ করে মুখে হাসি এনে বললো—এ যে তোমার ভাইজান, আমি তো তা জানতাম না। কিন্তু তোমরা কোথায় যাচ্ছ? কি উদ্দেশ্যেই বা ভ্রাতাভগ্নী এই প্রত্যুষে বিদেশী রাজ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছ?

তখন সেই রাজপুত যুবক বললো—আমরা ভাগ্যান্বেষী, চলেছি কোন কর্মের সন্ধানে। যেখানে কর্ম পাব সেখানেই আমাদের হবে অবস্থান, সে স্বদেশ বা বিদেশ হোক্। পররাজ্য হোক বা বিধর্মীর শাসিত হোক। নিজের দেশ যখন আমাদের জীবন ধারণের ক্ষমতা দিল না তখন আমাদের কোন স্বদেশ প্রীতি নেই। আমরা তাদেরই বন্ধু ভাববো, যারা আমাদের দুই ভাই-বোনের প্রতি কৃপা করবে। আমি রণনীতি জানি। যুদ্ধ আমাদের স্বধর্ম। তার প্রমাণ নিশ্চয় কিছুক্ষণের মধ্যে পেলেন। এবার আপনি বলুন আপনি কি আমাদের কোন সাহায্য করতে পারেন?

আকবর মনে মনে শিক্ষাগুরু মীর আবদুল লতিফকে স্মরণ করল। তাঁর আদর্শের বিশেষ সংজ্ঞাগুলি মনে আনল। পিতাকে স্মরণ করলো একবার। মা হামিদাকে মনে করলো। আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দেওয়া যে মানবের কল্যাণ।

জাতির বৈশিষ্ট্য। জাতিকে দুনিয়ার চোখে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে ঘৃণা ত্যাগ করতে হবে। আশ্রয়প্রার্থীর কোন ধর্ম নেই, সে সবার ধর্মের এক চিহ্নিত যোগসূত্র। সে বিধর্মী হলেও ধর্মচ্যুত নয়। অন্তত ইসলামের ঘরে তার নতুন প্রতিষ্ঠা হবে।

আকবর অশ্ব থেকে নেমে বিপরীত অশ্বের কাছে গেল। তারপর সস্নেহে বললো, তুমি শুনলে হয়তো অবাক হবে যুবক, আমি মুঘল সম্রাট আকবর শাহ। তোমাদের এদেশের পরম শত্রু। তাছাড়া তুমি হিন্দু ও আমি মুসলমান। তবু তুমি আশ্রয়প্রার্থী, মুসলমানের ধর্মে কি আছে জানি না, তবে আমার ধর্মে তোমাকে আশ্রয় দেওয়া একান্ত কর্তব্য। আমি তোমায় আশ্রয় দেব।

তার আগে বলো—তুমি কেন নিজের ভূমি ত্যাগ করলে? তোমাদের কি মাতাপিতা নেই, আত্মীয়স্বজন নেই?

যুবক ম্লানকণ্ঠে বললো—সে ইতিহাস বড় মর্মন্তুদ। এই পথের ওপর দাঁড়িয়ে তা বলা যায় না। তবে এইটুকু বলতে পারি, আমরা দুই ভাইবোন বড় ভাগ্যহীন। মাতার সুকোমল ক্রোড় চিরতরে হারিয়েছি। তিনি এ জগতে নেই। পিতা নতুন বিবাহ করে আমাদের মৃত্যু কামনা করেছেন। বিমাতার অত্যাচারে উত্যক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত আর গৃহে থাকতে পারি নি। স্বদেশেই থাকবার জন্যে রাণা উদয় সিংহের সেনাদলে ভর্তি হতে গিয়েছি কিন্তু পিতার কারসাজিতে তা আর সম্ভব হয় নি। অন্যকর্মও চেষ্টা করেছি কিন্তু মেলে নি। শেষে একদিন চরম অবস্থা সৃষ্টি হল। ভগ্নী শিবালীকে বিমাতা বাড়ীর বাইরে তাড়িয়ে দিলেন। তখন আর স্থির থাকতে পারলাম না। পিতাকে এর বিহিত করতে বললাম। তিনি নিরুত্তর রইলেন দেখে অগত্যা গভীররাত্রে ভগ্নীকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়েছি।

আকবর আবার কিশোরী শিবালীর দিকে তাকালো। সবে বৃক্ষশাখায় সবুজ পত্রালয়ের আবির্ভাব হয়েছে। ভাই যখন পিতামাতার বিরুদ্ধ আচরণের প্রতিবাদ করছিল, শিবালীর দুটি ডাগর চোখের প্রান্তভাগে জল টলমল করছিল। মুখখানি আনত করে সে পদাঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়ে মাটিতে দাগ টানছিল।

আকবর আরও খুঁটিয়ে শিবালীকে দেখতে লাগলো। না, তখন তার মধ্যে কোন মোহের সঞ্চার হচ্ছিল না। শুধু দেখছিল রূপের প্রকাশ। এইমাত্র দেখে সে ফিরেছে প্রকৃতির সৌন্দর্য। এখন দেখছে মানুষের রূপ। আর ভাবছিল, এইজন্যে বাদশাহরা এত আড়ম্বরের মধ্যে দিয়ে হারেম শোভা করে। তার মধ্যেও পুরুষের প্রবৃত্তিগুলি জাগতে শুরু করেছে। সেও মাঝে মাঝে শরীরে যেন কিসের উন্মাদনা অনুভব করে। ইন্দ্রিয়ের কোথায় যেন আলোড়ন। এক একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়। হঠাৎ শরীরটি ছটফট করে ওঠে।

তবু সে এখন অপরিণত। সলিমাকে দেখে তার মধ্যে রমণী স্পর্শের মাদকতা সৃষ্টি হোক। তবু সে জানে, সে এখন ঐদিকে মন সমর্পণ করতে পারে না।

কিন্তু শিবালীকে দেখে হঠাৎ তার ভগ্নীপ্রীতির মত এক প্রীতি অনুভব করলো।

একবার অবশ্য রাজপুরীর মধ্যের কথা ভাবলো। সেখানে বিধর্মীর পদসঞ্চার

বিদ্রোহের সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে রাজপুতরা মুঘলদের প্রধানশত্রু। সংগ্রাম সিংহের সাথে মুঘল বাদশাহ বাবর শাহের খানুয়ার যুদ্ধ এখনও বিভীষিকা সৃষ্টি করে। হিন্দুরা ভাবে, মুসলমানরা এদেশে এসে তাদের দেশ অধিকার করেছে। স্বদেশকে বাঁচানোর জন্যে স্বদেশবাসী মরীয়া। হিমুর সাথে পাণিপথের যুদ্ধতেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে। একই পতাকা তলে, তুর্ক, আফগান, রাজপুতরা মুঘলদের বিতাড়নের সঙ্কল্প নিয়েছিল। তুর্ক, আফগানরা স্বদেশবাসী ও মুঘলরা বিদেশী।

এই জাতিবিরোধ নিয়েই যত আক্রোশ। এখন যদি সে এই রাজপুত ভ্রাতা-ভগ্নীকে প্রাসাদে নিয়ে যায়, আলোড়ন জাগা স্বাভাবিকই বৈকি! হয়তো আমীর ওমরাহরা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করবে। অভিভাবক বৈরাম খান তার ব্যবহারে বিরক্ত হবেন, মাতা হামিদা বানু কৈফিয়ত তলব করে হয়তো তিরস্কার করবেন। হারেমের অন্যান্যরা নিজেদের মধ্যেই আক্রোশে ফুলবেন। তবু নিয়ে যেতে হবে। আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দেওয়া সকল ধর্মেই কর্তব্য। মুঘল বংশের রীতিই আছে, দস্যু হলেও আশ্রয়প্রার্থীকে কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নয়। মনে পড়লো, মাতার কাছে শোনা পিতা হুমায়ূনের কথা। সংগ্রাম সিংহের প্রিয়তমা পত্নী রাণী কর্ণাবতীর সাথে তিনি রাখীবন্ধন করে ভ্রাতাভগ্নী সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন। তাহলে হিন্দুর সাথে মুসলমানের এই প্রীতি নতুন নয়! কিন্তু একটি প্রশ্নের উত্তর তার মাথায় কিছুতে আসে না, মানুষ তো সবাই এক! তবে তার মধ্যে এই ভেদাভেদ কেন? ধর্মের এই বৈষম্য? খোদা সকলকেই একইভাবে মানুষ নামে সৃষ্টি করে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, সেখানে কাউকে কি অভিনব কোন ক্ষমতা প্রদান করেছেন? যার জন্যে একজন হবে শ্রেষ্ঠ, অপরজন তার গোলাম হবে! তবে কেন এই বিভেদ? কেন এই ধর্মের শ্রেণী নির্বাচন? যদি কখনও সম্ভব হয়, তাহলে সে এই বিভেদের প্রতিবাদ করবে। আজ যদি প্রয়োজন হয়, এই দুটি ভ্রাতাভগ্নীকে নিয়ে গিয়ে সে সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবারের মুখোস খুলে ফেলবে। ভাল কাজ করতে গেলে আন্দোলন জাগে, জাগুক।

আকবর যুবকের হাত ধরলো, ধরে বলল, আজ থেকে তোমরা আমার বন্ধু হলে। তোমাদের নিয়েই আমার ভবিষ্যতের পথে সংগ্রাম শুরু হল।

ওরা তারপর অশ্বের ওপর উঠে চলতে লাগলো। শিবালী বসলো সেই ভাইয়ের পিছনে, ভ্রাতার কোমর বেষ্টন করে।

তুর্ক, আফগান, মুঘলরা যারাই রাজ্য পরিচালনা করেছে, তারা তাদের অন্তঃপুরিকাদের জন্যে ভিন্ন একটি নতুন ব্যবস্থা করেছে। অন্তঃপুরিকারা বাইরের লোকের দৃষ্টিতে কখনও দৃশ্যমান হবে না। এমন একটি অন্তঃপুর রাজ্যের রহস্য নিয়ে প্রাসাদের বিশেষ একটি অংশে রক্ষিত হবে, যার গোপনতা সম্রাট নিজের ক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করবে। সেখানে সূর্যালোক পর্যন্ত প্রবেশ না করে, তার মত ব্যবস্থা। সূর্যেরও নির্লজ্জ প্রকাশ আছে, সে তার জ্যোতির বলয়ে যদি খুবসুরত আওরতের নগ্নদেহ দেখে লোলুপ হয়? এই দিল্লীর বুকে কত রাজা রাজত্ব করে গেছে। আছে

তাদের ভগ্নাবশেষ প্রাসাদের শেষচিহ্ন। সংযুক্তা, পৃথ্বীরাজের রাজপুরীর ওপর কুতুবউদ্দীন, আলতামাসের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল, সেই রাজপুরীতে ছিল আলাদা একটি অন্দরমহল, বাইরের সঙ্গে তার কোনই সম্বন্ধ ছিল না। আজ আকাশচুম্বী কুতুবমিনার আছে, আর আছে তাদের রাজত্বের ধ্বংসাবশেষ।

আরো পিছনে চলে গেলে হস্তিনাপুরের স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া যায়। মহাভারতের কুরুপাণ্ডবের রাজধানী এখানেই ছিল। কুরুক্ষেত্র এই দিল্লীরই কোন একস্থানে। আজ হস্তিনাপুর রাজধানীর কোন চিহ্ন নেই, তবে স্মৃতি আছে।

তারপর দিল্লীর বুকেই এক এক করে বিভিন্ন রাজগণ রাজত্ব করে গেছেন। দাসরাজরা, খলজীবংশ, তুঘলক বংশ, সৈয়দবংশ, লোদীবংশ তারপর মুঘলবংশ। মুঘলদের পরাজিত করে শূরবংশ। শূরদের পরে আবার মুঘলবংশ।

যমুনা যেমন বার বার পথ পরিবর্তন করে অন্যমুখী হয়েছে, তেমনি এদের রাজপ্রাসাদও বিভিন্ন অংশে সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানের যে প্রাসাদ তার অনেক রূপান্তর ঘটেছে। ইব্রাহিম লোদী যখন রাজত্ব করতেন, তখন প্রাসাদের অন্যরূপ ছিল। ইব্রাহিম লোদী রাজকার্যের চেয়ে বিলাসজীবনই বেশী পছন্দ করতেন। তাই তিনি দরবারের সজ্জার চেয়ে অন্দরমহলের শোভার দিকে মন দিয়েছিলেন। নতুন নতুন যেমনি আওরত নিয়ে এসে রঙমহল পূর্ণ করতেন, তেমনি নির্মাণ করাতেন নতুন নতুন বেহেঁসের মহল, যেখানে প্রবেশ করলে বেহেস্ত মনে হবে। ইব্রাহিম লোদী যখন পরাজিত হলেন, তখন অন্তঃপুরের অধিকার পেয়ে মুঘল বাদশাহ বাবর শাহ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনিও বহু পত্নী, উপপত্নী গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ইব্রাহিম লোদীর মত নয়। শুধু ইব্রাহিম লোদীর বেগমই যথেষ্ট ছিল না, ছিল বাঁদী, নর্তকী ও উপভোগের জন্যে হাজারো হাজারো কুসুমসদৃশ খুবসুরত মরশুমী আওরত। এত সুন্দর রমণী একসঙ্গে ভারতবিজয়ী মুঘল সম্রাট বাবর কখনও দেখেন নি!

সেই ইব্রাহিম লোদীর জেনানামহল দেখেই বাবর শাহের এমনি মহল করবার পরিকল্পনা এসেছিল। তিনি ভারতে যতদিন বেঁচেছিলেন, পরাজিত ইব্রাহিম লোদীর কিছু বাছা বাছা সুন্দরী নিয়ে আলাদা একটি রঙমহল করেছিলেন। সেখানে পরে এসেছিলেন আরও অন্যদেশের যুবতী রমণী। যারা শুধু উপভোগের জন্যে এসেছিল। সম্রাট তৈমুর সমরখন্দে কেমনভাবে অন্তঃপুর রক্ষা করতেন, তার কোন ইতিহাস নেই। তবে বাবরশাহ দেখেছিলেন, তাঁর পিতা ওমর শেখ মির্জাকে বহু শাদী করতে। তাঁর পত্নী ও উপপত্নীদের একটা হিসাব বাবরশাহ তাঁর আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কৈশোর জীবনে এই উপপত্নী, রক্ষিতা রাখার প্রতি বাবরের যে ঘৃণা ছিল, পরে আর তা থাকে নি। বিশেষ করে পরিণত বয়সে যখন তিনি ভারতবর্ষ জয় করেছিলেন, তখন যেমন মদ্যপানের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন, হয়েছিলেন রমণীসংসর্গের জন্যে লালায়িত।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়তো এইজন্যেই বাবর শাহ জয়লাভ করতে পারতেন না। ঘটনাটি ঐতিহাসিকরা বিশেষ আমোল দেন নি কিন্তু কত তুচ্ছ কারণে যে সেদিন

এক একটি যুদ্ধ পরাজয় লাভ করতো, সে ইতিহাস কে রাখে? পানিপথের যুদ্ধের আগের দিন বাবর শাহের শিবিরে গোপনে একটি হুরীর মত ছদ্মবেশী সুন্দরী প্রবেশ করে তাঁকে একেবারে বেহুঁশ করে দিয়েছিল।

বাবর শাহ তখন যুদ্ধের কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন। আকণ্ঠ রমণী সুধা পান করে সুরার মাঝে বেহুঁশ হয়ে সারারাত্রি কাটিয়ে দিয়েছিলেন। এমন কি সেনাপতি শিবিরে ঢুকতে চাইলেও হুকুম পায় নি।

তারপর চৈতন্যোদয় হয় প্রভাতের আলো আসমানে ফুটলে। চোখের আমেজ কাটলে রণবিশারদ বীরপুরুষ বাবর শাহ বুঝতে পারেন। তিনি কি মোহে বশ হয়ে নিজের কর্তব্য ভুলেছেন? সেদিন থেকে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, জীবনে মদ না, মেয়েছেলে না।······অনেকদিন তিনি মদ সত্যিই স্পর্শ করেন নি কিন্তু রমণী ভোগের তৃষ্ণা তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণের দ্বারা নিবৃত্তি হয়নি। বাবর শাহ মারা গেলে তাই হুমায়ুন পিতার রমণীদের নিয়ে বড় অসুবিধায় পড়েছিলেন। পিতৃভক্ত পুত্র হুমায়ুন পিতার স্পর্শ করা রমণীদের তো নিজের অঙ্কে স্থাপন করতে পারেন না! ছিল অনেক কাশ্মিরী আপেলের মত, কাবুলের মেওয়ার মত খুবসুরত জোয়ানী আওরত। হয়তো তাদের তখনও স্পর্শ করা হয় নি, যারা অন্তঃপুরের সৌন্দর্য বর্দ্ধিত করবার জন্যে সবে কোথা থেকে লুণ্ঠিত হয়ে এসে মুঘল অন্তঃপুরে স্থান পেয়েছে।

ইচ্ছে করলে হুমায়ুন শাহ তাদের নিয়ে মজলিস বসাতে পারতেন। হুমায়ুন নিজেও ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল ও বিলাসী। তারও হারেমে ছিল অনেক জোয়ানী আওরত। তিনিও যুবক বয়সে যথেষ্ট বিলাসীজীবনের পরিচয় দিয়েছিলেন, তবু অকৃতজ্ঞ সন্তানের মত পিতার গচ্ছিত আওরতদের ভোগ করেন নি! এমন কি কতক আওরত সৈনিকদের সাথে ষড়যন্ত্র করে তাদের অন্তঃপুরে গিয়ে উঠেছিল, আর কিছু পালিয়ে গিয়েছিল। তাতে হুমায়ুন শাহ খুশি হয়েছিলেন, নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

এমন করেই সৃষ্টি মুঘল পরিবারের অন্তঃপুর। মুঘল সম্রাটরা যুদ্ধে গেলে তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এই রীতি বাবর শাহও পালন করেছেন, হুমায়ুন শাহও পালন করেছেন। তৃতীয় সম্রাট এখন আকবর শাহ।

তবে তার বয়স অল্প। অন্তঃপুরের শালীনতা, সম্ভ্রম, অবরোধ এসব রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব তার এখনও হয়নি। তাছাড়া তার নিজস্ব আওরত যখন অন্তঃপুর আলো করে বাস করবে, তখন তার দায়িত্ব শুরু হবে। এখন অন্তঃপুরে আছে পিতার পোষিত হাজার রমণী। মাতার হেপাজতে যাদের ভরণ পোষণ নির্বাহ হয়। পিতার অবর্ত্তমানে মাতার কর্তব্য এখন তাদের প্রতিপালন করা। আর আছে মন্ত্রী, সেনাপতি, উজির প্রভৃতি উচ্চরাজকর্মচারীর পরিবাররা। তাদের মহল অবশ্য আলাদা। তবে মুঘল হারেমের সঙ্গে তাদের অবরোধ রক্ষিত হয় সেখানেও বাইরের লোকের কোন প্রবেশাধিকার নেই।

শুধু বৈরাম খানের পরিবারের জন্যে আলাদা একটি বিশেষ মহল তৈরী হয়েছিল। শেরশাহ যখন দিল্লী অধিকার করেছিলেন, তখন তিনি রাজপুরীর সবকটি অট্টালিকা

ভেঙে চুরমার করে নতুন ভাবে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। সেইজন্যে পূর্বে মুঘলরা হুমায়ুনের প্রথম রাজত্বকালে যেমনভাবে বাস করেছিলেন, পরে আর তা সম্ভব হয় নি।

তারপর বর্তমানে দিল্লী অধিকার করে বৈরাম খানের কর্তৃত্বাধীনে নতুন নতুন মহল নির্মিত হচ্ছিল। বৈরাম খান রাজপরিবারের সংলগ্ন নিজের অন্তঃপুরিকাদের জন্য অভিনব একটি মহল তৈরী করিয়েছিলেন। আর সেখানে দিনের পরদিন চলতো আমোদ প্রমোদের এক নতুন হল্লা।

আকবর শাহ অপরিণত বয়স্ক যুবক বলে তার খাসমহল নির্বাচিত হয়েছিল, অন্তঃপুর ও বারমহলের মধ্যবর্তীস্থানে। হামিদা বানু থাকতেন আকবরের পাশের মহলে, তবে অন্তঃপুরের সংলগ্ন। হামিদা বানুর পাশে থাকতেন যত ধাত্রীমায়েরা। তাদের প্রত্যেকের এক একটি মহল সুনির্দিষ্ট ছিল। আর আত্মীয়স্বজনেরা থাকতো ভেতর মহলে, তবে যারা দম্পতি তাদের জন্যে আলাদা মহল ছিল।

পুরুষেরা মেয়েমহলে রাত্রিবাস করতে গেলে তার ভিন্ন ব্যবস্থা। যাদের বহুপত্নী, তাদের কোন্ পত্নী কবে স্বামীর কক্ষে রাত্রিবাস করবে তার ব্যবস্থা থাকলে বাঁদী জেনানা দারোগা তাদের পৌছে দিয়ে আসতো। হারেমের এই বিরাট সমস্যা একটি রাজ্যের সমস্যার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এই হারেমের যিনি কর্ত্রী হতেন, তাঁর অনেক বিষয় চিন্তা করতে হত। এক জায়গায় অনেকগুলি রমণী থাকলে যে অবস্থা হয় আর কি ?

ইদানীং হামিদা বানু এই অন্তঃপুরের সর্বকর্ত্রী হয়েছিলেন।

আকবর আশ্রয়প্রার্থী দুই ভ্রাতা ও ভগ্নীকে এনে ভগ্নী শিবালীকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিল। জানিয়ে দিল, ভাগ্যহীনা এই রাজপুত কিশোরীকে যেন নিজের হেফাজতে যত্নে লালন করা হয়। মেয়েটিকে নিয়ে প্রথমে কোন গোলমাল লাগলো না। কারণ এমনি বিধর্মী বহু আওরতই হারেমের শোভাবর্দ্ধন করতো। আওরতের ধর্ম কি ? তারা যার ঔরসে যার গর্ভে জন্ম নিক্, পরিণত বয়সে যার ঘরে গিয়ে যার হৃদয়ে কুসুম ফোটাবে, সেই ভাগ্যবান পুরুষের ধর্মই তার। সেইজন্যে মুঘল রাজ্যের নীতিধর্মের দিক থেকে আওরতদের কোন দণ্ডাজ্ঞা ছিল না। বরং হিন্দুরমণী যত হারেমে আসে, তত জেনানমহলের ইজ্জত বাড়ে। শিবালী হারেমে প্রবেশ করতে কোন আন্দোলন উত্থিত হল না। আলোড়ন জাগল নন্দন সিংকে নিয়ে।

বিধর্মী নিশ্চয় গুপ্তচর, তাকে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হোক্।

সম্রাট আকবর রুখে দাঁড়ালো, খবরদার ! যে এই আশ্রয় প্রার্থীর মৃত্যুদণ্ড দেবে, আমি তার মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করবো। আমার পিতৃতুল্য রাজপুরুষরা কি ভুলে গেছেন যে, মুঘল রাজ পরিবারের নীতিই আছে আশ্রয়প্রার্থী শত্রু হলেও তাকে রক্ষা করা উচিত। আমি মুঘলবংশের উপযুক্ত পুত্র, আমি সেই নীতি পালন করেছি।

দরবারের রাজতখতে বসে অগণিত আমীর ও ওমরাহের সামনে নবীন সম্রাট আকবর এই ঘোষণা করছিল। একপাশে সেই যুবক নন্দন সিং দাঁড়িয়েছিল অপরাধীর মত।

আকবরের ঘোষণা শুনে আমীর ওমরাহদের মধ্যে সোরগোল উঠলো। বৈরাম খান মন্ত্রীর আসনে আসীন হয়ে চুপ করে বসেছিলেন।

এই সময়ে একজন ওমরাহ বললেন, এই যুবককে আশ্রয় দিয়ে আমরা কি করবো?

উত্তর দিল কিশোর আকবর, তাকে উপযুক্ত যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করবো, রাজকর্মে নিয়োগ করবো।

অন্য এক ওমরাহ বললেন, এরকমভাবে বিধর্মীদের নিযুক্ত করলে নিজেদের ধর্মের লোকরা নিযুক্ত হবে না।

তার উত্তরে আকবর বললো, ভারতবর্ষ শুধু ইসলাম ধর্মীদেরই একচেটিয়া নয়। আমরা যদি কখনও সমস্ত ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা পাই, তাহলে অন্যধর্মের মানুষেরও করুণা আমাদের দরকার। বরং আপন ধর্মের লোকেরা ক্ষমা করবে কিন্তু ভিন্নধর্মের লোকেদের মঙ্গল না চাইলে তারা ষড়যন্ত্রের দ্বারা রাজত্বের অবসান চাইবে।

এই কথাগুলি কি সামান্য এক অপরিণত যুবক বলতে পারে? অনেক বড় রাজপুরুষ, পর্যাপ্ত শক্তি নিয়ে যে পৃথিবীতে এসেছে। বুদ্ধিও আছে অনেক। তারও মনে এমনি দূরদর্শিতা জেগে উঠবে না। সেও এমনি ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে সোনার কল্পনা করতে পারবে না।

আমীর, ওমরাহরা সেইমুহূর্তে মনে মনে তৈমুরের উত্তরসাধককে সেলাম পেশ করলেন। যার মনে সমগ্র এশিয়া জয়ের পরিকল্পনা, তার বাহুতে যে একদিন বিরাট শক্তি এসে পড়বে, তার জন্যে নতি স্বীকার। এমন করে কজন কথাই বা বলতে পারে! এমনি করে আশ্বাস কোন্ বাদশাহের দ্বারা প্রকাশিত হয়!

বয়েসে নবীন কিন্তু বুদ্ধিতে অনেক বড়। এমন ক্ষুরধার বুদ্ধি বাদশাহের না থাকলে কি হয়? শক্তিও কম নেই। নিজের তরবারীর শক্তি দিয়ে পরবর্তীকালে আগ্রা জয় করেছে। সেকেন্দার শূরকে এই যুবকই একদিন হঠাৎ অতর্কিতে প্রাসাদ থেকে অশ্ব ছুটিয়ে গিয়ে ধৃত করেছিল। সঙ্গে মাত্র ছিল পঞ্চাশজন সিপাহী।

তারপর সেই সেকেন্দার শূরকে ক্ষমা করে তাঁকে একটি জায়গীর উপহার দেয় এই আকবর। বন্দীকে এই ক্ষমা করার ঘোর বিরোধী আমীর ওমরাহরা, সেদিনও এমনি এক বিরাট বক্তৃতা দিয়ে দরবারের উপস্থিত ব্যক্তিদের চমকিত করেছিল আকবর। কিন্তু সেই সেকেন্দার শূর বিহারে জায়গীর ভোগ না করে বিদ্রোহী হতে আকবর ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সেদিনও তার মূর্তি দেখবার মত। রক্তবর্ণ মূর্তিতে এই দরবারে দাঁড়িয়েই বালক আকবর চীৎকার করে বলেছিল, বেইমান যে, তাকে জীবিত ধৃত করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

ছুটেছিল এক সহস্র সৈন্য আকবরেরই বিশ্বস্ত অনুচর কেলী খাঁর পরিচালনাধীনে। তার আগেই সেকেন্দার শূর জায়গীরের লোভ ছেড়ে দিয়ে বাঙলা দেশে পলায়ন করেছিল।

আমীর ওমরাহদের সে কথা মনে পড়লো। উপস্থিত নবীন বাদশাহের

কতকগুলি কার্য বিরুদ্ধমনের বিদ্রোহ জাগায়, আর কতকগুলি কার্য বিস্ময় জাগায়। বন্দীকে ক্ষমা করা যেমন বৈরাম খানের নীতি নয়, আমীর ওমরাহদেরও সেই নীতি ছিল না। অবশ্য পূর্বসম্রাট হুমায়ুনও বন্দীকে ক্ষমা করতেন। কিন্তু সে কথা তখন অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন।

আমীর ওমরাহরা নবীন বাদশাহকে তাদের নীতি অনুসরণের জন্যে বার বার চেষ্টা করতেন কিন্তু আকবর বয়সে নবীন হলেও বুদ্ধির দিক দিয়ে কঠোর ছিল। বুদ্ধির চাতুরীতে তাকে কাবু করা সত্যিই দুষ্কর।

নন্দন সিংকে আকবর শেষপর্যন্ত সমস্ত বাতবিতণ্ডার বিরুদ্ধে আশ্রয় দিল। শেষপর্যন্ত রাজন্যবর্গের কাছে জামীনস্বরূপ নিজেকে গচ্ছিত রাখলো, 'যদি এই রাজপুত যুবক কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে তার জন্যে সেই দায়ী থাকবে। রাজ্যের কোন ক্ষতি হলে স্বয়ং সম্রাট তার ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করবে।'

সকলে সেই মুহূর্তে কিছু বললো না কিন্তু মনে মনে তারা সম্রাটের কার্যের ঘোর বিরোধিতা করলো। নবীন সম্রাট বয়েসে ছোট হলেও নিজের স্থির সঙ্কল্পে কেউ কখনও তাকে সরাতে পারে না। সুতরাং তাদের স্বাধীনতা যখন ঠিকমত প্রকাশ-লাভ করে না, তখন এই রাজ্য ও রাজত্বে প্রয়োজন কি? অপরিণত এই যুবককে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দিলেই মনে হয়, নিজেদের ক্ষমতা বজায় থাকবে।

কিন্তু বৈরাম খান এই বিদ্রোহের চক্রান্তে কোন উৎসাহ বোধ করলেন না। তিনি আমীর ওমরাহদের রক্তচক্ষুর দ্বারা বশ করে জানিয়ে দিলেন—আপনারা সে চেষ্টা কখনও করবেন না। আমি আমার বন্ধুর কাছে কসম খেয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি, সেই প্রতিজ্ঞা আমি কিছুতেই ভঙ্গ করবো না। তার পুত্রকে সিংহাসনের ওপর বসিয়ে, রাজ্য সুরক্ষিত করে তবে আমার ছুটি। কেউ যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা পূরণের বিরোধিতা করে তাহলে তার জীবন কিছুতে রক্ষা পাবে না। আমার তরবারীই সেই বিদ্রোহের অবসান চিরতরে ঘটাবে। আর উষ্ণশোণিতের স্রোতে মর্মরসোপান ধৌত করে এই প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করবে যে কর্তব্যের কঠিনতা যত নির্মম, বেইমানের দুর্বল তরবারী তত ক্ষুরধার নয়।

এরই মধ্যে একদিন রাত্রে হঠাৎ আকবরের ঘুম ভেঙে গেল। আজকাল তার নির্ভয়ে ঘুম হয় না। কেমন যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থেকে হঠাৎ আচমকা উঠে বসে। কেন উঠে বসে সে জানে না, অথচ তার ঘুম ভেঙে যায়। স্বল্পালোকিত কক্ষের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সে বোবা হয়ে যায়। প্রাসাদ চত্বর থেকে প্রহর গণনার ঘোষণা ভেসে আসে। কক্ষের বাইরে অলিন্দের মাঝে প্রহরীর চলাফেরার পদধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করে।

শয্যার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে আকবর ভাবতে বসে, এমন কেন তার হচ্ছে? কেন এই শান্তমনে বিক্ষুব্ধ যন্ত্রণার পলিমাটি? প্রায় প্রত্যহই তার ঘুম ভেঙে যায়, কখনও ভাঙে প্রভাত হওয়ার দুদণ্ড পূর্বে, কখনও রাত্রির মাঝামাঝি সময়। অথচ তারপর আর ঘুম আসে না। এমনি অবস্থায় পালঙ্কের ওপর ছটফট করতে করতে

রাত্রি শেষ হয়ে আসে, আর তাকে বেরিয়ে পড়তে হয় প্রাতঃভ্রমণে। কিন্তু ঘুমের সে জড়তা তার যায় না। কেমন যেন চোখদুটি জ্বালা করে, দেহ দুর্বল লাগে। অশ্বের বল্গা চেপে ধরলেও হাত ঠিক মজবুত হয়ে বসে না। অশ্বও তার দুরবস্থা বুঝতে পারে। ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

এমন কেন হচ্ছে ?

এই প্রশ্ন উদয় হতে আকবর আর নিজেকে শয্যার মধ্যে ধরে রাখতে পারে না। উঠে সে কক্ষের হর্ম্যতলে দাঁড়ায় তারপর কি ভেবে তারই কক্ষের ভেতর দিয়ে ছাতে ওঠবার সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায়। এই কক্ষের ওপর এই ছাতটিও সেই ব্যাঘ্রহত্যাকারী শেরশাহের পরিকল্পনায় সৃষ্টি। কেন যে তিনি এই ছাতটি নির্মাণ করেছিলেন, বোঝা যায় নি ? অন্তঃপুরের সংলগ্ন এই কক্ষটি হয়তো নিজের ব্যবহারের জন্যে সৃষ্টি করেছিলেন। আর এই ছাতটি গোপনে সকলের গতিবিধি দেখবার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছিল। এ ছাড়া কেন হবে এই গম্বুজযুক্ত ছাত ?

আকবর এর আগে একবার এই ছাতে উঠেছিল। নিজের কক্ষের মধ্যে বিশেষ-ভাবে নির্মিত এই উন্মুক্তস্থানের প্রতি তার কোন কৌতূহল ছিল না।

হঠাৎ সেদিন কি যেন ভেবে সন্ধ্যেবেলা এই ছাতে উঠে এসেছিল। অবশ্য তার গোপন মনে একজনকে দেখার প্রত্যাশা ছিল।

শিবালীকে।

মা হামিদার কাছে বাঁদীকে দিয়ে পাঠিয়েছে। কিন্তু হামিদার সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে, তিনি একবারও শিবালীর সম্বন্ধে কিছু বললেন না। অথচ তার জিজ্ঞেস করতে লজ্জা জেগে উঠলো। এই লজ্জা যে কেন তার এল, সে জানে না ! অথচ বার বার মুখে এসেও জিবের তালুতে কেমন যেন জড়িয়ে গেল। মাকে আর জিজ্ঞেস করা হল না সেই ভাগ্যহীনা কিশোরীর কি ব্যবস্থা করলে ?

এই অবস্থার জন্যেই সে হঠাৎ নিজের কক্ষের ঘুলঘুলি দিয়ে ওপরে উঠে এসেছিল। অনেকে বলত, এর ছাতে দাঁড়ালে জেনানামহলের সবকিছু দেখা যায়। আকবরকে অবশ্য কেউ নিষেধ করে নি কিন্তু কথাটা শুনে তার কেমন যেন লজ্জা করতো। ওখানে আছে কত মাতৃস্থানীয়া রমণী। যারা পিতার বিলাসজীবনের সঙ্গিনী ছিল। তাছাড়া আছে অজস্র আত্মীয়া। সেই আত্মীয়াদের কন্যারা আছে, যারা সম্পর্কে তারই ভগ্নীস্থানীয়া। না, না—তবু জেনানামহলের দিকে দেখবার তার বয়স হয় নি, সমস্ত রাজপুরীর লোকেরা তাকে এখনও বালক বলে। হৃদয়ের এই গূঢ়রহস্যে প্রবেশ করবার তারও কোন বাসনা নেই। জেনানামহল হাজার রহস্যে ঘেরা থাক্ তবু সে রহস্য উদঘাটনে তার অমূল্য জীবন ব্যাপৃত করবে না।

সলিমা তাকে 'বাচ্চামর্দানা' বলে রসিকতা করেছে। সে অপমানিত হয়েছে। একটি স্ত্রীলোক তার পৌরুষে আঘাত হেনেছে। হোক্ সে ভগ্নীর মত, তবু তাকে ক্ষমা না।

মা হামিদা এই শাদীতে বৈরাম খানকে আত্মীয় করে নিলেন, মা আগ্রহান্বিতা

না হলে সে এই মিলনের বিরুদ্ধতা করতো। সলিমার সেই 'বাচ্চা মর্দানা' বলা চিরকালের জন্যে রুদ্ধ করে দিত। তবে কি সে সলিমাকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দান করতো ? না, সে এই রমণী পুরুষের মাঝে এই মিলন ঘটতে দিত না। অন্তত বৈরাম খানের মহব্বত আন্তরিকতাশূন্য, এই প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করে সলিমাকে বিচ্ছেদের বহ্নিতে দগ্ধ করতো। লল্লা যদি বেইমানী না করতো, তাহলে হয়তো এই মিলন বিচ্ছেদের মাঝেই শেষ হয়ে যেত।

কিন্তু তাঁর জন্যেই কি প্রত্যেকদিন তার ঘুম ভেঙে যায় ?

না, সলিমাকে সে ভুলেছে। সলিমা এখন বৈরাম খানের বাহুলগ্ন হয়ে কত রঙীন স্বপ্ন দেখে। তাদের মিলনদৃশ্য দেখবার জন্যে তার কোন প্রত্যাশা নেই।

সে দিন যে ছাতে উঠেছিল সন্ধ্যাবেলা, শুধু শিবালীকে দেখবার জন্যে। যদি কোনরকমে তার চোখে পড়ে, সে জীবিত আছে, ভাল আছে সুখে আছে জানতে পারলেই আর কোন দুর্ভাবনা থাকবে না। যাকে জীবন দান করে, বাঁচবার অধিকার দিয়ে এখানে এনেছে, তার নিরাপত্তা জানার দায়িত্বও তো তার।

নন্দন সিংয়ের সঙ্গে প্রত্যহ দেখা হয়। রাজপুরীর পিছনদিকে অসি চালনার ভূমিতে তার দেখা পাওয়া যায়। সেও অসি কসরৎ করে নিজেকে যুদ্ধের জন্যে তৈরী করছে। যুবকটি বিনয়ী, দেখা হলেই মুসলমানী কায়দায় সেলাম পেশ করে।

নন্দন সিংকে সে কতকথা জিজ্ঞেস করে কিন্তু ভগ্নীর কথা জিজ্ঞেস করতে পারে না। হয়তো সে কিছুই জানে না, আবার হয়তো জানে। ভগ্নী ভাল আছে কিনা এ খবর কি সে যোগাড় করে নি ? কিন্তু সেখানেও লজ্জা।

আর সেইজন্যেই এই চোরের মত ছাতে এসে দাঁড়ানো কিন্তু ছাতে না এলেই বুঝি ভাল হত। এক দেখতে গিয়ে যে আর একদৃশ্য দেখে ফেললো, তার মূল্যায়ন কিসের দ্বারা হবে !

জীবনের এমনি সংঘাত যদি গোপনে ঘটে যেত।

অনেক ঘটনা হয়তো ঘটে কিন্তু তার প্রকাশ না থাকলে আর আলোড়ন জাগে না। সেদিন আকবর হঠাৎ মসজিদে আজানের সময় ছাতে এসে না দাঁড়ালে আর তাকে ঐ দৃশ্য দেখতে হত না। না দেখলে তার চিন্তার মধ্যেও এই সন্দেহ ফুটে উঠতো না।

দেখতে এল জেনানামহলের কোন অলিন্দ দিয়ে শিবালীকে দেখা যায় কিনা কিন্তু দেখলো এক সাংঘাতিক দৃশ্য।

পৃথিবী কি সেইমুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যেতে পারতো না ! দিন ও রাত্রির প্রতিদিনের ঘূর্ণায়মান আসা যাওয়া। বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেলেই তো মানুষের জীবনদীপ নির্বাপিত হত। কিংবা সমুদ্র হঠাৎ ছুটতে শুরু করলেই সমস্ত পৃথিবী জলপ্লাবিত হয়ে যেত।

কিন্তু কিছুই হল না। স্তব্ধ সন্ধ্যার মাঙ্গলিক মুহূর্তে মসজিদে মসজিদে মোল্লাদের আল্লাকে ডাকার প্রার্থনা যেন আরো সোচ্চার হল। আসমানের নীলিমার সুদূরে বল্লমে বিদ্ধ তারার উপস্থিতি পৃথিবীর আয়ু বৃদ্ধি করলো। কত মানুষ সেইমুহূর্তে

জন্ম নিল, কত আত্মার সেইমুহূর্তে নির্বাণ হল। কত দুর্বহ জীবন পরিসমাপ্তি হয়ে শান্তির কোলে লোকান্তরিত হল। হায়, সবই সেইমুহূর্তে মঙ্গল আরতির মত সমাধা হল, শুধু হল না আকবরের চোখের সেই দৃষ্টির কোন পরিবর্তন!

সে যেমন সেই অলৌকিক দৃশ্য অবাক দুই চোখ দিয়ে দেখেছিল, তেমনি দেখতে লাগলো। সেইমুহূর্তে সে চেয়েছিল, তার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যাক্ কিন্তু গেল না। চোখ দুটি তেমনি সজাগ, দৃষ্টি তেমনি স্বচ্ছ সেই দৃষ্টি দিয়ে সে তাকিয়ে থাকলো সামনের দিকে জেনানামহলের অন্দরে। মার কক্ষের অভ্যন্তরে। এই ছাতের অলিন্দ থেকে মা হামিদার কক্ষের সব দৃশ্য প্রকট। কক্ষের একটি গবাক্ষ দিয়ে সব দেখা যায়।

পুত্র হয়ে আকবরকে খোদা মাতার কক্ষের এমন এক দৃশ্য দেখালেন, যা স্বপ্নেরও অগোচর। অন্তত আকবর স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতো না, কেউ যদি এমনি এক রসালো গল্প তাকে শোনাতো, অবিলম্বে তার শিরচ্ছেদের আদেশ দিত।

কিন্তু এইবা কেমন ক'রে সম্ভব? মাতা হামিদা বানু এই সেদিন মৃত সম্রাটের শোকে মুহ্যমান হয়ে বৈরাগ্য জীবন আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর সেদিনের সেই বিচ্ছেদ বেদনার ইতিহাস কেউ না জানুক, সে তো জানে! মাতাকে যদি সেদিন সে উদ্ধার না করতো, তাহলে হয়তো তিনি স্বামীর বিয়োগ বেদনায় মুহ্যমান হয়ে সেই কক্ষেই আহার নিদ্রা ত্যাগ করে দেহ রাখতেন।

সমস্ত রাজপুরী সেদিন এই রাজরাণীর বেদনায় আবার নতুন করে মৃত সম্রাটের অভাব অনুভব করেছিল।

না, না এখনও সম্ভব নয়! তারই মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটেছে। তারই চোখের দৃষ্টিতে জাদুকরের ভেলকিবাজী চলেছে। কোন এক দক্ষ জাদুকর এমনি এক মায়ার সৃষ্টি করে তার মাতার প্রণয়লীলা প্রত্যক্ষ করাচ্ছে!

কিন্তু তাই যদি হবে তবে তার চেতনা কেন সজাগ? কেন সে সজাগ চেতনা নিয়ে এই কক্ষের ছাতের অলিন্দে দাঁড়িয়ে ঐ জেনানামহলের অভ্যন্তরে তাকিয়ে আছে? সে যে কেন ছাতে উঠেছিল, সে তা জানতো। এখনও জানে, সে এই বিসদৃশ্য চিত্র দেখবার জন্যে এই ছাতের অলিন্দে ওঠে নি। শিবালীকে দেখবার জন্যে তার আগ্রহ ছিল। শিবালী জেনানামহলের মধ্যে আরামে আছে কিনা দেখবার জন্যেই এই অলিন্দে উঠেছিল। সবই যখন চেতনার ভেতর আছে। এখন যা দেখলো, তা চেতনার বহির্ভূত জাদুকরীর ভোজবাজী হবে কেমন করে?

আবার সে অসহায় বোধ করলো। হয়তো সত্যিই সে এখনও বালক। বালকের চোখ নিয়ে সে যে দৃশ্য খারাপ মনে করেছে, সে দৃশ্য বড়দের মনের অন্য এক আচরণের দৃশ্য।

কিন্তু তাই বলে রাজরানী, সম্রাট হুমায়ুনের প্রিয়তমা মহিষী বর্তমান সম্রাট আকবর শাহের জননী; যাকে পিতা বলতেন জুলিবেগম, যাকে সে বলে পিয়ারী আম্মি—সেই রমণী এক ভিন্নপুরুষের পায়ের তলায় বসে কি প্রার্থনা করছে? আর সেই ভিন্ন একপুরুষ অন্য কেউ নয়, এ রাজ্যের সবচেয়ে বড় হিতৈষী বৈরাম খান।

বৈরাম খানকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বোধহয় তিনি অত্যধিক সুরা পান করেছিলেন। তার দেহ টলছিল, চোখ দুটি আমেজে ঢুলু ঢুলু ছিল। কথা শোনা যাচ্ছিল না কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল। তিনি বোধ হয় জড়িতস্বরে কি পেশ করছিলেন ?

আর মাতা পায়ের কাছে বসে কাতরতার দ্বারা তা প্রত্যাখান করছেন।

তবে কি পিতা বন্ধুকে রাজত্বের অভিভাবকত্ব দিয়ে তার মহিষীর দায়িত্বও অর্পণ করে গেছেন ? তাহলে এই ছলনা পূর্বে প্রকাশ করার কি দরকার ছিল ? না, না মা, আমার মা। তাঁর কোন অন্যায় পুত্রের দেখা অবশ্যই অপরাধ ? মায়ের সমালোচনা করা পুত্রের শোভা পায় না। যে পুত্রকে এই মা একদিন গর্ভে ধারণ করে জগতের মাঝে নিয়ে এসেছেন ?

আকবর তারপর আর সেই ছাতের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকে নি। একরকম মাতালের মত নীচে নেমে এসেছে। নিজের কক্ষে এসে বোবা পাথরের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সে কেমন যেন বোবা হয়ে গেছে।

একি দেখলাম আমি ? খোদা, তুমি আমাকে একি দৃশ্য দেখালে ? এই যদি জগতের আসল কলিজা হয়, তাহলে তুমি আমাকে এ জগত থেকে সরে যেতে সাহায্য কর।

আকবরের দু'চোখে জল নেমে এল। যেন যমুনা প্রাসাদের পাশ দিয়ে না বয়ে আকবরের দু'চোখের প্রান্ত দিয়ে নেমে প্রশস্ত বক্ষের পথ নিল !

সমস্ত কক্ষময় সে পাগলের মত ছটফট করে বেড়াতে লাগলো।

কক্ষের অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণবর্তিকার সামনে দাঁড়ালো। জোরালো আলোর সামনে দাঁড়িয়ে রক্তচক্ষু মেলে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে দেয়ালে টাঙানো তরবারীখানা টেনে নিল। বজ্রমুষ্ঠিতে ধরে অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণ বাতিদানে আঘাত করতে গিয়ে থমকে নিজেই বললো— এই কক্ষের কটি আলোকে আঘাত করলে কি পৃথিবীকে অন্ধকার করা যাবে ?

কিন্তু আমি কি করবো ? আমার মা অবিশ্বাসিনী, দ্বিচারিনী, ব্যভিচারিনী। আর আমি সেই সংবাদ জেনে নিঃশব্দে সম্রাটের ভূমিকা নিয়ে রাজ্য বিস্তারে মন দেব ? প্রজার মঙ্গল সাধনে নব নব অভিযান রচনা করে ঐশ্বর্যের এক বিরাট বৈভবে দাঁড়িয়ে নিজের কৃতিত্বের সাফল্যে উল্লসিত হব। আর অলক্ষ্যে কেউ দাঁড়িয়ে চুপি চুপি বলবে—জানিস্, বেচারী এই সম্রাটের মা নষ্টা জেনানা।

কে যেন অন্তরালে দাঁড়িয়ে পিশাচিনীর মত খিল খিল করে হেসে উঠলো।

জ্বালা, জ্বালা প্রচণ্ড জ্বালা। প্রশস্ত বক্ষের. অভ্যন্তরে যেন কিসের এক সুতীব্র অগ্নিদাহ দাউ দাউ করে জ্বলছে। সমস্ত শিরা উপশিরায় সেই জ্বালার তাপ লেগে কেমন যেন শোণিতে রণতাণ্ডব শুরু হয়েছে। পুষ্ট বাহুর কঠিন বলিষ্ঠতা যেন দুর্বল হয়ে শিথিল হয়ে গেছে।

আকবরের শরীরে আর কোন শক্তি থাকলো না। সে যেন কেমন দুর্বল হয়ে সারা কক্ষময় ছটফট করে বেড়াতে লাগলো।

মুঘল রাজত্বের হৃতঐশ্বর্য আবার ফিরে এসেছে। দিল্লীর প্রাসাদ শীর্ষে মুঘল পতাকা বাতাসে উঠছে। সে শুধু উড়ছে না একটি যোদ্ধা জাতির শৌর্যবীর্যের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করছে। আকবর বিবশ চোখে দেখতে লাগলো তারই কক্ষে ঐশ্বর্যের কত বিচিত্র সম্ভার। মণিমুক্তার কত ছড়াছড়ি যত্রতত্র। হীরা, চুনি, পান্নার রোশনাই তারই দেহের ওপর বিচিত্রভাবে ছড়িয়ে আছে। খানা আসে যত রাজসিক, হুকুম করলে এখুনি আসবে, যা তার প্রয়োজন। কোন অভাব নেই। কোন মালিন্য নেই।

তবে তার চোখে জল কেন? তবে তার বক্ষে জ্বালা কেন? তবে সে কিসের বেদনায় দুঃসহ হয়ে জীবন শেষ করতে চাইছে?

রাত্রি এগিয়ে চললো। সে থমকে দাঁড়াল না। মুহূর্ত তার কাজ করে ধীরে ধীরে প্রহরের দিকে এগিয়ে চললো।

হঠাৎ আচমকা কক্ষে প্রবেশ করলো খাসভৃত্য।

সে হয়তো কোন প্রয়োজনে কক্ষে প্রবেশ করেছিল, কিম্বা প্রভুর কোন ফরমাইজ আছে কিনা জানতে এসেছিল।

কিন্তু তাকে দেখে আকবর হঠাৎ বিকৃতকণ্ঠে বললো—সরাব লে আও!

খাসভৃত্য রহিম খাঁ প্রভুর ফরমাইজিতে চমকে উঠলো।

বুঝতে পারে নি এমনি ভান ক'রে আবার তাকাতে আকবর হঠাৎ অস্বাভাবিক চীৎকার করে বললো—সরাব, সরাব। আমি সরাব পান করবো। যা উল্লুক জলদি নিয়ে আয়। আস্‌লি সরাব। যে সরাব পান করলে হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা নিবৃত্তি হবে। মানসিক দুশ্চিন্তা থাকবে না। সুস্থ চিন্তাধারা রুদ্ধ হয়ে সমস্ত বুদ্ধি ঘোলাটে হয়ে যাবে। আমি চাই সরাব পান করে সেই দুর্লভ অন্ধকার লোকে চলে যেতে।

রহিম খাঁ ততক্ষণে কক্ষত্যাগ করে চলে গেছে।

আকবর মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে একটি মূল্যবান ডিভানের ওপর বসলো। দুহাত দিয়ে কপালের রগদুটি চেপে ধরলো। জীবনে এই সুরা স্পর্শের প্রথম শুভক্ষণটি মনে এলেই মনে পড়বে এই ভয়ঙ্কর দুষ্ট উপলক্ষ্যটি। এর চেয়ে জীবনে খারাপ সময় তো আর নেই! এমনি কোন এক অসহমুহূর্ত এলেই জীবনের সব সঙ্কল্প বানচাল হয়ে যায়।

না, আর কোন কথা সে ভাবতে পারছে না। এখন বুদ্ধিকে, বিবেককে, চিন্তাকে লয় করে নিঃঝুম হয়ে মাতাল হতে হবে। সুরার আস্বাদন সে জানে না।

তবে যারা সুরা পান করে, তাদের জিজ্ঞেস করে দেখেছে, জলীয় পদার্থটা যখন গলা দিয়ে বুকের নীচে নেমে যায়, সে তার অস্তিত্ব প্রকাশ করতে করতে যায়। অস্তিত্বের সেই জোরালো শক্তি দগ্ধ করতে করতে জ্বালিয়ে দিয়ে যায় কিন্তু তারপর হঠাৎ সেই যন্ত্রণা বিলুপ্ত হয়, নেমে আসে চোখের দুই দৃষ্টির মাঝে কেমন যেন এক নতুন জগতের সৌন্দর্য। সেখানে বর্তমানের কোন বেদনা নেই। স্পন্দনহীন জীবনের মাঝে এক নতুন স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে শোক, তাপ, দুঃখ, বিরহ, আঘাত সব ভুলিয়ে দেয়। সবগুলি ইন্দ্রিয় এক জায়গায় হয়ে আদিম এক আকাঙ্ক্ষা মনে ধরে, যা আনন্দের জন্যে, সুখের জন্যেই সৃষ্টি। সেখানে বিবেক দংশন করে না। চেতনা জাগ্রত হয়ে ন্যায়ের পথ ধরায় না। অন্য এক অনুভূতি। বিস্মৃত এক উপলব্ধি। স্বপ্নের এক নতুন জগত।

মুঘল রাজপুরুষরা সকলেই মদ্যপান করতেন। এমন কি জেনানামহলের বহু আওরত আজও মদ্যপান করে। তার মা পিতা বেঁচে থাকতে তাঁর সঙ্গে করতেন, এখন করেন কিনা সে জানে না।

সেও মদ্যপান করবে, তবে বয়সের একটা পরিমাপ আছে বলেই তার দ্বিধা ছিল। এ বয়সে মদ্যপান করলে আনুসাঙ্গিক উপগ্রহগুলি এসে জুটবে। আর তাদের প্রশয় দিতে গেলে শারীরিক যে বৃদ্ধি তা তার নষ্ট হয়ে যাবে। শরীরকে গঠন করতে গেলে, শক্তিশালী হতে গেলে অকালে শরীরকে ধ্বংস করা অন্তত বলশালী যোদ্ধার উচিত নয়।

বুদ্ধি তার আছে বলেই লোভের হাত থেকে সে নিস্কৃতি পেয়েছে। না'হলে অন্য কেউ হলে এতদিনে কবে সুরাপানে আসক্ত হয়ে অপরিণত মনে রঙমহলে গিয়ে হুল্লোড় করতো। আর যখন অসি ধরে যুদ্ধ করতো, দুর্বল হাতে কম্পিত বক্ষে পরাজিত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে প্রাণভিক্ষা করতো।

এসব জানে বলেই আকবর নিজেকে অনেক সংযমের ভেতর দিয়ে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু লাভ কি হল?

নিজেকে সম্রাটের মত তৈরী করে লাভ কি হল?

জগতের চতুর্দিকে নির্মলতার চেয়ে ধূসর পাণ্ডুরতাই বেশী। অন্ধকারের গোপনতাও কম নয়। পাপের এমনি বিচিত্র রূপ চতুর্দিকে হাত-পা মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে, সেখানে ঈশ্বরের উপাসনা নির্বুদ্ধির লক্ষণ বলেই মনে হয়।

আজ সে মর্মে মর্মে বুঝতে পারছে, তার এতদিনকার মানসিক সোপান নির্বুদ্ধিতাকেই প্রশয় দিয়েছে। সকলে তাকে যে বালক বলে তার কারণই হচ্ছে, সে বালকোচিত আচরণে অভ্যস্ত বলে। অজ্ঞানকে কখনও জ্ঞান দান করা উচিত নয়। জগতের যত অঘটন তাকে গোপন করে ঘটে যাক্। সে ঈশ্বরের সহজ পথই গ্রহণ করবে? কারণ তার জগত সীমাবদ্ধ। সে জানে জগতের সহজ পন্থাটুকু। জটিল জীবনের রূপ সে জানে না।

আকবর নিজেকে আঘাত করতে চাইলো। সত্যিই সে বুদ্ধিহীন। সে মানুষের আকৃতি দেখেই বিচার করে। মানুষের কোমলমনের কথা শুনে বিগলিত হয়।

কিন্তু জানে না, মানুষের আকৃতির পিছনে তার অনেক ছদ্মবেশ আছে। মানুষ যখন হত্যা করে তখন তার মুখের ওপর যে দৃশ্য ফুটে ওঠে, সে কি আর পরে থাকে? মানুষ যখন জঘন্য কাজ করতে উৎসাহিত হয়, তখন তার মুখের আকৃতি কি একেবারে পরিবর্তিত হয়? তেমনি মানুষের কোমলস্বরের কথার মধ্যেও থাকে প্রবঞ্চনা। সে কার্যোদ্ধারের জন্যে ছলের আশ্রয় নেয়।

এসব কথা কিন্তু এখন আকবর ভাবতে পারে।

এখন সে সমস্ত ভাবনায় উর্ধ্বে উঠে ভাবনাহীনের আবর্তে ঢুকে ঘুরপাক খাচ্ছে। বিরাট উত্তেজনায় তার দেহের কামিজ ঘামে ভিজে চুবুচুবু। প্রশস্ত কপাল দিয়েও দরবিগলিত ধারায় ঘাম ঝরছে। দু'চোখে জলের ধারা ছিল, এখন শুধু রেখা স্পষ্ট হয়ে আছে। এখন দু'চোখ দিয়ে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। বাঁদিকে গালের নীচে যে বড আঁচিলটি ছিল, সেটি ক্রোধের জন্যে স্ফীত হয়ে রক্তবর্ণ আকার ধারণ করেছে।

বান্দা রহিম খাঁ সুরা আনতে গেছে অনেকক্ষণ। আনতে তার অনেক বিলম্ব হচ্ছে। তবে কি সে গেছে অভিভাবককে জিজ্ঞেস করতে—বালককে সুরাপাত্র দেবে কিনা!

এইকথা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে আকবর আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, এত বড় স্পর্ধা ঐ নফরের! তার হুকুমকে এরা খোদার হুকুম মনে করে না! তার হুকুমকে অবমাননা করে অভিভাবকের নির্দেশ নিতে যায় যে সব বেতমিজরা তাদের চাবুক মেরে শায়েস্তা করতে হবে।

এই কে আছিস? আকবর হঠাৎ আবার অস্বাভাবিকস্বরে চীৎকার করে উঠলো।

এইসময় কক্ষে এসে প্রবেশ করলো অনেক লোক। অনেক রমণী ও পুরুষ। তার মধ্যে শুধু আকবর চিনলো মাকে, তার কয়েকজন ধাত্রীমাকে। আর যাকে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করে সেই বৈরাম খানকে।

আকবর তাদের দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল!

হঠাৎ তার চোখে পড়লো ভৃত্য রহিম খাঁকে। তাকে দেখেই আবার ক্রোধ সপ্তমে উঠলো—এই বেতমিজ, উল্লুক কাঁহাকা! সরাব কাঁহা!

হামিদা কাছে এগিয়ে এলেন। সস্নেহে আকবরের একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন—গোসা কেন কর বেটা? আমিই ওকে সরাব নিয়ে আসতে নিষেধ করেছি।

কেন করেছ? আমি কি এখনও বাচ্চা আছি? হাত ছেড়ে দাও। এই বলে আকবর ঝাঁকি দিয়ে মায়ের বন্ধন থেকে নিজের হাতখানি ছিনিয়ে নিল।

যা কোনদিন আকবর করে নি, শেষপর্যন্ত তাই সে করলো। মাকে সবার সামনে এমনিভাবে অপমান করার আকাঙ্ক্ষা কখনও তার হয় নি। মাকে সে ভালই বাসতো! এমন ভাল বোধ হয় কোন পুত্র তার মাকে বাসে না। এবং

এ কাহিনী সবাই জানতো, তাই আকবরের অমনি আচরণে উপস্থিত নারী-পুরুষেরা আশ্চর্য হল।

পুত্রের অস্বাভাবিক আচরণে হামিদা বানু মাথা নত করলেন। তার দু'চোখের কোণে মুক্তাবিন্দু দেখা দিল।

আকবরের চোখে পড়লো তা কিন্তু মাতার পূর্বের সেই আচরণ স্মরণ পড়তে সে আবার ক্ষিপ্ত হল। না, কোন ক্ষমা না! বরং এমন আচরণ প্রকাশ করতে হবে, যার মধ্যে মাতা-পুত্রের কোন সম্পর্ক নেই। শত্রু, শত্রুতাই পুত্রের সাথে মাতার সম্পর্ক।

এইসময় হামিদা বানু ক্রন্দন মুখরিত কণ্ঠে বললেন, বেটা, তোমার কি হয়েছে সত্যি করে বলো? হঠাৎ এমনি আচরণই বা প্রকাশ করছো কেন? তুমি তো এমনি কখনও ছিলে না!

ব্যস্, ব্যস্, আমি এসব মিঠি মিঠি বাত শুনতে চাই না। আমি জানতে চাই, আমার বান্দাকে আমি যা ফরমাইজ করেছি, তা পালিত হবে কি না!

হঠাৎ এই সময়ে বৈরাম খান অভিভাবকের মেজাজে গম্ভীরস্বরে বললেন—রাজকুমার, মা বলে যদি সম্মান না দাও, আওরত বলেও নিশ্চয় সম্মান দেবে। তোমার এই ঔদ্ধত্যে আমি আশ্চর্য হচ্ছি, তুমি মুঘল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়ে হঠাৎ কেন এমনি আচরণকে প্রশয় দিচ্ছ?

আকবর হঠাৎ বৈরামখানের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গস্বরে মাথা নত করে বললো—সেলাম আলেকুম খানসাহেব। তারপর হঠাৎ সরোষে গর্জন করে বললো—আপনি পিতৃতুল্য না হলে আপনার ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত শাস্তি তৈমুরের বংশধর আকবর শাহ নিজে হাতে দিত। যাই হোক্ উপস্থিত আমাকে আর ক্ষিপ্ত না করে আপনারা অনুগ্রহ করে আমার কক্ষ ত্যাগ করলে সুখী হব।

এই সময় বিবি রূপা বলে তার এক অন্যতম ধাত্রীমা এসে আকবরের হাত ধরলো।

আকবর হঠাৎ দারুণ কাতর হয়ে দু'হাত জোড় করে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললো—আপনারা আমার পূজনীয়া। কেন আপনারা আমার ক্ষুব্ধ মনের বাষ্পাচ্ছাদিত রূঢ় কথাগুলি শুনে মনে বেদনা পাবেন? আমি কেন এমন আচরণ করছি, যদি বলতে পারতাম তাহলে হয়তো এই জটিলতা অপসারিত হত কিন্তু এমন এক মানসিক দ্বন্দ্ব যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ধীরে ধীরে সকলেই কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

আর আকবর কেমন যেন একা বসে বসে দারুণ এক বেদনায় নীল হয়ে গেল। মাকে কত সে কটু কথা বললো। মায়ের চোখে জল দেখে অন্য সময় হলে সে কত কাতর হত! আর আজ সম্পূর্ণ বিপরীত। কাতর তো সে হলই না, বরং আরো জ্বালা আরো প্রদাহ।

এই সময় রহিম নয় অন্য একজন বান্দা একটি পানপাত্র ও একটি স্বর্ণভৃঙ্গারপূর্ণ সরাব নিয়ে এসে কক্ষে ঢুকলো।

তার হুকুম তামিল করা হয়েছে দেখে আকবর মনে মনে প্রীত হল।

আর চিন্তা না। এবার নতুন সাথী। নতুন জগত। বিড়ম্বনা নেই! আছে অনাবিল অফুরন্ত আনন্দ। দেখা যাক্ জগতের সবকিছু ভুলে রঙের জগতে গিয়ে রঙীন হওয়া যায় কি না!

আকবর কাছে টেনে নিল পাত্র, পূর্ণ করলো গুলাবী আতরের খুসবু দেওয়া সরাব, তারপর গলায় ঢেলে দিল এক নিমেষে।

চলে গেল জ্বালা নিয়ে দগ্ধ করতে করতে কোমল তন্ত্রে সজাগ সাড়া তুলে। প্রথম সুরার আস্বাদের এই অভিজ্ঞতা মর্মে মর্মে হৃদয়ে সাড়া জাগালো। হঠাৎ বুকটা অসহ্য যন্ত্রণায় চেপে ধরে আকবর নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কী অসহনীয় যে অনুভূতি! কী দুর্বহ যে উপলব্ধি! চোখ ফেটে তার জল বেরিয়ে পড়লো।

এই সময় সেই বান্দা বললো—হুজুর, আপ মাত পিজিয়ে, সরাব আপকো লিয়ে নেহি।

রক্তাভ চোখে আকবর বান্দার দিকে তাকালো। বান্দার স্পর্ধা দেখে সে ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার করে উঠলো, বেল্লিক—বেতমিজ। জুতি মারকে মু তেরা তৌড় দেউঙ্গা। অউর সরাব, জাদা সরাব। আজ রাত ভোর সরাব পান করেই যাব।

এই বলে আকবর আরো কয়েকপাত্র মদির সুরা গলায় ঢেলে মাতাল হয়ে উঠলো। বীভৎস হয়ে উঠলো। বিকৃতমুখে, ভয়াল চোখে, রক্তাভ দৃষ্টিতে বান্দার দিকে তাকাতেই সে সভয়ে সেলাম পেশ করতে করতে কক্ষ থেকে অদৃশ্য হল।

আকবর সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাস্য করে, রাত্রের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে বোবা মর্মর দেয়ালের গায়ে কম্পন তুলে চতুর্দিকে ভরিয়ে তুললো—হাঃ হাঃ হাঃ।

না, দুনিয়ার সঙ্গে কদিনই মুঘল বংশধরের কোন সম্পর্ক থাকলো না। সোনার বর্ণের সূর্যের উদয়কালে যে যুবক তাকে চুম্বন করবার জন্যে রাত্রির এক প্রহর থাকতে বাইরে বেরিয়ে পড়তো, কোনদিনও কোন অজুহাতে এই নিয়মের তার কেউ শৈথিল্য দেখে নি, শেষপর্যন্ত তাও হল। সূর্য বুঝি যমুনার অতল থেকে ম্লান দ্যুতি নিয়ে অবনত মস্তকে উদয় হল। বাতাস বুঝি আর সহজগতিতে বইলো না, কোথা থেকে যেন জলীয় তাপ বহন করে এসে দাহ সৃষ্টি করলো। মালঞ্চ বনে কুসুম বৃন্তে নতুন কলির আবির্ভাব হল না। যদিও বা আবির্ভাব হল, অলিদল এসে গুঞ্জরণ করলো না।

না, ভুল। পৃথিবী ঠিকই চললো। প্রকৃতি তার আপন নিয়মের বৃত্তে আবর্তিত হয়ে সব কিছুই সমাধা করলো। বিহঙ্গদল গান গাইতে গাইতে নদীর পার দিয়ে, বৃক্ষের অভ্যন্তর দিয়ে, মেঘের সীমানা ডিঙিয়ে বাসায় ফিরলো। মসজিদে আজানের করুণ সুর আসমানের বুকে প্রতিধ্বনিত হল। প্রাসাদ সিংহদরজার মাথায় নহবতখানায় মোহিনী রাগে সানাই বাজলো। রাজপুরীর অভ্যন্তরে খুব বিশেষ একটা চাঞ্চল্য জাগলো না। শুধু অন্তঃপুরে একজন অবিরাম কেঁদে চললো। সেইজন্যে অন্তঃপুরের রমণীদের মন বিস্বাদ।

তাও খুব বেশী নয়। যে কাঁদছে, সে কাঁদুক। কেউ না জানুক সে তো জানে, তার পাপের এই পরিণতি। তার অন্তর তো মিথ্যে নয়! সে নিজের বুকে হাত দিয়ে কখনও মিথ্যেকে ঢাকা দিতে পারবে না। যমুনার জলের ওপর হয়ত অনেক কল্লোল। অনেক সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে সে দর্শককে বিমোহিত করে কিন্তু যমুনা নিজে জানে, তার অতল জলের তলায় আছে কত পাপের হিমস্রোত, কত গোপন জঞ্জালের বিশ্রী স্তর।

সেইজন্যে অন্তঃপুরে যে নীরবে কাঁদছে. কাঁদুক। তার দিকে দৃষ্টি দেবার কারুরই দরকার নেই। রাজা-বাদশাহের রাজপুরীতে যেমন বহুলোক, তার বহু কলরব। উৎসব বাড়ীতে যেমন হয়, কেউ কারও খবর রাখে না। তেমনি মুখরিত সর্বদা এই রাজপুরী। অনেক গণ্ডগোলের মধ্যে কে কাঁদলো, তার অনুসন্ধান বড় একটা হয় না।

তবে নবীন সম্রাট আকবরের পরিণতিতে সকলেরই বিস্ময় উপস্থিত হল। আমীর, ওমরাহরা পর্যন্ত সচকিত হল।

দরবার গৃহ বন্ধ। সম্রাট যখন সিংহাসন অলঙ্কিত করবে না, তখন দরবারগৃহ খুলে কি হবে? সম্রাট না হয় রাজকার্য করে না, কিন্তু তাকে সামনে রেখেই তো মন্ত্রী, সেনাপতি এঁরা দরবার করেন? নিয়ম যেখানে শৃঙ্খলাবদ্ধ, সেখানে নিয়মের বহির্ভূত কোন কাজ করা যায় না। সেইজন্যে বাদশাহের অনুপস্থিতিতে সব কাজ বন্ধ হয়ে গেল।

বাদশাহ এখন আকণ্ঠ সুরার সমুদ্রে অবগাহন করে কর্তব্য ভুলেছে।

কেউ কেউ অন্তরালে মুচকি হেসে বললো—বাদশাহ নতুন সরাব পান করতে শিখেছে তো তাই এই অবস্থা! তা বেশ, মুঘল বংশের ধারাকেই অনুসরণ করেছে। রক্তের সম্বন্ধ যাবে কোথায়?

আবার কেউ বললো—এবার দু'চারটি খুবসুরত সায়েদ মাসুম চিড়িয়া খাসকক্ষে পাঠিয়ে দাও।

কিন্তু বয়স যে বড় অল্প! জেনানার উত্তাপ সহ্য করতে পারবে কেন?

ঠিক পারবে! মুঘল পুরুষদের শক্তি আলাদা ছাঁচে ঢালা। পূর্ব-পুরুষদের কথা শোন নি, তাদের মানই এই বাদশাহ রাখবে। এই বয়সে অন্য কেউ হলে হয়তো সরাবের পাত্র ধরতেই হাত দশবার কাঁপতো কিন্তু শুনছো না, সরাবখানা উজার করে শুধু মদ চলেছে। এবার হয়তো শোনা যাবে মজুত সরাব সব নিঃশেষ।

রুদ্ধদ্বার। বান্দার প্রবেশ ছাড়া কারো প্রবেশের হুকুম নেই। হুকুম নেই কোন রিস্তেদার আওরতের, রাজমাতা হামিদা বানুর। নফরসর্দার গোলাম মহম্মদের। শিক্ষক মীর আব্দুল লতিফের।

তবে একবার আব্দুল লতিফের প্রবেশাধিকার মিলেছিল। কাতর অনুনয় করে বান্দার হাতে দিয়েছিলেন এক খত।

'খোদার কসম জাঁহাপনা, আমি আপনার বিশ্রামে এতটুকু ব্যাঘাত সৃষ্টি করবো

না। শুধু আমার অভিপ্রায় প্রিয়তম ছাত্রের মুখদর্শন। এখন কোন জ্ঞানদান করা নয়। ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ নয়। দোস্তের সাথে দোস্তের মিতালী। মহব্বতের এক সুতীব্র আকর্ষণ অনুভূত হতে, তাই চাই প্রিয়মুখ দর্শন।'

কি সুন্দর কথার যোজনা! কি মুগ্ধ বিস্ময় এই কথার মধ্যে? আকবর উপেক্ষা করতে পারে নি। নেশায় সমস্ত শরীর তার টলে আছে। জ্ঞান নেই অথচ অজ্ঞানও হয় নি। চেতনার বহুদূরে অবস্থান করেও অচেতন সে হয় নি। সুখাদ্য উদরে এতটুকু নেই, অথচ অখাদ্যের শেষ নেই।

সে নেমে গেছে একেবারে নিঃসীম অন্ধকারের অতলান্তে। সে যেন তাকে মাটির তলায় কোন অন্ধকার বন্দীকক্ষে চিরকালের জন্যে আবদ্ধ করেছে কিন্তু তার জন্যে তার নেই কোন দুশ্চিন্তা। বরং সে আরো অন্ধকার প্রদেশে মিলিয়ে যেতে চায়।

এই সময় আব্দুল লতিফের এই খত। প্রথমে বান্দাকে তাড়া করলো, তারপর হঠাৎ লতিফসাহেবকে মনে আসতে সে হঠাৎ বান্দাকে ডেকে খতটি হাতে নিল। এই লোকটিকে যে সে খুব পছন্দ করে, এ কথা তার মনে পড়লো। পৃথিবীতে যদি কেউ তার এতটুকু আপন থাকে, মনে হয় এই লতিফসাহেব। এতবড় জ্ঞানী পুরুষ কিন্তু কোন অহমিকা নেই, বরং এমন সুন্দর কথা বলেন যা কেউ কখনও বলে নি। তাছাড়া আকৃতিতে আছে অদ্ভুত এক কমনীয় আকর্ষণ যা সচরাচর মেলে না।

নেশায় জড়ানো দেহ, ভাল করে লালচোখ দুটো মেলে দেখা যায় না। এ কদিন কেমন চেহারা হয়েছে তাও সে জানে না। বিরাটদর্পণ কক্ষের দেয়ালের চতুর্দিকে খোদিত আছে কিন্তু সভয়ে দর্পণের সামনে সে যায় নি।

সে তো ধ্বংস হতে চাইছে। ভুলে যেতে চাইছে সব, তবু ভুলতে পারছে না কেন? লোকে বলে, সরাব পান করলে সব বিস্মৃতি হয় কিন্তু কোথায় সেই বিস্মৃতি? আর কত পরীক্ষা হবে! সরাব হেরে গেছে তার কাছে। সরাব পারে নি নতুন মাশুককে জয় করতে। আকবর জয় করেছে সরাবকে। তবু সে পান করে চলেছে। যদি একবার সব বিস্মৃতি ঘটে! দর্দ কমে।

এমন সময়ে আব্দুল লতিফের একটুকরো খত।

খতটি হাতে নিয়ে সে পড়বার চেষ্টা করলো, শুদ্ধ ফার্সীতে সুন্দর হস্তাক্ষরের বয়ান। আব্দুল লতিফের সুন্দর হস্তাক্ষর সে চিনতো কিন্তু এই পরিবেশে আরো একবার তাকে মুগ্ধ করলো। আরো একবার সে জড়িতস্বরে বাহবা দিল। কিন্তু একি? পত্রটি তো সে পড়তে পারছে না। চোখে কেমন যেন ঝাপসা দেখছে। মাথাটার মধ্যে দারুণ যন্ত্রণা। লিপির অক্ষরগুলি কেমন যেন দৈত্য-দানবের মত চোখের সামনে কালো আলখাল্লা পরে এসে নৃত্য করছে!

কয়েকবার চোখ টেনে পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করে হঠাৎ বিরক্ত হয়ে সামনে দণ্ডায়মান বান্দাকে হুকুম করলো—পড়তে পারিস্?

জী, আজ্ঞে!

পড়্ তাহলে। শয়তান চোখদুটো কেড়ে নিয়েছে, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

বান্দা ভয়ে ভয়ে বাদশাহের হাত থেকে খতটি নিয়ে পাঠ করে শোনালো।

একটুখানি ঝিম মেরে মাথাটা নীচু করে আকবর বোধ হয় নিজেকে নেশা থেকে সরানোর চেষ্টা করলো, তারপর নিজেই ফিসফিস করে বললো—কেন যে এঁরা এখন দেখা করতে চান? এঁদের আমি শ্রদ্ধা করি। সেলাম জানাই। পেয়ার করি। এখন আমি দোজাখের অন্ধকার পথে নেমে পড়েছি। আলো আর চাই না। জীবন আর চাই না। কেউ সান্ত্বনা জানাক্ তাও যে চাই না। তবে কেন এই আহ্বান? আমার বুকের মধ্যে যে বেদনা, সে বেদনা জানাবার তো কোন উপায় নেই। তাই নিজের জ্বালায় নিজেই দগ্ধ হয়ে নিঃশেষে জীবনকে উৎসর্গ করেছি।

তারপর হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বান্দার দিকে তাকিয়ে হুকুম দিল, মিঞাসাহেব কো লে আও!

আব্দুল লতিক কক্ষে এসে দাঁড়ালেন। সেলাম পেশ করে আকবরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। দেখতে লাগলেন তাঁর ছাত্রের অবনতি। আকবরকে তিনিও যে ভালবেসে ফেলেছেন। কোথায় যেন তাঁর স্বভাবের সঙ্গে এই রাজকুমারের স্বভাবের মিল। তিনি বহু পড়াশুনা করে আজকে জ্ঞান আহরণ করেছেন। আজ পেয়েছেন সমস্ত চিন্তার একটা শেষ পরিণতি। আর এই রাজকুমার কোন কিছু অধ্যয়ন না করেই পেয়েছে তারই মত লক্ষ্যবস্তুর সন্ধান। তাঁর সেই গোপন প্রত্যাশা বুঝি এই তরুণ যুবকের ভেতর দিয়েই একদিন লক্ষ্যে গিয়ে পৌছবে।

তাই তিনি বড় ভালবাসেন এই কুমারকে। রাজা বলে নয়, বাদশাহ বলে নয় শক্তিধরের শক্তির সন্ধান পেয়ে। একজন উল্লেখযোগ্য পুরুষের ভেতরে তার চিন্তার সন্ধান পেয়ে মমতার আধার দিয়ে ঘিরে ফেলেছেন।

কিন্তু হঠাৎ একি? কেন এমন পরিণতি হল? বাইরের লোকের কথায় বিশ্বাস করেননি। নিজে চাক্ষুস না দেখে বিশ্বাস করবেন না বলেই ছুটে এসেছেন। জানেন এ সময় ঐ পরিবেশে গেলে নিজের সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে পারে, তবু নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারেন নি!

একটা অপূর্ব জীবন অকালে ধ্বংস হয়ে যাবে? একটা উজ্জ্বল্যমান হীরকখণ্ড জ্যোতি বিকীরণ করবার পূর্বেই লুপ্ত হয়ে যাবে? তবু যদি নিজের এতটুকু সাহায্য দিলে ফিরে আসে সেই মন, চেষ্টা করবেন না? সেইজন্যে এসেছেন। বড় প্রত্যাশা নিয়ে ধীর পায়ে ভীরুমনে বাদশাহের কক্ষে এসে ঢুকেছেন।

আকবর এই সময় আবার পাত্র পূর্ণ করে গলায় ঢালছিল।

আব্দুল লতিফ ব্যথিত স্বরে বললেন—আমার গোস্তাখি মাফি হয় কুমার! কেন তুমি নিজেকে এমনিভাবে নষ্ট করে দিচ্ছ?

আকবর হঠাৎ পাত্র নিঃশেষ না করে মধ্যপথে থেমে গিয়ে অবাক হয়ে আব্দুল লতিফের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—এ প্রশ্ন কেন করছেন মীরসাহেব! আমি আজ সব প্রশ্নের বাইরে চলে গেছি।

ক্যয়া তক্‌লিফ?

তাও বলবার নয়। শুধু সরাব পান করে দেখছি, অনেকে যে সরাব পান করে আনন্দ পায়, আমি পাই কিনা! কিন্তু কত ভাণ্ড শেষ করে দিলাম, বিনিময়ে কিছুই মিললো না। যার জন্যে সুরায় আসক্ত হলাম তাও ভুললাম না।

তারপর হঠাৎ কাতর হয়ে বললো—আপনি তো বহু জ্ঞান আহরণ করেছেন, আপনাকে আমি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করি। বলতে পারেন জীবনের কোন আঘাত ভুলতে কি উপায় অবলম্বন করা যায়?

আব্দুল লতিফ বুঝতে পারলেন, সম্রাটের দুঃখ কোথায়? নবীন সম্রাটের সুস্থ সবল মনে হঠাৎ কোন এক চরম আঘাত তাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। তাই তার এই পরিণতি। কিন্তু হঠাৎ তিনি নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে সোনা দগ্ধ হয়ে সাচ্চারূপ নিচ্ছে। আঘাত পাওয়া দরকার। আঘাত না পেলে জীবন মজবুত হবে না। জীবনের সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে চাই অধ্যবসায়। অধ্যবসায় উপদেশের দ্বারা বোঝানো যায় না। রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে যোদ্ধার অভিনয় করে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে হবে। সম্রাট হয়তো দরবারে বসে অপরাধীর বিচার করতে পারে। দণ্ড সকলেই দিতে পারে কিন্তু মানুষের অন্তরের স্নেহ সবার ভাগ্যে মেলে না, যে না বোঝে অন্যের অন্তরের বেদনা।

হঠাৎ আব্দুল লতিফ সেলাম পেশ করে বললেন—হুজুর আমি যাই।

কিন্তু আমার জবাব!

জবাব তুমিই একদিন নিজের কাছে পাবে।

এ কথার অর্থ?

এর বেশী আজ আর আমার জানাবার নেই।

কথাগুলি কি রূঢ় শোনালো না?

হয়তো শোনালো কিন্তু আঘাত প্রতি মানুষের জীবনে দরকার। আজ তোমার হয়তো কষ্ট হচ্ছে কিন্তু একদিন উপকার হবে। আমি যাই কুমার। আমি যা জানতে এসেছিলাম জেনে গেলাম।

আব্দুল লতিফ ছাত্রকে সম্রাটের সম্মান দান করে কক্ষ থেকে অদৃশ্য হলেন।

আকবর নিজের দেহে হঠাৎ চপেটাঘাত করে জানতে চাইলো, সে চেতনার মধ্যে আছে কিনা!

তারপর হঠাৎ নিজেই হো হো করে আপন মনে হেসে বললো—আসলে লতিফসাহেবেরও মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। আঘাত বোধ হয় তার জীবনে আছে বলে

সবাই আঘাত পাক তাই তিনি চান। এসব তত্ত্বকথা শোনার মত মর্জি আর নেই। এই বলে আকবর আবার মদ্যপান করতে লাগলো। কিন্তু হঠাৎ ভৃঙ্গার নিঃশেষিত দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার করে ডাকলো—বান্দা, এই উল্লুক ক্যা বাচ্চা! সরাব লে আও। আউর জাদা সরাব। গুলাবী সরাব। আতরের খুসবু মাখা সরাব।

হঠাৎ মনের মধ্যে গান এল। সুরের সুকুমার রাগিনী কোন্ অদৃশ্যলোক থেকে এসে কণ্ঠে সুর পরালো। নেশায় জড়ানো মনে আকবর গান গেয়ে উঠলো।

সেও গান গাইতে পারে, তারও কণ্ঠে গান আছে। তারও মনে সুর আছে। সঙ্গীতকে সে শুধু পছন্দ করে না, অন্তর দিয়ে ভালবাসে।

কিন্তু তার গান কেউ শুনতে পায় না। শ্রোতাকে শোনায় না সে। যখন মনে সুর আসে, সে আপন মনে গান গায়।

আজ কিন্তু আপন মনে গাইলো না, উদাত্তস্বরে নূরউল্লারই এক সঙ্গীত গেয়ে উঠলো। হঠাৎ তার চোখ দিয়ে জল হুহু করে গাল বেয়ে ঝরে পড়তে লাগলো।

তারপর আবার কি ভেবে বিরক্ত হয়ে চোখের জলকেই শাসন করলো।

আমি সম্রাট আকবর শাহ। আমি দিল্লীর সিংহাসনে বর্তমানের বাদশাহ। মুঘল বংশের উজ্জ্বল প্রদীপশিখা। আমার মত সৌভাগ্য ক'জনের আছে, তবু আমার চোখে এত জল কেন? কি দুঃখ আমাকে পোড়াচ্ছে, যার জন্য কিছুতে নিজেকে প্রকৃতস্থ করতে পাচ্ছি না!

কিন্তু ভুললে কেমন করে চলবে? ভোলা যে যায় না। যা চোখে দেখে মনের আয়নায় প্রতিফলিত হয়েছে, সে যে অদৃশ্য হয় না!

হঠাৎ আকবর চীৎকার করে ডাকলো, এই কে আছিস্?

একটি লোক সেইসময় আবার সরাবপূর্ণ ভৃঙ্গার নিয়ে প্রবেশ করলো। তাকে আকবর হুকুম করলো—একজন খুবসুরত যুবতী সুগায়িকা আমার কক্ষে নিয়ে আয়।

নফর দ্বিরুক্তি না করে সেলাম পেশ করে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ আকবর আনন্দে খুশি হয়ে উঠলো। সে বড় হয়ে গেছে। সে স্বাধীন হয়ে গেছে। তার ওপর আর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। এখন সে নিজের খুশিতে যা কিছু ইচ্ছে করবে সমস্ত গোলামরা তা তামিল করবে।

সত্যিই এক খুবসুরত জোয়ানী আওরত সেলাম পেশ করতে করতে কক্ষে প্রবেশ করলো।

আকবরের মনে হঠাৎ সরম জেগে উঠলো। নেশা তখনও তার দুই চোখে। পালঙ্কের শয্যার ওপর ঢলে পড়ে সে সামনে মেহগনি টেবিল থেকে পাত্র পূর্ণ করে পান করছে।

দুই চোখে ঢুলুঢুলু আমেজ। হঠাৎ সেই আমেজের মধ্যে আওরতের সুরতের বহ্নি তার চোখে দপ্ করে জ্বলে উঠলো।

আওরত অপরূপ সাজে সজ্জিতা রক্তবর্ণের পোষাকের সঙ্গে পরেছে মূল্যবান

জড়োয়ার অলঙ্কার। কানে হীরার কুণ্ডল থেকে আলো বেরিয়ে জ্যোতি ছড়িয়েছে। বক্ষের শুভ্র পেলতার ওপর মুক্তোর ঝিকিমিকি। চোখ দুটি থেকে কি এক মোহিনী মায়া ঠিকরে পড়ছে।

সেইমুহূর্তে আকবরের মনে রাজপুত কন্যা শিবালীর কথা মনে এল। ঠিক এমনি দুটি চোখ। যেন সেই চোখের ছায়া এই দুটি চোখের দৃষ্টির মধ্যে।

শিবালীর জন্যে হঠাৎ তার মনটা কেমন করে উঠলো। কে জানে, সে ভাল আছে কিনা! অন্তঃপুরে মা হামিদা তাকে আরামের মধ্যে রেখেছেন কিনা!

এখন যদি সে শিবালীকে দেখতে চায়, কেমন হয়? এখন নিশ্চয় তার অভিভাবক আর রক্তচক্ষু প্রদর্শন করে শাসন করবে না তার শাসনের ভিত যে আলগা হয়ে গেছে। সে যে এখন নিজের আচরণেই নিজে লজ্জিত।

তার ইচ্ছেকেই এখন সকলে মেনে নেবে। সে যে এখন দারুণ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। মানুষ খুন করতেও তার দ্বিধা হবে না!

মনে মনে নিজের স্বাধীন ক্ষমতায় প্রীত হয়ে আবার বান্দাকে ডেকে হুকুম করলো—এক নয়া রাজপুত আওরত রাজমাতার কাছে জিম্মা আছে, উসকো জলদি লে আও। উসকো নাম, শিবালী।

বান্দা চলে গেল সেলাম করে।

এবার আকবর বয়স্কমানুষের মত গম্ভীরস্বরে নতমস্তকে দণ্ডায়মানা আওরতকে আদেশ করলো—আচ্ছা গানা পেশ কর।

সুললিতকণ্ঠে মাধুর্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করে, সুর্মালাঞ্ছিত চোখের তারায় বিদ্যুতের বহ্নি জ্বালিয়ে একটি প্রেমের গান গাইতে লাগলো মেয়েটি।

গানের ভাষাতে ছিল আগুনের উত্তাপ, তাছাড়া কমনীয় রমণীর দেহের ঐশ্বর্যে আকবরের নেশা জড়িত চোখের দৃষ্টি পড়ে কেমন যেন তাকে রোমাঞ্চিত করে তুলছিল। স্ফীতকায় বক্ষের দিকে তাকিয়ে আকবরের দেহ কেমন যেন শিহরিত হচ্ছিল। সে ধীরে ধীরে রক্তিম চোখ দুটি গায়িকার গানের সাথে ছন্দ রেখে পা থেকে মাথা পর্যন্ত বুলিয়ে নিচ্ছিল। এমন করে খুঁটিয়ে একটি যৌবনবতী নারীকে দেখার সৌভাগ্য এই প্রথম।

সে অনুভব করতে লাগলো যেন সে সব ভুলে যাচ্ছে! সুরা তাকে যা ভোলাতে পারে নি, নারীর সৌন্দর্য তাকে তা মুহূর্তে ভুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এমন হল, গায়িকার গান আর তার মন আলোড়িত করলো না, গায়িকার যৌবনমণ্ডিত দেহের রমণীয় সৌন্দর্য তাকে সব ভুলিয়ে দিল।

সুরার পাত্র রেখে তাই সে রমণী-সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলো। এমন করে অভাববোধ তো কখনও সে অনুভব করে নি, তাছাড়া এমনি চাহিদাও তার কখনও মনে আসে নি! সে বালক, অপরিণত! এখনও সময় হয় নি পৃথিবীর অন্যদিকের পরিচয় লাভ করবার—এই শাসনের জন্যেই কৌতূহল ছাড়া তার কোন প্রত্যাশা ছিল না। আজও হয়তো হত না, যদি না আজ অবাধ্যতার পরিচয় দিত। অথচ

এই অবাধ্যতার জন্যে অন্যপক্ষ এমন এক বিড়ম্বনায় পড়েছে, নিষেধের সব ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

সেইজন্যে তার কক্ষে রমণীর প্রবেশের অধিকার মিলেছে।

কিন্তু আকবর মনে মনে আশ্চর্য হচ্ছিল, দুনিয়ার এই আওরতের ক্ষমতা দর্শনে। সুরা যে কদিন ধরে তাকে বশ করতে পারলো না, আওরত পারলো এক মুহূর্তে। তবে কি এজন্যেই পৃথিবীর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ পুরুষ আওরতের কাছে বশীভূত? তাদের বংশের সব পুরুষেরাই আওরত কবলিত। তৈমুর, বাবর, হুমায়ুন, শেখ মীর্জারা সকলেই আওরতের গোলাম।

হঠাৎ আকবরের স্মরণ পড়লো মাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মোহমুক্তি ঘটলো। বেইমান, অবিশ্বাসিনী, চরিত্রহীনা এই আওরত জাতি।

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত নেশার আমেজ অপসারিত হল। গায়িকার দেহের সৌন্দর্যে মনে হল বিষের প্রলেপ জড়ানো আছে। বিষধর সর্পের মত ফণা তুলে প্রথমে ছোবল না দিয়ে গোপন করে রাখে ফণাটি। তারপর ধীরে ধীরে মনে রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে আবেশের রক্তিম মুহূর্তে ফণা উত্তোলিত করে।

এ না হলে তার মা হামিদা বানু এমন হলেন কেন?

মাকে আর চিন্তা করতে কেমন যেন ঘৃণা জাগে? অথচ এই মায়ের গর্ভে সে জন্মেছে। আজ তার মনে হচ্ছে, এই মায়ের গর্ভে না জন্মালেই বুঝি মঙ্গল ছিল। কিন্তু তাহলে জন্মাতো কেমন করে? অন্য গর্ভধারিণী হলেও তো সেই অবিশ্বাসের কাজ করতো?

চিন্তা থেকে হঠাৎ সে সরে এসে গায়িকার দিকে চেয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বিরক্ত হয়ে বললো, গানা বন্ধ করে চলে যাও।

গায়িকা তখনও গান পেশ করছিল, হুকুম না হলে থামতে পারবে না বলেই করছিল। শ্রোতার হুকুম পেয়ে সে আর দ্বিরুক্তি না করে অদৃশ্য হল।

আকবরের তখন শিবালীকে মনে পড়েছে। শিবালীও তো আওরত, সেও কি একদিন এমনি অবিশ্বাসিনী হতে পারে?

এই সময় যে বান্দা শিবালীর খোঁজে গিয়েছিল, সে এসে জানালো, বেগমসাহেবা কোন উত্তরই দেন নি রাজপুত লড়কির সম্বন্ধে! তবে খাসবাঁদী জানালো, ঐ নামের কোন রাজপুত লড়কি মহলে নেই।

নেই?

হঠাৎ আকবর উঠে দাঁড়ালো—আম্মি উত্তর পেশ করা মনে করলেন না? এতদূর অবজ্ঞা? তবে তাই হোক্। নেমে আসুক বিচ্ছেদ। চলে যাক্ মায়া। ঐশ্বর্যের পাদপীঠ থেকে দৈন্যের পথে পৌছাক। ফকিরী জীবনে যদি কিছু পাওয়া যায় তাই মূল্যের। আর যদি মৃত্যু আসে তবে পরম শান্তি মিলবে অন্যলোকের সংসর্গে।

আকবর কাউকে কিছু না বলে সাধারণ পোষাকে সজ্জিত হয়ে নিজের অশ্বটি নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়লো।

শান্ত্রী পাহারাদার সম্রাটকে না চিনতে পেরে চীৎকার করে বললো—তফাৎ যাও হুশিয়ার, ঘোড়সওয়ার !

দুনিয়ার বাইরে কোন আশ্চর্য বস্তু নেই, তার ভেতরেই আছে যত রহস্য, গোপনতা। আর মানুষই সেই রহস্য সৃষ্টি করে। মানুষের মধ্যেই আছে সেই রহস্যের বৃহৎ ভাণ্ডার। ভাণ্ড বুঝি কখনও শেষ হবে না। সৃষ্টির কাল থেকে এই ভাণ্ড উপুড় হয়ে আছে, তরল পদার্থের মত গড়াচ্ছে তো গড়াচ্ছেই। শেষ নেই। লয়ও নেই।

শেষ হয়ে গেলে মানুষের সৃষ্টিরও শেষ হয়ে যেত। তাই বুঝি চিরকাল নব নব রহস্য স্তরে স্তরে শিলার মত বুকের জমিনে জমা হয়ে আছে। যত মানুষ তত পথ, তত অভিনব রহস্য। আর সেই রহস্য বুঝি এই নারী-পুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে।

হামিদা বানু পতিপ্রেমে গর্বিতা ছিলেন। কুমারী জীবনের যে কামনা ছিল, বিবাহের পর আর তা স্থায়ী হয় নি। হুমায়ুনের বৈমাত্র ভাই হিন্দাল তাঁকে দেখে মহব্বত দান করেছিলেন। হিন্দালকে তিনিও যে চান নি এমন নয়। সম্রাট পুত্র হিন্দালের রূপও ছিল, গুণও ছিল, তাছাড়া ছিল একটি রমণীকে ভালবাসার মত ক্ষমতা। হুমায়ুন যদি সেদিন আশ্রয়ের জন্যে বিমাতা দিলদারের কাছে না আসতেন, না দেখতেন হামিদাকে তাহলে হয়তো হিন্দালই লাভ করতো হামিদার মত রমণীরত্নকে।

কিন্তু সবই ভবিতব্য। কোথায় ছিলেন হুমায়ুন, কোথা থেকে কোথায় এসে হামিদার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিলেন। অবশ্য তার জন্যে পরে হামিদার মনে কোন অনুশোচনা জাগেনি। এমন একধরণের নিবিড় সোহাগ ভালবাসার রঙে রাঙিয়ে বাদশাহ্ হুমায়ুন পত্নীকে দান করেছিলেন, যা কেউ কখনও দান করতে পারে না। তাই হামিদা অতীতের সব ভুলে প্রিয় সান্নিধ্যে নিজের রমণীমনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন।

অন্তত স্বামী বেঁচে থাকা পর্যন্ত অন্যপুরুষের কথা বেগম মহিষী কখনও ভাবতেন না। সেদিনের কথা আজও মনে পড়ে, হিন্দালের মৃতদেহ যখন শিবিরের সম্মুখে আনা হল।

অথচ এই হিন্দালই একদিন ভ্রাতার ওপর যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কিন্তু সেই ভ্রাতার সপক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়েই মৃত্যুকে বরণ করলেন। হিন্দাল যথেষ্ট ভালবেসে ছিলেন হামিদাকে। ভালবেসেছিলেন বলেই ত্যাগ করতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি। ত্যাগের মধ্যে দিয়েই মহৎ জীবনের ইশারা। হিন্দাল সত্যিই মহৎ ছিলেন। ভ্রাতার বিশ্বাসঘাতকতায় বিরক্ত হলেও পরে শ্রদ্ধার মাঝে ভ্রাতাকে আপন করেছিলেন। মাতা দিলদারের কথায় প্রিয়তমাকে উৎসর্গ করে ভ্রাতার গুরুত্বকে মেনে নিয়েছিলেন এবং ভ্রাতারই জন্যে মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সমরে প্রাণবিসর্জন দিয়েছিলেন।

এ মহৎ প্রাণের বুঝি কোথাও তুলনা মেলে না। বাদশাহ পুত্ররা শুধু স্বার্থের

জন্যে হানাহানি, রক্তারক্তি করেছে এই ইতিহাসে লেখা আছে কিন্তু হিন্দালের মত বাদশাহ পুত্রদের নিঃস্বার্থ মনের মহৎ মনীষার কোন ইতিহাস লেখা হবে না।

হুমায়ুনের সকল ভ্রাতাই তাঁর শত্রুতা করেছেন, হিন্দালও কম করেন নি। তবে সে শত্রুতা প্ররোচনার দায়ে পড়ে করেছেন। আসলে তিনিও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হুমায়ুনকে পরিবারের অন্যান্যের মত শ্রদ্ধা করতেন।

ভ্রাতৃবৎসল এই হিন্দালকে পরে হুমায়ুন বুঝতে পেরেছিলেন, যখন তাঁর রক্তাক্ত মৃতদেহ শিবিরে আনীত হয়েছিল।

প্রথমে নৈশ সেই অভিযানে হিন্দালের মৃত্যু গোপন করে রাখা হয়েছিল। গোপন করার কারণ সৈন্যরা নিরুৎসাহ হয়ে ছত্রভঙ্গ হতে পারে, তাতে আরো বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। কিন্তু বাদশাহ ভগ্নী গুলবদনের স্বামী খাজা খিজর খাঁ এসে চুপি চুপি বললেন—হুজুর, জনাব হিন্দাল সাংঘাতিক আহত নয় শুধু তিনি নিহত হয়েছেন।

সেই সময় হুমায়ুনের কাছে ছিলেন মহিষী হামিদা ওরফে জুলিবেগম। হঠাৎ জুলিবেগম এই দুঃসংবাদ শুনে কেমন এক অস্বাভাবিক শব্দ করে উঠলেন। পতির বাহুবন্ধনে হামিদা আবদ্ধ ছিলেন, হঠাৎ কেমন যেন তার বন্ধন শিথিল হয়ে গেল। তিনি অল্প ব্যবধান রচনা করে চোখের জল রোধ করতে পারলেন না। হঠাৎ তাঁর সেই কুমারী প্রেমের দাবদাহে দগ্ধ হয়ে, শোকার্তা হয়ে উঠলেন।

হুমায়ুন পত্নীর অদ্ভুত আচরণে অভিভূত হলেন।

খিজর খাঁ তখনও আদেশ পালনের ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান।

হঠাৎ হামিদা ক্রন্দনমুখরিত খিজর খাঁর সামনে গিয়ে বললেন—কোথায় রেখেছ সেই নিহত রাজকুমারের মৃতদেহ, আমাকে একবার দেখাতে পারো?

খিজর খাঁ একান্ত অনুগতের মত নিম্নস্বরে বললেন—কিন্তু বেগম সাহেবা, আপনাকে দেখানো তো সম্ভব নয়? শাহাজাদার মৃতদেহ আছে গোপনে আমারই শিবিরের একান্তে। সেখানে বিশেষ পাহারা দিয়ে তার মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখা হয়েছে।

কিন্তু আমি যে একবার দেখবো? একটিবার কি আমাকে দেখাতে পারো না সাহেব?

কেমন যেন হামিদা বিবি পাগলের মত খিজর খাঁর হাতদুটি গিয়ে ধরলো।

খিজর খাঁ ইতস্তত করে বাদশাহের দিকে তাকালেন। বাদশাহ তখন অভিভূত, বিস্মিত হয়ে কি যেন ভাবছেন।

উত্তর খিজর খাঁই দিলেন—মাপ করতে হবে বেগম আলী শাহী, এ সময় নিহত রাজকুমারকে দেখাতে গেলে সৈন্যদের মধ্যে জানাজানি হয়ে যাবে।

কোন উপায় নেই?

না, উপায় থাকলেও সুযোগ নেওয়া হবে না। তোমার কোমল হৃদয়ের মাঝে দৃঢ়তার আচরণ পরাও। হুমায়ুন পত্নীর দিকে তাকিয়ে আদেশের ভঙ্গিতে বললেন।

গোপন কিছুই ছিল না। বেগম নিজেকে আর রোধ করতে পারেন নি। বেরিয়ে পড়েছিল তাঁর মনের আসল কঙ্কাল। তাঁর কুমারী জীবনের সেই প্রথম প্রেমের উচ্ছ্বাস, যা পরবর্তী স্রোতে সমুদ্রের জলে ধৌত হয়ে গিয়েছিল। ধৌত যে হয়ে যায় নি, তা দেখেই হুমায়ুন সেই মুহূর্তে ভ্রাতার বিহনের শোকে মুহ্যমান না হয়ে পত্নীর আচরণের জন্যে আঘাতের বেদনায় জর্জ্জড়িত হলেন। আর সেইজন্যেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল অমনি কঠিন দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাষা।

তারপর হুমায়ুন খিজর খাঁকে হুকুম করলেন—গোপনে ভ্রাতার মৃতদেহ তারই জায়গীর জুই-শাহীতে যেন সমাধিস্থ করা হয়।

খিজর খাঁ হুকুম নিয়ে চলে গেলে হুমায়ুন শাহ আর একবার স্তব্ধ হয়ে প্রিয়তমা পত্নীর দিকে তাকালেন।

হামিদা তখন মাথাটা নীচু করে পাগলের মত হাহুতাশ করে কেঁদে চলেছেন। তাঁর দুটি চোখ দিয়ে অশ্রু দরবিগলিত ধারায় নির্গত হচ্ছিল, তার শেষ কোনদিন হবেনা বলেই মনে হল। এ অশ্রু যে একদিনের নয়, অনেকদিন ধরে জমে জমে তবে এমনি অপর্যাপ্ত হয়েছে, তাই প্রমাণ করলো।

সে কথা বুঝে একবার হুমায়ুন মনে মনে ক্ষিপ্ত হতে গেলেন। পত্নীকে বেইমান বলে পরিত্যাগ করতে বাসনা জাগলো। অভিমান হল। এতদিনের এত সোহাগ, এত সান্নিধ্য, বিলাসমনকে সংযত করে, এই একজনের মাঝে নিজের হৃদয় সঁপে দেওয়া, সবই তাহলে মিথ্যে! আসলে বেগমের মনে ছিল পূর্বজীবনের সেই স্মৃতি! মহব্বত! দিলের মধ্যে ছিল হিন্দাল!

অনেকক্ষণ ধরে এক বিরাট জ্বালার মাঝে আত্মাহুতি দিয়ে নিজেকে হুমায়ুন প্রকৃতস্থ করার জন্যে যুদ্ধ করলেন।

এদিকে সময়ও অল্প, এখুনি শিবির পরিত্যাগ করে যুদ্ধে গিয়ে যোগদান করতে হবে। ভেসে আসছে অন্ধকারের মধ্যে থেকে সৈনিকদের মরণ আর্তনাদ।

বেগম কাঁদছে। সে কেন কাঁদছে তার অর্থ পরিস্কার। আর সেইজন্যে অন্তরে জ্বালার প্রদাহ। তার চেয়ে যদি যুদ্ধক্ষেত্রে এখুনি সাংঘাতিক আহত হতে পারতেন, মনে হয় ভাল হত। সে জ্বালা বুঝি সহ্য হত।

হুমায়ুন শাহ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সেই দিনটির কথা কোনদিন ভোলেন নি। সেদিন যে অসুবিধায় পড়েছিলেন, এমন অসুবিধায় বুঝি আর কখনও পড়েন নি বিশেষ করে একটি আওরতের কাছে তাঁর এই অবমাননা!

অন্য কেউ হলে এখুনি এই বেইমানের শাস্তি তিনি দিয়ে দিতেন। কোমরের বন্ধনী থেকে ইস্পাহানী ছোরাখানা বের করে আমূল ঐ কুসুম বক্ষে ঢুকিয়ে দিতেন কিন্তু তা যে হবার নয়, ঐ জুলিবেগমই আর প্রমাণ। দুনিয়ার সবাইকে হয়তো নির্মম শাস্তি দিয়ে প্রতিশোধ চরিতার্থ করতে পারেন, পারেন না এই রমণীকে কোন আঘাত করতে। আঘাত করলে সে ব্যথা নিজের বুকে বাজবে। হৃদয়ের সবটুকু মমতা যার জন্যে ব্যয় করেছেন, তার আচরণ এ যে ক্ষমারও অযোগ্য। তবু নিরুপায় তিনি।

হৃদয়কে অস্বীকার করতেও পারবেন না, বেগমকে বলতেও কিছু পারবেন না। বেগমের কান্না উপশমের জন্যে কাপুরুষের মত সান্ত্বনার বাণী আওড়াতে পারবেন। হ্যাঁ, সান্ত্বনাই দিতে পারবেন।

বেগম কাঁদছে দেখে তাঁর হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে। তার কান্না যাতে রুদ্ধ হয়, তাকে ভালো ভালো সোহাগের কথা বলতে হবে। হুমায়ুন তাই বললেন।

মরিয়ম রোনা মৎ। দুনিয়ায় খোদার ইচ্ছাকে মেনে নিতেই হবে। তোমার আমার বেদনা দরিয়ার পানির সাথে মিশে যাবে। জিন্দেগী বরবাদ করতে এই দর্দ ভুলে যাও। আসমানের নীল রঙের দিকে তাকিয়ে দেখো, তাহলেই বুঝবে, কোথাও নেই কারো সান্ত্বনা।

কিন্তু হুমায়ুন আর ভাল কথা বলতে পারলেন না। কেমন যেন নিজেকে বড় ছোট মনে হল। নিজেকে মনে হল বড় অসহায়। তাঁর পত্নী কাঁদছে তার দিলের মাশুকের বিহনে, আর তিনি তাকে সান্ত্বনা দান করছেন? তিনি কি মানুষ নামের বাইরে এসে পশুর উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন? যে কাঁদছে কাঁদুক। তার শোক নিবারণ হলে কান্না এমনিই শুকিয়ে যাবে।

এই কথা ভেবে হুমায়ুন যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্যে বেগে সেস্থান পরিত্যাগ করলেন।

এসব কথা আজ বিস্মৃতি। এ চিত্র অতীত। আজ হুমায়ুন বাদশাহ চলে গেছেন কিন্তু একজন এখনও আছে। তার কি মনে এসব স্মৃতি গুজরায় না।

দোষ হামিদা হয়তো কিছুই করেন নি কিন্তু দোষ না করলেও অপরাধের আবর্তে অনেক দোষ আপনা থেকেই হয়ে যায়। হামিদার জীবনের এইসব ঘটনা তাকে উপলক্ষ্য করেই ঘটে গেছে। অথচ তার জন্যে তিনি কতখানি দায়ী, এ অর্থ বিচার্য।

আর একজন পুরুষ বৈরাম খান।

বৈরাম খানকে দুঃসাহসী করেছিলেন হুমায়ুন শাহ। হুমায়ুন শাহের একটি দোষ ছিল, যাকে ভালবাসতেন তাকে দারুণভাবে বিশ্বাস করতেন। অন্ধ সেই বিশ্বাস। উদার হৃদয় দিয়ে যেখানেই প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে গেছেন, সেখান থেকেই রক্তাক্ত ছুরিকার হুমকি এসে তাকে খণ্ডবিখণ্ড করেছে।

তাঁর রাজ্য হারানোর প্রধান কারণই হচ্ছে এই।

বৈরাম খানের বেলাতেও তাই হয়েছিল। আর খানসাহেবও যথেষ্ট ধূর্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। বাদশাহের বিশ্বাস দৃঢ় করবার জন্যে তাঁর চরিত্রের বিশেষ দিকটি সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। তাই বাদশাহ অন্ধভাবে বৈরাম খানকে নিজের অন্তরের তুল্য আপন ব্যক্তিহিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

বৈরাম খান বয়েসে তরুণ হলেও ছোটবেলা থেকে চতুরতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন।

মাদ্রাসায় একসঙ্গে শাহাজাদা হুমায়ুনের সঙ্গে পড়াশুনা থেকে। চাঘতাই মুঘলবংশের কেউ নয়। ধর্মে শিয়া। তবু তার সাথে হুমায়ুনের বন্ধুত্ব হয়েছিল।

আর গরীব বংশের ছেলে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে সম্রাট পুত্রের স্বভাবের সাথে বশ্যতা স্বীকার করে নিজের সত্তাকে বিসর্জন দিয়েছিল।

অদ্ভুত এই ব্যক্তি বৈরাম খান। অদ্ভুত চতুর ও বুদ্ধিবিশিষ্ট নিজের কোন উদ্দেশ্যই মনে রাখেন নি। সম্রাটের লক্ষ্য তার জীবন শপথ। মুঘল বংশের রাজত্ব কায়েম করবার জন্যে বার বার সর্বোমুখী চেষ্টা করেছিলেন। বন্ধুত্বের শপথ চিরস্থায়ী করবার জন্যে জীবন উৎসর্গীত।

যে কোন বুদ্ধিমান লোকই বুদ্ধিভ্রষ্ট হবে এমনি এক আদর্শ বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হয়ে। অন্তর্নিহিত ভাব যাই থাক। সন্দেহজনক কোনকিছু না চোখে পড়লেই বিশ্বাস দৃঢ় হবে। হুমায়ুনের সেই জন্যে বিশ্বাস হয়েছিল।

তাছাড়া হুমায়ুন ছিলেন এমনিই উদার ও হৃদয়বান। চরিত্রের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম, বন্ধুপ্রীতি ইত্যাদি গুণের ইন্ধন অধিক পরিমানে ছিল। তাই বিশেষ বেগ পেতে হয়নি বৈরাম খানকে হুমায়ুনের প্রীতি লাভ করতে।

সেইজন্যে হুমায়ুন দিয়েছিলেন সর্বোপরি অভিভাবকত্ব তাঁর ভ বষ্যৎ উত্তরাধিকারী আকবরের।

আকবরের সমস্ত কৈশোরটি বৈরাম খানের ছায়াতেই আতঙ্কিত হয়েছিল। আকবর অত্যাচারিত হত। বিদ্রোহী হত। পিতার কাছে অভিযোগ পেশ করতো কিন্তু কোন সুরাহা হত না।

হুমায়ুন বলতেন—তুমি আমার বন্ধুকে পিতার মতই জ্ঞান করবে। পিতার নামে যেমন কোন অভিযোগ করা যায় না, তেমনি কোন বিক্ষোভ মনে পোষণ কোরো না। আমি যাকে বিশ্বাস করেছি তাকে নিজের চেয়ে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করি।

এমনিই অন্ধ বিশ্বাস হুমায়ুনের। পুত্রকেও অস্বীকার করে বন্ধুকে বিশ্বাস করেছেন।

কিন্তু একজন শুধু এই ধূর্তলোকের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক বুঝতে পেরেছিলেন।

তিনি হামিদা। জুলিবেগম। মরিয়ম মকানী। অন্তঃপুরের লক্ষ্মী। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। হারেমের জৌলুস। সম্রাটের প্রেয়সী।

তিনি এই বৈরাম খানকে চিনতে পারেন। কিন্তু নিরুপায় স্বামীকে তার পরিচয় দিতে গেলে পরিবর্তে স্বামীর কাছ থেকে অশ্রদ্ধা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অথচ শয়তান তার জাল বিছিয়েছে। পরিণামে কি হবে কে জানে?

শুধু তার ভয় করতে লাগলো একটিমাত্র সন্তানের জন্যে। আকবরের ওপর ঐ শয়তানের দৃষ্টি বেশি। যদি কোন চক্রান্ত মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাহলে আকবর হারিয়ে যাবে।

এই কথা ভেবেই একদিন তিনি গোপনে বৈরাম খানের সঙ্গে মিলিত হলেন।

কাজটা অবশ্য খুব গর্হিত। হারেমের জেনানা পরপুরুষের কাছে দর্শন দেওয়া, মুঘল রাজবংশের আইনে নিষিদ্ধ। সম্রাট হুমায়ুন যদি জানতে পারতেন তাহলে প্রিয়তমা বেগমের কি বিচার করতেন, চিন্তার বিষয়। অবশ্য সেই জেনেই হামিদা বিশেষ নিরাপত্তার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

পৃথিবীতে একজনমাত্র এই ঘটনাটি জানতো। হামিদার বাঁদী ছিল অনেকগুলি, তার মধ্যে খাঁসবাদীও কয়েকটি। এরই মধ্যে থেকে সঈদাকে তিনি নির্বাচন করেছিলেন।

সঈদা বিশ্বাসী ছিল, অন্তত বেগমকে সে যথেষ্ট পেয়ার করতো। এরই তত্ত্বাবধানে একদিন গভীর নিশিথে হামিদা বৈরাম খানকে ডেকে পাঠালেন।

কাজটি সত্যিই দুঃসাহসের মত। তবু উপায় কি? একমাত্র সন্তানের নিরাপত্তা দরকার। তার জীবন রক্ষা না হলে মাতৃত্ব নিশ্চিহ্ন হবে। আর কোন সন্তান গর্ভে এল না। কেন এল না সে জানে না? মনে হয়, স্বামীরই অপরাধ। অতিরিক্ত বিলাসজীবন যাপনের জন্যে জননশক্তি লোপ পেয়েছে। অথচ তিনি স্বীকার করেন না। বললে হাসেন।

প্রথম বিবাহিত জীবনে দাম্পত্য সুখের প্রথম প্রবল উন্মাদনায় আকস্মিক একটি ফল লাভ হয়েছিল। সেই সম্পদ। দুর্লভ সে সম্পদ। এই একটি ফল লাভ না হলে যে কি হত? রমণী পুরুষের সব সম্বন্ধই শিথিল হয়ে যেত। থাকত না কোন সোহাগ কোন নিবিড় সুখের উচ্ছ্বাস ভরা স্বপ্ন কল্পনার সীমাহীন আবেগ। তখন সম্রাটকে মনে হত শয়তান। অক্ষম এক অযোগ্য পুরুষ রমণীর চাহিদা পূরণ করতে পারে না। তাকে মাতৃত্ব দেবার মত শক্তি নেই, সুতরাং সে পুরুষের অধীনতা কোন রমণী চায়?

আজ দ্বিতীয় সন্তান থাকলে আর এই গোপন পরামর্শের দরকার হত না। মনে হচ্ছে, তার এই একটি মাত্র গর্ভের সন্তানকে নিয়ে ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠছে।

আকবরের বিপদ আসার আরো একটি কারণ মনে জাগছে, বৈরাম খান বয়েসে তরুণ হলেও তার প্রতি সে আকাঙ্ক্ষিত। যা দু-একবার দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে, তাতে তার চোখের ভাষা সে পড়েছে। রমণী চিরকালই পুরুষের দৃষ্টির অর্থ উপলব্ধি করতে পারে।

বৈরাম খান যে সৎ নয়, এই দৃষ্টিই তার প্রমাণ। সেদিনই সে ইচ্ছে করলে সম্রাটকে বলে একটা বিশ্রীকাণ্ডের উদ্ভব করতে পারতো। কিন্তু লাভ তাতে কিছু হত না। বৈরাম খান ধূর্ত। বন্ধুকে ঠিক বুঝিয়ে দিতেন।

আর সে নিজে বোকা হয়ে যেত! কারণ প্রমাণ কই? দৃষ্টির অর্থ দিয়ে তো কাউকে অপরাধী করা যায় না! তাছাড়া সম্রাট তখন বন্ধুপ্রেমে এমন আত্মহারা যে স্ত্রীকে সন্দেহ করতেন, তবু বন্ধুকে করতেন না।

এমনিই তখনকার পরিস্থিতি।

আজও সেই অবস্থা। হয়তো ধরা পড়লে তার দুর্ণাম হবে, বৈরাম খান বেঁচে যাবে। এরই মধ্যে বাদশাহের হারেম থেকে তিনটি যুবতী হস্তান্তরিত হয়েছে। নয়া খুবসুরত আওরত যখন বাদশাহের ইস্তেজারের জন্যে রঙমহলে এসে প্রবেশ করেছিল, তখন তাদের কেমন করে যেন বৈরাম খান দেখেছিলেন।

তারপরই প্রার্থনা ও দরবার।

বাদশাহ সম্রাট খুশিমনে বন্ধুকে উপঢৌকন দিয়ে দিলেন।

বাদশাহ বোধ হয় বন্ধুর প্রার্থনায় তাঁর প্রিয়তমা বেগমকেও দিতে পারতেন, যদি বৈরাম খান চাইতেন। তবে বৈরাম খান নির্বুদ্ধির পরিচয় দেন নি।

কিন্তু হামিদা কেমন যেন সম্রাটের এই বন্ধুপ্রীতি সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর নিজেরই মনে হল, একটা কিছু অঘটন ঘটুক। একটা বিশ্রী এমন কিছু ঘটুক, যাতে সম্রাটের চৈতন্যোদয় হয়। তার বিশ্বাস মর্মর সোপানের মত ভেঙে পড়ে।

হামিদা অবশ্য সেইজন্যে বৈরাম খানের সঙ্গে গোপনে মিলতে চাইলেন না। এই শয়তানপ্রকৃতি ধূর্ত ব্যক্তির অভিপ্রায় কি? কেন তিনি আকবরের ওপর অত্যাচার করে তাকে আঘাত করছেন? এই জানার জন্যেই এই অভিসার রচনা করলেন।

তার অতলান্ত দৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? চোখের কালো তারার মাঝে কি অভিজ্ঞা পোষণ করে সঙ্গোপনে এক অভিনব সুখ পালন করছেন? দৃষ্টি কি তবে বন্ধুর প্রিয়তমার প্রতি আকাঙ্ক্ষা পোষণ? তার দুধসাদা বর্ণ, সুষমামণ্ডিত দেহ বেহেস্তের অপরূপ ছটার মত দেহলালিমা দেখে নিজের যৌবন লাঞ্ছিত সুকুমার বলিষ্ঠ পুরুষ-অঙ্গ চঞ্চল হচ্ছে!

তবে কি স্মরণ করিয়ে দেয় সরহিন্দ যাত্রার পথে সেই স্মরণীয় জীবন রক্ষা!

সম্রাটের সঙ্গে সেদিন ছিল আরো অনেক রমণী। বিস্তৃত সৈন্যসামন্ত নিয়ে একটি বাহিনী পরিবৃত হয়ে সম্রাট চলেছিলেন সরহিন্দ জয় করতে।

চলতে চলতে রাত্রি আসতে একটি উন্মুক্ত ক্ষেত্রে শিবির সন্নিবেশিত হয়েছিল। স্থানটি খুব মনোরম ছিল না। বরং দুর্ভেদ্য জঙ্গলে পরিপূর্ণ। জঙ্গলে হিংস্র জন্তু থাকাও বিচিত্র নয়। তবু উপায় ছিল না বলে রাত্রিটুকু অতিবাহিত করবার জন্যে তাঁবু খাটানো হল।

সারি সারি তাঁবুর বেষ্টনীর মধ্যে সম্রাটের বাহিনী। ভিন্ন কটি তাঁবু আলাদা ভাবে স্থাপন করে হারেমের ব্যবস্থা হল। শুধু হামিদা থাকলেন সম্রাটের পাশে। তাঁর আলাদা অবস্থান সম্রাট নাকচ করে দিলেন। সেদিনের রাত্রিটি ছিল বড় ভয়ঙ্কর। আকাশে ছিল না কোন আলো। শুধু ভুসো কালি লেপা মসীলিপ্ত অন্ধকার। কেমন যেন থমথমে।

প্রকৃতির জন্যেও হতে পারে, তবে সাধারণত সম্রাট যুদ্ধের আগে কেমন যেন বিমনা হয়ে যেতেন। হয়তো তার মনে হত, তিনি এই যুদ্ধেই নিহত হবেন। আর সেইজন্যে তিনি সুখের মাঝে থাকতে চাইতেন। পৃথিবীতে যত সুখ আছে, এই যুদ্ধের আগে তিনি তা উপভোগ করে নিতেন।

বাদশাহের স্বভাবের এই ধারা প্রায় অনেকেই জানতো। জানতেন হামিদাও। তাই সে রাত্রে তিনি স্বামীর পাশেই থাকলেন।

অনেক রাত্রে যখন স্বামী নিদ্রিত হয়ে পড়লেন, হামিদার ঘুম না আসার জন্যে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

সারি সারি দু পাশে তাঁবু পড়েছে। অন্ধকারে তাঁবুর সারিই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, আর কোন শব্দ নেই। মনে হয় বিস্তৃত বাহিনীর লোকেরা ঘুমিয়ে গেছে।

আকাশে তখনও কোন আলোর রেখা ফোটেনি। তবে একটু তরল হয়েছে অন্ধকার। সেই আবছার মাঝে দেখা যাচ্ছে সামনে চাপ বাঁধা গভীর জঙ্গল। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের উঁচু মাথা সেই জঙ্গলের সীমানা ছাড়িয়ে আকাশ চুম্বী হয়ে আছে।

হামিদা ভাবছিলেন আগামী যুদ্ধের কথা। স্বামী যদি এই যুদ্ধে নিহত হন? তাহলে তাঁর বাঁচবার পথ কোথায়? কে দেখবে তাকে? কে আশ্রয় দেবে এই ভাগ্যহীনা রমণীকে? তাছাড়া বিজয়ী ব্যক্তিও তাকে ছাড়বে কেন? নিয়ে যাবে ধরে। কেড়ে নেবে তাঁর রমণী কৌস্তভ রত্নটি।

এই সব কথা তিনি প্রতিটি যুদ্ধের আগেই ভাবেন। পরিণতিটা ভেবে কেমন যেন শিহরিত হলো! কি নিরুপায় অবস্থা? কি ক্ষণস্থায়ী জীবন?

সম্রাটের কর্তৃত্বাধীনে তাদের সযত্নে লোকচক্ষুর দৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রাখার কত চিন্তা, তাদের সুখে রাখার জন্যে কত পরিকল্পনা।

যেই সম্রাট নিহত হলেন কোথায় গেল তাঁর রাজসিকতা। তখন এক একটি রমণীর মূল্য কানাকড়িরও সমান নয়। বরং, অন্যান্য আসবাবের যা মূল্য আছে লুণ্ঠিতা বেগমদের সে মূল্য নেই। হয়তো সাধারণ সব সৈন্যদের উন্মত্ত পাশবিকতার মাঝে পড়ে রক্তাক্ত হয়ে কোথায় যন্ত্রণার মাঝে লীন হয়ে যাবে।

এই সব কথাই হামিদা ভাবেন যখন স্বামী যুদ্ধে যান।

আজ এই উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আবছায়া অন্ধকারের মাঝে তাকিয়ে সেই কথা ভাবছিলেন, হঠাৎ তিনি আঁতকে উঠলেন। পায়ের অগ্রভাগে কি যেন দংশন করলো? প্রচণ্ড জ্বালা ও যন্ত্রণা। পায়ের শিরা থেকে কি যেন উত্তপ্ত হয়ে ওপর দিকে উঠে আসছে। মস্তিষ্কের কোষে কোষে তীব্র এক সীমাহীন অগ্নিপ্রদাহ।

হঠাৎ অন্ধকারে হামিদা দেখতে পেলেন বিষধর সর্প। অন্ধকারে ফণা তুলে তখনও তার সামনে জ্বলছে। ক্ষুধিত তার দুই চোখে কি যেন এক বিজাতীয় আক্রোশ। একটি কামড়ে তার সবটুকু আক্রোশ ঢেলে দিতে পারে নি, দ্বিতীয় দংশন সৃষ্টি করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

আর চিন্তা করতে পারলেন না হামিদা। পরিত্রাহি চীৎকারে সমস্ত প্রান্তর মুখরিত করে অসংখ্য তাঁবুর মানুষগুলিকে জাগিয়ে দিলেন।

মুহূর্তে অনুচররা এসে সেই বিষধর সর্পটি তরবারির আঘাতে ভূতলশায়ী করে দিল।

সর্পটির তখন আর নড়বার সামর্থ ছিল না। মানুষের বিষ শরীরে প্রবেশ করে তাকে বিষভারে অবনত করে দিয়েছিল। দ্বিতীয় দংশন করবার তার শক্তি ছিল কিনা কেউ জানে না। হয়তো ছিল না কারণ যখন অনুচররা আঘাত হানলো, তখন তার ফণাটি নিঃশব্দে দোদুল্যমান। এমন কি হামিদার পরিত্রাহি চীৎকারেও সে মনে হয় আর অবনত হতে পারে নি। শক্তি নিঃশেষিত হয়ে বিষের ক্রিয়ায় অবসন্ন।

সে যদি দ্বিতীয় কামড় রচনার জন্যে প্রয়োজন না ভেবে পলায়নোদ্যত হত, তাহলে বোধ হয় এই মৃত্যু তার ঘটতো না।

যাই হোক এদিকে হামিদার সমস্ত দেহ নীল বর্ণ হয়ে আসছে। তাঁবুতে তাঁবুতে সাড়া পড়ে গেছে। নিদ্রিত আর কেউ নেই। সকলেই সজাগ হয়ে প্রধানা বেগমের জন্যে চিন্তিত। কিন্তু কারুরই কাছে এগোবার হুকুম নেই। সকলেই অন্তরাল থেকে সংবাদ শ্রবণ করছে।

সম্রাট হুমায়ুন তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। প্রিয়তমা মহিষীর এই মৃত্যুনীল যন্ত্রণাক্লিষ্ট বদন দেখে অস্থির হয়ে পায়চারী করছেন।

বাঁদীরা বেগমের পাশে বসে তাঁকে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করছে। এসব ঘটনা এক মুহূর্তেই ঘটে গেছে, তার জন্যে কোন বিশেষ সময়ের প্রয়োজন হয় নি।

প্রজ্জলিত মশাল সামনে রাখা হয়েছে। হামিদাকে তুলে তাঁবুতে নিয়ে যাবার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু তিনি তাঁবুতে যাবেন না। তাঁর গোলাপ ফুলের বর্ণদেহ নীল হয়ে হয়ে নীলাভ হয়ে আসছে। চোখ মুখ দিয়ে উত্তেজনায় ঘর্ম নির্গত হচ্ছে। দেহের পোষাকেরও তখন আর কোন ঠিক নেই। যে মৃত্যুপথযাত্রী তার আর আবরু রক্ষার দরকার কি?

এই সময় সম্রাট হুমায়ুন শাহ বালকের মত কেঁদে উঠলেন। অতো বড় একজন বিরাট ব্যক্তি, যাঁর অধীনে শত শত সৈন্য, যাঁর বাহুতে মত্তহস্তীর বল, তিনি কাঁদছেন তাঁর প্রিয়তমার জন্যে। সম্রাট নাসিরউদ্দীন হুমায়ুন শাহ জঙ্গ বাহাদুর। ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট মুঘল যোদ্ধা রাজবংশের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যবান পুরুষ। তিনি কাঁদছেন বালকের মত একটি রমণীর জন্যে, যে রমণী তাঁর হেফাজতে আছে সংখ্যাতীত। ইচ্ছে করলে তিনি তখনও হাজার হাজার মোহর দিয়ে পৃথিবীর সেরা সেরা সুন্দরীকে ক্রয় করতে পারেন। হামিদার রূপ তাদের কাছে নিষ্প্রাণ দ্যুতির মতই ম্লান মনে হবে। তবু বাদশাহ তাঁর বিহনে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

এই শোকবিহ্বল মুহূর্তে বৈরাম খানের কাছ থেকে এক অনুচর এসে সম্রাটকে কিছু নিবেদন করলো।

সম্রাট শুনেই অস্থির হয়ে বললেন, কিন্তু কোথায় আমার দোস্ত? এতক্ষণ কেন সে আমাকে নিবেদন করেনি। বিলম্বে যে আমি আমার কলিজা হারাতে বসেছি, একি বোঝেনি সে?

বৈরাম খান একটু দূরেই অবস্থান করছিলেন। সম্রাটের অসহায় উক্তি তার কানে প্রবেশ করেছিল। কাছে এসে আদাব করে বললেন—আপনার হারেমের ইজ্জত জনাব, মৃত্যুর চেয়ে ইজ্জতই আপনারা রক্ষা করে থাকেন। তাই এই অধম সাহস করেনি ইজ্জতকে ক্ষুণ্ণ করে এগিয়ে আসতে।

সম্রাট হুমায়ুন তখন তাকিয়ে আছেন ভূলুণ্ঠিতা বেগমের যন্ত্রণা-কাতর দেহের দিকে। বেগমের সংজ্ঞা তখন বোধহয় বিলুপ্ত হয়ে আসছে। অন্ধকার নেমে আসছে সুন্দর দুটি সুর্মালাঞ্ছিত চোখের মাঝে।

সম্রাট হুমায়ুন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, দোস্ত, দুনিয়ার সব সম্পদের বিনিময়ে আমার এই প্রিয়তমা বেগম। যে রাজ্য ও রাজত্বের জন্যে দিনের পর দিন শ্রম প্রকাশ করছি, তাও যদি বেগমের বিনিময়ে ত্যাগ করতে হয়, আমি রাজী আছি। তুমি যদি পারো, আমার বেগমের জীবন দান কর। আমি চিরকাল ধরে তোমার গোলাম হয়ে থাকবো।

আর কোন কথা নয়, এবার কাজ। বৈরাম খান মুহূর্তে পরিচারিকাদের দ্বারা হামিদার সংজ্ঞাহীন দেহ তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। তারপর সেখানে নিয়ে গিয়ে একান্তে চললো তাঁর শুশ্রূষা।

বৈরাম খান জানতেন সর্পের বিষ তুলে দেহ নির্বাণ করতে। যথাকৃত্য তাই সম্পন্ন করতে লাগলেন।

রাত্রি এগিয়ে চললো নিঃশব্দে। মেঘের আড়ালে চন্দ্রিমা হারিয়ে থাকলো কি? না, তার প্রকাশ রহস্যময়তার ছায়ালোকে আরো ঘন হল! সে যাকগে।

তবে সে রাত্রিটি একান্ত বৈরাম খানের জীবনে নতুন রূপ নিয়ে এসে ধরা দিল।

আজ হামিদা গোপনে সেইজন্যে হাসেন। সংজ্ঞা যে একেবারে তার বিলুপ্ত হয় নি, সে খানসাহেব জানতেন না। বরং যন্ত্রণা আস্তে আস্তে লুপ্ত হতে তার জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় এনে দেহের চেতনা জাগিয়ে রেখেছিল। তখন যন্ত্রণার চেয়ে ভিন্ন পুরুষের শিহরণই তাকে সচেতন করেছিল।

বৈরাম খান সৎবুদ্ধি প্রণোদিত হলে কেন দ্বিতীয় কাউকে তাঁবুতে প্রবেশ করতে দেননি? এমন কি সম্রাটের হুকুম নিয়ে একটি পরিচারিকা বাইরে প্রহরায় নিযুক্ত থাকা ছাড়া আর কারুর তাঁবুতে অবস্থানের হুকুম ছিল না। সম্রাট চেয়েছিলেন পত্নীর পাশে অপেক্ষা করতে।

তাঁকেও বুঝিয়েছেন বৈরাম খান। আপনি সম্মুখে থাকলে ক্ষতি বৈ লাভ কিছু হবে না। যদি বেগমের জীবন রক্ষা করতে চান তাহলে নিজেকে বশ করে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম যান, আপনার পত্নীকে যথা সময়ে আপনার কাছে সুস্থ শরীরে পৌঁছে দেব।

সম্রাট তখন পত্নীকে হারাবার আশঙ্কায় ব্যাকুল। আর তাঁর মনে কিছুই ছিল না, কোন সন্দেহ। তাছাড়া তিনি দোস্তকে দারুণ বিশ্বাস করতেন। সেই বিশ্বাসেই তিনি সবকিছুই ভুলেছেন। এমন কি পত্নীর ইজ্জতের কথাও তাঁর বিস্মৃতির অতলে। বেগমকে পরপুরুষের সামনে বের করা মুঘল রাজবংশের নীতিবিরোধী, সে কথা তাঁর মনে ছিল না। শুধু তখন তিনি পত্নীর প্রাণের আয়ু চাইছিলেন। জীবন ফিরে চাইছিলেন।

হামিদার সংজ্ঞা প্রায় ছিল না। নীল বিষের ক্রিয়া রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে তাঁর জ্ঞান লুপ্ত হয়েছিল।

জ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরে আসতে লাগলো বৈরামখানের অদ্ভুত বিষ উত্তোলনে।

হামিদার সালোয়ারের অনেকখানি তিনি নিঃসঙ্কোচে তুলে দিয়েছিলেন। বেরিয়ে পড়েছিল দুধে আলতা বর্ণের মসৃণ পুষ্ট পায়ের ঊর্ধভাগ। বৈরাম খান কি সম্রাট

মহিষীর সেই পা-দুখানি দেখে শিহরিত হন নি? যেখানটায় সর্প দংশন করেছিল, সে স্থানটি অবশ ছিল। কি যে সেই মিঞা সাহেব করলেন?

আস্তে আস্তে চেতনা পূর্ণতার মধ্যে এল। পায়ে আর সেই অবশ ভাব নেই। দেহের যন্ত্রণাও অনেক আরামের মধ্যে।

তবু হামিদা সংজ্ঞাহীনের মত পড়ে রইলেন! তাঁর তখন মৃত্যু ভয় ছিল না, বরং মজা লাগছিল। এক পুরুষের বাহুবন্ধনে একটানা অভ্যস্ত জীবনের স্রোতে থেকে থেকে নতুন এক অভিনব জীবনের মধ্যে সাময়িক প্রবেশ করতে কার না মজা লাগে? যদি সেই জীবনের মধ্যে কোন ঝুঁকি না থাকে!

সেদিন যে কোন ঝুঁকি ছিল না, হামিদা বুঝতে পেরেছিলেন। সম্রাট বেগমের প্রাণ ফিরে পাওয়ার জন্যে সব কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেই রাজী ছিলেন।

আর খোদা বৈরাম খানকে সেই সুযোগ দিয়েছিলেন।

একটি একান্ত নিরালা তাঁবু। সেখানে আর কেউ নেই। একটি শয্যার ওপর সম্রাট মহিষী শুয়ে আছেন। আর একটি ধূর্ত আদমী দুর্লভ এক রমণীরত্নের সম্পূর্ণ অবয়ব ক্ষুধিত শ্বাপদের দৃষ্টিতে লেহন করছে। দুটি মশাল জ্বলছে। মশালের আলোতে তাঁবুর অভ্যন্তর ভাগ রোমাঞ্চকর।

হামিদা অজ্ঞানের ভান করে পড়ে থেকে চোখের ফাঁক দিয়ে বৈরাম খানকে দেখছিলেন।

বৈরাম খান একদৃষ্টে লোভাতুর রমণী দেহের আবর্তে অনেকক্ষণ দৃষ্টির তালিকা বুলিয়ে পরে মুখের কাছে এগিয়ে গেলেন। নিজের মুখখানি মহিষীর মুখ পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে কি ভেবে আবার সরিয়ে নিলেন। কামিজের ওপর দিয়ে মহিষীর বক্ষের সুউন্নত প্রবাল স্তম্ভ স্বর্ণচূড়ার সৃষ্টি করেছিল। ছিল না যৌবন মহিমার ওপর কোন পুরু আবরণ। অবরোধ রচনা করেনি হারেম ইজ্জতের অহমিকাকে প্রতিষ্ঠিত করে আওরতের কোন আলাদা ভূমিকা। তাই লোলুপ হয়ে সেই রাত্রে বৈরাম খান একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন। চোখের ফাঁক দিয়ে হামিদা তাই দেখে শিহরিত হয়েছিলেন। মৃণালবাহু দুটি বক্ষের কোমল চূড়ার ওপর ঢাকা দেবার বাসনা জেগেছিল। অন্ততঃ কোন আবরণ পরিয়ে ঐ বিশ্বাসঘাতক সম্রাটের দোস্তের চোখ দুটি অন্ধ করবার ইচ্ছা হয়েছিল।

হামিদা যখন এই ভাবছেন, সেই সময় তিনি দেখলেন, বৈরাম খানই একটি সূক্ষ্ম বসনের ওড়না নিয়ে এসে বুকে চাপা দিয়ে দিলেন।

হামিদা মনে মনে বৈরাম খানের সৎসাহসের প্রশংসা করে অজ্ঞানের ভান করে পড়ে থাকলেন। মন্দ কি? কোন দুঃসাহস যখন নেই তখন চারিত্রিক কলুষতা সৃষ্টি হওয়ারও ঝুঁকি নেই। তখন এ ক্রীড়া অনেকক্ষণ চললে ক্ষতি কি? কিন্তু ভয় আছে। বৈরাম খান কেন সম্রাটকে ডেকে তাঁর মহিষীকে জিম্মা করে দিচ্ছেন না? এই বিলম্বের মধ্যে কোন অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কি নেই?

হঠাৎ হামিদা বানু অনুভব করলেন, তাঁর মুখের ওপর তপ্ত এক নিঃশ্বাসের স্পর্শ। আঁতকে উঠলেন আতঙ্কে।

বৈরাম খান তাঁর মুখের ওপর আবার ঝুঁকে পড়েছিল। মনে হচ্ছে এখুনি তাঁর তৃষিত অধরের স্পর্শ আঁকবেন হামিদার নরম দুই আবেগসিঞ্চিত গোলাপ ফুলের পাপড়ি সদৃশ ওষ্ঠে।

আতঙ্কে, ভয়ে বিস্ময়ে হামিদা নড়ে উঠলেন। জ্ঞান ফিরে এসেছে এমনি অভিনয় করে তিনি চোখ মেললেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে বৈরাম খান ছিটকে সরে গিয়ে বিরাট দূরের এক ব্যবধান রচনা করলেন।

মনে মনে হামিদা বৈরাম খানের ভীরুতায় হাস্য সংবরণ করলেন।

আজ সে সব কথা মনে পড়ে।

সজ্ঞানে কখনও বৈরাম খান তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেননি। কিন্তু দৃষ্টি তার তেমনই ছিল। সে দৃষ্টির অর্থ সব রমণীরাই পড়তে পারে।

আজ তাই ভাবেন হামিদা। বৈরাম খান নিশ্চয় কিছু চায়। না হলে তার সন্তানের প্রতি ওঁর এই আক্রোশ কেন?

সেইজন্যে তিনি সঙ্গীদার মারফতে তাকে ডাকতে পাঠালেন।

সেদিন যদি না ডাকতে পাঠাতেন, তাহলে বোধ হয় ভাল হত তাহলে পরবর্তী ঘটনা এমনি জটিলতার পরিণতিতে এসে পৌছতো না। আর পুরুষ এই দুর্বলতার সুযোগ নিত না।

কিন্তু মা চায় পুত্রের নিরাপত্তা। পুত্রের জন্যে মাতা অনেক নীচে নামতে পারে। তার জন্যে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব নয়। সর্বকালের সর্বদেশে মাতাপুত্রের এই সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়ে আসছে।

তাই হামিদা কোন দোষ করেছিলেন কিনা, কাজির বিচার নয়—স্বয়ং ঈশ্বর সেই বিচারের আসনে বসবেন।

একটি আলাদা মহল পড়েছিল। কাবুল রাজপুরীরই একটি ঘটনা।

সমস্ত দুনিয়া নিদ্রার কোলে সমাচ্ছন্ন হলে হামিদা একটি বোরখায় নিজেকে গোপন করে খাসকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। যাবার সময় সঙ্গীদাকে চুপি চুপি বৈরাম খানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ওই গোপনতা সৃষ্টির কারণ হারেমের কোন রমণীর সাথে বাইরের লোকের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ হওয়ার জন্যে। আর বিশেষ করে রাজমহিষী। তাঁর আবরু তো সবার আগে!

এইজন্যে এই গোপনতার আশ্রয় নিতে হয়েছিল, না'হলে কোন মন্দ উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্যে হামিদা ঐ পরিবেশে বৈরাম খানকে ডাকতে পাঠান নি।

তবু সেই পরিত্যক্ত মহলের জনমানবহীন প্রকোষ্ঠে চলতে গিয়ে হামিদার সর্বশরীর ছমছম করে উঠেছিল। এখানে কোন প্রহরী নেই, কোন আলোরও

ব্যবস্থা নেই। বরং অন্ধকারের সরীসৃপরা মানুষের পদশব্দে ছুটপাট করে পালাতে লাগলো।

থমথমে আবহাওয়া। ভগ্নপ্রায় মহল। উন্মুক্ত আসমানের রূপালী চন্দ্রালোকের মিষ্টি আলো ভগ্ন গবাক্ষ দিয়ে এসে কক্ষের মধ্যে পড়েছিল।

এই পরিত্যক্ত মহলটি বর্তমান রাজপুরী থেকে একটু দূরত্বে। এখানে কারো আসার সম্ভাবনা কম বলে এই স্থানটি হামিদা নির্বাচন করেছিলেন! এখন এই রাত্রে একা এই মহলে দাঁড়িয়ে থাকতে তাঁর গা ছমছম করে উঠলো।

মহলের চতুর্দিকে চাপ চাপ গাঢ় অন্ধকার। স্থূলকায় থামগুলি দাঁড়িয়ে আছে যেন যমদূতের মত। কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যাবার গলিপথগুলি কেমন যেন ভয়াবহ। মনে হয় কে যেন গলির মধ্যে লুকিয়ে আছে ওৎ পেতে। গেলেই ঝাপটে ধরে কণ্ঠনালি চেপে ধরবে। যে ঘুলঘুলিগুলিতে পুষ্পপাত্র ও আলোকদান রাখা হত এখন সেগুলি খালি। সেখানে এক বুক করে অন্ধকার।

হঠাৎ নড়ে উঠলো ছাতের খিলান থেকে ঝোলানো ঝাড়-লণ্ঠনের ভগ্ন কাচগুলি। মনে হল, যেন কে নাচছে ঘুঙুর পায়ে দিয়ে। সচকিত হয়ে হামিদা বানু নিজের কোমরে রাখা ছুরিকাটি চেপে ধরলেন।

এই মহলটি কেন পরিত্যক্ত হয়েছিল হামিদার মনে পড়লো।

বাবর শাহের এক জেনানা বদমেজাজী ছিল বলে এরই এক প্রকোষ্ঠে তাকে আটকে রাখা হয়েছিল। জেনানাটিকে হামিদা দেখেননি, তবে শুনেছিলেন তার রূপ নাকি ছিল আসমানের মত জৌলুসে ভরা। হীরা জহরতের মত দ্যুতিময়। কিন্তু আওরত বড় মেজাজী ছিল, দিমাগে বাবরকে সে ইজ্জত দেয়নি। যেদিন বাবর শাহ তাকে সুন্দর সাজে ভূষিত হয়ে তাঁর কক্ষে আসতে বলেছিলেন, জেনানা হুকুমের নফরৎ করেছিল।

সম্রাটের হুকুমের বিরুদ্ধতা, সামান্য এক দুর্বল আওরত! নেমে এসেছিল সম্রাটের নির্মম শাস্তি সেই রমণীর ওপর। বন্দী হয়ে সেই বেয়াদপ রমণী এই মহলেরই এক রুদ্ধকক্ষে আবদ্ধ ছিল।

কিন্তু সেই বিদ্রোহিনী ছিল আরো দুঃসাহসী, সে সম্রাটের শাস্তির তোয়াক্কা করেনি। গবাক্ষের জাফরীর ছিদ্রে নিজের কাপড় বেঁধে গলায় ফাঁস টেনে দিয়েছিল। জেনানাটি নাকি বঙ্গদেশেরই কোন এক অঞ্চলের সোহাগ ছিল।

সে যাই হোক, তারপরেও এই মহল পরিত্যক্ত হয়নি। কিছুদিন ধরে এই মহলের আশেপাশে একটি ছায়া রমণীর উপস্থিতি রাত্রিবেলা অনেকে দেখতে পায়। সে কেমন যেন ভয় দেখিয়ে কণ্ঠনালি চেপে ধরতে আসে। ছুটে কাউকে তাড়া করে ভয় প্রদর্শন করে। এমনিভাবে একদিন সম্রাট হুমায়ুন শাহ এই মহল পরিত্যাগ করেন।

যখন এই সব কথা হামিদা আস্তে ভাবছেন, হঠাৎ সঈদা কাছে এসে চাপা স্বরে বলল—বেগমসাহেবা, জনাব খানসাহেব এসেছেন!

সামনে বিস্মিত চোখে বৈরাম খান দাঁড়িয়েছিলেন।

হামিদা চোখ ফেরাতেই বৈরাম খান সেলাম পেশ করে সম্মান জানালেন, তারপর মৃদুহেসে বললেন—কি আর্জি বেগমসাহেবা? হুকুম ফরমাইয়ে! অধীনকে কেন ডেকে পাঠিয়েছেন?

সঈদা সেখান থেকে সরে গিয়েছিল। সঈদার মুখের দিকে যদি কেউ তাকিয়ে দেখতো, তাহলে দেখতে পেত তার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির ঝিলিক। বাঁদী স্থূলবুদ্ধি নিয়ে আর বেশী কি বুঝবে?

ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে প্রকৃতির আলো—অন্ধকার অপহরণ করেছিল। দুজনে দুজনকে বেশ দেখতে পাচ্ছিল।

হামিদা সেজেছিলেন অপরূপ সাজে। দৌলতের রাণী দৌলত দিয়ে সাজিয়েছিলেন নিজের দেহবর্ণ। হীরার কুণ্ডল, হীরার বালা। সাচ্চা মুক্তোর সাতনরী হার কণ্ঠ থেকে বুকের সবটুকু অধিকার করেছিল। তাছাড়া রক্তবর্ণের সাটিনের সালোয়ার, কামিজ, বেগুনীরঙের ওড়নাখানা অবহেলাভরে মাটিতে লুটোচ্ছিল। আতরের খসবু দিয়ে বাতাস আমোদিত করেছে।

কেন যে এত অপরূপ করে সেজেছিলেন, হামিদা নিজেই জানেন না। কি উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্যে এই সাজ তা তাঁর অজ্ঞাত। তবে তিনি সব সময়েই সেজে থাকতেন, বর্তমানে তার ওপর একটু রঙ চড়িয়েছেন মাত্র।

কিন্তু বৈরাম খানের সেই পূর্বদৃষ্টির পুনঃ প্রতিফলন দেহের ওপর পড়তে তিনি সঙ্কুচিত হলেন। তাঁর তখনই মনে হল, এমনিভাবে সেজে আসা তার উচিত হয়নি।

হঠাৎ বড় লজ্জা এসে গণ্ড রক্তিম করলো। তিনি অনুতপ্ত হলেন। না এলেই বুঝি ভাল হত। কিন্তু আকবরের নিরাপত্তা! সন্তানের জীবন!

মনে পড়তেই হামিদা মাথা তুললেন, কাতরস্বরে বললেন—আমার সন্তানের জীবনরক্ষার জন্যে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

বৈরাম খান অবাক হলেন আকস্মিক এই কণ্ঠস্বরে। কিছুক্ষণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তারপর বললেন—কেন কোন কারণ ঘটেছে?

হামিদা চুপ করে থাকলেন। তাঁর সেইমুহূর্তে মনে হতে লাগলো, তিনি কি শুধু পুত্রের নিরাপত্তার জন্যেই এতদূর এগিয়ে এসেছেন? না, অন্য কারণও আছে। অবচেতন মনের মধ্যে কোন ভিন্ন উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত! এই নিশুতি রাত্রি। নিভৃতে এখানে দেখাশোনা। তাছাড়া নিজে তিনি সেজেছেন অপরূপ সাজে।

কেন? কেন? কি জন্যে তাঁর এই নিভৃত অভিসার? অভিসারই বলবে। কেননা এক খুবসুরত রমণী দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য পেয়ে তবু এসেছে এক দুষ্ট মতলবী ধূর্ত লোকের সাথে দেখা করতে। হয়তো যদি সন্তানের জন্যে তার এই ব্যগ্রতা থাকতো, তাহলে কিছু বলার ছিল না কিন্তু কোথায় যেন একটু অন্য সম্বন্ধ সৃষ্টি করবার ইঙ্গিত। স্বামীর দোস্ত, তারও যদি দোস্ত হয় ক্ষতি কি? কিন্তু একটি

রমণীর দোস্ত যে একজন পুরুষ হলে দুজনের সম্বন্ধ দোস্তের বন্ধনে থাকে না, একথা তখন সম্রাজ্ঞী বুঝতে চাইলেন না।

আজ বলতে দ্বিধা নেই। হামিদা নিজেই নিজের অন্যায় স্বীকার করেন। স্বামীর সোহাগ যত আবেগ মথিতই হোক, কিন্তু তিনি বৃদ্ধ, তার রক্ত তরল হয়ে এসেছে, তিনি হামিদাকে সুখী করতে পারেন না, এই কথাই সেদিন সম্রাজ্ঞীর মনে উদয় হয়েছিল।

আর বৈরাম খান ছিলেন হামিদার চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের বড়। দুজনের রক্তেই তখন উদ্দাম তারুণ্য। বৃক্ষশাখে যেমন নতুন পত্রলয় সবুজরঙের প্রাণস্পন্দন নিয়ে বাতাসে আন্দোলিত হয়, তেমনি তারুণ্যের এই যৌবনপুষ্ট দুটি নরনারী সেই নিশুতি রাত্রে উভয় উভয়ের দিকে অন্যদৃষ্টিতে তাকালো।

হামিদার মনে পড়লো সেই সর্পদংশনের রাত্রিটি। সেই দৃষ্টি, আজও সেই সাতৃষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে লোকটি তার দিকে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ হামিদা চাপাস্বরে ফিস ফিস করে বললেন—সম্রাট যদি তাঁর এই দোস্তের দৃষ্টির অর্থ অবগত হন ?

বৈরাম খানও সেইস্বরে উত্তর দিলেন—দৃষ্টির স্বাধীনতা সবারই আছে।

কিন্তু সেই দৃষ্টিতে যদি সুস্থচিন্তা প্রকাশ না হয় ?

অন্যায় কিছু নয়। রূপের দর্শন সবারই চোখে আগ্রহ সৃষ্টি করে।

আর কামনা ?

রূপ মনের মধ্যে অভিভূত করলে কামনা স্বাভাবিক পথ প্রার্থনা করে।

কিন্তু আমি যদি সম্রাটকে দোস্তের এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলি !

লাভ কিছু হবে না। সম্রাট আমাকে নিজের চেয়েও বিশ্বাস করেন।

হঠাৎ হামিদা দূরে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বললেন—আর সেইজন্যেই বুঝি আপনি সুযোগের আশ্রয় নিয়েছেন ?

আবার বৈরাম খানের বিস্ময়। বিস্ময়ে বললেন—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, আপনি কি বলতে চাইছেন ?

ঠিকই বুঝতে পারছেন। শুধু না বোঝার ভান করছেন। সম্রাট আপনার চালাকি ধরতে না পারুন, আমার কাছে আপনার সব কৌশলই ধরা পড়ে গেছে। আপনি আমাকে জব্দ করবার জন্যেই আকবরের ওপর অত্যাচার করছেন। অথচ আপনি বেশ ভালভাবেই জানেন, আকবর সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। তাকে মানুষ করবার ভার সম্রাট বিশ্বাস করে আপনার ওপর দিয়েছেন। আর আপনি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তার ওপর অত্যাচার করে চলেছেন। তার মতের বাইরে তাকে শাসন করে তার দৃঢ়তা ভেঙে দিচ্ছেন।

বৈরাম খান নিজের মনের অভিসন্ধি অন্যের মুখে শুনে অপরাধীর মত কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—বেশ আমি স্বীকার করছি, তাই করেছি। এবার বেগমসাহেবের আজ্ঞা কি বলুন ?

হামিদা মাথা তুলে বললেন—আমি আপোষ চাই। অন্তত সন্তানের ক্ষতি যাতে না হয়, তার জন্যে কোন স্বার্থত্যাগ।

বৈরাম খান হঠাৎ মৃদু হেসে বললেন—আমি রাজী। কি আপোষ প্রত্যাশা করেন ?

হামিদা চুপ করে ভাবতে লাগলেন।

মাথার ওপর আসমানের নীলিমায় হঠাৎ একটি তারা দৃষ্টিগোচর হল। তারাটির উজ্জ্বলতা দেখে হামিদা নিজের মনের অন্ধকারে সেই উজ্জ্বলতার একটু আলো প্রবেশ করাতে চাইলেন।

এই সময় হঠাৎ বৈরাম খান এগিয়ে গিয়ে হামিদার অতি নিকটে দাঁড়ালেন। একেবারে বুকের সান্নিধ্যে।

আবেগ জড়িতকণ্ঠে বৈরাম খান বললেন, খোদা তোমাকে যে সুরত দিয়েছেন, সে কি ঐ প্রৌঢ় সম্রাটের ভোগের জন্যে ব্যয়িত হবে ? আমি এই চেয়েছিলাম, আমি তোমার রূপে মুগ্ধ বেগমসাহেবা !

যেন সেই বিষধর সর্প আবার দংশন করলো হামিদাকে। হামিদা ককিয়ে উঠলেন। একজন অধীনস্থের মুখে অপমানজনক উক্তি শুনে তাঁর সম্রাজ্ঞীর পদগৌরব ক্ষুণ্ণ হল, তিনি ক্ষুব্ধস্বরে বললেন—স্তব্ধ হও দুঃসাহসী বেইমান ! স্পর্ধার সীমা যে ছাড়িয়ে গেছ, তা ভুলে যেও না।

বৈরাম খানও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমার স্পর্ধার একটা সম্পূর্ণ অর্থ আছে কিন্তু আপনি এই নিভৃত ভগ্নমহলে নিশুতি রাত্রে শুধু কি এমনি এসেছেন, এই আমাকে বিশ্বাস করতে হবে ?

আর না। সত্যকথাটা বুঝি প্রকাশ হয়ে পড়বে। আসল আকৃতির বীভৎস রক্তাক্ত ক্ষতটি বেরিয়ে পড়লে নিজেরই ভয় করবে।

তাই হামিদা ছুটলেন। বোরখাটা আবার দেহকে আচ্ছাদিত করে ফেলে দিয়ে পাগলীর মত ছুটলেন। কানদুটি রুদ্ধ করে দিলেন। রক্ত যেন দমকে দমকে প্রাবল্য সৃষ্টি করে মুখ দিয়ে উঠে আসতে লাগলো। দেহের প্রতিটি রক্তনিঃসরণের মুখ যেন হঠাৎ বড় হয়ে স্রোতস্বিনী হল।

হামিদার নেশা কেটে গেল। অনুতপ্ত হয়ে সেই গভীর নিশিথে শূন্যে কাকে যেন উদ্দেশ্য করে বললেন—এই পাপের জন্যে আমি যেন ক্ষমা পাই।

কিন্তু আমার আকবর, আমার মাতৃত্ব !

এই বুভুক্ষার সংশয় আবার দেখা দিয়েছিল, যখন সম্রাট হুমায়ুন শাহের আকস্মিক মৃত্যু কানে আসতে।

তার আগে সেই রাত্রির নিভৃতদর্শনের পরিনামটুকু লিপিবদ্ধ করা যাক্।

সঙ্গীদাকে বিশ্বাস করে হামিদা বেগম বৈরাম খানের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এবং এ সংবাদ গোপন রেখে দিতে বলেছিলেন। সঙ্গীদা বিশ্বাস ঠিকই রেখেছিল, তবে সে বেগমসাহেবার সেই নিভৃত মিলনের অর্থ অন্য করেছিল। রমণী পুরুষের সঙ্গে মিলিত হলে যা স্বাভাবিক অর্থ হয়, সেই অর্থই সে মনে ধারণ করেছিল।

আর তারই পরিণাম সঙ্গীদার মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। সেও মহিষীর মত ব্যভিচারিনী হয়েছিল। যৌবন তার ছিল, বয়সও তার খুব একটা বেশী নয়। মরদ চতুর্দিকে ঘুরছে। তাদের একটু সুযোগ দিলেই জীবন মধুময় হয়। অন্তত কটি রাত্রির সুখস্বপ্ন বিচ্ছিন্ন হয় না। আর তাছাড়া সম্রাজ্ঞী নিজেই যখন দ্বিচারিনী, কলঙ্কিনী—তখন তারা তো সামান্য বাঁদী ছাড়া কিছু নয়! তাদের চরিত্রের সততা কে অনুসন্ধান করে?

তাছাডা সম্রাট নিজে যদি কখনও কোন বাঁদীর প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে চান, তাহলে বাঁদীর গররাজির কোন ক্ষমতা আছে, না নফর সাহস করে প্রভুকে চটাতে পারে!

যাই হোক, সঙ্গীদা ছিল খাঁসবাদীর অন্যতম। সম্রাজ্ঞীর মহলেই তার বাস। সম্রাজ্ঞীর মহলেই গোপনে বাইরের লোক আনতে লাগলো।

চললো কিছুদিন ব্যভিচারের স্রোত মহলের গুপ্ত প্রকোষ্ঠের হর্ম্যতলে। দুঃসাহসী সঙ্গীদা বেপরোয়া হয়ে উঠলো।

শেষে একদিন সংবাদ গেল সম্রাজ্ঞীর কাছে।

চমকে উঠলেন হামিদা বানু। ছুটে গিয়ে চেপে ধরলেন ব্যভিচারিনীর কণ্ঠনালি।

সঙ্গীদা তখনই সরোষে বললো—আমার বেলা অপরাধ, আর সম্রাজ্ঞীর কোন অপরাধ নেই। তিনি নিভৃতে খানখানান সাহেবের—।

কথার শেষ আর হল না। ঠাস্ ঠাস্ করে চড় পড়তে লাগলো সঙ্গীদার গণ্ড লক্ষ্য করে। হামিদা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। নিজের সম্মান থেকে নীচে নেমে পড়ে পাগলিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। সেই অবস্থায় রাগের বশে চাবুক দিয়ে সঙ্গীদার কোমল অঙ্গ রক্তাক্ত করলেন।

তারপর পরিশ্রান্ত হয়ে নিজের কক্ষে ঢুকে হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকোলেন। চোখের কোণে অশ্রুর স্রোত এসে গণ্ডপ্লাবিত করলো।

হামিদা সেইমুহূর্তে বুঝলেন, অন্যায় তারই! সঙ্গীদা বেতনভোগী নোকর বলে নীরবে প্রহার সহ্য করলো। কিন্তু তিনি নিজেই তো তাকে এ সুযোগ প্রদান করেছেন।

কেন সেদিন রাত্রে তিনি বৈরাম খানের সঙ্গে মিলিত হলেন? তিনি কোন অন্যায় করেন নি বটে কিন্তু সে কথা কে বিশ্বাস করবে? তার উপরওয়ালা কেউ থাকলে সেও তো তার বিচার এমনি করতো! ঠিক সঙ্গীদার মত।

তারপর থেকেই হামিদা সংযমী হয়েছিলেন। মনের কোন দুর্বল প্রবৃত্তিকেই প্রশয় দেন নি। সন্তানের জন্যে কোন কাতরতা। তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারে হারিয়ে গেলেও নিজের নিঃস্বতা দিয়ে তাকে বাঁচানোর ভান করবেন না।

একটি সন্তান। আজ সে তার কেউ নয়। মুঘল রাজবংশের প্রদীপশিখা। তৈমুরের উত্তরসাধক। কেউ যদি হঠাৎ তাকে গুপ্তহত্যার দ্বারা নিঃশেষে সরিয়ে দেয়, কারও ক্ষমতা নেই তার প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে রাখে।

তাই হামিদা অন্তঃপুরের কঠিন অবরোধের মধ্যে শয্যার নিভৃত সুখগহনে শুয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটিয়ে দিতে লাগলেন। আর স্বামীর বিক্ষুব্ধ মনে মাঝে মাঝে সান্ত্বনা জানাতে লাগলেন। স্বামীকে সান্ত্বনা না জানালে তাঁর বিরাট মনে অসহায়তা বড় বেশী তাঁকে পঙ্গু করে দিত। পত্নীর কর্তব্য বলে হোক বা শুভানুধ্যায়ী বলে হোক্ তাঁকে এইটুকু ত্যাগস্বীকার করতে হত।

আর একজনের চোরাদৃষ্টির অর্থ মাঝে মাঝে মনের মধ্যে আলোড়ন জাগালে নিজেকে তার বড বড খারাপ লাগতো। আর তখনই তিনি নিজেকে আরো অন্তঃপুরের গভীরে প্রবেশ করিয়ে দিতেন। কিন্তু সব সাবধানতাই একসময় নিঃশেষে মুছে গেল, যখন সংবাদ প্রচারিত হল সম্রাট হুমায়ুন শাহ আকস্মিক কবরশায়িত হয়েছেন।

আকাশ যেন ভেঙে অন্ধকার নেমে এল। নীল আকাশের প্রান্তর জুড়ে আর কোথাও আলোর নিশানা থাকলো না। কে যেন অপর্যাপ্ত কালি দিয়ে লেপে দিল সম্মুখের দৃষ্টি। প্রলয়ের ঝঞ্ঝা বইলো আকাশে, বাতাসে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে। সুখের সেই স্বপ্নশয্যা, আহারের মোগলাই খানা, বিলাসের রঙীন পেয়ালা চূরমার হয়ে গেল।

সেদিন বুঝি কখনও ভোলা যায় না।

অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত হল।

সুখের সংসার ভেঙে তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেল।

হামিদারই মনে আঘাতটা সবচেয়ে বেশী বাজলো। সবে শান্তির যমুনা কল্লোলে ভাসতে ভাসতে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। স্বামীর বিক্ষুব্ধ জীবনে শুধু যুদ্ধ, হানাহানি, এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত শুধু দৌড় করেই পরিশ্রান্ত। স্বামীর সাথে তাঁকেও ছায়ার মত ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। সব শ্রমের শেষ স্বস্তি দিল্লী অধিকার।

দিল্লীর প্রাসাদ শীর্ষে মুঘল পতাকা উড্ডীন করে, স্বামীকে সিংহাসনের ঐশ্বর্যে প্রতিষ্ঠিত করে হামিদা তখন অন্য কিছু চিন্তার সমুদ্রে অবগাহনে ব্যস্ত। সাফল্যের একটা নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দে তখন হৃদয়ের অন্তঃস্থল পুলকিত।

তিনি তখনই পুত্রকে দেখার জন্যে চঞ্চল হয়ে স্বামীর অনুমতি নিয়ে সেই কালানোর দুর্গে গেছেন। সেখানে শুধু পুত্রই ছিল না। ছিল পুত্রের অভিভাবকও। নিঃসন্দেহে সেই অভিভাবকের অভিপ্রায় অবগত হয়ে একটু ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হয়েছেন।

নিষিদ্ধ বস্তুর দিকে মানুষের যেমন স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে, সেই আকর্ষণই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

না, সেখানে তিনি কোন দুর্বলতাকেই প্রশ্রয় দেন নি। দুর্গের অন্তঃপুরে সম্রাজ্ঞীর পদগৌরবে বাঁদী ও বান্দার সেলাম পেয়ে আয়াসের মাঝেই কালাতিপাত করেছেন।

রমণী জীবনের কোন গোপন সম্বন্ধ, অন্তরের কোন অভিলাষ, নতুন অভিসার রচনার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের কোন প্রবল ইচ্ছা তাঁর ছিল না, শুধু প্রয়োজনের জন্যে প্রয়োজন মেটাবার প্রত্যাশায় তিনি পুত্রকে দেখতে কালানৌর দুর্গে গিয়েছিলেন।

আর একবার দেখতে এসেছিলেন বৈরাম খানের গতিবিধি।

অনেকদিন থেকে স্বামীকে এই মানুষটির ওপর থেকে আস্থা তুলে নেবার জন্যে চেষ্টা করে এসেছেন কিন্তু সম্ভব হয় নি। কেমন যেন নিজেকে অন্তঃসার শূন্য মনে হয়েছে, স্বামী বুঝি তাঁর মনের কথা ধরে ফেললেন! ঈর্ষার বাষ্পে যে তার কণ্ঠ পরিবর্তিত হয়ে আছে, তা বুঝি আর গোপন থাকবে না।

বৈরাম খান যেন তাঁর সপত্নীর মতন। সবটুকু প্রীতি স্বামীর অপহরণ করার জন্যে তাঁর এই ঈর্ষা। কিন্তু স্বামীর কাছে কিছুতেই তাকে অপমানিত করে পরিত্যক্ত করতে পারলেন না।

বিষের সেই ঈর্ষার জ্বালা নিয়েই কালানৌর দুর্গে সেই ধূর্তকে দেখতে গিয়েছিলেন।

তারপর হঠাৎ একদিন গভীর নিশিথে সংবাদ এল, সব শেষ।

হামিদা তখন অন্তঃপুরের বিশেষ একটি ঐশ্বর্যমণ্ডিত কক্ষে স্বর্ণপালঙ্কে শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছিলেন, সংবাদটা তাঁর কানে আচমকা প্রবেশ করতে দিশেহারা হয়ে পড়লেন।

প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেন নি, মনে হয়েছে চক্রান্ত। রাজনৈতিক চক্রান্ত অনেক সময় দানা বেঁধে উঠলে তার প্রকাশ অনুমান করা যায় না। তারপর যখন সেই চক্রান্তের আসল স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন চতুর্দিকে তার আকস্মিকতা উপলব্ধি করা যায়।

মনে হয়, সম্রাট সেই চক্রান্তের মাঝে পড়েছেন কিন্তু তাই বলে এত তাড়াতাড়ি তাঁর মৃত্যু হয় নি।

এ বিশ্বাসযোগ্য নয়। পৃথিবী যদি এইমুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেত, তবু বিশ্বাস করা যায় কিন্তু সম্রাটের মৃত্যু!

এত তাড়াতাড়ি তাঁর সৌভাগ্য অস্তমিত হবে, এ যেন কল্পনার বাইরে। হামিদা তাই প্রথমে শুনে এক যুগ স্তব্ধ হয়ে থাকলেন। চিরকাল শিবিরে শিবিরেই স্বামীর সাথে কাটলো। একদিনের জন্যে বিপদ মুক্তি, একদিনের জন্যে নীরব প্রশান্তি, জীবনে এল না। যদিও বা বর্তমানে মিললো, তাও শেষ।

তারপর ধীরে ধীরে ব্যাপারটা অনুধাবন করে অশ্বের ওপর সওয়ার হয়ে বসলেন।

ছুটে এলেন বৈরাম খান। বাধা দেওয়ার জন্যে প্রতিবাদ করে বললেন, এ সময়ে আপনার সেখানে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। যদি সম্রাটের মৃত্যুতে বিদ্রোহ জেগে থাকে তাহলে আপনার প্রাণসংশয় হবে।

চোখে অশ্রুর প্রাবল্য বোধ হয় নি। দু' চোখে তপ্ত অশ্রু নিয়ে হামিদা বললেন—সম্রাট যখন চলে গেছেন, তখন আমার এই জীবনের প্রয়োজন কি? আমার জীবন সেই মহানুভব ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে গেলেই তো মঙ্গল বেশী!

কিন্তু আপনার পুত্র, আকবর এখনও আছে, তার জন্যে আপনার দায়িত্ব কম নয়। অন্তত তার জন্যে আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে।

হামিদার কথাটা সেইমুহূর্তে স্মরণ হল। মাতৃত্ব আবার হাহাকার করে উঠলো। এবার পত্নীত্ব গিয়ে মাতৃত্বের ভূমিকাতে সম্পূর্ণ তাঁকে প্রবেশ করতে হবে।

কিন্তু তবু একটিবার শেষ দেখা, পনেরো বছরের একাধিকক্রমে যাঁর সান্নিধ্যে যৌবনের অনেকগুলি তপ্তমুহূর্ত অতিবাহিত হয়েছে। যাঁর হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যন্ত পরিচিত। অতো বড় একজন পুরুষ কিন্তু তিনি শিশুর মত যখন অসহায় বোধে ছুটে আসতেন! এসব কথাই সেই মুহূর্তে মনে আসতে হামিদা আর স্থির থাকতে পারলেন না। মাত্র কটি অনুচর সঙ্গে নিয়ে অশ্বের ওপর উঠে বসলেন।

কবরশায়িত হবার পূর্বে শেষ একটিবার দর্শন। সেই প্রশান্ত সুন্দর বদন। চিন্তার কুহেলিকায় কত রেখার ছাপ পড়েছে। সেই কম্পিত দুখানি পুরু অধর, বলিষ্ঠতার ছাপ এঁকে তেজস্বী করে রেখেছিল। তারপর তিনি যখন সেদিনও বলিষ্ঠ বাহুর আলিঙ্গনে কাছে টেনে নিলেন—কে বলবে তিনি দিন দিন প্রৌঢ়ত্বের ধাপে এসে পৌঁছচেন?

একদিনের কথা সবচেয়ে মনে পড়ে। এই সেদিন দিল্লী বিজয় করে ফিরে তাকে কাছে টেনে নিলেন। এমন নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন, যা কোনদিন করেন নি। সোহাগ রঞ্জন পরিয়ে দিয়ে আবেগমথিত কণ্ঠে বললেন—বেগম, আজ আমি সম্পূর্ণ। পিতার রাজ্য হারিয়ে মনে বড় কষ্ট অনুভব করেছিলাম, নিজেকে বড় অক্ষম মনে হয়েছিল। আজ পিতার রাজ্য আবার পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, পিতার আশীর্ব্বাদ বুঝি আর দুর্লভ নয়।

এই সেই পুরুষ।

আজ তিনি নেই! আর তারই বেগম হয়ে স্বভাবের সবকিছু জেনে শেষ সময়ে একবার কাছে যাবো না!

সেইজন্যে তিনি বিপদ জেনেও দিল্লী গিয়েছিলেন।

কিন্তু এসব অতীত আরো অতীতে চলে গেছে।

বর্তমানে যখন তিমি পূর্ণ মাতৃত্বে এসে পৌঁছলেন, যখন তাঁর চিন্তা তাঁরই পথ—তখনকার কথাই লিপিবদ্ধ যোগ্য।

সম্রাটের মৃত্যুর পর শোকসাগরে হামিদা নিমজ্জিত হয়েছিলেন কিন্তু বার বার তাঁর মনের মধ্যে নাবালক পুত্র আকবরের ছবি ভেসে উঠেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে শোক অপসারিত হয়ে মাতৃত্বের পূর্ণরূপ বলিষ্ঠতার সহযোগে মনের দৃঢ়তা সৃষ্টি করেছিল।

যে গেছে তাঁর স্মৃতিই বড় নয়। তাঁর কষ্টায়াসে প্রাপ্ত নবলব্ধ সাম্রাজ্য রক্ষা করাই তাঁর প্রতি কর্তব্য জ্ঞাপন করা। তাছাড়া তাঁরই ঔরসজাত পুত্র, মুঘল বংশের প্রদীপশিখা, সে শিখা প্রজ্জলিত করে বংশকে রক্ষা করাও কর্তব্য।

অনেক বড় দায়িত্ব যেন স্কন্ধে স্থাপন করে স্বামী সরে পড়েছেন। এবার পরীক্ষা সম্মুখীন। তিনি অন্তরালে থেকে পত্নীর যোগ্যতা পরিমাপ করেছেন। একদিন যেমন সোহাগরঞ্জন পরিয়ে বাহু আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে রমণীর সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, তেমনি আজ দায়িত্ব দিয়ে গেছেন মাতৃত্ব সমুজ্জ্বল করে নাবালক পুত্রকে সাবালক করে মুঘল সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাঁরই অবহেলায় যদি মুঘল রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে মৃত মুঘল পূর্ব-পুরুষরা কখনই তাকে ক্ষমা করবেন না। তাঁদের অনেক কষ্টে, অনেক মেহনতে পাওয়া রাজ্য পরহস্তগত হলে তাঁরা অন্তরাল থেকে অভিশাপ দেবেন।

হামিদা নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিলেন।

একদিন বৈরাম খানের অন্তরালে থেকে নিজের সাহসকে অন্তর্মুখী করতেন, সেদিন বৈরাম খানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন—আপনিই আমার শেষ অবলম্বন, আপনাকে যেমন সম্রাট দোস্ত বানিয়েছিলেন, আজ বেগমের দোস্ত হয়ে মুঘল ঐতিহ্যকে রক্ষা করুন। আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে আমি আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করবো।

কিন্তু সেদিন বড় দুঃসময়। বৈরাম খানের মত কূটবুদ্ধি মানুষও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।

গোয়ালিয়র গেছে, আগ্রা গেছে দিল্লীও হস্তান্তরিত।

মুঘল রাজত্বকে ধ্বংস করবার জন্যে তুর্ক আফগান, রাজপুত প্রভৃতি যোদ্ধারা হিমুর পতকাতলে উপস্থিত হয়েছে।

একা বৈরাম খান কি করবেন?

নিজের জীবন রক্ষার জন্যে স্বার্থে অন্ধ হয়ে মুঘল সম্বন্ধ ত্যাগ করে সরে পড়াই বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া এখন স্বাধীনতার জন্যে, মুঘল অধীনতা অস্বীকার করবার জন্যে হিন্দুস্থানের প্রতিটি লোক আগ্রহী। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধাচরণের কোন মূল্য নেই, যখন মুঘল সৈন্যরাই ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করেছে।

হামিদা বৈরাম খানের মনোভিপ্রায় অবগত হলেন। নেমকহারামের বেইমানীতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে গিয়ে স্বামীর কথা স্মরণ করলেন। রাজনৈতিক প্রবঞ্চনায় ছলনার আশ্রয় নিলে কোন অপরাধ হয় না! শত্রুকে কর্তব্যের খাতিরে বন্ধু করে নিয়ে, শয়তানকে উত্তম কথায় প্রলোভিত করে কার্যোদ্ধার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে কোন পাপ নেই। তাতে খোদার আশীর্বাদই পাওয়া যায়। যে এই কৌশল অবলম্বন করতে পারে না, তাকে খোদাও ক্ষমা করে না। তার জন্যে জগতের অন্ধকার পথই সৃষ্টি হয়ে থাকে। অশ্রু স্রোতস্বিনী হয়। দুর্ভাগ্যই প্রাণের সম্বল হয়।

স্বামীর এই কথা স্মরণ করে হঠাৎ হামিদা ছলনার আশ্রয় নিলেন। বৈরাম খানকে মিষ্ট কথার তুষ্ট করে বললেন—আপনাকে আমি সম্রাট স্বামীর পরই শক্তিমান বলে মনে করি। এই দুর্দিনে যদি আপনি সরে দাঁড়ান, তাহলে সমস্ত মুঘল পরিবারটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। আপনি কি তাদের রক্ষার জন্যে কোন শক্তিই প্রয়োগ করতে পারেন না?

রমণীর এই পৌরুষের ওপর আঘাত হানতে শক্তিমান খানসাহেবের হৃৎপিণ্ডে অপমানের জ্বালা সৃষ্টি হল। হিমুর মত এক অসমসাহসিক বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করা বড়ই অসাধ্য, তবু চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?

কিন্তু বিনিময়ে কি মিলবে? যদি কোনরকমে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন, তাহলে আকবর হবে তাঁর অধিকারী। আর তিনি সেই নাবালক সম্রাটের অভিভাবক হয়ে রাজ্য পরিচালনা করবেন। একদিন এই সম্রাটের নাবালকত্ব অপসারিত হলে তাঁর কর্তব্য শেষ হয়ে যাবে। তখন তিনি কি করবেন? রাজসরকারের কৃপার পাত্র হয়ে বাকী দিনগুলি আয়াসের মাঝে কাটিয়ে কবরশায়িত হবেন। এই চিন্তার মধ্যে কাপুরুষতার ছোঁয়াচই বেশী।

তবু খানসাহেব সেই জীবনই মেনে নিতে পারেন, যদি তার বিনিময়ে অন্য কিছু দুর্লভ বস্তু প্রাপ্ত হন। সাধারণত ভাগ্যান্বেষীরা অন্যের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে নিজের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেছে। ইতিহাসে এমনি ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। বিবেকের পরিচয় দিলে আর অপরের বুকে ছুরি বসানো যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ শেরশাহ। তাঁরও পূর্ব-পুরুষ কেউ একটা সম্রাট পদগৌরব পান নি। অথচ সেই ফরিদ একদিন ব্যাঘ্রহন্তাকারী বীর শূরবংশের প্রতিষ্ঠা করে দিল্লীর সিংহাসনের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসলেন।

এমনি দৃষ্টান্ত আরো কত আছে! ভাগ্যান্বেষীদের ভাগ্য এমনিভাবে নিজের ক্ষমতার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। তারপর তাদের নিয়ে ইতিহাস রচনা হয়েছে।

সেই মুহূর্তে বৈরাম খান সে কথা ভেবেছিলেন! এদের ত্যাগ-করে হিমুর সাথে বন্ধুত্ব করে নিজের পথ করে নেন। ধ্বংস হোক্ মুঘল ঐতিহ্য। লুপ্ত হোক্ তাদের জৌলুস। তাঁর এতে কি যায় আসে?

এমনি সময়ে হামিদা স্বামীবিহনের শোকের বিষাদ মুখমণ্ডল থেকে মুছে, চোখের জলের স্রোতে বাঁধ সৃষ্টি করে হঠাৎ সেই তারুণ্যের উজ্জ্বলতা মুখের ওপর ফুটিয়ে চোখে মোহিনী মায়া সৃষ্টি করলেন। দয়িতের প্রাণে চেয়ে রমণী যেমন কাতর বিহ্বল চোখে মেঘের প্রান্তবুকে আলপনার আঁকিবুঁকি কাটে, তেমনি হামিদা বানু উনত্রিশতম যৌবন পার করেও আবার সেই অষ্টাদশের উত্তপ্তময় দিনে ফিরে এলেন।

হামিদা বানু লজ্জারুণ আরক্ত বদনে পদ্মকলিসম আঁখি নত করে চাপাস্বরে বললেন—আপনার মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হবে। আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।

এরপরই সেরাত্রে আকবরকে রমণীর পোষাক পরিয়ে কয়েকখানি পাল্কী অন্তঃ-পুরিকা পরিবৃতা হয়ে পলায়ন করলো।

আর বৈরাম খান ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের একত্র করবার জন্যে আলী কুলী সাইবনীর সাহায্য নিয়ে তরদী বেগকে খুঁজতে লাগলেন।

তারপরের ঘটনা অবশ্য সকলের জানা।

[এরপরে দ্বিতীয় খণ্ডে দেখুন]